ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক-পত্রিকা

## দ্বিতীয় বর্ষ

মাঘ ১৩৩৫ – পৌষ ১৩৩৬

সম্পাদক
শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এ, এম্-আর-এ-এস্

রামধনু কার্য্যালয়
১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

# রামধনু

## দ্বিতীয় বর্ষ, ( মাঘ, ১৩৩৫—পৌষ, ১৩৩৬ )

### বিষয়-সূচী

বর্ণানুক্রমিক


| বিষয় | লেখকের নাম | পৃষ্ঠা |
| --- | --- | --- |
| অদল বদল ( পৌরাণিক গল্প ) ... | শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি, এ, এম্, আর, এ. এস ... | ৩২৩ |
| অন্ধ মেয়ে ( গল্প ) ... | অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল, এম্-এ, বি, এল | ৩০৭ |
| অপ্রস্তুত ( গল্প ) ... ... | শ্রীমতী মণিকা দেবী | ১৬২ |
| অলঙ্কারের কথা ( সচিত্র ) ... ... | ,, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস-সি | [illegible] |
| অশথের আতিথ্য ( কবিতা ) ... ... | ,, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি, এ ... | ২০৯ |
| আগে চল্ আগে চল্ ( সচিত্র ) ... ... | ... ... ... ... | ১১০ |
| আত্ম-সম্মান ( গল্প ) ... ... ... | শ্রী—— ... ... ... | ৩৭৪ |
| "আম খাব" খেলা ... ... | ,, ননীগোপাল মজুমদার ... | ২৫৬ |
| আশীর্ব্বাদ ( কবিতা ) ... ... | ,, হরেন্দ্রনাথ সিংহ, কবিভূষণ ... | ৫০৫ |
| আশ্বাস ( কবিতা ) ... ... ... | ,, নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্-এ | ৫৩৭ |
| আয় চাঁদ আয় ( কবিতা ) ... ... | ,, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ... | ৪৬৪ |
| ইউরোপ যাত্রার দুঃখ ( সচিত্র ) ... ... | ,, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, | ৫১৬ |
| উচিত সাজা ( গল্প ) ... ... | ... ... ... | ২৩৪ |
| উড়ো জাহাজে ভারতবাসী ( সচিত্র ) ... | ... ... ... | ২৭৬ |
| একটি গোপনীয় কথা ( গল্প ) ... ... | অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্-এ, | ১৩৭ |
| কবিতার সুপুরুষ ( রঙ্গচিত্র ) ... ... | ... ... ... | ৪৮০ |
| কমল ও পঙ্ক ( কবিতা ) ... ... | শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ ... | ১৯৬ |
| কষ্টিপাথর ( ধারাবাহিক গল্প ) ... ... | অনুবাদক—অধ্যাপক শ্রীমনো[illegible] ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি, এল, | [illegible]৭৭, ৬২৮ |
| কান ঢাকা টুপী (গল্প) ... ... | শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্[illegible] ... | ৫৯৭ |
| কাপাটি কাপাটি ড্যাং ( কবিতা ) ... ... ... | ,, সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ[illegible] বি, এস্ সি, ... ... | ১০৫ |
| কাবুলী ওয়ালার দেশ ( সচিত্র ) ... ... | সম্পাদক ... | ৩০, ৯৩ |
| কাঁটার ব্যথা ( গল্প ) ... ... | শ্রীঅরুণা দেবী ... | ৪২১ |
| কৃপণের সাজা ( গল্প ) ... ... | শ্রী—— ... | ৩৬২ |





বিষয় — লেখকের নাম — পৃষ্ঠা

... ... ... ... ৩০৫
কেন ... ... ... ... ... ৬২০
কে বেশী সুন্দর (ব্যঙ্গচিত্র) ... ... ... ... ৫৫
কেরোসিন তেল কোথা হইতে আসে (বিজ্ঞানের কথা) শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য... ২৫৭
[illegible]ণিকা ( গল্প ) ... শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী ... ৪৬৫
[illegible]খুকীর আব্দার ( কবিতা ) ... স্বর্গীয়া সুনন্দা ভৌমিক ... ৫৫০
[illegible]খোকাখুকু ( কবিতা ) ... শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র ... ৪৩০
[illegible]খোদার উপর খোদকারী ( গল্প ) ... ,, কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, বি, এ... ১৭৮
[illegible]দখালির হাত ( গল্প ) ... অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্-এ, বি-এল, ৩৬৪
[illegible]ায়ের চাষী ( কবিতা ) ... ,, জ্যোৎস্না দেবী ... ২৭৭
[illegible]ীসের পণ্ডিত (ইতিহাসের গল্প) ... শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর, এ, এস, ৩১১
[illegible]াও ঘুমাও ( কবিতা ) ... শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... ২১১
[illegible]গুপ্ত ( ইতিহাসের গল্প ) ... সম্পাদক ... ... ৫৭৯
[illegible]মেলী (কবিতা) ... ,, বিমলচন্দ্র দত্ত ... ১০৮
[illegible]র শ' বছর আগে মেরুর পথে ( সচিত্র ) শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য,...
[illegible]দের দেশের মেয়ে (গল্প) ... অধ্যাপক শ্রীবিভূতি ভূষণ ঘোষাল এম্ এ,বি এল, ৫২১
[illegible]ত্র পরিচয় ... ১০৪, ১৫৪, ২০৬, ২৬০, ৩১০, ৩৪০, ৪০৩, ৪৬৮,
... ৫২০, ৫৭২, ৬১৮
...
... ৩৬৫
[illegible]মো (কবিতা) ... কুমারী উষারাণী দেবী ... ১৫২
[illegible]তালী (কবিতা) ... কুমারী উষারাণী দেবী ... ৪২
[illegible]র ধরা (গল্প) ... শ্রীদুর্গাকান্ত বাগ্‌চি ... ২৬৪
[illegible]বির কথা (সচিত্র) ... ৪৪২
[illegible]াতির মাপ (গল্প) ... শ্রীদেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, ৩৭
[illegible]ছোট বোন্ (কবিতা) ... শ্রীমতী লতিকা দেবী ... ৬৩৪
[illegible]ছোট্ট সাথী (কবিতা) ... কুমারী উষারাণী দেবী ... ৩১২
[illegible]গাই খুড়ো (কবিতা) ... শ্রীঅনিল কুমার সরকার ... ২৮১
[illegible]টিল প্রশ্ন (কবিতা) ... ,, বিকাশ দত্ত ... ৬২১
[illegible]দিনের উপহার (গল্প) ... ,, অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় ... ৩২০
জলের কা[illegible]নের কথা) ... ,, ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি, এস্, সি, ৯৪
জানোয়ারের কথা (সচিত্র) ... শ্রী— ... ১৪৫
জাপান কবে জাগিল (সচিত্র) ... শ্রী— ... ২৫৯
জামসেদপুর ও তাহার কারখানা ... শ্রীসুরেন্দ্র মোহন সেন ... ৫১
জ্ঞান-রাণী (কবিতা) ... ,, উমাপদ ভট্টাচার্য্য ...

| বিষয় | লেখকের নাম | পৃষ্ঠা |
| --- | --- | --- |
| জ্যান্ত আলো (বিজ্ঞানের কথা) | ” ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য | ৩০০ |
| টেনিসের গল্প (সচিত্র প্রবন্ধ) | ” রামকৃষ্ণগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, | ৬০২ |
| ডাকটিকিটের গল্প (সচিত্র) | ” হীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় | ৫৫৮ |
| ডাক্তারী (কবিতা) | ” বিকাশ দত্ত | ৬৭০ |
| ডান্ পিটে (গল্প) | ” ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি এস্ সি, | ৩৪৪ |
| তপস্বীর তেজ (পৌরাণিক গল্প) | ” বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি, এ, এম্, আর, এ, এস্, | ১২৮ |
| তিন বীর (কবিতা) | ” জ্যোৎস্না দেবী | ৫৮১ |
| তিমির গল্প (সচিত্র) | ” হীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় | ৩৩৬ |
| তোমাদের ছোট্ট চীনা ভায়ারা | ” চৈনিক | ৭৫ |
| ত্রিপুর বিনাশ (পৌরাণিক গল্প) | ” বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি, এ, এম্, আর, এ, এস্, | ৩৮১ |
| থেসেলির রাণী (গল্প) | শ্রীমতী মণিকা দেবী | ৫৩৮ |
| দাতাকর্ণ (কবিতা) | শ্রীকালিদাস রায়, বি, এ, কবিশেখর | ৫২০ |
| দানবীর নোবেল (বিজ্ঞানের কথা) | ” ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বি-এস্ সি, | ৫৯০ |
| দুখীরাম (গল্প) | | ৪৮২ |
| দু' পায়া ভূত (গল্প) | অধ্যাপক শ্রীআনন্দ কৃষ্ণ সিংহ, এম্ এ, বি এল, | ২৫৩ |
| দৈত্যের কথা (কবিতা) | শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি এল, | ৫৯ |
| ধাঁধার উত্তর | | ৫০, ১০২, ১৫৫, ২০৭, ২৬২, ৩১৬, ৩৬৯, ৪২৬, ৪৭৮, ৫৩৪, ৫৮৭, ৬৩৯ |
| নব বর্ষের প্রার্থনা (কবিতা) | | ১৫৭ |
| নমস্কার (কবিতা) | শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি এ, | ৪৮১ |
| নয়া বছরের মজা | ” ননীগোপাল মজুমদার | ১৭৫ |
| নিতাইচন্দ্রের তপস্যা (গল্প) | ” চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্ এ, | ১৮৫ |
| নিরানব্বইএর ধাক্কা (গল্প) | ” বাণীকান্ত ভট্টাচার্য্য | ২০৪ |
| নূতন ধাঁধা | | ৫১, ১০৩, ১৫৬, ২০৮, ২৬২, ৩১৭, ৩৬৯, ৪২৭, ৪৭৯, ৫৩৫, ৫৮৮, ৬৪০ |
| পক্ষিরাজের তেজ (পৌরাণিক গল্প) | ” বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি এ, এম্, আর, এ, এস্, | ২৫ |
| পণ্ডিতী সমালোচনা (কবিতা) | অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল, এম্ এ, বি এল, | [illegible] |
| পদ্মরাগ (ধারাবাহিক গল্প) | অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, [illegible] এল, | ১০, ৮৪, ১১৯, ১৯৭, ২২০, ২৯২, ৩৩১, ৪০৪, ৪৬০, ৫৫১, ৬১১ |
| পরলোকে নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল | | ৩৬১ |
| পরীক্ষিৎ রাজার দেহত্যাগ (পৌরাণিক গল্প) | শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি এ, এম্, আর, এ, এস্ | ৬০ |
| পাতালে সোণার পুরী (ঐ) | ঐ | ৪৮৬ |





| বিষয় | লেখকের নাম | পৃষ্ঠা |
| --- | --- | --- |
| পারস্য সেকাল ও একাল (সচিত্র) | | ১৮৯ |
| পূর্ণিমা (দৃশ্যকাব্য) | শ্রীমদনকুমার চট্টোপাধ্যায় | ৪৬৬ |
| পৃথিবীর আকার (রঙ্গ) | ” বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী | ৫৮৪ |
| প্রকৃতির তাজ্জব খেয়াল (সচিত্র) | | ১৬ |
| প্রাচীন ভারত (কবিতা) | শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী | ৪৬৭ |
| প্রার্থনা (কবিতা) | ” কালিদাস রায়, বি এ, কবিশেখর | ১ |
| ফটোর বাতিক (সচিত্র) | | ১৬৫ |
| ফরাসী দেশের বীর মেয়ে (ইতিহাসের গল্প) | শ্রীচারুচন্দ্র দাশ গুপ্ত, বি-এ, | ৩৫০ |
| বন্ধু (বিজ্ঞানের কথা) | শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি,এস্-সি | ৪৩৫ |
| বসন্ত-শোভা (কবিতা) | কুমারী উষারাণী দেবী | ৯২ |
| বড় ছোট (কবিতা) | শ্রীবীরেন্দ্রলাল সেন | ৯১ |
| বড়দের জীবনের ছোট খাট ঘটনা (সচিত্র) | শ্রীমতী চারুলতা দেবী | ৩৯৭ |
| বাক্‌চাতুরী (গল্প) | শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী | ১৫২ |
| বাঘের মন্ত্রী (পৌরাণিক গল্প) | ,, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি,এ, এম্,আর,এ,এস্, | ২৮৩ |
| বাচ্চাই সাক্কো (সচিত্র) | | ১৮৫ |
| বাজিকরের দেশ (কবিতা) | ,, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি,এ | ২৬৩ |
| বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ (কবিতা) | শ্রীমতী আশারাণী মিত্র ও শ্রীঅশোককুমার দাস | ১৫০ |
| বীর পালোয়ান (কবিতা) | ,, বিকাশ দত্ত | ১২৬ |
| বুনো জানোয়ার ধরার কৌশল (সচিত্র) | ,, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি, এস্-সি, | ৪৮৯ |
| বুড়া ছেলে (কবিতা) | ,, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি, এ, | ৪২৯ |
| বৃক্ষ ও কুঠার (কবিতা) | এ, করিম | ৬৩৩ |
| বৈজ্ঞানিক (গল্প) | ,, চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্,এ, | ২৭১ |
| বৈজ্ঞানিকের কপাল (বিজ্ঞানের কথা) | ,, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য | ২ |
| বৈজ্ঞানিকের ঘুড়ী (বিজ্ঞানের গল্প) | ঐ | ১৫৮ |
| ব্রাহ্মণ ও কুকুরের মাংস (পৌরাণিক গল্প) | শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি,এ, এম্-আর-এ-এস্ | ৪৫৫ |
| ব্রাহ্মণের দান (পৌরাণিক গল্প) | ঐ | ২৪৪ |
| ভজহরি মাষ্টারি (কবিতা) | শ্রীবিকাশ দত্ত | ২৪৩ |
| ভয়ঙ্কর (গল্প) | ,, প্রেমেন্দ্র মিত্র | ৫০৬ |
| ভাগ্য পরীক্ষা (গল্প) | ,, মণীশ ঘটক | ৪৯৮ |
| ভূতের বাড়ী (গল্প) | অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, এম্-এ, বি-এল্ | ৪১৩ |
| ভোরের আলো (কবিতা) | শ্রীঅনিলকুমার সরকার | ৪২১ |
| ভোরের আলো (কবিতা) | ” জ্যোৎস্না দেবী | ১৩১ |

| বিষয় | | লেখকের নাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| মজার অঙ্ক | ... | „ শ্রীঅমলচন্দ্র গুহ রায় ... | ৬৩৫ |
| মণি মুক্তার কাহিনী (সচিত্র) | ... | শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ... | ২৩৭ |
| মণীন্দ্রচন্দ্র ও ললিতকুমার (সচিত্র) | ... | ... | ৬২৫ |
| মরুভূমিতে বত্রিশ বছর (সচিত্র) | ... | „ ননীগোপাল মজুমদার ... | ২৮৬ |
| মানুষের কাছাকাছি জীব (সচিত্র) | ... | „ বিরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ | ৪৪৮ |
| মায়ে ঘুমালো···(কবিতা) | ... | „ উমাপদ ভট্টাচার্য্য ... | ৩৯৬ |
| মেঘ্‌লা রাতে (কবিতা) | ... | „ বিকাশ দত্ত ... | ৩৪১ |
| মেয়েদের জানা দরকার | ... | | ১৪৯, ২০২, ২৫৬, ৩৬০ |
| মেয়ে ব্যারিষ্টার | ... | ... | ৪১ |
| যমজ ছেলে (বিজ্ঞানের কথা) | ... | শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্ সি | ৩৭৪ |
| যমরাজের সমস্যা (গল্প) | ... | „ চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্ এ ... | ৫৭৩ |
| রঙ্গ-কণা | ... | „ লক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী ... | ৯৩ |
| রঙ্গ-কণা | ... | „ রামেন্দুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় | ৫৮১ |
| রঙ্গ-কণা | ... | „ রামেন্দুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়··· | ৬৩৫ |
| রসায়নে যুগান্তর (বিজ্ঞানের কথা) | ... | „ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ... | ২২৭ |
| রং তামাসা (রঙ্গ) | ... | „ নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... | ১৫৬ |
| রাজার বিচার (গল্প) | ... | „ কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত বি-এ ... | ৭৯ |
| রাত কি দিন (গল্প) | ... | „ সতীশচন্দ্র ঘটক, এম্-এ, বি-এল্ | ২২ |
| রামধনু (কবিতা) | ... | „ নবজীবন ঘোষ ... | ৩৭৩ |
| রামধনু (কবিতা) | ... | „ চণ্ডীচরণ মিত্র ... | ৪৫৯ |
| রাম বিভ্রাট (গল্প) | ... | „ চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ ... | ৩৮, ৬৯ |
| রেণুকা (গল্প) | ... | „ নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... | ৫৮২ |
| লণ্ডনের কথা (ভ্রমণ) | ... | কুমারী তপতী সরকার ... | ৫৬৮ |
| শীতের প্রতাপ (কবিতা) | ... | শ্রীসুধাংশুকুমার বসু ... | ৮ |
| শীতের সাঁঝে (কবিতা) | ... | „ বিকাশ দত্ত ... | ৬১৯ |
| শ্রাবণে (কবিতা) | ... | „ বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল্··· | ৩১৯ |
| সওদাগরের কাণ্ড (গল্প) | ... | „ রসোদর শর্ম্মা ... | ৩৯২ |
| সখার আশায় (কবিতা) | ... | „ নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... | ২০৩ |
| সত্যকথা (কবিতা) | ... | „ বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল্, এম্, আর, এ,এস | ১৫ |
| সন্দেশ | | | ৪৮, ১০০, ১৫৩, ২০৫, ২৬১, ৩১৩, ৩৬৭, ৪২৪, ৪৬৯, ৫৩৩, ৫৮৫, ৬৩৭ |
| সন্ধ্যা (কবিতা) | ... | শ্রীজ্যোৎস্না দেবী ... | ৪৬ |
| সমুদ্রের বাসিন্দা | ... | ... | ১৩৪ |





| বিষয় | | লেখকের নাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| সাজাহানের সমাধি (গল্প) | ... | শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য ... | ৩৫৫ |
| সাবাস্ ডাক্তারী (সচিত্র) | ... | শ্রী— ... | ২৪৮ |
| সুয়েজের খাল (সচিত্র) | ... | শ্রী— ... | ৩৮৪ |
| স্বর্গের মন্দির (গল্প) | ... | ... | ৫৬৩ |
| হঠাৎ ব্রাহ্মণ (পৌরাণিক গল্প) | ... | শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্, আর, এ, এস্ | ১৭১ |
| হরিহর (গল্প) | ... | শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ ... | ১১৩ |
| হাবা (গল্প) | ... | অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল এম্-এ, বি-এল্ | ৩৪ |
| হাসির-টুক্‌রা | ... | শ্রীমনীষা সেন ... | ৬৩৩ |
| হেনরী আর্ভিং ও এলেন-টেরি (সচিত্র) | ... | শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, বি-এ ... | ৫২৮ |


---

# রামধনু, ২য় বর্ষ (মাঘ ১৩৩৫—পৌষ ১৩৩৬)

## চিত্র-সূচী

### মাঘ


| | ছবির নাম | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১। | বড় দিনে বাংলার অতিথি (রঙ্গীন) | ... ... | মুখপত্র |
| ২। | গ্যালিলিও | ... ... ... | ২ |
| ৩। | দুইটি পাথরই এক সাথে পড়িল | ... ... | ৪ |
| ৪। | রণজিৎ ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল | ... ... | ১৩ |
| ৫। | বাড়ীখানা···আগলাইয়া দাঁড়াইল | ... ... | ১৫ |
| ৬। | মেঘের গায় মানুষের ছায়া | ... ... | ১৭ |
| ৭। | আকাশের গায় প্যারিস সহরের ছায়া | ... ... | ১৮ |
| ৮। | মরুভূমিতে বালু-স্তম্ভ | ... ... | ২০ |
| ৯। | ঘূর্ণিবায়ু এই আসিল বলিয়া | ... ... | ২১ |
| ১০। | এক সঙ্গে তিনটা রামধনু | ... ... | ২১ |
| ১১। | কদ্রু ত' ভারী খুসী, বিনতা হতভম্ব হইয়া পড়িলেন | ... | ২৬ |
| ১২। | নারায়ণের সঙ্গে তাঁহার দেখা | ... ... | ২৯ |
| ১৩। | আমীর আমানুল্লা | ... ... ... | ৩১ |
| ১৪। | ট্যাঁকের কাপড়···সম্মুখে ধরিল | ... ... | ৪০ |
| ১৫। | শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু | ... ... | ৪৮ |

## ফাল্গুন


| ছবির নাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ১৬। এঁড়ে বাছুরের জন্মবার্ত্তা (রঙীন) | মুখপত্র |
| ১৭। সমুদ্রের তীরে পেট্রোলিয়ামের খনি | ৫৭ |
| ১৮। কলিকাতা হইতে প্রায় দার্জ্জিলীং পর্য্যন্ত লম্বা তেলের নল | ৫৮ |
| ১৯। মুনির কান্ধের উপর ঝুলাইয়া দিলেন | ৬১ |
| ২০। সাপেরা…ব্রাহ্মণ সাজিল | ৬৬ |
| ২১। ডাণ্ডাটাকে পুড়িয়ে আনি | ৬৮ |
| ২২। সব রাম বেঞ্চের উপর দাঁড়াও | ৭০ |
| ২৩। ডাক্তার সান্ ইয়াৎ সেন | ৭৬ |
| ২৪। ডাঃ সান্ ইয়াৎ সেনের পত্নী | ৭৮ |
| ২৫। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে, সেই তোমার বাবা! নয়? | ৮৫ |
| ২৬। তেঁই জলে বসাইয়ে রেখেছেন | ৮৯ |
| ২৭। শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে | ৯৬ |
| ২৮। কড়ির বন্টগুলি…ভাজিয়া গেল | ৯৮ |
| ২৯। এই অসীম বলশালী জীবকে…খাটাইতেছে | ৯৯ |
| ৩০। অপূর্ব্ব পুকুর | ১০০ |


## চৈত্র


| ছবির নাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ৩১। ছেলের মেধা দেখিয়া গুরু মশাই অবাক্ (রঙীন) | মুখপত্র |
| ৩২। মেরুর কয়েকটি বাসিন্দা | ১০৮ |
| ৩৩। মেরুর পথের একটি দৃশ্য | ১১১ |
| ৩৪। বলিবে "থ্যাঙ্ক ইউ" | ১১৭ |
| ৩৫। কোন্ রাস্তায় কি ভাবে যাইতে হয় দেখিয়া লও | ১১৮ |
| ৩৬। ততক্ষণে…লাফিয়ে পড়েছে | ১২১ |
| ৩৭। 'ব্রিজ্' খেলিতেছিল | ১২৪ |
| ৩৮। সকলে বিরক্ত হইয়া গেল ব্রহ্মার কাছে | ১৩০ |
| ৩৯। এমন তেজের সঙ্গে তাকাইলেন যে…ছাই হইয়া গেল | ১৩২ |
| ৪০। একটা করে কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে নিস্ | ১৩৯ |
| ৪১। গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন | ১৪৩ |
| ৪২। সম্রাট্ মুৎসোহিতো | ১৪৬ |
| ৪৩। জাপানের পার্লামেন্ট-গৃহ | ১৪৮ |
| ৪৪। জাপানের প্রধান মন্ত্রী ব্যারণ তনকা | ১৪৮ |




## বৈশাখ


| ছবির নাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ৪৫। পথের ধারে শিল পুঁতেছে কেন বাবা? (রঙীন) | মুখপত্র |
| ৪৬। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্ক্লিন… | ১৫৯ |
| ৪৭। সেই ঘুড়ী একেবারে মেঘের গায়ের উপরে লইয়া ফেলিলেন | ১৬১ |
| ৪৮। রাস্তায় রাস্তায় এই দৃশ্য | ১৬৫ |
| ৪৯। দুই বুড়ার ছবি তোলা হইতেছে…ফোর্ড ও এডিসন | ১৬৬ |
| ৫০। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হুভার | ১৬৯ |
| ৫১। আল স্মিথের ছবি তোলা হইতেছে | ১৭০ |
| ৫২। হর্য্যশ্ব রাজার সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইয়া দিল | ১৭১ |
| ৫৩। ঠাকুর আপনার আশ্রমে বীতহব্য ঢুকেছে… | ১৭৪ |
| ৫৪। জামাই বাবু না, জামাই কাবু | ১৭৮ |
| ৫৫। বাচ্চা-ই-সাক্কো | ১৮৫ |
| ৫৬। রেজা শা পহ্লবী | ১৯৫ |
| ৫৭। টেবিলের নীচে…খুঁজিতে বাকী রাখিল না | ১৯৮ |
| ৫৮। ঐযে দূরে গাড়ীখানা…ওখানাকে ধরতে হবে | ২০১ |
| ৫৯। কর্ণেল বার্কার | ২০৫ |


## জ্যৈষ্ঠ


| ছবির নাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ৬০। কল্পুরে জৈ (রঙীন) | মুখপত্র |
| ৬১। তিনি লোক ছিলেন কতকটা এই রকমের | ২১২ |
| ৬২। সেল্সিউকস্ | ২১৭ |
| ৬৩। খিল লাগাইয়া বন্ধ করা কেন? | ২২১ |
| ৬৪। সাজসরঞ্জাম | ২২৬ |
| ৬৫। প্রিষ্টলি | ২২৯ |
| ৬৬। ক্যাভেণ্ডিশ | ২৩১ |
| ৬৭। পরীক্ষাগারে লাভয়সির ও বার্থোলেট | ২৩২ |
| ৬৮। সিংহলের দন্তমন্দির… | ২৪০ |
| ৬৯। মিশর রাজকুমারীর মুকুট | ২৪১ |
| ৭০। সিংহলী জহুরী কেমন হীরা কাটিতেছে | ২৪২ |
| ৭১। আর উঠিলেন…সেই চ্যবন ঋষি | ২৪৫ |
| ৭২। আমার যেন ধর্ম্মে খুব ভক্তি থাকে | ২৪৭ |
| ৭৩। ডাক্তারখানা | ২৪৯ |
| ৭৪। হাতুড়ের কাণ্ড | ২৫১ |

## আষাঢ়


| ছবির নাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ৭৫। নাইবো-ই নাইবো ( রঙ্গীন ) | মুখপত্র |
| ৭৬। ভালবাসার বাগান… | ২৬৬ |
| ৭৭। মায়ের কোলে যীশু | ২৬৭ |
| ৭৮। হাটের গাড়ী | ২৬৯ |
| ৭৯। সরলতা | ২৭০ |
| ৮০। দাড়ি দিয়ে দেশের কষ্ট মেটাবো | ২৭৫ |
| ৮১। বিমানবীর মিঃ কাবালি | ২৭৬ |
| ৮২। সক্রেটিস ও প্লেটো | ২৭৮ |
| ৮৩। নিজের চোখেই ব্যাপারটা দেখুন না | ২৮৫ |
| ৮৪। লিভিংষ্টোন | ২৮৮ |
| ৮৫। সে একখানা দৃশ্য বটে ! | ২৯৪ |
| ৮৬। চোরা কোঠরী মাংতা | ২৯৬ |
| ৮৭। কুকুরকে লাই দিলে মাথায় চড়ে | ৩০০ |
| ৮৮। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া হয় ? | ৩০৫ |
| ৮৯। বলের মত বাড়ী | ৩১৩ |


## শ্রাবণ


| ছবির নাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ৯০। রান্না, পড়া এক সাথে (রঙ্গীন) | মুখপত্র |
| ৯১। নায়গ্রা জল-প্রপাত… | ৩২১ |
| ৯২। জলের একটি কাণ্ড—রাতকে দিন করিবার চেষ্টা | ৩২৩ |
| ৯৩। চাবুক দিয়া সপাসপ্ মারিতে লাগিলেন | ৩২৭ |
| ৯৪। কোথায় বন ! দেখেন আশ্চর্য্য ব্যাপার | ৩২৮ |
| ৯৫। উপস্থিত সকলের মুখ…সাদা হইয়া গেল… | ৩৩৫ |
| ৯৬। একপাল তিমি…মারা গিয়াছে | ৩৩৭ |
| ৯৭। দাঁত-ওয়ালা তিমি | ৩৩৯ |
| ৯৮। দু' নৌকায় পা দিলে এমনি দশা হয় | ৩৪১ |
| ৯৯। গাবেব হাউসে যা না | ৩৪৬ |
| ১০০। দ্বারোয়ানজীর…টিকিটি বাতাসে দোল খাইতেছে | ৩৪৮ |
| ১০১। সার্লোৎ কর্দে | ৩৫১ |
| ১০২। রসরাজ অমৃতলাল বসু | ৩৬১ |
| ১০৩। অসভ্যদের পাখী শিকার | ৩৬৭ |
| ১০৪। কয়েকটি জাপানী মেয়ে কোটো বাজাইতেছে | ৩৬৮ |




## ভাদ্র


| ছবির নাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ১০৫। বীরাঙ্গনা (রঙ্গীন) | মুখপত্র |
| ১০৬। দু'টী কি আলাদা মানুষ | ৩৭৫ |
| ১০৭। কয়েক জোরা যমজ ছেলে মেয়ে | ৩৭৭ |
| ১০৮। দশ বছরের মধ্যে…এই চার জোড়া যমজ ছেলে হইয়াছে | ৩৮০ |
| ১০৯। মহাদেব বাণ ছাড়িলেন | ৩৮৩ |
| ১১০। ডি লেসেপ্স্ | ৩৮৯ |
| ১১১। সুয়েজ খাল | ৩৯১ |
| ১১২। যেটি খুসী বাছিয়া লও | ৩৯৫ |
| ১১৩। ব্রাহ্মণের ছেলে, মুরগী কি নিতে পারি ? | ৪০০ |
| ১১৪। আমার কোট্ কি হল ? | ৪০৩ |
| ১১৫। চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে | ৪০৫ |
| ১১৬। দ্বারোয়ানের বাছা ঘাল | ৪০৮ |
| ১১৭। পৃথিবীর সব চাইতে বড় ঘুড়ী | ৪২৪ |
| ১১৮। এক্সরে দিয়া বুকের পাঁজর দেখিতেছেন | ৪২৫ |


## আশ্বিন


| ছবির নাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ১১৯। 'বিদ্যাসাগর' উপাধি-লাভ | মুখপত্র |
| ১২০। কোটালও দেখে সত্যই তাই | ৪৩৩ |
| ১২১। ডাক্তার সিম্প্সন্ | ৪৩৬ |
| ১২২। লুই পাস্তুর | ৪৩৮ |
| ১২৩। যোসেফ্ লিষ্টার | ৪৪১ |
| ১২৪। দেখে, বাবা তামাক খাচ্ছেন | ৪৪৫ |
| ১২৫। আদিম মানুষ শিকার করিয়া ঘরে ফিরিতেছে | ৪৪৮ |
| ১২৬। আদিম যুগের মানুষ… | ৪৪৯ |
| ১২৭। গরিলার রাগ | ৪৫০ |
| ১২৮। শিম্পাঞ্জী লিভিংষ্টোনের হাত ধরিয়া বেড়াইতে যাইতেছে | ৪৫২ |
| ১২৯। বিশ্বামিত্র কুকুরের মাংস চুরি করিতে উদ্যত | ৪৫৬ |
| ১৩০। হুকা-কাশি চিনিলেন—সে সোলেমন সাহেব | ৪৬২ |
| ১৩১। মাছ হইতে মানুষ | ৪৬৯ |
| ১৩২। গ্র্যাফ্ জেপেলিন্ | ৪৭০ |
| ১৩৩। কবিতার সুপুরুষ | ৪৮০ |

## কার্ত্তিক


| | ছবির নাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১৩৪। | ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে (রঙীন) ... ... | মুখপত্র |
| ১৩৫। | মাংসের ঢিবিটা তুলিয়া লইল ... ... | ৪৮৪ |
| ১৩৬। | হনুমান্ হাত যোড় করিয়া…প্রণাম করিলেন ... | ৪৮৭ |
| ১৩৭। | এ অবস্থায় সিংহের সাথে দেখা করিতে কোন ভয় নাই ... | ৪৯০ |
| ১৩৮। | হিংস্র, একগুঁয়ে হিপোপটেমাস…ঘোড়া সাজিয়াছে ... | ৪৯১ |
| ১৩৯। | খাঁচা খুলিয়া বাহিরে আসিয়াছে ... ... | ৪৯৪ |
| ১৪০। | বাছা বাছুর ! ... ... ... | ৫০১ |
| ১৪১। | বিশালকায় জীব দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে ... | ৫১৪ |
| ১৪২। | শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ... ... | ৫১৭ |
| ১৪৩। | স্যর হেন্‌রি আর্ভিং… ... ... | ৫২৯ |
| ১৪৪। | এলেন টেরি ... ... ... | ৫৩০ |
| ১৪৫। | স্যর হার্বার্ট ট্রি ... ... ... | ৫৩২ |
| ১৪৬। | আশুতোষ কলেজের ছাত্র ষোড়শী গাঙ্গুলী ... | ৫৩৩ |
| ১৪৭। | চুম্বকের শক্তি ... ... ... | ৫৩৪ |


## অগ্রহায়ণ


| | | |
|---|---|---|
| ১৪৮। | মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর (রঙীন) ... ... | মুখপত্র |
| ১৪৯। | যমরাজ প্লুটোর সাথে হারকিউলিসের যুদ্ধ ... | ৫৪১ |
| ১৫০। | ডায়াক মেয়ের বেতের গয়না ... ... | ৫৪৫ |
| ১৫১। | উল্কীর চূড়ান্ত ... ... ... | ৫৪৭ |
| ১৫২। | বুলগেরিয়ার পাড়াগেঁয়ে মেয়ের বিবাহের সাজ ... | ৫৪৮ |
| ১৫৩। | রাণীর প্রসাধন ... ... ... | ৫৪৯ |
| ১৫৪। | প্রকাণ্ড ঘোড়া রাস্তা কাঁপাইয়া চলিয়া গেল ... | ৫৫৪ |
| ১৫৫। | বিরাট্ মূর্ত্তি তীর-বেগে ছুটিয়া যাইতেছে ... ... | ৫৫৬ |
| ১৫৬। | ঘোড়ার ডাক—১নং ছবি ... ... | ৫৫৯ |
| ১৫৭। | ঘোড়ার ডাক—২নং ছবি ... ... | ৫৬০ |
| ১৫৮। | টেম্‌স্ নদীর উপরে পার্লিয়ামেন্টের বাড়ী… ... | ৫৭১ |
| ১৫৯। | খারাপ খবর আছে… ... ... | ৫৭৭ |
| ১৬০। | চ্যানিং পরিবার ... ... ... | ৫৭৯ |


## পৌষ


| | | |
|---|---|---|
| ১৬১। | আচ্ছা জব্দ ! (রঙীন) ... ... | মুখপত্র |





| | ছবির নাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১৬২। | সেকালে আল্প্‌স্ পাহাড় কি ভাবে পার হইত ... | ৫৯১ |
| ১৬৩। | একালে আল্প্‌স্ পাহাড় কেমন ভাবে পার হয় ... | ৫৯৩ |
| ১৬৪। | কবি রবীন্দ্রনাথ ... ... ... | ৫৯৬ |
| ১৬৫। | টিল্‌ডেন্ ... ... ... | ৬০৪ |
| ১৬৬। | লাকস্ত্ ... ... ... | ৬১০ |
| ১৬৭। | টেলিগ্রামখানা…সাঙ্কেতিক চিহ্ন ... ... | ৬১৩ |
| ১৬৮। | কে বেশী সুন্দর ? ... ... ... | ৬২০ |
| ১৬৯। | মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র ... ... ... | ৬২৬ |
| ১৭০। | অধ্যাপক ললিতকুমার ... ... | ৬২৭ |
| ১৭১। | ভাই-বোনেরা পরামর্শে ব্যস্ত ... ... | ৬৩১ |
| ১৭২। | অদ্ভুত বক্তৃতা ... ... ... | ৬৩৭ |
| ১৭৩। | নূতন আমীর নাদির খাঁন্ ... ... | ৬৩৮ |

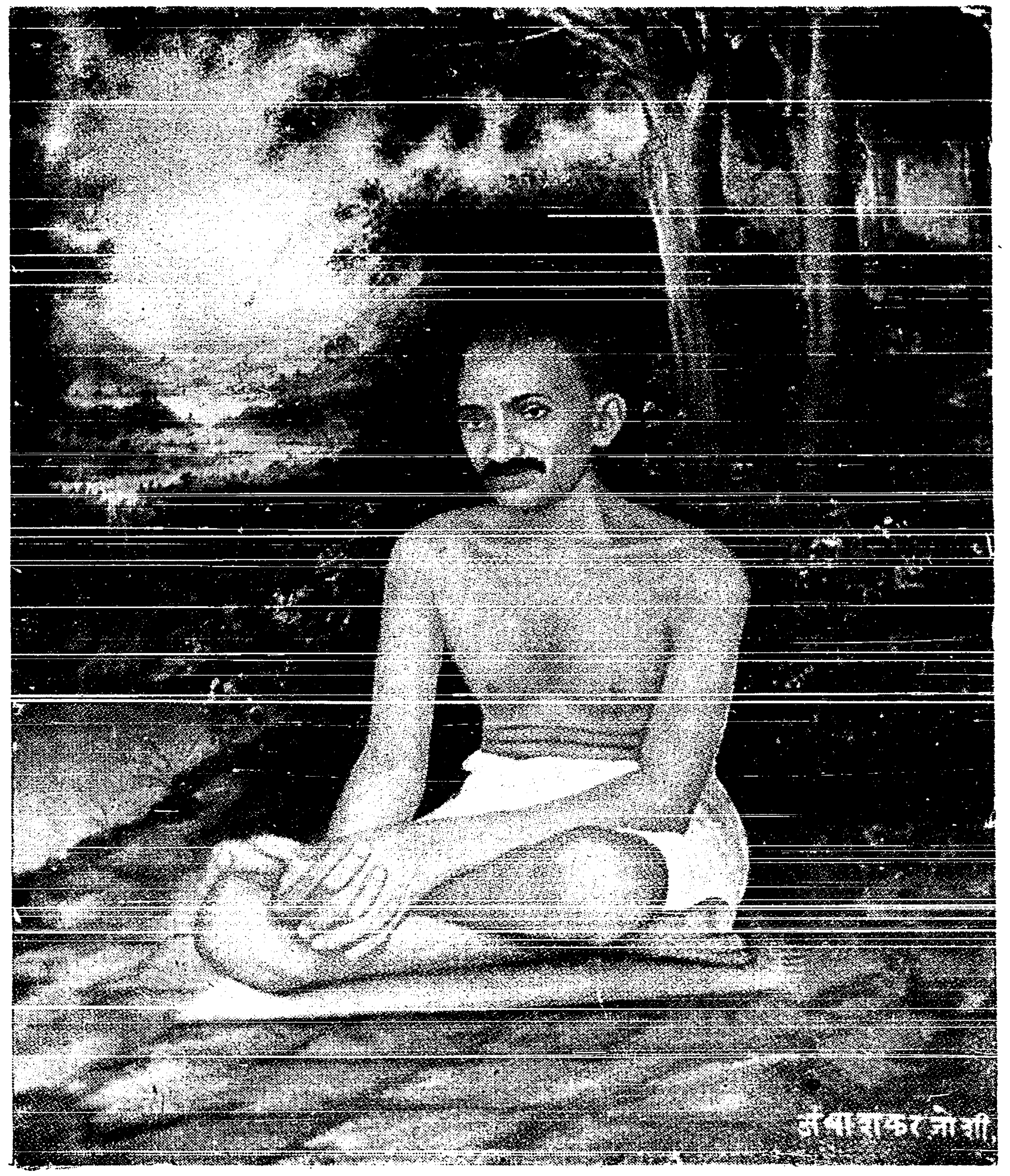

বড়দিনে বাংলার অতিথি

( মহাত্মা গান্ধী )

C. H. ARAN & CO

২য় বর্ষ } মাঘ, ১৩৩৮ { ১ম সংখ্যা

# প্রার্থনা

—)(*)(—

( শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর )

পতনই হয় যদি      সে যেন জানু পাতি'
তোমারি জয় গানে লভে জয়,
অশ্রু ঝরে যদি      ঝরে তা' যেন তব
মহিমা দয়া হেরি—খেদে নয়।
বিদরে হিয়া যদি      দীর্ণ হোক তাহা
দুখীর দুখ দেখি, দয়াময়,

মরণ আসে যদি পালিতে তব ব্রত
যেন তা আসে, জরা রোগে নয়।

---

# বৈজ্ঞানিকের কপাল

( শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য )

এখন যদি তোমাদের বলি—"জান, পৃথিবীটাই সূর্য্যের চারিদিকে দিন রাত ঘুরিতেছে, আর সূর্য্যটা আছে মাঝখানে ঠায় দাঁড়াইয়া," তোমরা নিশ্চয়ই মুখ টিপিয়া হাসিবে। বলিবে—"ভা—রী ত' একটা কথা বলিলেন, যে ছেলেটা ভূগোলের প্রথম পাতাটা মাত্র পড়িয়াছে সেও ত' এই সামান্ত কথাটা জানে।"

কথাটা আজকাল সামান্তই বটে। কিন্তু চিরটা কাল এমন ছিল না; এমন একদিনও গিয়াছে যেদিন এই কথাটাই প্রমাণ করিতে গিয়া এক বৈজ্ঞানিককে কত লাঞ্ছনা—অত্যাচারই না সহ্য করিতে হইয়াছিল!

গ্যালিলিও

এই বৈজ্ঞানিকটি আর কেহ নহেন,—গ্যালিলিও। প্রায় সাড়ে তিন শ' বছর আগেকার কথা। ইটালীতে যে পিসা বলিয়া একটা জায়গা আছে—সেখানকার বিশ্ব-বিত্থালয়ের তখন ভয়ানক নাম ডাক। গ্যালিলিও ছিলেন সেখানকারই এক ছাত্র! কিন্তু ছাত্র হইলে কি হয়, এই ছাত্রের তুখার বুদ্ধির কাছে অধ্যাপকদের বেশ নাকাল হইতে হইত।



অধ্যাপক কোন একটা কথা বলিলেই গ্যালিলিও উঠিয়া দাঁড়াইতেন—"শুধু বলিয়া গেলে চলিবে না, কেন ও রকম হইবে বুঝাইয়া দিন।" অধ্যাপক চটিয়া যাইতেন—"আরে বাপু, এর মধ্যে আবার কেন কি? সেকালকার বড় বড় পণ্ডিতরা যে একথা বলিয়া গিয়াছেন, তোমাকে মানিতেই হইবে।" গ্যালিলিও হাতে হাতে প্রমাণ না পাইলে কোন জিনিষই মানিয়া লইতে পারিতেন না। ফলে কেহ তাঁহাকে বলিত বোকা, কেহ বলিত অহঙ্কারী—আরও কত কি!

গ্যালিলিওকে তাঁর বাবা ডাক্তারী পড়িতে দিয়াছিলেন, কিন্তু ছেলের ঝোঁকটা ছিল বিজ্ঞান, অঙ্ক, জ্যোতির্ব্বিত্থা এই সবের দিকেই বেশী। পড়াশুনা পাইলে আর অন্তদিকে তাঁহার মন থাকিত না—আর প্রত্যেক জিনিষ তিনি দেখিতেন খুঁটিনাটি করিয়া।

এই খুঁটিয়া দেখিবার ফলে একদিন এক কাণ্ড হইল। একদিন গ্যালিলিও ছাদের উপর বসিয়া আছেন, হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল এক গির্জ্জার দিকে। গির্জ্জার গায়ে আলো বসাইবার জন্ত এক রকম ফ্রেম্ থাকে। গ্যালিলিও দেখিলেন সেটা দিব্যি ছুলিতেছে। নিতান্ত একটা তুচ্ছ ব্যাপার—কিন্তু গ্যালিলিওর চোখে তাহার মধ্যে একটা মস্ত আবিষ্কার ধরা পড়িয়া গেল। তিনি দেখিলেন প্রত্যেকটা দোল শেষ হইতে ঠিক একই সময় লাগিতেছে। গ্যালিলিও সঙ্গে সঙ্গে ঘরে নামিয়া আসিলেন, তারপর ব্যাপারটাকে আর একটু ভাল করিয়া দেখিবার জন্ত একটা সূতার আগায় একটা ভারী জিনিষ বাঁধিয়া দিয়া সূতাটা দেয়ালে ঝুলাইয়া দিলেন,—আর গভীর মনোযোগের সঙ্গে সূতার দোল দেখিতে লাগিলেন। নাঃ, বাস্তবিকই যা ভাবিয়াছেন তাই। তখন তিনি ভাবিলেন মজা মন্দ নয়, এই ব্যাপারটা কাজে লাগাইতে পারিলে সময় মাপিবার বেশ ত' একটা যন্ত্র তৈরী হইতে পারে। যেমন ভাবা কাজেও তাই। তিনি এই ব্যাপারটার সাহায্যে প্রথমে হাতের নাড়ী পরীক্ষার একটা ব্যবস্থা করিলেন, তারপর কয়েকদিন পরেই একটা ঘড়ী তৈরী করিয়া ফেলিলেন—আর তার নাম দিলেন "পেণ্ডুলাম ঘড়ী।" তোমাদের অনেকের বাড়ীতেই বোধ হয় একটা না একটা দেয়াল ঘড়ী আছে। ঘড়ীর ভিতর যে জিনিষটা টক্ টক্ করিয়া

দোলে তাহাই হইতেছে পেণ্ডুলাম। প্রত্যেকটি দোল খাইতে ঠিক একই সময় লাগে আর তাহা হইতেই সময়টা মাপা হয়। ইহাই গ্যালিলিওর প্রথম আবিষ্কার।

এই আবিষ্কারের ফলে গ্যালিলিওর উৎসাহ গেল ভয়ানক বাড়িয়া। অল্প কয়েকদিন পরেই তিনি আরও কয়েকটা ছোটখাট আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ পাইলেন।

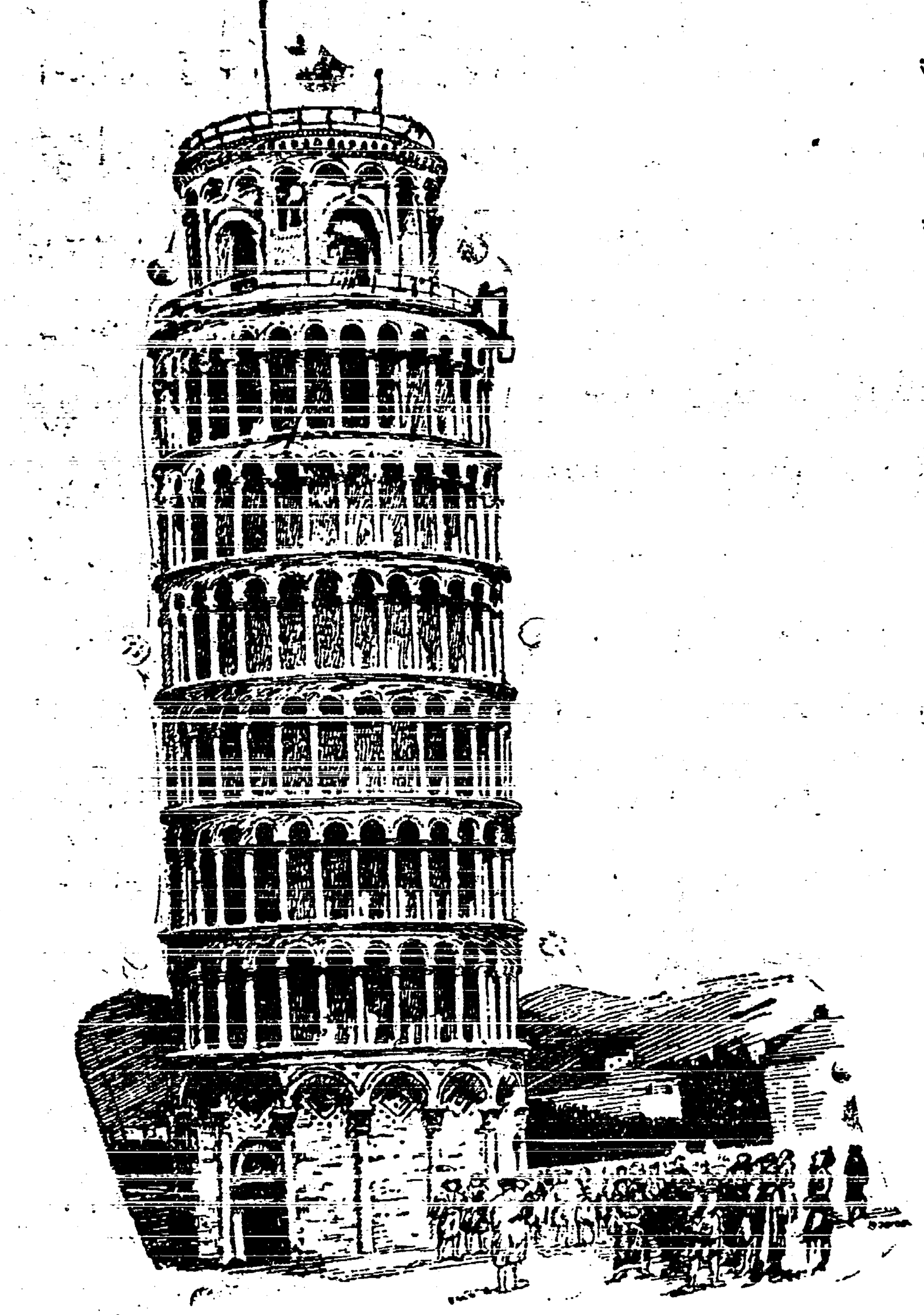

দুইটি পাথরই এক সঙ্গে পড়িল

এইবার একদিকে যেমন তাঁহার খ্যাতি বাড়িতে লাগিল আর একদিকে তেমনি একদল শত্রুও জুটিতে আরম্ভ করিল। গ্যালিলিও সেকালকার বড় বড় পণ্ডিতদের যত সব ভুল ধারণা আস্তে আস্তে ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিলেন।—অনেকে এটা সহ্য করিতে পারিত না। অথচ গ্যালিলিও দিতেছেন হাতে হাতে প্রমাণ। তারা শুধু হিংসায় পুড়িতে লাগিল।

এই সময় গ্যালিলিও আর একটা বড় সত্য আবিষ্কার করিলেন। তোমাদের অনেকেরি হয়তো বিশ্বাস—যে একটা ভারী আর একটা হাল্কা জিনিষ যদি সমান উঁচু জায়গা হইতে এক সঙ্গে নীচে ফেলিয়া দেওয়া যায় তবে ভারী জিনিষটা আগে মাটিতে পড়িবে। তখনকার লোকেরাও তাহাই জানিত। কিন্তু গ্যালিলিও বলিলেন ধারণাটা ভুল—আমি প্রমাণ করিব। পিসা সহরে একটা অদ্ভুত



মিনার আছে। মিনারটা খুব উঁচু কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সেটা মাটির উপর ঠিক খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া নাই—একটু হেলিয়া আছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে এই বুঝি সবশুদ্ধ উল্টাইয়া পড়িল। কিন্তু শত শত বছর ধরিয়া সেটা সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। গ্যালিলিও করিলেন কি, একদিন সকলকে ডাকিয়া সেই মিনারের নীচে দাঁড় করাইলেন। আর নিজে উপরে উঠিয়া একটা ভারী পাথর আর একটা হাল্কা পাথর এক সঙ্গে নীচে ফেলিয়া দিলেন। সকলে অবাক্ হইয়া দেখিল ২টি পাথরই একসঙ্গে নীচে পড়িয়াছে। গ্যালিলিও বলিলেন—আমি ত আগেই বলিয়াছি। লোকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। আর এই সামান্য পরীক্ষাটার ফলে তিনি বিজ্ঞান জগতের একটা নূতন দিক খুলিয়া দিলেন। তোমরা বড় হইয়া সে সব পড়িবে।

শত্রুর দল এবার মহা খাপ্পা। শেষে তাহারা নানারকম ফন্দী, ষড়যন্ত্র করিয়া গ্যালিলিওকে পিসা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া দিল। গ্যালিলিও গিয়া পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে জুটিলেন।

এখানে আসিয়া গ্যালিলিও আবিষ্কার করিলেন থার্ম্মোমিটার—যাহা দিয়া তাপ মাপা যায়। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন কোন একটা জিনিষকে গরম করিলে সেটা আয়তনে একটু বাড়িয়া যায়। ইহাই হইল তাঁহার আবিষ্কারের ভিত্তি। তিনি একটা নলের মধ্যে জল ভরিয়া নলের মুখটা দিলেন বন্ধ করিয়া। তার পর নলটা একটু গরম করিতেই দেখা গেল জলটা নলের মধ্যে একটু উঠিয়া গিয়াছে। আর একটু গরম করিতে আর একটু উঠিল। আবার ঠাণ্ডা করিতেই নামিয়া আসিল। জল কতটা উঠিল এই দেখিয়া যাহার মধ্যে নলটা রাখা হইল সেটা কতখানি গরম তাহাও মাপা চলিল।—কিছুদিন পরে জলের বদলে ভরা হইল স্পিরিট, তারপর পারা।

তার পরের আবিষ্কার দূরবীন। গ্যালিলিও শুনিলেন কে একজন নাকি দূরের জিনিষকে বড় করিয়া দেখিবার এক যন্ত্র বাহির করিয়াছে। যেই শোনা অমনি তিনিও বসিয়া গেলেন—কি? ও পারিল আর আমি পারিব

না? এক রাত্রের মধ্যে মাথা খাটাইয়া তিনি এক অদ্ভুত যন্ত্র তৈরী করিয়া ফেলিলেন। সামান্ত একটা নলের দু' ধারে বাঁকা বাঁকা দু'খানা কাঁচ বসান—কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া একি অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যাইতেছে। বহু দূর দুরান্তরের দৃশ্য, শুধু চোখে যাহা ধারণা করাও অসম্ভব তাহাই কিনা ইহার ভিতর দিয়া দিব্যি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

গ্যালিলিও তাঁহার দূরবীণের ভিতর দিয়া আকাশের দিকে চাহিলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেন এক নূতন রূপ খুলিয়া গেল। আকাশে এতদিন যত তারা দেখা যাইত এখন দেখা গেল তাহাদের সংখ্যা প্রায় দশগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। চাঁদকে লোকে কি না মনে করিত, এখন দেখা গেল চাঁদের গায়ে নানা রকম পাহাড় পর্ব্বত দেখা যাইতেছে। শুধু তাই নয়, গ্রহের সংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে। কোন কোনটার চারিদিকে আবার চাঁদ ঘুরিতেছে। সূর্য্যের গায় কতকগুলি গর্ত্ত; আবার শনি গ্রহটা দেখিতে কি অদ্ভুত!

দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি আসে যায়, গ্যালিলিও তাঁহার যন্ত্র লইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকেন। তারপর হঠাৎ একদিন সকলে দেখিল গ্যালিলিওর মুখ আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে, তিনি এক নূতন সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন।

তখন পর্য্যন্ত সকলেই জানিত, পৃথিবীটা আকাশের ঠিক মাঝখানে বসান আছে। তারাগুলি আকাশের গায় থাকে থাকে সাজান আছে, ঠিক যেমন গহনার মধ্যে হীরামুক্তা বসান থাকে—আর সূর্য্যটা দিবারাত্রি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরপাক খাইতেছে। গ্যালিলিও বলিলেন, "সব ভুল ধারণা, সূর্য্য ত ঘুরিতেছে না, পৃথিবীটাই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। গ্রহ, উপগ্রহ, তারা কোনটাই আকাশের গায় গাঁথা নাই।"

শত্রুর দল এবার আর স্থির থাকিতে পারিল না। গ্যালিলিওকে তাহারা পাগল, আহাম্মক, বোকা কত কি বলিল। গ্যালিলিওর সমস্ত কথা, আবিষ্কার দূরবীনের ভুতুড়ে কাণ্ড বলিয়া উড়াইয়া দিল। আর, দেশের লোকদের মাথা বিগ্‌ড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া তাঁহার উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল।



এক বিজ্ঞ বলিলেন—"আমরা সকলেই জানি, ধাতু সাতটা, সপ্তাহে সাতটা দিন, মানুষের মাথায় সাতটা ছিদ্র, কাজেই সাতটার বেশী গ্রহ থাকিতেই পারে না।" এই রকম আরও কত কি। সবচেয়ে বেশী চটিয়া গেলেন পাদ্রী মহাশয়রা। গ্যালিলিও তাঁহাদের ধর্ম্মের উপর হাত বাড়াইয়াছেন! তাঁহাদের ধর্ম্ম-গ্রন্থে যাহা লেখা আছে লোকদের তাহার উল্টা শিখাইতেছেন, এতদিনের বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া দিতেছেন—লোকে যে বিগ্‌ড়াইয়া যাইবে। আর তাঁহাদের ধর্ম্মের উপর বিশ্বাস করিবে না, একি সহ্য হয়?

গ্যালিলিওর মুখ কিন্তু বন্ধ হইল না। তিনি যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছেন, চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়াছেন, জগৎকে তাহাই শিখাইয়া যাইবেন। এই তাঁহার ব্রত। ফলে উৎপীড়ন বাড়িয়া চলিল, শেষে তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করা হইল। তখন তিনি সত্তর বছরের বৃদ্ধ।

গির্জ্জার কর্ত্তাদের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসাইয়া জোর করিয়া তাঁহাকে দিয়া বলান হইল—"পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে এমন আহাম্মকের মত কথা আর কাহাকেও শিখাইব না।" দারুণ অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া গ্যালিলিও মন্ত্রচালিতের মত তাহাই আওড়াইয়া গেলেন। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া যেন আপন মনেই বলিলেন—"কিন্তু আমি জানি পৃথিবী ঘোরে।"

গ্যালিলিওর শেষ জীবনের কথা পড়িলে কান্না পায়। এত বড় একটা মাথাওয়ালা লোক—কি কষ্টেই না তাঁহার শেষ দিনটা গিয়াছে! পৃথিবীশুদ্ধ লোক তাঁহাকে ত্যাগ করিল, "ইটালির আহাম্মক, পাগল, বোকা" এই নামেই তিনি বিখ্যাত হইয়া গেলেন। তার উপর যন্ত্রণা চরমে পৌঁছিল—যখন সেই বৃদ্ধ বয়সে নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাঁহার চোখ দুইটি অন্ধ হইয়া গেল। যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পর্দ্দা ঠেলিয়া ফেলিয়া তিনি তাহাকে হাজার হাজার গুণ বড় করিয়া গিয়াছিলেন তাহা আর তিনি এ জীবনে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। এমনি করিয়াই দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে বিজ্ঞানবীর চলিয়া গেলেন।

আজ লোকে ইটালির এই 'আহম্মক' নামধারী লোকটিকে চিনিয়াছে।

তিন শ' বছর আগেকার বিজ্ঞানের সেই আদিম যুগে যে লোকটি এমন সব কাণ্ড করিয়া গিয়াছিল, আজকার দিনে সে জন্মাইলে কি করিত তাহাই শুধু ভাবি।

## শীতের প্রতাপ

( শ্রীসুধাংশু কুমার বসু )

শীত এলো,—মাঘ এলো,—নাম্‌লো রে ঠাণ্ডা—
কন্‌কনে হিম লেগে গেলো বুঝি জান্‌টা।
হুহু কোরে উত্তুরে বায়ু জোরে ছুটচে,
ছুঁচ হ'য়ে যেন গায়ে প্যাঁট প্যাঁট ফুটছে।

নিদারুণ ঠাণ্ডাতে গেলো দেহ কালিয়ে—
মনে হয় যাই বাপু আফ্‌রিকা পালিয়ে।
মানে নাকো শীত মোটে আলোয়ান-শাল গো—
সোয়েটার-কোট ফুঁড়ে কোরছে নাকাল গো—

শিরা উপশিরা দিয়ে চলে নাকো রক্ত—
বন্ধ যে হোলো নাড়ী,—জমে হোলো শক্ত—
বক্ষের ধুক্ ধুক্ শীতে বুঝি থাম্‌লো;
চক্ষের পরে হায় আঁধিয়ার নাম্‌লো—

খাঁচা ছেড়ে প্রাণ-পাখী দিল বুঝি পাড়ি রে—
আগুনের মালসাটা দেনা তাড়াতাড়ি রে।
মুখ ফাটে, ঠোঁট ফাটে, সারা দেহ ফাট্‌চে;
ছুরি দিয়ে যেন কেউ দেহখানা কাট্‌চে।



জল যেন বরফের গিসতুতো ভাই গো—
হাতে দিলে মনে ভাবি আমি বুঝি নাই গো—
কল্‌কাতা নয়—এটা উত্তর মেরু রে,
এর চেয়ে ঢের ভালো কঙ্গো কি পেরু যে।
অঘ্রাণ শেষে যেই শীতবুড়ো জাগ্‌লো—
রবিমামা নিমেষেতে অন্দরে ভাগ্‌লো।
ভোর হোলো তবু নেই মামাটীর দ্যাখা হে—
দায় হোলো কল্‌কাতা সহরেতে ট্যাঁকা হে!
কুয়াসায় ঢাকা, হায়, বিল্‌কুল সৃষ্টি—
মায়াজাল ছিঁড়ে তার চলে নাকো দৃষ্টি।
দক্ষিণ হস্তের নেই কোনো ভাবনা—
তাই হেথা পড়ে আছি, আর কোথা যাব না।
ছোটো ছোটো নয়া আলু লাগে বড়ো মিষ্টি,
ডা'লে ঝোলে অম্বলে খাই রোজ বিশটি।
পৃথ্বীর আকারের সিলেটের লেবু হে
চেখে দেখি হরদম—আমি আর দেবু যে!
কচি কচি ফুল কপি—খাই তার ডাল্‌না;
মুলো খাই নুণ দিয়ে—মোটেও তা' ঝাল না;
কড়ায়ের শুঁটী খাই—কাঁচা কিবা রান্না;
কুল খাই যতো দাও বলি নাক—'আর না'।
বেড়াবার সাধ চিতে একতিল নাহিরে—
চাহি নাক মোটে আর যেতে, ভাই, বাহিরে।
রেতে, ভাই, কী আরাম লেপে ঢুকি যখনি,
শীতটার সাত খুন মাপ শুধু তখনি॥

# পদ্মরাগ

[ পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর ]

( অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম-এ )

[ **পূর্ব্বকথা** ঃ—রণজিৎ বড় ঘরের ছেলে, বয়সে যুবক। লেখাপড়া ভাল মতই শিখিয়াছে কিন্তু নামটা তার খেলাধূলা, ব্যায়াম কসরতের জন্যই বেশী। ঢাকায় সে তার দিদির বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিল কিন্তু একখানা জরুরী টেলিগ্রাম পাইয়া তাহাকে সমসেরপুরে ফিরিয়া যাইতে হইল। তার পাঠাইয়াছিলেন সমসেরপুরের রাজাবাহাদুর। তাঁহার বাড়ীতে পূর্ব্বপুরুষের একখানা পদ্মরাগমণি ছিল—মণিখানা হইতেই সে বংশের সৌভাগ্যের সৃষ্টি। হঠাৎ অতি আশ্চর্য্যভাবে সেই পদ্মরাগখানা অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। দিবেন ও দীপেন নামে রাজবাহাদুরের উপযুক্ত দুইটী ভাইপো থাকিলেও, বৃদ্ধ রাজাবাহাদুর রণজিৎকে বিশেষ স্নেহ করিতেন বলিয়া ও তাহার শক্তি-সামর্থ্যের উপর তাঁর নিজের খুব আস্থা থাকায় রণজিৎকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।

প্রসিদ্ধ জাপানী ডিটেক্‌টিভ্ হুকাকাশিকেও আনান হইয়াছে। হুকাকাশির ক্ষুরধার বুদ্ধি। চারিদিক্ দেখিয়া শুনিয়া এমনই আশ্চর্য্য কতকগুলি খবর আপনা হইতেই সে বলিয়া দিল এবং সেগুলি এমনি আশ্চর্য্যভাবে মিলিয়া গেল যে আশেপাশের সকলেই স্তম্ভিত হইল।

এদিকে একটা খোঁড়ার চালচলনে সন্দেহ হওয়ায় রণজিৎ পিছু পিছু যাইয়া তার বাড়ীটা দেখিয়া আসিল। সে ফিরিতেছিল, এমন সময় একটা লোক সাইকেলে করিয়া তাহাকে একটা চিঠি দিয়া বোঁ বোঁ শব্দে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। চিঠিতে লেখা ছিল "সাবধান, পরের উপকার করিতে গিয়া নিজের জীবনটী খোয়াইওনা।" ]

হতভম্বের মত রণজিৎ রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া রহিল। এক এক বার মনে হইল ছুটিয়া গিয়া লোকটাকে সাইকেল হইতে টানিয়া নামায়, কিন্তু ততক্ষণে সে অনেকদূর চলিয়া গিয়াছে। আর তা' ছাড়া কাজটাও বড় নিরাপদ নয়। কে জানে তার কাছে কোন্ অস্ত্র আছে? আবার একবার মনে হইল সেই ভাঙ্গা একতালা বাড়ীটায় গিয়া 'খোঁড়া' লোকটাকেই সে চাপিয়া ধরে, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই বুঝিল এ মৎলব ও কোন কাজের নয়। সম্বলের মধ্যে তো শুধু শিবনন্দনের লাঠিখানা! শুধু তাহাই মাত্র লইয়া কোন্ সাহসে সে সেই দস্যুদলের আড্ডায় গিয়া হানা দিবে? তাহারা দলে পুরু, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রেরও তাহাদের নিশ্চয়ই কোন অভাব নাই। এ শুধু নিতান্ত গোঁয়ারের মত কামানের সম্মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়ান বই তো নয়! আর তা ছাড়া আরও একটা কথা আছে। শত্রুপক্ষ এখন হাতের সম্মুখে, একটু হুঁসিয়ার হইয়া চলিতে পারিলে তাহাদিগকে একেবারে হাতের মুঠার ভিতরে আনাও বোধ করি ততটা কঠিন হইবে না। এখন



আনাড়ির মত একটা কাঁচা চাল চালিয়া বসিলে সমস্তই মাটি হইয়া যাইবে। তাই ঠিক করিল, হুকাকাশির সহিত পরামর্শ না করিয়া একটি পা'ও আর সে কোন দিকে বাড়াইবে না।

স্নান নাই, খাওয়া দাওয়া নাই, মাথার উপর কড়া রোদ, রণজিৎ হুকাকাশির উদ্দেশে রাজবাড়ীর দিকে চলিল। রাজবাড়ীর প্রকাণ্ড সিঁড়িগুলি একটার পর একটা অতিক্রম করিয়া বারান্দায় উঠিতে প্রথমেই দেখা মিলিল দিবেন্দ্রের। দিবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"কোত্থেকে রণজিৎ? এত বেলা এখনও যে দেখ্‌ছি উস্কোখুস্কো চেহারা? খাওয়া দাওয়া হয় নি নাকি?"

"না দিবেন দা, এখনও ওসবের সময় হ'য়ে ওঠেনি। রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করবার হঠাৎ এম্‌নি দরকার হ'য়ে উঠ্‌লো যে, বাড়ী যাবারও তর সইল না, সোজা চলে এলাম।"

"জ্যেঠামশা'য়ের সঙ্গে দেখা করবে?" বলিয়া দিবেন খানিকক্ষণ রণজিৎএর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল—"আমি বলি, থাক্ রণজিৎ, এখন আর তাঁর সাথে দেখা করে কাজ নাই, এই সবে অনেক কষ্টে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে আমরা সবাই নেমে আস্‌ছি।"

রণজিৎ ভয় পাইয়া কহিল "তাঁর অসুখ আবার বেড়ে গেছে নাকি? কই আজ ভোরে তো তার কিছুই টের পাইনি!"

"অসুখ বাড়েনি। হুকাকাশির দুর্ঘটনার কথাটা শুনে হঠাৎ তিনি কেমন আচ্ছন্নের মত হয়ে পড়লেন, মনে হ'ল যেন মূর্চ্ছা গেলেন। তাড়াতাড়ি প্রবোধ ডাক্তারকে ডেকে পাঠান হ'লো। তিনি আস্‌তে তবে জ্ঞান হোলো। চারিদিকে খানিকটা তাকিয়েই হঠাৎ দীপেনের হাত দুটো ধ'রে ধরাগলায় জ্যেঠামশাই বল্লেন—"দীপেন, আমার সব আশা ভরসা গেল।" আর তার পরেই ছোটছেলের মত হুহু করে কেঁদে ফেল্লেন। ডাক্তার বল্লে, তাঁর মাথার এখন বিশ্রাম দরকার। তাই মর্ফিয়া ইনজেক্‌জন্ ক'রে ঘুম পাড়াতে হ'য়েছে। এই আমরা সবে নেবে আস্‌ছি।"

দিবেনের শেষ কথাগুলির একটি বর্ণও রণজিতের কাণে ঢুকিল না,—"হুকাকাশির দুর্ঘটনা" কথাটা শুনিয়া এমনি হতবুদ্ধিই সে হইয়া গেল। দিবেন থামিতেই তাই সে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "হুকা-কাশির আবার কি দুর্ঘটনা ঘট্‌লো ? আমি যে আপনার কথা কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে, দিবেন দা।"

পূরো দুই মিনিট কাল রণজিতের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া দিবেন কহিল, "তুমি কি কিছুই শোন নাই নাকি ?"

"নাঃ, কিচ্ছুনা !"

"আজ চা খাওয়ার পর হুকাকাশি নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর বেহারা অমৃত। হঠাৎ একখানা মোটর এসে তাঁদের সাম্‌নে দাঁড়াল,—জন চার পাঁচেক লোক তাতে ছিল। মোটরখানা থাম্‌তেই তারা করলে না কি, টক্ করে নেমে এসে হুকা-কাশিকে ঘিরে ফেল্লে। তারপর, একজন পকেট থেকে পিস্তল বের করে তাঁর বুকের সাম্‌নে উঁচিয়ে ধরে বল্লে, 'খবর্দ্দার, নড়াচড়া বা চেঁচামেচির নামটি পর্য্যন্ত করবেন না, লাভ তাতে কিছুই হবে না, শুধু শুধু প্রাণেই মারা পড়বেন। আমাদের সবাইকার কাছেই, শুধু একটা নয়, দু'দুটো ক'রে গাদা পিস্তল রয়েছে।' তার কথা শেষ হ'তেই দলের ভেতর থেকে একজন এগিয়ে এসে হুকাকাশির হাতে একটা হাতকড়া পরিয়ে দিলে আর তারপর তাঁকে টেনে মোটরে তুলে, অসম্ভব রকম জোরে সমসেরপুর রোড্ দিয়ে সোজা সহর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। অমৃতের ওপর হুকুম হয়েছিল চুপ্ ক'রে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে—এদিক্ ওদিক্ করার চেষ্টা করলেই মাথার খুলি তার উড়ে যাবে। বেচারা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, মোটর হাঁকিয়ে সবাই চলে গেলে উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে আমাদের খবর দিলে। ডিটেক্‌টিভের চাকর কিনা, তাই বুদ্ধি খাটিয়ে মোটর গাড়ীর নম্বরটাও আন্‌তে ভোলে নি। কিন্তু দেখা গেল, ওদলের বুদ্ধি ঢের বেশী। নম্বরটা মেলাতেই সবাই দেখলাম, এ জ্যাঠামশাইয়েরই একখানা গাড়ীর নম্বর। গাড়ীখানা তখনও দিব্যি গ্যারেজে রয়েছে। বুঝ্‌তে পারলে না ?—পাছে নম্বর নিয়ে কোন একটা গোলমালে পড়ে, তাই ওটা জাল করে নিয়েছে।"



সেই ধূলাভরা সিঁড়ির উপরেই রণজিৎ ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

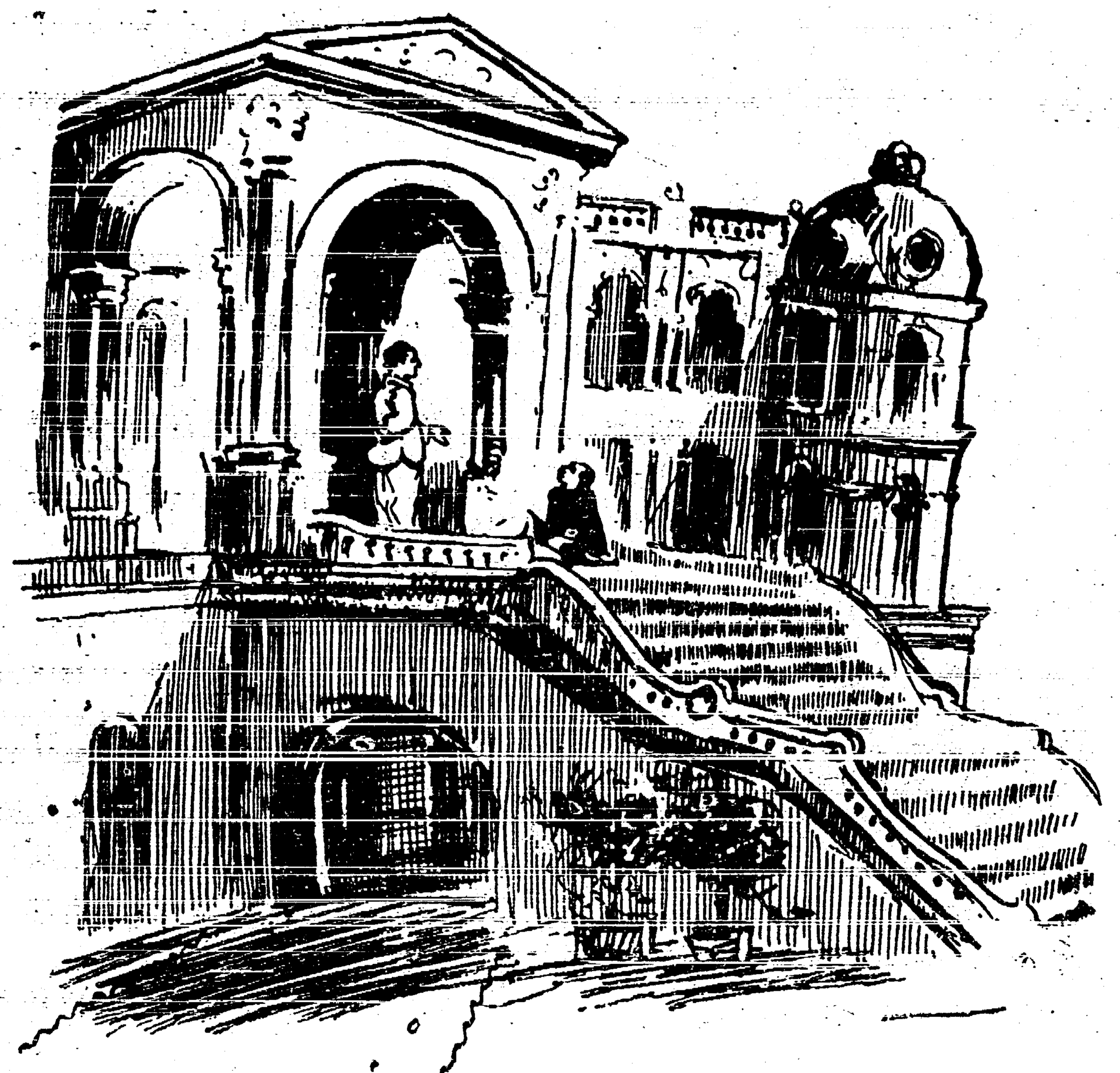

রণজিৎ ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল

"আহা, মাটীতে বসে পড়্‌লে কেন ? চল চল, আমার ঘরে চল।"

ঘরে গিয়া দিবেন্দ্র আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "আমি বলি রণজিৎ, একাজ থেকে তুমি তোমার হাত গুটিয়ে ফেল—বড় বিপজ্জনক কাজ এ। একথা মনেও এনো না যে, পদ্মরাগ যে চুরি করেছে সে রামা-শ্যামার মত ছ্যাঁচড়া চোর। রীতিমত মাথাওয়ালা শিক্ষিত লোক এর পেছনে আছেই আছে। একবার গোড়া থেকে তাদের কাজগুলো বেশ করে ভেবে দেখ দিকিনি ? পাইক-বরকন্দাজ-দ্বারোয়ানে ভরা এত বড় বাড়ীটা, আমরা এতগুলো লোক রয়েছি, আর সে কিনা রাতের পর রাত রোজ রোজ সবার চোখে ধূলো দিয়ে জ্যাঠামশাইয়ের শোবার ঘরের সাম্‌নে পাইচারী করে গেল। শুধু তাই নয়, শ্রীমন্তের কথা যদি সত্যি হয় তবে রোজ সে তিনটে ক'রে জোরে জোরে শিস্‌ও দিয়েছে ; শিস্ কেন দিয়েছে তা' ভগবান্ জানেন, কিন্তু আমি বলি, কি আশ্চর্য্য হুঁসিয়ার সে-বল দিকিনি, কি ক'রে সবার চোখ এড়িয়ে এ কাজ সে কর্‌লে, তাই ভেবে ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি। তারপর শ্রীমন্ত যে বল্লে পদ্মরাগ চুরি এক ভূতুড়ে ব্যাপার, বড় মিথ্যে বলে নি সে।

জ্যাঠামশাইয়ের চাবি রইল জ্যেঠামশাইয়ের কাছে, ঘরে যেমনটী তালা লাগান ছিল তেমনিই রইল অথচ পদ্মরাগখানা সরিয়ে নিয়ে গেল। কি প্যাঁচাল বুদ্ধি, বাবা ? হুকা-কাশিকে যে আনা হয়েছে, ঘুণাক্ষরেও সেকথা জ্যাঠামশাই কাউকে জানতে দেন নি। একে ত চালাকীতে হুকা-কাশির যুড়ি এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পাওয়া ভার, তার ওপর এই দারুণ গ্রীষ্মেও বেচারা সের দেড়েক ওজনের দুটো দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু পারলে তাদের চোখ এড়াতে ? কোন্ ফাঁকে এসে বন্দী করে নিয়ে পালাল। তাই বলছিলাম রণজিৎ, এ অজানা শত্রুর সাথে লেগে আর কাজ নেই। কখন কি বিপদ্ ঘটে বলা যায় না তো ! ঠিক এই কথাই সেদিন বল্‌ছিলাম জ্যাঠামশাইকে, কিন্তু তিনি ধরে নিলেন আমি ভীরু। এ কথা তাঁর একবারও মনে এলো না যে, ভবানন্দ রায়ের বংশের কেউ কখন ভয় কাকে বলে জানে না— এ শুধু সাবধানতা বই তো আর কিছু নয়। শত্রুজানা থাক্‌তো তো অবশ্য কোন কথা ছিল না।"

দিবেনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রণজিৎ দীপেনের উদ্দেশে চলিল। মন তাহার যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল—এতবড় একটা ধূর্ত্ত দস্যুদলের সহিত এবার হইতে লড়িতে হইবে তাহাকে সম্পূর্ণ একা ; সাহায্য করিবার, কিম্বা নিদেন একটু পরামর্শ দিবারও আর কেউ নাই। অথচ তখন পিছাইয়া যাওয়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব, কেননা রাজা বাহাদুরকে সে বড় গলায় কথা দিয়াছে, এখন ফিরিয়া দাঁড়াইবে কোন মুখে ? দিবেন যেরূপ ভড়্‌কাইছে, তাহাতে তাহার নিকট হইতে সহায়তা পাওয়ার বড় বেশী আশা নাই। দেখা যাক্ এখন দীপেন কি বলে ! কিন্তু——সে যে নিতান্তই গোবেচারা—কী ই বা করিবে সে ? তবু দেখা যাক্ !

কথাটা পাড়িতেই দীপেন কিন্তু খুব উৎসাহী হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরামর্শের পর দুই বন্ধু ঠিক করিল, সেই ভাঙ্গা একতালা বাড়ীটা এখন অবিলম্বে ঘিরিয়া ফেলাই দরকার। থানার দারোগার তলব পড়িল।

সন্ধ্যা হইতে তখনও খানিকটা বাকী ছিল। দারোগার নির্দ্দেশমত থানা



হইতে একদল পুলিশ গিয়া বাড়ীখানা ঘেরাও করিয়া তাহার সমস্ত দরজাগুলি

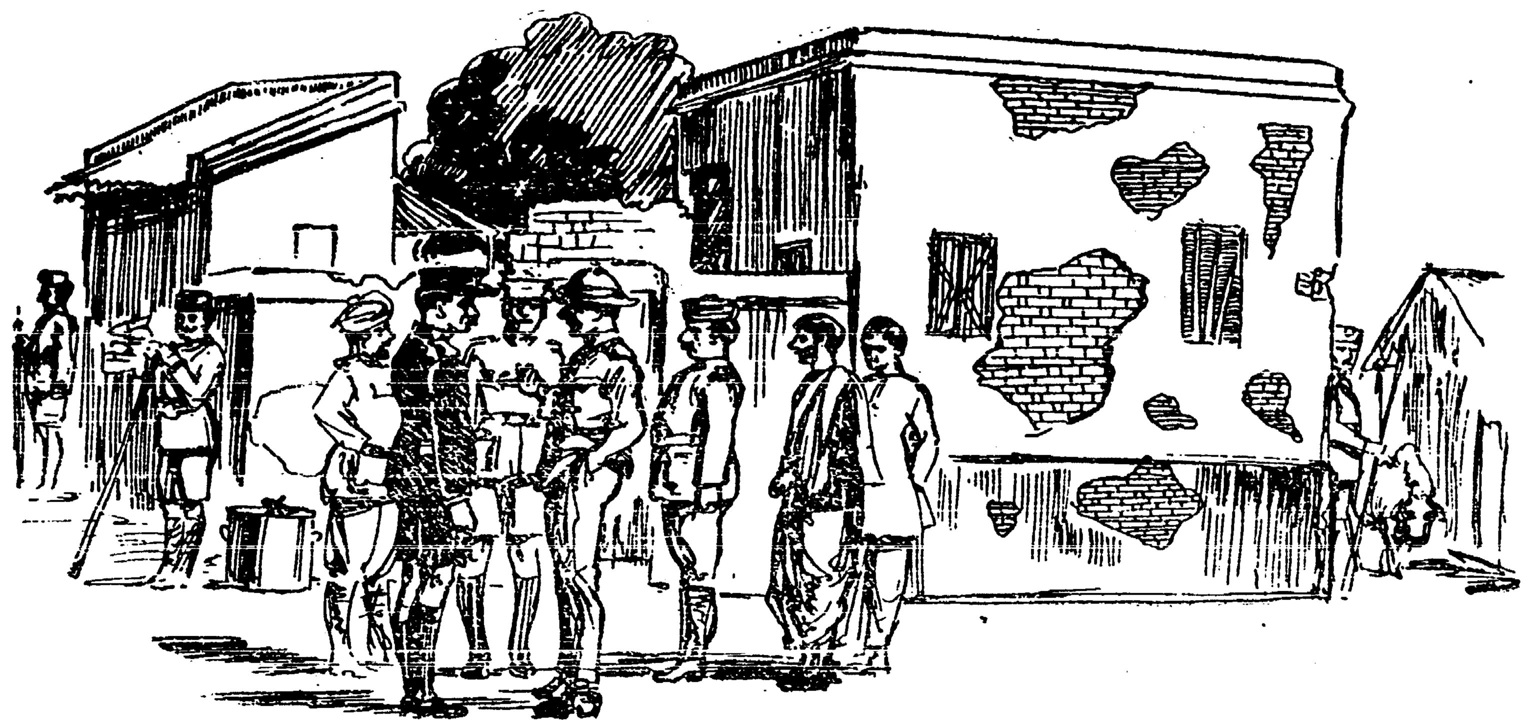

বাড়ীখানা ঘেরাও করিয়া তাহার সমস্ত দরজাগুলি আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইল

আগ লাইয়া দাঁড়াইল। (ক্রমশঃ)

---

## সত্য-কথা

(শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার)

[ বেখাপ্পা থাক্‌লে কিছু "সত্য-কথা"-পদ্যে,
দেখিয়ে দিও বয়স যাদের এগার-র মধ্যে ]:

ভর সন্ধ্যায় ফাঁকা মাঠে বেড়াচ্ছিলাম এক্‌লা ;
বল্লে আমার বন্ধু তখন ( ডাক নাম তার কেঁক্‌লা )—
"ফিরে চল ঘরে, ভাই, রোদ থাক্‌তে থাক্‌তে,
এই বনে চরে বাঘ সন্ধ্যাটি ঠিক লাগ্‌তে।".
পাঁচ মিনিটে গাঁয়ে ফিরে দেখি দূরে ( বাবারে ! )—
অন্ধকারে শেওড়া গাছে বাড়িয়ে লম্বা থাবা-রে
কে যেন দাঁড়িয়ে আছে ; কেঁক্‌লা বল্লে—ডাকিনী,
ফটিক্ বল্লে—পেত্নী, আর পাঁচু বল্লে—নাগিনী !

দৈবে এসে জুটল কাছে ( সেটা মোদের বরাতই )
হাতে ধরে কাঁধের করাত গাঁয়ের একজন করাতী।
ঠিক হোল, সেই তেঁতুল গাছটি সবাই মিলে কাটব ;
তাড়িয়ে ভূত গাঁয়ের পথে নির্ভয়েতে হাঁটব।

পড়্‌ল কুড়ুল ছয়খানা,—হ'ল বেজায় শব্দ ;
ভূতেরা সব সেদিন থেকে হ'ল ভারি জব্দ।
ফিরিয়ে দিলাম কাঠুরেকে দা খন্তা কুড়ুল-ও ;
রূপ কথাটি ফুরুল, আর নটেগাছটি মুড়ুল।

---

# প্রকৃতির তাজ্জব খেয়াল

একবার একদল সাহেব বেড়াইতে বেড়াইতে বিলাতের আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের উপর এক জঙ্গলে আসিয়া পড়িলেন। ভদ্রলোকেরা বোধ হয় বেড়ান'র আনন্দে আকাশের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখেন নাই, ফলে খানিক দূর যাইতেই তাঁহারা পড়িয়া গেলেন এক ঝড়ের মুখে। ওঃ সেকি কাণ্ড! চারিদিক অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, কিছুই দেখা যায় না—রাস্তা ঠিক করা ত' দূরের কথা। হঠাৎ আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া একটা বজ্রপাত হইয়া গেল। বাজ পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর ভস্ ভস্ আওয়াজ শোনা গেল, আর দলের একজন সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "মাথা জ্বলে গেল, মাথা জ্বলে গেল"। সাহেব টুপী খুলিতেই দেখা গেল তাঁহার চুলগুলি আলপিনের মত খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, আর তার ডগায় দপ্ দপ্ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। পুরাণের গল্পে দেবতাদের মাথার চারিদিকে যেমন আলোর কথা শোনা যায়—ঠিক তেমনি।

প্রায় মিনিটখানেক পরে আগুন নিবিল; ভদ্রলোকও শান্ত হইলেন। তখন আর কোন যন্ত্রণাই নাই। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, আকাশের গায় যে বিদ্যুৎ



দেখা যায় তাহারই খানিকটা সাহেবের উপর পড়িয়াছিল। আর তারই ফলে এই অদ্ভুত ব্যাপার।

বিদ্যুৎকে লইয়া এই রকম অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড অনেক সময় শোনা যায়। কয়েক বছর আগে সুইজারল্যাণ্ডে একটা প্রকাণ্ড বন নাকি এমনি ভাবে বিদ্যুতের হাতে পড়িয়াছিল। কিছুর মধ্যে কিছু না, হঠাৎ এক দিন রাত্রে দেখা গেল সমস্ত বনটা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে—ঠিক যেন সেই মহাভারতের আমলের "খাণ্ডব দাহন" আর কি!

শুধু বিদ্যুৎ বলিয়া নয়, জলে, স্থলে, আকাশে কত সময় যে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখা যায় তাহা শুনিলেও অবাক্ হইতে হয়। পৃথিবীর বড় বড় পর্য্যটকেরা নাকি এ রকম একটা না একটা দৃশ্য হামেশাই দেখিতে পান।

একবার এক স্পেনদেশীয় নাবিক ঘুরিতে ঘুরিতে এক উঁচু পাহাড়ের

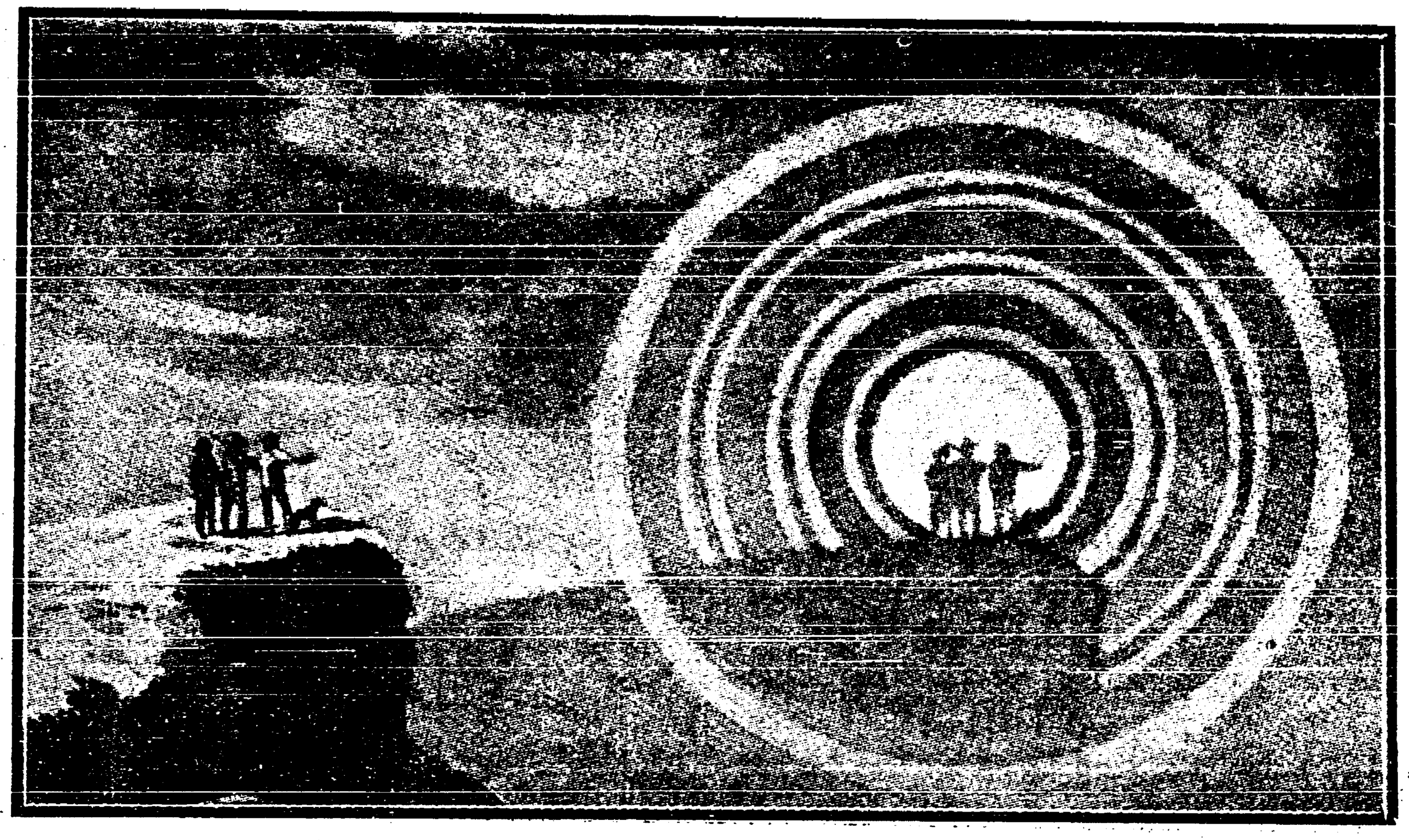

মেঘের গায়ে মানুষের ছায়া

চূড়ায় আসিয়া পড়িল। হঠাৎ সে দেখে আকাশের গায় মেঘের ভিতর কতকগুলি রং বেরং এর বৃত্ত, আর তারই মাঝখানে একজন লোক দিব্যি দাঁড়াইয়া আছে।

নাবিক বেচারা প্রথমটা বেশ কৌতুক অনুভব করিল, কিন্তু একটু পরেই সে কৌতুক দাঁড়াইল গিয়া ভয়ে। লোকটা কি বেয়াদব—ঠিক নাবিক যা করে তাই করিতেছে। নাবিক দৌড়াইলে সেও দৌড়ায়, নাবিক বসিলে সেও বসে। খানিক পরে দেখা গেল লোকটি আর কেউ নয় নাবিক নিজেই। মেঘের গায়ে তাহারই ছায়া পড়িয়া এই কাণ্ড। জার্ম্মেনিতে ব্রোকেন বলিয়া একটা পাহাড় আছে, সেখানে দাঁড়াইলে নাকি যখন তখন এই রকম মেঘের গায়ে নিজের ছায়া দেখা যায়। আগেকার পৃষ্ঠার ছবিটায় দেখ, তিনজন লোকের ছায়া কেমন একসঙ্গে মেঘের গায়ে পড়িয়াছে।

এত ভালই, প্রায় বছর ৫০।৬০ আগে ফ্রান্সে যা এক কাণ্ড হইয়াছিল, শুনিলে তাক্ লাগিয়া যাইবে। একদিন ভোর বেলা দেখা গেল ফ্রান্সের প্যারিস

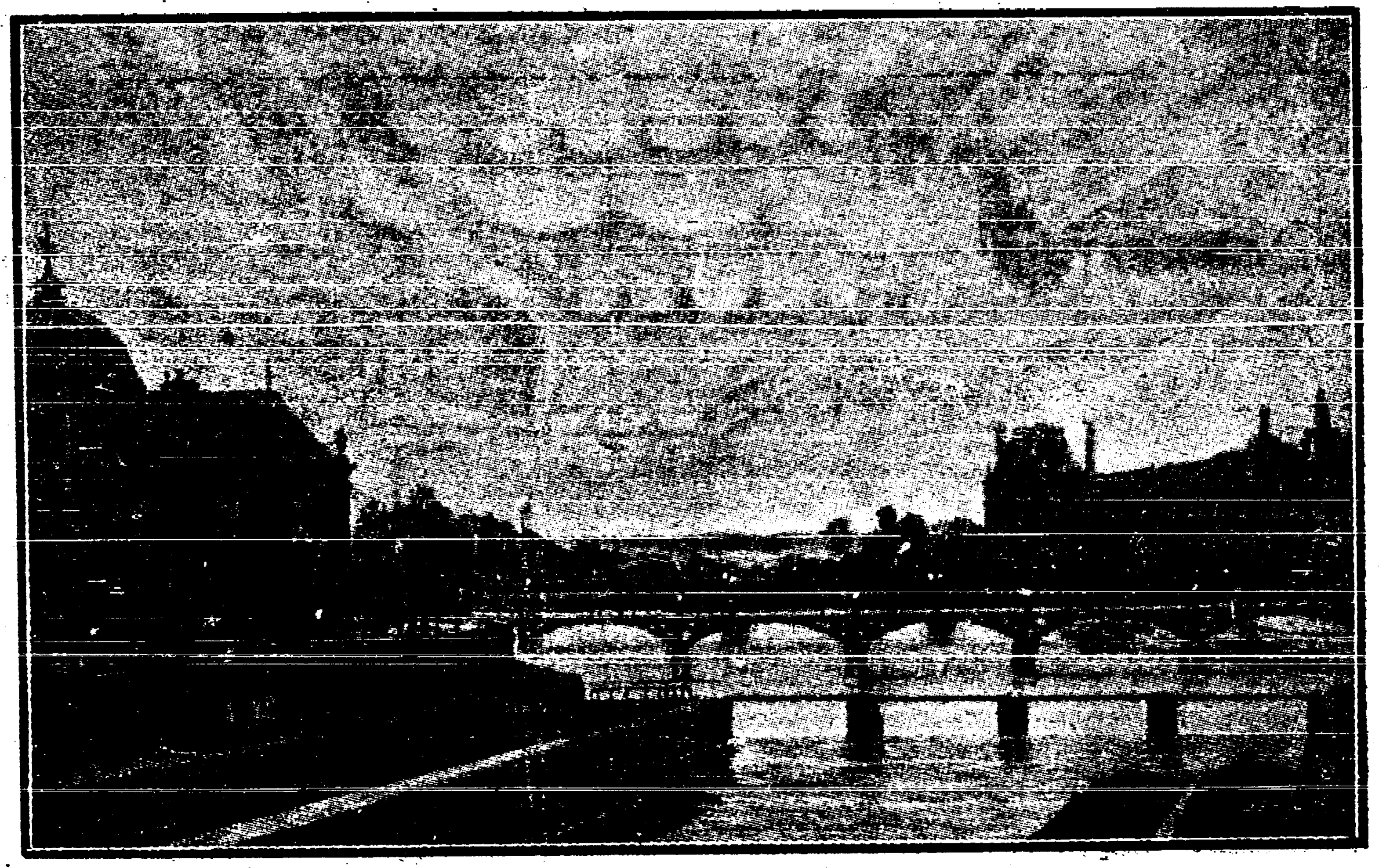

আকাশের গায় গোটা প্যারিস্ সহরটার ছায়া পড়িয়াছে

সহরের উপর অনেকটা উঁচুতে আকাশের গায় আর একটা সহর উল্টা হইয়া ঝুলিতেছে। সহর শুদ্ধ লোক ত' অবাক! ভূতুড়ে কাণ্ড না কি? পরে জানা গেল



আকাশের গায় গোটা প্যারিস সহরের ছায়া পড়িয়া এই কাণ্ড ঘটাইয়াছে, এরকম ঘটনা পৃথিবীতে খুব কমই ঘটিয়াছে।

মরুভূমির মরীচিকার কথা তোমরা অনেকেই বোধ হয় শুনিয়াছ। দারুণ গরমে পিপাসায় আধমরা হইয়া কয়েকজন লোক হয়তো মরুভূমির মধ্যে ঘুরিতেছে, হঠাৎ দেখা গেল একটু দূরে চমৎকার এক হ্রদ—তার মধ্যে কত গাছপালার ছায়া পড়িয়াছে। অথচ ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটিয়াও সে হ্রদের সন্ধান মিলিবে না। এ ব্যাপারটাও হয় ছায়ারই কসরতে। মরুভূমির বাতাস সবটা সমান ভারী নয়; আর তাহারই ফলে বহু—বহু দূরের কোন গাছপালার ছায়া আসিয়া পথিকের সম্মুখে পড়ে। কেন ও রকম হয় তাহা তোমরা বড় হইয়া বিজ্ঞান পড়িলে বুঝিবে।

পৃথিবীর উত্তর দিকের দেশগুলি যদি একবার ঘুরিয়া আসিতে পার তবে আরও কতকগুলি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাইবে। দুপুর রাত্রে সূর্য্য দেখিবার কথা ভাবিতে পার? কিন্তু এও মোটেই অসম্ভব নয়। নরওয়ে দেশে গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি কয়েকদিন ধরিয়া দুপুর রাত্রে দিব্যি সূয্যিমামার সাক্ষাৎ মেলে। কয়েক দিন কয়েক রাত ধরিয়া সূর্য্যঠাকুর আর আকাশ হইতে নড়িতে চান না। ব্যাপারটা কিন্তু বিশেষ কিছু নয়, ঐ সময় পৃথিবীটা একটু হেলিয়া থাকে, ফলে কয়েকটা দিন ওই সব দেশে পৃথিবী উল্টাইয়া গেলেও সূর্য্যের দেখা পাওয়া যায়।

আবার মেরুর কাছাকাছি গেলে হয়তো দেখিবে সূর্য্যের চারিদিকে আশে পাশে আরও কতকগুলি গোল গোল বৃত্তাকার আলো দেখা যাইতেছে। এগুলিকে বলা হয় "নকল সূর্য্য"। ইহাদের এক একটা আবার এক এক রংএর হয়—লাল—সবুজ—হল্‌দে। বাতাসের মধ্যে সেখানে অনেক সময় বরফের কণা ভাসে, আর তার ভিতর দিয়া সূর্য্যের আলো আসিলেই এই ব্যাপার দেখা যায়।

সমুদ্র মহাশয়ও রকমারি ভেল্কি দেখাইতে কম ওস্তাদ নহেন। সমুদ্রের মধ্যে দাবানলের কথা অনেকেই বোধ হয় জান; জলস্তম্ভের কথা শুনিয়াছ কি?

সমুদ্রের জল কখনও কখনও ঘুরপাক খাইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থামের মত খাড়া হইয়া উঠে। থাম বলিলাম বটে কিন্তু সে থামের আকার কল্পনা করাও বেশ কঠিন। এক একটা জলস্তম্ভ সময় সময় ২০০ ফুট চওড়া আর মাইল খানেক উঁচু হয়। সেগুলি জলের মধ্যে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে না,—ভীম বেগে—কখনও কখনও ঘণ্টায় প্রায় ৬০ মাইল অর্থাৎ পাঞ্জাব মেলের চেয়েও জোরে ছুটিয়া চলে। অনেক সময় আবার অনেকগুলি জলস্তম্ভ একসঙ্গে পাশাপাশি ছুটিতে থাকে। তাহাদের গর্জ্জনে আকাশ পাতাল কাঁপিতে থাকে, সে পথে কোনও জাহাজ পড়িলে আর তাহার রক্ষা নাই। জলস্তম্ভ যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে তখনকার অবস্থাটা আরও ভয়ানক।

মরুভূমিতে বালুস্তম্ভ

ঠিক জলস্তম্ভেরই মত মরুভূমির বালুস্তম্ভ। হাজার হাজার মণ বালি বাতাসে ঘুরপাক খাইতে খাইতে প্রকাণ্ড দৈত্যের মত খাড়া হইয়া উঠে, তার পর



প্রচণ্ডবেগে ছুটিয়া গিয়া ফাটিয়া পড়ে। তাহার মুখে পড়িলেও যে অবস্থাটা মোটেই আরামদায়ক হয় না তা বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারে।

ঘূর্ণিবায়ু এই আসিল বলিয়া

পাশে যে ছবিখানা দেখিতেছ—ওটা হইতেছে ঘূর্ণিবায়ুর ছবি। বাতাসে পাক খাইয়া রাস্তার ধূলাও যে কেমন করিয়া আকাশে গিয়া ঠেকিতে পারে তা ছবিখানা দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। এ ব্যাপারটাও ঠিক মরুভূমির বালুস্তম্ভেরই মত। তবে ব্যাপারটা মরুভূমির মধ্যে নয়—সাধারণ রাস্তার উপর, কাজেই লোকের প্রাণের অবস্থাটা এখানে একটু বেশী রকম মারাত্মক।

আর একখানা ছবি দেখ। এক সঙ্গে কতগুলি রামধনু উঠিয়াছে। একটা রামধনু তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ কিন্তু এ রকম এক সঙ্গে ৩।৪টা রামধনু জড়াজড়ি করিয়া উঠিতে নিশ্চয়ই দেখ নাই। এও প্রকৃতির এক খেয়াল।

ভগবানের রাজ্যে এ রকম অদ্ভুত অদ্ভুত কত কাণ্ডই যে ঘটে কয়জন তাহার তাহার খোঁজ রাখে বল!

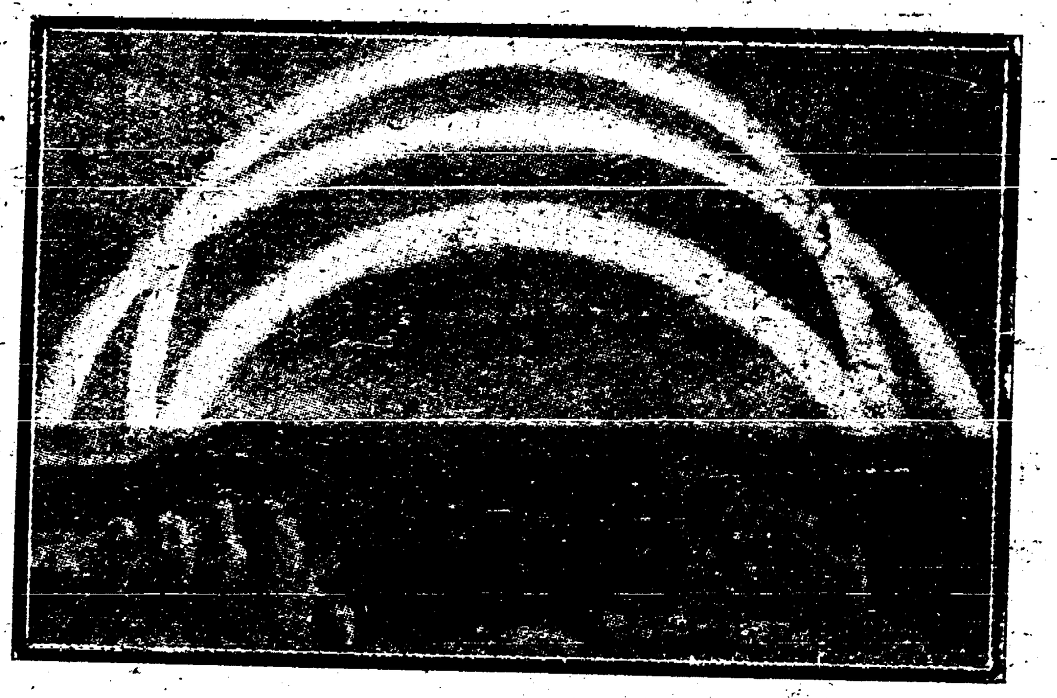

একসঙ্গে তিনটা রামধনু

# রাত কি দিন

( শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক এম-এ, বি-এল )

বহু কালের কথা। তখন মানুষের মত জন্তুদেরও রাজা ছিল। রাজা আর কেউ নয়, শজারু। শজারু রাজা হয়েছিল এই জন্যে যে, তার কাছে বাঘ সিংহও এগোতে ভয় করতো। শজারুর পূরো নাম ছিল শ্রীল শ্রীযুক্ত শজারুলাল কণ্টিকারী।

রাজার নীচেই ছিল সর্দ্দার জন্তুরা। এক এক জাতের জন্তুর এক এক জন সর্দ্দার ছিল।

একদিন শজারু রাজা তাঁর সর্দ্দার জন্তুদের ডেকে পাঠালেন। কি, না একটা মস্ত সভা বসবে, তাতে একটা মস্ত জরুরী কথার মীমাংসা হবে। সারাটা দিন গাধা মন্ত্রী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বনের মধ্যে রাজার হুকুম জারি করলেন।

রাত যখন ঝাঁ ঝাঁ করচে তখন গভীর বনের মধ্যে সভা জমতে লাগলো। কত সর্দ্দার জন্তু যে এলো তার ঠিকানাই নেই ; হাতী, উট, জিরাফ থেকে আরম্ভ করে শেয়াল কুকুর পর্য্যন্ত। মুখে মুখে রাজার হুকুম এত ছড়িয়ে পড়েছিলো, যে উত্তরের সাদা ভাল্লুক, দক্ষিণের কালো বাঘ, পূবের দাঁতালো শূয়োর, পশ্চিমের ঝাঁকালো গণ্ডার—তারা পর্য্যন্ত আসতে বাদ পড়লো না। আর সে কী উৎসাহ! কেউ হুপ্ করে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে, কেউ ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কেউ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে যায়।

প্রায় শেষরাত্তিরে যখন জন্তুদের আসা একেবারে বন্ধ হলো, যখন সমস্ত বনটা একেবারে গম্ গম্ করচে, তখন ঠিক বনের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালা হলো। এই আগুনের আলোতে সকলে সকলের মুখ দেখ্তে পেলে, আর সকলেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠ্লো—'জয় শজারুলাল কী জয়, জয় কণ্টিকারী মহারাজ কী জয়।'

তারপর আর সাড়াশব্দ নেই, সব চুপ্। তখন আস্তে আস্তে শজারু



অগ্নিকুণ্ডের ধারের একটা মাটির ঢিপির উপর উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সমস্ত গা দেখ্তে দেখ্তে ফুলে উঠ্লো, সমস্ত কাঁটা একসঙ্গে খাড়া হয়ে কাঁপতে লাগ্লো—আর সেই কাঁটার ডগায় ডগায় আগুনের আলো ঝিক্‌মিক করতে লাগ্লো। তিনি অত্যন্ত চিন্তিতভাবে দু'এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে শেষে গম্ভীর গলায় বলে উঠ্লেন—'আমি ভেবে ঠিক করতে পারচি না, আমি ভেবে ঠিক করতে পারচি না যে কী সব সময় থাক্‌বে, রাত কিম্বা দিন, দিন কিম্বা রাত।'

এই কথা শেষ হবামাত্রই—চারদিক থেকে একটা ভয়ঙ্কর গোলমাল উঠ্লো। কেউ বল্‌তে লাগ্লো 'কেবল দিন চাই'। কেউ বল্‌তে লাগ্লো 'কেবল রাত চাই।' সকলেই একসঙ্গে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিল বলে, ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না কে কি বল্‌চে, কে কি চায়। কেবল সকলের গলাকে দাবিয়ে দিয়ে ছাপিয়ে উঠেছিল কালো ভাল্লুকের গলা। সে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছিল, কখনো এদিকে, কখনো ওদিকে, কখনো সাম্‌নে, কখনো পিছনে, কখনো একে সরিয়ে, কখনো ওকে ধাক্কা দিয়ে। আর তোলো হাঁড়ির মত ভারী আওয়াজে সে কেবল বল্‌ছিল—'রাত, রাত, শুধুই রাত।'

সভার এককোণে একটা কাঠের গুঁড়ির উপর বসে ছিল কাঠবেড়াল। তার ল্যাজটি পিঠের উপর দিয়ে ঘুরে মাথা পর্য্যন্ত উঠেছিল। আর, সে সাম্‌নের পা দিয়ে কি যেন কুটুর কাটুর করে খাচ্ছিল। ব্যাপার দেখে সে একটু হেসে নিয়েই তড়াক্ করে একটা তুড়িলাফ মার্‌লে, আর তারপরই চেঁচাতে লাগ্লো—'রাতের পর দিন হবেই, চাও আর না চাও।' তার গলা প্রথমটা তেমন শোনা যাচ্ছিল না—কিন্তু একটু পরেই সব জন্তুর গলা যখন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ভেঙ্গে কিম্বা বসে গেলো, তখন তার গলাই উঠ্‌লো চন্‌চনিয়ে। ঝিনুক দিয়ে কড়াই চাঁচ্‌লে যে রকম আওয়াজ হয় সেই রকম আওয়াজে সে তখনো বল্‌চে—'রাতের পর দিন হবেই। চাও আর না চাও।'

সব জন্তুরা অবাক্ হয়ে তার মুখের দিকে চাইলে আর ভাল্লুকের দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে পড়্‌লো। সে একটা কিম্ভূত কিমাকার গর্জ্জন ক'রে

বললে—'কি বলিস্? আহাম্মক, কি বলিস্?' কাঠবেড়াল নেচে উত্তর দিলে—'ঠিক্ বলি দিগ্‌গজ, ঠিক বলি। বিশ্বাস না হয়, ঐ দেখ পূব দিকে চেয়ে।'

সকলের চোখ পূব আকাশের দিকে ঘুর্‌লো। আশ্চর্য্যি হয়ে সকলে দেখলে যে ঠিক যেখানে আকাশ গিয়ে মাটি ছুঁয়েচে—সেই জায়গাটা বেশ লাল হয়ে উঠেচে—ঠিক সেই রকম লাল—যেমন রোজই হয়ে থাকে, দিন হবার আগে।

এই রেঃ! তবে ত দিন হচ্চেই। কিন্তু এ-ও কি হতে পারে? তাদের চাওয়া না চাওয়াকে গ্রাহ্য না করেই দিন হচ্চে!

ভাল্লুক তার সমস্ত কপালটাকে ভীষণভাবে কুঁচকে কাঠবেড়ালের দিকে চাইলে। তার যত কিছু রাগ গিয়ে পড়লো কাঠবেড়ালের উপর, যেন সমস্ত দোষ তারই। কাঠবেড়াল তা দেখেও দেখ্‌লে না। ফূর্ত্তির সঙ্গে লাফিয়ে বলে উঠ্‌লো—"হলো ত দিন, হলো ত?"

ভাল্লুকের গলা দিয়ে একটা শব্দ বেরুলো—"ঘারর্—র্—র্—র্'। তার পরই দেখা গেল ভাল্লুক ঝড়ের মত ছুটেচে কাঠবেড়ালের পিছনে—আর কাঠ-বেড়ালও গাছপালার মধ্যে দিয়ে ছুটেচে তীরটির মত। কিন্তু কাঠবেড়ালকে ধরা কি আর ভাল্লুকের কাজ? একটা বড় গাছের গুঁড়ির তলায় একটা ছোট্ট খোঁদল ছিল; কাঠবেড়াল সাঁৎ করে তার মধ্যে সেঁদিয়ে গেল। ঠিক সেই সময় ভাল্লুকও থাবা হাঁকড়েছিল কিন্তু সে থাবা কাঠবেড়ালের আর কিছুই করতে পারলে না, তার পিঠের উপর গোটা চার পাঁচ নখের আঁচড় টেনে দিলে মাত্র। সেই জন্যেই ত কাঠবেড়ালের গায়ে অমন ডোরা ডোরা দাগ।

ভাল্লুক খানিকক্ষণ গর্ত্তের মুখের গোড়ায় বসে রইলো, শেষে—বিরক্ত হয়ে—চলে গেলো। যাবার সময় কাঠবেড়াল তাকে গর্ত্তের ভিতর থেকে শুনিয়ে দিলে—'গেলো ত, রাত গেলো ত।'

---

# পক্ষিরাজের তেজ

(মহাভারত হইতে)

কশ্যপ ঋষি বিবাহ করিয়াছিলেন অনেকগুলি। তাঁহার দুইটি স্ত্রীর নাম ছিল কদ্রু ও বিনতা। দুইটীই দক্ষ প্রজাপতির কন্যা—দুই ভগিনী, আবার দুই সতীন। দুই জনই দেখিতে বেশ সুশ্রী ছিলেন। একদিন মহর্ষি কশ্যপ তাঁহাদিগকে বলিলেন—"আমি বর দিব, তোমরা কি চাও?" কদ্রু বলিলেন,—"আমি চাই খুব জোরদার হাজারটি নাগ ছেলে।" বিনতা বলিলেন,—"আমি দুটী মাত্র ছেলে চাই, কিন্তু তারা যেন শরীরে, বলে ও বিক্রমে কদ্রুর ছেলেদের উপরে হয়।" মহর্ষি বলিলেন,—"তাই হউক।"

অনেকদিন কাটিয়া গেল—কদ্রুর গর্ব্ভ হইতে এক হাজার ডিম বাহির হইল আর বিনতার গর্ব্ভ হইতে বাহির হইল মোটে দুইটী। চাকরাণীরা ডিমগুলি বেশ ভাল করিয়া ঢাকা দিয়া রাখিল। পঁচিশ বৎসর এই ভাবে চলিয়া যাওয়ার পর কদ্রুর ডিমগুলি একে একে ফুটিতে লাগিল এবং এক এক ডিম হইতে এক এক ছেলে বাহির হইল কিন্তু বিনতার ডিম আর ফোটে না। বিনতা অস্থির হইয়া পড়িলেন, শেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া একটা ডিম ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ভাঙ্গিয়াই দেখেন, ছেলের শরীরের আধখানা ঠিক হইয়া গিয়াছে, আর আধখানা এখনও কাঁচা। ছেলে ত ডিম হইতে বাহির হইয়াই চটিয়া লাল—মাতাকে বলিল,—"তুমি আমাকে কাঁচা থাকৃতে বের ক'রে নেহাৎ অন্যায় কাজ ক'রেছ; সতীনের সঙ্গে রেসারেসি ক'রে তুমি যখন এমনটা করলে, তখন তোমাকে ৫০০ বছর সেই সতীনের দাসী হ'য়ে থাকৃতে হবে।" আবার বলিল—"আর একটা ডিমে যে ছেলে আছে, যদি তুমি ডিমটা আগে ভেঙ্গে দিয়ে তার শরীরটা খারাপ ক'রে না ফেল, তবে সেই ছেলেই তোমাকে দাসীগিরি থেকে ছাড়িয়ে আন্‌বে; একটু সবুর কর্‌তে হবে, আরও ৫০০ বছর গেলে তবে ও ডিম আপনা থেকে ফুট্‌বে।"

আধকাঁচা ছেলেটী গিয়া সূর্য্যের রথ চালাইতে লাগিল—তাহার নাম অরুণ।

এদিকে দেবতারা সমুদ্র মন্থন করিয়া উচ্চৈঃশ্রবা নামে একটা ঘোড়া পাইয়াছিলেন। কদ্রু সেই ঘোড়া দেখিতে পাইয়া বিনতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিনতা, বল ত ঘোড়াটা কি রংএর?" বিনতা বলিলেন,—"সাদা"; কদ্রু বলিলেন,—"আমার বোধ হয়, ঘোড়ার লেজটা কাল।" দুই জন পণ করিলেন, যাহার কথা মিথ্যা হইবে সে দাসী হইয়া

থাকিবে। সতীন দুইটী পরদিন ঘোড়াটাকে ভাল করিয়া দেখিবেন ঠিক করিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

কদ্রু বাড়ী গিয়া নিজের ছেলেদিগকে বলিলেন,—"তোমরা কাল রূপ ধ'রে উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়ার লেজের উপর ঝুলতে থাক ; লেজটা যেন কাল হ'য়ে যায়, আমাকে যেন দাসী হ'তে না হয়।" যে সকল সাপ কদ্রুর হুকুম মানিল না তিনি তাহাদিগকে শাপ দিলেন যে "জন্মেজয় রাজা যখন সাপমারা যজ্ঞ করবেন তখন তোমরা সেই যজ্ঞের আগুনে পুড়ে মরবে।"

রাত্রি পোহাইল। সকাল বেলা কদ্রু ও বিনতা আকাশে উঠিয়া সমুদ্র দেখিতে দেখিতে তাহা পার হইয়া যেখানে উচ্চৈঃশ্রবা ছিল একেবারে সেইখানে উপস্থিত। ঘোড়াটা ধবধবে

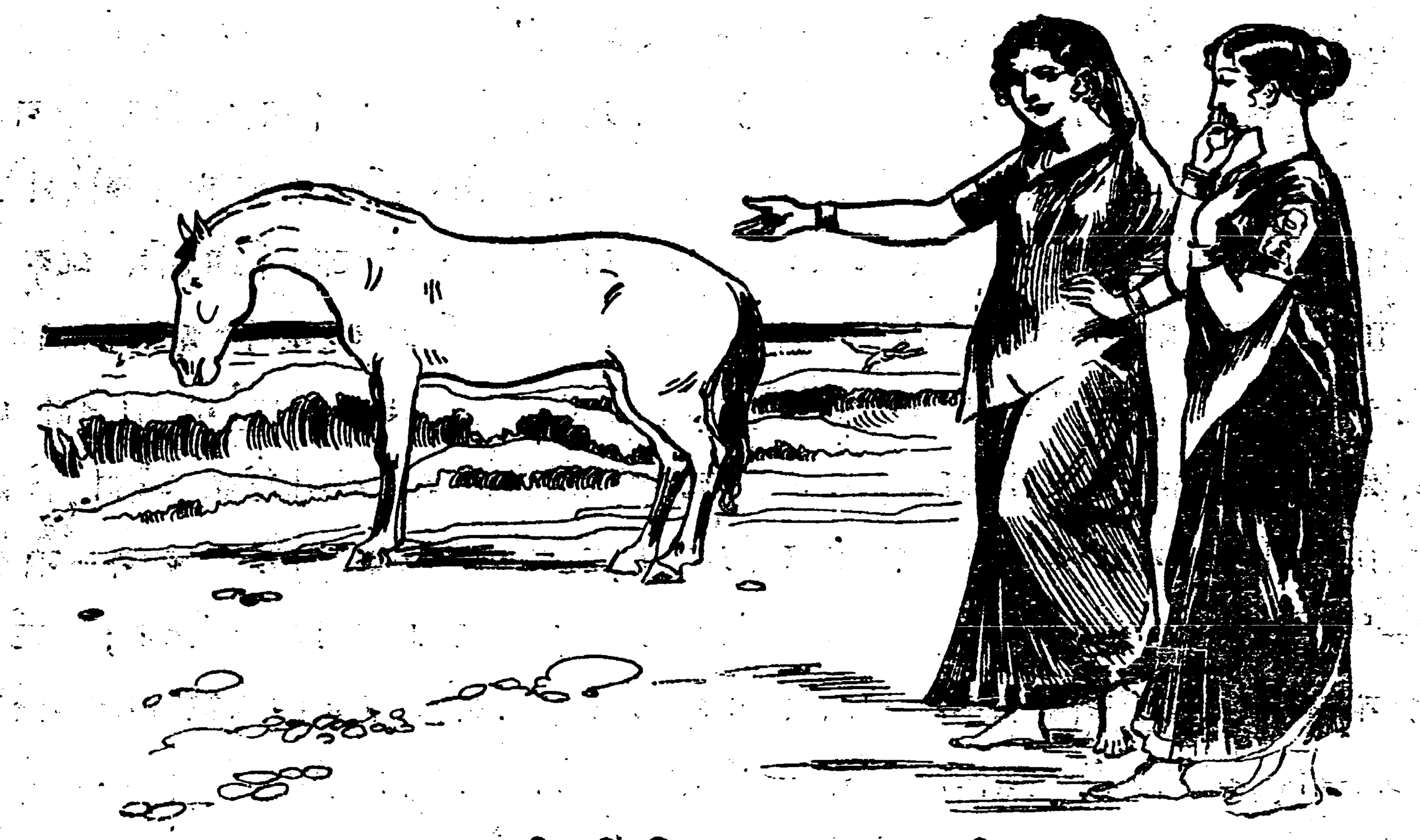

কদ্রু ত ভারী খুসী, বিনতা হতভম্ব হইয়া পড়িলেন

সাদা কিন্তু কদ্রুর কাল কাল সাপ ছেলে লেজের উপর পড়ায় লেজের রোঁয়াগুলি কাল দেখাইতে লাগিল। কদ্রু ত ভারী খুসী, বিনতা হতভম্ব হইয়া পড়িলেন।

বিনতা পণে হারিলেন, কাজেই তাঁহাকে কদ্রুর দাসীপনা করিতে হইল। তিনি দাসীগিরি করিতেছেন এমন সময় তাঁহার আর একটা ডিম ফুটিয়া গেল আর সেই ডিম হইতে বাহির হইল এক পাখী। বাহির হওয়ার পরই পাখীর শরীরটা বাড়িতে লাগিল। যেমন শরীর তেমনি তেজ ; এই পাখীই গরুড়। গরুড় জন্মাবার পরই ক্ষুধার চোটে অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং খাবার জিনিষ যোগাড় করিবার জন্য আকাশে উঠিলেন। তাঁহার



শরীর ও তেজ দেখিয়া দেবতারা পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিলেন। দেবতারা গিয়া অগ্নিকে বলিলেন—"ঠাকুর, তুমি আর বেড় না ; তুমি কি আমাদের পুড়িয়ে মারবে?" অগ্নি বলিলেন—"না হে, তোমাদের ভুল হ'য়েছে, এ আমি নই, বিনতার ছেলে গরুড় ; তোমাদের কোন ভয় নাই ; গরুড় দেবতাদিগের পক্ষে ; এস, আমরা সবাই গরুড়ের কাছে যাই।"

তখন দেবতারা আর ঋষিরা গিয়া গরুড়ের স্তব করিতে লাগিলেন। গরুড় খুসী হইয়া নিজের তেজ কতকটা সামলাইয়া লইলেন ; তারপর চলিয়া গেলেন সমুদ্র পার হইয়া মায়ের কাছে—যেখানে বিনতা কদ্রুর দাসীপনা করিতেছিলেন। একদিন বিনতা বসা এমন সময়ে কদ্রু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, সমুদ্রের মধ্যে এক সুন্দর দ্বীপে নাগেরা থাকে ; আমাকে সেখানে নিয়ে চল।" হুকুম পাইয়া বিনতা কদ্রুকে পিঠে করিয়া সেই দ্বীপে চলিলেন আর বিনতার হুকুমে গরুড়ও কতকগুলি সাপকে পিঠে করিয়া চলিলেন সঙ্গে সঙ্গে। গরুড় সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া যাইতেছিলেন ; সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ আসিয়া সাপেদের উপর পড়িল। সাপেদের ভারী কষ্ট হইল, মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হইতে লাগিল। তখন কদ্রু বৃষ্টির জন্য ইন্দ্রের স্তব করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র খুসী হইয়া আকাশ মেঘে ঢাকিয়া ফেলিলেন আর মেঘদিগকে হুকুম দিলেন,—"খুব বৃষ্টি কর।" যে হুকুম, সেই কাজ। মেঘেরা বেদম বৃষ্টি করিতে লাগিল—চারিদিক অন্ধকার, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের খেলা ; কোথায় থাকিল সূর্য্য আর কোথায় থাকিল চন্দ্র! সাপেরা ত ভারী খুসী। তাহারা মহাসুখে গরুড়ের পিঠে চড়িয়া তাহাদের দ্বীপে গিয়া পৌঁছিল। পৌঁছিবার পর তাহাদের কি স্ফূর্ত্তি! তাহারা সমুদ্র দেখিল, সুন্দর বনে মনের সুখে বেড়াইতে লাগিল। কিছুদিন পর তাহাদের ইচ্ছা হইল আর এক সুন্দর দ্বীপে যাইতে। তাহারা সেখানে লইয়া যাওয়ার জন্য গরুড়ের উপর হুকুম করিল। গরুড়ের ইহা মোটেই ভাল লাগিল না। তিনি মায়ের কাছে গিয়া বলিলেন—'মা! আমাদিগকে এই সাপগুলোর হুকুম মান্‌তে হবে কেন? বল ত শুনি।" বিনতা তখন গরুড়কে নিজের দাসীপনার বিষয় বুঝাইয়া বলিলেন। গরুড় তখন নাগদের নিকট গিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, কি করিলে আমাদের এই দাসত্ব ছোটে?" নাগেরা বলিল, "যদি তুমি নিজের বিক্রমে অমৃত আন্‌তে পার, তা হ'লেই খালাস পাবে।"

গরুড় তখন মায়ের নিকট বিদায় লইয়া অমৃতের খোঁজে চলিলেন। মুস্কিল হইল তাঁহার খোরাকটা লইয়া—কি খান? মায়ের হুকুম মত কতকগুলি চণ্ডালকেই খাইয়া

ফেলিলেন—আবার বাপের হুকুম মত খাইলেন গজ কচ্ছপকে *। আহার শেষ করিয়া গরুড় আবার আকাশে উড়িলেন। এবার উৎপাত হইতে লাগিল দেবতাদিগের উপর। স্বর্গে আগুন ছুটিতে লাগিল। দেবতাদিগের অস্ত্রশস্ত্র ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল, ইন্দ্রের বজ্র জ্বলিয়া উঠিল। মেঘ হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল। দেবতারা ভয়ে তাঁহাদের গুরু বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর, এ কিসের উৎপাত ?" বৃহস্পতি বলিলেন—"বালখিল্য ঋষিদের তপস্যায় বিনতার গর্ভে এক ভয়ানক ছেলে জন্মেছে ; তারই এই ব্যাপার। তার যে জোর, সে অনায়াসেই অমৃত নিয়ে যেতে পারে।" তখন অমৃতের ভাণ্ডার যাহাদের জিম্মায় ছিল ইন্দ্র তাহাদিগকে খুব সাবধান করিয়া দিলেন, যেন গরুড় অমৃত নিতে না পারে। ইন্দ্র নিজেও বজ্র হাতে করিয়া দেবতাদের সঙ্গে অমৃতের পাহারায় থাকিলেন। যে দেবতার যে অস্ত্র তাহা লইয়া দেবতারা অমৃতের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু গরুড় উপস্থিত হইবামাত্র সকলের কাঁপুনি আসিল। বিশ্বকর্ম্মা গরুড়ের আঁচড় কামড় খাইয়া সেখানে মারাই পড়িলেন। আর সব দেবতারও শরীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বায়ু গরুড়ের পাখায় তোলা ধুলা সরাইয়া দিয়া অন্ধকার কমাইয়া দিলেন বটে কিন্তু দেবতারা গরুড়ের যুদ্ধে টিকিতে পারিলেন না—যিনি যেদিকে পারিলেন চম্পট দিলেন। কত যক্ষেরা গরুড়ের হাতে প্রাণ দিল।

গরুড় অমৃতের কাছে গিয়া দেখেন তাহার চারিদিকে ভয়ানক আগুন। তিনি ইচ্ছামত শরীর বদলাইতে পারিতেন। হাজার হাজার মুখ করিয়া নদীর জল টানিয়া লইলেন এবং সেই জল দ্বারা ঐ আগুন নিবাইয়া দিলেন। তার পর আর এক শরীর—সোণার শরীর—ধারণ করিয়া ভিতরে ঢুকিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন একখানা ভয়ঙ্কর ধারাল চক্র সর্ব্বদা ঘুরিতেছে—যে অমৃত নিতে আসিবে চক্র তাহার গলাটা কাটিয়া ফেলিবে। গরুড় শরীরটাকে খুব ছোট্ট করিয়া চক্রের মধ্যেকার ছিদ্র দিয়া ভিতরে গেলেন কিন্তু গিয়াই দেখেন তাহার নীচে দুই ভীষণ সাপ জ্বলন্ত আগুনের মত অমৃতের পাহারায় আছে—তাহাদের চক্ষে পলক নাই—তাহাদের দৃষ্টিতেই লোক পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। গরুড় তাড়াতাড়ি ধুলা ছুড়িয়া সাপ দুইটার চক্ষু ঢাকিয়া ফেলিলেন এবং তাহাদের শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অমৃত লইয়া একেবারে আকাশে উড়িয়া পড়িলেন কিন্তু অমৃত তিনি নিজে খাইলেন না।

গরুড় অমৃত লইয়া আকাশে উড়িতেছেন এমন সময় দেবদেব নারায়ণের সঙ্গে তাঁহা

* ১৩৩৪ চৈত্র সংখ্যার 'রামধনু'তে "গরুড়ের ক্ষুধা" প্রবন্ধে ইহার বৃত্তান্ত আছে।



দেখা। নারায়ণ গরুড়ের বিক্রমে খুসী হইয়া বলিলেন—"পক্ষিরাজ, তুমি বর চাও, আমি তোমাকে বর দিচ্ছি।" গরুড় বলিলেন—"আমি আপনার উপরে থাকৃতে চাই আর চাই যেন আমি অমৃত না খাইয়াই অজর ও অমর হইতে পারি।" নারায়ণ বলিলেন,——"তাহাই হউক"। গরুড় তখন নারায়ণকে বলিলেন—"ঠাকুর, আপনিও বর চান, আমি বর দিব।" নারায়ণ বলিলেন,—"তুমি আমার বাহন

নারায়ণের সঙ্গে তাঁহার দেখা

হও"। আবার, গরুড়কে উপরে থাকার বর দিয়াছেন মনে করিয়া বলিলেন,—"আর তোমাকে থাকৃতে হবে আমার রথের ধ্বজা হয়ে।" গরুড় বলিলেন—"তাহাই হইবে।"

এদিকে ইন্দ্র ত রাগে গস্ গস্ করিতেছিলেন। তিনি গরুড়কে আকাশ দিয়া যাইতে দেখিয়া রুখিয়া আসিলেন এবং তাঁহার উপর বজ্র ছাড়িয়া দিলেন। বজ্রের ঘা খাইয়া গরুড় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেবরাজ, তোমার বজ্রে আমার কিছুই হয় নাই কিন্তু যে মুনির হাড় থেকে এই বজ্র হয়েছে তাঁর আর তোমার সম্মানের জন্য আমি একটা পালক ছেড়ে দিলাম।" ইন্দ্র তখন সেই পালকটি দেখিয়া বলিলেন, "বাঃ, কি সুন্দর ত, তোমার নাম আজ থেকে হ'ল সুপর্ণ।" গরুড়ের তেজে ইন্দ্রের তাক্ লাগিয়া গেল, তিনি গরুড়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। গরুড়ের তাহাতে আপত্তি ছিল না—দুইজনই ত কশ্যপের পুত্র, দুই ভাই। তাঁহাদের বন্ধুত্ব হইয়া গেল।

ইন্দ্রের ইচ্ছা হইল জানিতে—গরুড়ের কতটা বল। গরুড় বলিলেন, "নিজে আর

নিজের কথা কি বল্‌ব ? আমি এই গোটা পৃথিবীটাকে—মায় সমুদ্র, বন, পর্ব্বত—একটা পাখার উপর নিয়া যেতে পারি ; আর যদি তুমি এর উপর চড়, তোমাকেও সেই সঙ্গে নিয়া যেতে পারি।” ইন্দ্র বলিলেন, “তোমার সকলই সম্ভব ; এখন তুমি আমার বন্ধু হইলে ; যদি অমৃতের দরকার না থাকে, ওটা আমাকে ফিরিয়ে দাও, আর কাউকে দিলে সে আমার উপর উৎপাত কর্‌বে।” গরুড় বলিলেন, “অমৃতে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমি কাউকে দেব না, আমি যেখানে রাখ্‌ব তুমি সেখান থেকে চুপ করে নিয়ে এস।” সাপের অত্যাচারের কথা মনে করিয়া আবার বলিলেন, “তোমার কাছে আমি একটা বর চাই, এই সাপগুলা যেন আমার খাবার জিনিষ হয়।” ইন্দ্র উত্তরে বলিলেন,—“তাই হবে।” নারায়ণও এই ব্যবস্থা মঞ্জুর করিয়া দিলেন।

গরুড় ফিরিয়া মাতার নিকট গেলেন, তার পর নাগদিগকে বলিলেন,—“আমি এই কুশের উপর অমৃত রাখ্‌লাম, তোমরা তাড়াতাড়ি স্নানপূজা সেরে নিয়ে খেয়ে ফেল ; তোমরা যা চেয়েছিলে আমি তাই করেছি, তবে এখন আমার মা দাসীপনা থেকে খালাস হউন।” সাপেরা বলিল, “তাই হউক।” কিন্তু, তাহারাও স্নান করিতে গেল, ইন্দ্রও অমৃত লইয়া চম্পট। সাপেরা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—অমৃত যেখানে ছিল সেখানে নাই। তাহারা বুঝিল—যেমন চালাকি করিয়া বিনতাকে দাসী করা হইয়াছিল, অমৃতও চুরী গিয়াছে তেমনি চালাকিতে। তখন, যে কুশগুলির উপর অমৃত ছিল সাপেরা সেই কুশ চাটিতে লাগিল। তাহাতে অমৃত ত যুটিলই না, লাভের মধ্যে সাপেদের জিহ্বা ফাটিয়া দুইভাগ হইয়া গেল।

---

# “কাব্‌লীওয়ালার” দেশ

দেশটা খুব বড় নয় কিন্তু লোকগুলি খুব বড় বড়। পাহাড়, পর্ব্বত দেশে যথেষ্ট—মানুষগুলি যেমন লম্বা চওড়া, তেমনি বলবান্‌ ও সাহসী। সেকালে পাহাড়ে পথের মধ্য দিয়া কতবার যে এরা ভারতবর্ষে আসিয়া আমাদের দেশে রক্তারক্তি করিয়াছে তাহা বলা কঠিন। এদেশে মুসলমান রাজত্ব হইয়াছিল ইহাদেরই তেজে। মোগল বংশ যদিও গোড়ায় আফগানিস্থানের বাহিরের বংশ



কিন্তু কাবুলে আসিয়া আড্ডা গাড়িবার পরই কাব্‌লীওয়ালার সাহায্যে তাহাদের এ দেশে আড্ডা।

কাবুল অবশ্য আফগানিস্থানের রাজধানী কিন্তু আমরা গোটা আফগানিস্থানের লোককে এবং তাহারও বাহিরের অনেক লোককে কাবুলী বা “কাব্‌লীওয়ালা” বলি। ভাল করিয়া ব্যাকরণ পড়িলে তোমরা বুঝিবে যে “কাব্‌লীওয়ালা” কথাটা ভুল কিন্তু অনেক ভুল কথাই ত লোকের মধ্যে চলিয়া যায়—এটাও চলিয়া গিয়াছে।

আমীর আমানুল্লা

গোটা আফ্‌গানিস্থানের লোক সংখ্যা প্রায় এক কোটী, আমাদের বাঙ্গালার প্রায় ৫ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে ? সেখানকার লোকগুলি লোকের মত। আফ্‌গানিস্থানের লোক বেশীর ভাগই মুসলমান—নানা দলের মুসলমান। হিন্দুও আছে কিন্তু খুব কম। ইংরাজ অনেকবার যুদ্ধ করিয়াও আফ্‌গান জাতিকে বশে আনিতে পারেন নাই। একদিকে রুস, অন্যদিকে ইংরাজ—“কাব্‌লীওয়ালা” মধ্যে থাকিয়া বেশ সুবিধাই করিয়া লইয়াছে। দুইদলই “আমীর”কে অর্থাৎ আফ্‌গানদের রাজাকে বেশ তোয়াজ করে।

গায়ে জোর ছিল, মনে তেজ ছিল কিন্তু এতকাল কাব্‌লীওয়ালা অসভ্য জাতির মধ্যেই গণ্য হইত। সওদাগরেরা পিঠে করিয়া মোটা মোটা গাঁঠরী আনিত—আর ভারতবর্ষের দেশে বিদেশে বিক্রয় করিয়া বেড়াইত। ধারে জিনিষ দিতেও

কসুর ছিল না। টাকা আদায় করিতে লাঠীই ছিল প্রধান সম্বল। কিন্তু কাব্‌লীওয়ালার শিক্ষা ও সভ্যতার অভাব দূর করিতেছেন বর্ত্তমান আমীর আমানুল্লা।

কাবুলে কে রাজা হইবে তাহা অনেক সময়েই ঠিক করিয়া লইতে হইয়াছে অস্ত্র দিয়া। মারামারি-কাটাকাটি বিদ্যায় দুরন্ত না হইলে কেহ আফ্‌গানদের রাজা হইবার উপযুক্তই নয়। ইহার পূর্ব্বে আমীর ছিলেন হবিবুল্লা। তিনি লোক মন্দ ছিলেন না কিন্তু গোলমালে পড়িয়া লোকের হাতে মারা গেলেন। কাহার চক্রান্তে যে তিনি খুন হইলেন তাহা এখনও ঠিকমত জানা যায় নাই। তাহার পর দিনকয়েকের জন্য রাজা হইয়াছিলেন তাঁহার এক ভাই, তাহার পর এই আমানুল্লা। ইনি বাপের বড় ছেলে নহেন কিন্তু তেজে সকল ছেলের চেয়ে বড়, তাই চেষ্টা ও যোগাড়ে রাজত্ব হাতে করিয়া লইয়াছেন।

সে কি যে-সে রাজত্ব ? আফ্‌গানিস্থানে রাজা সাক্ষীগোপাল নন—তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা। আবার কড়া লোক না হইলে এই দুরন্ত জাতিকে ঠিক রাখাও চলে না। আমানুল্লা দরকার হইলে খুব কড়া আবার দরকার মনে করিলে খুব নরম।

তিনি চেষ্টা করিতেছেন 'কাবলীওয়ালা'কে পৃথিবীর বড় বড় সভ্য জাতির লোকের সঙ্গে শিক্ষায় ও সভ্যতায় সমান করিয়া তুলিতে। মুস্তাফা কেমাল পাশা যেমন তুরুষ্ককে বড় করিয়া তুলিয়াছেন * ইনিও চান সেইরকম আফ্‌গানিস্থানকে বড় করিতে। তুরুষ্কের লোকের শিক্ষাদীক্ষা আগে হইতেই অনেকটা ভাল ছিল কিন্তু আমানুল্লার হাতে ক্ষমতা অনেক—তিনি যে পুরুষানুক্রমিক রাজা, খাঁটি রাজা, দেশের একচ্ছত্র রাজা। তিনি এসিয়া ও ইউরোপের বড় বড় দেশ ঘুরিয়া আসিয়াছেন, তাহাদের কাজকর্ম্ম দেখিয়া অনেক শিখিয়াছেন। তিনি চান নিজের দেশকেও সেই রকম করিয়া তুলিতে। রাস্তাঘাট ভাল করিতেছেন, রেল বসাইবার চেষ্টা চলিতেছে। যুদ্ধের বড় বড় সামগ্রী তৈয়ার হইতেছে, তার বসিয়াছে।

* গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার রামধনু দেখ।



শিক্ষা কেবল স্বদেশে বসিয়া নয়, যাহাতে বিদেশেও বড় রকমের শিক্ষা হয় এই মতলবে রাজা ইউরোপে অনেক আফ্‌গান ছেলেমেয়েকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। মেয়েদেরকে ঘরে পর্দ্দার আড়ালে পূরিয়া রাখা তিনি পছন্দ করেন না। তাঁহার রাণী সৌরিয়া ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া বিদেশ ঘুরিয়া আসিয়াছেন আর রাজা ও রাণী দুইজনে মিলিয়া দেশের মেয়েদের ঘোমটা ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমীর কাব্‌লীওয়ালার পোষাক বদ্‌লাইবার হুকুম দিয়াছেন—তাহা চান তিনি সাহেবী ধরণের করিতে। রাজকার্য্যে পাঁচজনের মত নেওয়ার জন্যও একটা সভা করিয়াছেন। দেশে দেশে দূত রাখিয়াছেন, তাহারা অন্য রাজ্যের কাজকর্ম্ম দেখে ও তাঁহাকে জানায়।

সাবেকী লোক নূতন নিয়মে সব সময়ে সন্তুষ্ট হয় না। আফ্‌গানিস্থানে অল্পদিন হইল বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। আমীর তাহা থামাইয়া দেশটাকে আবার কতকটা ঠাণ্ডা করিয়াছেন কিন্তু আরও ঠাণ্ডা করা বাকী। থামাইতে হইতেছে কতকটা যুদ্ধদ্বারা—কতকটা লোকজনকে বুঝাইয়া। অশিক্ষিত লোকের ভাল করিতে গেলেও বিপদ্। একে ত' নূতন ভাল কাজ করিতে গেলেই টাকা লাগে। রাজা ত আর সে টাকা নিজে প্রসব করিতে পারেন না, প্রজার কাছ হইতেই যোগাড় করিতে হয় ; যাহারা না বোঝে তাহারাই চটে। পুরাতন নিয়ম তুলিয়া দিয়া নূতন নিয়ম চালাইতে গেলেও অনেকে চটে। কাবুলী মোল্লাদের দেশে যথেষ্ট ক্ষমতা—তাঁহারা বলিতে থাকেন, ধর্ম্ম গেল, রাজা কাফের হইল। কিন্তু দেশের যিনি কর্ত্তা তাঁহার কাজই ত দেশটাকে ভাল করা, দেশটাকে বড় করা। কাব্‌লীওয়ালাদের রাজা সে কাজে খুব ভাল মতই লাগিয়া গিয়াছেন। বিদ্রোহের সময়ে যখন কাবুলে খুব সঙ্গীন অবস্থা, চারিদিকে কেবল গুলি ছুটিতেছে, লোক ভয়ে কবাট বন্ধ করিতেছে, তখন আমীর সাহেব নিজেই বন্দুক ঘাড়ে করিয়া আগে বাহির হইয়া লোককে দেখাইয়া দিয়াছেন কেমন করিয়া সাহসের সহিত লড়াইয়ে যাইতে হয়। তাঁহার দৃষ্টান্তেই লোক গোলাগুলি ছুড়িয়া বিদ্রোহীদিগকে কাবুল হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। আমীর রাণীকে ও ছেলেপিলেদিগকে উড়ো জাহাজে

করিয়া কাবুল হইতে সরাইয়া কান্দাহার পাঠাইয়া দিয়াছেন কিন্তু নিজে কাবুলে থাকিয়া অটলভাবে কাজ করিয়া যাইতেছেন। দেশকে ঋড় করায় এত যে চেষ্টা সেজন্য দেশে বিদেশে তাঁহার খুব নাম পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার নিজের দেশের লোক অনেকেই বর্ব্বর, তাই তাঁহাকে এখনও ভাল করিয়া চেনে নাই।

এখন এই দেশটাকে শেষ পর্য্যন্ত ঠিক রাখিতে পারিলেই হয়। এত ব্যাপার যিনি করিতেছেন তাঁহার বয়স কত জান? মোটে ৩৬ বৎসর কয়েক মাস।

---

# হাবা

( অধ্যাপক শ্রীবিভুতিভুষণ ঘোষাল এম-এ, বি-এল )

এক গাঁয়ে একটা ছেলে ছিল—তার নাম হাবা। ভালো নাম তার একটা ছিল বই কি? কিন্তু সবাই তাকে 'হাবা' বলে' ডাক্‌তো, তাই সেইটেই চলন হ'য়ে গিয়েছিল। বিধবা মা ছাড়া তার আর কেউ ছিল না। তারা ছোট্ট কুঁড়েতে থাকতো—গাঁয়ের এক পাশে। মা চরকা কাট্‌তো, আর তা' থেকে যা' পেতো, কষ্টেসৃষ্টে তাদের দুটো পেট এক বেলা ভরতো। হাবার বয়স হ'য়েছিল পনের যোল,—কিন্তু রোজগারের চেষ্টা তার আদৌ ছিল না। সে সারাদিন রোদে খেলিয়ে বেড়াতো,—আর রাতে চ্যাটাইয়ের ওপর কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাক্‌তো। মা রোজই তাকে বোঝাতো যে, রোজগার না করলে চল্‌বে না। কিন্তু কে কার কথা শোনে? হাবার পয়সা আনবার দিকে গা-ই হোল না। তখন মা চোখ দুটো রাঙা করে' বল্লে,—"দেখ্, হাবা, যদি রোজগার না করিস্ তো আমানীও খেতে পাবি নি আর ঘর থেকে চলে যেতে হবে—বুঝ্‌লি?" হাবা বুঝলো কি না বুঝলো ভগবান জানেন। কিন্তু ধমকানি খেয়ে সে রোজগারের চেষ্টায় বেরুলো সেই প্রথম।

সেদিন সে এক চাষার ধান কতকটা কেটে দিয়ে নগদ চার পয়সা মজুরী পেলে। সন্ধ্যার সময় সে ঘরে ফিরলো। পথে একটা ছোট নদী,—তার ওপর ছিলো একটা সাঁকো। পয়সা তো কখনো রোজগার করে নি। নগদ চার পয়সা পেয়ে সে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে পয়সা লুফ্‌তে লুফ্‌তে সাঁকো পেরুতে গেলো। আর সব কটা পয়সাই টুপ্ টুপ্ করে' নদীর জলে পড়ে গেলো। মুখ চুণ ক'রে সে ঘরে ফিরে এসে কাঁদো কাঁদো হ'য়ে মাকে সব খুলে বল্লে। মা জবাব দিলে,—"দূর বোকা, পয়সা কাপড়ের খোঁটে বাধ্‌তে হয়।" হাবা বল্লে,—"পরের বার তাই কর্‌বো।"



পরের দিন সে আবার বেরুলো। গাঁয়ের দুধ যোগান দেয় যে গয়লা তার হঠাৎ অসুখ করেছিলো। সে হাবাকে দেখ্‌তে পেয়ে বল্লে,—"হাবা তুই আমার দুধ বেচে দিবি আজ। এক ভাঁড় দুধ পাবি।" হাবা তাইতে রাজী হ'য়ে গেল। বিকাল বেলা সে দুধের ভাঁড়টা কাপড়ে বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে বাড়ী চল্লো। পৌঁছাবার আগেই সবটুকু দুধ চল্‌কে' পড়ে গেলো। মা বল্লে,—"বোকা ছেলে! দুধের ভাঁড় মাথায় করে' আন্‌তে হয়।" হাবা জবাব দিলে,—"আচ্ছা, এবার তাই কর্‌বো।"

পরের দিন সে আবার সেই গয়লার কাজে গেলো। দুধ সেদিন সবটাই বিক্রী হ'য়ে গিয়েছিল। কাজেই গয়লা তাকে খানিকটা মাখন দিল। সে পাতায় ক'রে মাখনটা মাথায় বসিয়ে নিলে। পথে রদ্দুরে তা' গলে গিয়ে কতক গড়িয়ে প'ড়লো আর কতক মাথার চুলে লেগে গেলো। মা বল্লে,—"কোথাকার গাধা রে তুই? মাখন হাতে ক'রে নিতে হয়—জানিস্ না?" হাবা জবাব দিলে,—"এর পর তাই হবে।"

এবার সে একটা রুটি-ওলার কাছে কাজ পেলো। রুটি-ওলার ছিলো একটা ছোটো বেড়াল। সেটাকে সে বিদায় কর্‌তে পার্‌লে বাঁচে। তাই সে হাবাকে বল্লে,—"ত্যাখ্, হাবা, তুই যদি আমার রুটিগুলো সেঁকে দিস্ তোকে এই বেড়ালটা দেবো।" হাবা তাতেই রাজী হোয়ে গেলো। সন্ধ্যা বেলা সে বেড়ালটাকে দু'হাতের চেটোয় বসিয়ে বাড়ী যাবার পথ ধরলে। কিন্তু বেরালটা এমন আঁচড় কামড় সুরু করলে যে হাবা সেটাকে ফেলে দিয়ে রক্ষা পেলো। মা বল্লে,—"তোর উচিত ছিল দড়ি দিয়ে বেঁধে ওটাকে টেনে আনা।" হাবা জবাব দিলে,—"এবার তাই করবো।"

পরের দিন সে সকালে বেরিয়ে এক কসাইয়ের কাজে লেগে গেলো। ফেরবার সময় কসাই তাকে খানিকটা ভেড়ার মাংস দিলে মজুরী হিসাবে। হাবা একটা দড়িতে বেঁধে মাংসটুকু রাস্তার ধুলোর ওপর দিয়ে হিড়্ হিড়্ ক'রে টেনে আন্‌তে লাগ্‌লো। তার খানিকটা খেলে কাক, খানিকটা কুকুর—আর বাকীটুকু ধুলো ময়লা লেগে অখাদ্য হোয়ে গেলো। মা বল্লে,—"আঃ গাধা,—ওটা কাঁধে ঝুলিয়ে আনাই যে ঠিক ছিলো।" হাবা জবাব দিলে,—"তাই নাকি? আচ্ছা এবার আর ভুল হবে না।"

আবার সে বেরুলো তার পরের দিন রোজগারের চেষ্টায়। যেতে যেতে পুকুরঘাটে দেখলে, এক বুড়ো ধোপা এক রাশ কাপড় নিয়ে ব'সে হাপুস নয়নে কাঁদছে। সে কাছে এসে

বল্লে,—"ধোপা ভায়া, কি হ'য়েছে? কাঁদছো কেন?" ধোপা বল্লে,—"আর ভাই! ছেলেটা ভিন্ গাঁয়ে গেছে। এতগুলো কাপড় আছড়াবার শক্তি তো আমার নেই। অথচ কালই সব কেচে শুকিয়ে দিতে হবে! কি করি ভেবে পাচ্ছি না। তাই কেঁদে মরছি।" হাবা তড়াক ক'রে ব'লে উঠ্‌লো,—"তার আর ভাবনা কি? তুমি চুপ ক'রে ব'সে থাকো। আমি সব কাপড় আছড়ে ঠিক ক'রে দেবো। কি দেবে বল।" ধোপা বল্লে,—"আমার তো আর পয়সা নেই। তবে একটা খোঁড়া গাধা আছে,—সেইটে দিতে পারি। "আচ্ছা, তাই সই" ব'লে হাবা কাপড় আছড়াতে লেগে গেলো। কাজ শেষ হ'লে সে তার পাওনা গাধাটা কান রকমে ধ্বস্তাধ্বস্তি কোরে কাঁধে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে চল্লো।

হাবার বাড়ী যাবার পথে এক মস্ত জমিদার বাস করতেন। তাঁর একটি মাত্র মেয়ে—দেখ্‌তে শুন্‌তে ভালো—কিন্তু জন্মাবধি কালা আর বোবা। জমিদার মেয়ের চিকিৎসার জন্যে অনেক টাকা খরচ ক'রেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। মেয়েটিকে এ পর্য্যন্ত কেউ হাস্‌তে দেখে নি। বড়ো বড়ো কব্‌রেজেরা বল্‌ছেন যে, তাকে কেউ যদি হাসাতে পারে তো সে সেরে যাবে। জমিদার তাকে হাসাবার নানান্ ব্যবস্থা করেছেন; কিন্তু হাসাতে পারেন নি। তিনি সবাইকে ব'লে রেখেছেন, যদি কেউ তাঁর মেয়েকে হাসাতে পারে তা'রই সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন।

হাবা গাধাটাকে কাঁধে নিয়ে পথ বেয়ে চল্লো। তার চারটে পা শূন্যে ঝুল্‌ছে আর সে প্রাণপণ চীৎকার জুড়ে দিয়েছে। হাবার এদিকে গলদঘর্ম্ম হচ্ছে। জমিদারের মেয়ে জান্‌লায় চুপ কোরে ব'সে ছিলো। পথের মধ্যে হাবাকে সেই অদ্ভুত অবস্থায় দেখে সে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলো। আর তখুনি তার রোগ সেরে গেলো। সে কাণেও শুন্‌তে পেলে—মুখ দিয়ে তার কথাও ফুট্‌লো। মেয়ে সেরে উঠেছে—কাজেই জমিদারের প্রাণে খুব আনন্দ হোলো। তিনি কথামতো হাবার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন।

দুনিয়ার বোকা হাবা এখন জমিদারের জামাই। তার এখন দুমহল বাড়ী। সেখানে থাকে সে আর তার স্ত্রী। বুড়ী মায়ের দুঃখ এতদিনে শেষ হোলো। শেষ কটা দিন সে ছেলের নতুন বাড়ীতে সুখেস্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিলে। প্রথম নাতির মুখ দেখে বেশ সুখেই সে ম'লো।

---

# ছোট বোন্

( শ্রীমতী লতিকা দেবী )

কোন্ তটিনীর তীরের পথে,
কোন্ সাগরের পারে—
যেথায় আমার ছোট বোন্‌টী
নিতুই খেলা করে—

বল্‌তে হবে তোমায় আজি
তাহার ঠিকানা,
ফাঁকি দিলে চল্‌বে না আজ,
শুন্‌বো না মানা।

তেপান্তরের মাঠের মাঝে
কোন্ অজানার পাশে?—
ছোট্ট নদী যেখান দিয়ে
আপনি ব'য়ে আসে,

রাজপুত্র যায় যে দেশে
পক্ষিরাজে চ'ড়ে,
রাজকন্যা দেখে তারে
দুটী নয়ন ভ'রে,

ভোম্‌রা যেথায় উড়ে বেড়ায়
নিবিড় বনের মাঝে,
সাঁঝে যেথায় সবাই ফিরে
আপন কুলায় কাজে,

জটাই বুড়ী যায় যে পথে
গোবর ঝুড়ি নিয়ে—

রোজই তুমি বল আমায়
আসবে দুদিন পরে,
কত দুদিন গ্যাছে চ'লে
একটি দিনের তরে।

আজ্‌কে আমি মান্‌বো নাকো,
শুন্‌ব নাকো মানা
খুঁজ্‌ব তারে সেই পথেতে
যে পথ নাহি জানা।

দেখ্‌তে সেকি পায় না আমার
কাজল চোখের জল ?
পায় যদি সে, তবে কেন
করে এত ছল ?

বছর পরে বছর আসে
ঘোরন-চাকার ঘোরে,
ছোট্ট আমার বোন্‌টি কোথায়
লুকিয়ে আছে দূরে।

---

# 'রাম'-বিভ্রাট

( শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ )

গিরিশ বাবুর বয়স অনেক হইয়াছে ; কিন্তু একটিও নাতি হইল না। একি কম দুঃখের কথা ? কি আর কর্ব্বেন ? দুইবেলা দেবতাকে ডাকেন। শান্তি, স্বস্ত্যয়ন করেন। এমনি করিয়া দিন যায়, বছর যায়। অবশেষে মা-ষষ্ঠীর দয়া হইল। তাঁহার ছেলের ঘরে ছেলে দিলেন। দিব্যি ছেলে। খাসা নাক, মুখ ; খাসা চোখ—যেন সাক্ষাৎ রাজপুত্তুর। গিরিশবাবু কহিলেন, "তোমরা জানো ? স্বয়ং রামচন্দ্র আমার ঘরে এসেছেন"। সকলে কহিল, "ঠিক, ঠিক"। ছেলের নাম হইল রামচন্দ্র।



তারপর বুড়া দাদামশাই মারা গেলেন। বলিয়া গেলেন, "আমার বংশে যত ছেলে হ'বে, তাদের নামের গোড়ায় থাক্‌বে রাম, আর শেষে থাক্‌বে দেবতার নাম"। দুই বছর না যাইতেই ছেলে হইল। বাবা নাম রাখিলেন—রামশশী। এমনি করিয়া, কিছুদিন যায় আর একটা করিয়া ছেলে হয়। তিন, চার, পাঁচ, ছয়—কেবলি ছেলে, মেয়ে আর হয় না। বাড়ীর কর্ত্তা মহেশ বাবু ভয় পাইলেন। কি সর্ব্বনাশ ! এত নাম যে আর পাওয়া যায় না। এমনি কপাল, সাত বারের বারেও ছেলে হইল। মহেশ নাম খুঁজিতে বসিয়া গেলেন। রামকৃষ্ণ, রামহরি, রামশঙ্কর, রামগোপাল—চল্‌তি নামের সব কটাই তো শেষ হইয়া গিয়াছে। এবার উপায় ? ভাবিতে, ভাবিতে মহেশের মুখে অন্ন নাই, চোখে নিদ্রা নাই। কাজ গেল, কর্ম্ম গেল ; তবু কোন কুলকিনারা পাওয়া গেল না। পাড়ার যাহাকে পান জিজ্ঞাসা করেন, "ওহে একটা নাম দিতে পার, যার গোড়ায় থাক্‌বে রাম, আর শেষে থাক্‌বে দেবতার নাম ?" সকলেই মাথা নাড়ে। মহেশ মনে মনে আওড়ান—রামকার্ত্তিক, রামবরুণ, রামযম—উঁহু, কোনটাই পছন্দ হয় না। এমনি যখন অবস্থা, তখন একদিন সকাল বেলা করিম কাজির ছেলে ছলিমদ্দি দুধ বেচিয়া সেই পয়সায় চুরুট কিনিয়া মনের আনন্দে টানিতে টানিতে চলিয়াছে। মহেশকে দেখিতে পাইয়া কহিল, "কি কত্তা, অমন ক'রে বসে যে ?"

মহেশ কহিলেন,—"আরে ভাই, বড় বিপদ্।"

"কি বিপদ্ ?"

"সে শুনে তুমি আর কি করবে ? কত বড় বড় পণ্ডিত ঘোল খেয়ে গেল ?"

"তবু, শুনিই না ?"

"একটা নাম দিতে পার, যার গোড়ায় থাক্‌বে রাম আর শেষে থাক্‌বে দেবতার নাম ?"

ছলিমদ্দি কতক্ষণ কি ভাবিল। তারপর কহিল, 'খুব পারি'। বলিয়া ট্যাঁকের কাপড় থেকে চুরুটের বাক্‌সটা খুলিয়া মহেশের সম্মুখে ধরিল। মহেশ দেখিলেন লেখা আছে, 'রাম রাম'। মহেশ যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। বাড়ীতে সবাই সেদিন পেট ভরিয়া খাইল এবং নাক ডাকিয়া ঘুমাইল। কিন্তু মা খুসী হইতে পারিলেন না। মায়ের মন তো ? এমন যে ছেলে, তাহার নাম হইল কিনা রাম রাম—একটা বিশ্রী চুরুটের নাম। কিন্তু উপায় কি ?

মহেশ শাসাইয়া দিলেন—এবার যদি ছেলে হয়, সে হতভাগার কপালে আর নাম জুটিবে না। সকলে ভয় পাইল। গিন্নী কালীঘাটে জোড় পাঁঠা মানৎ করিলেন, মা কালী এবার যেন মেয়ে হয়, দোহাই তোমার। কিন্তু মা কালী কি আর সব কথা শুনিতে পান ?

এবারও ছেলে হইল। রামকৃষ্ণ ছুটিয়া বাবাকে খবর দিতে গেল। মহেশ ঠাস করিয়া তাহার গালে এক চড় কসাইয়া দিলেন।

ট্যাকের কাপড় থেকে চুরুটের বাক্সটা খুলিয়া মহেশের সম্মুখে ধরিল

মুখে যাহাই বলুন, নাম তো একটা রাখিতেই হইবে। কিন্তু দেশে থাকিয়া আর সে আশা নাই। মহেশ স্থির করিলেন, বিদেশে যাইতে হইবে। ভালো দিন দেখিয়া বাহির হইলেন। কত দেশ খুঁজিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, খুঁজিয়া ফিরিলেন; কাশী, কাঞ্চী, কনৌজ খুঁজিলেন। নবদ্বীপ গেলেন, ভাটপাড়া গেলেন। কত ন্যাড়া মাথা, ফোঁটাকাটা, টিকিধারী, দাড়িওয়ালা সাধুসন্ন্যাসীর দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিলেন। কোন ফল হইল না। অবশেষে গেলেন বর্দ্ধমানে এক জ্যোতিষীর বাড়ী। মস্ত জ্যোতিষী—মানুষের হাত দেখিয়া কতটুকু বিদ্যা, কয়টা বিবাহ, এক নিঃশ্বাসে বলিয়া দেন। মাটিতে আঁচড় কাটিয়া বয়স পর্য্যন্ত বাহির করিতে পারেন। মহেশ ছুটিয়া গিয়া একেবারে তাহার পা জড়াইয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; গণক গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে'।

মহেশ। আজ্ঞে, সে অনেক দিন, প্রভু।

গণক। তোমার হাত দাও।



মহেশ হাত দিলেন। জ্যোতিষী অনেকক্ষণ ধরিয়া এ পিঠ ও পিঠ দেখিয়া কহিলেন, 'সমূহ বিপদ দেখিতেছি'।

মহেশ। আপনি অন্তর্য্যামী প্রভু। বড্ড বিপদে পড়েছি; আমায় উদ্ধার করুন।

মহেশ সব কথা জ্যোতিষীকে বুঝাইয়া দিলেন। জ্যোতিষী খড়ি নিয়া গণনা আরম্ভ করিলেন।

সে কি গণনা! বড় বড় আঁক কষা হইল। লম্বা, চৌকা, গোল, চ্যাপ্টা নানা রকম চিত্র আঁকা হইল। সমস্ত ঘর ভর্ত্তি হইয়া গেল, দেয়াল ভর্ত্তি হইয়া গেল, ছাদ ভর্ত্তি হইয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, রাত্রি আসিল। তারপর রাত্রি গেল, দিন গেল। মহেশ পাথরের মত বসিয়াই রহিলেন। তিন দিন তিন রাত্রি পরে গণনা শেষ হইল। জ্যোতিষী চক্ষু তুলিয়া কহিলেন, 'তোমার পুত্রের নাম রামসিংহ'। মহেশ কহিল, 'কিন্তু প্রভু, সিংহ তো দেবতার নাম নয়'। ওঃ—বলিয়া গণক আবার খড়ি নিয়া বসিলেন। আবার একদিন এক রাত কোথা দিয়া কাটিয়া গেল। অবশেষে আদেশ হইল, 'শ্রবণ করো'। মহেশ হাতযোড় করিয়া রহিলেন। জ্যোতিষী কহিলেন——

সিংহ পশুর রাজা
শাস্ত্রে বলে, রাজা দেবতা
সুতরাং সিংহও দেবতা।

মহেশ প্রণাম করিয়া মাথা তুলিয়া দেখিলেন, জ্যোতিষী আবার ধ্যানস্থ হইয়াছেন। পাঁচটি টাকা রাখিয়া দিয়া তিনিও বাহির হইয়া পড়িলেন।

(ক্রমশঃ)

---

# মেয়ে ব্যারিষ্টার

ইউরোপ, আমেরিকায় মেয়ে ব্যারিষ্টারের অভাব নাই কিন্তু আমাদের দেশে এতদিন এ জিনিষটা বড় একটা দেখা যাইত না, আজকাল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ বছর বিলাতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় ২০ জন ভারতীয় মহিলা পাশ করিয়াছেন। ইঁহারা শীঘ্রই এদেশে আসিয়া কাজ আরম্ভ করিবেন।

---

# চোর ধরা

শ্রীতুর্গাকান্ত বাগ্‌চি,

সেরপুর ( বগুড়া )

সন্ধ্যাকাল—টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়্‌ছে, আকাশখানা কোন্ একখানা অজ্ঞানা হাতের কাল কাপড়ে ঢাকা। কোথাও আলোর লেশমাত্র নাই। আমাদের বাড়ীর দাবায় আমি ও আরও কয়েকজন আমার সহপাঠী ব'সে রবিবারের আমোদ উপভোগ কর্‌ছি।

ইতিমধ্যে একজন বেশ বিজ্ঞ ভাবে মাথা তুলিয়ে ধীর, গম্ভীর স্বরে বল্‌তে আরম্ভ ক'রে দিল,—"তোরা ত' গল্পেই মেতে আছিস্, আজকের দিনটার প্রতি আর ত' লক্ষ্য কর্‌ছিস্ না! আজকের দিনের মতো ভীষণ দিন এ জীবনের মধ্যে দেখ্‌তে পেলুম না।" অমনি আর একজন চেঁচিয়ে উঠলো—"আরে, এমন সুন্দর দিনটা ভীষণ হ'য়ে গেল কিসে?"

আরে, শুধুই কি বলি তোদের মাথায় কিছুই নেই? আছে শুধু গোবর ভরা। এইটুকু বুঝতে পার্‌লি না? এই রকম রাত্রিতে চোর আসার বেশী সম্ভাবনা।"

'চোর' কথাটা শুনে প্রাণ কিন্তু কেমন ছ্যাঁৎ ক'রে উঠ্‌লো। সেই ক্ষুদ্র মজলিসে সাহসী ব'লে আমিই একটু পরিচিত ছিলুম। আমার সে গর্ব্বটাকে ত বজায় রাখ্‌তে হবে। তাই একটু চাপা গলায় ব'লে ফেল্লুম—"হোক্ চোরের আমদানী, আমাদের বাড়ীতে আর আস্‌বে না।"

অমনি কালীপদ একটু হেসে বল্লে—"কেনরে, তোরা কি চোরের সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছিস্ নাকি?"



একটু তাচ্ছীল্য ভাবে ও সুরে বল্লুম—"হ্যাঁ, খেয়ে দেয়ে ত' আর কাজ নেই আমাদের, শেষে গেলুম কিনা চোরের সাথে মিতালি পাতাতে, খাসা বুদ্ধি বাবা তোর, নাকে কাণে ছিপি দিয়ে রাখিস্, নইলে উড়ে যাবে।

"আচ্ছা ধর্, যদি আজ তোদের বাড়ী আসে?"

একটু পৌরুষ-গম্ভীর স্বরে অপূর্ব্ব হিন্দী ভাষায় বল্লুম,—"গুঁতাসে কাঁটাল পাকিয়ে দেব।"

রমেশ বল্লে,—"দেখা যাবে। আজকেই যদি চোর মহাশয় তোদের বাড়ী শুভ-পদার্পণ করেন তবে হাতে কলমে পরীক্ষা হ'য়ে যাবে।"

কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি যে তারা সবাই আমাকে জব্দ করবার উদ্দেশ্যেই আজ সন্ধ্যা থেকে আমাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'য়েছে। তাই আমি বেশ জোরেই বল্লুম, "দেখিস্, দেখিস্।"

অমরেন্দ্র ছিল আমাদের মধ্যে একজন "হব্য ভব্য"। তাই আমাদের তর্ক শেষে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে পরিণত হয় দেখে বল্লে, "তোমরা যতই তর্জ্জনগর্জ্জন কর না কেন, বর্ষণ কালে কিন্তু নাস্তি। ধন্যি ছেলে, বাবা, সুধীর। তার বুকের পাটা ছিল্ল বল্‌তে হবে। নৈলে পাঁচ পাঁচটা চোরের সঙ্গে ছোকরা লড়তে পার্‌ল!"

এইখানে সুধীরের চোর ধরার ইতিহাসটা একটু বলি, কেন না তাহার কথায় আমাদের সকলেরই চোর ধর্‌বার ইচ্ছেটা হবে। পিতৃমাতৃহীন সুধীর চৌধুরী আমাদের গ্রাম্য জমিদারের নিকট অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালিত হয়ে গ্রাম্য উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কর্‌ত। একবার গ্রামে ভীষণ চোরের উৎপাত হয়। একদিন রাত্রে কয়েকজন চোর বাবুর গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, সুধীর কোন কাজে বাড়ীর ভিতর হ'তে বাহিরে আসিতেই তাদের দেখ্‌তে পায়। সুধীরটা ছিল ষণ্ডা, সে অমনি পা টিপে টিপে সেই ঘরের ভিতর ঢুকেই একটা চোরকে ঘরের এক কোণে নিয়ে জাপ্‌টে ধরেছে। অপরাপর চোরগুলো এই ব্যাপার দেখেই সবাই মিলে সুধীরকে আক্রমণ করেছে, তখন সুধীর অন্য উপায় না পেয়ে সব কটার সঙ্গে ধবস্তাধবস্তি আরম্ভ করে দিলে। ইত্যবসরে বাবু ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠেই ঘরে এইরূপ কাণ্ড দেখে ভীত, কাতর স্বরে নিজের ডালরুটিধ্বংসকারী জবরদস্ত সিং মহাশয়কে ডাকৃতে আরম্ভ করলেন। "এই, জবরদস্ত সিং, জল্‌দি ইধার আইয়ে, হামারা ঘরমে চোর ঢুকা হ্যায়।" জমিদার বাবু কোথায় হিন্দীভাষায় পাণ্ডিত্য উপার্জ্জন করেছিলেন

জানি না কিন্তু তাঁর কাতরকণ্ঠে সাহায্য-ভিক্ষা কেহ শুন্‌ল না। জবরদস্ত সিং মহাশয় বোধ হয় এই মাত্র তুলসী দাসের ভজন-গীতি শেষ করে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলেন। এদিকে হ'য়েছে কি, চোরগুলো অন্য উপায় না দেখে যে লোকটাকে সুধীর বিশেষ ভাবে ধ'রেছিল তাকে এবং সুধীরকে একসঙ্গে নিয়ে রওনা। পথে কিন্তু এক বেটা পুলিশের কৃপা-কটাক্ষে ধরা পড়ে গেল। এই ব্যাপারে গ্রামের প্রত্যেক লোকই সুধীরের প্রশংসা করে।

সেইরূপ একটা প্রশংসা পাবার আশায় আমিও সেইদিন রাত্রিতে চোর ধরবার আশায় বুক বাঁধলুম। চোরকে উপলক্ষ্য করে যে আমায় জব্দ করা সেই সান্ধ্যসভার উদ্দেশ্য ছিল তাহা তখন বুঝতে পারি নি।

* * * * * *

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছি যে, চোর আস্‌লে তাকে এই ভাবে এই কায়দায় ধর্‌ব। কিন্তু তক্ষুণি মনে হচ্ছে, আচ্ছা, যদি চোরের সিঁদকাটি দিয়ে আমায় মারে—ও বাবা! তবেই ত' গিয়েছি গো।

রাত্রি তখন ১টা, রাস্তার ধারে আমার জানলার পাশে কয়েকজন লোকের পরামর্শ শুনতে পেলুম। ইতিমধ্যে লক্ষ্য করে দেখি ঘর অন্ধকার। আমার ঘরের ভিতর থেকে দরজা খুলে একটা কি বেরিয়ে গেল। আমার ঘরের মেঝেয় যে আমাদের চাকর শু'ত সেটা কিন্তু তখন অনুমান কর্‌তে পারলুম না। লোকটা বের হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের বাক্সগুলো সব ভীষণ শব্দে নীচে পড়ে গেল। আর কি, নিশ্চয় চোর এসেছে—পাশের জানলা খুলে রাস্তায় টপ্‌কে পড়্‌লুম, সাম্‌নে দেখি এক বেটা, মাথায় বাক্স, হাতে মশাল নিয়ে দৌড়চ্ছে। সাম্‌নে একজন বেশ ভদ্র-বেশী লোক তাকে আরো জোরে যাবার জন্য তাড়া কর্‌ছে। এ নিশ্চয়ই চোর, ধর বেটাকে। এ কি! এ বেটাও যে আমার দিকে তাকিয়ে 'চোর' 'চোর' কর্‌তে কর্‌তে পড়ে গেল। আমিও একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। আর কি করি? এদিকে হাতের মশালটা মাটিতে পড়ে দপ্‌ দপ্‌ ক'রে জ্বল্‌ছিল। তার আলোতে দেখ্‌তে পেলুম যা তাতে ত' আমার জিব শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেল। এ যে মিহির, রায় বাড়ীর চাকর। যে আগে আগে যাচ্ছিল সে এই ব্যাপার দেখে আমার দিকে একেবার দৌড়িয়ে এল। অবশেষে দেখা গেল যে আমার বন্ধু মানদের দিদির বর অবিনাশ মৈত্র। এতক্ষণে আমার চোখের সাম্‌নে থেকে ঝাপ্‌সা কেটে গেল। মৈত্র মশায়ের আজ রাত্রি তিনটার গাড়ীতে কল্‌কাতা যাবার কথা ছিল—চাকর সঙ্গে নিয়ে তাই ষ্টেশনে যাচ্ছিলেন। আমার ভুলে যে আজ এতটা কাণ্ড ঘটে উঠ্‌বে তা ত' ভাবিনি। তখন আর গত্যন্ত রান দেখে—দে লম্বা। অবশেষে তাদের সোর-গোলে পাড়ার সবাই জেগে উঠ্‌ল। তারা সবাই মিলে আমাকেই চোর ব'লে সাব্যস্ত করে নিল। আমার পেছু পেছু জনকয়েক লোক ছুট্‌তে আরম্ভ করে দিল। অবশেষে আমি ধরা পড়ে গেলুম। ধরা পড়েই কি নিস্তার আছে? অমনি সবাই মিলে "বোম্বাই থেকে আমদানী করা" কীলে আমায় জলযোগ কর্‌তে দিল। আমাকে ধ'রে নিয়ে এসে সবাই আমাকে দাঁড় করাল আমাদেরই বাড়ীর সাম্‌নে। দেখি বাড়ীর সাম্‌নে বাবা, জ্যেঠামশাই প্রভৃতি দাঁড়িয়ে আছেন। আর একধারে কালীপদ, রমেশ, অমরেন্দ্র প্রভৃতি আমাকে লক্ষ্য করে কি বলাবলি কর্‌ছে, আর শুধু শুধুই হাস্‌ছে। সবাই সমস্বরে চীৎকার করে বল্‌ছে, "মার বেটাকে—মেরে ধুলো ঝেড়ে দাও। বেটা এই বয়েস থেকেই চুরি কর্‌তে আরম্ভ ক'রেছে, শেষে ত একটা ডাকাত হয়ে দাঁড়াবে।" অবশেষে দেখি সেই ভিড় ঠেলে আমাদের অবনী-দা বেরিয়ে আস্‌ছে। সে এসেই আমায় হাতে ধ'রে তুলে নিয়ে বল্ল, "আঃ, কি কর্‌ছ তোমরা, চেয়ে দেখ দেখি এ কে?" সবাই তখন "এ যে দীনেশ" বলেই মুখ কালী করে পিছিয়ে যেতে লাগল।



ভিড় থেকে কালীপদ একটু নুনের ছিটে দিয়ে বল্ল, "আহা, বেচারার আর কি কিছু আছে? ওকে সবাই গুঁতিয়ে কাঁটাল পাকিয়ে দিয়েছে।"

আমি রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে, অপমানে শেষ হয়ে এক দৌড়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেলুম। সবাই পিছু থেকে বল্‌তে লাগ্‌ল, "যাস্‌নি, শুনে যা, ব্যাপার কি বলে যা।" আর কার কথা কে শোনে? বাড়ীর ভিতর থেকে শুন্‌তে পেলুম, যে হতচ্ছাড়া ছোক্‌রা প্রথমে আমাদের সেই মজ্‌লিসে চোরের কথা তুলেছিল সেই হাঁদা গঙ্গারাম গণেশচন্দ্র বল্‌ছে, "ব্যাপার আর কিছুই নয়, দীনেশ আজ নিশ্চয়ই চোর ধর্‌বে স্থির করে শুয়েছিল। মাঝ-রাত্রিতে স্বপ্ন দেখে দৌড়ে এসে মিহিরকে চোর ভেবে ধরে'ছে।"

* * * * * *

পরদিন স্কুলে গেছি। যেই টিফিনের বেল পড়েছে, অমনি রমেশ এসে আমার গা টেপা আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। অমনি কালীপদ পেছন থেকে বলে উঠল, "ও কি করছিস্‌ রে?"

"কাঁটালটা কাল যে গুঁতন খেয়েছে—আজ পেকেছে কিনা তাই দেখ্‌ছি।"

# সন্ধ্যা

শ্রীজ্যোৎস্না দেবী
( বহরমপুর )

সোণার রথে চড়ে রবি
ঐ যে গেল চলে,
নীল সাগরের তলে যেথায়
নূতন আলো ঝলে।

ডুব্‌তে দেখে সন্ধ্যা রাণী,
ছড়িয়ে দিলে আঁচল খানি,
মাঠে নেমে এল,

যেখান দিয়ে যাচ্ছে রাণী,
রঙ্গিয়ে তার তুলিখানি
ক'রে দিল কাল।

গরুর পাল সঙ্গে ক'রে,
রাখাল ছেলে লেজটী ধ'রে,
গান গেয়ে যায়,

কৃষক হাল কাঁধে ক'রে,
সারাদিনের কার্য্য সেরে,
বৃষ নিয়ে ধায়।

থাম্‌ল অই, মধুর গান,
পাখী সব ছাড়ল তান,
গাছে ফিরে এল,

সুরু হ'ল পেঁচার ডাক,
শিয়াল গুল দিচ্ছে হাঁক,
টেকা দায় হ'ল।



ঘরে থেকেই খুকু বাবু,
খেলা ছেড়ে খোকন বাবু,
বাড়ী ফিরে এল,

মন্দিরেতে দীপ জ্বল্‌ল,
কাঁসর ঘণ্টা ঐ বাজল,
ঐ যে শোনা গেল।

মা খুড়ি সব আঙ্গিনায়,
গড় ক'রে তুলসী তলায়,
প্রদীপ এল রেখে,

ঠাকুরমারা নাতি নিয়ে
গল্প বলেন পা ছড়িয়ে
মহাভারত রেখে।

উঠ্‌ল ডাকি ঝিঁ ঝি পোকা,
বইটা নিয়ে বস্‌ল খোকা,
ঠাণ্ডা হ'ল ঘর,

ঠাকুমা এই ছাড়া পেয়ে,
বসছে গিয়ে মালা নিয়ে,
ঘোরাচ্ছে ঐ কর।

সোণার রথে চড়ে রবি
ঐ যে গেল চলে,
নীল সাগরের তলে যেথায়
নূতন আলো ঝলে।

## মেয়ের মত মেয়ে

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর নাম এখন গোটা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনি বাঙ্গালীর মেয়ে—তাঁহার পিতা ৺ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ঢাকা জেলার লোক—হায়দরাবাদ রাজ্যে গিয়া কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। সেদেশে ডাঃ নাইডুর সহিত বিবাহ হওয়ায় বাঙ্গালীর মেয়ে নাইডু হইয়া গিয়াছেন। ইংরাজী কবিতা লিখিয়া সরোজিনী খুব নাম করিয়াছিলেন। তাহার পর কংগ্রেসের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেখানেও খুব নাম করিয়াছেন। ইনি যেমন লিখিতে, তেমনি বক্তৃতা করিতে পটু—আবার মন যেমন কোমল, মানুষটী তেমনি বেপরোয়া। আজকাল ইনি আমেরিকায় গিয়া বক্তৃতা দিতে-

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

ছেন। আমেরিকার লোক বুঝিতেছে——হাঁ, ভারতবর্ষেও মেয়ে লোকের মত মেয়ে লোক আছে। সেখানকার লোক টাকা দিয়া ইহাঁর বক্তৃতা শুনিতেছে। এক একটী বক্তৃতার দাম কত জান? ১৫০০৲ টাকা।



## কলিকাতায় বিরাট্ ব্যাপার

এবার বড়দিনের বন্ধের সময় কলিকাতায় খুব ধুমধাম হইয়া গিয়াছে। ভারতের জাতীয় মহাসভা আর তার সাঙ্গোপাঙ্গ কত ছোট বড় সভা, গণিতেই মাথা ঘুরিয়া যায়। জাতীয় মহাসভার সভাপতি হইয়াছিলেন এলাহাবাদের নামজাদা উকীল পণ্ডিত মতিলাল নেহ্রু। চৌত্রিশ ঘোড়ার গাড়ীতে তাঁহাকে হাবড়া ষ্টেশন হইতে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। বড়লাট সাহেবের গাড়ী টানে ৮টা ঘোড়ায়। ঘোড়ার উপর বাঙ্গালী ভলাণ্টিয়ার সওয়ার—নূতন রকমের দৃশ্য বটে। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু হইয়াছিলেন ভলাণ্টিয়ার দলের সেনাপতি। যেখানে সভাসমিতি বসিয়াছিল তার নাম দেওয়া হইয়াছে দেশবন্ধু নগর—স্থানটী লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। এখনও সেখানে মেলা হইতেছে—নানা জায়গায় তৈয়ারী নানা রকমের জিনিষ দেখান হইতেছে!

## মিষ্টি কাজ

যে কাজটির কথা বলিতেছি সেটা করিতে কাহারও আপত্তি থাকিবে এতবড় বেরসিক বোধ হয় কেহ নাই, কাজটা আর কিছু না—লজেন্স চাখা। তোমরা হাসিতেছ, কিন্তু বাস্তবিকই আমেরিকার সরকারে ঠিক এই রকম একটা কাজ আছে। দেশে যত লজেন্স, চকোলেট্ প্রভৃতি তৈরী হয় তাহা চাখিয়া তাহাদের কোন্টা ভাল কোন্টা খারাপ, কোনটার দাম কত হওয়া উচিত—এই সব ঠিক করিবার জন্য একজন লোক রাখা হইয়াছে। এই কাজ পাইয়াছে একটী মেয়ে; তাহার নাম মিস্ ক্যাথরিণ কারবাইন। আগে খবর পাইলে তোমরাও এক একটা দরখাস্ত করিয়া দিতে, নয় কি?

## কলিকাতার দুধ

আমাদের কলিকাতা সহরটার মধ্যে রোজ কতখানি করিয়া দুধ খরচ হয় জান? হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে সবশুদ্ধ প্রায় ৩ হাজার মন। তাহার মধ্যে ১ হাজার মন কলিকাতা সহরের গোয়ালার কাছেই পাওয়া যায়। প্রায় হাজার মন পাওয়া যায় কলিকাতারই আশে পাশে হইতে, বাকীটা আসে রেলে। এই হিসাবে লোক পিছু গড়ে পৌনে দু'ছটাক দুধ খরচ হয়।

## কাচের মত লোহা

ডাক্তার কার্ল মুলার নামে জার্ম্মেণীর এক বৈজ্ঞানিক একখানা লোহার পাতকে কাচের

মত স্বচ্ছ করিয়াছেন। পাতটা এত পাতলা যে সেটাকে শূন্যে ঝুলাইয়া বাতাস করিলে জলের মত নড়িতে থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা এই নতুন ধরণের ইস্পাতকে নানারকম কাজে লাগাইবেন বলিয়া আশা করিতেছেন।

## লাঠি না ক্যামেরা ?

আমেরিকার কোন কোন সহরে আজকাল পুলিশ এক রকম অদ্ভুত লাঠি ব্যবহার করে। লাঠির ভিতর ছোট্ট একটা ক্যামেরা বসান থাকে, বাহির হইতে তাহা দেখা যায় না। ভিড়ের মধ্যে কাহারও ছবি লইতে হইলে পুলিশ অনায়াসে লাঠি তুলিয়া ধরিয়া সকলের অসাক্ষাতে ফটো তুলিয়া লইতে পারে। লাঠির একদিকে একটা বোতাম থাকে, সেটা টিপিলেই ক্যামেরার মধ্যে ফটো উঠে। ফটো যদিও খুব ছোট হয় কিন্তু সেটাকে ইচ্ছা করিলেই এনলার্জ্জ করিয়া লওয়া চলে। এই লাঠি-ক্যামেরায় একসঙ্গে পর পর ২০।২৫ খানা ছবি তোলা যায়।

## কর্দ্দম বৃষ্টি

কিছুদিন আগে নিউজিল্যাণ্ডে ভারী মজার এক রকম বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। একদিন বিকালে হঠাৎ সমস্ত আকাশ অন্ধকার হইয়া গেল, তারপর আরম্ভ হইল বৃষ্টি। কিন্তু সে বৃষ্টিতে জল পড়িল না, পড়িতে লাগিল পাতলা কাদার গোলা। বৃষ্টি থামিলে দেখা গেল সমস্ত বাড়ীর ছাদ, রাস্তা, গাড়ীঘোড়া সব জিনিষের উপর কাদার পর্দ্দা জমিয়া রহিয়াছে। বছর পঁচিশেক আগেও নাকি সেখানে একবার এই ধরণের ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

---

# গতমাসের ধাঁধার উত্তর

পদ্ম, লোচন, নাগ, পালটা, বেশ, ভাল, পরশু, গুলি, হর, পাই, বার, জোনাকি, থাকা, জমি, দার, হার, মে, হিত, হের, বার্ত্তা, তুলি, জটা, ছাই, পা, আর, ভাব।

---

# উত্তর দাতাদিগের নাম

## যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—

অরুণা দেবী ( পাটনা ), আশারাণী, অশোক, ক্ষেমময়, বিমল, সুষমাময়, অনু, শোভা, জনু, বানু, প্রীতু, বিজু, তুলু, হিরণ, ও জ্যোতি ( কলিকাতা ); হিমাংশুকুমার নিয়োগী ( জলপাইগুড়ী ), অমিয়া, ইন্দিরা ও অশোক মিত্র ( জামসেদপুর ), কমল, কৃষ্ণ, কুঞ্জ, লাবণ্য ( ইটালি, কলিকাতা ), সুনন্দা ভৌমিক ( রংপুর ), আভারেণু দেবী ( রংপুর ), গুণদা মুখার্জ্জী ( দিল্লী ); মিলন মালা ঘোষ ( ভবানীপুর, কলিকাতা ); শিশিরকুমার রায় ( বসিরহাট ), যশোমাধব সাহিত্য সঙ্ঘের সভ্যগণ ( ধামরাই ), পারিজাত-রেণু দেবী ( মহিমাগঞ্জ ), কিশোর লাইব্রেরীর পরিচালকগণ ( শ্রীরামপুর ), শান্তি, প্রতিভা ও অমল সেনগুপ্ত ( এলাহাবাদ ), বাণীকান্ত ভট্টাচার্য্য উষা, উমা, কনক, মনি ও চন্দ্রকান্ত ( কলিকাতা ), আশুতোষ চৌধুরী, সন্তোষ, ভুটু, মন্তি, ধপু, মানি, মুমু ও ড্যাংপি, সুধাংশুকুমার দত্ত ( জব্বলপুর ), পুষ্প, অজু ও গিরু ( ডাল্টনগঞ্জ ), সুধীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ( পাহাড়পুর ), গোকুলানন্দ দাস ( রংপুর ), সাধনাপ্রসাদ দাসগুপ্ত ( দমদম্ ), উত্তর বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমস্থ ঋষি বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ ( বগুড়া ), মুকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ( কলিকাতা ), রাধিকামোহন মৈত্র ( ঘোড়ামারা, রাজসাহী )। ইহা ছাড়া হাওড়া হইতে একজন নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন কিন্তু চিঠিতে তাঁহার নাম পাওয়া গেল না।

## যাঁহারা আংশিক উত্তর দিয়াছেন—

লক্ষ্মী দেবী ( সাওগাঁ ), সলিল বর্দ্ধন ( নেত্রকোণা ), শিবপদ সেনগুপ্ত ( বাইশরশি, ফরিদপুর )।

---

# নূতন ধাঁধা

**সঙ্কেত**ঃ—নীচে কতকগুলি শব্দ পর পর সাজান আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি অক্ষর বড়। এই বড় অক্ষরগুলি সাপের মত আঁকা বাঁকা ভাবে বসান আছে,—আর উপর নীচে পড়িলে হয়—একজন লোকের নাম,—"হরিপদ"।

**হ**রিণ
স**রি**ষা
কল**প**
ক**দ**লী

অমরা নীচে এই রকম আরও দুটি ধাঁধা দিলাম। তাহাতে যে শব্দগুলি দেওয়া হইল, তাহাদের ঠিক মত এক একটা প্রতিশব্দ বসাইয়া এই রকম আঁকা বাঁকা ভাবে উপর নীচে পড়িলে এক একটা নাম পাইবে। ইহাকে ইংরাজীতে বলে—Zig Zag puggle।

১। রামচন্দ্র
একটি বড় সংখ্যা
রূপ
নীচাশয়
মুক্ত করা
বড়
খাবার জিনিষ

শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

২। ছেলেদের খেলিবার জিনিষ
সাহেবদের দেশ
একটি ফল
ধোপা
পড়া
ফুলের নাম
রোগের নাম
শোওয়া

ভেল্কিরাম

উপরের ২টি ধাঁধারই সবগুলি কথা তিন অক্ষরের। যে নাম ২টি পাওয়া যাইবে সে ছুইটিই ভারতের খুব নামজাদা ছ'জন লোকের নাম।

**খ**

নীচে যে খালি স্থানগুলি আছে সেগুলি পূরণ করিতে হইবে। প্রথম লাইনে যে কথাটা বসিবে, নীচের লাইনে বসিবে ঠিক সেটাই উল্টা করিয়া; যেমন প্রথম লাইনে যদি বসে 'দাস' নীচের লাইনে বসিবে 'সদা'—

১। সবাই মিলে——দেখে যাত্রা শুভকর
কিংবা সবে——বলে লোটা কম্বল ধর।
২। দেবের কাছে——পাওয়া অত সহজ নয়
——করলেই বর কি মেলে? কক্ষনো তা নয়।

ভেল্কিরাম

## রামধনুর পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

এবার যে কয়েকটী গল্প পাওয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষার পর নিম্নলিখিতরূপ পুরস্কার দেওয়া স্থির হইল—

১ম পুরস্কার (রৌপ্যপদক)—শ্রীসাধনা প্রসাদ দাসগুপ্ত, গ্রাহক নং ১০৬
২য় পুরস্কার (৬৲ টাকার বই)—শ্রীঅমলেন্দু সরকার, গ্রাহক নং ১৫৯
৩য় পুরস্কার (৩৲ টাকার বই)—শ্রীপ্রভাতকুমার বসু, গ্রাহক নং ১৫০

রামধনুর বর্ত্তমান বর্ষেও প্রতিযোগিতা পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যাইবে। আশা করি এবার গ্রাহক গ্রাহিকারা দ্বিগুণ উৎসাহে প্রবন্ধ লিখিতে বসিবেন এবং যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যায় তাহার মধ্যেই সকলগুলি লেখা আসিয়া পৌঁছিবে।

চিত্রে বিদ্যাসাগর-জীবনী
(১) "এঁড়ে বাছুরের" জন্মবার্ত্তা

[শেষ পৃষ্ঠায় চিত্র-পরিচয় দেখ]

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE

২য় বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৩৮ { ২য় সংখ্যা

# জ্ঞানরাণী

[ শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য ]

এস গো উজলি চিত্তটি, জ্ঞানরাণী ওগো নন্দিতা,
অজ্ঞান-তমঃ-কুজ্ঝটি দীপ্তিতে তব লুপ্ত হোক্ ;
সুপ্ত জীবনে জাগ্রত কর গো, বিশ্ব-বন্দিতা,

চন্দন-ফুল-চর্চ্চিত চরণে তোমার লুটুক্ প্রাণ,
পরাণ ভরিয়া আজ তব বন্দন-ভরা উঠুক্ গান।

এস এস হৃদি-পঙ্কজে উজলি' কাব্য-কুঞ্জবন,
চরণ ঘেরিয়া গন্ধাকুল জুটুক আসিয়া ভক্তালি ;
মৌ-আশে জুটি' চৌ-পাশে তুলুক্ নিত্য গুঞ্জরণ।

চন্দন-ফুল-চর্চ্চিত চরণে তোমার লুটুক্ প্রাণ,
পরাণ ভরিয়া আজ তব বন্দন-ভরা উঠুক্ গান।

অশ্রু-শিশিরে ঝল্‌মলি' উঠুক্ তোমার হেম-কিরণ,
নয়নে জাগায়ে রূপ-শোভা, পরাণে বুলা'ক্ শান্তিটুক্ ;
লীন হ'য়ে শেষে তা'র মাঝে লভুক্ সে নীর ক্ষেম-হিরণ।

চন্দন-ফুল-চর্চ্চিত চরণে তোমার লুটুক্ প্রাণ,
পরাণ ভরিয়া আজ তব বন্দন-ভরা উঠুক্ গান।

বীণাটির সুরে ঢেউ তুলে' ছেয়ে যাক্ দূর-নীল-সীমা,
বিশ্বের সারা বুক ভরি ছন্দিত তারি ঝঙকৃতি—
ঘুমায়ে পড়ুক্ শ্রান্ত গো, অন্তরে লভি' মিল্‌টি, মা।

চন্দন-ফুল-চর্চ্চিত চরণে তোমার লুটুক্ প্রাণ,
পরাণ ভরিয়া আজ তব বন্দন-ভরা উঠুক্ গান।

এস গো উজলি' চিত্তটি, জ্ঞানরাণী জ্ঞান অঙ্কিতা,
কনক-কিরীট-দীপ্তিতে পুলকি কাব্য-কুঞ্জবন—
অযুত-ভক্ত-বৈতালী, কল-ঝঙ্কার-ঝঙ্কৃতা,

চন্দন-ফুল-চর্চ্চিত চরণে তোমার লুটুক্ প্রাণ!
পরাণ ভরিয়া আজ তব বন্দন-ভরা উঠুক্ গান!

---

# কেরোসিন তেল কোথা হইতে আসে

( শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য )

কেরোসিন তেলটা আজকাল আমাদের বিশেষ দরকারী জিনিষগুলির মধ্যে একটা। বড় বড় সহরের কথা ছাড়িয়া দাও—সেখানে হয়ত ইলেকট্রিক আর গ্যাসের আলোতেই অনেক কাজ চলিয়া যাইতে পারে—কিন্তু সহরের বাহিরে আসিলেই তোমাকে এই কেরোসিন তেলের শরণ লইতে হইবে। কেরোসিনের লণ্ঠন ছাড়া অন্য আলোর কথা আমরা যেন ভাবিতেই পারি না। আরও কত কাজে যে কেরোসিনের দরকার তাহার হিসাব নাই।

কিন্তু এই যে কেরোসিন তেলটা—এটা কোথা হইতেই বা আসে আর কেমন করিয়াই বা তৈরী হয়, সে খবর বোধ হয় অনেকেই রাখ না। আজ তাহারই কিছু তোমাদের বলিব।

কেরোসিনকে হিন্দুস্থানীরা বলে "মট্টীকা তেল" ; হঠাৎ শুনিলে মনে হইবে দেখিতে নোংরা বলিয়া বুঝি এই নামকরণ, কিন্তু আসলে তা নয় ; কেরোসিনের জন্ম মাটীর তলায়, তাই এই নাম।

কেরোসিন তেলের প্রথম আবিষ্কার হইয়াছিল আমেরিকায়। সেখানে মাটীর তলা হইতে মাঝে মাঝে এক রকম তরল তেলের মত জিনিষ বাহির হইত, জিনিষটা যে আসলে কি তাহা কেহই জানিত না। কয়লার মধ্যে, পাথুরে জায়গা হইতে বাহির হইত বলিয়া লোকে ইহাকে বলিত পেট্রোলিয়াম্ বা 'পাথুরে তেল'। আমেরিকার অসভ্য জা'তেরা পরম আনন্দে এই তেল লইয়া সারা গায়ে মাখিত—আর বলিত ইহাতে নাকি তাহাদের শরীর খুব সুস্থ থাকে।

অসভ্যদের দেখাদেখি সাহেবেরাও শেষে পেট্রোলিয়াম্ গায়ে মাখিতে সুরু করিল। তখন দেখা গেল জিনিষটা বাতের পক্ষে বেশ ভাল ওষুধ। কিন্তু ওষুধ ভিন্ন এর মধ্যে যে আর কোন গুণ থাকিতে পারে তাহা কেহ ভাবিয়া দেখে নাই।

ইহার কিছুদিন পরে ভার্জ্জিনিয়া নামে আমেরিকার একটা জায়গায় এক কাণ্ড দেখা গেল। মাটীর তলায় পাথরের মধ্যেও যে লবণ পাওয়া যায় তা বোধ হয় তোমরা অনেকেই জান। মাটী খুঁড়িয়া গভীর গর্ত্ত করিয়া তবে সে লবণ তুলিতে হয়। একদল লোক লবণের আশায় মাটী খুঁড়িতেছিল, খোঁড়া শেষ হইলে দেখে নীচে লবণের সাথে এই পাথুরে তেলটা বিশ্রীভাবে জড়াইয়া আছে,—কি আপদ্ দেখ দেখি,—লবণটা ত' গেলই, তার উপর এতগুলি পাথুরে তেল—এগুলি দিয়াই বা কোন্ কর্ম্মটা হইবে ?

এতগুলি জিনিষ নষ্ট হইবে? তাকি হয়? তখন চেষ্টা আরম্ভ হইল—আচ্ছা, জিনিষটাকে ওষুধ ভিন্ন আর কোনও কাজে লাগান যায় না ? পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল—এর খানিকটা অংশ দিয়া আলো জ্বালান চলিতে পারে।

এই সময় পেস্‌নার নামে এক সাহেব কয়লা হইতে ভারী চমৎকার একটা তেল বাহির করিয়া ফেলিলেন। আলো জ্বালাইবার কাজে তেলটা খুবই সুবিধার। তিনি ইহার নাম দিলেন 'কেরোসিন'। কেরোসিন বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে তার ভয়ানক কদর আরম্ভ হইল। সকলেই কেরোসিন চায়, অথচ অত তেল যোগাড় করাও হইল মুস্কিল। তখন এক পণ্ডিত ভাবিলেন, আচ্ছা, পেট্রোলিয়ামের তেলটার সাথে কি জিনিষটার কোন মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ? যা ভাবা তাই। নানা রকম পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল পেট্রোলিয়ামের মধ্যে এই কেরোসিন তেল প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে।

তখন লোকে ছুটিল পেট্রোলিয়াম্ যোগাড় করিতে। কর্ণেল ড্রেক্ নামে এক ভদ্রলোক হইলেন এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী। 'খোঁজ, খোঁজ' করিয়া সারা দেশ খুঁজিয়া পাতিয়া শেষে তিনি এক মস্ত খনি বাহির করিয়া ফেলিলেন !

দেখিতে দেখিতে এই অদ্ভুত তেলের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। যাহারা চালাক লোক তাহারা আগে আগে আসিয়া খনির আশেপাশের জায়গা যে যতটা পারিল কিনিয়া লইল। যেখানে এতদিন ছিল ২।৩ শ' লোক, দুই মাসের



মধ্যে দেখা গেল সেটা একটা প্রকাণ্ড সহর হইয়া দাঁড়াইয়াছে—আর লোক-সংখ্যা ঠেকিয়াছে গিয়া প্রায় ১৫ হাজারে। এমনি করিয়া কেরোসিনের ব্যবসা সুরু হইল।

আজকাল আমেরিকায় খনির সংখ্যা আরও অনেক বাড়িয়াছে। এই কেরোসিন বিক্রী করিয়া সেখানকার লোকেরা কোটি কোটি টাকা রোজগার করিতেছে।

পেট্রোলিয়ামের খনি যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন সে এক বিরাট্

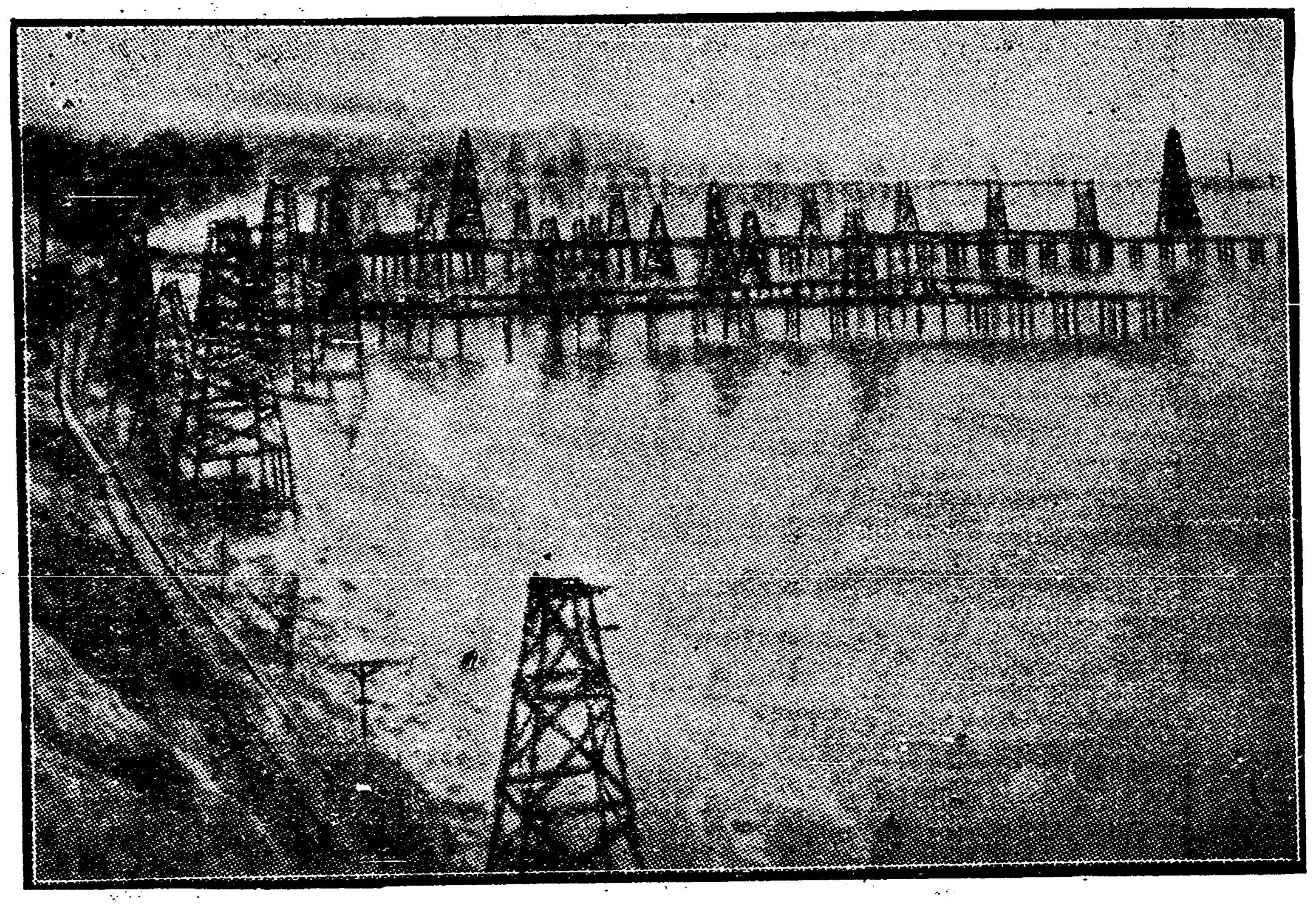

সমুদ্রের তলায় অনেক পেট্রোলিয়াম্ পাওয়া যায়। এই সব খনির সাহায্যে তাহা তোলা হয়

ব্যাপার। এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় তেল পাঠাইবার বন্দোবস্তও অদ্ভুত রকমের। প্রথম প্রথম বড় বড় পিপার মধ্যে করিয়া তেল চালান দেওয়া হইত কিন্তু তাহাতে অসুবিধা দেখিয়া আজকাল কি করা হয় শুনিবে ? মাটীর তলা দিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নল বসাইয়া তাহার মধ্য দিয়া তেল ঢালিয়া দেওয়া হয়। সে নলের এক একটা অনেক সময় তিন চারশ' মাইল,—অর্থাৎ প্রায় কলিকাতা হইতে

দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত লম্বা। শুধু পেনসিলভিনিয়া জায়গাটায়নাকি যত নল আছে, সব একত্র করিয়া যুড়িলে ২৫ হাজার মাইল লম্বা জায়গা যুড়িয়া যায়। ভাবিয়া দেখ কি বিরাট্ কাণ্ড।

খনি হইতে পেট্রোলিয়াম্ তোলা হইলে সেটাকে লইয়া যাওয়া হয় কারখানায়। তার পর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দৈত্যের মত কলকব্জা, চুল্লী প্রভৃতি খাটাইয়া তাহা হইতে কেরোসিন বাহির করা হয়।

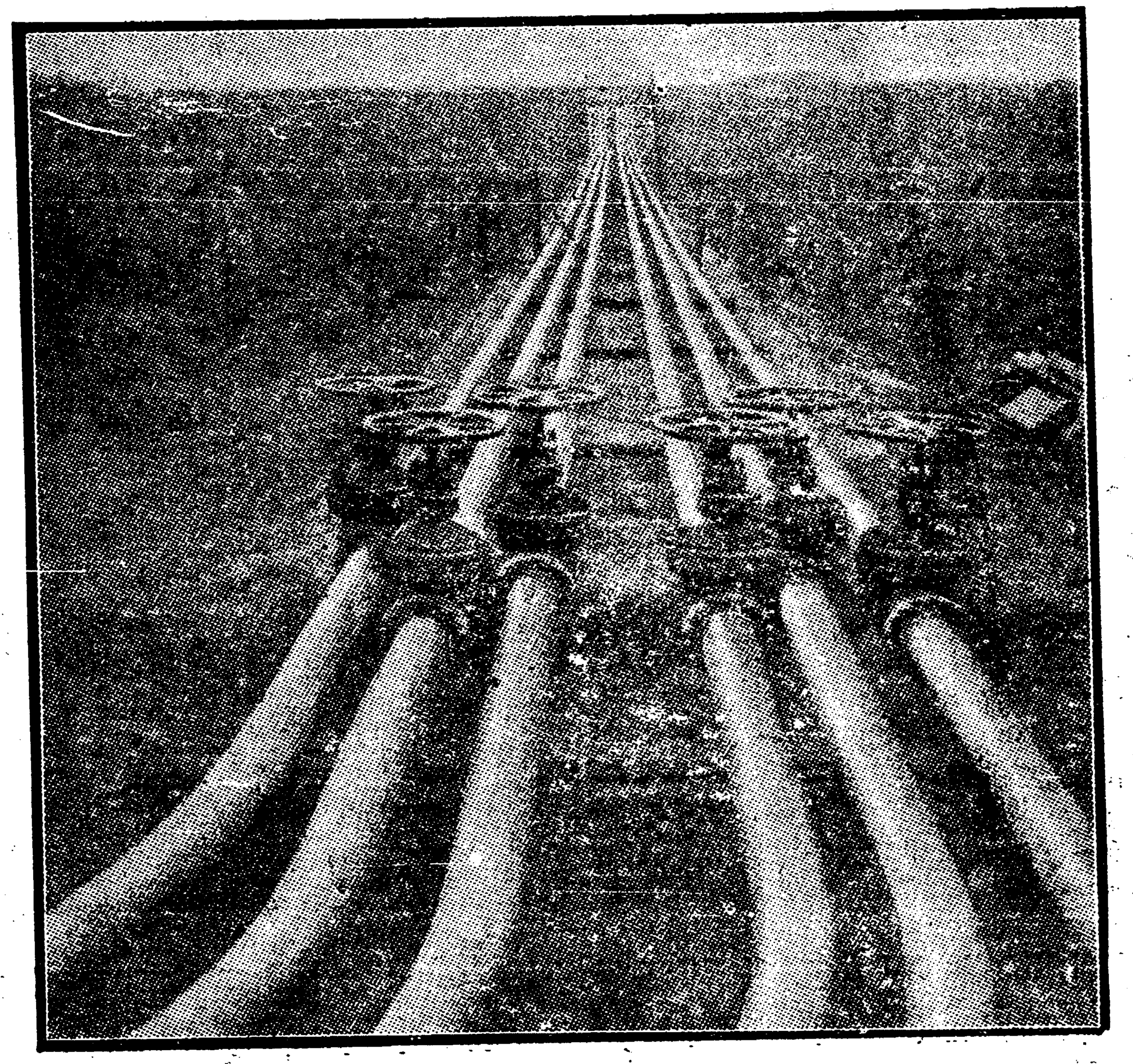

কলিকাতা হইতে প্রায় দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত লম্বা তেলের নল

পেট্রোলিয়াম্ হইতে যে শুধু কেরোসিন তেলই তৈরী হয় তাহা নহে। পেট্রোলিয়াম্‌কে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া পণ্ডিতেরা আরও নানা রকম দরকারী জিনিষ তৈরী করিতেছেন। সেগুলির এক একটা এক এক রকম বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ে লাগান



হয়—ভেসেলিন, গ্যাসোলিন, মোমবাতি, মোটরের তেল প্রভৃতি, আরও কত রকম জিনিষ।

কেরোসিনের খনিতে মাঝে মাঝে আর একটা দৃশ্য দেখা যায়। সে বড় ভয়ানক ব্যাপার। বড় বড় পুকুরের মত সব চৌবাচ্চা বোঝাই তেল রহিয়াছে—হঠাৎ হয়তো কাহারো অসাবধানতার জন্য তাহাতে একটু আগুন লাগিয়া গেল। বাস্! তারপরে সে অগ্নিকাণ্ড থামাইবার ক্ষমতা কাহারও নাই। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, সে আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকিবে। সবটুকু তেল না নিঃশেষ করিয়া থামিবে না।

পেট্রোলিয়াম্ পাথুরে জায়গায় পাওয়া যায় কিন্তু কি করিয়া সেখানে সেটা জমে তাহা বলি নাই। এ বিষয়ে বড় বড় পণ্ডিতেরা নানা কথা বলেন। কেউ কেউ বলেন মাটীর তলায় বহু নীচে যেখানে কয়লার সহিত নানা রকম ধাতু মিশিয়া আছে—দারুণ উত্তাপে টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে—তারই মধ্যে ফুটন্ত জল লাগিয়া ভাঙ্গিয়া চূরিয়া এই কাণ্ড। আবার অনেকে বলেন, মাটির তলায় লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার গাছপালা, মাছ, নানা রকম জন্তু প্রভৃতির দেহ পচিয়া রহিয়াছে—আর উপর হইতে তাহার উপর দারুণ চাপ পড়িয়া আস্তে আস্তে সে গুলিকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া এই অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে।

শুধু আমেরিকা নয়, পৃথিবীর নানা জায়গায় এই পেট্রোলিয়াম্ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে রুষিয়া ও ব্রহ্মদেশ দুটি নাম করা জায়গা।

---

## দৈত্যের কথা

( শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার )

ভীমগাঁয়ের পাহাড়েতে এক যে ছিল দত্যি,<br>
একদিন তার হোল জ্বর ; কি করবে সে পথ্যি !<br>
টিপে নাড়ী দেখে জিভ্ বদ্দি হতভম্বা ;<br>
খাওয়ার লোভে বেড়েছে জিভ্—আড়াই হাত লম্বা।

বদ্দি তখন তু'স্সের ওজন বড়ি একটা গিলিয়ে,
বল্লেন্—দাও লঘু পথ্যি চালে ডালে মিলিয়ে।
রাঁধা হ'ল চট্‌পট্ একশ' হাঁড়ি খিচুড়ি,—
খিদের চোটে চিহ্ন তার রইল নাক' কিছুরই।
নিরাশায় পিঁপড়াগুলা গর্ত্তে গিয়ে ঢুক্‌ল ;
কুকুর মিছাই শুঁক্‌ল পাতা, বিড়াল মাথা ঠুক্‌ল।
ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল,—দত্যি বাজায় বেহালা,
তিন চুমুকে খেয়ে শেষে তিন শ' চায়ের পেয়ালা।
সুরের সঙ্গে মিলিয়ে গলা গায় দত্যির কন্যে ;
ভীমগাঁয়ের মানুষ উজার, বনের পশু হন্যে।

---

## পরীক্ষিৎ রাজার দেহত্যাগ

( মহাভারত হইতে )

পরীক্ষিৎ ছিলেন অভিমন্যুর পুত্র—যে অভিমন্যু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সপ্তরথীর হাতে পড়িয়া অন্যায় যুদ্ধে মারা যান। অভিমন্যুর মৃত্যুর সময় পরীক্ষিৎ মায়ের পেটে। পাণ্ডবদের ছেলেপিলে সব মারা পড়ায় যুধিষ্ঠির স্বর্গে যাওয়ার সময় এই পরীক্ষিৎকেই রাজা করিয়া গিয়াছিলেন।

পরীক্ষিৎ মস্ত বীর ছিলেন আর বনে বনে ঘুরিয়া শিকার করিতে খুব ভালবাসিতেন। বাঘ, মহিষ, হরিণ, শূয়র, পাইলেই হইল—অমনি দফা শেষ করিয়া দিতেন।

একদিন ঘোর বনে এক হরিণ পরীক্ষিতের বাণ খাইয়া দৌড় মারিল। হরিণটার ছিল জোর কপাল, তাই সঙ্গে সঙ্গে মরিল না। রাজা তখন দিলেন হরিণের পিছনে পিছনে দৌড় কিন্তু সে হরিণ ধরা কি আর সোজা ? হরিণের পিছনে ছুটিয়া রাজা আসিয়া পড়িলেন এক গরু চরাবার জায়গায়। সেখানে এক



মুনি ছিলেন, নাম শমীক। বাছুরেরা দুধ খাইলে তাহাদের মুখ দিয়া যে ফেনা বাহির হইত মুনি সেই ফেনা খাইয়া কোন রকমে প্রাণটা রাখিতেন। রাজা গিয়াই মুনির কাছে নিজের পরিচয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বাণ খেয়ে হরিণটা কোথায় পালিয়ে গেল, তুমি কি দেখেছ ?" মুনির ব্রত ছিল তিনি কথা কহিবেন না, তাই রাজার কথারও কোনও উত্তর দিলেন না। পরীক্ষিৎ একে হরিণের চিন্তায় বিভোর, তাহার উপর ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় শরীরটা ছট্ ফট্ করিতেছিল। তিনি মুনির কাছে কোনও উত্তর না পাইয়া একেবারে রাগে লাল হইয়া উঠিলেন।

মুনির কান্ধের উপর ঝুলাইয়া দিলেন

তারপর করিলেন কি ? না, সেখানে একটা মরা সাপ ছিল, সেটাকে ধনুকের আগায় করিয়া তুলিয়া মুনির কান্ধের উপর ঝুলাইয়া দিলেন। মুনিটী ছিলেন খাঁটি ধার্ম্মিক লোক, তিনি জানিতেন পরীক্ষিৎ আদতে লোক খারাপ নন। তিনি রাজার উপর কোন রকম রাগ দেখাইলেন না, ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেনও না। সাপ কান্ধে করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

রাজা বাড়ী চলিয়া গেলেন। এদিকে মুনির এক পুত্র ছিলেন—নাম শৃঙ্গী, বয়স অল্প, মেজাজ ভারী চড়া। তিনি ব্রহ্মার পূজা সারিয়া বাড়ী আসিতেছেন,

এমন সময় তাঁহার এক বন্ধু—ইনিও এক মুনি-পুত্র, নাম কৃশ,—বলিয়া উঠিলেন, "—ওহে শৃঙ্গী, তুমি নাকি ভারী তপস্বী আর তেজস্বী ? তোমার বাপ তো কান্ধে মরা সাপ বইছেন, যাও, আর জাঁক করতে হবে না, আমাদের মত সিদ্ধ, তপস্বী মুনির ছেলেরা কোন কথা কইলে তার আর জবাব দিতে এস না। তোমার বাপের এত অপমান, তিনি নিজে ত কিছু কর্‌লেনই না, তুমি যে এত জাঁক, এত বড়াই কর তুমিই বা কি কর্‌লে ?"

শৃঙ্গী তাঁহার বন্ধুর কথা শুনিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন—"কৃশ, বল ত' কেমন করিয়া আমার বাবার কান্ধে মরা সাপটা গেল ?" কৃশ উত্তরে বলিলেন,—"ভাই হে, রাজা পরীক্ষিৎ শিকার খেল্‌তে বনে এসেছিলেন, তাঁরই এই কর্ম্ম; তিনিই ঐ সাপটা তোমার বাপের কান্ধে চড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন।"

শৃঙ্গী এই কথা শুনিয়া রাগে গস্ গস্ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"ঠিক ক'রে বলতো, আমার বাবা পরীক্ষিতের কাছে কি দোষ করেছিলেন ?" তখন কৃশ, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সব কথা শৃঙ্গীকে শুনাইয়া দিলেন।

শৃঙ্গী বুঝিলেন, তাঁহার পিতার কোনও অপরাধ নাই, তিনি কথা কহিবেন না নিয়ম করিয়াছিলেন, তাই রাজার কথার কোনও উত্তর দেন নাই। তাঁহার রাগ মোটেই থামিল না, তিনি আচমন করিয়া লইয়া রাজাকে শাপ দিলেন, "আমার বুড়ো বাবার মৌনব্রতের সময় যে দুষ্ট পাপী রাজা তাঁর কান্ধের উপর সাপ ঝুলিয়ে দিয়ে অপমান করেছে, আজ থেকে সাত রাত্রির মধ্যে সাপের রাজা তক্ষক তাকে যমের বাড়ী পাঠাবে"।

শৃঙ্গী শাপ দিয়াই চলিলেন তাঁর পিতার কাছে। গিয়া দেখেন, সত্য সত্যই তাঁহার বাপের কান্ধের উপর মরা সাপ। আবার শৃঙ্গীর রাগ হইল, দুঃখও হইল, তিনি মনের দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বলিলেন, "বাবা, আপনি কোন অপরাধ করেন নি, অথচ রাজা আপনার এই অপমান করেছে, এই শুনে আমি রাজাকে শাপ দিয়েছি, আজ থেকে সাত দিনের মধ্যে সাপের রাজা তক্ষক তাকে



যমের বাড়ী পাঠাবে।" শমীক পুত্রের কথা শুনিয়া বলিলেন—"বাপু হে, কাজটা ভাল কর নাই। আমি এতে খুসী হ'তে পার্‌লাম না। তপস্বীদের এমনটা করা উচিত নয়। আমরা তো পরীক্ষিৎ রাজার অধিকারের মধ্যেই থাকি, তিনি অত্যাচারী রাজা নন, তিনি আমাদের রক্ষা করেন ব'লেই আমরা ধর্ম্মকর্ম্ম যা কিছু কর্‌তে পারি। আমাদের ধর্ম্মে তাঁরও ভাগ আছে। ভাল রাজা হঠাৎ কিছু অন্যায় ক'রে বস্‌লে সেটা সয়ে নেওয়াই উচিত। পরীক্ষিতের খুবই ক্ষুধা-তৃষ্ণা পেয়েছিল। আর এটা তো পরিষ্কারই বোধ হচ্ছে, আমার যে কথা না কবার ব্রত ছিল সেটা তিনি জান্‌তেন না। তাই হঠাৎ এ কাজটা ক'রে ফেলেছেন। রাজা না থাক্‌লে কত রকম অত্যাচার, উপদ্রব, প্রজার কত কষ্ট—তুমি নেহাৎ ছেলেমি করেছ।"

শৃঙ্গী পিতার কথা শুনিয়া বলিলেন, "বাবা, আমি হঠাৎ ছেলেমিই করে থাকি আর অন্যায়ই করে থাকি, আপনি আমার কাজে খুসীই হন আর বিরক্তই হন, যা বলেছি তা হবেই হবে। আমি কখনও ঠাট্টা ক'রেও মিছে কথা কই নি,* কাজেই আমার শাপও মিছে হতে পারে না।" শমীক পুত্রের কথা শুনিয়া বলিলেন—"বাপু হে, সেটা আমি জানি; তোমার ক্ষমতা খুব, মিছে কথা তুমি কখনও কওনা, তোমার শাপ অবশ্যই ফল্‌বে। কিন্তু তুমি ত' আমার ছেলে, ছেলে বড় হ'লেও বাপ তাকে শাসন কর্‌তে পারেন। তুমি তপ জপ খুব কর, তাতে রাগটাও বেড়ে যায়; কিন্তু তোমার স্বভাবটা ঠাণ্ডা করা উচিত। তুমি শান্ত হবার চেষ্টা কর। বনের ফলমূল খেয়ে ক্রমে ক্রমে বদ্‌রাগটাকে থামাও; তা হ'লে শাপ দিলে যে ধর্ম্ম নষ্ট হয় তা তোমার হবে না। ইন্দ্রিয়কে জয় কর্‌তে হয়, লোককে ক্ষমা কর্‌তে হয়, তবেই মঙ্গল। আমার স্বভাবই ক্ষমা করা। এখন আমি পরীক্ষিৎ রাজার কাছে খবর পাঠাই যে আমার ছেলের বয়স অল্প, বুদ্ধি এখনও পাকেনি, তাই আমার অপমান দেখে তোমাকে এই রকমের শাপ দিয়েছে।"

গৌরমুখ নামে শমীক মুনির এক শিষ্য ছিলেন। মুনি তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, "তুমি হস্তিনাপুরে গিয়ে আগে রাজার মঙ্গলামঙ্গল জিজ্ঞাসা করে শেষে তাঁকে

* আজকাল কেহ এই বড়াই করিতে পারে কি ?

এই খবরটা দেবে।”— গৌরমুখ গুরুর হুকুম পাইয়া গেলেন হস্তিনাপুরে। আগে দারোয়ানকে দিয়া খবর পাঠাইলেন, শেষে ভিতরে ঢুকিলেন। রাজা গৌরমুখকে পাইয়া খুব আদর-যত্ন করিলেন। খানিক কথা-বার্ত্তার পর গৌরমুখ বলিলেন,— “শমীক একজন খুব বড়দরের মুনি। তিনি কথা কহিবেন না ব্রত করেছিলেন, সেই সময় আপনি ধনুকের আগা দিয়ে তাঁর কান্ধের উপর এক সাপ ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। শমীক আপনাকে মাপ করেছিলেন কিন্তু তাঁর ছেলে শৃঙ্গী বড় রাগী, তিনি বাপের অপমান দেখে আপনাকে শাপ দিয়েছেন যে সাত দিনের মধ্যে আপনি তক্ষকের কামড়ে মারা যাবেন। শমীক ছেলের শাপ থামাবার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু সে শাপ থামাবার নয়। শমীক মুনি আপনাকে তাই এ খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন।”

সব কথা শুনিয়া পরীক্ষিৎ রাজার মনটা দমিয়া গেল। তিনি যে শুধু শুধু শমীকের অপমান করিয়াছেন ইহা ভাবিয়া ভারী কষ্টও হইল। নিজেকে মরিতে হইবে ইহা জানিয়া যতটা কষ্ট হইল তাহা অপেক্ষা বেশী কষ্ট হইল অকারণে মুনিকে অপমান করিয়াছেন ভাবিয়া। শেষে তিনি গৌরমুখকে বিদায় দিয়া বলিলেন, “যাক্, আপনি গিয়া বলুন তিনি যেন আমার উপর খুসী থাকেন।”

তাহার পর রাজা ভাবিলেন, এখন কি করা যায়? মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এমন করিয়া একটা বাড়ী তৈয়ার করিলেন যাহাতে তক্ষক না আসিতে পারে। একটা মাত্র থামের উপর বাড়ীটা রহিল। আর সেই বাড়ীতে থাকিলেন রাজা, ভাল ভাল কবিরাজ, আর মন্ত্রতন্ত্র-জানা ব্রাহ্মণেরা। রাজা সেখানে থাকিয়াই মন্ত্রীদের সঙ্গে করিয়া রাজ্যের কাজকর্ম্ম চালাইতে লাগিলেন।

কশ্যপ নামে এক ব্রাহ্মণ ভাল বিষের ঔষধ জানিতেন। তিনি যখন শুনিলেন তক্ষকের কামড়ে পরীক্ষিৎ রাজা মারা যাইবেন তখন তাঁহার খুব ইচ্ছা হইল, সাপে কামড়াইলেই রাজাকে মন্ত্র দিয়া আর ঔষধ দিয়া বাঁচাইয়া দেন—তাহাতে ধর্ম্মও হইবে, কিছু রোজগারও হইবে। সেই সাতদিনের দিন তিনি সাজিয়া-গুজিয়া রাজাকে বাঁচাইবার জন্য রওনা হইলেন। এদিকে তক্ষকও এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সাজিয়া



রাজাকে কামড়াইতে চলিল। দু'জনায় রাস্তায় দেখা। তক্ষক জিজ্ঞাসা করিল, —“ঠাকুর, এত তাড়াতাড়ি কোথায় চলেছ?” কশ্যপ বলিলেন, “শুনলাম, আজ নাকি পরীক্ষিৎ রাজাকে তক্ষক কামড়ে দিয়ে মেরে ফেলবে। রাজাকে তাই বাঁচাতে যাচ্ছি।” তক্ষক বলিল, “ওহে, আমিই যে সেই তক্ষক, আমি কামড়ে দিলে কি সাধ্য তোমার যে তাঁকে বাঁচাও? আমিই আজ রাজাকে মারব।” কশ্যপ বলিলেন, “নিশ্চয়ই আমি রাজার বিষ খসাতে পারব।”

তক্ষক বলিল, “আচ্ছা, দেখা যাক্, তোমার বিদ্যার দৌড় কতদূর। এই যে সম্মুখে বটের গাছ আছে, আমি এর উপর কামড়ে দিচ্ছি, বাঁচাও দেখি তুমি গাছটাকে।” কশ্যপ বলিলেন,—“খুব পারব।” তক্ষক তখন দিল সেই গাছের উপর ছোঁ মারিয়া। গাছটার তখন হইল কি? গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেল। তক্ষক বলিল,—“ঠাকুর, বাঁচাও না এই গাছটাকে?” কশ্যপ নিজের বিদ্যা প্রকাশ করিয়া গাছটা যেমন ছিল তাহাকে ঠিক তেমনি করিয়া দিলেন। প্রথমে বাহির হইল গ্যাঁজ, তারপর দুইটী পাতা, তারপর আর সব পাতা, ডালপালা —ঠিক যেন আগেকার সেই গাছটি। তক্ষকের তাক্ লাগিয়া গেল।

তক্ষক তখন বলিল,—“আচ্ছা, রাজাকে বাঁচাইয়া তোমার কি লাভ বল দেখি? তুমি যা চাও আমিই বরং তোমাকে তা দি। পরীক্ষিতের উপর ব্রাহ্মণের শাপ আছে,—বোধ হয় তোমার চেষ্টাতেও তিনি বাঁচবেন না, তা হলে তোমার একটা বদনাম হবে।” কশ্যপ বলিলেন, “আমার টাকার দরকার, আমি যাচ্ছি টাকার জন্য। তুমি আমাকে টাকা দাও, ব্যস্, আমি ফিরে যাচ্ছি।” তখন তক্ষক কশ্যপকে অনেক টাকাকড়ি দিয়া দিল। কশ্যপও দেখিলেন, রাজার আর পরমায়ু নাই; তিনি টাকাকড়ি পাইয়া সেখান হইতেই লম্বা দিলেন।

তখন গেল তক্ষক হস্তিনানগরে। যাইতে যাইতে শুনিল, রাজা এমন সব মন্ত্র আর ঔষধের যোগাড় করিয়াছেন যাহাতে বিষ নষ্ট হইয়া যায়। তখন সে ভাবিল, কোন রকম ছল করিয়া রাজাকে ঠকাইতে হইবে। তক্ষক অন্যান্য সাপকে বলিল, —“দেখ, তোমরা সব ব্রাহ্মণ সাজ, সেখানে গিয়া বল আমাদের বিশেষ দরকার

আছে। তারপর রাজার কাছে গিয়ে ফল, ফুল, কুশ, জল এই সব দিয়ে রাজাকে আশীর্ব্বাদ কর।" সাপেরা তাহাদের রাজা তক্ষকের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ সাজিল। রাজা তাহাদিগের মিথ্যা আশীর্ব্বাদ নিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাহারা চলিয়া গেলে রাজা মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, "এস আমরা ঋষিদের দেওয়া এই সব ফল খাই।" তক্ষক নিজে গোপনে একটা ফলের মধ্যে ছিল। রাজা নিজে আরম্ভ করিয়া দিলেন সেই ফল খাইতে। খাবার সময় সেই ফলের মধ্য হইতে ছোট্ট

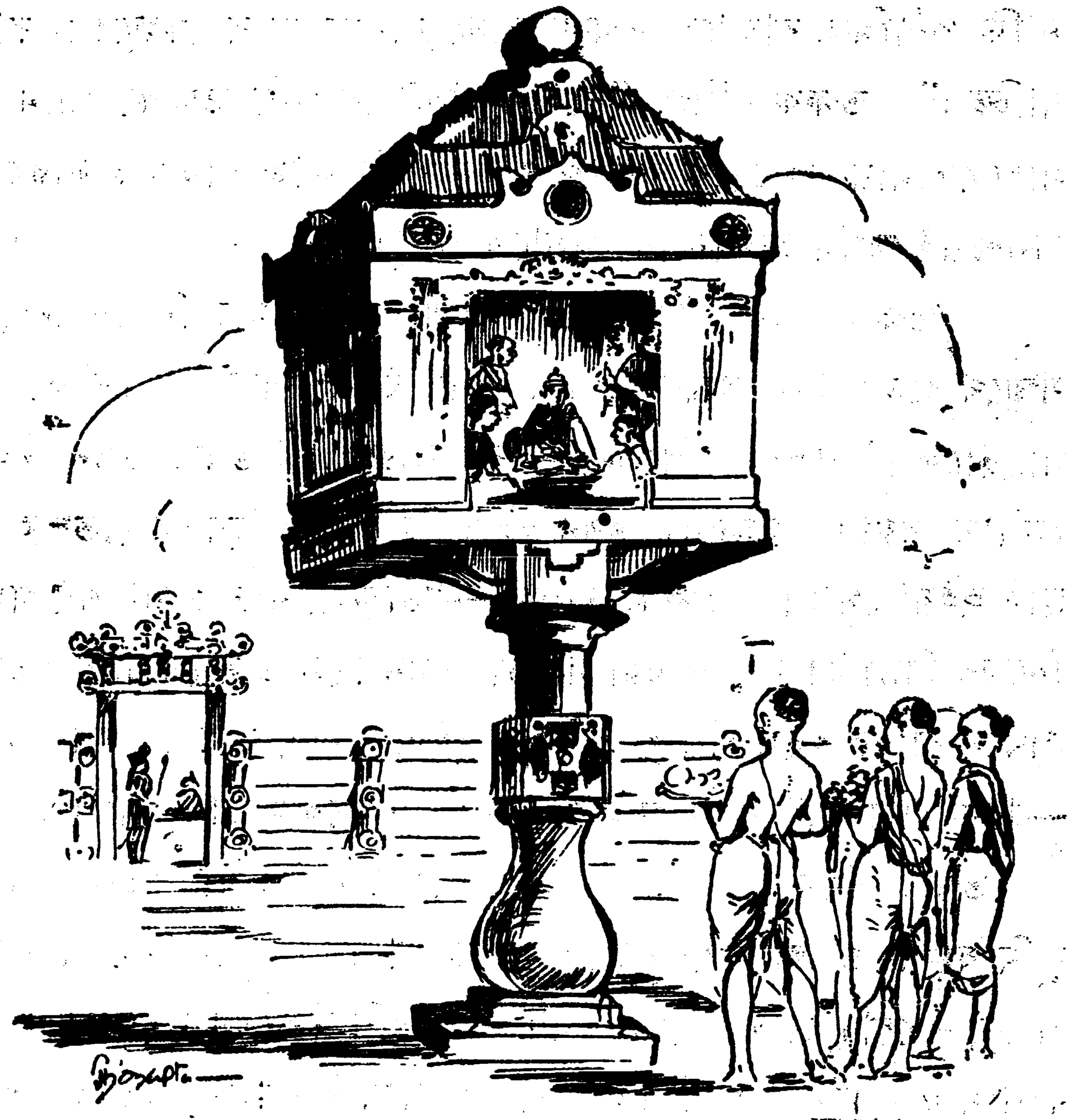

সাপেরা……ব্রাহ্মণ সাজিল

একটা পোকা বাহির হইল। পোকাটার কাল চক্ষু, তামার মত রং। রাজা সেই পোকাটাকে হাতে লইয়া মন্ত্রীদিগকে বলিলেন,—"সূর্য্য তো অস্ত যাচ্ছেন, আমার তা হ'লে আজ আর বিষের ভয় নাই। এই পোকাই তক্ষক হ'য়ে আমাকে কাটুক্। তা হ'লে আমিও শাপ থেকে খালাস হ'তে পারি, ব্রাহ্মণের কথাও ঠিক থাকে।" মন্ত্রীরা বলিলেন, "তা বটে, তা বটে"। রাজা বুদ্ধির ফেরে পোকাটাকে লইয়া নিজের ঘাড়ের উপর রাখিয়া হাসিতে লাগিলেন। আদতে তো তক্ষক! সে নিজের শরীরটা বড় করিয়া রাজার ঘাড় জড়াইয়া ধরিল। তারপর তার কী গর্জ্জন!



সঙ্গে সঙ্গেই সে দিল রাজাকে ধাঁ করিয়া কামড়াইয়া। তখন মন্ত্রীদের কান্না দেখে কে? তাঁহারা ভয় খাইয়া সেখান হইতে চম্পট্ দিলেন। তক্ষকও নিজের তেজে সেই বাড়ীটাকে একেবারে পোড়াইয়া দিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল। রাজা যে বিষের তেজে পড়িয়া গেলেন আর উঠিলেন না।*

---

## ডাক্তারী

(শ্রীবিকাশ দত্ত)

ভয় পেওনা বল্ছি তোমায়,
লাগ্‌বে নাকো মোটে।
মিথ্যে অমন কাঁদ্‌লে পরে
হয়তো যাবো চোটে।

তাইতে বলি চুপ্‌টি ক'রে
একটুখানি বোসো—
ডাণ্ডাটাকে পুড়িয়ে আনি,
ব্যস্ত কেন, রোসো!

এই ম'রেছে! আবার কেন
ছট্‌ফটানি শুনি?
সারিয়ে দোবো ঠিক্ বেমালুম
এক্ষুনি এক্ষুনি!

পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি
আস্‌ছি—এলুম বোলে,

* কেহ কেহ মহাভারতের এই তক্ষকদংশনের গল্পকে তক্ষক জাতির হস্তিনাপুর আক্রমণের রূপক মনে করেন।

দেখিস্ দাদা, এই সুযোগে
যাস্‌নে যেন চ'লে !
রোগীর দুখে আমার বুকে
অষ্টপ্রহর বাজে,
তাইতে তোরে বুঝিয়ে বলি,
থাকতে পারি না যে ।

ডাণ্ডাটাকে পুড়িয়ে আনি......

ওকি, ওকি, ছুট দিলি যে ?
ব্যাপারটাকি, হ্যাঁরে—
ভয়টা যদি, হেথায় কেন
আসিস্ বারে বারে ?



রোগ হ'য়েছে সারিয়ে দোবো,
এইতো জানি সোজা !
কখন যে কি ভাবের উদয়—
কিছুই না যায় বোঝা !

---

# 'রাম'-বিভ্রাট

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর ]

( শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ, )

২

মহেশের আট ছেলে ইস্কুলে যায়। সারি বাঁধিয়া বসে, সারি বাঁধিয়া বাড়ী ফেরে। পণ্ডিত মশায় বড় মুস্কিলে পড়িয়াছেন। ইহাদের নাম তাঁহার কিছুতেই ঠিক থাকে না। রামশশী দুষ্টামি করিলে রামশঙ্কর মার খায়। রামহরিকে আদর করিতে গিয়া রামকৃষ্ণের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বসেন। সেদিন তো এক মজাই হইয়া গেল। পণ্ডিত মশায় ইস্কুলে আসিয়া জামাটা খুলিয়া ফেলিলেন। বড্ড গরম পড়িয়াছে কিনা! তারপর পা দুইটা সোজা টেবিলের উপর তুলিয়া দিলেন। মস্ত বড় ভুঁড়িটা দশ নম্বর ফুটবলের মত উঁচু হইয়া রহিল। তিনি ডাকিলেন—'রামজীবন'। কেউ সাড়া দিল না। সত্যি সত্যি রামজীবন তো কেউ নাই। আবার ডাকিলেন, 'রামকমল'। এবারেও কেউ জবাব দিলে না। পণ্ডিত মশায় চটিয়া গিয়া হাঁক দিলেন, 'রামরাম, ভূগোল নিয়ে এসো।' সে বেচারা তালপাতা লেখে, সে ভূগোলের কি জানে ? ভূগোল পড়ে রামশঙ্কর। আসলে ওটা পণ্ডিত মশায়ের ভুল। যাহা হউক, রামরাম তো কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া হাজির। পণ্ডিত মশায় হাঁকিলেন, 'তোকে কে ডাক্‌ল ?' বলিয়াই এক চড়। রামরাম ভ্যাঁ করিয়া কান্দিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পণ্ডিতমশায় আরো রাগিয়া গেলেন, কহিলেন, 'সব রাম বেঞ্চের উপর দাঁড়াও।' এমনি প্রায়ই হয়।

শেষটায় পণ্ডিত মশায় বিরক্ত হইয়া কহিলেন, নাঃ এ আর চলে না। একটা উপায় করিতেই হইবে। কি উপায় করেন ? প্রথমটা স্থির করিলেন নামগুলি একদম মুখস্থ করিয়া

ফেলিতে হইবে। সেই চেষ্টাই চলিল। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, পণ্ডিত মশায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া, টিকি নাড়িয়া, হাত ঘুরাইয়া, সুর করিয়া পড়িতে লাগিলেন,—

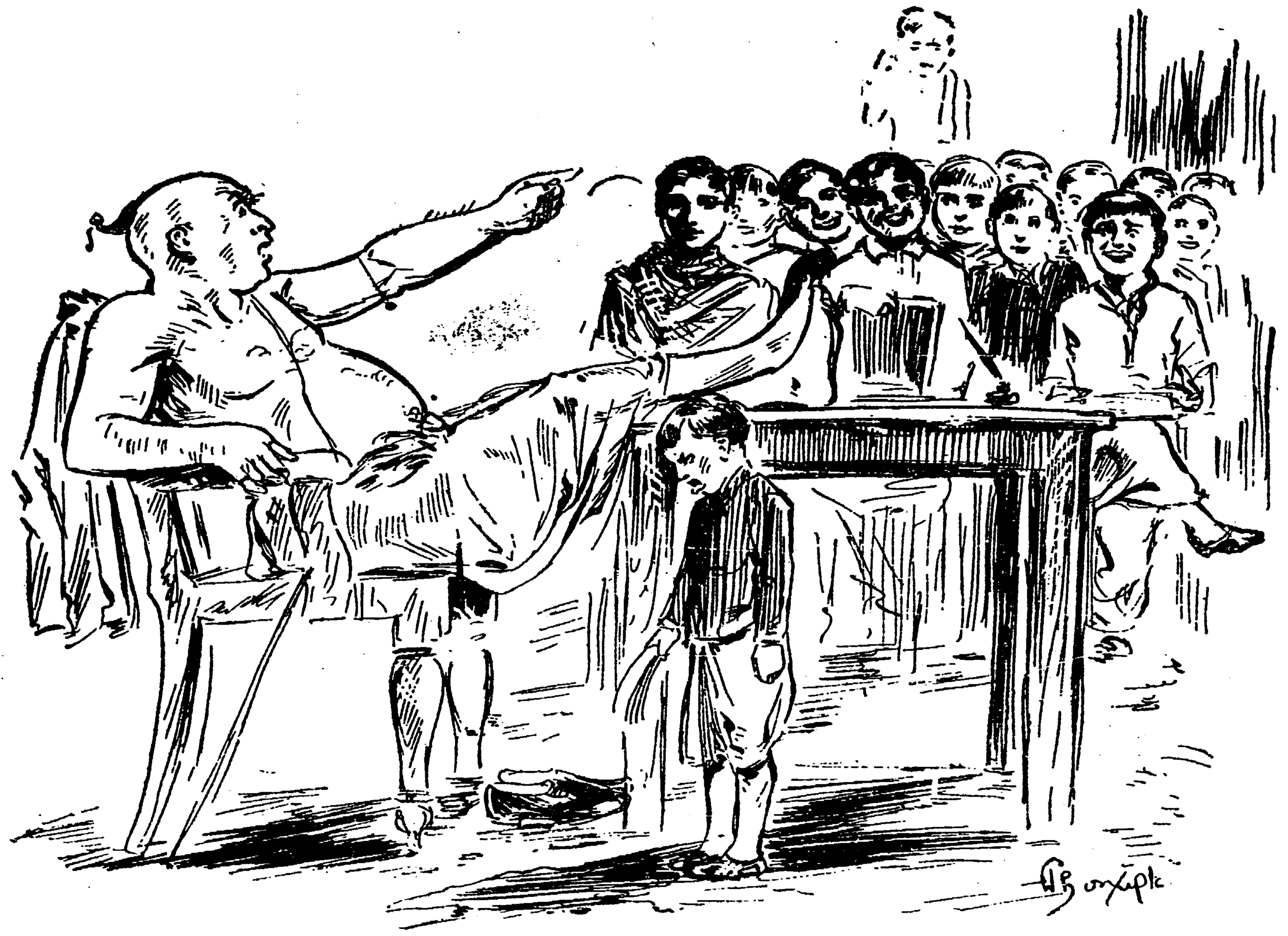

সব রাম বেঞ্চের উপর দাঁড়াও

রামচন্দ্র, রামশশী, রামকৃষ্ণ, রামহরি।
রামশঙ্কর, রামরাম, রামগোপাল, রামসিং॥

পড়িতে পড়িতে যদি ঘুম পায়, চোখে তেল দিয়া আবার সুরু করেন; যদি ঘামিয়া যান, গায়ে এরোরুট মাখিয়া লাগিয়া যান। তবু মুখস্থ হয় না। বুড়োমানুষ কিনা! অতগুলি 'রাম' মনে রাখা কি সোজা কথা? যাহা হউক, অনেক চেষ্টায় নাম তো মুখস্থ হইল। কিন্তু গোল মিটিল না। কাহার নাম কোন্‌টা সেটা তো এখনো স্থির হইল না। এখনো রামশঙ্করকে ডাকিতে গিয়া রামসিংহকে ডাকিয়া বসেন। কিন্তু পণ্ডিতমশায় তো হাল ছাড়িবার পাত্র নন, ঘরে দুয়ার দিয়া অন্য উপায় ঠাওরাইতে বসিয়া গেলেন। স্নান নাই, আহার নাই, ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার সুন্দর ভুঁড়িটা যেন চুপ্‌সাইয়া গেল। এদিকে গৃহিণী কিন্তু ক্রমেই ফুলিতে আরম্ভ করিলেন। কিসে বল দিকিন? রাগে। তারপর এক মহাকাণ্ড! তখন ঠিক দুপুর। 



গিন্নী ভাত বাড়িয়া ডাকিলেন, 'ওগো শুন্‌ছ? ভাত দেওয়া হ'য়েছে।' পণ্ডিতমশায় কি ঐ সব তুচ্ছ কথা তখন শুনিতে পান? গিন্নী আবার ডাকিলেন, সাড়া পাইলেন না। শেষে কাছে আসিয়া দাঁত মুখ খিঁচাইয়া কহিলেন, 'বলি, কাণের মাথা কি খেয়েছ?' পণ্ডিতমশায় চমকাইয়া উঠিলেন, 'মাথা? হাঁ, মাথা! মাথা! গিন্নী, ঠিক বলেছ, মাথা!! মাথাতেই ঝুলিয়ে দিতে হবে। নাঃ, গলায় দিলেই যেন ভালো হয়। আচ্ছা গলায়।' গৃহিণী দেখিলেন, এতো পাগলের লক্ষণ! অমনি, 'ওগো, আমার কি হ'বে গো' বলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া কাঁদিতে সুরু করিলেন। পাড়ার লোক ছুটিয়া আসিল, এবং ব্যাপারটা কিছু আঁচ করিয়া লইয়াই ঘড়া ঘড়া জল পণ্ডিত মশায়ের মাথায় ঢালিতে আরম্ভ করিল। পণ্ডিত মশায় যত বলেন, 'আরে করো কি, করো কি'? অমনি আর এক ঘড়া। অবশেষে বেচারী যখন বেদম হাঁচিতে সুরু করিয়াছে, লোকগুলি তখন ভয় পাইয়া পলাইয়া গেল। পণ্ডিত মশায় ছাড়া পাইয়াই, ঘরে ঢুকিয়া একটা জুতার বাক্স বাহির করিলেন। সেটাকে ছিঁড়িয়া, কাঁচি দিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া আটখানা টিকিটের মত করিলেন। বড় বড় অক্ষরে ১, ২ করিয়া সেগুলিকে নম্বর দিলেন। তারপর প্রত্যেকটাতে একগাছি দড়ি বাঁধিয়া ইস্কুলে লইয়া গেলেন। রামের দলের ডাক পড়িল। ছোট বড় হিসাবে তাহাদের দাঁড় করাইয়া প্রথম থেকে সেই নম্বর আঁটা টিকিটগুলি তাহাদের গলায় পরাইয়া দিলেন। রামচন্দ্রের নম্বর এক, রামশশীর দুই—এমনি ভাবে চলিল। পণ্ডিত মশায় গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'এই টিকিট বাড়ী নিয়ে পকেটে রাখ্‌বে, ইস্কুলে আস্‌বার সময় রোজ গলায় ঝুলিয়ে আস্‌বে। যদি হারায়, বেতের ঘায়ে মাথা উড়িয়ে দেবো।'

সমস্ত গোল এবার একেবারে মিটিয়া গেল। আর চোখে তেল দিয়া নাম মুখস্থ করিবার দরকার নাই। যখন যাহাকে দরকার নম্বর ধরিয়া ডাকিলেই হাজির। এদিকে রামশশীর মাথায় এক মৎলব আসিল। সে ছিল সবার চেয়ে দুষ্টু আর চালাক। আঁকটা তাহার একেবারেই ভালো লাগিত না! তাহার ভাই রামকৃষ্ণ আবার ছিল তেমনি বোকা, অঙ্ক সে খুব ভালো জানিত। রামশশী করিল কি, রাত্রে চুপি চুপি রামকৃষ্ণের পকেট থেকে তাহার টিকিটখানা চুরি করিয়া নিজের খানা সেইখানে রাখিয়া আসিল। রামকৃষ্ণ বেচারী কিছু জানে না। পরদিন ইস্কুলে গিয়া সেই টিকিট পরিয়াই বসিয়া আছে। পণ্ডিত মশায় হাঁক দিলেন, 'বাড়ীর আঁক সব নিয়ে এসো।' টেবিলের উপরে খাতা জড়ো হইল—সব নম্বর দেওয়া। পণ্ডিতমশায় তিন নম্বর খাতা তুলিয়া লইলেন। সেটা কিন্তু রামকৃষ্ণের খাতা। এদিকে

তাহার গলায় যে টিকিট ঝুলিতেছে তাহার নম্বর দুই। তিন নম্বর আজ রামশশী। সুতরাং রামশশীরই ডাক পড়িল! পণ্ডিত মশায় বেজায় খুসী হইলেন। একটা আঁকও ভুল যায় নাই! রামশশী একখানা ছবির বই পুরস্কার পাইল। তারপর দুই নম্বর খাতা। এবার রামকৃষ্ণের ডাক পড়িল। সব অঙ্ক ভুল! পণ্ডিত মশায় গণিয়া গণিয়া সাত ঘা বেত তাহার পিঠে লাগাইয়া দিলেন। কেন না, সাতটা আঁক কষিতে দেওয়া হইয়াছিল।

রামশশী কেবল যে দুষ্টুই ছিল, তাহা নয়, সে ছিল আবার চোর। ঘোষেদের বাগান থেকে কাঁঠাল চুরি করিয়া খাইত। ঘোষেরা টের পাইল, এবং ইহাও বুঝিল যে এটা নিশ্চয়ই মহেশের ষণ্ডা ছোঁড়াটার কাজ। ভট্চায্যি মশায় গ্রামের মুরুব্বি, তাঁহার কাছেই নালিশ রুজু হইল। তিনি কহিলেন, 'সাক্ষী কই?' একে একে পাঁচজন সাক্ষী আসিয়া জুটিল। আসলে কিন্তু কেহই দেখে নাই! ভট্চায্যি মশায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাঁঠাল কে নিয়েছে?'

প্রথম সাক্ষী বলিল, 'আজ্ঞে, রামশশী।'

'ঠিক করে বল।'

সাক্ষী কাঁপিয়া গিয়া কহিল, 'আজ্ঞে না, রামশঙ্কর।'

'ভেবে বল।'

সাক্ষী মুস্কিলে পড়িল। খানিকক্ষণ মাথা চুল্‌কাইয়া কহিল,

'আজ্ঞে না, রামকৃষ্ণ।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

তারপর অন্যান্য সাক্ষীরাও না জানিয়া সায় দিয়া গেল। রামকৃষ্ণ বেচারীকে টানিয়া আনা হইল এবং দুই কাণে পাঁচটা পাঁচটা—দশটা—কাণমলা দেওয়া হইল।

এ আর কি—সব ছোট খাটো ঘটনা! ইহার পরে যে ব্যাপার ঘটিল, তাহা যদি বলি, তোমরা নিশ্চয়ই ভয় পাইবে। হয়ত কাঁদিয়া ফেলিবে, নয়তো হাসিয়া গড়াগড়ি যাইবে। না, সে আমি বলিব না। তবে বলিতে পারি, যদি না কাঁদ। বল, কাঁদিবে না? আচ্ছা, তবে শোনো।

মহেশের মস্ত সংসার। গৃহিনী একা মানুষ। তাহাতে বুড়া হইতে চলিয়াছেন। কর্ত্তাকে ধরিয়া পড়িলেন,—এবার আমাকে একটি বৌ আনিয়া দাও। বটেই তো? এমন যোগ্য পুত্র



যাহার, তাহার কি এই বয়সে এত কষ্ট করা সাজে? কর্ত্তা তাঁহার রামচন্দ্রের জন্য কনে খুঁজিতে বাহির হইলেন। সোণাপুর গ্রামে ভৈরব রায়ের মেয়েই পছন্দ হইল। মেয়ে তো নয়, যেন পরী! রাঙা টুকটুকে রং, কালো কুচ্‌কুচে চুল। নাকে নোলক, পায়ে মল। ঝুম্ ঝুম্ করিয়া চলে। কাজে কর্ম্মেও যেন হীরার ধার। লেখাপড়াই কি কম শিখিয়াছে? সে সুর করিয়া বানান করিতে করিতে রামায়ণ পড়ে, পাঁচের ঘর অবধি নামতা গড় গড় করিয়া বলিয়া দেয়। মহেশ বড্ড খুসী হইয়া গেলেন। ভৈরবকে কহিল, 'আপনার যেদিন ইচ্ছে ছেলে দেখে আস্‌বেন।' ভৈরব কহিল, 'আপনার ছেলের নামটা কি?'

'আজ্ঞে, রামচন্দ্র।'

তারপর একদিন ভোরে উঠিয়া, খুঁজিয়া বাছিয়া, পাঁজিতে যেটা সব চেয়ে ভালো দিন সেই দিনই ভৈরব যাত্রা করিল। ছেলের পূরা নামটি তাহার মনে ছিল না, ছিল শুধু—রাম। তাহাতে কি আর ক্ষতি? বাড়ীতে নিশ্চয়ই সবাই তাহাকে রাম বলিয়াই ডাকে।

চৈত্রমাস। রোদে যেন আগুন জ্বলে। খাঁ খাঁ করে মাঠ। কোথাও এতটুকু ছায়া নাই। ঘাসপাতা সব পুড়িয়া গিয়াছে। তেষ্টায় ভৈরবের ছাতি ফাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু কোথাও এক ফোঁটা জল নাই। এমনি করিয়া ক্ষুধায় তৃষ্ণায়, পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া আসিতে আসিতে যখন সে মহেশের বাড়ী পৌঁছিল, তখন বেলা গড়াইয়া গিয়াছে। ডাকিল, 'মহেশবাবু আছেন?' কেহ সাড়া দিল না। তারপর ডাকিল, 'রাম, ও রাম, রাম বাড়ীতে আছ?' বলিতে বলিতে হুড়মুড় করিয়া আট ভাই আসিয়া হাজির। ভৈরব কহিল, 'রামকে ডেকে দাও দিকিন।' সকলে এক সঙ্গে চেঁচাইয়া উঠিল, "আমি রাম"। সকলেই রাম! ভৈরব প্রথমে খুব আশ্চর্য্য হইল, তারপর বেজায় রাগিয়া গেল। কহিল, 'তোমরা তো আচ্ছা পাজী হে।' তাহারাও চটিয়া গেল। আট ভাই একসঙ্গে বুক চাপ্‌ড়াইয়া পা ঠুকিয়া বলিয়া উঠিল, 'আমরা পাজী নই, আমরা রাম।'

ভৈরব একে রোদ্রের জ্বালায় অস্থির, তাহাতে এই সব ডেঁপো ছেলের ঠাট্টা। তাহার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল কিন্তু ইহাদের সঙ্গে পারিয়া ওঠা তো সহজ নয়! তাই সে আর কিছু না বলিয়াই ফিরিয়া চলিল। ছেলেরা ডাকিল,—'শুনুন, শুনুন ও মশাই শুনুন।' ভৈরব চাহিয়াও দেখিল না।

হন্ হন্ করিয়া ভৈরব চলিয়াছে, পথে মহেশের সঙ্গে দেখা। দেখিয়াই তাহার রাগ চট্ করিয়া মাথায় উঠিয়া পড়িল। হাত-পা ছুড়িয়া চেঁচাইয়া কহিল, 'আপনি একটা আস্ত

জোচ্চোর, আর আপনার ঘরে যে মেয়ে দেয়, সে একটা আস্ত গাধা। ঐ সব এক ফোঁটা ফোঁটা ছেলে, আমার সঙ্গে ঠাট্টা!'

মহেশ অতি কষ্টে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া কহিলেন, 'আপনি চলুন, আমি সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।' ভৈরব তখনও চেঁচাইতেছিল। জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মহেশ নিঃশব্দে বাড়ী ফিরিল। শোবার ঘরে একটা প্রকাণ্ড দা ছিল, তাহাই হাতে করিয়া বাহির হইল। গৃহিণী আসিয়া পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, 'কোথায় যাচ্ছ?' মহেশ কহিল, 'সে ভেড়ার পাল কৈ? সবগুলোকে কেটে কুচি কুচি করবো।' গৃহিণী চেঁচাইয়া উঠিলেন। একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। পাড়ার দশজন গণ্যমান্য লোক আসিয়া পড়িলেন। ভট্‌চাযি্য মশায়ও আসিলেন। অবশেষে অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল,—উহাদের কাটিয়া আর কি হইবে? উহাদের 'রাম' কাটিয়া দাও। তারপর ছেলে গুলিকে এক জায়গায় জড়ো করিয়া তাহাদের মাথা ন্যাড়া করিয়া কপালে চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হইল। সারাদিন পূজা চলিল। তারপর সন্ধ্যাবেলা মহেশ গলবস্ত্র হইয়া কহিলেন, 'আকাশে চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী, পাতালে বাসুকী সাক্ষী, পৃথিবীতে সমস্ত স্থাবর, জঙ্গম, পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গ সাক্ষী, আমি আজ হইতে আমার পুত্রগণের 'রাম' কাটিয়া দিলাম।'

সমস্ত লোক ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। স্বর্গ হইতে ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি হইল। কিন্তু ছেলেদের শান্ত করে কাহার সাধ্য? 'আমাদের নাম ছোট হইয়া গেল' বলিয়া নানান সুরে তাহারা কান্না জুড়িয়া দিল। একদিন একরাত গেল। সে কান্না আর থামে না। অবশেষে ভট্‌চায্যি-মশায় কহিলেন, 'হে বৎসগণ, তোমাদের নামের শেষের ভাগ যে দেবতার নাম। 'রাম' গেল—আজ থেকে তোমরা দেবতা।'

তাইত'। তখন সকলেই আনন্দে নাচিতে সুরু করিল। রামসিংহ সকলের ছোট। সে কিছুই বুঝিল না, গম্ভীর ভাবে এককোণে দাঁড়াইয়া আপন মনে বলিতেছিল, 'আমি নাম তিন্ন'। সকলে রা' রা' করিয়া ছুটিয়া আসিল, 'আরে না-না-না, তুমি রামসিংহ নও, তুমি শুধু সিংহ'। সেও খুসী হইয়া গেল। লাফাইতে লাফাইতে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, 'আমি তুধু তিন্ন, আমি তুধু তিন্ন।'

---

# তোমাদের ছোট্ট চীনা ভায়ারা

[ শ্রীচৈনিক ]

আমাদের দেশে অনুস্বর বেচারীর কোথাও আদর নাই। তোমাদের কত সব ভাল ভাল নাম! কই, অনুস্বর দেওয়া তো একটাও চোখে পড়ে না! সেই সেকালে ছিলেন কংস রাজা, আর একালে আছে আমাদের গ্রামের বংশী ময়রা। ব্যস্। আর যাও দিকিন একবার চীন দেশে। রাস্তা ঘাটে লোক আর ধরে না। চ্যাপ্টা নাক, ছোট চোখ, হল্‌দে রঙ্, মাথায় ঝুঁটি। ছেলেমেয়েও কি অল্প? সবারই নামে অনুস্বর। চুং চাং আর ফ্যাং লিন্ মারামারি করিয়াছে। জজ সাহেব ক্যাংচু কোতোয়াল ফুংচুংকে হুকুম করিলেন, 'লাগাও উহাদের পাঁচিশ চুং।' হয়তো বা শুনিবে, চুং মানেই বেত। শুধু কি মানুষের নাম? রাস্তা-ঘাট, সহর-গ্রাম, নদী-পর্ব্বত সকলের গায়েই অনুস্বর। ভূগোল খুলিয়া দেখ—

টংকিং, হোয়াংহো, হংকং, ল্যাংচাউ,
চুংকিং, নিংপো, সাংহাই, চ্যাং চাউ।

এই অনুস্বরের দেশের ছেলেমেয়েদের আমার খুব ভাল লাগে। তাহাদের সম্বন্ধে তুই চারিটা কথা তোমাদের বলিব। পিঠে একটা মস্ত বোঁচ্‌কা বাঁধিয়া, ঢোলা পায়জামার উপর খাটো কোট পরিয়া অনেকদিন উহাদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। কত ছেলের সঙ্গে ভাব হইয়াছিল। সকলের কথা আজ মনেও নাই। কিন্তু ফাংলুকে ভুলিতে পারি নাই। ফাংলু গরীবের ছেলে। বাবা ছিলেন মিস্ত্রী। নৌকায় জন্ম, নৌকাতে ঘরবাড়ী। চীনদেশে এইরকম অনেক লোক নৌকাতে থাকে। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী লোক এই দেশে। ডাঙ্গায় সকলের স্থান কুলায় না।

ফাংলুর বয়স যখন একমাস তখন তাহার মা দৈবজ্ঞ ডাকিয়া, ভাল দিন দেখিয়া,

দেবতার পূজা দিয়া, ছেলের মাথাটা কামাইয়া দিলেন। এমনি সকলকেই দিতে হয়। ছয় বছর বয়সে,—সকল মাথা ন্যাড়া,পিছনে মস্ত ঝুঁটি—ফাংলু বাবার সঙ্গে ইস্কুলে গেল। সব ছেলের ঐ এক অবস্থা। সে তো ইস্কুল নয়, হাট। সমস্ত ছেলে গায়ের জোরে চেঁচাইয়া পড়া করিতেছে। থামিলে আর রক্ষা নাই। তার পর গুরুমহাশয় যখন ডাকিবেন, তাঁহার কাছে গিয়া, তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পড়া বলিতে হইবে। মুখোমুখী দাঁড়াইলেই বেত। ছেলেরা শুধু পড়ে না, লেখেও। উহাদের পেন্সিলও নাই, কলমও নাই। ছবির মত এক একটা অক্ষর, তুলি দিয়া বসিয়া বসিয়া লিখিতে হয়। সে অক্ষর ও কি পাঁচ দশটা? সাত শোর কম নয়।

ডাক্তার সান্ ইয়াৎ সেন

ফাংলুর নাম আগে ছিল—কি একটা, ভুলিয়া গিয়াছি। তাহার অর্থ কুকুর।



চীনা ছেলেদের গোড়াতে এম্‌নি নামই থাকে—হয় কুকুর, নয় বেড়াল, নয়তো হতচ্ছাড়া, কুড়ে, লক্ষ্মীছাড়া কিংবা ছারপোকা। কে জানে যদি নামের লোভে ছেলের উপর অপদেবতার চোখ পড়ে, সে তো আর বাঁচিবে না! এই ভয়ে বাপ-মা তাহাদের ভাল নামও দেন না। ভাল নাম দূরে থাকুক, মাঝে মাঝে তাহাদের মার-ধোর পর্য্যন্ত সহিতে হয়—অবশ্য লোক-দেখানো মার! বাপ-মা ছেলে মারিয়া ভূত-প্রেতদের বুঝান—এ নেহাৎই ফেলানো ছেলে; ইহার উপর চোখ দিও না।

ফাংলু ইস্কুলে ঢুকিলে তাহার ছেলেবেলাকার 'কুকুর' নামের বদলে ঐ ভাল নামটী দেওয়া হইয়াছে। বিয়ের সময় তাহার আর একটা নাম হইবে। তার পর যখন সে পাশ-টাশ করিয়া বাহির হইবে, তখন আর একবার নাম বদল হইবে। এমনি করিয়া চীনা ছেলেদের নামকরণ হয় চারবার।

মেয়েদের এ সব বালাই নাই। এই কিছুদিন আগেও তাহারা ইস্কুলে যাইতে পাইত না, ঘরে বসিয়া সুতা কাটিত, কাপড় কাচিত, আর মায়ের সঙ্গে সংসারের সব কাজ করিত। আজকাল তাহাদের জন্য ইস্কুল হইয়াছে। ছেলেদের মত তাহারাও পড়িতে যায়।

ফাংলুর একটি ছোট বোন ছিল, তাহার নাম মাংচু। যখন সে খুব ছোট, একদিন শুনিলাম, তাহার জ্বর হইয়াছে। গিয়া দেখিলাম, তাহার ছোট্ট ছোট্ট দুইটি পায়ে খুব জোরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া লোহার জুতা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মেয়েটা যন্ত্রণায় কাঁদিয়া অস্থির! তাহার বাবা কহিল, "এ ছাড়া আর উপায় কি? সব মেয়েকেই ওটা করতে হয়। ছোট পা না হ'লে তো সে সুন্দর হয় না, বিয়েও হয় না।" মাংচু যখন বড় হইবে, বেচারী না পারিবে ছুটিতে,না পারিবে ভাল করিয়া হাঁটিতে। তবু সুন্দরী হওয়া চাই। আজকাল কিন্তু এই নিয়মটা একরকম উঠিয়াই গিয়াছে।

মাংচুর আবার ইহারই মধ্যে বিয়ের কথাও হইতেছে। ও পাড়ার বা-থিন্ নাকি চার টাকা পণ দিয়া মাংচুকে ছেলের বৌ করিবে। মাংচু বেচারী কাঁদিতে

কাঁদিতে শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া যাইবে, আর মায়ের কাছে আসিতে পাইবে না। চীনা মেয়েদের বড় কষ্ট। যত আদর ছেলেদের। ফাংলু বলিল, "যদি পাশ কর্‌তে পারি, বাবা বলেছেন, একটা মস্ত ব্যাঙ কিনে দেবেন।" আমি বলিলাম, ব্যাঙ্‌ দিয়ে কি হবে, ফাংলু ?"

"কেন,খাবো!" বলিয়া ফাংলু ঠোঁট চাটিতে লাগিল। আমি তো অবাক্! শুনিলাম ব্যাঙের ঠ্যাং আর আরসুলার মাথা পাইলে নাকি চীনা ছেলেরা আর কিছুই চায় না। শুধু ছেলেরাই বা বলি কেন, বুড়োদেরও ঐ কথা!

ডাঃ সান্ ইয়াৎ সেনের পত্নী—ইঁহারও ব্রত দেশের সেবা

মস্ত দেশ এই চীন। অনেকগুলি বড় বড় রাজ্য। তাহাদের মধ্যে ঝগড়া বিরোধও কম নয়। কিছুদিন আগে সেটা খুবই বাড়িয়াছিল। কত লোক ঘরোয়া যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে! আজ চীন স্বাধীন। ছেলেমেয়েদের আনন্দ আর ধরে না। দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা প্রাণপণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় ছিলেন ডাক্তার সান ইয়াৎ সেন। চীনের ছেলেমেয়েরা তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করে। তিনিও ইহাদের



খুব ভালবাসিতেন। বলিতেন, "এই সব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, এরাই তো দেশের আশা"। এই মহাপুরুষের জীবন-কথা যদি তোমরা জানিতে চাও, বলিও, সময় পাইলে আর একদিন শুনাইব।

---

# রাজার বিচার

( শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত বি-এ )

ঝুম্‌রু হাড়ির মেয়ে।

রাজবাড়ীর পেছনে রাজার ছেলের খেলার বাগান। তার পাশে ঝুম্‌রুর মায়ের কুঁড়ে ঘর। মা মেয়েকে নিয়ে সেই কুঁড়ে ঘরে থাকে, আর রাজবাড়ীতে 'খেটেখুটে' চেয়ে-চিন্তে যা পায় তা দিয়ে দু'জনের পেট চালায়।

রোজ বিকেলে পড়ন্ত রোদে রাজার ছেলে বাগানে খেল্‌তে আসে। তার সঙ্গে খেলার সাথী জোটে উজীরের ছেলে আর কোটালের ছেলে। রাজার ছেলে সাথীদের সাথে সোণার ডেলা নিয়ে খেলে। ঝুম্‌রু দূরে দাঁড়িয়ে সে খেলা দেখে। সোণার ডেলা ছোড়া-ছুড়িতে কখনো কাছে এসে পড়্‌লে ঝুম্‌রু যদি ধর্‌তে যায়, অম্‌নি কোটালের ছেলে চোক রাঙ্গিয়ে ধমক দিয়ে ওঠে—'খবরদার! ধরিস্‌নে।' ধমক শুনে' ঝুম্‌রু ভয়ে ভয়ে পিছিয়ে যায়। তার ভয় দেখে' উজীরের ছেলে খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে ওঠে।

একদিন রাজরাণী সখ ক'রে ছেলের গলায় নতুন মুক্তোর হার পরিয়ে দিলেন। হারের মাঝে হাঁসের ডিমের মত প্রকাণ্ড এক মাণিক্য। আর সে ডিম-মাণিক্যের গা থেকে যেন আগুন ঠিক্‌রে পড়্‌চে।

নতুন হার গলায় প'রে রাজার ছেলে বিকেল বেলা খেল্‌তে এল। তার সঙ্গে খেলার সাথী এল উজীরের ছেলে আর কোটালের ছেলে। খেল্‌তে খেল্‌তে রাজার ছেলে গলার হার হ'তে ডিম-মাণিক্যটী খুলে' ফেল্‌লে, আর তাই নিয়ে তিন বন্ধু এ ওর গায়ে ছোড়াছুড়ি খেল্‌তে লাগ্‌ল।

ঝুম্‌রু দূরে দাঁড়িয়ে খেলা দেখ্‌ছিল। অত বড় মাণিক্য, আবার তা জ্বল্‌ জ্বল্‌ ক'রে জ্বল্‌চে,—দেখে' ঝুম্‌রুর মনে কি সথ হোলো—ছোড়াছুড়িতে ডিম-মাণিক্যটী একবার কাছে এসে পড়্‌তেই সে ছুটে' গিয়ে তা'তে হাত ছোঁয়ালে। কোটালের ছেলে,—'খবরদার!' ব'লে ধমক দিয়ে উঠ্‌ল। ভয়ে ভয়ে ঝুম্‌রু হাত গুটিয়ে দূরে পালিয়ে গেল।

খেলা সেরে রাজপুত্র সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরেচে, রাজ-রাণী ছেলেকে কোলে কর্‌তে গিয়ে থম্‌কে গেলেন—'একি! মুক্তোর হারের ডিম-মাণিক্য কই?' তক্ষুণি 'খোঁজ্‌ খোঁজ্‌' ক'রে চারদিকে সাড়া প'ড়ে গেল। বাগানবাড়ী, পথ ঘাট, তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা হোলো—কোথাও তো সে মাণিক্য নেই!…এ কি ব্যাপার!

রাজরাণী উজীরের ছেলে আর কোটালের ছেলেকে জিজ্ঞেস কর্‌লেন—'বলো তো, বাছারা, তোমাদের খেলার বাগানে আর কেউ ছিল নাকি?'…তাই তো! কে আর ছিল সেখানে?—উজীরের ছেলে 'ইয়ে ইয়ে' ক'রে মাথা চুল্‌কোয়,—ভেবে কিছু মনে কর্‌তে পারে না।…কোটালের ছেলের হঠাৎ মনে পড়্‌ল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছিলই তো বটে,—সেই হাড়ির মেয়েটা। আর সে তো একবার মাণিক্যটা নিতেও চেয়েছিল।

রাজরাণী হাড়িবৌ আর তার মেয়েকে ডেকে পাঠালেন। মায়ের সঙ্গে ঝুম্‌রু রাজবাড়ীতে এল। রাণী জিজ্ঞেস কর্‌লেন—'হ্যাঁগা বৌ, শোনো তো, কোটালের ছেলে বলে কি!…সুধোও দেখি তোমার মেয়েকে, আমার ছেলের ডিম-মাণিক্য সে পেয়েছে নাকি?'

রাণীমার একি কথা! হাড়ি-বৌ কথা শুনে' ভয়েই অস্থির। কাঙাল মানুষ তারা, সাত রাজার ধন মাণিক নিয়ে কর্‌বেই বা কি, আর লুকোবেই বা কোথায়? আর, তার মেয়েও তো সে রকম মেয়ে নয়! তবু রাণীমা'র হুকুম—হাড়ি-বৌ মেয়ের মুখের দিকে চায়, মেয়ে মায়ের মুখের দিকে চায়—কারু মুখেই রা' সরে না।

কোটালের ছেলে ধম্‌কে উঠ্‌ল—'কালা নাকি?—রাণীমার কথা শুন্‌চ না? রাজপুত্রের গলার হারের ডিম-মাণিক্য পাওয়া যাচ্ছে না। এই একটু আগেই আমরা তা দিয়ে খেলে এসেচি। খেলার সময় তোমার মেয়ে তা ধরেছিল। আর ও ছাড়া সেখানে তো আর কেউ ছিলও না। নিশ্চয়ই ও-ই সেই ডিম-মাণিক্য চুরি ক'রে রেখেচে।'



কোটালের ছেলের কথা শুনে' ঝুম্‌রুর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত থর্‌ থর্‌ ক'রে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। সে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্‌ল—'কিন্তু আমি তো তা একবার ছুঁয়েছিলুম মাত্র। কোটালের ছেলে ধম্‌কে উঠ্‌লেন, অম্‌নি ফিরে গেলুম। তারপর দূরে দাঁড়িয়ে খেলাই দেখেচি। রাণীমা, সত্যিই আমি সে ডিম-মাণিক্য নিইনি।'

কিন্তু ঝুম্‌রুর কথা শোনে কে? কোটালের ছেলে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—'ঐ শুনুন, মাণিক্য ও ধরেছিল কিনা? আপনি ছাড়্‌বেন না, রাণীমা। সোজা কথায় স্বীকার না পায়, বাবাকে ডেকে আন্‌চি—গুঁতোর চোটে মাণিক্য আদায় হবে।'

হাড়ি-বৌ আর তার মেয়ে যত কাঁদ্‌চে, কোটালের ছেলে ততই জোরে চ্যাঁচাচ্ছে—'ডিম-মাণিক্য নিশ্চয়ই এ নিয়েচে।'

রাজরাণী কি কর্‌বেন ভেবে পাচ্ছেন না, এমন সময় দরবার ভেঙ্গে রাজা অন্দরমহলে এলেন। হাড়ি-বৌ আর তার মেয়েকে কাঁদ্‌তে দেখে, রাজা বল্‌লেন—'এ কি?'

রাণী রাজাকে সব কথা বুঝিয়ে বল্‌লেন। ঝুম্‌রু কেঁদে বল্‌ল—'মহারাজ, সত্যিই আমি ডিম-মাণিক্য নিইনি।'

রাজা একবার নিজের ছেলের দিকে, আবার উজীরের ছেলের আর কোটালের ছেলের মুখের দিকে চান, আর একবার ঝুম্‌রুর দিকে তাকান। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু-চারবার এরকম ক'রে কি ভাব্‌লেন, তারপর বল্‌লেন—'আচ্ছা, আমি এর বিচার করব। তোমারা কেউ আমাকে চার রঙের চারটে গোলাপফুল এনে দাও দেখি।' রাজার হুকুম শুনে' লোকজনেরা দশজনে

দশদিকে ছুটে' গেল। কিছুক্ষণ পরে প্রত্যেকে হাতে ক'রে নিয়ে এল চার চার রঙের চারটে গোলাপফুল। রাজা বেছে বেছে চার রঙের চারটে ফুটন্ত ফুল হাতে নিলেন। তাই মুখের কাছে ধ'রে বিড়বিড় ক'রে খানিকক্ষণ কি বল্‌লেন। তার পর নিজের ছেলের, উজীরের ছেলের, কোটালের ছেলের আর ঝুম্‌রুর হাতে এক এক রঙের এক একটা ফুল দিয়ে বল্‌লেন—'আমি এই ফুলে মন্ত্র প'ড়ে দিলুম। কাল বাদে পরশু তোমাদের বিচার হবে। ঐদিন যখন আমি ডাক্‌ব, তোমরা যে যার ফুল নিয়ে আমার সাথে দেখা করবে। যার দোষ নেই তার হাতের ফুল তাজা থাক্‌বে, জেনো।'

রাজার ছেলে, উজীরের ছেলে, কোটালের ছেলে আর ঝুম্‌রু ফুল নিয়ে চ'লে গেল।

তিন দিনের দিন রাজা সবাইকে ফের ডেকে পাঠালেন।

রাজা বল্‌লেন—'ডিম-মাণিক্য কে নিয়েছে আজ তার বিচার হবে। সে দিন আমি তোমাদের সবাইকে এক একটা গোলাপফুল দিয়েচি, আর ব'লে দিয়েচি—যার দোষ নেই তার হাতের ফুল তাজা থাক্‌বে। এখন দেখাও দেখি তোমাদের যার যার ফুল।'

ফুলের কথা শুনে'ই যেন রাজার ছেলের চমক ভাঙ্‌ল। সে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌ল—'আমার সে ফুল তো নেই। পরশুই তা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।'

—'বেশ।'—রাজা উজীরের ছেলেকে বল্‌লেন—'তোমার ফুল?'

উজীরের ছেলে ফুল বের করলে—জলভরা শিশিতে বোঁটা ডুবানো গোলাপ—আধো মরা আধো পান্‌সে।

উজীরের ছেলের ফুল দেখে' কোটালের ছেলেকে রাজা বল্‌লেন—'তোমার ফুল দেখি?'

কোটালের ছেলে রাজার হাতে দিল—সত্ত ফোটা একটা টাট্‌কা গোলাপ—যেন এই মাত্র গাছ হ'তে বোঁটা ছিঁড়ে' আনা হয়েচে।

কোটালের ছেলের ফুল দেখে' রাজা ঝুম্‌রুর দিকে চোক ফিরালেন।



ঝুম্‌রু আঁচলের গাঁট খুলে' কাঁপা হাতে বের করলে—শুক্‌নো একটা গোলাপ ফুল—রাজার হাত লাগতেই তার পাপড়িগুলো ঝুর্ ঝুর্ ক'রে খসে পড়্‌ল।

রাজা পালঙ্ক থেকে নেমে ঝুম্‌রুকে বুকে জড়িয়ে ধর্‌লেন। সঙ্গে সঙ্গে রাণীর দিকে ফিরে বল্‌লেন—'তোমার ডিম-মণিক্য যে-ই নিক্, এ কখনো নেয়নি, এ খাঁটী সত্য।'

রাজার কথায় সকলে অবাক্ হ'য়ে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

রাজা বল্‌লেন—'তোমরা সবাই অবাক্ হচ্ছ? অবাক্ হওয়ার কথাই বটে। কিন্তু ব্যাপারটা কি, বোঝ। আমি এদের হাতে কয়েকটা গোলাপ ফুল দিয়েছিলুম। মিছি মিছি মন্ত্র পড়ার ভান ক'রে ব'লে দিয়েছিলুম—যার দোষ নেই তার ফুল তিন দিনের দিনও তাজা থাক্‌বে। কিন্তু সত্যিই কি গোলাপ ফুল সে রকম তাজা থাক্‌তে পারে? রাজপুত্র অত ভাবাভাবির ধার ধারেনি—ফুল যেমন পেয়েচে তেম্‌নি হারিয়ে ফেলে বসেচে। ডিম-মণিক্যও হয়তো এই ভাবেই তার হাতে খোয়া গিয়ে থাক্‌বে। উজীরের ছেলে বাপের নাম রাখ্‌তে পার্‌বে! ফুল তাজা থাকে না জেনেশুনেই বুদ্ধি ক'রে তাজা রাখবার উপায় ঠাউরেচে। তার বুদ্ধির তারিফ কর্‌তে হয় বটে, কিন্তু ডিম-মণিক্যের বেলা তার এ বুদ্ধিতে একেবারে রেহাই পাওয়া কঠিন। কোটালের ছেলে আসল বাপ্‌কা ব্যাটা। কেমন চোকের পরে টাট্‌কা ফুল ধ'রে দেখালে—তিন দিনেও তা একই রকম তাজা আছে! যে জ্যান্ত লোককে এমন ফাঁকি দিতে পারে, তার ফাঁকিতে অমন ডিম-মণিক্য কত গণ্ডা মিলিয়ে যায়!' কিন্তু এদের দোষগুণ যাই হোক্, তা ভাবার সময় এই নয়। এখন শুধু মনে হয় এই হাড়ি মেয়েটীর কথা। তাজা ফুল না দেখাতে পার্‌লে নিজে দোষী হবে জেনে শুনেও এ মিথ্যে কাজ করতে পারেনি। তাকে যে ফুল দিয়েছিলুম, শুকিয়ে গেছে দেখেও সেই ফুলই সে ফেরত নিয়ে এসেচে। যার মনে পাপ আছে সে এ রকম কাজ কর্‌তে পারেনা। তাই বল্‌চি, ডিম-মাণিক্য এ কখনো নেয়নি।' বল্‌তে বল্‌তে রাজা রাণীর দিকে ফিরে' বল্‌লেন—'রাণী, তুমি দুঃখ কোরোনা। তোমার একটা ডিম-

মণিক্য খোয়া গেছে বটে, কিন্তু আমার রাজ্যে এমন মানুষ আছে যাদের তুলনায় অমন হাজার হাজার ডিম-মাণিক্য তুচ্ছ—এইটেই আমার বড় আনন্দের কথা। আর আমার সেই আনন্দের কারণ—উজীরের ছেলে নয়, কোটালের ছেলে নয়, আমার নিজের ছেলেও নয়—হাড়ির ঘরের মেয়ে—ঝুমরু!'

---

## পদ্মরাগ

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর ]

( অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ )

অল্প খানিকটা সময় যাইতে না যাইতেই ভিতর হইতে মেয়েদের স্পষ্ট কান্নার স্বর আসিল। তখন অন্ততঃ এ কথাটা বোঝা গেল যে, দস্যুদের আড্ডা এটা নয়—বোধ হয় তাদের দলেরই কাহারো একজনের বাড়ী হইবে। তা হোক, সে বরঞ্চ ভালই। বাড়ীর লোকেরা আর কতই বা সেয়ানা হইবে, তাদের নিকট হইতে কি আর আসল কথাগুলি বাহির করিয়া লওয়া যাইবে না? শিখাইয়া পড়াইয়া ইহাদেরও যে ভালমতেই রাখা হইয়াছে সে তো জানা কথা, কিন্তু তবুও তেমনতর জেরার মুখে ইহারা আর কতক্ষণ টিকিবে?

মিনিট্‌ চার পাঁচ পরে ভিতর হইতে একটী ছোট্ট, আট নয় বছরের মেয়ে বাহির হইয়া আসিল। রণজিৎ ও দীপেনের সম্মুখে গিয়া বলিল, "বাবা তো আজ আড়াইটের গাড়ীতে এখান থেকে পালিয়েই গেছে, তবে তোমরা এত পুলিশ নিয়ে কাকে ধর্‌তে এসেছ? দাদু বাড়ী নেই,—মা, ঠাকুমা সবাই কাঁদ্‌তে লেগেছে। যাও না তোমরা এখান থেকে চলে?"

কথা কয়টা গিয়া খট্‌ করিয়া রণজিতের কাণে লাগিল। মেয়েটী যা বলিতেছে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তার বাবা তো এখান হইতে চম্পট্‌ই দিয়াছে, তবে আর এখন এত লোক লইয়া এখানে আসার দরকারটা কি? বাবা যে তাহার একটা মস্ত অপরাধ করিয়াছে, এ ছোট মেয়েটা পর্য্যন্ত সে খবর রাখে। শুধু



তাই নয়, সেই অপরাধের জন্য পুলিশের লোকে যে যে কোন সময়ে আসিয়া তাহাকে হাতকড়া পরাইতে পারে,—তাহাও তার অজানা নাই। রণজিতের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে এ মেয়েটী আর কেউ নয়, সেই 'খোঁড়া' প্রভুরই কন্যা। তা, এ ভালই হইল। এ যখন এত খবর রাখে, তখন নিশ্চয়ই আরও অনেক জরুরী খবর ইহার নিকট হইতেই বাহির হইয়া পড়িবে।

খুড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে সেই তো তোমার বাবা! নয়?

মিনিট্‌ দুই তিন ধরিয়া রণজিৎ ও দীপেনের মধ্যে ইংরাজীতে কি কথা হইল, ছোট মেয়েটা তার কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাই সে আবার কহিল "কী ফট্‌ ফট্‌ কচ্ছ? যাও না চ'লে এখান থেকে?"

দীপেনের হাসি পাইল। বলিল, "এই যাচ্ছি খুকী, এক্ষুনি যাচ্ছি। অত ধমকালে কি আর তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়? আচ্ছা, ঐ যে—লোকটা কেমন একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে—সেই তো তোমার বাবা! নয়?"

খুকী কিন্তু এবার বিষম চটিয়া গেল। আর চটিবেই বা না কেন, নিজের বাবাকে খোঁড়া বলিলে কার না রাগ হয়? রাগিয়া বলিল, "আমার বাবা খোঁড়া হ'তে যাবে কেন? খোঁড়া তোমার বাবা।"

রণজিৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, দীপেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দেখ্‌লে হে, ভুল আমি কিছুই করিনি! আসলে পা তার ঠিকই আছে। শুধু [illegible] এলেই বাছা কেমন যেন একটু খোঁড়াতে সুরু করেন।" মেয়েটাকে বলিল, "আরে রাম, রাম, ওর যত সব কথা—তোমার বাবা কখনো খোঁড়া হ'তে পারে—অমন চমৎকার তার পা দু'খানা! আচ্ছা, তোমার বাবা যে আজ পালিয়ে গেছেন বল্‌ছ, তা' পালাতে গেলেন কেন তিনি?"

মেয়েটী একটু খুসী হইয়াছিল, বলিল, "না পালালে যদি তোমরা কেউ তাকে ধরে নিতে!" এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া গলাটাকে একটু খাটো করিয়া আবার বলিল, "একটা কথা বল্‌ছি—খবর্দ্দার, কারো কাছে বলো না যেন, মা বারণ ক'রে দিয়েছে কিন্তু—দেখ, বাবা যে এখানে ছিল, সে কথা কেউ জানে না। কি একটা যেন কাজ কর্‌ছিল এখানে—কাউকে না জানিয়ে। দিনের বেলা বাড়ীর ভেতর চুপ্‌টী মেরে বসে থাক্‌তো, অনেক রাত হ'লে তবে সেই কাজে বের হোত। তা না হ'লে ঘুম থেকে উঠ্‌তে কি আর অম্‌নি অম্‌নি অত দেরী হয়? শুধু আজই যা সকাল সকাল উঠেছে, কল্‌কাতায় ফিরে যেতে—ঐ যাঃ, জায়গাটার নাম বলে ফেল্লাম যে! দেখো, তোমরা যেন কাউকে আবার ব'লে ফেল না!"

রণজিৎ দীপেনের মুখের দিকে, ও রণজিতের মুখের দিকে দীপেন তাকাইয়া রহিল, মুখে কেহই কোন কথা বলিল না।

বাহিরে এমন সময়ে কিসের যেন একটা গণ্ডগোল শোনা গেল, এবং সকলের কণ্ঠকে ছাপাইয়া যে উচ্চ গলাটা সবাইকার কাণে আসিল সেটা যেন মনে হইল রাজবাড়ীর বৃদ্ধ গোমস্তা হরিদাস সরকারের, অতি উচ্চস্বরে কাহাকে তিনি শাসাইতেছেন যে, রাজা বাহাদুরকে বলিয়া তাহাকে যদি পূরা তিন বৎসরের জেল তিনি খাটাইতে না পারেন, তবে তাঁহার নাম হরিদাস সরকারই নয়—ইত্যাদি। অপর লোকটীও তীব্রকণ্ঠে কি যেন বলিতেছে, কিন্তু তাহা বুঝা যাইতেছে না। মেয়েটাকে সেইখানে একটু দাঁড়াইতে বলিয়া দীপেন ও রণজিৎ সেই দিকে ছুটিয়া গেল।



হঠাৎ দীপেনকে সেখানে দেখিয়া হরিদাস একেবারে 'থ' হইয়া গেলেন। দারুণ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোটবাবু, আপনি এখানে?"

"হ্যাঁ সরকার মশায়, পুলিশ নিয়ে এ বাড়ীটা আমায় ঘেরাও কর্‌তে হয়েছে। অতি বড় এক বাটপাড়ের বাড়ী এটা।"

"সে কি ছোটবাবু, এ যে আমার বাড়ী!"

"কি? কি বল্লেন? কার বাড়ী এটা?" বিস্মিত দীপেনের মুখ দিয়া একেবারে একসঙ্গে তিন তিনটা প্রশ্ন বাহির হইয়া পড়িল।

"হ্যাঁ ছোটবাবু, আমি ঠিক কথাই বলেছি, এটা আমারই বাড়ী। এখানে বাট্‌পাড় এসে জুট্‌বে কোথা থেকে?"

"তবে সরকার মশাই, এদিকে একটু আস্‌তে হচ্ছে আপনাকে।"—বলিয়া রণজিৎ বৃদ্ধ, বিমূঢ় হরিদাসকে বারান্দার এক কোণে লইয়া গেল। হতভম্ব দীপেনও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

নিরালায় আসিয়া রণজিৎই আবার কথা আরম্ভ করিল। কহিল, "দেখুন, একজন অপরাধীকে ধরবার জন্যে আমরা এত পুলিশ নিয়ে এখানে এসেছি। সহরে এত বাড়ী থাকতে আপনারই এখানে আসার মানে এই যে, আজ তাকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দেখা গেছে। তার পর, এই একটু আগেই আপনার ছোট্ট নাত্‌নীটার মুখে আপনার ছেলের সব কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে। যে লোক সারাটী দিন বাড়ীতে লুকিয়ে বসে থাকে, রাত্তিরে দুনিয়ার লোক ঘুমুলে যার কাজ করবার সময় হয়, মানুষের সাথে দেখা হলেই যার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, আপনিই বলুন, তাকে যদি আমরা সাধু-সজ্জন মনে না করি, তবে কি সে আমাদের খুবই অন্যায়?"

হঠাৎ কথার মধ্যে দীপেন জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "আপনার কোন্ ছেলে সরকার মশাই? অবিনাশ?"

হরিদাস ঘাড় নীচু করিয়াছিলেন, মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ছোটবাবু।" বৃদ্ধের মুখ একেবারে কালীর মত মলিন হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ

মাথা নীচু করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার বরাত বাবু, নইলে এ বুড়ো বয়সে আমায় এতটা ছুর্ভোগ ভুগ্‌তে হবে কেন বলুন! দেনায় দেনায় ছেলেটা ডুবে গেছে, সমসেরপুরে আর তার মুখ দেখাবার জো নেই। তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। অবশ্য মেয়েদের কাছে কিছু বাড়িয়ে বল্‌তে হয়েছে—পুলিশে ধরে নেবে, এ ভয় না দেখালে, হয়তো বা কথাচ্ছলে কখন্ কাকে ফস্ করে কি ব'লে ফেল্‌বে! মেয়েছেলে বই তো নয়! এখানে দিন তিনেক হলো কি একটা দলীল তৈরি করাতে এসেছিল, রাত্তিরে রাত্তিরে উকীলের কাছে যেত, দিনে যাওয়াটা পছন্দ কর্‌তো না।" কথা কয়টা কহিয়া হরিদাস থামিলেন। দারুণ লজ্জায় মাথাটা তাঁহার যেন আপনা হইতেই নুইয়া পড়িতেছিল!

এতক্ষণে দীপেন আবার মুখ খুলিল। বলিল, "রণজিৎ, এ সব কথা আগাগোড়া সত্যি। এ জন্যেই একটু আগে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, এ অবিনাশ কি না। কিছুদিন আগে অবিনাশ আমার সাথে একবার দেখা করেছিল; তখনই দেনার কথা উল্লেখ করে বলেছিল যে, এর পরে হয়তো সম্‌সেরপুরে আসা তাকে একেবারে বন্ধই করে দিতে হবে।"

এতক্ষণের পরিশ্রম, জল্পনা-কল্পনা, এক নিমেষের ফুৎকারে উড়িয়া গেল। বোঝা গেল, পূরা একটা বেলা তাহাদের নিছক নষ্ট হইয়াছে।

তাহা তো হইল, কিন্তু সে খোঁড়াটাকে রণজিৎ যে স্পষ্ট চোখে এই বাড়ীতেই ঢুকিতে দেখিয়াছে! সে আর কিছু অবিনাশ নয়! অবিনাশকে সম্‌সের-পুরে অনেকেই চেনে, শুধু কি আর খোঁড়াইয়াই সে পার পাইবে? তবে কে সে, আর এ বাড়ীতেই বা সে ঢুকিতে গেল কেন? ইহার জবাবও পাওয়া গেল হরিদাসের নিকটেই; বলিলেন "বেলা তখন ছুপুর হবে, নাইতে যাব ব'লে তেল মাখ্‌ছি, এমন সময় একটা লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে বাইরের ঘরটায় ঢুকে বল্লে, 'বাবু, আজ এখানে ছুটো আহার কর্‌তে পাবো?' রান্নাবান্না তখন চুকে বুকে গেছে, আবার কে তখন ছু'বার ক'রে হাঁড়ি চড়ায়! তাই চারটে পয়সা দিয়ে তাকে



বিদেয় কর্‌লাম। এই দরজা দিয়ে সে গলিপথে বেরিয়ে গেল।" বলিয়া হরিদাস গলির দিক্‌কার দরজাটা দেখাইয়া দিলেন।

রণজিতের নিজের ছুই গাল কষিয়া চড়াইতে ইচ্ছা হইল—সামান্য একটু চাল চালিয়া খোঁড়া কেমন সুন্দর তাহার চোখে ধূলা দিয়া পালাইয়াছে! বাড়ী গিয়া সে হয়তো তাহার দলের লোকের সহিত কতই না হাসিয়াছে! মুর্খ সে, এই বুদ্ধি লইয়া সে করিবে আবার হুকা-কাশিকে উদ্ধার! যাহারা চতুর-চূড়ামণি হুকা-কাশির উপর টেক্কা মারিয়াছে, সে যাইবে তাহাদের সাথে লড়িতে! বলে কিসে আর কিসে!! পুলিশ-পাহারা উঠাইয়া সকলে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া রণজিৎ ভাঙ্গা-মনে সটান গিয়া একটা ইজি-চেয়ারে

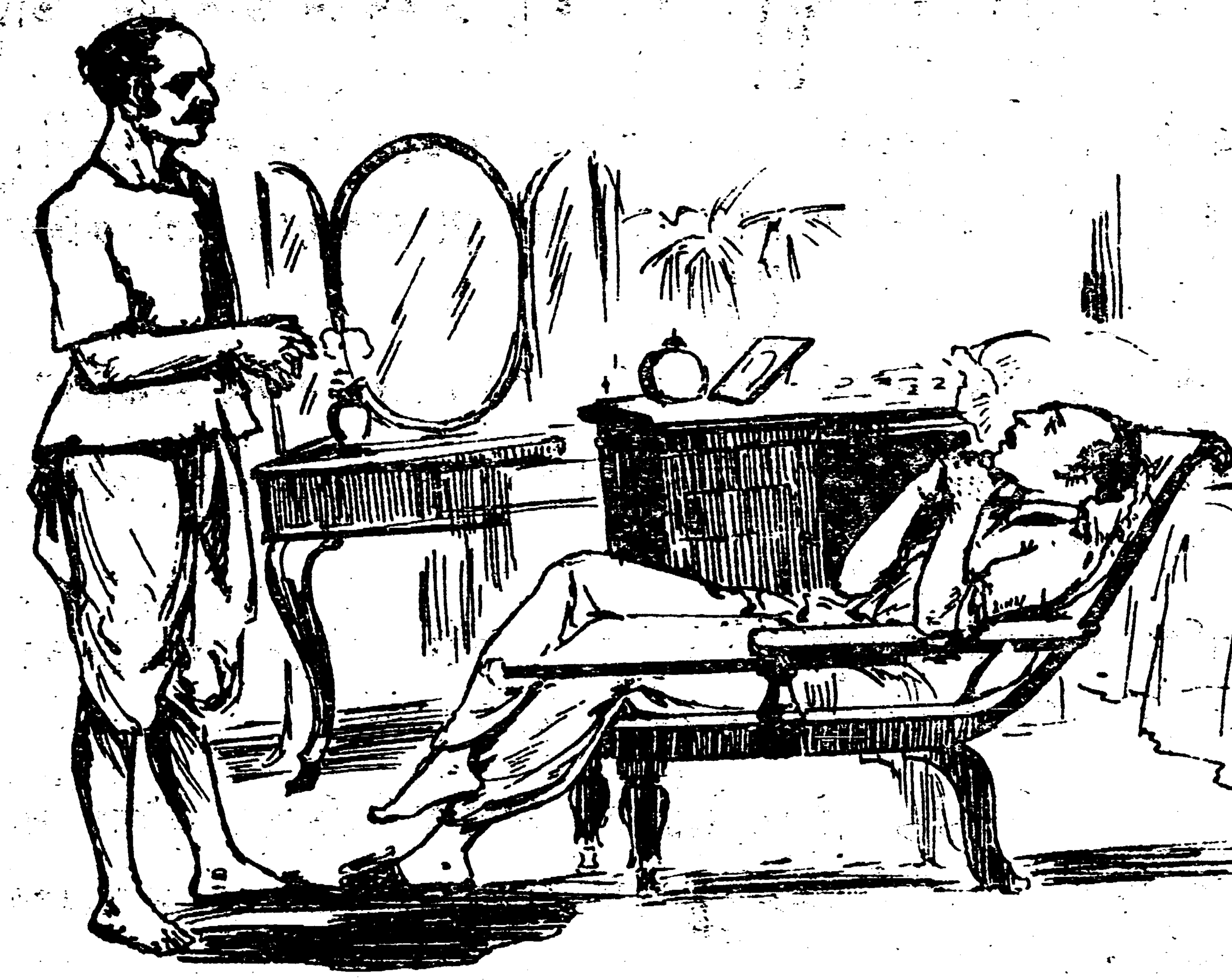

তেঁইজন্যে বসাইয়ে রেখেছেন

শুইয়া পড়িল। ঘরের বড় আর্শিটায় চাকর শিবনন্দনের ছায়া পড়িয়াছিল, একটু পরেই সে সশরীরে সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। বাড়ী পশ্চিমে হইলেও শিবনন্দন

বাংলা দেশে আছে অনেকদিন; তাহার বিশ্বাস, রবি ঠাকুর ভিন্ন বাংলা ভাষায় তার সমান দখল আর কারো নাই। অনেক সুন্দর সুন্দর বাংলা কথা সে শিখিয়াছিল—যেমন, আল্পো (অল্প), আনেক (অনেক), তেঁইজন্তে (সেইজন্ত), ক্যায়টা (কয়টা) ইত্যাদি। এইরূপ বাছা বাছা কয়েকটী সুন্দর সুন্দর শব্দ একত্র করিয়া সে রণজিৎকে বলিল, "এক্ ঠো ছেলিয়া আইসেছেন, আপনি ঘোরে ছিলেন না, তেঁইজন্তে আমি তাকে বাহারমে বসাইয়ে রেখেছেন। তার খুব দোরকারী কাজ আছেন।"

"ডেকে আনো—এখানেই নিয়ে এস।"

"এহিখানে ডাক্‌বেন?"

বিরক্ত হইয়া রণজিৎ বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, এহিখানে ডাক্‌বেন, তাড়াতাড়ি যান্।"

একটু পরে যে ছেলেটী ঘরে ঢুকিল তাহার বয়স বছর বারো। ঠিক ভদ্রশ্রেণীর তাহাকে বলা যায় না। ঢুকিয়াই সে একেবারে প্রশ্ন করিয়া বসিল, "কই? আমার টাকা?"

আশ্চর্য্য হইয়া রণজিৎ জিজ্ঞাসা করিল, "টাকা? কসের টাকা?"

"বাঃ, বাবুটী যে বল্লে, এই চিঠিখানা আপনার কাছে নিয়ে গেলেই আপনি দুটো টাকা দেবেন, কই সে টাকা?"

রণজিতের কৌতুহল আর বেগ মানিল না, পকেট হইতে দুইটী টাকা তাহার হাতে দিয়া বলিল, "দাঁড়াও চুপ ক'রে এখানে, পালিও না।"

চিঠিখানা খুলিয়াই কিন্তু সে দারুণ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল—হুকা-কাশির চিঠি। ইংরাজীতে চিঠিখানা লেখা, আমরা এখানে তাহার বাংলা অনুবাদ দিলাম :—

"প্রিয় রণজিৎ বাবু, এক মুহূর্ত্তের অসাবধানতার জন্য আজ আমি বন্দী! পাঁচ মিনিটে এই চিঠিখানা লেখা আমাকে শেষ করিতে হইতেছে, কেননা এখনও মাটীর উপরেই আছি, এরূপ চিঠিপত্র লেখার কথা প্রকাশ পাইলে বোধ হয়



পাতালে প্রবেশ করিতে হইবে। কি করিয়া এ চিঠি পাঠাইলাম, এ ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন।

এখনও সমসেরপুরেই আছি, কিন্তু কোথায় যে আছি, সে সম্বন্ধে কিছুই ধারণা করিতে পারিতেছি না। ইহাদের চাল-চলনে বোধ হইতেছে, আজই ইহারা এখান হইতে সরিয়া পড়িবে—একটু দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন কি? রাজা-বাহাদুরের ঘরে একটা বইয়ের 'পেজ-কাটারের' ভাঙ্গা হ্যাণ্ডেল নিশ্চয়ই পড়িয়া আছে। বিশেষ যত্নের সাথে তাহা খুঁজিয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিবেন; সাবধান, ঘুণাক্ষরেও কিন্তু সে কথা কাহারো কাছে প্রকাশ করিবেন না। ইতি—

হুকা-কাশি"

(ক্রমশঃ)

---

## বড়-ছোট

(শ্রীবীরেন্দ্রলাল সেন)

বড় আমি ছোট তুমি
এই দুই কথা,
আনিল অনর্থ—যত
ধরণীর ব্যথা।

হাসি' চাঁদ নীলাকাশে
গরবেতে বলে,
মিঠি মিঠি মোরই তরে
তারাগুলি জ্বলে!

তারারাজি বলে হেসে,
কেন এ গরব?
আছে ভানু, তাই মোরা
ঝলিতেছি সব!

তুমি আমি ছোট বড়,
না আনিও মনে,
জ্বলি মোরা— আছি বলে
ভানুর কিরণে।

[ এই বিভাগে কেবল মাত্র গ্রাহক-গ্রাহিকার লেখা ছাপা হয়। প্রত্যেক রচনার সহিত নিজের গ্রাহক নং চাই। ]

## বসন্ত-শোভা

কুমারী উষারাণী দেবী
( পিরোজপুর, বরিশাল )

আম-কাননে পাখীর গানে চমক্ লাগায় হৃদ্-মাঝে,
"পিপিউপিয়া" জুড়ায় হিয়া, চক্ষে আনে নিদ্রা যে,
মুকুল-ঝরা গন্ধে ভরা বৃক্ষ শোভায় মন হরে,
দিল্ কাঁপায়ে দখিণ বায়ে গন্ধে তাহার প্রাণ ভরে।
চমক্ লাগে কুসুম বাগে পুষ্প ফোটে বন ছেয়ে,
লুট্‌ছে মধু ভোমরা বঁধু পাগলপারা গান গেয়ে।
সুর-সোহাগে তন্দ্রা লাগে নিঝুম করা গন্ধে যে;
পুষ্প গাছে পাপিয়া নাচে প্রাণ-কাঁপানো ছন্দে যে।
নিঝুম রাতে বংশী হাতে গায় নিরালা ওই বসে,
পথিক-প্রাণে তন্দ্রা আনে শ্রবণ-কোণে যেই পশে।
মাত্‌ছে হিয়া ওই হেরিয়া বুল্‌বুলীর-ই ফুলগাছে,
"ধিন্‌তা ধিনা তাইরে নানা" গাছের ডালে দুল্‌নাচে।
খোকন সোণা হাত দুখানা বাড়ায়ে দেছে চাঁদপানে,
"ওই যে চাঁদা, ধর্‌বো দাদা"— খোকন মণি ফাঁদ জানে।

---

## রঙ্গ-কণা

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী
( গ্রাহক—৭৮ নং নিউ গেট্ ষ্ট্রীট, শ্রীরামপুর )

১ম লোক। মৃত্যুকে কেউ জয় কর্‌তে পারে না—এখন পর্য্যন্ত কেউ পারেনি।

২য় লোক। আমি পারি।

১ম লোক। কি ক'রে?

২য় লোক। যত দিন বাঁচ্‌বো, মৃত্যুকে আমার কাছে ঘেঁষ্‌তে দেব না।

---

## কাব্‌লীওয়ালার দেশ

মাঘমাসের 'রামধনু'তে আমরা আফগান জাতির ও আমীর আমানুল্লার কথা কিছু বলিয়াছি। আমানুল্লা দেশটাকে বিলাতী ধরণে উপরে তুলিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু মোল্লারা তাঁহার পেছনে লাগিয়া গেল। বাচ্চা-ই-সাকো নামে এক ডাকাতের সর্দ্দার নিমকহারামী করিয়া তাঁহারি টাকায় লোকজন জোটাইয়া তাঁহাকে কাবুল হইতে তাড়াইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। আমানুল্লা বেগতিক দেখিয়া ভাই এনায়তুল্লার মাথায় রাজমুকুট পরাইয়া উড়োজাহাজে কান্দাহার চলিয়া গিয়াছেন। এনায়তুল্লাও কাবুলে টিকিতে পারেন নাই। দস্যু-সর্দ্দারের উৎপাতে তাঁহাকে রাজত্ব ছাড়িয়া ইংরাজের উড়োজাহাজে পলাতক হইতে হইয়াছে। বাচ্চা-ই-সাকোই এখন কাবুলের আমীর—আর, তিনি বলিতেছেন যে তিনি একজন খোদার লোক ( হজরত মহম্মদেরই মত ? )। নিজেকে খোদার লোক বলিলেও লোকে বলিতেছে খোদার সহিত তাঁহার বেশী সম্পর্ক নাই—তাঁহার কাজকর্ম্মগুলি হইতেছে বাস্তবিক সয়তানের মত। কাবুলে লুট তরাজ, অত্যাচার, কত কি হইতেছে। আমানুল্লা যাদুঘরে ভাল ভাল ছবি যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলেন—তাহাতে নাকি পুতুল-পূজা হয়, দাও সেগুলির দফা শেষ করিয়া। যাদুঘর আবার কি ? পারস্য দেশের সুন্দর গালিচা—তাহার উপর ছবি থাকিলেই ত' পুতুল হইয়া গেল, দাও তাহা নষ্ট করিয়া। মেয়ে লোকের জীবন কি আর পর্দ্দা ছাড়া হইতে পারে ?

দাও আবার বোরখা লাগাইয়া। আর কাবুলী লম্বা পাগড়ী এতকাল চলিতেছে, এখন না পরিলে যে লোক কাফের হইয়া গেল, আন তাহা ফিরাইয়া। বিদ্যালয়—সে যে ডাকাত রাজার বিদ্যাবুদ্ধির সীমার বাহিরে—দাও তাহা তুলিয়া। সাবেক মন্ত্রীদের উপর হুকুম চলিতেছে—"হও আমার মন্ত্রী।" অস্বীকার করিলেই অপমানের একশেষ। আমানুল্লার মস্ত অপরাধ—তিনি কাবুলীওয়ালার দেশে ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, আরও কত কি ছেলেমেয়েদের স্কুলে চালাইতেছিলেন। ডাকাত রাজা কি এ সব আজগুবি রাখিয়া দিতে পারেন? দাও ও সব তুলিয়া। এই রকমে নূতন আমীর সাহেবের রাজত্ব চলিতেছে।

তোমাদের কেহ কেহ হয়ত মনে করিতেছ—যেখানে ইতিহাস নাই, ভূগোল নাই, অঙ্ক নাই, স্কুলে যাইতে হয় না, কেবল আছে লাফালাফি আর ঝাঁপাঝাঁপি, সে কি মজারই দেশ! কিন্তু আর একটু বড় হইলে বুঝিবে—দেশটা যদি মানুষের হয়, জানোয়ারের না হয়, তবে এ সকল চাই-ই চাই।

লোক যতই অশিক্ষিত হউক, এমনতর রাজত্বে বেশী দিন বাস করিতে পারে না। এই নয়া আমীর সাহেবের বাদশাহীও বোধ হয় বেশী দিন চলিবে না। আমানুল্লাও লোকজন যোটাইতেছেন। অন্য লোকও গোলমাল দেখিয়া কাবুলের রাজ সিংহাসনে লোভ করিতেছে। তবে এখন শীত, বরফে পথ ঘাট বন্ধ,—তেমন লড়াই হইতে পারিতেছে না। বাচ্চা-ই-সাকোর তাই বাঁচোয়া। শীত গেলে যে তিনি টিকিয়া থাকিবেন এমন মনে হয় না। তাঁহার রাজত্ব এখনও কাবুল সহরের আশে পাশে মাত্র, দূরে তাঁহাকে কেহ মানে না। আমানুল্লা মানুষকে বড় করার চেষ্টায় ছিলেন। আর এই 'পয়গম্বর' আছেন মানুষকে জন্তু করার চেষ্টায়। আমানুল্লা ফিরিয়া আসিলেই আফ্‌গান জাতির মঙ্গল।

---

# জানোয়ারের কথা

( শ্রী........................ )

গত পৌষ মাসের 'রামধনু'তে জানোয়ারের অনেকগুলি অদ্ভুত ক্ষমতার কথা তোমাদের শুনাইয়াছি, আজ তাহাদের সম্বন্ধে আরও কতকগুলি নূতন নূতন খবর দিব।



একটা কথা গোড়াতেই বলিয়া রাখা দরকার—জানোয়ারদের এ সকল ক্ষমতা কিন্তু প্রকৃতি-দত্ত। এমন সব কথাও শোনা গিয়াছে যে, যে সকল জানোয়ার জীবনে কখনো মানুষের নামগন্ধও শোনে নাই, তাহারাও, তাহাদিগকে ধরিবার জন্য পাতা ফাঁদ দেখিয়া এক নিমেষেই বুঝিয়া লইয়াছে যে, ও সব বস্তু বড় সুবিধার নয়। এ রকম একটা ঘটনা আমাদের বলিয়াছেন উত্তর-মেরুর আবিষ্কর্ত্তা নর্‌ওয়ের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ন্যান্‌সেন্। যে জাহাজখানায় চড়িয়া তিনি মেরু আবিষ্কারে গিয়াছিলেন সেখানার নাম ছিল 'ফ্র্যাম্'। দু'দিন পরেই 'ফ্র্যাম্' বরফে একেবারে 'জাম্' হইয়া গেল। একে তো এই বিপদ্, তাহার উপর আবার যখন তখন শ্বেত ভল্লুকের অত্যাচার। উত্তর-মেরুর বাসিন্দা সে সকল ভালুক—যেমন তাদের গায়ে জোর তেম্‌নি তাদের বদ্ মেজাজ। চারিদিকে ধূ ধূ করে বরফ, বহুদিন না খাইতে পাইয়া ক্ষুধার জ্বালায় তাহারা পাগলের মত হইয়া আছে—এতগুলি জীবের লোভ কি আর সাম্‌লাইতে পারে? একটু সুবিধা পাইলেই জাহাজ হইতে তাহারা এটা সেটা চুরি করিতে লাগিল। আজ কুকুরটা গিয়াছে, কাল নিশ্চয়ই মানুষটা যাইবে! কাজেই দেখিয়া শুনিয়া শেষটায় ডাক্তার ন্যান্‌সেন একটা ফাঁদ পাতিলেন। ফাঁদের মাঝখানে দিব্যি খাবারের বন্দোবস্ত থাকিল, আর চারদিকে তার-টার দিয়া এমনই একটা কল করা হইল যে মুখ দিলেই ভালুক বাবাজী আট্‌কা পড়িবেন। এদিকে সুযোগ বুঝিয়া ভালুক প্রভু তো গুটিগুটি আসিয়া উপস্থিত! খাবারের চারিপাশে কল-কব্জার অত ঘটা দেখিয়াই তো সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল—উহুঁ ব্যাপার তো বড় সুবিধার ঠেকিতেছে না! পিছনের চারি পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বেশ ভাল করিয়া ফাঁদটা একটু সে দেখিয়া শুনিয়া লইল, তারগুলির চারপাশটাও একবার ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিল। উঁহু, কাজ নাই বাপু ও সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে গিয়া, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাই। ফাঁদে সে ধরা দিল না। অথচ পেটের অবস্থা তখন তাহার এমন যে, নিজের মাংস ছিঁড়িয়া খাইতে পারিলে বোধ হয় সে তাহা করিতেও ত্রুটী করিত না। এখন কথা হইতেছে যে, ঐ জিনিষটা যে তাহাকেই ধরিবার জন্য পাতা একটা ফাঁদ, এ সে বুঝিল কি করিয়া? মেরুর দেশে তার বাস, ন্যান্‌সেনের আগে

সেখানে আর কোন মানুষই যায় নাই। মানুষই যে চেনে না, মানুষের পাতা ফাঁদ সে চিনিল কি করিয়া ? একেই বলে সংস্কার !

জানোয়ারেরা বনজঙ্গলে কি ভাবে জীবন কাটায়, সেটা একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে তাহাদের স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, গতিবিধি সম্বন্ধে অনেক জিনিষ জানা যায়। মেঘের মত ভীষণ গর্জ্জন করিয়া সিংহ মহাশয় যখন

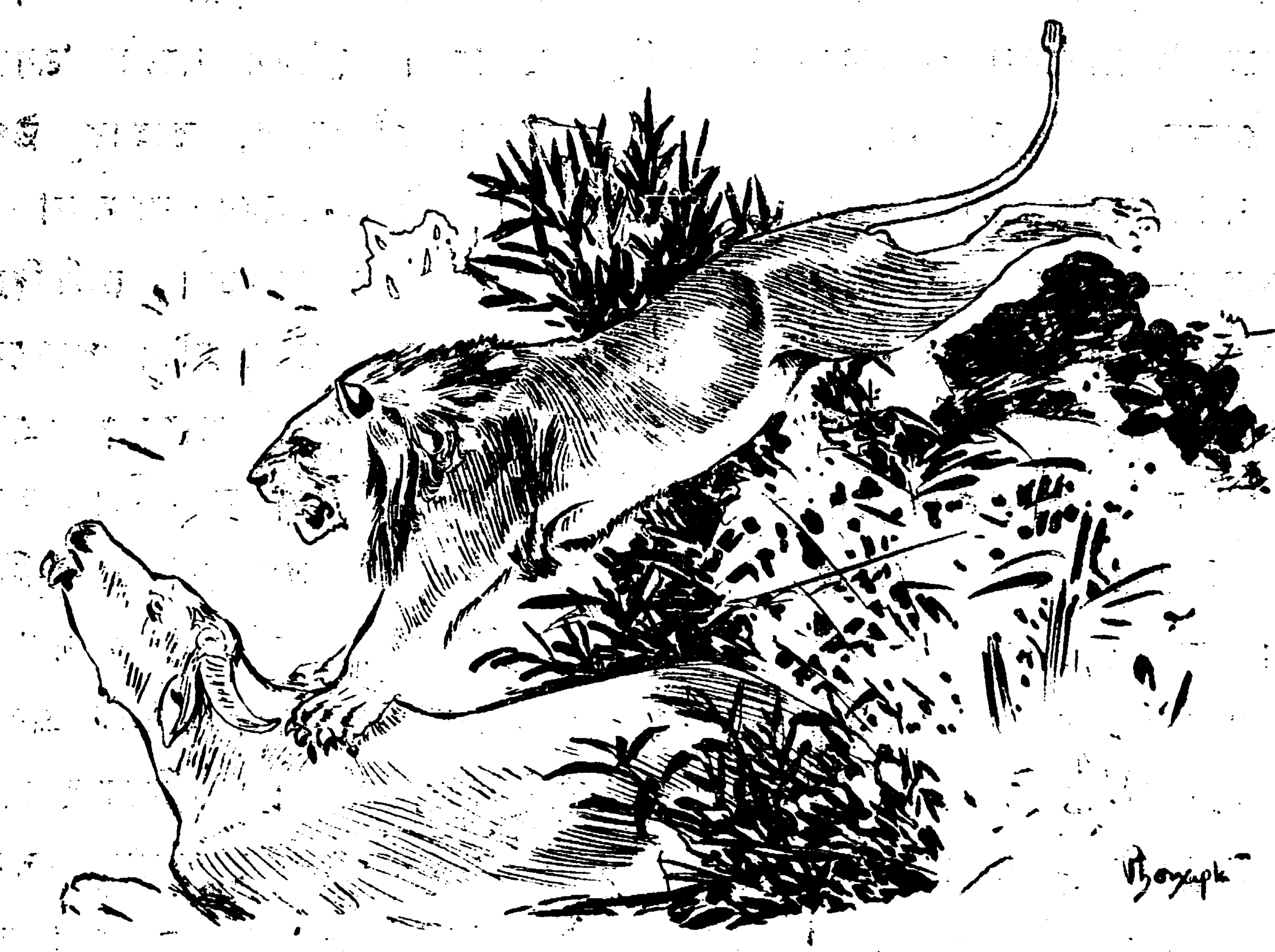

শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে

তাঁহার শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন, তখন অবশ্য অনেক বীরপুরুষেরই আত্মারাম উড়িয়া যায়। কিন্তু তবুও সাহেবদের "জানিবার ইচ্ছাটা" এতই প্রবল যে, হামেশাই যেখানে এ সব কাণ্ড ঘটিতেছে, সেই খোদ আফ্রিকার জঙ্গলে যাইয়াও এ সব জিনিষ লক্ষ্য করিতে তাহারা মোটেই পিছ্‌পা নয়। ড্রামণ্ড্ সাহেব একটা ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে তোমরা সিংহদের নিজেদের পরিবারের ভিতর আচার-ব্যবহার কিরূপ, তাহার অনেকটা আঁচ করিতে পারিবে। তিনি



ছিলেন সে সময়ে জুলুল্যাণ্ডে। একদিন দেখিলেন, একদল জেব্রা প্রাণপণে দৌড়াইতেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হলদে রংয়ের একটা পশু বিদ্যুতের মত ছুটিয়া আসিয়া, পালের গোদা যেটা, সেই জেব্রাটীকেই ঘাল করিয়া ফেলিল। তার পর পশুরাজের কী চীৎকার ! দেখিতে দেখিতে সিংহী তাহার কাচ্চা-বাচ্চা লইয়া হাজির হইল। সাহেব দেখিলেন, জেব্রাগুলি যে দিক্ হইতে দৌড়িয়া আসিয়াছিল, সিংহীটাও আসিল সেই দিক্ হইতেই। তখন তাঁহার আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, সিংহীই জেব্রাগুলিকে এদিকে তাড়াইয়া আনিয়াছে—যাহাতে সিংহ মশাই মনের সুখে বেচারাদের ঘাড় মট্‌কাইতে পারেন। দুইজনে মিলিয়া দিব্যি একজোটে শিকারটী বাগাইল ! তার পর আসিল খাবার পালা। একটু মারামারি কাড়াকাড়ি নাই—চমৎকার ধীরে সুস্থে সকলে মাংস খাইতে বসিয়া গেল। হাজার হোক্ পশুরাজ তো, গাম্ভীর্য্যটা বজায় না রাখিলে চলিবে কেন ? বাচ্চাগুলি গোড়াতে ছোটলোকের মত ভাগ লইয়া একটুখানি চেঁচামেচি করিতে গিয়াছিল বটে, কিন্তু বাপ-মা তাদের দুই চড়ে সজুত করিয়া দিল।

অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস, জানোয়ারদের "আমার জিনিষ" এই জ্ঞানটা খুবই প্রবল। তোমার পোষা কুকুরটী হয়তো তোমার কাছে আর কাউকে ঘেঁষিতেই দিবে না। কেন জান ? তুমি হইলে তার জিনিষ, অন্যে কেন তোমার সহিত এতটা ঘনিষ্ঠতা করিতে আসিবে ? তুমি দাও তোমার বাড়ীখানা অন্যকে ছাড়িয়া ? এ সম্বন্ধে একখানা ইংরাজী কাগজে বড় মজার একটা ঘটনা পড়িয়াছিলাম। এক সার্কাস-ওয়ালা অনেকগুলি সিংহের সহিত খেলা দেখাইতেছিলেন। সবগুলি সিংহই তাঁর নিজের নয়, কতকগুলি নিজের, কতকগুলি অপরের—তবে পোষা সব গুলিই। সার্কাস-ওয়ালার নিজের সিংহের মধ্যে একটা ছিল ভারী বেয়াড়া—মালিককে সে বড় একটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিত না, আর তার হুকুম তামিলও করিত প্রায় সেই রকমই। হঠাৎ সিংহগুলি রুখিয়া উঠিয়া, কি জানি কেন, সার্কাস-ওয়ালাকে আক্রমণ করিল। বেচারার অবস্থা কাহিল,—না যায় তাহাকে বাহির করা, না যায় সিংহগুলিকে গুলি করিয়া মারা ! কেননা, গুলি খাইলে অতগুলি সিংহ আর

কিছু সার্কাস-ওয়ালাকে আস্ত রাখিবে না। হঠাৎ একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিল। সেই বেয়াড়া সিংহটা বোধ হয় মনে করিল, এ সার্কাস-ওয়ালাটা তো আমার জিনিষ, মারিতে হয়, বরং আমি মারিতে পারি—উহারা কে? সে গিয়া আক্রমণ করিল সেই সিংহের দলকে—তুমুল যুদ্ধ! সার্কাস-ওয়ালাকে ছাড়িয়া সবগুলি সিংহ গিয়া পড়িল সেই বেয়াড়া সিংহটাকে লইয়া। সার্কাস-ওয়ালাকে সেই সুযোগে খাঁচা হইতে বাহিরে লইয়া আসা হইল। সৌভাগ্যক্রমে সেই বেয়াড়া সিংহটাও সে বার বাঁচিয়া গিয়াছিল।

এবার অন্য কথা। অনেকের ধারণা মাংস না খাইলে গায়ে জোরই হয় না। যদি তাহাদের বলা যায়, কেন রে বাপু, হাতী, গণ্ডার, মহিষ, এরা যে মাংস খায় না, গায়ের জোরে কি তাই বলিয়া এরা তোমার ঐ বাঘ-সিংহের চাইতে কম যায়, তো অমনি তাহারা বলিয়া উঠিবে, "আরে রেখে দাও তোমার হাতী-গণ্ডার! কত বড় শরীরখানা ওদের! বাঘ-সিংহের মত অত টুকু শরীর হ'লে আর ওদের পাত্তাই পাওয়া যেত না!" গরিলা সম্বন্ধে কিন্তু এ কথা একেবারেই খাটে না। মাথায় সে প্রায় মানুষের সমানই হইবে, কিন্তু কী সাংঘাতিক তার গায়ের জোর! বাঘ-সিংহ হইতে এক তিল কম তো নয়ই। আর কী ভয়ানক তার মেজাজ—যেন সাক্ষাৎ যমদূত! অথচ সে কিন্তু নিরামিষাশী। আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে তার বাস। গরিলা বলিয়া যে একটা জীব আছে, তাহা তো এত দিন লোকে বিশ্বাসই করিত না—কোন শিকারী তার কথা বলিলে তাহা নিতান্ত গাঁজাখুরী গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিত! জীবন্ত অবস্থায় বড় সড় গরিলা ধরা বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত কাহারও সাধ্যে কুলায় নাই—যা' দুএকটা ধরিয়াছে তা নিতান্ত বাচ্চা অবস্থায়। এমনই একখানা চীজ্ সে!

কড়ির বল্টু গুলি কাচের মত ভাঙ্গিয়া গেল



ডাঙ্গায় যেমন গেল ইহারা, তেমনি জলে হইতেছে হাঙ্গর, কুমীর আর অক্টোপাস্। কুমীরকে একটা লোক একবার ভারী জব্দ করিয়াছিল। লোকটা জলে নামিতেই তো স্যাৎ করিয়া একটা ডুবে কুমীর আসিয়া তাহাকে ধরিয়াছে। একটুও না ভড়্কাইয়া অমনি সে কুমীরের দুই চোখে দুই আঙ্গুল ঢুকাইয়া দিল। কুমীর ভাবিল এ আবার কে রে—ভালয় ভালয় তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া লম্বা দিয়া তবে তার রেহাই!

এই অসীম বলশালী জীবকে মানুষ কেমন চাকরের মত খাটাইতেছে

হাতীর গায়ে যে কি অসম্ভব জোর হয়, তাহার একটা ছোট্ট বিবরণ দিয়া আজ তোমাদের নিকট হইতে বিদায় লইব। ৯৮ পৃষ্ঠায় ছবির ঐ হাতীটা নিউ-ইয়র্ক সহরের চিড়িয়াখানার বাসিন্দা। হঠাৎ তাহার একদিন রাগ হওয়ায় সে কি করিল জান? তার ঘরের সেই ভারী ইস্পাতের কড়িগুলিতে শুঁড় দিয়া এমনি মোচড় লাগাইল যে, বল্টু গুলি একেবারে কাচের মত ঝুর্ ঝুর্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। সবাই তো ব্যাপার দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত—এ কী না করিতে পারে? অথচ এ পাতার ছবিতে দেখ, এই অসীম বলশালী জীবকে মানুষ কেমন চাকরের মত খাটাইতেছে!

## অপূর্ব্ব পুকুর

জীবনের আনন্দটাকে পূরামাত্রায় আদায় না করিয়া সাহেবেরা আর কিছুতেই ছাড়িবে না। আমেরিকায় আবার কী এক নূতন কাণ্ড করিয়াছে দেখ! প্রচণ্ড গরম পড়িয়াছে, ছেলেমেয়েরা আর কলের জলে স্নান করিয়া আরাম পায় না—ইচ্ছাটা, পুকুরে নামিয়া বেশ একটু সাঁতার-

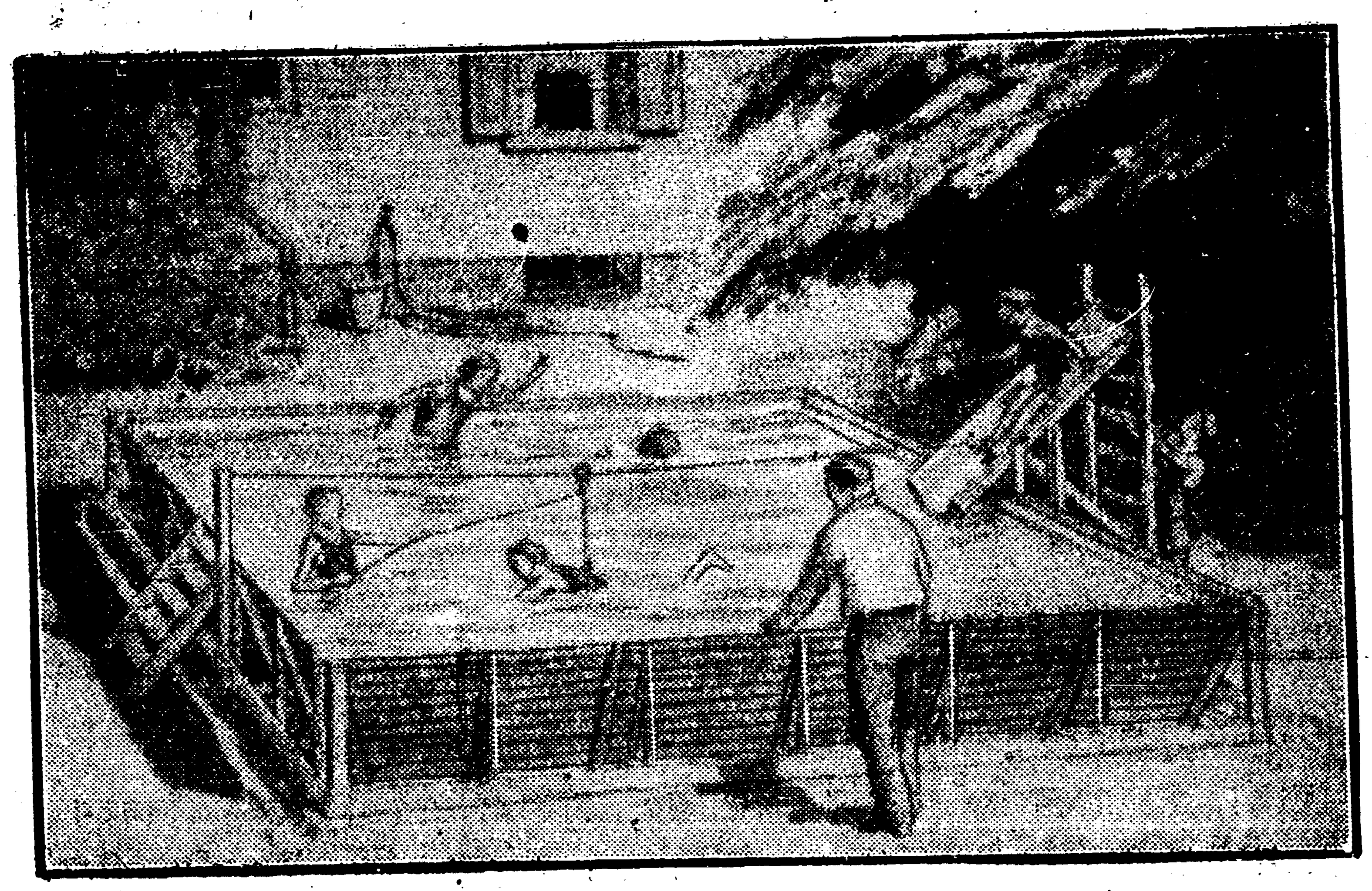

অপূর্ব্ব পুকুর

বাজী খেলে। কিন্তু কচি কচি ছেলেমেয়েরা—যদি ডুবিয়া মরে! কাজেই এই অপূর্ব্ব পুকুরের সৃষ্টি! ব্যাপার কিছুই নয়। বাগানের মধ্যেই কাঠের বেড়া দিয়া একটা কাঠামো তৈরি করিয়া লও। তার পর ত্রিপল বা অন্য কিছু—যাহার ভিতর দিয়া জল বাহির হইতে না পারে এমন একটা জিনিষ দিয়া তলা ও ভিতরটা ছাইয়া ফেল। ছবিতে দেখ, কি ভাবে ওয়াটার-



প্রুফ্ কাপড়কে কাঠামোর সহিত আট্‌কাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তার পর পাম্প [illegible] পুকুরে জল ভরিয়া লও—জলের পরিমাণ এতটা রাখিও যাহাতে ছেলেরা ডুবিয়া না যায়। ব্যস্, এইবার ডাক ছেলের দলকে, লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি, ছড়্‌ছড়ি যাহা খুশী করুক, ডুবিয়া মরিবার আর ভয় নাই।

## যারে বলে বাড়ী

আমেরিকার নিউইয়র্কে "কুইটেবল বিল্ডিং" নামে একটী সাঁইত্রিশ তালা বাড়ী আছে। তোমরা বলিবে, এ আর বিচিত্র কি, পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন তালা বাড়ীর কথাও তো সেখানে শোনা যায়! তা শোনা যায় বটে, কিন্তু এই বাড়ীর বিবরণ একটু শুনিবে? ইহাতে বার হাজার লোকের বাসের বন্দোবস্ত আছে, অর্থাৎ আমাদের বাংলা দেশে ছোট খাটো একটা নগরের সমস্ত লোকই এখানে বাস করিতে পারে। প্রত্যহ ১,২৭০০০ লোক এই বাড়ীতে যাতায়াত করে, ৬৩টী লিফ্‌টের সাহায্যে ৯২,০০০ লোক আফিসের কাজে যায়, ৬৩,০০০ চিঠি ও পার্সেল ভাড়াটিয়াদের বিলি করিতে হয়। বাড়ীটায় মাত্র ৫০০০ জানালা, ১০,০০৫ দরজা ও ১৫০০০ ইলেক্‌ট্রিক বাতি আছে।

## নারীর সংখ্যা

সাধারণতঃ দেখা যায় পৃথিবীতে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান। বোধ হয় ভগবানের বিধানই এই। সময়ে সময়ে কিন্তু এ বিধান একেবারে ওলোট্-পালট্ হইয়া যায়। প্রশান্ত মহাসাগরে, টাগোয়া নামে একটা দ্বীপ আছে। সেখানে নাকি পুরুষ যদি থাকে একজনতো নারী থাকিবে চৌদ্দজন!

## বিলাতে নারী ম্যাজিষ্ট্রেট্

আমাদের দেশে কোথাও যদি এক জন নারী অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা আর কিছু হইল, অমনি খবরের কাগজে তাহার ছবি উঠিল, কত কি হইল! কিন্তু যাও দেখি একবার বিলাতে। সেখানে এ ব্যাপার হামেসাই ঘটিতেছে। নারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ সেখানে কত জন শুনিবে?—১৬৫৭ জন।

## বম্বেতে দাঙ্গা

'প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসিবে'—ইহা বাইবেলের উপদেশ, কিন্তু কয়জন ইহা মানে? আমাদের দেশে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে। ইহাদের ত' ভাই ভাই হইয়াই থাকা

উচিত্, কিন্তু থাকে কই ? এই সে বার কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা ও ছোরা মারামারি হইয়া কত লোক মারা গেল। এবার বম্বে সহর কলিকাতাকে অনেক পেছনে ফেলিয়াছে! কে গুজব তুলিল, পাঠানেরা হিন্দুদের ছেলে ধরিয়া নিতেছে—আর কি রক্ষা আছে, মার পাঠানদেরকে। বম্বেতে কল-কারখানা অনেক, অনেক হিন্দু তাহাতে কাজ করে। পাঠানেরাই বা পেছ-পা হইবে কেন ? তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে দলবল জোটাইয়া লইল। ফলে খুব মারামারি কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে। পুলিশ গুলি চালাইয়াছে, পুলিশের লোকও গুণ্ডার হাতে মরিয়াছে। সৈন্য আনিয়া মোতায়েন রাখা হইয়াছে, সৈন্যেরাও গুলি চালাইয়াছে। এবারকার 'রামধনু' ছাপা হওয়া পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, মারা গিয়াছে ১১০ জনের কম নয়, জখম হইয়াছে ৬০০ জন। আর কলিকাতার দাঙ্গায় মারা গিয়াছিল মোট ৭২ জন। এই ছোটখাট যুদ্ধের বিরাম কবে হইবে কে জানে ?

---

## গতমাসের ধাঁধার উত্তর

ক

| | |
|---|---|
| ১। রাঘব | ২। লাটিম |
| হাজার | বিলাত |
| চেহারা | কমলা |
| পামর | রজক |
| মোচন | পাঠন |
| বৃহৎ | অতসী |
| মাখন | কলেরা |
| রাজা রামমোহন | শয়ন |
| | লালা লাজপত রায় |

খ

১। মরা—রাম    ২। বর—রব

---

## উত্তর দাতাদিগের নাম

### যাঁহারা সবগুলির নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন ঃ—

হিমাংশুকুমার নিয়োগী ( জলপাইগুড়ী ), কৃষ্ণ, কুঞ্জ, কমল, লাবণ্য ( ইটালি, কলিকাতা ), আশারাণী, অশোক, ক্ষেমময়, বিমল, সুধাময়, জহু, বাসু, প্রীতু, হীরু ও জ্যোঃতি ( কলিকাতা ), ব্রজগোপাল রায় ( রায়গড় ) কল্যাণী দত্ত ( নিউদিল্লী ), কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় ( লাহোর ), হেমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, নগেন্দ্র, নৃপেন্দ্র ও দীনেশ



( ময়মনসিংহ ), গিরীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী ( তুষভাণ্ডার, রঙ্গপুর ) দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ( পাটনা ), সুবেণকুমার ও রণেশকুমার গুপ্ত ( জামসেদপুর ), যশোমাধব সাহিত্যসঙ্ঘ ( ধামরাই ), অভ্র, শঙ্কর, ধ্বনি, মণি, কল্যাণী ও সুধামাধব ঘোষ ( জামালপুর ), প্রভাসচন্দ্র সাফুই ( সরিষা ), সুধীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ ( দিনাজপুর ), সুনন্দা ভৌমিক ( রংপুর ), যামিনী, তারক, গৌরী, অমূল্য, নন্দ, অজিত, নিতাই, ভূপেন, সম্বল ও হীরেন ( ঋষি বিদ্যালয়, মধ্যবাংলা সারস্বত আশ্রম, ঢাকা ), পুলিনবিহারী ও নীলিমা কুমারী বিশ্বাস ( কলিকাতা ), পারিজাতরেণু দেবী ( মহিমাগঞ্জ )।

### যাহারা ৩টী ধাঁধার নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন ঃ—

যোগেশচন্দ্র সাহা ( নারিঙ্গেন ), প্রফুল্ল গুপ্ত ( নদীয়া ), সুধীন্দ্রমোহন রায়, শান্তি প্রসাদ নাগ ও ফণীন্দ্রনাথ চাকী ( গাইবান্ধা ), সলিল বর্দ্ধন (নেত্রকোণা), মনোজিৎ বসু ( কুড়িগ্রাম ), মাখন লাল অধিকারী ( কিশোরগঞ্জ ), উত্তর বাংলা সারস্বত আশ্রম ( বগুড়া ), কেশবচন্দ্র সেন ও অমূল্যচন্দ্র সাহা ( মেদিনীপুর ), সদানন্দ ও হীরালাল সাহা ( মেদিনীপুর ), শিবপদ সেন ( বাইসরশী, ফরিদপুর )।

### যাঁহারা ২টীর নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন ঃ—

সেরাজল আবেদিন ( বর্দ্ধমান ), প্রিয়দাস বড়ুয়া ( আকিয়াব ), অপর্ণা, প্রমোদ, ভানু ( ১ ), নরেন্দ্র, অমিয়, সুনীল, টুকু, ফুল, সতী, মিনতি, রমলা, প্রমীলা, অজিত, নিখিল, টাউ, ভানু ( ২ ), রেণু ও গুনু ( ভোলা ), দ্বিজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ( বহরমপুর ), পূর্ণিমা ও সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ ( কর্ম্মাটর ), কমলচন্দ্র সরকার ( ডায়মণ্ড-হারবার ), বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ( বালী ), প্রফুল্লকুমার কুণ্ডু ( লৌহজঙ্গ ), রাজলক্ষ্মী, জয়লক্ষ্মী ও সতীলক্ষ্মী ( আকুই )।

### যাহারা ১টীর নিভুল উত্তর দিয়াছেন ঃ—

রেণুকা, লতিকা, অশোকা ও সব্যসাচী ( রাজসাহী ), সাধনা প্রসাদ দাসগুপ্ত ( দমদম )।

---

## নূতন ধাঁধা

### Zig-Zag Puzzle ( আঁকা বাঁকা ধাঁধা )—

[ **সঙ্কেত** ঃ—মাঘ মাসের রামধনুতে দেখ। ]

| | |
|---|---|
| সেবক | ভোজন |
| সরোবর | ব্যয় |
| যাহা জলে জন্মে | চন্দ্র |
| আকাশ | বিনিময় |
| দীপমালা | ফুল |

উত্তরে যে নামটা পাওয়া যাইবে তাহা আমাদের দেশেরই খুব বড় একজন লোকের নাম।

শ্রীকমলচন্দ্র সরকার

২

সুবোধকে তার সেজ কাকা একখানা সাইকেল দিয়ে বল্লেন "আজ ১১টার ট্রেণে তোর মাসীমারা হবিগঞ্জ ষ্টেশনে নামবেন ; হবিগঞ্জ তো এখানে নয়,তুই শীগ্‌গির সাইকেলটা নিয়ে যা। এই যে দেখছিস্ দু'টো রাস্তা এর বাঁ দিকেরটা দিয়ে যা। দুটো রাস্তাই যদিও ষ্টেশনে গেছে তবু বাঁ দিকেরটা দিয়ে গেলে দু'মাইল পথ কম হবে। এক্ষুনি রওনা হ', তাহলে ঘণ্টায় ৮ মাইল চালালেই ঠিক ১১টার সময় ষ্টেশনে পৌছুতে পারবি।"

সুবোধ ভাব্‌লে একটু বাহাদুরি করি। এই ভেবে সে বাঁ দিকেরটা দিয়ে না গিয়ে ডান দিকের রাস্তা ধরে চল্ল। তবে ঘণ্টায় ৮ মাইল না গিয়ে ১০ মাইল জোরে চালাতে লাগল। ষ্টেশনে গিয়ে সে দেখল যে ট্রেণ আসবার ১২ মিনিট আগেই সে পৌঁছে গেছে। বল দেখি কোন্ রাস্তাটা কত লম্বা ছিল।

---

## চিত্র-পরিচয়

প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ত্তা প্রথমে এই ভাবেই প্রচারিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হাটে গিয়াছেন, এমন সময় বিদ্যাসাগর ভূমিষ্ঠ হইলেন। ঠাকুরদাস বাড়ী ফিরিবার পথে তাঁহার পিতা (বিদ্যাসাগরের ঠাকুরদাদা) রামজয় তর্কভূষণের সহিত দেখা হইল। রামজয় বলিলেন, "আমাদের আজ একটা এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।" এখন ব্যাপার হইয়াছে এই যে, সে সময় তাঁহাদের একটা গরুরও বাছুর হইবার কথা ছিল। ঠাকুরদাস ভাবিলেন বুঝি সেই বাছুরই হইয়াছে, তাই তিনি বাড়ী ঢুকিয়া গোয়াল-ঘরের দিকেই চলিলেন। রামজয় তখন আসল ব্যাপারটা জানাইয়া শেষে বলিলেন, "ইহাকে এঁড়ে বাছুর বলার কারণ এই যে, এ শিশু অত্যন্ত একগুঁয়ে হইবে, যাহা ধরিবে, তাহা করিবেই করিবে।" রামজয় জ্যোতির্ব্বিদ্যা জানিতেন।

এবার হইতে প্রতি মাসে আমরা বাংলার আদর্শ ছাত্র বিদ্যাসাগরের জীবনী এইরূপ রঙ্গীন চিত্রে প্রকাশ করিব। এবছর প্রতিমাসে একখানা করিয়া এরূপ ছবি বাহির হইবে। কাজেই গ্রাহকগণ একত্র ছবিতে বিদ্যাসাগরের জীবনী পাইবেন।

---

চিত্রে বিদ্যাসাগর-জীবনী—২
ছেলের মেধা দেখিয়া গুরুমশাই অবাক্!

C. H. ARAN & CO.

২য় বর্ষ } চৈত্র, ১৩৩৮ { ৩য় সংখ্যা

# কাপাটি কাপাটি ড্যাং

( শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বি-এস্‌সি। )

কাপাটি কাপাটি ড্যাং—
কাপাটি কাপাটি ড্যাং !
ধর্‌ ধর্‌ এই ধর্‌—
পিছে সর্‌ পিছে সর—
এই ছোঁয়—ছোঁয় এই—
তোর কিরে ভয় নেই ?
ডুগ্‌ ডুগ্‌ ডুগ্‌ ডুগ্‌—
কলাই, খেঁসারী, মুগ !

যাস্, কেন যাস্ ভাই—
'ভুড্ডো'রে দম নাই !—
কাপাটি কাপাটি ড্যাং—
ঠ্যাং তোলে কোলা ব্যাঙ্ !

আচ্ছা ও সা-জোয়ান,—
ডন্-করা পালোয়ান্ !
গোঁ ধরেছে বাপ্ রে !
ফেলে নাকি হাঁফ রে !
ফের যদি আসে ভাই—
ভয় নাই ! ভয় নাই !
ঠ্যাং দুটো ধরে ঠিক্—
করে দেব দিক্‌সিক্ !
ল্যাং মেরে তারপর—
এই সর—এই সর্ !

কাপাটি কাপাটি ড্যাং—
কাপাটি কাপাটি ড্যাং !

ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাং—
সর্ সর্ মারে ল্যাং !

গাল-ফুলো ভজারাম,—
থল্‌থলে কালোজাম !

সেদিন এক পাট্টি—
এসে খেলোয়ারটি !

এদিকেতে এলো যেই—
দম্ নেই ! দম্ নেই !

ধপাস্ অমনি ভাই—
হেসে নাহি-কূল পাই !



তারপর ?—তারপর
চাপে হ'ল মর্‌মর্,—
কাঁদে যেন কোলা ব্যাঙ্,
কাপাটি কাপাটি ড্যাং !
ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্—
অর্হর খেঁসারী মুগ !
আয় আয় ! ভয় নাই—
একবার যদি পাই,
করে দেব বাজিমাৎ—
একেবারে কুপোকাৎ !

কাপাটি কাপাটি ড্যাং—
কাপাটি কাপাটি ড্যাং !

দু'পাট্টি ঘাড়ে তোর্—
দূর দূর, দূত্তোর্ !
সন্ধ্যা যে হ'ল পার—
আজ্‌কে হ'ল না আর !
দেখা যাবে এলে কাল—
ভেঙ্গে দেব সব চাল !
শিখে এসে কসুরৎ—
দেখে নেব কিম্মৎ !
চুপ্ চাপ্—চুপ্ চাপ্—
আজ দিনু ক'রে মাপ্ !

কাপাটি কাপাটি ড্যাং—
ঠ্যাং নাড়ে কোলা ব্যাঙ্ ।

# চারশ' বছর আগে মেরুর পথে

( শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য )

মেরুর দেশের কথা তোমরা অনেকেই হয় ত' কিছু না কিছু শুনিয়াছ। সেই ঠাণ্ডার দেশ, সেখানে না আছে গাছপালা, না আছে ফল-ফুল, চারিদিকে শুধু ধূ ধূ করিতেছে বরফ। মানুষের ভিড় নাই, যে কয়েকজন আছে তাহাদের রকম সকমটাই বা কি অদ্ভুত! সারা গা মোটা জানোয়ারের লোম দিয়া জড়ান, হঠাৎ দেখিলে হয়তো ভালুক বলিয়াই ভুল হইবে,—ঘর বাড়ী সব বরফ দিয়া তৈরী। আর মাংস ছাড়া অন্য কোনও খাবার বড় একটা পাওয়া ভার। শাদা শাদা ভালুক, হরিণ, আর সীল এরাই হইল সেই মুলুকের আসল বাসিন্দা।

মেরুর কয়েকটী বাসিন্দা

এমন দেশেও নাকি লোকের যাইতে ইচ্ছা করে? আর সে যাওয়াও বড় সহজ ব্যাপার নয়। না আছে পথ-ঘাট, না আছে গাড়ী-ঘোড়া। মাসের



পর মাস তোমাকে বরফ কাটিয়া কাটিয়া নৌকা ঠেলিতে হইবে, আর পদে পদে না খাইয়া অথবা শীতে জমিয়া মরিবার ভয় ত' আছেই!

তোমরা এক বাক্যে বলিবে, কাজ নাই বাপু অমন বেড়ান'য়, ঘরের ছেলে ঘরে আছি, বেশ আছি। কিন্তু এক ধরণের লোক আছে যাহারা এই ধরণের জায়গায় বেড়াইতেই সব চেয়ে আনন্দ পায়। অদ্ভুত সাহস আর শক্তি লইয়া তাহারা জন্মায়। নূতন জ্ঞানের জন্য, আবিষ্কারের নেশায়, তাহারা না করিতে পারে এমন কাজ নাই।

এই ধরণেরই একজন লোক ছিলেন হেন্‌রী হাড্‌সন্। বাড়ী ছিল তাঁহার ইংলণ্ডে।

সে আজ প্রায় সাড়ে চারশ' বছর আগেকার কথা, ইয়োরোপ হইতে এসিয়ায় আসিবার সহজ কোন পথ লোকে জানিত না। হাড্‌সন ঠিক করিলেন তিনি একটা খুব সহজ পথ দেখাইয়া যাইবেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল জাহাজে করিয়া উত্তর মেরুটা পার হইতে পারিলেই এসিয়ায় পৌছান যাইতে পারে।

তথনকার লোকের বিশ্বাস ছিল, মেরুর কাছাকাছি দেশ গুলিতে দৈত্য-দানবেরা থাকে—জলের মধ্যে মৎস্য-কুমারীরা দলে দলে ঘুরিয়া বেড়ায়—অমন বিপদের জায়গা আর নাই। হাড্‌সনও সে সব বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু সে সবকে তিনি ভয় করিবার পাত্র মোটেই ছিলেন না। তিনি বলিলেন, "বেশ ত মৎস্য-কুমারীদের চেহারাটাও ভাল করিয়া দেখিয়া আসিব।"

হাড্‌সনের সঙ্গে চলিল তাঁহারই মত বাছা বাছা দশ জন লোক, আর তাঁহার বালক পুত্র জন্। তারপর একদিন পাল তুলিয়া তাঁহারা নীল সাগরের বুকে পাড়ি দিলেন।

জাহাজ যতই উত্তরের দিকে চলিল, ঠাণ্ডা ততই বাড়িতে লাগিল। তার পর আস্তে আস্তে বরফ দেখা দিল। শেষে বরফের মধ্যে জাহাজ আট্‌কাইয়া গেল। বরফ কাটিয়া কাটিয়া তাঁহারা চলিলেন, কিন্তু শেষে তাহাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

বাধ্য হইয়াই তখন তাঁহারা একটু ঘুরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই চির-তুষার ভাঙ্গিয়া পার হওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব, কাজেই সে যাত্রা তাঁহাকে ফিরিতে হইল। তবে তাহার মধ্যেও একটা বড় তথ্য জানা গেল যে, মেরু পার হইয়া এশিয়ায় যাইবার উপায় নাই।

দেশে ফিরিয়া হাড্‌সন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার লোক মোটেই নন। তিনি ভাবিলেন, আচ্ছা সোজা উত্তর দিক্‌টা না হয় বন্ধই আছে, কিন্তু একটু ঘুরিয়া উত্তর-পশ্চিম কিংবা উত্তর-পূর্ব্ব দিক্ দিয়া গেলেই ত চলে। সাত মাসের মধ্যেই আবার তিনি প্রস্তুত হইলেন। এবার সঙ্গে চলিল ১৩ জন অনুচর।

আবার সেই বরফের মধ্যে জাহাজ আট্‌কা পড়িল—তিন সপ্তাহ ধরিয়া বরফের সঙ্গে যুদ্ধ চলিল, কিন্তু এক পা'ও আগান গেল না। তখন তিনি উত্তর-পশ্চিম দিক্ দিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। মাঝ হইতে একটা প্রকাণ্ড ঝড়ের মধ্যে পড়িয়া তাঁহারা একটুর জন্য মরিতে মরিতে রক্ষা পাইলেন। যেদিকে পথ নাই সেদিকে কে আর যাইতে পারে? মিথ্যামিথ্যি সঙ্গের লোকগুলিকে কেনই বা মারিবেন? হাড্‌সন আবার ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু ক'দিনের জন্য? আবিষ্কারের নেশা তাঁহাকে চাপিয়া বসিয়াছে, ঘরে তাহাকে ধরিয়া রাখে কাহার সাধ্য?

এবার তাঁহার একটা সুবিধা জুটিয়া গেল, ওলন্দাজেরা তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিল। শেষে তাহাদেরই দু'খানা জাহাজ লইয়া আবার হাড্‌সন রওনা হইলেন। জাহাজ দু' খানার নাম "হাফ্ মুন্" ও "হোপ্‌ফুল"।

আবার সেই আগেকার মত গোলমাল, শেষে সঙ্গের লোকেরা বাঁকিয়া বসিল। হাড্‌সন 'হোপ্‌ফুল' ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন কিন্তু নিজে "হাফ্‌মুন" লইয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে ঢুকিলেন।

কিন্তু সে যাত্রায়ও বিশেষ ফল হইল না, কতকগুলি নূতন দ্বীপ ও নদী আবিষ্কার করিয়া সে বারেও তাঁহাদের ফিরিতে হইল।



কিন্তু অদ্ভুত অধ্যবসায় লইয়া হাড্‌সন জন্মিয়া ছিলেন। এত করিয়াও তিনি দমিলেন না। তিনি যাহা পণ করিয়াছেন তাহা করিবেনই। তাই কিছুদিন পরে আবার তিনি জলে ভাসিলেন; এবার তাঁহার সঙ্গে রহিল ছয় মাসের মত খাবার, ২০ জন লোক ও তাঁহার ছেলে জন্। এই ২০ জনের মধ্যে গ্রীণ বলিয়া একজন দুষ্ট লোক ছিল।

মেরুর পথের একটি দৃশ্য

জাহাজ চলিতে লাগিল। কত অদ্ভুত অদ্ভুত নিত্য-নূতন দৃশ্য তাঁহাদের চোখে পড়িতে লাগিল। এক জায়গায় নাকি তাঁহারা কতকগুলি মৎস্যকুমারীও দেখিতে পাইলেন (আসলে সেগুলি সীল্‌মাছ)।

ক্রমে পথ দুর্গম হইতে লাগিল। কিন্তু এবার আর হাড্‌সন ফিরিবেন না ঠিক করিয়াছিলেন। বরফ ভাঙ্গিয়া, ঝড় বৃষ্টি মাথায় লইয়া তাঁহারা চলিলেন। উত্তর—তারপর পশ্চিম এমনি করিয়া শেষে তাঁহারা এক নূতন সমুদ্রে আসিয়া পড়িলেন। (তোমরা ভূগোলে যে হাড্‌সন উপসাগরের কথা পড় এটা আসলে তাই—হাড্‌সনের নাম হইতে পরে এই নাম হইয়াছে)। সেই বিরাট জলরাশি

দেখিয়া হাড্‌সন ভাবিলেন—এতদিনে বুঝি তাঁহার আশা পূর্ণ হইতে চলিল। তিনি এই উপসাগরটাকে প্রশান্ত মহাসাগরে ঢুকিবার পথ বলিয়া ধরিয়া লইলেন।

তিন মাস ধরিয়া হাড্‌সন সেই সাগরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। কিন্তু কিছুই হইল না, প্রশান্ত মহাসাগরে ঢুকিবার পথ পাওয়া গেল না। জাহাজের লোকেরা শেষে আপত্তি তুলিল। এরকম অনির্দ্দিষ্টভাবে আর কতদিন ঘুরিয়া বেড়ান যায়? তার উপরে সম্মুখে শীতকাল।

ইহার মধ্যে একদিন একটা দ্বীপ পাওয়া গেল। জাহাজের লোকেরা বলিল, "এইখানে শীতটা কাটাইয়া যাওয়া হউক।" কিন্তু কে সে কথা শোনে? হাড্‌সন তখন একটা দিনও নষ্ট করিতে নারাজ।

পথ মিলিল না। তার পর একদিন এক প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ঝড় আসিয়া জাহাজের নোঙর টোঙর ভাঙ্গিয়া একাকার করিয়া দিল। তার পর শীত আসিল, জল জমিয়া বরফ হইয়া গেল, জাহাজ আটকা পড়িল। সেই অবস্থায় দারুণ কষ্টের মধ্যে সারা শীতকালটা তাঁহাদের কোন রকমে কাটাইয়া দিতে হইল। বরফ গলিলে আবার তাঁহারা রওনা হইলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শেষে একদিন দেখা গেল, খাবার ফুরাইয়া গিয়া মাত্র পাঁচ টুকরা পণির বাকী রহিয়াছে। হাড্‌সন তাহাই সকলকে সমান ভাগ করিয়া দিলেন।

সেই যে দুষ্ট লোকটা—গ্রীণ, সে কিন্তু ইতিমধ্যে এক কাণ্ড বাধাইয়া রাখিয়াছিল। হাড্‌সনের সাথে আসিয়া বেচারা বেজায় মুস্কিলে পড়িয়াছিল; তাই এত দিন সে প্রতিশোধ দিবার ছুতা খুঁজিতেছিল, আর দলের লোকদের বিগ্‌ড়াইয়া দিবার চেষ্টায় ছিল। সে আর তাহার দলের লোক এইবার 'সমান ভাগ হয় নাই' এই বলিয়া ছল করিয়া হাড্‌সনকে আক্রমণ করিল। হাড্‌সনের পক্ষে যাহারা ছিল তাহারাও রুখিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা ছিল অল্প—কাজেই পারিল না। ফলে, কয়েকজন খুন হইল।



তার পরের কথা ভাবিতেও কান্না পায়। দুরাত্মারা হাড্‌সন, তাঁহার ছেলে ও রুগ্ন কয়েকজন লোককে বাঁধিয়া ফেলিয়া একটা নৌকার মধ্যে নামাইয়া দিল। তার পর সেই নৌকার মধ্যে সামান্য ২।৪টা আসবাব ফেলিয়া দিয়া, সে নৌকা সেখানে খুলিয়া দিয়া, জাহাজ লইয়া সরিয়া পড়িল। এমনি করিয়াই সেই বিরাট্ সাহসী মানুষটার জীবন শেষ হইল। অসহায় অবস্থায় সেই সীমাহীন সমুদ্রের মধ্যে একখানা ভাঙ্গা নৌকায় তিনি ভাসিতে লাগিলেন। তার পর কি হইল কেহই জানে না।

সেই দুষ্ট দলের মধ্যেও সকলকে আর দেশে ফিরিতে হইল না। গ্রীণ ও আর কয়েকজন লোক খাবার সংগ্রহ করিতে গিয়া এস্কিমোদের হাতে প্রাণ হারাইল। বাকী কয়েকজন নানা দুঃখ কষ্ট সহিয়া হাড় আর চামড়া ক'খানি মাত্র লইয়া দেশে ফিরিল।

---

## হরি-হর

(শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ)

### এক

একই রাস্তার এপার ওপার ঠিক মুখোমুখী দুই খানি বাড়ী। এক খানি শাদা রংএর একতলা, তার দেয়ালের গায়ে লেখা আছে—ডাক্তার হরিনাথ ধর। আর এক খানি লাল রংএর দোতলা, গেটের উপর লেখা—ডাক্তার হরনাথ কর। দুই ডাক্তারে ভাবের আর অন্ত নাই। ধর করের নাম শুনিলেই বলে পাজী, আর কর, ধরের ছায়া দেখিলেই বলে ছুঁচো। পাড়ার লোকে বলাবলি করে, হরিনাথ আর হরনাথ যেন হরি-হর আত্মা।

হরিনাথ ওপারের দোতলার দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকায় আর দাঁত কড়মড় করিয়া বলে,—একটা ভূমিকম্প, ভগবান্, একটা ভূমিকম্প! সকালে উঠে যেন দেখ্‌তে পাই, ঐ দোতলার সব ইট ধূলোয় গড়াগড়ি। দিন যায়, ভূমিকম্পও দুই

একটা হয়, কিন্তু দোতলার ইট ঠিকই থাকে। শেষটায় স্থির হইল নিজের বাড়ীটাই দোতলা করিতে হইবে। গিন্নীর কাছে কথাটা পাড়িতেই, তিনি অবাক্ হইয়া কহিলেন,—টাকা? হরিনাথ মাথা চুল্কাইতে চুল্কাইতে কহিল, "কিছু হাতে আছে; আর বাকীটা ভাব্ছি তোমার গয়না গুলো যদি—"

গিন্নী তিন হাত ছিট্কাইয়া গিয়া নথ নাড়িয়া হাত ঘুরাইয়া বলিলেন, "আহা-হা! সখ্ দেখে আর বাঁচিনা!"

স্ত্রীর সেই মূর্ত্তি দেখিয়া হরিনাথের বুক শুকাইয়া যায়। দোতলার আশা ঐ পর্য্যন্তই থাকে।

সেদিন দুপুর বেলা হরিনাথ খাইতে বসিয়াছে; আর, হরনাথ দাড়ি কামাইবার জন্য মুখে সাবান মাখিতেছে। এমন সময় রাস্তা থেকে কে ডাকিল, "ডাক্তার বাবু আছেন?" দুই ডাক্তার এক সঙ্গে সাড়া দিয়া কহিল, "আজ্ঞে, আসুন।" মিনিট খানেকের মধ্যেই দুই জনে দুই দিক্ থেকে বাহির হইয়া আসিল, এবং পরস্পরের দিকে এমন করিয়া তাকাইল, যে সত্যি কাল হইলে দুই জনেই ভস্ম হইয়া যাইত। ভাগ্যিস্ এটা কলি কাল! হরনাথের হাতে সাবান মাখা ব্রাস্, আর হরিনাথের হাতে ডালমাখা ভাত। লোকটি ত অবাক!

হরিনাথ বলিল, "আপনার কি অসুখ?"

সঙ্গে সঙ্গে হরনাথও কহিল, "আপনার কি অসুখ?"

হরিনাথ হাঁকিয়া কহিল, "সাবধান, বল্ছি।"

হরনাথ আরো জোরে হাঁকিল, "সাবধান, বল্ছি।"

ব্যস্। লাগিয়া গেল হরি-হরের যুদ্ধ। পাড়ার লোক ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, হরিনাথের ভাত গিয়াছে হরনাথের ডান গালে, আর হরনাথের সাবান আসিয়াছে হরিনাথের বাঁ গালে, রোগী অনেকক্ষণ চম্পট দিয়াছে।

দিন দুই পরে ডাক্তার ধর সকাল সকাল খাওয়া শেষ করিয়া একটা ব্যাগ হাতে করিয়া রোগীর বাড়ী যাত্রা করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার করও অন্য ফুটপাথ ধরিয়া ঠিক একই তালে পা ফেলিয়া ব্যাগ ঝুলাইয়া



চলিয়াছে। পথে একজন ভিখারী পয়সা চাহিতে, হরিনাথ একটি পয়সা দিল। হরনাথ ভাবিল, আমার বুঝি পয়সা নাই? কিন্তু কাছে অন্য ভিখারী নাই, সুতরাং উহাকেই ডাকিল,—"ওরে"। ভিখারী ডাক শুনিয়া ভয় পাইল, ভাবিল, ডাক্তার নিশ্চয়ই তাহাকে অস্ত্র করিবে। অতএব, আর কোন দিকে না চাহিয়া সোজা দৌড়! হরনাথ ছাড়িবে কেন? সেও পিছন পিছন ছুটিল। মিনিট পনেরো পরে ভিখারীকে ধরিয়া টানিতে টানিতে হরিনাথের সম্মুখে আনিয়া তাহার হাতে দুইটা পয়সা দিল। হরিনাথও সঙ্গে সঙ্গে তিনটি।

অমনি হরনাথ চা'রটা। এমনি করিয়া কর যত দেয়, ধর দেয় আরও বেশী, আবার ধর যত দেয়, কর দেয় তারও বেশী। দেখিতে দেখিতে পয়সা ফুরাইয়া গেল। তখন টাকা।

টাকাও ফুরাইয়া গেল। তখন নোট্। নোটগুলোও যখন শেষ হইয়াছে, দুই জনে দুই জনের দিকে জ্বলন্ত চোখে একবার তাকাইয়া চলিয়া গেল। ভিখারীটা রাস্তায় দাঁড়াইয়া কান্দিতে লাগিল। টাকা না দিয়া মার দিলে সে অনেক খুশী হইত।

দুই

সীধু সরকার হরনাথের রোগী। সেদিন অবস্থা একটু খারাপ হইয়া পড়িতেই তাহার ছেলে ডাক্তার বাবুকে ডাকিতে ছুটিয়াছিল। পথে হরিনাথের সঙ্গে দেখা। "কিরে বাঞ্ছা? শোন্ শোন্, ছুটছিস কেন?" বাঞ্ছা কহিল, "আজ্ঞে, বাবার বড্ড অসুখ। ও ডাক্তার বাবুকে—"

হরিনাথ কহিল, "অসুখ? তবে চল্, দেখে যাই।"

বাঞ্ছা বলিল, "কিন্তু..."

"আবার কিন্তু কি রে? চল্।"

সীধুর ডান হাতে হরনাথ একটা মাত্র ইন্জেক্সন্ দিয়াছিল। সুতরাং হরিনাথ বাঁ হাতে দুইটা ইন্জেক্সন্ লাগাইয়া দিল। তাই শুনিয়া হরনাথ ডানহাতে দিল আরো তিনটা, এবং পরদিনই হরিনাথ আসিয়া বাঁ হাতে চারটা;

এমনি করিয়া চলিল। সীধু যত বলে "মরে গেলাম ডাক্তার বাবু, আর ফুঁড়বেন" না, হরিনাথ ততো বেশী করিয়া ফোঁড়ে আর বলে "ঐ পাজীটার হাতে যদি না মরে থাক, আমার হাতে মরবে না।"

সীধু সারিয়া উঠিল বটে, কিন্তু হাত দুইখানা গেল। ক্ষতি-পূরণের দাবীতে সে দুই ডাক্তারের নামে নালিস রুজু করিল। জজ সাহেব আসামীদের তলব করিলেন। বিচারে স্থির হইল, হরিনাথের অপরাধ বেশী; তাহার জরিমানা দু'শ টাকা, আর হরনাথের দেড় শ। হরনাথ হাত জোড় করিয়া কহিল, "হুজুর, আমারও দু'শ টাকা জরিমানা আজ্ঞে হোক্!"

জজসাহেব অবাক্ হইয়া কহিলেন, "কেন?"

"আজ্ঞে ঐ ছুঁচোটা যদি দু'শ দেয়, আমিও দিতে পারবো।"

হরিনাথ রাগে গস্‌গস্ করিতে করিতে কহিল, "আর ঐ পাজীটা যদি দুশ' দেয়, হুজুর আমি দেবো তিন শ'।"

হরনাথও রুখিয়া উঠিয়া কহিল, "তা'হলে আমার চারশ'।" মারামারির উপক্রম। তখন পুলিশ আসিয়া দুই জনকে থামাইল। জজসাহেব দেখিলেন, মহাবিপদ, কহিলেন, "আচ্ছা, আবার বিচার হবে।"

পরের দিন আদালতে ভীষণ ভীড়। জজসাহেব হুকুম দিলেন, "তোমাদের শাস্তি—আমার সামনে দাঁড়াইয়া, সমস্ত এজলাসের কাছে তোমরা দু'জনে কোলাকুলি করবে।"

ধর ও করের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। হরিনাথ কান্দিয়া কহিল, "হুজুর, আমাকে সাত বছর জেল দিন। তবু ওটা পারবো না।"

হরনাথও কান্দিতে কান্দিতে বলিল, "আমাকে আট বছর দিন, হুজুর!" জজ-সাহেব হাঁক দিয়া কহিলেন, "আমার হুকুম মানতে হবে।" তার পর দুই ডাক্তারকে মুখোমুখী দাঁড় করানো হইল। জজসাহেব বলিলেন, "এক—দুই—তিন।"

ব্যস্। ধরে এবং করে কোলাকুলি হইয়া গেল।



সব গোল এবার একেবারে মিট্‌মাট্। আজকাল দুই ডাক্তারে বেজা[y] ভাব। হরিনাথ ডাকে, 'ভাই হরনাথ'! হরনাথ বলে, 'কি ভাই হরিনাথ'! পাড়া[র] লোকে আবার বলাবলি করে, "হরিনাথ আর হরনাথ যেন হরিহর আত্মা!"

---

## 'আগে চল্ আগে চল্'

রবি বাবুর একটা গান আছে, "আগে চল্ আগে চল্ ভাই।" কবি আমাদের আগাইয়া চলিতে বলিতেছেন। আসলে কিন্তু আমরা তেমন আগাইয়া চলিতে পারিতেছি না। হ্যাঁ, আগাইতেছে বটে সাহেবেরা। বড় বড় ব্যাপারের উদাহরণ তো রোজই পাইতেছ, ছোট-খাটো তুচ্ছ ব্যাপার, যা আমাদের মনেই আসে না, সে বিষয়েও তাহারা কেমন হুঁসিয়ার দেখ!

বলিবে, "থ্যাঙ্ক ইউ"

পার্কে বেড়াইতে গিয়াছ, হঠাৎ মনে হইল, বেঞ্চির উপর বসিয়া একটু ধীরে সুস্থে একখানা খবরের কাগজ পড়িতে পারিলে মন্দ হইত না। কিন্তু খবরের কাগজ পাইবে কোথায়? দৈবাৎ যদি কোন ফেরি-ওয়ালা সেদিকে আসে তবেই যা একটু ভরসা। ফলে হয়তো তোমার কাগজ পড়ার ইচ্ছাটাই মাঠে মারা যাইবে। জার্ম্মাণীর বার্লিন সহর হইলে এ আর তোমাকে সহিতে হইবে [না।] পার্কে পার্কে কল বসান আ[ছে]

ধ্যে পয়সা ফেলিয়া দাও, কল অমনি ‘ঘচ্’ করিয়া তোমাকে এক খানা কাগজ উগ্‌রাইয়া দিবে। আর সঙ্গে সঙ্গে কি বলিবে, জান? বলিবে, ইউ”।

বার্লিনের পার্কে পার্কে আর একটা জিনিষ দেখা যায়, সেও ভারী কার। তোমাদের মধ্যে যাহারা কলিকাতার বাহিরে থাক, তাহাদের কাউকে কলিকাতার মধ্যে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, অবস্থাটা কি হয় ভাব দেখি! দিন ঘুরিতে ঘুরিতে হন্দ যাও, তবু বাড়ী চিনিয়া উঠিতে পার না। কাতাতেই যদি এমন হয় বার্লিনে কি হইবে? সে সহরটা গোটা তন কলিকাতার সমান, বিদেশী সেখানে গিয়া যে ঠাঁই-ই না। সেখানকার কর্ত্তা কি বিদেশীদের কথাও ভাবিয়া রাখিয়াছেন।

কোন্ রাস্তায় কি ভাবে যাইতে হয়, দেখিয়া লও।

র্কে পার্কে টেবিলের উপর গোটা সহরের মস্ত বড় ম্যাপ্ রহিয়াছে—কাচ দিয়া



সে ম্যাপ্ ঢাকা—ব্যস্, যেখানে দাঁড়াইয়া আছ সেখান হইতে কোন্ রাস্তায় কি ভাবে যাইতে হয়, দেখিয়া লও।

কোন কোন সহরে আবার বন্দোবস্ত আরও ভাল। ম্যাপের নীচে রাস্তা গুলির নাম লেখা আছে। যে রাস্তায় যাইবে তাহার নামের উপরকার একটা বোতাম টিপিলেই ম্যাপের গায়ে সেই রাস্তায় একটা বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিয়া উঠিবে—সমস্ত ম্যাপখানা আর কে খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না।

দেখ দেখি, ছোট-খাটো খুঁটি নাটি নকার লোকেরা কেমন সজাগ!

---

## পদ্মরাগ

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর ]

( অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ )

### নূতন ব্যাপার

রণজিতের সেদিন সারাটা ক্ষণই এইরূপ উত্তেজনার ভিতর দিয়া কাটিয়া গেল, কিন্তু পরের দিনও ভগবান্ বুঝি তাহার জন্য আরও খানিকটা উত্তেজনা সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। তাই ভোর হইতে না হইতেই শিবনন্দন আসিয়া তার হাতে এক টুক্‌রা কাগজ দিয়া গেল; তার অপরূপ ভাষার বেড়া ডিঙ্গাইয়া এটুকুও বুঝা গেল যে, রণজিৎকে দিবার জন্য রাজবাড়ীর দ্বারোয়ান খুব ভোরে আসিয়াই চিঠিখানা দিয়া গিয়াছে।

বেশী কিছু নয়, কাগজখানায় লেখা ছিল মাত্র গোটা দুই চার কথা—“শীঘ্র এসো, নূতন ব্যাপার—দীপেন।” কিন্তু এই গোটা দুই চার কথাই রণজিতের পক্ষে যথেষ্ট। ‘তৈরী’ হইয়া রাজবাড়ীর দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইতে মিনিট

পনেরোর বেশী সময় তাহার লাগিল না—পরম নেশার বস্তু চা'টী পর্য্যন্ত তখনো তাহার খাওয়া হয় নাই।

গেটে দ্বারোয়ান বসিয়া ছিল, উঠিয়া সেলাম করিয়া রণজিৎকে সরাসর একেবারে দিবেনের ঘরে নিয়া হাজির করিল। চৌকাঠের এ পাশে দাঁড়াইয়া রণজিৎ যা লক্ষ্য করিল তা'তো সে বেচারীর বুদ্ধির অতীত! খাটের উপর পড়িয়া দিবেন কাৎরাইতেছে, বাড়ীর ছেলেবুড়ো প্রায় সকলেই তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর তার হাঁটুর নীচে দীপেন কি একটা মালিশ করিতেছে। রণজিৎ দেখিল, হাঁটুর নীচটা তাহার গোল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে।

রণজিতের দিকে নজর পড়িতেই দিবেন বলিয়া উঠিল, 'উঃ, আগে যদি জানাতে ভাই, যে আসলে লোকটা কে, তবে—যেত যেত হাঁটু, ধরে আমি রাখতামই তাকে। কিন্তু তা' তো জান্‌তাম না, তাই লাঠির ঘা পড়্‌তেই বসে পড়্‌লাম—উঃ, হাতে এসেও ফস্কে গেল, এ দুঃখু আমি রাখি কোথায়?"

রণজিৎ কিছুই বুঝিল না, শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

দিবেন আবার বলিল, "জান বোধ হয় যে খুব ভোরে, যে সময়টাকে শাস্ত্রে বলে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত, সেই সময়ে ঘুম থেকে ওঠাই হোলো আমার বরাবরকার অভ্যেস। মুগুর-বারবেল ভাজার অমন চমৎকার সময় আর নেই। ছাতে উঠে বারবেল ভাঁজ্‌ছি, অন্ধকারের ঘোর তখনও বেশ পরিষ্কার ক'রে কেটে ওঠে নি, দেখলাম লাঠি হাতে একটা লোক এ বাড়ী পানে আস্‌ছে। তা' আর কি, কত লোকই তো আসে যায়! একটু পরেই যে ব্যাপার দেখলাম সে কিন্তু বাস্তবিকই অদ্ভুত! বাড়ীর কাছাকাছি এসে লোকটা হঠাৎ লাঠি-ভর দিয়ে খোঁড়াতে সুরু কর্‌লো, আর এদিক্ ওদিক্ উঁকি ঝুঁকি মেরে কি দেখ্‌তে লাগ্‌লো। ব্যাপারটা যে বেশ স্বাভাবিক নয়, তা' বোধ হয় তোমরা অস্বীকার কর্‌বে না। জোয়ান মরদ লোকটা দিব্যি বুক টান্ করে হেঁটে আস্‌ছিল, হঠাৎ তার এ কি কাণ্ড! বোঝা গেল ভেতরে বেশ একটা গলদ আছে—কাকপক্ষী তখনও জাগেনি, ভেবেছিল কে আর তার দিকে তাকিয়ে বসে আছে? বারবেলটা নামিয়ে রেখে চুপি চুপি নেমে



এলাম, কোন রকমে টের না পায়, এম্নিভাবে গুঁড়ি মেরে মেরে ওর পানেই এগিয়ে চল্‌লাম। কিন্তু লাভ হোল না, দেখে ফেল্লে। তখন আর লুকোচুরিতে ফল কি বল? দারোয়ানের নাম ধরে গোটা তুচ্চার হাঁক দিয়ে লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হোল—উঃ, বড় লাগ্‌ছে দীপেন, একটু আস্তে আস্তে মালিশ কর—।"

ততক্ষণে লোকটার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়েছে।

দীপেন হাতটাকে একটু আল্‌গা দিয়া রণজিতেব উদ্দেশে বলিল, "আমিও কিন্তু তখন জেগেছি, বাগানে একখানা বেঞ্চের উপর বসে আছি। আর একটীমাত্র প্রাণী তখন জাগা, সে হ'চ্ছে দারোয়ান কিষণ সিং।—নিজের ঘরেই বসে বোধ করি সিদ্ধিটিদ্ধি কিছু ঘুঁট্‌ছিল। দু'জনাই চীৎকার শুনে বেরিয়ে পড়লাম। দাদা কিন্তু ততক্ষণে লোকটার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়েছে। কিন্তু হাজার হোক্ পেশাই হচ্ছে ওদের ওই, কেমন একটা কায়দা করে শরীরটাকে একটু বাঁকিয়ে নিতেই দাদা গিয়ে একেবারে মাটীতে মুখ থুবরে পড়্‌লে। এটা ও ঠিকই বুঝে নিয়েছিল যে দাদার সাথে সাম্‌নাসাম্‌নি লড়্‌তে হলে মিনিট্ খানেকের বেশী

দাঁড়ান ওর হাড়ে কুলোবেনা, কাজেই দাদা যাতে ওর পেছু ধাওয়া না কর্‌তে পারে, তার একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে দিল—হাতের সেই লাঠিখানা তুলে ধাই করে গায়ের জোরে এক বাড়ি মেরে।

দাদা তো হাঁটু চেপে বসে পড়লো, আর ও দিলে সেই সুযোগে চোঁ-চা দৌড়! কপালের শিরাগুলো তখন আমার দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বল্‌ছে। কি করি, মুটিয়ে গেছি, দৌড় আর তেমন আসেনা, তবুও প্রাণপণে ছুট্‌লাম। কিষণ সিং তো দৌড়ে আবার আমার চাইতেও সরেশ কিনা—ভুঁড়ির টানই সামলাবে না দৌড়োবে? গলা ফাটিয়ে চীৎকার কর্‌লাম, কিন্তু সবই মাঠে মারা গেল, কে আর অত ভোরে জেগে বসে আছে। কাছেই গাছের গুঁড়ির সাথে একটা সাইকেল বাঁধা ছিল, তাইতে চড়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে খোঁড়া অদৃশ্য হয়ে গেল'।"

বেহারা আসিয়া খবর দিল, কুমারেশ আসিয়াছে।

"এখানে নিয়ে এসো।

আচ্ছা, এখন একটু কাজ কর্ম্মের কথা আছে, তোমরা সবাই যাও, শুধু দীপেন আর রণজিৎ থাক্‌বে।"

ঘরে ঢুকিল একটী বছর কুড়ি বয়সের সুন্দর যুবা পুরুষ। দিবেন লোকটী একটু সাহেবী মেজাজের, এ যুবকটি তাহারই সেক্রেটারী, ঘরে ঢুকিতেই দিবেন প্রশ্ন করিল, "এই যে কুমারেশ, কতদূর কি করে এলে?"

"সমস্তই ঠিক হ'য়ে গেছে। যা যা আপনি বলেছিলেন সবই ষ্টেশন মাষ্টারকে বুঝিয়ে বলা হয়েছে, তিনি ভার নেবেন বলেছেন।"

"আর মাঝিহাটীর কথা?"

"তাও বলেছি। তারও তিনি ঠিকঠাক্ বন্দোবস্ত রাখ্‌বেন!"

"আচ্ছা যাও, চা-টা খাওগে, বেলা হ'য়ে গেছে। রণজিতেরও বোধ হয় ও কাজটা সারা হয়নি, যে তাড়াতাড়ি চলে এসেছ! ওহে কুমারেশ, যাবার সময়ে কাউকে বলো যে রণজিতের চা-টাও যেন এখানে পাঠিয়ে দেয়, আর সঙ্গে কিছু আনুষঙ্গিক, বুঝলে?"



কুমারেশ ঘরের বাহির হইতেই দিবেন বলিল, "দীপেনের মুখে পরে খোঁড়ার কথা সমস্তই শুন্‌লাম—আপ্‌শোষ এই, কথা কটা আগে জানতাম না—যাক! পদ্মরাগ যে ওদের হাতে, নিতান্ত পাগল ছাড়া বোধ হয় সে বিষয়ে আর কেউই সন্দেহ কর্‌বে না। আজকে যে নাড়াচাড়াটা খেলে, তাতে ওরা খুবই সাবধান হয়ে যাবে। এরকম একটা জানাজানি হওয়ার পর কি আর এখানে বসে থাক্‌তে ওদের সাহসে কুলোবে? এ অঞ্চলে জ্যাঠামশায়ের কি রকম প্রতাপ তা আর নিশ্চয়ই ওদের অজানা নেই! এ রকম একটা ছোট জায়গায় আমাদের পক্ষে ওদেরকে খুঁজে বের করা মোটেই শক্ত হবে না। যত শীগ্‌গির সম্ভব, গা-ঢাকা দেওয়াই এখন ওদের মঙ্গল। এই সব ভেবে চিন্তে আগে থেকেই সে পথটা বন্ধ করবার চেষ্টায় আছি। এই একটু আগেই কুমারেশকে পাঠিয়ে ছিলাম ষ্টেশনে। ষ্টেশনমাষ্টারকে জানিয়ে রাখা গেল যে আমরা কয়েকজন ফেরারি আসামী ধরার চেষ্টায় আছি। চবিবশ ঘণ্টা কেউ না কেউ আমাদের লোক ছদ্মবেশে ষ্টেশনে পাহারা থাকবে। তারা যদি কারুকে সন্দেহ করে তবে তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে তিনি এবং রেলওয়ে পুলিশ যেন সাহায্য করেন। এজন্য যা কিছু দায়িত্ব তা তাঁকে ভাব্‌তে হবে না, সে ভার নেবেন রাজাবাহাদুর স্বয়ং। আমার বিশ্বাস, রণজিৎ, সমসেরপুরে ট্রেন ধরতে তারা সাহস করবেনা। হয় মাঝিহাটী জংসন, আর নয় তো সমসেরপুর থেকে মাঝিহাটীর ভেতরে আর কোন ষ্টেশনে তারা উঠ্‌বে। কাজেই এখানকার ষ্টেশনমাষ্টারকে ভার দিয়ে দেওয়া হোলো যে মাঝিহাটী পর্য্যন্ত প্রত্যেক ষ্টেশনে ষ্টেশনে যেন এ বন্দোবস্ত বহাল থাকে।

এসব তো গেল, কিন্তু তারা সমসেরপুর রোড্‌ দিয়ে বেরিয়ে, একেবারে পাকা সড়ক ধরে মোটরেও তো সোজা কল্‌কাতা চলে যেতে পারে। কাজেই সে রাস্তায়ও আমাদের দস্তুরমত পাহারা রাখা চাই। তোমরা গিয়ে এখন থেকেই এ বিষয়ে বন্দোবস্ত করলে ভাল হয়—কুমারেশকেও বরং সাথে নাও।"

"আমি খবর পেয়েছি এরা আজই সরে পড়্‌বে" বলিয়া রণজিৎ হুকাকাশির

চিঠির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিল। শুনিয়া দুই ভাই বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল। দিবেন বলিল, "আগুন কখনো ছাই দিয়ে চেপে রাখা যায় না—হুকাকাশিকেও এরা চেপে রাখতে পারবে না—জিৎবই আমরা শেষ পর্য্যন্ত।"

## ৯

## কাছি-সংগ্রহ

এলাহাবাদের যে অঞ্চলটার নাম লুকারগঞ্জ, সেখানে অনেক বাঙ্গালী পরিবারের বাস। অল্প কয়েক দিন হইল, জনকয়েক বাঙ্গালী যুবক আসিয়া সেখানে ছোটমত একটা বাড়ী ভাড়া লইয়াছে। পাড়ার লোকে জানিত, তাহারা এলাহাবাদ সহরের নানা জায়গায় কাজ করে, খরচ কম পড়িবে ভাবিয়া সকলে একত্রে মেস্ করিয়া আছে।

সেদিন রবিবার—বেলা বোধকরি তখন গোটা চারি। একটা ঘরে চারজন যুবক তক্তপোষের উপর বসিয়া 'ব্রিজ্' খেলিতেছিল।

'ব্রিজ্' খেলিতেছিল।



খেলা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে হঠাৎ একটা সিটি বাজিয়া উঠিল—কলিকাতার রাস্তায় পুলিশেরা অপর পুলিশকে ডাকিতে হইলে যে রকম শব্দ করে, সেই রকমের আওয়াজ। মুহূর্ত্ত মধ্যে যুবক চারিজন হাতের তাস ফেলিয়া দিয়া দোতলার একটা ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল।

দোতলার সেই ঘরটার মালিকের নাম উদয়েন্দু। একটী পা মাটিতে, অপর পাটী চেয়ারের উপর তুলিয়া দিয়া উদয়েন্দু জুতার ফিতা বাঁধিতেছিল। টেবিলের উপর রিষ্টওয়াচটি শোয়ান, দৃষ্টি তাহার তাহার উপরেই নিবদ্ধ। পাশেই একখানা টেলিগ্রাম পড়িয়া আছে।

যুবক কয়েকটি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিতেই উদয়েন্দু বলিল, "গুহর কাছ থেকে তার এসেছে। এখন চারটে তিন। আমি বেরোচ্ছি, চারটে পঁয়ত্রিশ মিনিটের ভেতর ফিরে আস্‌বো। খেতে দশ মিনিট্, তৈরি হ'তে দশমিনিট। ব্যস্, চারটে পঞ্চান্নয় বেরিয়ে পড়ে, পাঁচটা পনেরোয় আমাদেরকে ষ্টেশনে উপস্থিত হতে হবে। তা হলেই পাঁচটা পঁচিশের ট্রেন ধরবার দশ মিনিট সময় আমরা পাব। সেই যথেষ্ট! তিনজন আমার সাথে যাবে। তোমরা এর মধ্যে ষ্টোভ ধরিয়ে এমন কিছুর জোগাড় করে নাও, যাতে কালকে বেলা দশটার আগে উদয়-প্রভুরা আর কোন ওজর-আপত্তি না তোলেন। ব্যস্!"

"এমন হঠাৎ কোথায় যাবার দরকার হ'য়ে পড়লো, উদয় দা?"

উদয়েন্দুর ফিতা বাঁধা সারা হইয়া গিয়াছিল। টেবিলের উপর হইতে সেই টেলিগ্রামখানা বিমলের হাতে দিয়া বলিল, "ধা——জঙ্গলে, পড়ে দেখ, এর বেশী আর কিছু এখন বল্‌তে পাচ্ছিনা ভাই, সে সময় কোথা? এই দেখ, দেখতে দেখতে চারটে চার হ'য়ে গেল—ট্রেনে উঠে ধীরে সুস্থে সব জান্‌বে।" বলিয়া ঝড়ের মত উদয়েন্দু বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

ঠিক চারিটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে উদয়েন্দু ফিরিল, বগলের নীচে তাহার কুণ্ডলী পাকান একটা মোটা কাছি। বাসার সকলে তখন খিচুড়ী পাক শেষ করিয়া

চায়'খানা থালায় তাহা পরিবেশন করিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। সতীশ, বিমল ও মৃগাঙ্ক সঙ্গে যাইবে, তাহারা আসনে বসিয়া গিয়াছে।

খাইতে খাইতে সকলে হাসি তামাসা আরম্ভ করিল। বিমল বলিল, "যে রাম-কাছি আজ এনেছে উদয় দা, নিশ্চয়ই ধা——জঙ্গলে হাতী ধরতে যাওয়া হচ্ছে। ও কাছি গলায় পড়লে, হাতী তো হাতী, তিমি মাছের পো পর্য্যন্ত শায়েস্তা হয়ে যাবে।" মৃগঙ্ক বলিল, "আরে দূর দূর, হাতী বাঁধতে অতবড় কাছি লাগবে কিসে? বোধ হয় গঙ্গা থেকে ষ্টীমার সরাতে হবে। তা', যাচ্ছি চার জোয়ান, কাছি বেঁধে ষ্টীমারটাকে কি আর ধা——জঙ্গলে টেনে নেওয়া যাবে না?"

সকলেই হাসিতেছিল, শুধু এই সব হাসি ঠাট্টায় যোগ দেয় নাই উদয়েন্দু নিজে। কি যেন একটা গভীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সে খাইয়াই চলিয়াছিল। তাহাকে সমীহ করিত সকলেই, কাজেই তখন আর কেউ কোথায় যাইতে হইবে সে বিষয়ে প্রশ্ন করিল না।

সেদিন পাঁচটা কুড়ি মিনিটে হাফ্‌প্যান্ট্ পরা শার্ট্ গায় ও বুট্‌জুতো পরা চারিটি যুবক গিয়া এলাহাবাদ ষ্টেশনে গাড়ীতে চাপিয়া বসিল। পাঁচটা পঁচিশে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

---

## বীর পালোয়ান ?

(শ্রীবিকাশ দত্ত)

বীর পালোয়ান আসছে দেশে, রট্‌লো গুজব মস্ত,
কুস্তিবীরের মুখ শুকালো—সবাই ভয়ে ত্রস্ত;
চীনদেশেতেই বাস নাকি তার, নামটি হ'ল মঙ্কা,
এমনি সাবাস শিক্ষা তাহার, ডিঙোয় নাকি লঙ্কা।
তিন ফুঁ দিয়ে তিনশোমণি পাথর ছোঁড়ে তিন ক্রোশ,
তাইতো ওটা মানুষতো নয় রাক্ষস কি খোক্কস।



বন-মহিষের সঙ্গে লড়াই করতে খুবই ওস্তাদ,
শিংধরে তার আছড়ে দিয়ে চড়বে পিঠে পশ্চাৎ
সাতশোমণি, শুন্‌ছি নাকি, তার সে ছুটো ডম্বল,
বাপ্‌রে, শুনেই কম্প আসে, আনরে ওরে কম্বল।
এইসা বড় লোহার কড়ি মুচড়ে করে গোল্লা,
চীন গেছিল, বল্‌লো সেদিন ফজল করিম মোল্লা।

কায়দা কানুন তার যা যত আজ দেখাবে মঙ্কা,
সেই হুজুগে বিক্‌লো টিকিট দশটি হাজার তঙ্কা;
হাজার হাজার লোক এসেছে অনেক কোরে কষ্ট
কুস্তিবীরের ভোজবাজীটাই দেখ্‌তে চোখে স্পষ্ট;
টং কোরে যেই ঘণ্টা বাজা—উঠ্‌লো সবাই চম্‌কে,
"সবুর সবুর গোল করো মৎ" কেউবা চেঁচায় ধম্‌কে;
পর্দ্দা ঠেলে আস্‌লো ছুটে মানুষ তো নয়—খড়কে—
সবাই গেল হক্‌চকিয়ে এক্কেবারে ভড়্‌কে;
কই প্যালোয়ান, কোথায় বা কি—ব্যাপারটা কি তাই তো—
লিক্‌লিকি এই মানুষ ছাড়া আর কেহ কই, নাইতো।
হাঁক্‌লো কে এক লম্বা গলায়, "এই পালোয়ান মঙ্কা",
ডুম্‌ডুমাডুম্ দম্‌দমাদম্ উঠ্‌লো বেজে ডঙ্কা।
"ঘাবড়ে গেছি, ঘাবড়ে গেছি—হায়রে দাদা হায়রে,
রাগ্‌বো নাকি হাস্‌বো সেটা ঠিক্ করাটাই দায়রে।"

---

# তপস্বীর তেজ

( পৌরাণিক )

সেকালে সূর্য্যবংশে বাহু নামে এক মস্তবড় রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল অযোধ্যায়। রাজা বড় হইলে কি হয় ? তিনি ক্রমে আমোদপ্রমোদে বেদম মাতিয়া গেলেন, আর তাহার ফলে অনেক শত্রু তাঁহার পেছনে লাগিল। অনেক জাতি একত্র হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া দিল—হৈহয়, তালজঙ্ঘ, কাম্বোজ, পহ্লব, যবন, শক, পারদ ইহারা সকলেই চড়াও করিল। বাহু ইহাদিগকে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না—যুদ্ধে হারিয়া গেলেন। তারপর তাঁহাকে একেবারে রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইল বনে, যেখানে মুনিঋষিরা থাকেন। তাঁহার রাণী যাদবীর তখন গর্ভ। বাহুর আর এক রাণী হিংসার জ্বালায় যাদবীকে বিষ খাওয়াইয়া দিয়াছিল কিন্তু পেটের ছেলে তাহাতে মারা পড়িল না, যাদবীও মরিলেন না। রাজ্য খোয়া গেল, যাদবী রাজার সঙ্গে বনে গেলেন। বাহু ছিলেন বিলাসী রাজা আর এখন থাকিতে হইল একেবারে বনে। বনে গিয়া তিনি তপস্যা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তখন বয়সও বেশী হইয়াছিল, কষ্টও খুব হইতেছিল, এই কষ্ট কাটাইয়া উঠা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। একদিন জল আনিতে গিয়া রাজা আর ফিরিতে পারিলেন না, তাঁহার ভবলীলা শেষ হইল। সতী যাদবী আর কি করিবেন ? স্বামীর চিতা সাজাইয়া নিজেও সেই চিতায় পুড়িয়া মরিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু সেখানে ছিলেন ভৃগু মুনির পুত্র ঔর্ব্ব। ঔর্ব্ব অনেক বুঝাইয়া রাণীকে থামাইলেন, পরে নিজের আশ্রমে রাখিয়া তাঁহার তত্ত্বতালাস করিতে লাগিলেন।

ক্রমে উপযুক্ত সময়ে রাণী এক পুত্র প্রসব করিলেন। 'গর' অর্থাৎ বিষ পেটে গিয়াছিল, বিষের সঙ্গেই ছেলে মাটীতে পড়িল। তাই তাহার নাম হইল



সগর। ঔর্ব্ব মুনি ছেলেটীকে বেশ যত্নে লালনপালন করিতে লাগিলেন—তাহাকে লেখাপড়া, ধর্ম্মশাস্ত্র ও যুদ্ধবিদ্যা বেশ ভাল করিয়া শিখাইলেন।

সগর বড় হইয়া যেমন বিদ্বান্ তেমনি বীর হইয়া দাঁড়াইলেন। এইবার আসিল বাপের শত্রুদের সঙ্গে বোঝাপড়ার সময়। সগর বল জোটাইয়া সেই হৈহয় প্রভৃতি জাতিদের সঙ্গে যুদ্ধে লাগিয়া গেলেন। তাদের কি আর সাধ্য যে সগরের মত বীরের তেজ সহ্য করিতে পারে ? হৈহয়দিগকে তিনি পশুর মত মারিয়া ফেলিলেন। তাহাদের দফা শেষ করিয়া ধরিলেন শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ আর পহ্লবদিগকে। তাহারা বেগতিক দেখিয়া বশিষ্ঠ মুনির খোসামোদ করিতে লাগিল, "ঠাকুর, আমাদের বাঁচান।" বশিষ্ঠ সগরকে অনেক বুঝাইয়া যুদ্ধ হইতে থামাইলেন। কিন্তু দুষ্ট জাতিগুলাকে কিছু শাস্তিও ত দেওয়া চাই, সগর তাহাদের ধর্ম্মকার্য্য নষ্ট করিয়া দিলেন। আর করিলেন কি ? শকদের মাথা আধা-নেড়া করিয়া দিলেন, আর যবন ও কাম্বোজদিগকে দিলেন একেবারে নেড়া করিয়া। পারদ ও পহ্লবদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইল—তাহাদিগকে চুল লম্বা করিয়া ছাড়িতে হইবে আর দাড়ি রাখিতে হইবে। ক্ষত্রিয়দের যে রকম বেদ পড়া ও হোম করার নিয়ম আছে ইহাদের সে সব বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। মোটের উপর ইহারা 'বর্ব্বর' জাতির মধ্যে দাঁড়াইল। তাঁহার বাপের আমলের শত্রু আরও কত জাতি এই রকমের দণ্ড পাইল। দণ্ড পাওয়ার পর দুষ্ট জাতিগুলি সগরের বশ হইয়া গেল।

সগর এই রকম শত্রুদের জব্দ করিয়া জোরে রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার রাণী ছিলেন দুইটী—বৈদর্ভী ও শৈব্যা ( মতান্তরে বৈদর্ভীর নাম কেশিনী ও অপর রাণীর নাম সুমতি)। রাণীদের কাহারও ছেলে না হওয়ায় সগরের বড় কষ্ট হইতে লাগিল। শেষে তিনি রাণীদের সঙ্গে করিয়া মহাদেবের তপস্যায় লাগিয়া পড়িলেন। মহাদেব তপস্যায় তুষ্ট হইয়া এই বর দিলেন যে তাঁহার এক রাণীর পেটে খুব বলবান্ ষাট্ হাজার ছেলে জন্মিবে—আর অন্য রাণীর ছেলে হইবে জোরদার একটী ; ঐ ষাট্ হাজার ছেলে মারা পড়িবে, আর ঐ এক ছেলে হইতেই বংশ থাকিবে।*

* রামায়ণের মতে সগর ভৃগু মুনির নিকট গিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, আর বরও দিয়াছিলেন ভৃগুমুনি।

রাণী-দুইটী তপস্যার পর বাড়ী ফিরিলেন। দুই রাণীরই গর্ভ হইল। ক্রমে বৈদর্ভী প্রসব করিলেন একটী লাউ, আর শৈব্যা প্রসব করিলেন কার্ত্তিকের মত এক সুন্দর ছেলে। লাউ দেখিয়া রাজা ভাবিলেন, এ আবার কি? তিনি লাউটাকে ফেলিয়া দিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় আকাশ হইতে খুব জোরে শব্দ হইল, "রাজা, তুমি লাউটা ফেল না, লাউয়ের মধ্যেকার বীজগুলি বেছে ষাটটী ভাগ কর,—তারপর ওগুলি রেখে দাও ঘিয়ে ভরা গরম গরম হাঁড়ির মধ্যে। দেখ' তোমার ষাট হাজার ছেলে হবে, মহাদেবই এই রকম বন্দোবস্ত করেছেন।"

দৈববাণী শুনিতে পাইয়া রাজা সগর সেই রকমই ব্যবস্থা করিলেন। এক এক হাঁড়ির ভার থাকিল এক এক ধাত্রীর উপর। ক্রমে বহু কাল চলিয়া গেলে ঐ লাউয়ের বীজ হইতে সগর রাজার ষাট্ হাজার বলবান্ ছেলে জন্মিল। কিন্তু ছেলেগুলা কি ছেলে? অসুরের বাড়া। তাহারা ভারী দুষ্ট হইল, যাকে তাকে

সকলে বিরক্ত হইয়া গেল তখন ব্রহ্মার কাছে।



অপমান করিতে লাগিল—দেবতা, দৈত্য, রাক্ষস ইহাদের সঙ্গে পর্য্যন্ত ঝগড়া বাধাইতে ছাড়িল না। সকলে বিরক্ত হইয়া গেল তখন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা বলিলেন, "তোমাদের কোন ভয় নাই, ওদের যেমন কর্ম্ম শীঘ্রই তেমনি ফল পাবে"। সকলে ফিরিয়া আসিল।

অনেকদিন পরে সগর রাজার ইচ্ছা হইল অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে। একটী দুইটী নয়, ৯৯টী যজ্ঞ সারিয়া ফেলিলেন। গোল বাধিল একশ বারের বার। অন্য বারের মত এবারও অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল, আর ঘোড়ার সঙ্গে চলিল সগরের ষাট হাজার পুত্র। ঘোড়া চরিতে চরিতে ক্রমে এক ভয়ানক সমুদ্রের মধ্যে আসিয়া পড়িল, কিন্তু সে সমুদ্রের জল শুকাইয়া গিয়াছিল। সগরের পুত্রেরা ঘোড়াটাকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করিল না, কিন্তু দেখিতে দেখিতে ঘোড়াটা কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহাকে দেখা গেল না। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র রাক্ষস সাজিয়া ঘোড়াটাকে চুরী করিয়া পাতালে রাখিয়া আসিলেন। রাজপুত্রেরা চোরকে দেখিতে পায় নাই, তবে মনে করিল ঘোড়াটাকে কেহ চুরী করিয়া নিয়াছে। তাহারা আসিয়া বাপের কাছে সমস্ত কথা বলিল। রাজা হুকুম দিলেন—"তোমরা বেশ ভাল করে সব জায়গা খুঁজে দেখ"। রাজপুত্রেরা তাহাই করিল, কিন্তু কোথায় বা গিয়াছে সে ঘোড়া আর কে-ই বা তাহাকে নিয়া চম্পট দিয়াছে—কোন খোঁজই মিলিল না। পুত্রেরা পিতার নিকট আসিয়া যোড়-হাতে বলিল—"বাবা, আমরা আপনার হুকুমে সব জায়গা খুঁজে দেখেছি; সমুদ্র, বন, নদী ইত্যাদি কিছুই বাকী রাখি নাই, কিন্তু না পাওয়া যায় সে ঘোড়া, না পাওয়া যায় তার চোর।" সগর ত ছেলেদের কথা শুনিয়া চটিয়া লাল! তিনি বলিলেন, "চলে যাও তোমরা আবার, খবরদার, ঘোড়া না নিয়ে আর কখনও এখানে ফিরবে না।" ছেলেরা আবার ঘোড়ার খোঁজে বাহির হইল, গোটা পৃথিবীটা তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা দেখিতে পাইল এক শুক্‌না সমুদ্র, আর তার মধ্যে এক গর্ত্ত। রাজপুত্রেরা

কোদাল আরও কত কি আনিয়া সেই গর্ত্তটাকে খুঁড়িয়া বড় করিতে লাগিল। কত অসুর, কত সাপ, কত রাক্ষস আরও কত কি জন্তু সেই মাটীর মধ্যে ছিল। অস্ত্রের ঘায়ে বেদনায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া সেগুলি মরিতে লাগিল। কারও মাথা কাটা গেল, কারও শরীর কাটা গেল, কারও চামড়া কাটা গেল, কারও বা ভাঙ্গা হাড়গোড় দেখা যাইতে লাগিল। এই রকম ব্যাপার চলিতে লাগিল, কিন্তু ঘোড়ার তখনও দেখা নাই। রাজপুত্রেরা ভারী চটিয়া গেল। তাহারা সমুদ্রের পূর্ব-উত্তর দিকে খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাতাল পর্য্যন্ত গিয়া হাজির। সেখানে গিয়া দেখে, ঘোড়াটা বেশ চরিয়া বেড়াইতেছে আর তাহারই কাছে বসিয়া কপিল মুনি। কী তাহার তেজ, যেন আগুন দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে! রাজপুত্রেরা ঘোড়া পাইয়া ত একেবারে আহ্লাদে আটখানা! তাহাদের খুব রাগ হইল ঐ কপিল মুনির উপর। মনে করিল, তিনিই বুঝি চোর। তাহারা কপিল মুনির উপর অনেক চোটপাট করিয়া ছুটিয়া চলিল ঐ ঘোড়া ধরিতে। মুনি নিজের অপমানে রাগিয়া গেলেন এবং চক্ষু ঘুরাইয়া এমন তেজের সঙ্গে রাজপুত্রদের দিকে তাকাইলেন যে তাহারা সেই তেজে পুড়িয়া একেবারে ছাই হইয়া গেল।

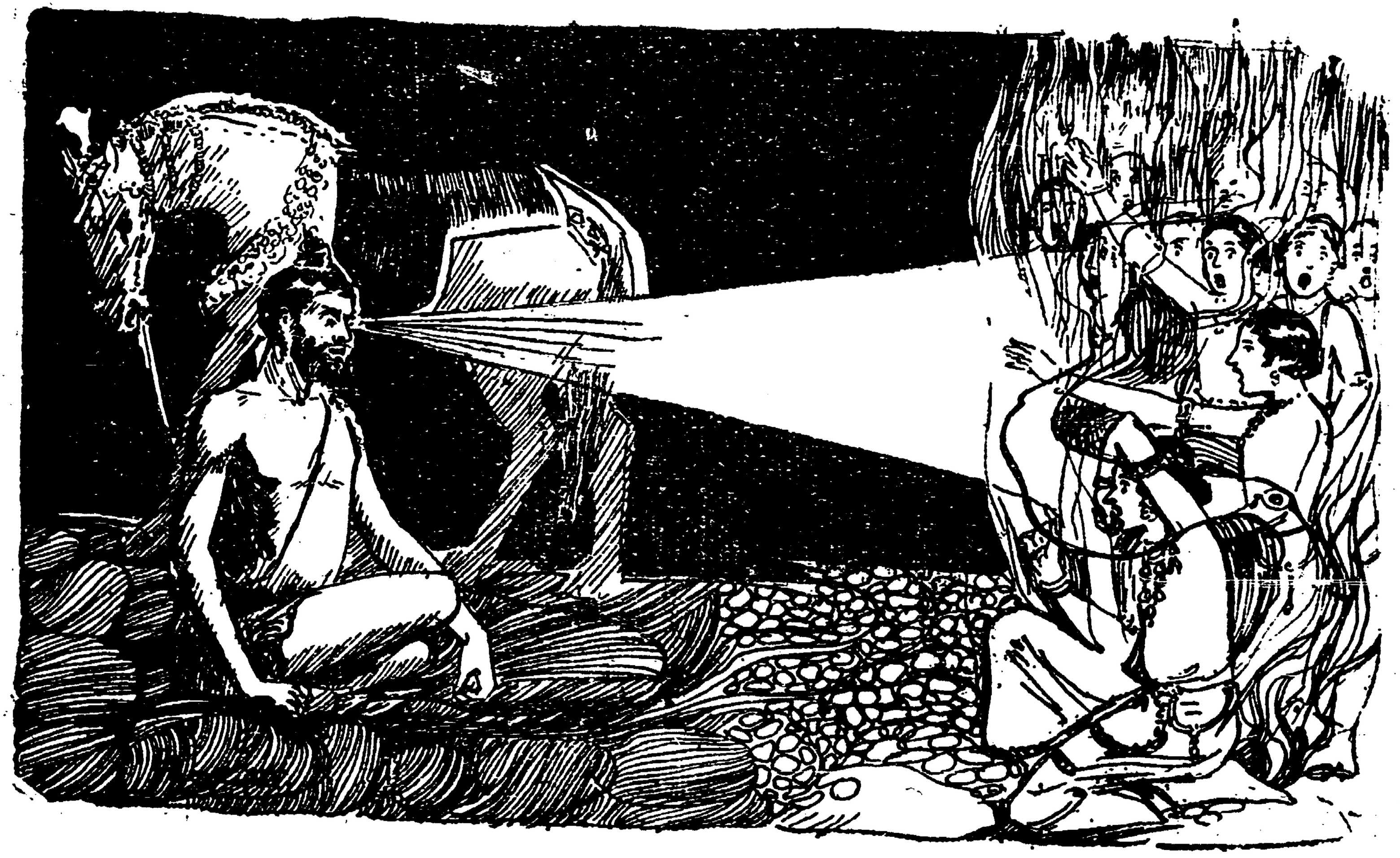

এমন তেজের সঙ্গে তাকাইলেন যে তাহারা পুড়িয়া একেবারে ছাই হইয়া গেল।



খবরটা সগর রাজার নিকট গিয়া দিলেন নারদ মুনি। শুনিয়া রাজার মন বড় খারাপ হইল। হইবারই কথা, তাঁহার গতিকেই ত এত বড় ব্যাপারটা ঘটিল! সগর আবার ইহার পূর্ব্বেই তাঁহার আর এক রাণীর ছেলে অসমঞ্জাকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। অসমঞ্জা ছিল বড় বদখেয়ালের লোক। তাহার আমোদ হইত প্রজাদের দুর্ব্বল ছেলেপিলেগুলিকে কষ্ট দিতে। সে ছেলেগুলাকে ঘাড়ে ধরিয়া তুলিয়া সরযূ নদীতে ছুড়িয়া ফেলিত। ছেলেগুলা কাঁদিত, নদীতে ডুবিয়া যাইত, আর অসমঞ্জা তামাসা দেখিত। প্রজারা আসিয়া যোড়হাতে রাজার কাছে নালিশ করিল। রাজা ভাবিয়া চিন্তিয়া মন্ত্রীদিগকে হুকুম দিলেন, "এ ছেলেটাকে তোমরা নগর থেকে তাড়িয়ে দূর করে দাও।" মন্ত্রীরা তাহাই করিলেন। সেই হইতে অসমঞ্জার আর দেখা নাই।

অসমঞ্জা গিয়াছে, ষাট্‌ হাজার পুত্র মারা গেল, এখন রাজা অসমঞ্জার পুত্র অংশুমান্‌কে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ বাছা, আমি তোমার বাপকে তাড়িয়েছি, আবার ষাট্‌ হাজার ছেলে মারা গেল, যজ্ঞও হল না। তুমি এক কাজ কর, ঘোড়াটাকে গিয়া আন, আমার যেন নরক না হয়। যাও, বাহির হও ধনুক আর তরোয়াল নিয়া।"

অংশুমান্‌ ঠাকুরদাদার কথা শুনিয়া চলিলেন সেই ঘোড়ার খোঁজে। গর্ত্ত ত কাটাই ছিল, তিনি সেই গর্ত্ত দিয়া সমুদ্রের তলায় গিয়া দেখেন, কপিল মুনি বসা আর ঘোড়াটা তাঁহার কাছে। অংশুমান্‌ গিয়াই মুনির পায়ে গড় হইয়া প্রণাম করিলেন, তার পর নিজের কথা খুলিয়া বলিলেন। কপিল মুনি অংশুমানের ভক্তিতে খুব খুসী হইয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে বর দিচ্ছি, নাও।" অংশুমান্‌ বলিলেন, "আমাকে বর দিবেন ত এই যজ্ঞের ঘোড়াটা দিন, আর আমার পিতৃলোককে উদ্ধার করুন।" মুনি বলিলেন, "তাই হবে, তোমার অদৃষ্ট খুব ভাল, তোমাতে ক্ষমা আছে, ধর্ম্ম আছে, সত্য আছে, তোমার কাজের জন্যই সগরের ছেলেরা স্বর্গে যাবে, তোমার পৌত্র মহাদেবকে খুসী ক'রে গঙ্গা দেবীকে স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যে আনবে, তোমার ভাল হউক। যাও তুমি এই যজ্ঞের ঘোড়া নিয়া।"

অংশুমান্ যজ্ঞের জায়গায় ঘোড়া আনিয়া দিয়া পিতামহের পায়ের উপর প্রণাম করিলেন। সগর অংশুমান্কে খুব আদরযত্ন করিয়া যজ্ঞ শেষ করিলেন। দেবতারা সগর রাজাকে খুব সম্মান করিলেন আর সমুদ্রের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক বনিয়া গেল—সমুদ্রের নাম হইয়া গেল সাগর। *

অনেক কাল রাজত্বের পর অংশুমানের হাতে রাজ্য দিয়া সগর চলিয়া গেলেন—স্বর্গে।

সগরের ষাট্ হাজার ছেলেকে উদ্ধার করার জন্যই ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন কিন্তু—সে আর এক কাহিনী।

---

## সমুদ্রের বাসিন্দা

মাটীর উপর হাতী আছে, গণ্ডার আছে—ইহারা অবশ্য বড় বড় জানোয়ার, গায়েও খুব জোর। আমাদের দেশের সেকালকার পণ্ডিতেরা এক জানোয়ারের কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম শরভ। তাহার নাকি পা ছিল ৮টা, আর চক্ষু ছিল উপরের দিকে। সে জানোয়ারকে দেখার ভাগ্য আমাদের হয় নাই। সত্যই ছিল কিনা ভগবান্ জানেন। কিন্তু এখন দেখিতে পাওয়া যায়, সব চেয়ে বড় বড় জানোয়ারকে পোষে জল; মাটীকে এখানে জলের কাছে হা'র মানিতে হইয়াছে।

তিমির কথা তোমরা অবশ্যই শুনিয়াছ। তিমি মাছ নয়, রীতিমত জানোয়ার। আমাদের ছেলেপিলেরা যেমন মায়ের দুধ খাইয়া বাঁচে, তিমির ছেলেপিলেরাও তাই। দুধ থাকে তলপেটের একটু উপর। আবার তিমি মাছের মত জলের মধ্যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ছাড়িতেও পারে না, তাহাকে আসিতে হয় জলের উপরে। অবশ্য সে অনেকক্ষণ জলের মধ্যে থাকিতে পারে—অনেকক্ষণ বাদে উপরে আসিয়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে খানিকটা জলও ছিটাইয়া ফেলে। সে জল নিঃশ্বাসের সঙ্গে ছুটিয়া ফোয়ারার মত অনেক দূর ছিট্কাইয়া পড়ে—

* সগরের ছেলেরা সমুদ্রকে কাটিয়া বাড়াইয়াছিল কিনা।



একটা দেখার জিনিষ বটে। কবি কালিদাস তাঁহার "রঘুবংশ" কাব্যে লিখিয়াছেন, রামচন্দ্র যখন পুষ্পক রথে চড়িয়া লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় আসেন তখন পথে সীতাকে তিমির এই কাণ্ড দেখাইয়াছিলেন। আমাদের সাবেক পণ্ডিতেরা তিমি অপেক্ষাও বড়-বড় জলজন্তুর কথা লিখিয়াছেন—যে তিমিকেও খাইয়া ফেলিতে পারিত তাহার নাম ছিল তিমিংগিল, আবার তাহাকেও যে খাইত তাহার নাম ছিল "রাঘব"। কিন্তু এই দুই জানোয়ারের অস্তিত্ব ছিল বোধ হয় কবিদের মনে।

কল্পনা ছাড়িয়াই দিলাম। তাহা হইলে দেখা যাইবে, শরীরের পরিমাণে জলেস্থলে তিমিই সকল জানোয়ারের উপর। তিমিই কি আর এক রকমের? কাহারও ভীষণ দাঁত, কাহারও দাঁতই নাই। এক শ্রেণীর দাঁত-ওয়ালা তিমির বাজে সামুদ্রিক জীবজন্তু খাইয়া তৃপ্তি হয় না, সে জন্য তিমিকে পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলে। গোটা তিমিটাকে গিলিয়া ফেলিতে না পারুক, তাহার শরীরটাকে যখন দাঁত দিয়া কড়্মড়্ করিয়া চিবাইয়া পেটের মধ্যে পোরে, তখন ইহাকে তিমিংগিল বলিলে বোধ হয় দোষ হয় না—উপরে যে কল্পনার কথা বলিলাম সেটা নিছক্ কল্পনা নয়।

সব তিমির কিন্তু দাঁত নাই। আগে বোধ হয় ছিল, ক্রমে খসিয়া গিয়াছে। ভগবানের নিয়মই এই, যাহার যেটার প্রয়োজন সেটা বাড়িয়া জাঁকাল হইয়া উঠে, আর যেটার প্রয়োজন নাই সেটা আস্তে আস্তে সরিয়া পড়ে। যাহাদের দাঁত নাই তাহারা খায় সমুদ্রের লতাপাতা আর ছোট ছোট মাছ। এইগুলি ধরার জন্য তিমির মুখের মধ্যে হাড় দিয়া বোনা এক রকম জাল আছে। অল্প জলে যেখানে ছোট ছোট মাছ ঘুরিয়া বেড়ায়, এই শ্রেণীর তিমি সেখানে হাঁ করিয়া গিয়া পড়ে—বোধ হয় দেখিতে পায়, গন্ধেও টের পায়। আর কি সে ছোট মাছদের রক্ষা আছে? তিমির জালে আট্কাইয়া তাহার ভক্ষ্য হইয়া পড়ে। তিমি মুখ বন্ধ করে, তার পরে করে তাহাদিগকে একেবারে উদরসাৎ। তিমির মত বড় হাঁ আর কাহারও নাই, কিন্তু এই শ্রেণীর তিমির গলায় ছিদ্র খুব ছোট, তাই দরকার ছোট মাছের।

তিমির হাঁ কত বড় জান? মানুষ ত মানুষ, মানুষ-জন সমেত একখানা

ছোটখাট নৌকাই ভিতরে চলিয়া যায়। একজন বড় মানুষ মুখের মধ্যে সোজা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে।

উত্তর মহাসাগরই সব চেয়ে বড় তিমির প্রধান আড্ডা। অবশ্য অন্য জায়গায়ও সময় সময় ইহাদের দেখা পাওয়া যায়। মানুষ পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়ায়, ইহারাও একটু আধটু ঘুরিবে না? ৮০ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা তিমি দেখা গিয়াছে। ভাব ত কি ব্যাপার! ১৫ জন মানুষের সমান লম্বা দেহখানি, তাহার উপর আবার লেজ আছে। মাথাটাই কিন্তু দেহখানার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ।

বড় দাঁত-ওয়ালা তিমি বড় ভয়ানক জানোয়ার—বেশী মাংস খায়, কাজেই জলে থাকিলেও স্বভাবটা উগ্র। আপনা আপনির মধ্যে লড়াই করে—মাংসের জন্য নয়, স্বভাবের জন্য। যুদ্ধে মৃত এই রকম কত তিমির হাড় গোড় পাওয়া গিয়াছে।

যে তিমিগুলি তিমির মাংস খায় তাহারা এই বড় দাঁতওয়ালা তিমির মত বড় হয় না, কিন্তু উগ্রতায় বড়। দল বাঁধিয়া যুদ্ধে লাগিয়া যায় আর বড় তিমিগুলিরও কর্ম্ম শেষ করিয়া দিয়া তাহাদের মাংসের সদ্ব্যবহার করে। এই কাজে তাহাদের সাহায্য করে কোন কোন রকমের অদ্ভুত মাছ। এক রকমের মাছ আছে, তাহার নাকের উপর হইতে বর্শার মত অস্ত্র বাহির হয়; আর এক রকমের মাছের নাকের দুই পাশে আছে করাতের মত ধারাল দাঁত। এই সব অস্ত্রের নিকট তিমি মহাশয় তাঁহার প্রকাণ্ড শরীর লইয়া কাবু হইয়া পড়েন। মানুষের সহিত বানরের বন্ধুত্ব ও রাক্ষসের যুদ্ধ হইয়াছিল—আমরা রামায়ণে পাই। কখন কখন এই শ্রেণীর মাছ লড়াই করিবার সময় অন্য দাঁতাল তিমির সহিত বন্ধুত্ব করিয়া একযোগে বড় বড় তিমির কর্ম্ম শেষ করিয়া দেয়।

তিমির গায়ে না আছে কাঁটা না আছে আঁস—বেশ তেলাল শরীর। তেলের, এবং মুখের ভিতর যে হাড়ে-বোনা জাল থাকে তাহার জন্য তিমি শিকারীদের এত প্রিয়। যখন নাক দিয়া উপরে জল তোলে তখনই শিকারীদের পোয়া-বার!



তিমির তেলের খুব দাম আর হাড়ের দামের কথা শুনিলে ত অবাক্ হইয়া যাইবে।

তোমাদের খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদ আছে, জলজন্তুদের কি নাই? ডলফিন্ নামক সামুদ্রিক জানোয়ার খুব আমোদপ্রিয়। ইহারা দল বাঁধিয়া জলের মধ্যে খুব লাফায়, নাচে আর আমোদ করে। কোন জাহাজ দেখিলে ছুটিল তাহার পেছনে। দরকার হইলেই সঙ্গীদের ডাকিয়া কাছে আনে। ইহাদের ভাষা ইহারাই বোঝে।

পাতালে নাগকন্যাদের কথা আমাদের অনেক পুরাণে আছে। কোন কোন সামুদ্রিক জানোয়ারের চেহারা মোটামুটি নাগকন্যাদেরই মত—অনেকটা মানুষের মত মাথা—অত সুন্দর না হউক—আর লম্বা লেজ। নাগকন্যারা ক্রমেই অদৃশ্য হইতেছেন।

জলহস্তীর কথা বোধ হয় শুনিয়াছ। কলিকাতার চিড়িয়াখানায় জলহস্তী আছে। দক্ষিণ মহাসাগরে এমন জলহস্তী আছে যে ২০।৩০ ফিট্ লম্বা আর বেড়ে ১৫ হইতে ১৮ ফিট্। সিংহের মত, ভালুকের মত জানোয়ারও সমুদ্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ভূগোলে পড়া যায় স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগ বেশী। জীবজন্তুও হয়ত বা জলেই বেশী। কিন্তু তাহার গণনা (census) করিবে কে?

—✻—

# একটী গোপনীয় কথা

( অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ )

## এক

যাইবার দিন সুনীল অমন কাণ্ডটা করিয়া বসিল কেন? তুই আজ যাইতেছিস্ পাড়াগাঁ ছাড়িয়া সহরের ইস্কুলে গিয়া ভর্ত্তি হইতে, ভাল করিয়া পড়াশুনা হইবে বলিয়া, কোথায় বাড়ীর সকলের সাথে মিষ্টি ব্যবহার করিবি, তা না দিলি ভোর বেলাতেই লীলাকে চটাইয়া! যাওয়ার দিনে কাজটা কি বড় ভাল হইল? বেচারা অত করিয়া কবিতাটা লিখিয়াছে, না হয় একটু আধটু

দোষ-ত্রুটী থাকিলইবা, তাই বলিয়া অমন ঠাট্টা-তামাসা করিয়া একবাড়ী লোকের সাম্‌নে উহাকে অপদস্থ করাটা কেমন ধারা ব্যবহার তোর ? লীলা চটিয়াছে, বাস্তবিকই চটিয়াছে ! আজই না হয় ছোড়্‌দা তার বিদেশে চলিয়াছে, কিন্তু দিন তাহার আসিবেই। তখন লীলা দেখিবে, শার্টে বোতাম লাগাইবার দরকার তার আর হয় কিনা ! দেখিবে, লুকাইয়া লুকাইয়া চা খাওয়ার সময় লীলার খোঁজ পড়ে কিনা ! হুঁ !

সুনীলের মনটা কিন্তু কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতেই কেমন কেমন করিতে লাগিল। হাজার হোক্‌, ছোট বোনটা তো, যাওয়ার দিন তাহার মনে কষ্ট দিয়া যাইবে ? তাই কাছে গিয়া চুলের মধ্যে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কি রে, চটে গেলি নাকি রে ? আরে, কবিতা লেখা কি এতই সোজা রে ? আগে দস্তুর মত 'ভাব' হওয়া চাই।"

ঠোঁট ফুলাইয়া লীলা জবাব দিল, "আমি বুঝি সব্বার সঙ্গে আড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছি ?"

"আরে বোকারাম, সে রকম ভাবের কথা বল্‌ছি না।"

"তবে আবার কি রকম ভাবের কথা ?"

"আচ্ছা দাঁড়া, তোকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। মনে কর 'সীতার বনবাসের' বিষয় একটা কবিতা লিখ্‌তে হবে। তখন তোর মনে খুব দুঃখু হওয়া চাই, নইলে ভাল কবিতা বেরোবে না !"

ব্যাপারটা লীলা তখন খুব সহজেই বুঝিয়া ফেলিল,—হোঃ, ভাব হওয়া মানে মনে দুঃখু হওয়া,—এ আর কে না বোঝে ? বলিল, "আচ্ছা ছোড়দা, সেই যে 'জ্ঞান-বিকাশ' পত্রিকায় তোমার কবিতাটা বেরিয়েছিল—সেই যে—

পর্ব্বত-দুহিতা নদি, বারি-ভরা দেহ,
সম্মান করিনু তোমা, আমি কিম্বা কেহ।

—সেটা লেখার সময় নিশ্চয়ই তোমার মনে খুব ভাব এসেছিল, নাঃ।" সুনীল সগর্ব্বে হাসিয়া বলিল, "ভাব না এলে কি অমন কবিতা কলম দিয়ে বেরোয় রে ?"



"আমি কিন্তু বলে দিতে পারি ছোড়দা, কবে তুমি ও কবিতা লিখেছিলে ?"

"কবে বল্‌তো ?"

"সেই যে সেবার অঙ্ক না পারার জন্যে বাবা তোমাকে খুব ঠেঙ্গিয়েছিলেন, তুমি সারা দিন বসে কাঁদ্‌লে,—নিশ্চয়ই সেদিন। নয় কি ? মনে খুব ভাব এসেছিল বুঝি ?"

সুনীল ভীষণ চটিয়া উঠিল, বলিল, "তুই একটা গাধা, তুই একটা গো-ভূত !"

কি কথার উত্তরে কি কথা, লীলার মুখ কালো হইয়া গেল। দেখিয়া সুনীলের মনে বড় দুঃখ হইল। একটু ভাবিয়া বলিল, "ও কিরে, মুখটা অমন প্যাঁচার মত করছিস্‌ কেন ?"

"নাঃ, মুখ প্যাঁচার মত কর্‌বে না, ভারী তো, উনি আমাকে গাধা বল্‌বেন !"

"আরে বোকা, এও বুঝ্‌তে পারলি নে, একটা কল্‌ করে তোর মনে ভাব এনে দিলাম। নইলে তুই তো আর সত্যি সত্যিই গাধা নোস্‌ ! তোর কি চারটে পা আছে ? যা, এবার একটা কবিতা লিখে ফেল্‌তো" ! "ওঃ তাই নাকি ?" বলিয়া দাদার উদারতায় মুগ্ধ হইয়া, একগাল হাসিয়া লীলা চলিয়া গেল। খানিকটা

একটা করে কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে নিস্‌

পরে সে তার ছোড়দা কে তার লেখা কবিতা শুনাইয়া দিল——

"একটী আকের গাছে ছিল মেলা কাক,
কাকগুলি রোজ রোজ নিয়ে যেত আক,
এক দিন প্রভাতে কাকগুলি আক নিতে এসে দেখে,
গাছের গোড়ায় কে যেন ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে ডাকে!
'ভাইও, ভাইও,' বলি' কাকগুলি ধায়,
দেখিল, একটি জীব কট্-মট্ চায়!"

সুনীল লাফাইয়া উঠিল, "বেড়ে, বেড়ে, বেড়ে কবিতা, কোথায় লাগে রবি ঠাকুর ?"

"কিন্তু দাদা, সব সময় যে মনে এমন ভাব আসে না ?"

"কবিতা লেখার আগে একটা করে কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে নিস্। চ'খে জল আসবে, মনে দুঃখু হবে, আর তর্ তর্ করে কবিতা লিখে যাবি।"

## দুই

পাড়াগাঁয়ের ইস্কুলে ভাল পড়াশুনা হয় না, তাই সুনীলের বাবা হরকিশোর বাবু ঠিক করিয়াছেন, সুনীলকে এবার সহরে পাঠাইয়া দিবেন। দিব্যি হোষ্টেলে সে আপন মনে পড়াশুনা নিয়া থাকিবে, কোন ঝঞ্ঝাটই নাই। অবিনাশ বাবুই ত সহরে রহিয়াছেন, (সম্পর্কে তিনি সুনীলের মামা হন) খোঁজ-খবর লইবার লোকের আর ভাবনা কি ? আর তা ছাড়া হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ও তো তাঁহার ছেলে-বেলাকার বন্ধু। হরকিশোর বাবুর দেখাদেখি গ্রামের আরও দু'একজন ভদ্রলোকও ঠিক করিয়া ফেলিলেন তাঁহাদের ছেলেদের—বিনোদ আর অভয়কেও—সুনীলের মত সহরে পাঠাইতে হইবে।

আজ যাত্রার দিন ঠিক হইয়াছে, তিনটি ছেলেই একসঙ্গে যাইবে। কতটুকুই বা পথ, রেলে যাইতে সবে তো লাগে তিন ঘণ্টা! তাও আবার নামা-উঠা নাই। প্রথমটা অভয় আর বিনোদের সাথে সুনীলকে পাঠাইতে হরকিশোর



বাবুর তেমন ইচ্ছা ছিল না ; ছেলে দুইটী বড় বখাটে। কিন্তু একটু পরেই ভাবিলেন, "তুমিও যেমন, সারাটা বছর ওরা থাকবে এক সঙ্গে হোষ্টেলে, আর এই তিন ঘণ্টা সময় গাড়ীতে একত্র গেলেই একেবারে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে—হ্যা—"

রওনা হইবার সময়ে সুনীলের মা তাকে অনেক উপদেশ দিয়া দিলেন—"কারুর সঙ্গে গোয়ার্তুমি করিস্‌নে, কাঁচা ফল না ধুয়ে খাস্‌নে, দুবেলা চা খাস্‌নে," ইত্যাদি।

রেলগাড়ীতে উঠিয়া তিন বন্ধু দেখিল যে, গাড়ীতে থাকিবার মধ্যে আছে একটি বুড়োসুড়ো গোছের ভদ্রলোক। নিতান্ত অজ পাড়াগেঁয়ে সে, নইলে মাথায় অতবড় টিকি থাকে, আর বালাপোষ গায়ে দিয়া এক পাশে অমন 'জবু থবু' হইয়া বসিয়া থাকে ? ভট্‌চায্যি পণ্ডিত মানুষ, নিশ্চয় কোথাও ফলার মারিতে গিয়াছিল। কী ফূর্ত্তি তখন তাহাদের! জীবনে এই প্রথম একলা রেল গাড়ীতে চড়িয়াছে, পারে তো নাচে! একটু পরেই অভয় গান জুড়িল। ওঃ, সে কী গান, শুনিলে তোমাদের জীবনে আর কখনও গান শুনিবার জন্য সাধ হইত না, গলাখানা বাস্তবিকই দিল্লী হইতে বর্ম্মা পর্য্যন্ত হানা দিতেছিল। সে গান শুনিয়া কোন ভদ্রলোকই ঠিক থাকিতে পারে না, বুড়ো ভদ্রলোকটীও পারিলেন না। বলিলেন, "ওহে ছোক্‌রারা, এ আরম্ভ করলে কি ?"

অভয় চটিল, দারুণ চটিল। কেন রে বাপু, রেল কোম্পানীকে পয়সা তুমিও দিয়াছ, তাহারাও দিয়াছে, তবে তোমার এমন ফোঁস্-ফোঁসানি কেন ? হঠাৎ তাহার মাথায় চট্ করিয়া কি একটা বুদ্ধি আসিল, বিনোদ আর সুনীলকে গাড়ীর একধারে সে ডাকিয়া লইয়া গেল।

সেখানে তিন জনে মিলিয়া যে পরামর্শ আঁটিল সে বড়ই ভয়ানক! ঠিক হইল, এই এতটা সময় গাড়ীতে তাহারা নিরর্থক নষ্ট করিবে কেন ? তার চেয়ে এই ভট্‌চায্যির পো কে লইয়া রগড় করা যাক্ না। ক্ষেপাইয়া ইহাকে গাড়ী-ছাড়া করিয়া তবে ছাড়া।

ফিরিয়া আসিয়া আবার তাহারা নিজে নিজেকার জায়গায় বসিয়া পড়িল। মিনিট্ তিন চার যাইতে না যাইতেই অভয় বেঞ্চির উপর চিৎপাৎ হইয়া বুক চাপ্ড়াইতে চাপ্ড়াইতে চীৎকার করিয়া উঠিল, "উঃ হু হুঃ, গেলুম গো গেলুম।"

বুড়ো ভদ্রলোকটি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "একি, এর কি শূলের ব্যথা আছে নাকি ?"

অভয় গোঙ্গাইতে গোঙ্গাইতে বলিল, "না গো ঠাকুর মশাই, পাপী, বড় পাপী আমি—গেলুম গো গেলুম।"

বিনোদ বলিল, "শাস্ত্রে আছে—

তাম্রকূটং মহাদ্রব্যং স্বেচ্ছয়া দীয়তে যদি
অশ্বমেধ-ফলপ্রদং টানে টানে চতুর্গুণম্

বুঝলেন কিনা ঠাকুর মশাই, ওসবও একটু আধটু পড়াশুনা আছে কিনা— মানে হচ্ছে যে, যে লোক তামাক খায় তাকে যদি না চাইতেই কেউ তামাক সেজে খাওয়ায়, তবে সে হুঁকোয় যতগুলো টান দেবে, প্রত্যেক টানে যে তামাক সেজে দিয়েছে তার চার চারটে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হবে। তা, আপনি যদি ঠাকুর মশাই আদেশ করেন, তবে ও আপনাকে একছিলিম তামাক সেজে দেয়। তাতে করে' যদি বেচারার পাপের ব্যথাটা একটু কমে। দেখ্ছেন না কি কষ্ট পাচ্ছে ?"

"বাঃ ছোকরা বাঃ, বেশ কথা কইতে শিখেছ তো, বলি বয়েস কত হল ?"

বিনোদের 'কমলাকান্তের দপ্তর' পড়া ছিল, জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞে ষ্ট্যাণ্ডার্ড না ক্যাল্‌কাটা ?"

বুড়ো ভদ্রলোক সে কথার উত্তর দিতেছেন না দেখিয়া অভয় বলিল, "বাংলা করে বল বিনোদ, নইলে ইংরিজি বল্‌লে ঠাকুর মশাই বুঝবেন কি করে ?"

বিনোদ নিজের রিষ্ট্ ওয়াচ্ দেখিয়া বলিল, "ষ্ট্যাণ্ডার্ড্ অর্থাৎ রেল-ওয়ের সময় হ'লে বয়স হচ্ছে তের বছর, সাত মাস, ছ' দিন, পনেরো ঘণ্টা, সাঁইত্রিশ মিনিট, এক-চল্লিশ সেকেণ্ড, আর ক্যাল্‌কাটা হলে তার সঙ্গে চব্বিশ মিনিট যোগ হবে।"



ভদ্রলোকটী বলিলেন, "বাঃ ছোক্‌রা, এই বয়সেই বেশ পেকে উঠেছ তো ?"

খোঁচা খাইয়া ছোক্‌রাদের রোখ আরও চড়িয়া গেল। তখন সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটীকে লইয়া এমনই ঠাট্টা-তামাসা তাহারা আরম্ভ করিল যে সে সমস্তের বর্ণনা দিতে আমার কলমে বাধে। শুধু এইটুকু বলিলেই ঢের হইবে যে, পরের ষ্টেশনে বুড়ো ভদ্রলোক নামিয়া গিয়া অন্য একটা গাড়ীতে চড়িলেন।

তিন

সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সকলে সহরে আসিয়া পৌঁছিল। হরকিশোর বাবু প্রথমে সকলকেই অবিনাশ বাবুর বাড়ীতে গিয়া উঠিতে বলিয়াছিলেন। একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া তাই সুনীল, বিনোদ আর অভয়, অবিনাশ বাবুর বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

সেই রাত্রেই ঠিক হইল কাল সাড়ে দশটায় কাচারী যাইবার পথে, অবিনাশ বাবু সকলকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসিবেন। তার পর একদিন ধীরে সুস্থে হোষ্টেলে গেলেই হইবে।

পর দিন সাড়ে দশটার কিছু আগেই কাচারী যাইবার সাজ-পোষাক করিয়া অবিনাশ বাবু গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন, ছেলে তিনটীও তাঁর পিছন

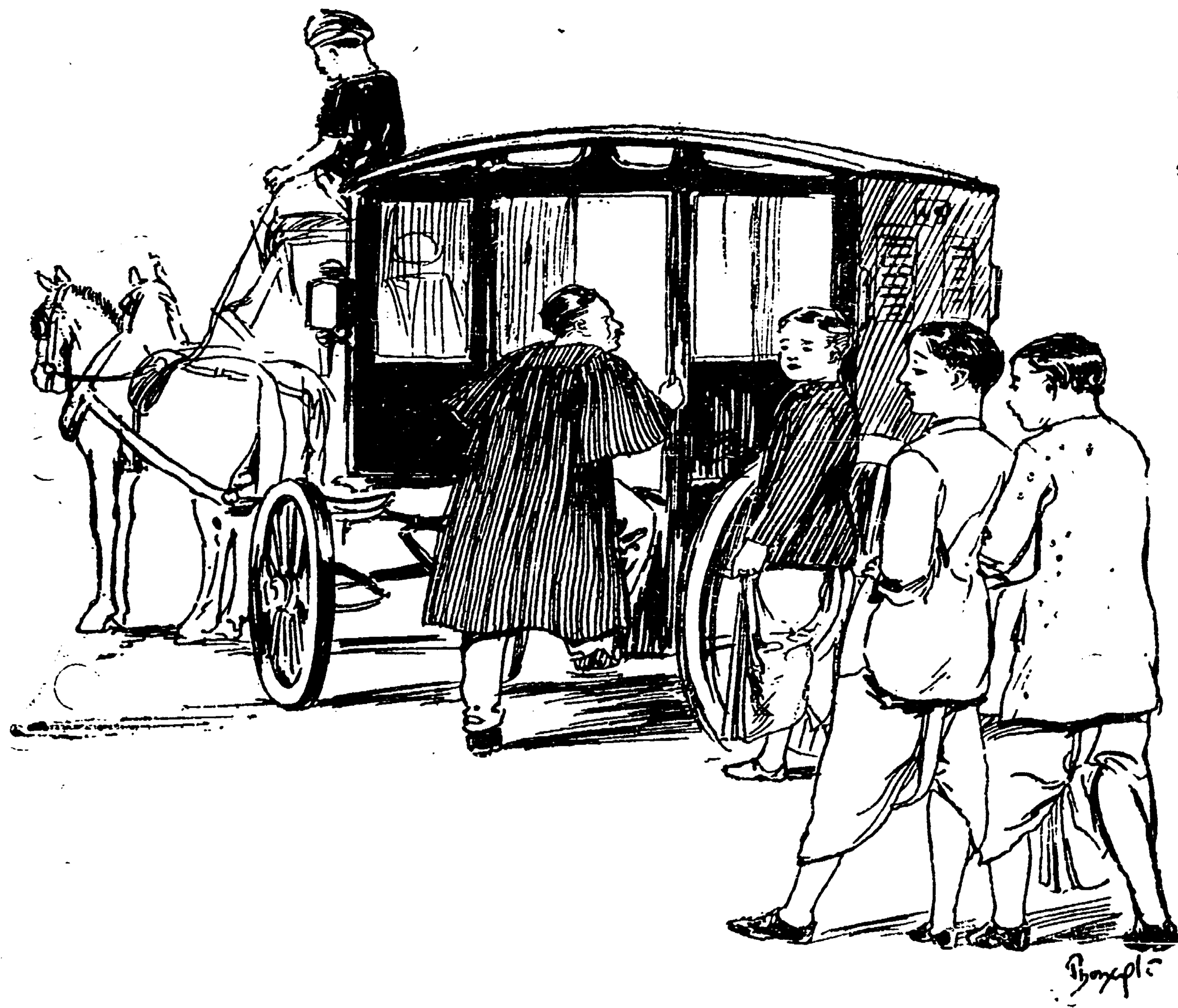

গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

পিছন ভয়ে ভয়ে গিয়া গাড়ীতে চড়িল। পাড়াগাঁয়ের ছেলে তাহারা, সহরের ইস্কুলে ভর্ত্তি হইতে যাইতেছে, বুক দুরু দুরু করিবার কথাইতো! ছাত্রেরা হয়তো তাহাদের নিয়া কতই না ঠাট্টা-তামাসা করিবে, সব ইস্কুলেই তো এমনটা করে! তার উপর মাষ্টার মশাইরা হয়তো কত রকমের কঠিন কঠিন প্রশ্ন করিবেন, হয়তো বা ক্লাশের মধ্যে আঁক কষিতে দিয়া বসিবেন!

ইস্কুলের চেহারা দেখিয়া বেচারারা আরও ভড়্‌কাইয়া গেল। কী বিরাট্ বাড়ী! কোথায় লাগে ইহার কাছে, তাদের পাড়াগাঁয়ের ইস্কুল! ক্লাশগুলি গম্ গম্ করিতেছে—ছাত্রে ভরা, মাষ্টার মশাইরা গম্ভীর মুখে পড়াইতেছেন।

চাপরাশী হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের বসিবার ঘর দেখাইয়া দিল। সামনে পর্দ্দা ঝুলিতেছিল, তাহা সরাইয়া অবিনাশ বাবু ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার পিছনে সুনীল, আরও পিছনে—বাকী দুইজন।

ঘরে ঢুকিয়াই সুনীল যে মাটীতে পড়িয়া গেল না, তার কারণ বোধ হয় এই যে, ঠিক তার পাশে ছিল দেওয়ালটা। কিন্তু মুখ তার একেবারে কাগজের মত সাদা হইয়া গেল। কেন? কাল বালাপোষ আর টিকির দৌলতে ট্রেনের মধ্যে যিনি ভট্‌চায্যি ঠাকুর বনিয়াছিলেন, আজ চোগা-চাপ্‌কান পরা ও সেক্রেটারিয়েট্ টেবিলের পাশে বসা সেই লোকটীকেই দেখিয়া সুনীল বুঝিল, আসলে ইনি হইতেছেন হেড্ মাষ্টার! আজ আর তাঁহার 'জবুথবু' ভাব নাই, বরং চশমার ভিতর দিয়া গম্ভীর ভাব আর রুক্ষ মেজাজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

অবিনাশ বাবু বলিলেন, "হেড্ মাষ্টার বাবু, এটীই হচ্ছে আমার ভাগ্নে, হরকিশোর বাবুর ছেলে! সুনীল, এঁকে প্রণাম কর।"

হেড্ মাষ্টার মশায় চশ্‌মার ভিতর দিয়া প্রত্যেকের মুখের দিকেই একবার করিয়া তাকাইলেন, তারপর বলিলেন, "ওঃ, এই হরকিশোরের ছেলে? তা' এদের সকলের সাথেই তো কাল ট্রেনে আমার আলাপ পরিচয় হ'য়ে গেছে!" "কই, সে কথা তো আমায় কেউ বল নি?" বলিয়া অবিনাশ বাবু ছেলেদের মুখের দিকে তাকাইলেন।



হেড্ মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "সে কিহে সে কথা বলনি নাকি, তবে কি আমাকেই বল্‌তে হবে?"

তোমরা শুনিয়া হাসিও না, চুপি চুপি একটা সত্য কথা তোমাদের বলিতেছি—এ কথা শুনিবার পর সুনীল একেবারে 'ভ্যাঁ' করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

হেড্ মাষ্টার মশায়কে কিন্তু লোক ভালই বলিতে হইবে, তিনি হঠাৎ সে কথাটা চাপা দিয়া ছেলে কয়টিকে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। আজ পর্য্যন্ত অবিনাশ বাবু বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই যে সুনীল সেদিন হঠাৎ এমন কাঁদিয়া উঠিল কেন। দেখিও তোমরা যেন কোন দিন অবিনাশ বাবুর কাছে গোপনীয় কথাটা ফাঁক করিয়া দিও না?

---

# জাপান কবে জাগিল

শ্রী.................................... ।

আজকাল তোমাদের কাউকে পৃথিবীর কয়েকটা বাছা বাছা বড় জাতির নাম করিতে বলিলে, জাপানের নাম কর প্রত্যেকেই। বছর ষাট সত্তর আগে কিন্তু বড় বলা দূরের কথা জাপানকে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিত না। আর, সবে এই কয়েকটা বছরের মধ্যেই কি ঘোর পরিবর্ত্তন!

জাপানের রাজাকে বলা হয় 'মিকাডো'। নামে 'সম্রাট্' হইলেও মিকাডো কিন্তু রাজ্য-শাসনের সমস্ত ক্ষমতাই আস্তে আস্তে খোয়াইয়া বসিলেন। আসলে যিনি রাজা হইলেন, তাঁহার উপাধি হইল 'শোগান'। গোড়াতে শোগান ছিলেন অনেকটা প্রধান সেনাপতি গোছের কর্ম্মচারী; হইয়া দাঁড়াইলেন কিন্তু তিনিই দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা!

জাপানে আর এক শ্রেণীর লোক ছিলেন, যাঁদের স্বয়ং শোগান পর্য্যন্ত খাতির করিয়া চলিতেন। তাঁরা হইলেন দেশের জমিদার-সম্প্রদায়; জাপানী ভাষায় তাঁহাদের নাম 'দাইমো'। নিজ নিজদের জমীদারীর মধ্যে এই দাইমোরা ছিলেন এক একটী বিধাতা-পুরুষ। যাহা খুসী হইত তাহাই করিতেন, আর করিতেন কথায় কথায় লোকের মুণ্ডপাত। যে সমস্ত অনুচর-সৈন্যের দৌলতে দাইমোরা এতটা তেজ খাটাইতেন, তাদের বলা হইত 'সামুরাই'—সে যে কী সাংঘাতিক সৈন্য তাহা বোধ হয় তোমরা কল্পনায়ও আনিতে পারিবে না।

ভয় বলিয়া কোন জিনিষ তাহারা জানিতই না, পুরুষ মানুষের দয়ামায়া আছে শুনিলে হাসিয়াই তাহারা আকুল হইত,—আরে, মেয়েদের সঙ্গে তবে প্রভেদটা রহিল কোথায় ? এক খানা তরোয়ালে তাহাদের কুলাইত না,—কোমরের দুই পাশে সর্ব্বদা ঝুলান থাকিত দুই খানা তরোয়াল। সে তরোয়াল একবার খুলিলে আর রক্ষা ছিল না, যেমন করিয়াই হউক রক্ত তাহাকে খাওয়াইতেই হইবে। রক্ত না খাওয়াইয়া খাপে তরোয়াল পূরিয়া রাখা ছিল সামুরাই-শাস্ত্রে মহাপাপ !

একটা জিনিষ জাপানীরা দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না—সেটা হইতেছে কোন বিদেশী জাতিকে আমল দেওয়া। বিদেশী ? ওরে বাবা ! সমস্ত লুটিয়া পুটিয়া লইবে যে। ইউরোপের দুই একটা জাতি কিন্তু শোগানকে বলিয়া কহিয়া নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বেশ একটু সুবিধা করিয়া লইল। দেশের লোকেরা তাহাতে তো খাপ্পা হইবেই। আর দাইমোরাও কোন্ বিরক্ত একটু না হইলেন !

সম্রাট্ মুৎসোহিতো

কিন্তু আসল ঘরোয়া গোলমাল সুরু হইল ১৮৫৩ সন হইতে। আমেরিকার সাধ গেল চীনের পূব দিক্‌কার সহর গুলির সহিত বেশ জাঁকিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য সুরু করিতে। এখন অসুবিধা হইতেছে এই যে, আমেরিকা হইতে কয়লা বোঝাই করিয়া একেবারে চীনের সহর গুলিতে আসিয়া পড়াটা যে কোন জাহাজের পক্ষেই বেশ একটু কঠিন ব্যাপার। খুব সুবিধা হয়, যদি পথে জাপানের কোন জায়গায় জাহাজ থামাইয়া কয়লা বোঝাই করিয়া লওয়া যায়। কিন্তু জাপান যে সে দিকে একেবারে মারমুখী—আবার বিদেশী ?



আমেরিকার কর্ত্তা মহাশয় সলা-পরামর্শ করিয়া শেষটায় কমোডোর পেরি নামে বিখ্যাত এক নৌ-সেনাপতিকে এক চিঠি দিয়া দিলেন জাপানের শোগানের কাছে পাঠাইয়া। সঙ্গে কয়েকখানা যুদ্ধ জাহাজও চলিল। পেরিকে বলিয়া দেওয়া হইল "দেখ বাপু, প্রথমে গিয়া বেশ মিষ্টি কথাতেই কাজ হাঁসিল করার চেষ্টা করিবে ; তার পর যদি নিতান্তই নাছোড়-বান্দা দেখ, তবে আর কি করিবে, গায়ের জোরের একটু নমুনা দেখাইও—তখন আপনিই রাজী হইবে।"

পেরি সাহেব তো চিঠি লইয়া চলিলেন। শোগানের হাতে চিঠিখানা দিয়া তিনি জাহাজ সমেত জাপান হইতে চলিয়া গেলেন ; বলিলেন, ফিরিবার পথে উত্তর লইয়া যাইবেন।

শোগান বেচারা পড়িয়া গেলেন মহা ফ্যাসাদে। যদি আমেরিকার কথাটা না রাখা হয়, তাহা হইলে—উঃ, যে দারুণ জাত,—কামানের গোলাতেই জাপানের দফা ঠাণ্ডা করিয়া দিবে। আর যদি তাদের বন্দরের মধ্যে ঢুকিতে দেওয়া হয় তো, দাইমোরা ক্ষেপিয়া গিয়া যে কি কাণ্ড করিয়া বসে, তারই বা ঠিক্ কি ? বেগতিক দেখিয়া তিনি সব দাইমোদের চিঠি দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, এ ক্ষেত্রে কি করা উচিত। সকলেই এক উত্তর পাঠাইল—কখনো রাজি হইব না—অত ভয় কি আমেরিকাকে ? তরোয়ালে এখনও আমাদের ধার আছে।

যথাসময়ে পেরি উত্তর নিতে আসিল। ইচ্ছা করিয়াই কয়েকখানা বেশী জাহাজ সঙ্গে আনিল—ভাবটা এই যে, রাজি যদি না হও তবে তো বুঝিতেই পারিতেছ ! ব্যাপার দেখিয়া শোগান গেলেন ভয় খাইয়া, পেরির কথাতেই সায় দিয়া ফেলিলেন। আমেরিকা যেই একবার অনুমতি পাইল, তখন আর বিলাতের অন্যান্য জাতিগুলিকেই বা ঠেকান যায় কি ভাবে ?—সকলেই আসিয়া জুটিল।

শোগানের ব্যবহারে একদল দাইমো একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল—কে তোমার শোগান ? আমরা তাকে চিনি না, আমাদের রাজা হইতেছেন মিকাডো ! তাহাদের সামুরাইয়েরা বিদেশীদের উপর অসম্ভব অত্যাচার সুরু করিয়া দিল। বিদেশীরাও যখন দেখিল, শোগান তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন না তখন তাহারাও রুখিয়া দাঁড়াইল। সামান্য কয়জন লোক, তাহারাই কামানের গোলায় ইয়া বড় বড় দাইমোদের জমীদারী লণ্ড ভণ্ড করিয়া দিল। জাপানীরা বুঝিল, ঢাল-তরোয়ালের দিন গিয়াছে, পৃথিবীতে টিকিয়া থাকিতে হইলে তাহাদেরও বন্দুক কামান ধরিতে হইবে—ইয়োরোপীয়দের সমকক্ষ হইতে হইবে।

ঠিক এই সময় এক শুভ-মুহূর্ত্তে তেরো বছরের ছেলে ম্যুৎসোহিতো মিকাডো হইয়া গদীতে বসিলেন। জাপানের সৌভাগ্য-সূর্য্য সেইদিনই উদিত হইল। পুরাতন শোগান

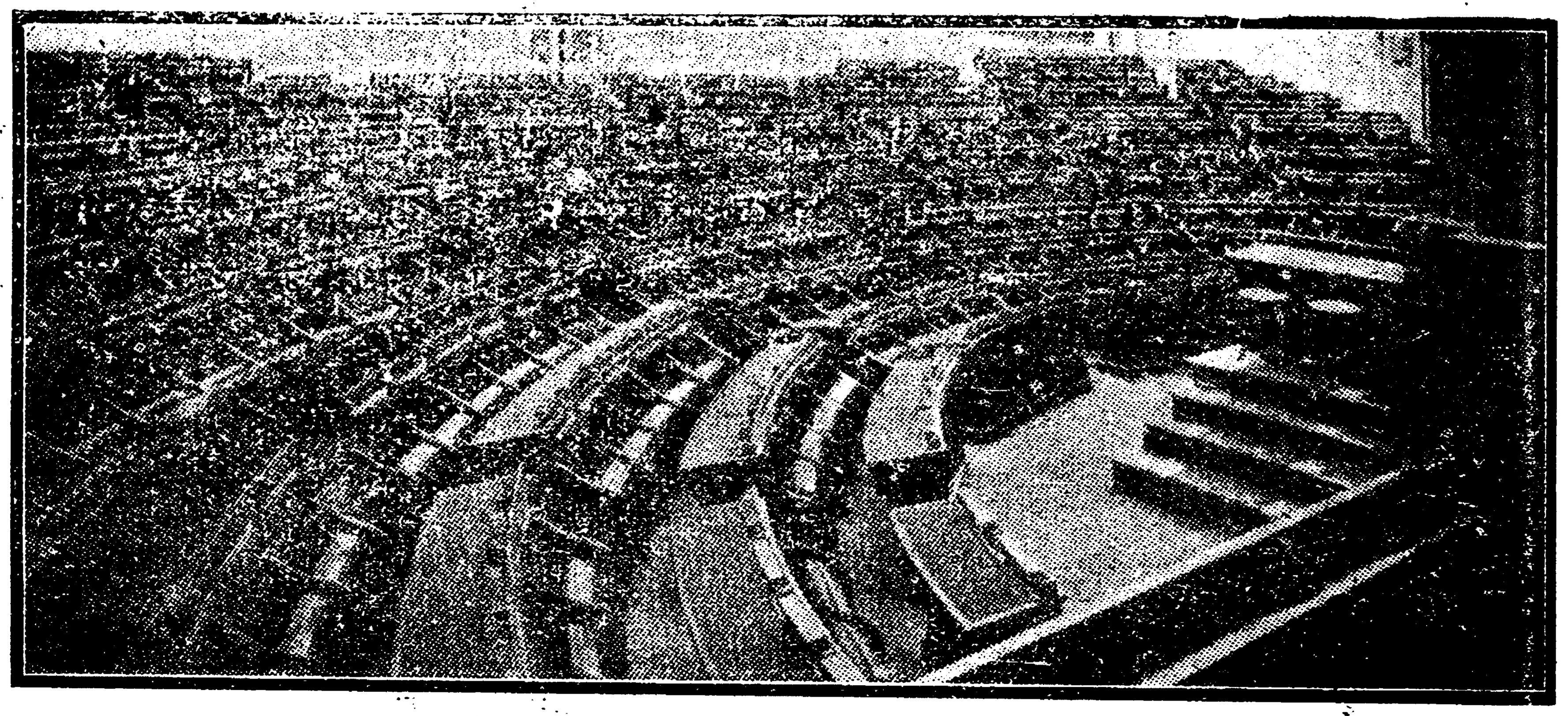

জাপানের পার্লামেণ্ট-গৃহ

জাপানের প্রধান মন্ত্রী ব্যারণ তনকা।

ইতিপূর্ব্বেই মারা গিয়াছিলেন, নূতন যিনি শোগান হইলেন, দাইমোরা তাহাকে ধরিয়া বসিল, তোমার সমস্ত ক্ষমতা মিকাডোকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। দেখিতেছ না তুই রাজার হাতে পড়িয়া সোণার জাপান আজ পথে বসিতে চলিয়াছে? নূতন শোগান রাজী হইলেন।

ইহার পরেই দাইমোরা আর একটা কাজ যা করিল, গোটা তুনিয়ার ইতিহাস-খানায় বোধ হয় তাহার তুলনা মিলিবে না! আগেই বলিয়াছি না যে নিজেদের জমী-দারীর মধ্যে দাইমোরাই ছিল সর্ব্বেসর্ব্বা? আজ তাহারা একযোটে আসিয়া মিকাডোকে বলিল, "সম্রাট্ আমাদের জমীদার, লোকজন সমস্তই আনিয়া আপনার হাতে দিলাম—



আজ হইতে আপনিই সর্ব্বেসর্ব্বা, আমরা কেউই নই। এ রকমটা না করিলে দেশের আর মঙ্গল নাই।"

ব্যস্, একবার যেই ঘর ঠিক হইয়া গেল, আর জাপানকে কে ঠেকাইয়া রাখে? তু'দিনের মধ্যেই দেশে রেল-টেলিগ্রাফ বসিল, সমুদ্রে সমুদ্রে জাপানী জাহাজ নাচিতে লাগিল, আর দলে দলে ছেলেরা বিদেশ হইতে নানা বিদ্যা শিখিয়া আসিয়া দেশের কাজে লাগিয়া গেল। আর রাজা? আস্তে আস্তে সমস্ত ক্ষমতা তিনি তাঁর প্রজাদের হাতেই ছাড়িয়া দিলেন। প্রজাদের বাছাই করা লোক নিয়া পার্লামেণ্ট্ বা মহাসভা বসিল, আর সেই সভাই হইল দেশের হর্ত্তাকর্ত্তা।

ইহার অল্প কয়েক দিন পরেই ক্ষুদে জাপান ইয়া বড় চীনকে যুদ্ধে তুলাধুনা করিয়া ছাড়িল, এবং তুই দিন যাইতে না যাইতে বিরাট্ রুষিয়া যে রুষিয়া, তিনিও জাপানের সাথে যুদ্ধে ফেল মারিলেন। সকলে বুঝিল, হ্যাঁ একখানা জাত বটে!

---

# মেয়েদের জানা দরকার

১। টাট্‌কা কতকগুলি ফুল পাইলে সকলেরই ইচ্ছা করে সেগুলি টেবিলের উপর ফুলদানে সাজাইয়া রাখিতে। ফুলদানের মধ্যে জল ভরিয়া তাহার মধ্যে খানিকটা কর্পূর মিশাইয়া লইলে ফুলগুলি বেশী দিন টাট্‌কা থাকিবে।

* * * *

২। ছুরিতে মরিচা পড়িলে যদি একটু পেঁয়াজ কাটিয়া তাহা দিয়া সে জায়গাটা ঘষা যায় তবে মরিচা উঠিয়া যাইবে।

৩। অনেক সময় শিশির মুখ আটকাইতে গিয়া দেখা যায় ছিপি ঠিক মত লাগিতেছে না, সে অবস্থায় যদি ছিপিটাকে খানিকক্ষণ তেলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা যায় তাহা হইলে অনেক সময় কাজ চলিতে পারে।

* * * *

৪। চা খাইতে গিয়া অনেক সময় কাপড়ের উপর চা পড়িয়া বিশ্রী দাগ লাগিয়া যায়। সব সময়ে সে দাগ উঠিতে চায় না, কিন্তু যদি চা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানটায় খানিকটা লবণ দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া যায়, তবে খানিক পরে ধুইয়া ফেলিলেই গোল চুকিয়া যাইবে।

---

## বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমতী আশারাণী মিত্র ও শ্রীমান্ অশোককুমার দাস।
(কলিকাতা)

কবি! তোমার কাব্য-ধারা পড়ছে বেগে বেয়ে,
হিমাচলের শীর্ষ হ'তে ধরার বুকে ছেয়ে।
ছন্দ-ভরা, উদাস-পারা, পাগল-করা গান,
চিত্ত-হারা, কেমনধারা, আবেগভরা তান।

কবি, তোমার কল্প-কথা, কাব্য হ'য়ে ঝরে,
বিশ্ববাসীর মর্ম্মব্যথা, তোমার বাণীর পরে।
স্নিগ্ধ, সরস, তোমার ভাষা, ওগো বিশ্ব-কবি,
বিশ্ব-বাসীর চিত্ত-পটে রাজে তোমার ছবি।

তোমার সরল গীতিগুলি সকল লোকেই গায়,
গানের মাঝে প্রাণের সাড়া সকল লোকেই পায়।

কাব্যে তোমার বিশ্বছাড়া চিত্ত-হারা সুর,
কাব্য লিখেই আত্মহারা, বক্ষ ভরপূর।

ভারত মাতার বক্ষ-মাঝে সরল, সজীব রবি,
ফুটলে তুমি স্নিগ্ধ সাজে, পূজ্য বিশ্বকবি।

---

## "বাক্-চাতুরী"

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী।
(শ্রীরামপুর)

প্রথম

শীতকালের রাত্রি। দানাপুরে যাইতে ছিলাম। ইণ্টারক্লাশে ভিড় হইয়াছিল বটে, তবে তেমন নয়। ট্রেন যখন হাওড়া ষ্টেশন হইতে ছাড়ে ছাড়ে, দুই মিনিটমাত্র বাকী আছে, এমন সময় এক মাড়োয়ারী আসিয়া আমাদের কামরায় উঠিতে চাহিল, বলিল, "বাবু হামি মাত্র এক ষ্টেশন্ যাবে।" অনেকেই বলিল, "হিঁয়াপর নেই হোগা, দোসরা গাড়ীমে যাও।" আমি তাহার প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া সকলকে বুঝাইয়া বলিলাম, আহা বেচারী একটী ষ্টেশন পরে নেবে যাবে, আর গাড়ীও এক্ষুণি ছেড়ে দেবে, অতএব এ অবস্থায় আমাদের বিরোধী হওয়া উচিত নয়। "আচ্ছা তবে আসুক" এই বলিয়া সকলে যে যাহার জায়গায় গায়ের কাপড় জড়াইয়া শয়ন করিল। আমিও বাঙ্কের উপরে অপরাপরদের মত সেই পথ অনুসরণ করিলাম।

দ্বিতীয়

তখন অনেক রাত্রি। ট্রেন বর্দ্ধমান ছাড়িয়া গিয়াছে এমন সময় আমার ঘুম ভাঙ্গিল, বাঙ্কের উপর উঠিয়া বসিয়া একটা সিগারেট ধরাইলাম। সিগারেট টানিতে টানিতে চোখ পড়িল নীচের দিকে। চেয়ে দেখি সেই পূর্ব্বোক্ত মাড়োয়ারীটা দিব্যি এতগুলা বোচকাবুচ্কি আনিয়া জায়গা করিয়া অর্থাৎ ইহার, উহার, তাহার জিনিষগুলি সরাইয়া ফেলিয়া, নিজের জিনিষগুলি ভাল করিয়া একস্থানে রাখিয়াছে, এবং মেঝেতে তাহার রচিত বিছানায় শয়ন করিয়া তাহার একজন স্বদেশবাসীর সহিত হাসিয়া হাসিয়া গল্প করিতেছে। মিথ্যাবাদী লোকটার উপর বড়ই ক্রোধ জন্মিল। হিন্দিভাষায় আমার ভালরূপ দখল না থাকায় বাংলা হিন্দী দুই মিশাইয়া এক অপরূপ ভাবে তাহাকে কহিলাম, "তুম্ লোক্ কি বোলা হ্যায় আমাকে? বোলা নেই তুমলোক এক ষ্টেশন্ যায়গা?"

মাড়োয়ারী। হাঁ, হামি এক ষ্টেশন্ যাবে, বাবু।
আমি। তবে তুম কাহে নেই এক ষ্টেশন্ পরে নাবা হ্যায়?
মা। বাবু হামিতো বলেছে এক ষ্টেশন্ যাবে।
আ। তোম কাঁহা যায়গা?
মা। মোকামা।
আ। হাওড়া থেকে মোকামা এক ষ্টেশন্ হ্যায় নেই, বেইমান!!

মা। হাঃ হাঃ হাঃ, বাবু মোকামা এক ষ্টেশন্ হ্যায়—

এই বলিয়া তাহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীটী বারংবার আমাদের চোখের সম্মুখে ধরিয়া বলিতে লাগিল, "বাবুলোক, মোকামা একই ষ্টেশন্ হ্যায়, দোস্‌রা নেই।" এতক্ষণে তাহার কথাটা বুঝিয়া আমরা সকলেই হাসিয়া ফেলিলাম। "রামধনুর" পাঠক পাঠিকারা ইহা পড়িয়া হাসিবে কিনা বলিতে পারি না। যাক্, সেই মাড়োয়ারীটা অন্য কোন উপায়ে আমাদের কামরায় স্থান পাইত না, বাক্-চাতুরীই তাহার স্বকার্য্য সাধন করিল।

——

## চৈতালি।

কুমারী উষারাণী দেবী।
( পিরোজপুর, বরিশাল )

| | | | |
|---|---|---|---|
| রাঙ্গা হয়ে<br>গাছের শাখে | আবিররাগে<br>বিহগ ডাকে, | আজ এলোরে<br>কণ্ঠে তাহার | চৈতালি ;<br>ঐ তালুই। |
| পিচ্‌কারীতে<br>হোলি খেলায় | ফাগের আলো<br>মাত্‌লো হিয়া, | ঝর্‌ছে গো আজ<br>ছুট্‌লো সবে | দিগ্বিদিক্ ;<br>মন্ যেদিক্। |
| রাঙ্গা হলো<br>পিচ্‌কারিতে | বন্ পিয়ারি,<br>ফিনিক্ ছোটে | ঠোঁটের কোণে<br>ধরছে আজি | লাল্ আলো ;<br>তাল্ ভালো। |
| হাস্নো-হেনা<br>হাস্‌ছে-ঢেলে | গোলাপ যূথী<br>মলয়-সনে | আর মালতি<br>সুবাস মৃদু- | গন্ধরাজ ;<br>মন্দ আজ। |
| লাল হলো রে<br>তাল্ ধরেছে | বিশ্ব খানা,<br>বুল বুলিটী, | চাইতে নারি<br>তাইরে না রে | বা রে বাঃ ;<br>না রে নাঃ। |
| আবির লয়ে<br>পথিক যত | পট্‌লা রুনু<br>প্রাণ পণে ঐ | ছুট্‌লো পথে<br>পালিয়ে গেল | লাফ্ মেরে ;<br>হাঁফ্ ছেড়ে। |
| ছেলে মেয়ের<br>হোলির মাঝে | ছোট্ট দলে<br>উঠ্‌লো ফুটে | লাগ্‌লো বেজায়<br>যুগল দুটী | ফূর্ত্তি রে ;<br>মূর্ত্তি রে। |
| ভক্তি-ফুলে<br>মোদের বুকে | যুগল দেবে<br>ঝরুক তাহার | করবো মোরা<br>জাগরণের | অর্চ্চনা ;<br>মূর্চ্ছনা। |
| রাঙ্গিয়ে জগৎ<br>বিশ জুড়ে | ফাগের রাগে<br>নিচ্ছে সবাই | আজ এলো রে<br>সুর মথিয়া | চৈতালি ;<br>ঐ তালুই। |

——

### ইঁদুর-পয়সা

সোণা, রূপা, তামা এই সব ধাতুই তো জানি এক টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহার হয়। আগে লোহাও চলিত, আমাদের দেশে কড়িরও প্রচলন ছিল। শুনিতে পাই প্রাচীন গ্রীসে নাকি এক কালে ষাঁড়ও টাকাকড়ি হিসাবে লোকে ব্যবহার করিত, কেননা হাল চাষ করা, মোট বওয়া প্রভৃতি কাজে ষাঁড়ের দরকার হইত সকলেরই। এ সব তো গেল, কিন্তু ইঁদুর মহাশয়কে লইয়া টাকাকড়ির কাজ চালানর কথা কোথাও শুনিয়াছ কি? যদি সে ব্যাপার দেখিতে চাও তো প্রশান্ত মহাসাগরের হাও দ্বীপটা একবার ঘুরিয়া আসিও।

### আবর্জ্জনার দাম

বাড়ী, ঘর দুয়ার প্রভৃতি ঝাটাইয়া যখন এক রাশ জঞ্জাল বা আবর্জ্জনা লইয়া রাস্তার ডাষ্ট্ বিণে ফেল, তখন স্বপ্নেও ভাব না যে দেশের কত পয়সা এই ভাবে নষ্ট হইতেছে। আবর্জ্জনার সাথে যে পরিমাণ ধাতু প্রতি বৎসর এই ভাবে নষ্ট হয়, তাহা জমাইয়া রাখিতে পারিলে দস্তুরমত বড় লোক বনিয়া যাইবে! পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, এক ইংলণ্ড দেশটাতেই আবর্জ্জনা হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ ধাতু পাওয়া যায়।

### লোহার অপচয়

ধাতুর মধ্যে সব চেয়ে দরকারী হইতেছে লোহা। কিন্তু দুঃখের বিষয় মরিচা ধরিয়া প্রতি বছর গোটা পৃথিবীতে প্রায় ছাপ্পান্ন কোটী সত্তর লক্ষ মণ লোহা নষ্ট হইতেছে। আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরা মাথা খাটাইতেছেন, কী ভাবে এ মারাত্মক অপচয়ের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

### মানুষের শরীরে কি কি আছে

দু'মণ ওজনের একটী সাধারণ মানুষের শরীরে কি কি মাল মশ্‌লা আছে শুনিবে? মণ খানেক জল—কেরোসিন তেলের কানাস্তার গোটা দুই কানাস্ত্রা তো হইবেই। গ্যাসে ছোট খাটো একটা ঘর ভরিয়া রাখা চলিবে। চর্ব্বি যা আছে তাহাতে গোটা ত্রিশেক মোম-

বাতি অনায়াসেই তৈরি করিতে পারিবে, আর অঙ্গার যা আছে তাহাতেও হাজার দশেক পেন্সিলের সীস্ তৈরি করা চলিবে। জন চব্বিশেক লোক ভাত খাইবার জন্য যতটা নুন পাতে নেয়, প্রায় ততটা নুন এবং কাপ পনেরো চা' তৈরিতে যত খানি চিনি লাগে ততটা চিনি মানুষের দেহের মধ্যেই পাওয়া যায়। এ ছাড়া আরও যা সব জিনিষ আছে তাহার মধ্যে চুনের নাম করা যাইতে পারে।

## তারার ক্ষুধা

তোমরা অনেকেই হয়ত' জান, না খাইতে পাইলে কেহই বাড়িতে পারে না। আকাশের তারাগুলিও বাড়ে, এ কথাও হয়ত তোমরা কেহ কেহ জান। কিন্তু তারাও খায়, একথা নিশ্চয়ই তোমরা মানিবে না। ডাক্তায় শেপলি নামে আমেরিকার এক পণ্ডিত কিন্তু বলিতেছেন—তারারা সত্যি সত্যিই খাইতে ওস্তাদ—তবে তাহাদের খাবারটা আমাদের মত মাছ ভাত নয়। শূন্যের মধ্যে যে সব উল্কা ছুটিয়া বেড়ায়, কাছে আসিলে তারারা তাহাদেরই ধরিয়া খায়।

পৃথিবী ও সূর্য্য ইঁহারাও কম পেটুক নহেন। সূর্য্য বেচারাকে আমাদের কাছে আলো পাঠাইতে হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহার ফলে সূর্য্যকে প্রতি সেকেণ্ডে ৪০ লক্ষ টন মাল মসল্লা খরচ করিতে হয়। সূর্য্য ঠাকুর নাকি সেই ক্ষতিটার শোধ তুলিয়া নেন প্রতি সেকেণ্ডে কয়েক কোটি উল্কা উদরস্থ করিয়া।

ব্যাপারটা যদি সত্যি হয় তবে কি অদ্ভুত বল ত?

## কাবুলের খবর

এখনও দেশ গোলমাল চলিতেছে, ঠিক খবর পাওয়া কঠিন। যতদূর জানা গিয়াছে, সর্দ্দার নাদির খাঁ ফরাসী দেশ হইতে আসিয়া কাবুলের পূর্ব্বদিকের উপজাতিদের সঙ্গে মিতালির চেষ্টায় আছেন। তিনি ধরা পড়িয়াছেন বলিয়াও একটা খবর আসিয়াছে। তাঁহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে বলিয়াও একটা গুজব উঠিয়াছে। আলি আহমাদ জান একবার ধাক্কা খাইয়াও নিশ্চেষ্ট নহেন। আমীর আমানুল্লাও নাকি কাবুলের দিকে রুখিয়া আসিতেছেন। আর বাচ্চ-ই-সাকো এখনও গাঁট হইয়া কাবুলে আছেন। সর্দ্দারদের কার মনের ভাব কি—কে আমানুল্লার পক্ষে যাইবেন, কে-ই বা নিজে দাঁও মারার উদ্যোগে আছেন, শীঘ্রই বোঝা যাইবে।

---

## চিত্র পরিচয়ঃ—

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঁচ বৎসর বয়সে কালী-পণ্ডিত মহাশয়ের পাঠশালায় ভর্ত্তি হইলেন। তিন বৎসর মাত্র সেখানে ছিলেন, কিন্তু ইহার মধ্যেই পণ্ডিত মহাশয় বুঝিয়া লইলেন যে এরূপ তুখোড় ছেলে তিনি তাঁহার জীবনে দেখেন নাই।

---

# গতমাসের ধাঁধার উত্তর

১। সাধক
সরণী
জলজ
গগন
দীপালী
অশন
খরচ
চন্দ্রমা
বদল
কুসুম
সার জগদীশচন্দ্র বসু

২। বাঁ দিকের রাস্তা ১৬ মাইল; ডানদিকেরটা ১৮ মাইল।

---

# উত্তর দাতাদিগের নাম

## যাঁহারা দুইটী ধাঁধারই নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন :—

শিশিরকুমার রায় (বসিরহাট), হিমাংশুকুমার নিয়োগী (জলপাইগুড়ি), প্রিয়দাস বড়ুয়া (আকিয়াব), মনোজিৎ বসু (কুড়িগ্রাম), দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় (পাটনা), অরুণা দেবী (পাটনা), অমিয়কুমার বড়াল (পাটনা), কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় (লাহোর), 'বয়েজ ওন লাইব্রেরী'র সভ্যগণ, লক্ষ্মীদেবী (সাওর্গা), নগেন্দ্র, নৃপেন্দ্র, দীনেশ ও শ্রীনাথ (কামালপুর), প্রতুলচন্দ্র ঘোষ (মেদিনীপুর), গুণদাপ্রসাদ মুখার্জ্জী (দিল্লী), অখিলচরণ বসু (ঢাকা), যোগেশচন্দ্র সাহা (ঢাকা), উত্তর বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম (বগুড়া), কুমুদ বিহারী ঘোষ (ধুবড়ী), রমেন, ইন্দু, ঊষা, মণি, ধনি, শঙ্কর ও সুধামাধব ঘোষ (জামালপুর), সুনন্দা ভৌমিক (রংপুর), বিমল-জ্যোতি ও ধ্রুব জ্যোতি সেন (কল্‌মা), হরিদাস, দেবেন্দ্র, নগেন্দ্র, শ্রীবাস ও রইছ (কামালপুর), পুলিনবিহারী ও নীলিমাকুমারী বিশ্বাস (কলিকাতা)।

## যাঁহারা একটী ধাঁধার নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন :—

শৈলেন্দ্রনাথ সেন (ভবানীপুর), পারিজাত রেণু দেবী (রংপুর), উলুবেড়িয়া সেকেণ্ডক্লাসের ছাত্রগণ (উলুবেড়িয়া), বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় (বালী), অপর্ণা সেন (ভোলা), কল্যাণী দত্ত (নিউদিল্লী), প্রফুল্লরঞ্জন গুপ্ত (নদীয়া), নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ধূলগ্রাম), শিবপদ সেন গুপ্ত (বাইশরশি, ফরিদপুর), পুসু, বুলু, নিরু, অজু, অরুণ ও খোকা (ডাল্টনগঞ্জ), মধ্যবাংলা সারস্বত আশ্রমের ছাত্রবৃন্দ (জয়দেবপুর, ঢাকা)।

---

# রং তামাসা

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ( ধূলগ্রাম, খুলনা )।

সহকারী শিক্ষক। ( হেড্‌মাষ্টারের প্রতি ) থার্ড ক্লাসের 'কেব্‌লা' বলে যে ছেলেটা আছে, তাকে নিশ্চয়ই শাস্তি দিতে হবে; কারণ সে অন্য স্কুলের মাষ্টারদের কাছে বলে বেড়ায় যে আমি একজন মহা গণ্ডমূর্খ !

হেড্‌মাষ্টার। আচ্ছা, আমি তাকে নিষেধ করে দেব যেন সে স্কুল সংক্রান্ত এ রকম গোপনীয় বিষয়গুলি আর কখনও প্রকাশ না করে।

---

# নূতন ধাঁধা

## ১

### শব্দ রুহিতন

কয়েকটী শব্দকে এমন ভাবে সাজাতে হবে যে পাশাপাশি ( বাঁয়ে থেকে ডাইনে ) যে শব্দগুলি আছে, উপর থেকে নীচেও সেই শব্দই হবে। আর সবশুদ্ধ দেখতে হবে রুহিতনের মত। নীচে একটা উদাহরণ দিলাম—

ধাঁধার শব্দগুলি—( ১ ) ব্যঞ্জনবর্ণ ( ২ ) ভুট্টা ( ৩ ) লোকনিন্দা ( ৪ ) টানিলে বড় হয় এমন একটা জিনিষ ( ৫ ) ব্যঞ্জনবর্ণ।

উত্তর—

জ
জ না র
জ না প বা দ
র বা র
দ

এই রকম দুইটী ধাঁধা দেওয়া গেল ঃ—

**ক**

(১) ব্যঞ্জনবর্ণ ; (২) ফুলের নাম ; (৩) পরদিন ; (৪) জন্তুবিশেষ ; (৫) ব্যঞ্জনবর্ণ।

**খ**

(১) ব্যঞ্জনবর্ণ ; (২) বাজী তৈরী করিবার একটি আবশ্যক দ্রব্য ; (৩) রামায়ণোক্ত পর্ব্বত ; (৪) কলা ; (৫) ব্যঞ্জনবর্ণ।

শ্রীহীরেন্দ্র চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

## ২

কোন্‌ নিরাকার ফুল সাকার হইলে ফল হয় ?

শ্রীমনোজিৎ বসু

---

চিত্রে বিদ্যাসাগর-জীবনী—৩
"পথের ধারে শিল পুঁতেছে কেন বাবা" ?
[ চিত্র পরিচয় দেখ
শিল্পী—শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত ]
C. H. ARAN & CO

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE

# রামধনু

২য় বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৩৬ | ৪র্থ সংখ্যা

## নব বর্ষের প্রার্থনা

নব বরষের প্রথম প্রভাতে শুধু এই চাই দান,
তোমাকেই যেন বাসি আমি ভাল, হে আমার ভগবান্।
দুঃখ কি সুখ, যা' মেলে মিলুক,—সবি বহে কল্যাণ,—
এ নীতি আমায় তুমি শিখাইও, হে আমার ভগবান্।
জীবনে যা কিছু জানিয়াছি ভাল, আমা হতে তাহা ম্লান
দিওনা হইতে, হে আমার প্রভু, হে আমার ভগবান্।

———

# বৈজ্ঞানিকের ঘুড়ী

( শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য )

আমাদের একটি চাকর ছিল—সব ব্যাপারেই অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিতে তাহার জোড়া দুটি ছিল না। মনে পড়ে এক বর্ষার রাত্রে ঘরের মধ্যে চুপ্ চাপ্ বসিয়া আছি,—বাহিরে ভীষণ বাদল, আকাশ কাঁপাইয়া তুমুল শব্দ উঠিতেছে, আর মাঝে মাঝে অন্ধকার চিরিয়া হঠাৎ বিদ্যুতের আলো জ্বলিয়া উঠিয়াই সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়া যাইতেছে। আমাদের সেই চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হ্যাঁরে, আলোটা অমন করে কেন রে?" সে পরম বিজ্ঞের মত জবাব দিল, "ব্যাপারটা হইতেছে কি জান, স্বর্গে দেবতাদের সাথে দৈত্যের লড়াই চলিতেছে না! দৈত্যেরা দেখার সুবিধা হইবে বলিয়া যত বার আলো জ্বালাইতেছে দেবতারা সঙ্গে সঙ্গে নিভাইয়া দিতেছেন।"

অশিক্ষিত লোকেদের কাছে আর এর বেশী কি আশা করা যায়? এখনও হয়ত অজ পাড়াগাঁয়ে গেলে এমন অনেক লোক দেখা যাইবে যাহারা বুড়া বয়সেও এই সব আজগুবি বিশ্বাস ছাড়িতে পারে নাই। কিন্তু তোমাদের যদি জিজ্ঞাসা করি তোমরা এক সঙ্গে বলিয়া উঠিবে—"এ আর জান না? ইলেক্ট্রিসিটি—ইলেক্ট্রিসিটি। মেঘে মেঘে ঘষা লাগিয়া বিদ্যুৎ তৈরী হইতেছে, আলোটা তারই, শব্দটাও। আজ এ কথাটা সকলেই জোর গলায় বলিতে পারে, কিন্তু এক দিন ছিল যে দিন লোকে আমাদের সেই চাকরটার মতই এ সবের কিছুই জানিত না। বৈজ্ঞানিক হাতে নাতে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন তবে না, লোকে জানিয়াছে!

সে অনেক দিনের কথা—প্রায় দুশো বছর। মানুষ তখন ঘরে বসিয়া অল্প সল্প বিদ্যুৎ তৈরী করিতে শিখিয়াছে কিন্তু এখনকার মত নানা কাজে তাকে খাটাইতে শেখে নাই। শুধু পণ্ডিতদের মহলে তখন জিনিষটাকে লইয়া বেশ



একটু সাড়া পড়িয়াছে, এই পর্য্যন্ত। এই সময়ে আমেরিকায় বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্ক্লিন বলিয়া একজন লোক ছিলেন।

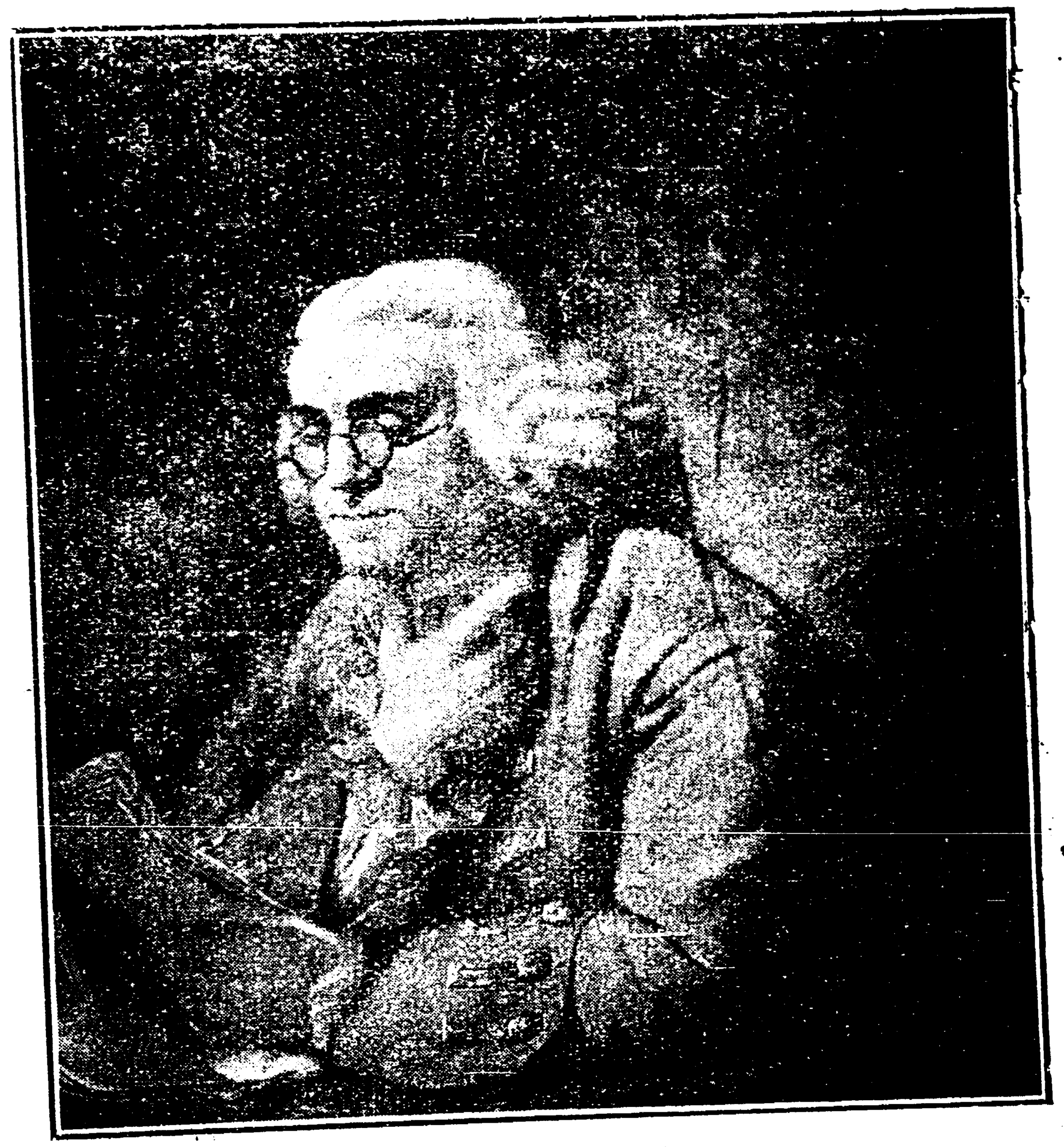

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্ক্লিন

বেঞ্জামিন ছিলেন গরীবের ছেলে—কিন্তু লেখা-পড়ার দিকে তাঁর ঝোঁকটা ছিল বরাবরই খুব বেশী; নিজের যত্নে বড় হইয়া তিনি কালে দেশের নেতা হইয়াছিলেন, নিজের দেশকে স্বাধীন করিতেও কম করেন নাই। কিন্তু রাজনীতির সাথে তিনি আর একটা জিনিষের চেষ্টা করিয়াছিলেন—সেটা হইতেছে বিজ্ঞান। বিশেষ করিয়া, এই বিদ্যুৎ।

কোন কোন জিনিষ ঘষাঘষি করিলে অনেক সময় বেশ খানিকটা বিদ্যুৎ তৈরী করা যায়। বিদ্যুৎ বেশী হইলে অনেক সময় শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। অনেকটা আকাশের বিদ্যুতের মত। কয়েক জন পণ্ডিত এই সাদৃশ্য দেখিয়া সন্দেহক রিলেন—হয়তো বর্ষার আকাশে যে আলো জ্বলিয়া উঠে,তাহার সাথে এই বিদ্যুতের কোন মিল আছে। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্ক্লিনও ইঁহাদের মধ্যে একজন। কিন্তু বেঞ্জামিন শুধু সন্দেহ করিয়াই আসেন নাই, তিনি ভাবিতেন—ব্যাপারটা সত্যি কিনা পরীক্ষা করা যায় না?

পরীক্ষা করিতে হইলে আকাশের বিদ্যুৎকে ধরিয়া আনা দরকার। কিন্তু তাই বা কি করিয়া হয়? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহার মাথায় এক অদ্ভুত বুদ্ধি আসিল।

তার পর এক দিন সকলে দেখে আধা-বয়সী একজন ভদ্রলোক নিতান্ত ছোট ছেলেটির মত মনের সুখে ঘুড়ী উড়াইতে শিখিতেছে। পড়্ পড়্ করিয়া আকাশে ঘুড়ী উড়িতেছে আর তিনি দিব্যি সূতা ছাড়িতেছেন। সকলে ঠিক করিল, লোকটা পাগল। এক বুড়ী গিয়া থানায় খবর দিল। থানার লোকেরা আসিয়া দেখে লোকটি আর কেউ নয়—স্বয়ং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।

ফ্র্যাঙ্কলিন ঠিক করিয়াছিলেন ঘুড়ীতে করিয়া আকাশের বিদ্যুৎ ধরিবেন। তাই বুড়া বয়সে গিয়াছিলেন ঘুড়ী উড়ান শিখিতে।

এইখানে একটা কথা জানা দরকার। বিদ্যুৎ জিনিষটা সব কিছুর ভিতর দিয়া সমান ভাবে যাইতে পারে না, কোন কোন জিনিষের মধ্য দিয়া ইহা খুব তাড়াতাড়ি যায়—যেমন তামা প্রভৃতি ধাতু—আবার কোন কোন জিনিষের মধ্য দিয়া ইহা যাইতে পারে না। সিল্ক্ এই ধরণের একটী জিনিষ।

ফ্র্যাঙ্কলিন একটা সিল্কের ঘুড়ী তৈরী করিলেন, আর তার মাথায় একটা তার বাঁধিয়া দিলেন। তার পর ঘুড়ীটায় লম্বা সূতা বাঁধিয়া ফেলিলেন, সূতাটা তিনি হাত দিয়া ধরিলেন না। সূতার গোড়ায় একটা হাতখানেক লম্বা সিল্কের ফিতা বাঁধিয়া লইয়া তাহাই ধরিলেন, আর যেখানটায় সূতা আর সিল্ক বাঁধা হইল সেই গিঁঠটায় একটা চাবি বাঁধিয়া লইলেন। এই হইল তাঁর সরঞ্জাম। তার পর তিনি মেঘের আশায় বসিয়া রহিলেন।

তার পর একদিন বর্ষা আসিল, আকাশ মেঘে মেঘে ঢাকিয়া ফেলিল, আর তার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইতে আরম্ভ করিল। ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁহার ঘুড়ী লইয়া বাহিরে আসিলেন,—আর সূতা ছাড়িয়া সেই ঘুড়ী একেবারে মেঘের গায়ের উপর লইয়া ফেলিলেন।

প্রথমবার একটা বিদ্যুৎ ঘুড়ীর উপর দিয়া চলিয়া গেল, কিছুই হইল না।



ফ্র্যাঙ্কলিনের বুকটা দুরু দুরু করিয়া উঠিল—তবে কি তাঁহার সন্দেহ ভুল? একটু পরে আবার বিদ্যুৎ চমকাইল, ফ্র্যাঙ্কলিন দেখিলেন হঠাৎ তাঁহার ঘুড়ীর সূতা শক্ত হইয়া টান টান হইয়া গেল। ঘুড়ীর উপর সত্যসত্যই বোধ হয় বিদ্যুৎ পড়িয়াছে।

সেই ঘুড়ী একেবারে মেঘের গায়ের উপরে লইয়া ফেলিলেন

সূতার কাছে আঙ্গুল লইয়া ফ্র্যাঙ্ক্লিন দেখিলেন, বিদ্যুৎ যেমন করিয়া টানে সূতাও যেন তেমনি করিয়া তাঁহার আঙ্গুল টানিতেছে। তারপর বৃষ্টি আরম্ভ হইল, সূতা ভিজিয়া গেল, ফ্র্যাঙ্ক্লিন সেই চাবিটার গায়ে হাত দিলেন। চাবির উপরটা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—আর সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁকুনি খাইয়া ফ্র্যাঙ্ক্লিন পড়িয়া গেলেন। তোমাদের মধ্যে যাহাদের বাড়ীতে ইলেক্ট্রিক লাইট আছে তাহাদের অনেকেই হয়তো বিদ্যুতের ঝাঁকুনি—'শক্'—জিনিষটার একটু আধটু পরিচয় পাইয়াছ। একটা শক্ খাইলে তোমাদের মনে যে খুব আনন্দ হয় না, এটা বোধ হয় আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু এই ঝাঁকুনি খাইয়া ফ্র্যাঙ্ক্লিনের মনে, দুঃখ হওয়া দূরে থাক্, যত আনন্দ হইয়াছিল অতটা তোমাদের কাহারও জীবনে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কেননা, এই ঝাঁকুনির ফলে প্রমাণ

হইয়া গেল—আকাশের যে আলো তাহা আসলে বিদ্যুৎ ( ইলেকট্রিসিটি ) ভিন্ন আর কিছুই নয়।

---

# অপ্রস্তুত

( শ্রীমতী মণিকা দেবী )

আমাদের ক্লাসের সকলেরই পরস্পরের মধ্যে বেশ ভাব-সাব ছিল। তার কারণ যে কি, তা তোমরা সবাই নিশ্চয় বুঝ্‌তে পেরেছ—দুষ্টামিতে আমাদের কেউই কম ছিলাম না। কিন্তু সেবার যা ঠকাটা ঠকেছিলাম, জীবনে আর কখনও সে রকম অপ্রস্তুত হইনি।

সেবার আমাদের ক্লাশে একটী নূতন মেয়ে ভর্ত্তি হ'ল—লীলা। তার বাবা পশ্চিমের এক সহরে কাজ করতেন, তাই তাকে আমাদের হোস্টেলেই থাক্‌তে হোলো। লীলার সঙ্গে কিন্তু আমাদের তেমন ভাব হোলো না। আমাদের সঙ্গে তেমন মিশ্‌তও না সে, আর বেড়াবার সময় একলাটি গম্ভীর হয়েই বেড়াত। যদিও বা ডাক্‌লে একটু আধটু কাছে আসতো, কিন্তু মন খুলে কথা বলেনি সে কোন দিনই। সরলা একদিন আমায় বল্ল, "জানিস্ মায়া, লীলা কেন আমাদের সঙ্গে মেশে না?" আমি, টুনী, মীনা, লতা সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে উঠলাম, "কেন ভাই, কেন মেশে না?" জবাব দিল রেবা, বল্লে, "মিশ্‌বে কিরে, অমন সুন্দরী, আমাদের মত কাল পেঁচীদের সাথে মিশ্‌লে মানহানি হবে না বুঝি?" সুন্দরী রেবা নিজেও কিছু কম ছিল না, বরং লীলা আস্‌বার আগে স্কুলের সেরা সুন্দরী বল্‌তে হলে রেবাকেই বল্‌তে হোত; কিন্তু লীলা আসতেই সে গর্ব্বে তার ঘা পড়ে গেছে। কাজেই এত রাগ!

টিফিনের সময় যখন আমাদের বাড়ী থেকে খাবার আসতো, সে সময়টা ছিল আমাদের ভারী আমোদের সময়। পাঁচজনে মিলে মহা হল্লা করে খাবার



খাওয়া চল্‌তো! কিন্তু এখানেও লীলা এক কাণ্ড করে বস্‌লো। টুনীদের বাড়ী থেকে সেদিন খাবার এসেছে। লীলাকেও ডাকা হোল। ও কিনা ফস্ করে বলে বস্‌লে, "ওর বাড়ীর খাবার আমি কেন খেতে যাব? আমার জন্যে তো আর ওর মা খাবার পাঠান নি"! ওর সেই লম্বা বুলি শুনে তো আমরা অবাক্! টুনী আবার পর কি করে হোলো?

সেবার গরমের ছুটীর দু'তিন দিন আগে, সরলা একদিন হঠাৎ হাঁফাতে হাঁফাতে মুখ লাল করে আমাদের সবাইকে ডেকে বল্ল, "জানিস্ ভাই, বাছা এবার হাতে হাতে ধরা পড়ে গেছেন। পরশু দিন লীলার মামা তার জন্য একটা বাক্স এনে তাকে দিয়েছেন। লীলা সেই বাক্সটা নিয়ে শোবার ঘরে তার খাটের তলায় রেখেছে। পরশু বিকেল বেলা আমার মাথা ধরেছিল বলে আমি বেড্‌রুমে শুয়েছিলাম—দেখলাম লীলা চুপি চুপি এসে, এদিক্ ওদিক্ চেয়ে, আস্তে আস্তে খাটের তলা থেকে বাক্সটা বের করে কি কর্‌ছে। পেছন ফিরে বসেছিল, তাই ভাল করে দেখতে পেলাম না। কালও আমি ওর ওপর নজর রেখেছিলাম—ঠিক একই সময় ও এসে ঘরে ঢুক্‌ল। কী হ্যাংলা মেয়ে বাবা, কি ছোট আত্মা! ছি ছি! দেশ থেকে খাবার এসেছে—এখানে এক হোস্টেল মেয়ে, আর তুই কিনা সব্বার কাছ থেকে লুকিয়ে একাই হাস্ হাস্ করে তাই গিল্‌ছিস্? ঘেন্নাও হোলো না—এত ছোট প্রবৃত্তি!"

মীনা বল্লো, "চল্ ভাই, এখুনি গিয়ে বাক্সটা খুলে দেখি কি আছে ওতে।"

লতা বল্লো, "দূর বোকা, চাবী যে ওর আঁচলে আছে; খুল্‌বি কি করে?"

আমি বল্লাম, "শোবার ঘরে তো বাক্স রাখ্‌বার নিয়ম নেই, চল্ এক কাজ করা যাক্। আজ লীলা শোবার ঘরে যাবার আগেই সবাই গিয়ে লুকিয়ে থাক্‌বো। তার পর ও এলেই "শোবার ঘরে বাক্স রেখেছ কেন, এক্ষুণি বলে দেব"—এই ভয় দেখিয়ে চাবীটা আদায় করে নিতে হবে। তার পর ও যেমন মেয়ে তার তেম্নি শাস্তি হবে। ভাল মানুষের মুখোস পরে থাকা ওর বেরিয়ে যাবে—এক হোস্টেল

মেয়ে সবাই টের পাবে কত নীচ, কত ছোট ওর মন! সেটা কি বড় কম শাস্তি হবে ?”

তাই ঠিক হলো। বিকেল হতে না হতে কারুর মাথা ব্যথা হ'ল, কারুর পেট ব্যথা হ'লো, কারুর জ্বর-জ্বর ভাব হলো, সবাই একে একে বেড্‌রুমে গিয়ে হাজির! কেউ দরজার পাশে, কেউ বিছানার তলায়, সবাই লুকিয়ে রইলাম। একটু পরে লীলা এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে চট্ করে ঘরে ঢুকে পড়্‌ল। আমাদের ও অবস্থায় দেখেই তো সে একেবারে ভড়্‌কে গেল। আমি তাড়াতাড়ি লীলার সাম্‌নে গিয়ে বল্‌লাম, “লীলা, শোবার ঘরে কোনও বাক্স রাখবার নিয়ম নেই তা তুমি জান। ভাল চাও তো চুপ্ করে থাক,—একটু নড়া চড়া করবে না, বা একটী কথা কইবে না। তা না হলে আমি কিন্তু মিস্ দাসকে বলে দেব।” ( মিস্ দাস আমাদের লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ )।

সরলা তখন আস্তে আস্তে লীলার আঁচল হ'তে চাবীর গোছাটী খুলে নিল। তারপর সকলে মহা উৎসাহে বাক্সটা ঘিরে বস্‌লাম। সরলা চট্‌পট্ বাক্সের ডালাটা খুলে ফেল্‌ল। ডালা খুল্‌তেই তো সকলের চক্ষুস্থির! সরলা “মাগো” বলে চীৎকার করে উঠ্‌লো। সবাই ভয়ে সাত হাত দূরে পালালাম। মীনা তো ভয়ে মূর্চ্ছাই যাবার যোগাড়। লীলার দিকে চেয়ে দেখি সে মিট্ মিট্ করে হাস্‌ছে। যা রাগ হল! টুনী লীলাকে বল্ল, “শীগ্‌গীর তোমার বাক্স বন্ধ কর।” কিন্তু মনে হলো, লীলা যেন ইচ্ছে করেই দেরী কর্‌ছে—বলে, চাবী কোথায় গেল, এ কোথায় গেল, সে কোথায় গেল। এদিকে আমাদের তো ফিট্ হ'তে শুধু বাকী। শেষটায় লীলা কি মনে করে এসে বাক্সটা বন্ধ করে, আমাদের দিকে তাকাল।

আমাদের তো লজ্জার একশেষ। লীলা বল্ল, “তোমারা তো কেউ একবারও আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না যে বাক্সতে কি আছে? সেদিন আমার ছোট ভাই লিখেছিল যে ছুটীতে বাড়ী যাবার সময় আমি যেন নিশ্চয় করে তার জন্য বিলাতী ইঁদুর নিয়ে যাই। এ ক'দিনের জন্যে আমি এ গুলো কোথায় কার



কাছে রাখি বল? মামা তো পরশু দিনই দেশে গেছেন। এ দিকে হোষ্টেলে এসব রাখবার নিয়ম নেই। তাই আমি চুপি চুপি খাটের তলায় লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমার বেড্-কভারটা মস্ত বড়, তাই কিছু দেখা যায় নি। বিকেলে সবাই যখন বেড়াতে যেত, তখন আমি এ গুলোকে খাবার দিয়ে যেতাম। তোমরা সকলে এত ভয় পাচ্ছ কেন? এগুলো তো পোষা ইঁদুর—কামড়াবে না তোমাদের!”

যা লজ্জায় পড়েছিলাম, তা বুঝতেই পারছ! সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি, হাজার কৌতূহল হলেও আর না ব'লে কারুর জিনিষে হাত দেব না।

---

## ফটোর বাতিক

যেথানেই ফটোগ্রাফি জিনিষটার কদর বেশী, সেথানেই আজকাল রাস্তায়

রাস্তায় রাস্তায় এই দৃশ্য!

রাস্তায় এই দৃশ্য—ক্যামেরা হাতে লোকের দল। আমাদের দেশেও এ রকম ব্যাপার হওয়ার আর বড় বেশী দেরী নাই। কাজ চালানর উপযুক্ত একটা

ক্যামেরার আর কতই বা দাম—ছ' সাত টাকা বই তো নয়! কাজেই এ বিদ্যাটা আর না শেখে কে?

বড় লোক যাঁরা—তা সে টাকার দৌলতেই হউন, আর খ্যাতি-প্রতিপত্তির জন্যই হউন—ক্যামেরার বাতিক বাড়িলে কিন্তু তাঁদের বড় মুস্কিল—জীবন একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। ঐ যে ক্যামেরা হাতে অত গুলি লোক, উহাদের কাজই হইতেছে, নামজাদা লোক দেখিলে তাঁকে দাঁড় করাইয়া ছবি তোলা। তোমরা হয় তো বলিবে—ইহাতে ভয়ের কারণটা আবার কোথায় দেখিলে বাপু? আমাদের যদি কেউ এম্‌নি ভাবে বিনা পয়সায় ছবি তুলিয়া দিত তবে তো বাঁচিয়া যাইতাম! কিন্তু দস্তুর মত ভয়ের কারণ যে এতেও আছে তা এখনই বুঝাইয়া দিতেছি।

নীচের ছবিটা একবার ভাল করিয়া দেখ দেখি! দুইটী বৃদ্ধকে একদল

দুই বুড়ার ছবি তোলা হইতেছে—ডান ধারের রোগা বুড়াটী ফোর্ড, বাঁ দিকের মোটা বুড়াটী এডিসন্

লোক ছবি তোলার জন্য পাক্‌ড়াও করিয়াছে, আর নিতান্ত অসহায় শিশুর মত দুই বুড়া নিজেদেরকে তাদের হাতে সঁপিয়া দিয়াছে। এই বৃদ্ধ দুইটী কে কে শুনিবে? রোগামত যিনি তিনি হইতেছেন হেন্‌রি ফোর্ড্—গোটা পৃথিবীতে এঁর মত ধনী লোক আর নাই। তোমরা যে ফোর্ড্ মোটর-কারে চড়, সে এই



ফোর্ড্ সাহেবেরই কারখানার গাড়ী। শুনিয়াছি, দৈনিক আয় ইঁহার বার লক্ষ টাকা। কারখানায় এক লক্ষ লোক কাজ করে, অর্থাৎ কিনা, সমস্ত ঢাকা সহরটায় যত লোক এক ফোর্ড্ সাহেবের কারখানাটীতেই তত লোক। এই যে বুড়া হইয়াছেন, একটু কি বিশ্রাম আছে? এখানে, ওখানে, সেখানে দিন-রাত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন, আর নানা রকম যন্ত্রপাতি নিয়া দিন-রাত মাথা ঘামাইতেছেন! এমন কাজের লোক পৃথিবীতে খুব কমই দেখা গিয়াছে। আর তাঁর পাশের মোটাপানা বুড়াটী হইতেছেন এডিসন্—পৃথিবীর একজন অতি বড় বৈজ্ঞানিক, যাদুকর বৈজ্ঞানিক বলিলেই চলে। আজ যে তোমরা মনের ফূর্ত্তিতে বায়োস্কোপ দেখিতেছ, ঘরে বসিয়া গ্রামোফোনে গান শুনিতেছ, তা এই বুড়াটীরই কল্যাণে। ভদ্রলোকের বয়স হইয়াছে বিরাশি বছর, কিন্তু এই বয়সেও সারা দিনরাত্রিতে ইনি ঘুমান মাত্র চার ঘণ্টা! তাও কি ঘুমাইতে চান? এই সেদিন মাত্র ইনি ভগবানের কাছে নালিশ জানাইয়াছিলেন—ভগবান্, তুমি এত জিনিষ করিলে, এই হতচ্ছাড়া ঘুম জিনিষটাকে তুলিয়া দাও না! চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চার ঘণ্টাই যদি ঘুমাইয়া কাটাইলাম, তবে আর কাজ করিব কখন?

এখন বোঝ এই দুই বৃদ্ধের সময়ের কি দাম! এক একটি মিনিট্ তো নয়, যেন হীরা-জহরৎ। এখন বাড়ী হইতে যতবার বাহির হইবেন, ততবারই যদি ফটোওয়ালারা এই সব লোকের সময় নষ্ট করে, তবে কেমন লাগে বল তো? কত রকমের ফরমাস তাদের—"মশাই, ঠিক সোজাটী হয়ে দাঁড়ান তো, টুপিটা খুলে ফেলুন তো, মাথাটাকে ডান ধারে একটু হেলান তো, এইবার একটু হাসুন তো!!!" বছরের মধ্যে ৩৬৫ দিন প্রত্যহ কয়েকবার করিয়া যদি এই উৎপাত চলে, তবে জিনিষটা রীতিমত ভয়ের জিনিষ হইয়া দাঁড়ায় না কি?

মর্গ্যান্ সাহেব এক কালে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন—ফটোগ্রাফার দেখিলেই তিনি দস্তুর মত তার পেছু তাড়া করিতেন। কেউ কেউ বলে সাহেবের নাকটা নাকি তেমন সুশ্রী ছিল না—ইয়া বড়! পাছে পৃথিবীর লোকে তাঁর নাকের কথা টের পায় এই ভয়ে সাহেব ফটোগ্রাফারকে বড় একটা কাছে ঘেঁষিতে

দিতেন না। তাঁর ছেলে আবার বাপেরও এক ডিগ্রী উপরে। কেউ যাহাতে তাঁর ছবি তুলিতে না পায় সেইজন্য তিনি নাকি রীতিমত ডিটেক্‌টিভ লাগাইতেন।

এই যে বড় লোক দেখিলেই তার ফটো তোলার একটা বাতিক, এর দুটি কারণ বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, মানুষ বড় হইলেই তাঁর চেহারাটা কেমন সেটা জানার একটা স্বাভাবিক কৌতূহল সবাইকারই হয়। দ্বিতীয়তঃ, আজকাল কেমন যেন একটা লোকের ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, মানুষের ফটো দেখিলেই মানুষটী কি রকম-সকমের, তার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কতটা—প্রভৃতি অনেক কিছুরই খবর বলিয়া দেওয়া যায়। এ ধারণাটা সত্যি কিনা, আমেরিকার কয়েকজন পণ্ডিত তা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তারা করিলেন কি, একদিকে ধরিলেন এমন কয়েকজন লোক যারা জীবনে খুবই উন্নতি করিয়াছে, আর অপর দিকে ধরিলেন এমন কয়েকজন লোক যারা কিছুই করিতে পারে নাই। তার পর তাদের কুড়ি বাইশ বছর বয়সের ফটোগুলি লইয়া একটা নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের ছাত্রদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তার ফলে দেখা গেল, ধারণাটা একেবারে বিলকুল ঝুটা। ব্যবসা করিয়া যিনি হয় তো লাখ লাখ টাকা রোজগার করিয়াছেন, ছাত্রেরা রায় দিল, তিনি একজন জবুথবু পাদ্রী। তাও আবার বেশ কার্য্যক্ষম পাদ্রী নয়—অকেজো অপটু পাদ্রী। জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক—পৃথিবীকে যিনি হয় তো প্রত্যহই নূতন নূতন জ্ঞান দান করিতেছেন, টাকা পয়সার প্রতি যাঁর এতটুকু আসক্তি নাই, তাঁহার ছবি দেখিয়া ছাত্রেরা মাথা নাড়িয়া বলিল "এ ব্যাটা লেখা পড়ার বড় একটা ধার ধারে না, তবে হ্যাঁ, ব্যবসার নানা রকম ফন্দি ফিকিরে এর মাথা খেলে বটে!" এই রকম সব সিদ্ধান্ত! আমাদের আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের (পি, সি, রায়) ছবি দেখিলে হয়তো তারা বলিত, "এ বুড়ো পাটের দালালী করে।"

এ রকম অদ্ভুত অদ্ভুত হাস্যকর ভুলগুলা যে কেন হয়, তা বলা কিন্তু খুব কঠিন নয়। ফটো তুলিবার জন্য তুমি যখন ক্যামেরার সাম্‌নে গিয়া বস, তখন তোমার মনে খালি এই কথাই আসে যে, লোকে তোমার ছবি তুলিতেছে—এই বুঝি



খারাপ হইল, এই বুঝি তোমার তাকাইবার ত্রুটী হইল ইত্যাদি। ফলে তোমার স্বাভাবিক মুখের ভাব ফটোতে প্রায়ই উঠে না। যাহারা ফটো তুলিতে তুলিতে ঝানু হইয়া গিয়াছে, তাদের কথা অবশ্য আলাদা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নীচের

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট্ হুভার

এই ছবিখানা দেখ। প্রথম ছবিখানার ডান ধারে যিনি বসিয়া, তিনি হইতেছেন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট্ হুভার (ইঁহার কথা তোমরা গত পৌষ মাসের 'রামধনু'তে পড়িয়াছ)। লোকটী খুবই গুণী এবং চৌকশ, আর জীবনে অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছেন নানা রকমের। কিন্তু ক্যামেরার সাম্‌নে আসিলেই ভদ্র লোকের হয় হৃৎকম্প! একেবারে হাবা-গবার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সামনের দিকে তাকাইয়া থাকেন। সে মুখে ভাবের কোন জোয়ার-ভাটা খেলে না। পরিচয় না দিলে লোকে বলিবে—একটি অজ পাড়াগেঁয়ে।

কিন্তু ও পৃষ্ঠার ছবিখানার দিকে তাকাও দেখি! ও খানা হইতেছে আল্ স্মিথের। আমেরিকার কর্ত্তা হইবার জন্য ইনি হুভারের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু ভোটে হারিয়া গিয়াছেন। ইনি কিন্তু ফটোগ্রাফার বা তার ক্যামেরাকে 'ডোণ্ট্ কেয়ার' করেন। দিব্যি আপনার মনে চেয়ারে গ্যাঁট্ হইয়া বসিয়া থাকেন—কে ফটো তুলিল বা না তুলিল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নাই।

অনেকে আছেন যাঁরা আবার ফটো তোলার সময় ইচ্ছা করিয়াই চেহারাটা বদ্‌লাইয়া ফেলেন। যেমন ধর, বিখ্যাত সেনাপতি পার্শিং। আসলে মানুষটা তিনি দিব্যি হাসি খুসী খোস-মেজাজী, কিন্তু যেই একবার ক্যামেরার সাম্‌নে

দাঁড়াইলেন, অমনি যেন তাঁর ভিতরের সৈনিক-পুরুষটী হুঙ্কার দিয়া উঠিল। শরীরটাকে টান টান করিয়া, চোখ পাকাইয়া, কাঠখোট্টা হইয়া তিনি দাঁড়াইলেন, কোথায় গেল সেই হাসি-খুশী দিল্ দরিয়া লোকটি—এ যেন জে ঙ্গি জ্ খাঁর পয়লা দোস্ত্।

আল স্মিথের

ঠিক এর বিপরীত হইতেছেন আবার টুনী, যিনি আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টি-যোদ্ধা বলিয়া পরিচিত। ফটো তোলার সময় তাঁর কী নরম-সরম গো-বেচারা ভাব! কে বলিবে এই লোকই ও রকম দুরন্ত ভাবে ঘুঁষি ছুড়িতে পারে।

পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত নাকি সব চেয়ে বেশী ফটো তোলা হইয়াছে যুবরাজ প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্সের। বাঙ্গালীদের মধ্যে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথেরই ফটো সব চেয়ে বেশী তোলা হইয়াছে—স্বদেশে ও বিদেশে একত্র করিয়া।

কি ভাবে বসিলে তোমার ফটো খুব ভাল মত উঠিবে, সে সম্বন্ধে একজন লেখক অনেকগুলি পরামর্শ দিয়াছেন। তারই দুই একটী পরামর্শ রামধনুর পাঠককে দিয়া আজ বিদায় লইব। যে কাপড়-চোপড় পরা তোমার অভ্যাস নাই, ফটো তোলার সময় তা' কখনই পরিও না। পরিলে একটা অস্বস্তি বোধ করিবে এবং ফটোও তেমন জুৎসই হইবে না। ভরা পেট, খাওয়ার পর কখনো ফটো তুলিও না, মুখের ভাব তা হইলে ঠিক মত থাকিবে না। আর যদি তোমার নাকটা একটু অতিরিক্ত রকমের বড় হয়, তবে সেটাকে ঠিক ক্যামেরার সম্মুখে



রাখিবে। তাহা হইলেই নাক আর খগ-রাজের মত মনে হইবে না, মানুষের মতই মনে হইবে।

---

# হঠাৎ ব্রাহ্মণ

( মহাভারত হইতে )

সেকালে মনু ছিলেন এক মস্ত বড় রাজা, আর তাঁহার বংশের যে কত্ত কত্ত রাজা হইয়াছিল তাহা বলাই যায় না। এক রাজার নাম ছিল হৈহয়, ওরফে বীতহব্য। এই রাজার রাণী ছিলেন দশটী আর ছেলে হইয়াছিল একশ'টী। ছেলেরা সবাই যেমন যুদ্ধে, তেমনি লেখাপড়ায় তৈয়ারী হইয়াছিল।

হর্য্যশ্ব রাজার সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইয়া দিল

ঐ সময়ে বারাণসীতে খুব বড় দরের এক রাজা ছিলেন—নাম হর্য্যশ্ব। বীতহব্য রাজার ছেলেরা এই হর্য্যশ্ব রাজার সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইয়া দিল। একদিকে গঙ্গা, অন্যদিকে যমুনা—যুদ্ধটা হইল মাঝখানে। হর্য্যশ্ব

যুদ্ধে কেবল হারিলেনই না, প্রাণটী পর্য্যন্ত দিলেন। তখন কাশীর রাজা হইল তাঁহার পুত্র সুদেব। কিন্তু সুদেবকেও বেশীদিন রাজ্য করিতে হইল না। বীতহব্যের পুত্রেরা আসিয়া তাঁহাকে তাড়া করিল। তাহার পর যুদ্ধে তাঁহার দফা ঠাণ্ডা করিয়া দিয়া তবে ফিরিল।

এই বার বারাণসীর রাজা হইলেন সুদেবের পুত্র দিবোদাস। তিনি রাজা হইয়া দেখিলেন তাঁহার শত্রুরা ভারী জবরদস্ত, রাজধানীটাকে আরও ভাল করিয়া রক্ষা করা চাই। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের হুকুম লইয়া ভাল করিয়া সব আঁট-ঘাঁট বান্ধিলেন, বারাণসীর শোভাও তাহাতে বেশ বাড়িয়া গেল। কিন্তু বীতহব্যের ছেলেরা ছিল নাছোড়বান্দা। তাহারা আবার যুদ্ধের জন্য সাজিয়া দিবোদাসের উপর চড়াও করিল। দিবোদাস ভীরু ছিলেন না, তিনিও তাহাদের সঙ্গে লড়াইতে মাতিয়া গেলেন। সে কি যে সে লড়াই? সাবেক কালে যেমন দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের লড়াই হইয়াছিল, সেই রকমটা আর কি? হাজার বৎসর পর্য্যন্ত লড়াই-ই চলিল। দিবোদাস ক্রমে কাবু হইয়া পড়িলেন, তাঁহার রথ, ঘোড়া সব নষ্ট হইল, সৈন্য-সামন্ত মারা গেল, টাকাকড়ি ফুরাইয়া গেল। তিনি তখন আর কি করিবেন? রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া নেহাৎ গরীবের মত গিয়া পড়িলেন ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে, হাত যোড় করিয়া গিয়া মুনির নিকট দাঁড়াইলেন।

মুনি বলিলেন "কি হয়েছে, বাছা, তোমার? সব কথা খু'লে বল, আমি তোমার ভাল ক'রে দেব।"

রাজা বলিলেন, "ঠাকুর, বীতহব্যের ছেলেরা আমার বংশে কাউকে রাখে নি। আমি এখন হয়ে পড়েছি একা। আপনি গুরু, আমাকে বাঁচান।"

মুনি বলিলেন, "রাজা, তুমি আর ভয় করো না; তোমার যাতে ছেলে হয় আমি সেজন্য যজ্ঞ কর্‌ব; সেই ছেলেই বীতহব্যের বংশের দফা শেষ ক'রে দেবে।"

দিবোদাস বিদায় নিলেন, ভরদ্বাজ মুনিও যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন।



সেই যজ্ঞের ফলে রাজার এক পুত্র হইল—পুত্রের নাম হইল প্রতর্দ্দন। সে কি যেমন তেমন ছেলে? জন্ম মাত্রেই এত বড় হইয়া উঠিল যে লোকে মনে করিল বুঝি তের বছরের ছেলে। সে বেদও শিখিল, ধনুকবাণ দিয়া যুদ্ধ করাও ভাল মতই শিখিল। তার পর ভরদ্বাজমুনি তাহাকে যোগ শিখাইতে লাগিলেন। সেই যোগের ফলে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল—সব জায়গার তেজ গিয়া ঢুকিল প্রতর্দ্দনের শরীরের মধ্যে—তিনি সূর্য্যের মত ঝক্‌মক্‌ করিতে লাগিলেন। প্রতর্দ্দন শিখিয়া পড়িয়া ভরদ্বাজের কাছে মানুষ হইলেন। তার পর শরীরে কবচ লাগাইলেন আর হাতে ধনুক, তরোয়াল, ঢাল সব নিয়া রথে চড়িয়া পিতার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা দেখিলেন যেন মূর্ত্তিমান্ আগুন আসিয়াছে। তিনি ভারী খুসী হইয়া ছেলেকে যুবরাজ করিয়া দিলেন।

এইবার প্রতর্দ্দনের উপর রাজার হুকুম হইল বীতহব্যের ছেলেদের যুদ্ধে মারিয়া ফেলিতে। পিতার হুকুম পাইয়া প্রতর্দ্দন রথে চড়িয়া যাত্রা করিলেন এবং গঙ্গা পার হইয়া বীতহব্যের রাজধানীর দিকে ছুটিলেন। বীতহব্যের পুত্রেরা ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বড় বড় রথে চড়িয়া যুদ্ধে বাহির হইল আর বাণের পর বাণ ছুড়িয়া প্রতর্দ্দনকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিল। কিন্তু প্রতর্দ্দনকে তাহারা চিনিত না। তিনি বাণে বাণে বীতহব্যের ছেলেদের বাণ ত কাটিলেনই, তাহার উপর আবার কাটিলেন ঐ ছেলেগুলার মাথা। মাথা কাটার পর তাহারা কাটা গাছের মত টিপ্‌ঢাপ্‌ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

মহারাজ বীতহব্য তখন বেগতিক দেখিয়া রাজধানী ছাড়িয়া লম্বা দিলেন—গিয়া একেবারে ভৃগুমুনির আশ্রমে পৌঁছিলেন। মুনিকে বলিলেন, "ঠাকুর, আমাকে বাঁচান"। মুনি তাঁহাকে ভরসা দিয়া নিজের আশ্রমে রাখিয়া দিলেন। এদিকে প্রতর্দ্দন বীতহব্য রাজার পেছনে ছুটিতে ছুটিতে ভৃগুমুনির আশ্রমে উপস্থিত। গিয়াই তিনি বলিলেন "মুনির শিষ্যেরা এখানে কে আছ? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছি। আমার আসার খবর দাও"। কথাগুলি প্রতর্দ্দন এত জোরে বলিয়া ফেলিলেন যে তাহা মুনির কাণে গেল। মুনি বাহিরে

আসিয়া প্রতর্দ্দনকে আদর-যত্ন করিলেন, তাহার পর তাঁহাকে কি করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রতর্দ্দন বলিলেন, "ঠাকুর, আপনার আশ্রমে বীতহব্য এসে ঢুকেছে, তাকে ছেড়ে দিন, তার ছেলেরা আমার বংশ নাশ ক'রে ফেলেছে, আমার কাশীরাজ্য—সমস্ত ধনদৌলত—ছারেখারে দিয়েছে, আমি বীতহব্যের একশ ছেলের

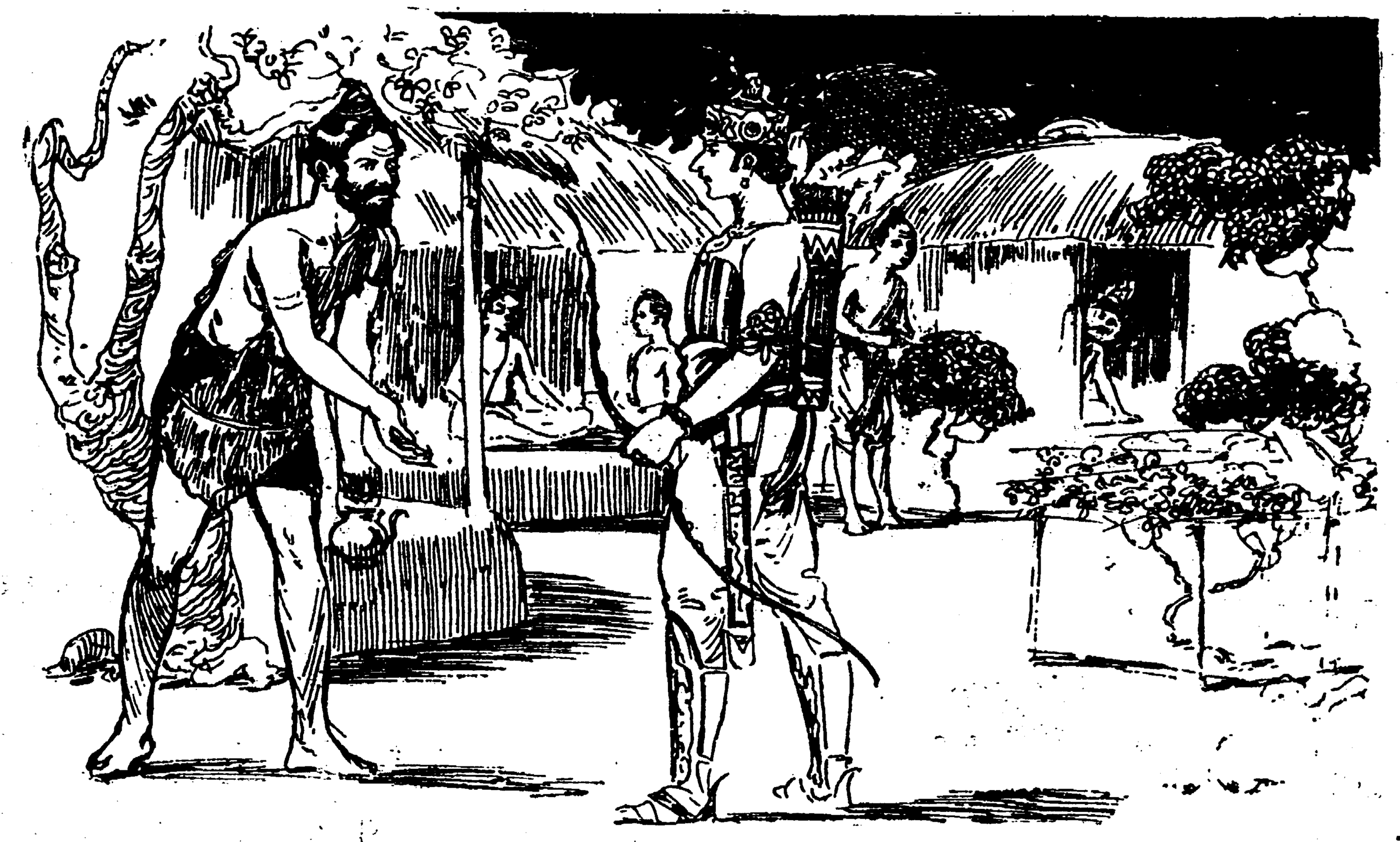

ঠাকুর, আপনার আশ্রমে বীতহব্য এসে ঢুকেছে

কর্ম্ম শেষ ক'রে দিয়েছি, এখন বীতহব্যকে মার্‌তে পারলেই বাপের ঋণ হ'তে খালাস পাই।"

ভৃগুমুনি প্রতর্দ্দনের কথা শুনিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমার এখানে ত কোন ক্ষত্রিয় নাই, সবাই যে ব্রাহ্মণ"। প্রতর্দ্দন ভৃগুমুনির কথা শুনিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, দুষ্ট বীতহব্য ক্ষত্রিয়, সে ভয় খেয়ে আপনার কাছে এসে পড়েছে, আর আপনি ব'লে দিলেন যে সে ক্ষত্রিয় নয়, ব্রাহ্মণ। আচ্ছা সে ত তা হ'লে ব্রাহ্মণ হয়ে গেল, নিজের জাত'টা খোয়াল। এটা হ'ল আমারই গতিকে, কাজেই আমার কাজও হয়ে গেল। এখন আপনি হুকুম দিন, আমি ফিরে যাই"।



প্রতর্দ্দন এই রকম খুব দু কথা শুনাইয়া দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। আর বীতহব্য? তিনি আর ক্ষত্রিয় থাকিলেন না, হইয়া গেলেন ব্রাহ্মণ। তাঁহার বংশ ব্রাহ্মণের বংশ হইয়া গেল। বীতহব্যের পুত্র গৃৎসমদের কত কথা বেদে পাওয়া যায়।

বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন কত তপস্যা করিয়া, আর বীতহব্য ব্রাহ্মণ হইয়া গেলেন শুধু ভৃগুমুনির ঘরে লুকাইয়া থাকার ফলে—মুনির কথায়!

---

## নয়া বছরের মজা

( শ্রীননীগোপাল মজুমদার )

তোমাদের মধ্যে অনেকের বাড়ীতেই বোধ হয় বছরের পয়লা দিনে ছোটখাট একটা ভোজের মত হয়, অনেক অতিথি এসে জোটেন।—আচ্ছা, সে ভোজটায় তুমি যদি দু'একটা মজা দেখাতে পার তবে কি তোমাদের মনে ভারী ফূর্ত্তি হয় না?

সবার আগেই বলে নিচ্ছি, যে, তোমরা আমার লেখাটা পড়েই যেন মনে করো না যে তোমরা এক এক জন মস্ত মস্ত ওস্তাদ্‌ হয়ে গেছ। ভোজে দেখাবার আগে নিজেরা কয়েকবার পরীক্ষা করে দেখো, তারপর যখন দেখবে বেশ ঠিকঠিক হয়ে আসছে, কোথাও ঠেকছে না, তখন বুঝবে যে তোমাদের ধরা পড়্‌বার আর কোন ভয় নেই।

### মজার সিকি

বন্ধুদের কাছ থেকে চারটা সিকি নিয়ে নাও। চারটেই যেন এক রকমের হয়; অর্থাৎ একটা ছোট সিকি নাও ত চারটেই ছোট নিতে হবে, আর একটা যদি বড় নাও, তবে সবগুলিই তোমায় বড় নিতে হবে। তবে ছোট সিকি নেওয়াই সুবিধে—তোমাদের ছোট ছোট হাত ত'।

তুমি একটা টেবিলের সামনে বসে পড়, তারপর এক এক হাতে একটা করে সিকি নিয়ে, হাতের মুঠো বন্ধ করে দাও, তারপর টেবিলের উপর হাত দুটো চিৎ করে রাখ (না খুলেই)। এবার তোমাদের একজন বন্ধুকে তোমার দু'হাতে বাকি সিকি দু'টো তুলে দিতে বল। তার পর তুমি তোমার হাত দুটোকে পরস্পরের দিকে এগিয়ে আনতে থাক, আর বল যে, এক্ষুণি একটা মজা হবে। হঠাৎ খুব তাড়াতাড়ি হাত দুটো পরস্পরের দিকে আনতে গিয়ে দুটো সিকি টেবিলে পড়ে গেল, তুমি বল্‌লে, "ঐ যাঃ, একটু ভুল হয়ে গেল।" আবার তোমার একজন বন্ধু তোমার দু'হাতে দুটো সিকি তুলে দিল, আবার হাত দুটোকে পরস্পরের দিকে নিলে, ঠুন্ ঠুন্ করে সিকির আওয়াজ হলো। তোমার হাতের উপরের সিকি উড়ে গেছে। তুমি হাত খুলে দেখালে যে, তোমার এক হাতে তিনটে সিকি, আর এক হাতে একটা সিকি! সবাই অবাক্! আসল ব্যাপারটা কিন্তু কিছুই নয়; যখন তুমি দুটো সিকি ফেলে দিলে, তখন কিন্তু দু'হাত থেকে দুটো ফেল্‌লে না, এক হাতে দুটো সিকিই রইলো, আর অন্য হাতের দুটো সিকিই ফেলে দিলে। তাহ'লে সে হাতটা রইলো খালি, কাজেই এবারে এক এক হাতে একটা করে সিকি দিলে এক হাতে একটা, আর এক হাতে তিনটে সিকি থাকবে।

## তাসের খেলা

তাসের প্যাকটা নিয়ে তা থেকে দশ, গোলাম, বিবি আর সাহেবগুলো বাদ দাও।

এবারে যে কোন বন্ধুকে দুটি তাস তুলে নিতে বল, তারপর সে দু'খানার যে কোন একখানার নম্বরকে দ্বিগুণ করে পাঁচ যোগ দিতে বল। এবারে সেই ফলটাকে পাঁচ দিয়ে গুণ করতে বল, তারপর অন্য তাসটার নম্বরটা যোগ দিতে বল। তার পর তাকে চেঁচিয়ে শেষ ফলটা আর তাসের রং দুটো পর পর বল্‌তে বল। তুমি একটু ভেবেই বলে দিলে কোন্ কোন্ তাস সে



ধরেছে। কি করে করবে তাই বল্‌ছি। ধর, তোমার বন্ধু রাখল, ৩ আর ১—তবে তোমার আঁক হলো

৩×২=৬ ; ৬+৫=১১ ; ১১×৫=৫৫

৫৫+১=৫৬

এখন তোমার বন্ধু তোমাকে বল্‌লে, যে শেষ ফল ৫৬ ; তুমি তক্ষুণি কর্‌লে কি, এ ফলটা থেকে পঁচিশ বাদ দিলে—কত হলো? (৫৬−২৫=৩১)। ব্যস্, তুমি বলে দিলে ৩ আর ১।

## মধুরেণ সমাপয়েৎ

এবারে যা শেখাচ্ছি, সেটা ম্যাজিক কোন রকমেই নয়। সব্বার আগে একটা সাধারণ পেন্সিলকে নানা রকম রং দিয়ে রং চংএ করে ফেলতে হবে। তার পর তোমার বন্ধুদের কাছে বলতে হবে যে, 'এটা একটা অসাধারণ পেন্সিল, এ যে কোন রং লিখতে পারে।' তার পর একটা রংয়ের নাম জিজ্ঞেস করবে; ধর, বন্ধুরা উত্তর কর্‌লেন, "সবুজ"। তুমি একটা কাগজ টেনে, তাতে চটপট লিখবে 'সবুজ'; তার পর সবার সামনে তুলে ধর্‌বে।—সারা ঘরময় একটা হাসির হর্‌রা পড়ে যাবে।

তুমি আর সেখানে দাঁড়িয়ো না কিন্তু।

* * * *

তোমাদের মধ্যে কে কে ম্যাজিক দেখালে তা লিখ্‌তে ভুলো না যেন।

# গদখালির হাত

( অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, এম্-এ, বি-এল্ )

তোমরা সকলে নিশ্চয়ই যশোহর জিলার নাম শুনিয়াছ। এক কালে ইহা বীরত্বের জন্য বিখ্যাত ছিল—যশোহরের প্রতাপাদিত্যের নাম বাঙ্গালায় কে না জানে? আবার আজকাল যশোহর বিখ্যাত হইয়াছে আর এক কারণে—ম্যালেরিয়ার জন্য। এখন অবশ্য ম্যালেরিয়া প্রায় সমস্ত পশ্চিম বঙ্গেই আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে, কিন্তু প্রথম যখন বছর পঞ্চাশেক পূর্ব্বে ম্যালেরিয়ার প্রথম প্রকোপ আরম্ভ হয় তখন যশোহর জিলাই সব চাইতে বেশী আক্রান্ত হয় এবং এই জিলায় গ্রামকে গ্রাম একেবারে উৎসন্ন হইয়া যাইতে থাকে।



ম্যালেরিয়ার এই উৎকট মহামারী লক্ষ্য করিয়া এক মজার উদ্ভট শ্লোক পর্য্যন্ত রচিত হয়।

জগৎ-প্রাণঃ হরেৎ প্রাণান্ জীবনং জীবনং হরেৎ।
যশোহরে কিমাশ্চর্য্যং প্রাণদা যমদূতিকা॥

এই শ্লোকটীর অর্থ কি বল ত?

"যিনি জগতের প্রাণ তিনি প্রাণ হরণ করেন, যিনি জীবন-স্বরূপ তিনি জীবন হরণ করেন; যশোহরে এমনই আশ্চর্য্য ব্যাপার যে যমদূত লোকের প্রাণদান করে।" এইটাই সহজ অর্থ মনে হয়, কিন্তু ইহার কোন মানেই হয় না, একেবারে একটি আস্ত ধাঁধা। আসল অর্থ ইহার ভিতরে লুকান রহিয়াছে। "জগৎপ্রাণ" শব্দের এক অর্থ বায়ু, কারণ বায়ুতেই লোকে প্রাণধারণ করে; "জীবন" শব্দের এক অর্থ জল, কারণ জল ব্যতীত জীবনধারণ অসম্ভব; এবং "যমদূতিকা"র অর্থ তেঁতুল। কাজেই আসল অর্থ দাঁড়াইল এইরূপ:

"যশোহরের জলবায়ু এমনই অপূর্ব্ব যে ইহার বায়ু সেবন করিলেই প্রাণনাশের সম্ভাবনা, ইহার জলগ্রহণ করিলে জীবনের আশঙ্কা; এবং জীবন রক্ষার একমাত্র উপায় পুরাণো তেঁতুল সেবন করা, কারণ পুরাণো তেঁতুল জ্বরের বড় প্রতিষেধক।" সত্যিই খুব মজার শ্লোক, নয়?

এই যশোহর জিলার একটি গল্প বলি শোন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রথম ম্যালেরিয়ার উৎপাতের সময়ে যশোহর অঞ্চলেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ড আক্রমণ হইয়াছিল। আর সব ব্যারামেরই যেমন হইয়া থাকে, প্রথম আক্রমণই সব চাইতে ভয়ানক, কালক্রমে অনেকটা গা-সহা হইয়া যায়, ম্যালেরিয়ায়ও তাই; এখন ত ম্যালেরিয়া আমাদের নিত্য সহচর বলিলেই হয়, বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গে; নূতনত্ব কিছুই নাই, কাজেই আমাদের সহ্যগুণও অনেকটা বোধ হয় বাড়িয়াছে। কিন্তু প্রথম যখন এই মহামারী এই দেশে আসে তখন ইহার আক্রমণ অনেকেই সহ্য করিতে পারে নাই; হাজার হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল; গ্রামের পর গ্রাম এই কালব্যাধির অত্যাচারে একেবারে জনশূন্য হইয়া শ্মশানভূমিতে পরিণত হইতেছিল; এমন ভয়াবহ ব্যাপার যে কল্পনা করিতেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

তোমরা যদি কলিকাতার শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে খুলনা লাইনে কেহ গিয়া থাক, তবে বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ যে কলিকাতা ও খুলনার প্রায় মাঝামাঝি দূরে একটী ষ্টেশন আছে—নাম গদখালি। এই ষ্টেশন ও সন্নিহিত গ্রামটি যশোহর জিলায়। সেই ম্যালেরিয়ার

আক্রমণে এই গ্রামটির দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। এমন বাড়ী ছিল না যেখানে অধিকাংশ লোক ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মারা না গিয়াছে। কোন কোন বাড়ীতে একটী লোকও জীবিত ছিল না। আর যে বাড়ীতে কোন গতিকে দুই একটী লোক জীবিত ছিল তাহারাও অধিকাংশ প্রাণের ভয়ে গৃহের মায়া পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছিল। এই প্রকার যখন গ্রামের অবস্থা তখন একটী পথিক ব্রাহ্মণ দূর দেশ হইতে ভ্রমণ করিতে করিতে গদখালিতে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি জ্বরের মহামারীর কথা পথে আসিতে আসিতে শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অবস্থা যে এতদূর ভয়ঙ্কর তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই। তিনি যখন গ্রামে আসিয়া পৌছিলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। রাত্রিতে আর কোথায় যাইবেন এই ভাবিয়া গ্রামেই কোন বাড়ীতে আশ্রয় লইতে পারেন কিনা সেই চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। একটী বাড়ীতে চেষ্টা করিতে গিয়াই ত ব্রাহ্মণের চক্ষুঃ স্থির। বাড়ীর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন, কেহই আসিল না কিংবা কোন উত্তর করিল না। ব্যাপার কি জানিবার কৌতূহলে তিনি সন্তর্পণে দরজায় হাত দিতে দেখিলেন যে দরজা খোলা; খোলা দরজা দিয়া ভিতরে ঢুকিতেই যে দৃশ্য তিনি দেখিলেন তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; তিন চারিটি মৃতদেহ ঘরের ভিতরে পড়িয়া রহিয়াছে; ভীষণ দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে; মড়াকে ঘরের বাহির করিবার চেষ্টাও কেহ করে নাই অথবা করিবার অবকাশ পায় নাই। ব্রাহ্মণ আর তিলেক বিলম্ব না করিয়া দৌড়িয়া সে ভীষণ স্থান হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। একটু স্থির হইলে পরে আর এক বাড়ীতে খোঁজ করিতে গেলেন; সেখানেও সেই অবস্থা; কোন জীবিত লোক নাই, সব পলাইয়াছে, শুধু মৃতদেহগুলি শূন্য ঘর আগলাইতেছে। বার বার এই বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া ব্রাহ্মণ প্রায় পাগলের মত হইয়া উঠিলেন—কোথায় যাই, কি করি, এই ভাবিয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। রাত্রিও ক্রমশঃ অধিক হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই প্রকার অস্থির হইয়া পথিক রাস্তা দিয়া এদিক্ ওদিক্ যখন ঘুরিয়া ফিরিতেছিলেন তখন হঠাৎ এক বাটীর সন্নিকট হইয়া দেখিতে পাইলেন যে বাড়ীর ভিতর হইতে একটি ক্ষীণ আলোর শিখা দেখা যাইতেছে। এই আলোটুকু দেখিয়া এতক্ষণ পরে ব্রাহ্মণের মনে একটু ভরসার সঞ্চার হইল; যাহা হউক, এতক্ষণে একটা বাড়ী পাওয়া গেল যাহাতে একটা জীবিত লোকের অন্ততঃ সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে এবং রাত্রির আশ্রয় মিলিবে। সেই বাড়ীর সম্মুখে গিয়া একটু আশ্বস্ত ভাবেই ব্রাহ্মণ ডাকিলেন। কিয়ৎক্ষণ কোন সাড়া আসিল না। পুনঃ পুনঃ ডাকিতে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর আসিল "দরজা খুলিয়া ভিতরে



আসুন; আমি অত্যন্ত পীড়িত, শয্যা হইতে উঠিতে পারি না; মাপ করিবেন।" মানুষের মুখের কথা শুনিয়া পথিক আর কালবিলম্ব করিলেন না; দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া স্বর লক্ষ্য করিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন যে কয়েকটী ঘর সম্পূর্ণ নির্জ্জন, কেহ সেখানে আছে বলিয়া মনে হইল না; শুধু একটি ঘরে একটি ক্ষীণ প্রদীপ মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে—এই দীপটির শিখা বাহির হইতে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। যে ঘরে আলোটি জ্বলিতেছিল সে ঘরে পৌছিয়া হঠাৎ ক্ষীণ আলোকে ভিতরে কি আছে কিংবা কে আছে কিছুই ঠাহর করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে সেই মৃদু আলোতে চোখ অভ্যস্ত হইলে দেখিতে পাইলেন যে একখানা জীর্ণ তক্তপোষের উপর একটি কঙ্কালসার ব্যক্তি পড়িয়া রহিয়াছে। খাটের উপর যেন একেবারে লাগিয়া রহিয়াছে, দেখিলে মুমূর্ষু বলিয়া মনে হয়। ব্রাহ্মণ সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, আপনি কি অত্যন্ত পীড়িত? কি অসুখে ভুগিতেছেন?" পীড়িত ব্যক্তি অতি কষ্টে উত্তর করিলেন "হ্যাঁ, এই কাল ম্যালেরিয়ায় আমাকেও প্রায় গ্রাস করিয়াছে; আমার আর যাহারা পরিবার পরিজন ছিল এই বাড়ীতে তাহারা কেহই জীবিত নাই; আমিই শুধু একাকী এখন শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতেছি।" ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া একটু লজ্জিত ভাবেই বলিলেন "তাহা হইলে ত আমি এখানে আশ্রয় লইতে আপনাকে বড়ই বিব্রত করিয়াছি; আমি পথিক ব্রাহ্মণ, অনেক দূরদেশ হইতে আসিয়াছি; মহামারী যে এইরূপ ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে ইহার ত কিছুই আমি জানিতাম না; এই রাত্রিতে অপরিচিত স্থানে কোথায়ই বা যাই, কি করি?" শয্যায় শয়িত ব্যক্তিটি বলিলেন "না, কোথাও যাইবার দরকার নাই। আসিয়া যখন পড়িয়াছেনই তখন এখানেই রাত্রি যাপন করুন। আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ তায় অভ্যাগত, আপনারই কষ্ট হইবে। তবু আমার ভাগ্য যে আমার এই শেষ অবস্থায় আপনার ন্যায় ব্রাহ্মণের সেবা করিবার সুযোগ পাইলাম। আমায় আর বঞ্চিত করিবেন না। খাবার জিনিষ সামান্যই আছে। সামান্য একটু চিঁড়া গুড় ঐ হাঁড়িতে ঝুলান রহিয়াছে, আর কলসীতে জল আছে; আপনিই একটু কষ্ট করিয়া সব সামগ্রী যোগাড় করিয়া লইয়া একটু সামান্য জলযোগ করুন। আমার এমন শক্তি নাই যে খাট হইতে উঠিয়া আপনাকে যোগাড় করিয়া দিই।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "না, থাক্ থাক্, আপনি ভাবিত হইবেন না, আমিই সব যোগাড় করিয়া লইতেছি।" এই বলিয়া তিনি চিঁড়া গুড় হাঁড়ি হইতে নামাইয়া একটা সরাতে ঢালিয়া লইলেন। কলসী হইতে একটু জল গড়াইয়া লইলেন; এবং জলযোগে প্রবৃত্ত হইলেন। পীড়িত ব্যক্তিটি তাঁহার আহার দর্শন করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন "ব্রাহ্মণ ঠাকুর, আপনার খাইবার বড়ই কষ্ট হইতেছে, শুধু জল আর গুড় দিয়া কি চিঁড়া খাওয়া যায়? একটু লেবু হইলে বোধ হয় ভাল হয়, না?" ব্রাহ্মণ বলিলেন "লেবু কি আছে? পাইলে অবশ্য ভালই হয়।" পীড়িত ব্যক্তি উত্তর করিলেন "ঘরে নাই বটে, তবে আমি এক্ষণেই আনিয়া দিতেছি। তবে আপনি অনুগ্রহ করিয়া একবার চোখ বুজুন।" ব্রাহ্মণ ত এই উত্তর শুনিয়া একেবারে অবাক্। এই মুমূর্ষু ব্যক্তি, যে পাশ ফিরিয়া শুইতে পারে না, সে লেবু আনিয়া দিবে কোথা হইতে? কি প্রকারেই বা দিবে? আবার চক্ষু মুদ্রিত করিতেই বা বলে কেন? এক অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় ব্রাহ্মণ অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিলেন। মুখে শুধু বলিলেন "আচ্ছা, চোখ বুজিতেছি"। কিন্তু মুমূর্ষু ব্যক্তি কি করে তাহা দেখিবার জন্য চোখ একেবারে না বুজিয়া একটু ফাঁক করিয়া রহিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে ভয়ে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল, তিনি আসনে বসিয়াই ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে পীড়িত ব্যক্তি শয্যাতে শুইয়াই জানালার দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। জানালার বাহিরে অনেকটা দূরে একটা লেবুগাছ ছিল। মুমূর্ষু সেই তক্তপোষ হইতেই হাতখানা দশগুণ লম্বাকরিয়া জানালার ভিতর দিয়া গলাইয়া দূরের সেই লেবু গাছ হইতে টপাটপ গোটা কয়েক লেবু পাড়িয়া আনিলেন। আনিয়া হাতকে আবার স্বাভাবিক অবস্থাপন্ন করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন "চোখ মেলুন, লেবু আনা হইয়াছে।" আর লেবু? ব্রাহ্মণের ত ততক্ষণ ভয়ে অজ্ঞান হইবার উপক্রম। ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন আর চোখ ত কপালে উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়াই শয্যাস্থ ব্যক্তির আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে ব্রাহ্মণ লুকাইয়া সবই দেখিয়া ফেলিয়াছেন। তখন আর তুষ্ট ছলনা করিয়া কি হইবে বিবেচনায় ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন "আপনি যখন সকলই দেখিয়া ফেলিয়াছেন তখন আর লুকাইয়া লাভ কি? আমিও জীবিত নই, আমি মৃত। আমার সব পরিবার পরিজন আগেই মরিয়াছে, যতক্ষণ আমার সামর্থ্য ছিল, তাহাদের শবদেহ টানিয়া ঘরের বাহির করিয়া ঐ লেবু গাছ তলায় রাখিয়া দিয়াছি। তার পর কালব্যাধি আমাকেও গ্রাস করিল। আমার মৃতদেহ ঘরের বাহির করার আর কোন লোক ছিল না। তাই আমার দেহ এই খাটের উপরই রহিয়াছে। এ বাড়ীতে আমার কিছু সঞ্চিত ধন পোঁতা আছে, তাহারই আকর্ষণে আমি এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছি না। আপনি যখন আসিলেন তখন ভাবিলাম যে আপনার সাহায্যে এই ধনের একটা সদ্গতি ব্যবস্থা করিয়া আমি মুক্ত হইব। তাই এই দেহে ভর করিয়া আপনাকে ভিতরে ডাকিয়া আনিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই সঞ্চিত ধন গ্রহণ করিবেন এবং তাহা সৎকার্য্যে ব্যয় করিবেন, এবং আমার ও পরিবারবর্গের পারলৌকিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা



করিবেন। তাহাতেই আমাদের সকলের কল্যাণ হইবে। আপনি ব্রাহ্মণ, আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" এই বলিয়া মৃতব্যক্তি নির্ব্বাক্ হইলেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই সেই ক্ষীণ দীপশিখারও নির্ব্বাণ হইল।

ব্রাহ্মণ কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় নিশ্চল, স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। এই অভাবনীয় ঘটনায় বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার মত তাঁহার সামর্থ্য রহিল না। কিছুকাল পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইলে পর সেই অন্ধকার রাত্রিতেই সেই ভীষণ স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনেকদিন পরে মহামারী একটু প্রশমিত হইলে পর ব্রাহ্মণ সেই বাড়ীতে পুনরায় উপস্থিত হইয়া মৃতের সেই আদেশ অনুসারে সঞ্চিত ধন উদ্ধার করিয়া মৃতের ও তৎপরিবারের পারলৌকিক ব্যবস্থা করিয়া উদ্বৃত অর্থ গরীবদুঃখীকে বিলাইয়া দিলেন।

যশোহর অঞ্চলে গদখালির হাতের এই অদ্ভুত গল্পটি লোকের মুখে মুখে এখনও শোনা যায়।

---

## পণ্ডিতী সমালোচনা

( অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল এম্-এ, বি-এল )

রামধন পণ্ডিতে বুক্‌নীতে পারে কে ?
মান্‌তেই হ'বে সব, যাই বলে, যা' লেখে !
বিত্তের নাম নেই, বাহাদুর বচনে ;
ভাবে মনে কেউ তা'র নেই জুড়ী ভুবনে।
ইস্কুলেতে বল্‌ছে সে,—"রাখ্ তোরা মনেতে ;
হক্ কথা পোর্ দেখি মগজের কোণেতে।
বঙ্কিম যা' লিখেছে, বাংলাই নয় তা' ;
পাঁচশোটি ভুল আছে, ব্যাকরণে কয় তা'।
গোল কোরে বস্‌লো সে 'মৃণালে'র মানেতে ;
ধরলুম ভুল তা'র, তুল্‌লো না কাণেতে।
ঈশ্বর পণ্ডিত, ওস্তাদ্ লিখিয়ে ;
হাত ধরে' বেচারার দি'ছি কতো শিখিয়ে।

তবু ও সে শিখ্‌লো না, ভুল কোরে' বসেছে ;
বাংলার পাকা ধান মই দিয়ে চষেছে।
বই নেই বাংলায়, সে অভাব ঘোচাতে
লিখলে সে যা' এসেছে কলমের খোঁচাতে।
ব্যাকরণ লিখে গেছে বোপদেব, পাণিনি ;
দেমাকের চোটে, হায়, কাউকেই মানে নি।
এই সব ভুঁইফোঁড় লিখিয়ের জ্বালাতে
হরদম সাধ যায় দেশ ছেড়ে পালাতে।
পাত দুই পড়ে' সব ইংরেজী ভাষাটা
বাংলায় ওস্তাদী দেখাবার আশাটা
এ কালের ছোঁড়াদের ঘাড় চেপে বসেছে ;
ব্যাকরণ শাস্ত্রের রাজপদ খসেছে।
সন্ধি ও সমাসের ধার তা'রা ধারে না ;
ফক্কিতে কাজ সারে, কই, তবু ছাড়ে না।
আজ কাল পাঁজী পুঁথী আঁচড়ায় বাঁদরে ;
সেই সব ছাই পাঁশ পড়ে সব আদরে।
ঘোর কলি দেশময় এর চেয়ে হ'বে কি ?
মূর্খের জারীজুরী,—পণ্ডিতে ক'বে কি ?
দেবতার অঙ্গনে জঞ্জাল ছড়ানো ;
এর সাজা দুই গালে ঠাস্ ঠাস্ চড়ানো।"
এই বোলে' টিকি নাড়ে, চারদিক তাকিয়ে ;
কেউ যদি কয় কথা, দেয় তারে হাঁকিয়ে।
বিদ্যার ভুড়ভুড়ি, ওস্তাদী মুখেতে ;
রামধন শর্ম্মার কাল কাটে সুখেতে।

---

## বাচ্চা-ই-সাক্কো

ভিস্তি-ওয়ালার ছেলে বাচ্চা-ই-সাক্কোর সহিত আমানুল্লার সংঘর্ষের কথা তোমরা ইতিপূর্ব্বে 'রামধনু'তে পড়িয়াছ। বাচ্চা-ই-সাক্কোর বিবরণ শুনিয়া লোকটীর ছবি দেখিতে তোমাদের হয় তো কারো কারো ঔৎসুক্য হইয়াছে। তাই আমরা এখানে তাহার ছবিটী দিলাম। ছবিটী মাসিক মোহাম্মদীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

---

বাচ্চা-ই-সাক্কো

## নিতাইচন্দ্রের তপস্যা

( শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ )

খুব ছেলেবেলাতেই মা বাপ মারা যান। ছিলেন এক বুড়ী পিসীমা। তিনিই অতিকষ্টে নিতাইকে মানুষ করেন। এক ঘরের এক ছেলে, কখন যে কিসের

বায়না ধরে এই চিন্তায় পিসীমার মুখে অন্ন নাই, চোখে নিদ্রা নাই। দুপুর রাত, পৃথিবীশুদ্ধ লোক নাক ডাকিয়া ঘুমাইতেছে, হঠাৎ নিতাই'এর সুর শোনা গেল—উঁ, উঁ, উঁ,…আমি খৈ খাবোঁ—ও—ও…। সর্ব্বনাশ, ঘরে যে খৈ নাই! পিসীমা তাড়াতাড়ি ডালা নিয়া ছুটিলেন। অনেক খোঁজাখুজির পরে খৈ মিলিল। কিন্তু নিতাইচন্দ্র ডালাটা পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল—হুঁ, আমি বুঝি শুকনো খৈ খাবো? ভাগ্যিস্ ঘরে দুধ ছিল। বলামাত্র আনিয়া দেওয়া হইল; কিন্তু তাহাতেও বিপদ। নিতাই যাই দেখিল দুধের বাটির উপরে খৈএর সেই উঁচু পাহাড়টি নীচু হইয়া গিয়াছে, তিন লাফে পিসীমার ঘাড়ের উপর পড়িয়া, চুল ছিঁড়িয়া কাপড় টানিয়া চেঁচাইয়া পাড়া মাথায় করিয়া তুলিল,—ডাইনী, রাক্ষুসী বুড়ী, আমার খৈ খেলি কেন?

পিসীমা কহিলেন,—ছিঃ বাবা, আমি তোমার খৈ খেতে পারি?

—হুঁ, খাস্‌নি, তো আমার খৈ কমে গেল কেন?

বলিয়া একটা দা লইয়া পিসীকে তাড়া করিল।

এতো গেল ছেলেবেলার কথা। ক্রমে নিতাই'এর বয়স হইল, বুদ্ধি হইল। এদিকে সংসারের অবস্থা ভাল নয়। পিসীমা কহিলেন,—বাবা, এবার একটা চাকরি বাকরি ছাখ, আমি আর ক'দিন? নিতাই তাহার জমকালো গোঁফ্ জোড়ায় চাড়া দিয়া কহিল,—চাকরি? আমি চাকরি করবো? পিসী, তুমি আজো আমায় চিনতে পারনি।

এ সব পিসীমার অভ্যাস ছিল। তিনি দমিলেন না। গ্রামের ইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার মহাশয়কে ধরিয়া অনেক কষ্টে নিতাইকে থার্ড পণ্ডিতের পদটা জোগাড় করিয়া দিলেন। অগত্যা নিতাইচন্দ্র কালো বার্ণিশ করা জুতায় তেল মাখিয়া মচ্ মচ্ করিতে করিতে ইস্কুলে গেল।

কিছুদিন যায়। সেকেণ্ড মাষ্টার রসিক বাবু সত্যই রসিক ছিলেন। নিতাই'এর গোঁফ দেখিয়া তাঁহার কবিতার ভাব আসিল। কিছুদিন আগে ছেলেরা মিলিয়া যোগীন বসুর এই বিখ্যাত কবিতাটা আবৃত্তি করিয়াছিল।



ছাত্র। ঐ যে চিত্রের শিরে ঘন মসীরেখা
পূরব পশ্চিম ব্যাপি রয়েছে অঙ্কিত,
কি নাম উহার দেব, কি নাম উহার?
শিক্ষক। মসীরেখারূপে, বৎস, ঐ হিমাচল
ভারতের পিতৃরূপী।

রসিক বাবু ইহার অনুকরণে লিখিলেন—

ছাত্র। ঐ যে ওষ্ঠের শিরে ঘন মসীরেখা
পূরব পশ্চিম ব্যাপি রয়েছে অঙ্কিত,
কি নাম উহার, দেব, কি নাম উহার?
নিতাই। মসীরেখারূপে, বৎস, গোঁফ এর নাম,
উকুনের জন্মভূমি।

কবিতাটি মুখে মুখে প্রচার হইতে দেরি হইল না। নিতাই'এর কাণে যখন গেল, সে সোজাসুজি আস্তিন গুটাইয়া ইস্কুলের মধ্যেই রসিক বাবুকে আক্রমণ করিল। অন্যান্য মাষ্টার মশায়রা কোন রকমে থামাইয়া দিলেন।

নিতাই ফিফ্‌থ্ ক্লাসে বাংলা পড়াইত। ব্যাকরণে তাহার অগাধ জ্ঞান, আর সেইজন্যে ঝোঁকও ছিল খুব। সেদিন চণ্ডীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, বল্ দিকিন ভ্রমণ ধাতু প্রত্যয় কি?

আজ্ঞে, ভ্রম্ ধাতু অনট্।

কোন্ বাচ্যে?

আজ্ঞে, ডাববাচ্যে।

নিতাই হাতের বেতখানা তাহার মাথায় ঠুকিতে ঠুকিতে কহিল, ডাববাচ্য কি রে, গাধা? চণ্ডী কহিল, আজ্ঞে পণ্ডিত মশাই, মানে বইতে লেখা আছে।

কই, দেখি?

নিতাই অবাক হইয়া গেল, সত্যিই তো ডাববাচ্য লেখা আছে। তখন অন্যান্য মানে বইগুলি দেখা হইল, সব এক। ছাপার অক্ষরে তো ভুল হইতে

পারে না। আর এতগুলি বইতে যখন লিখিয়াছে, তখন ওটা নিশ্চয়ই ঠিক। নিতাই বুঝাইয়া দিল,—যুগে যুগে যেমন ধর্ম্ম বদ্‌লায়, তেমনি ব্যাকরণেরও পরিবর্ত্তন হয়। তোমরা জানিতে বাচ্য তিন প্রকার। কিন্তু হে বৎসগণ, আজ থেকে জানিয়া রাখ বাচ্য চার প্রকার, কর্ত্তৃবাচ্য, কর্ম্মবাচ্য, ভাববাচ্য এবং ডাববাচ্য।

কিছুদিনের মধ্যেই নিতাই দেখিল, ইস্কুলের ছেলেরা তাহাকে দেখিলেই বলে ডাববাচ্য। মাষ্টার মশায়রাও বলিতে আরম্ভ করিলেন—বিশেষ করিয়া রসিক বাবু। নিতাই ক্লাশে যায়, বোর্ডে, চেয়ারে, টেবিলে, দেয়ালের গায়ে সর্ব্বত্র কেবল এককথা, ডাববাচ্য। একদিন সে পড়াইতে পড়াইতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বাড়ী আসিয়া দেখে তাহার পকেট ভরা কাগজের টুক্‌রা। প্রত্যেকখানার পিঠে—ডাববাচ্য!

নিতাই বেদম রাগিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ দোয়াত কলম নিয়া হেড্‌মাষ্টারকে একটা কড়া চিঠি লিখিয়া চাক্‌রী ছাড়িয়া দিল। কিন্তু ইস্কুলের বাহিরেও নিস্তার নাই। দেখিতে দেখিতে বাতাসের মত ছেলেদের মুখ থেকে মেয়েদের এবং মেয়েদের মুখ থেকে বুড়াদের মুখেও ঐ এক কথা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিতাই স্নান করিতে যায়, "ডাববাচ্য", মাঠে যায়—"ডাববাচ্য", হাটে যায়—"ডাববাচ্য।" ক্রমে সে ক্ষেপিয়া গেল। একটা প্রকাণ্ড মোটা লাঠি লইয়া দুপুর রোদে পথে পথে ছেলের দল তাড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল।

রহিম সেখ ভিন্ন গ্রামের লোক, নিতাইএর প্রজা। তাহার গাছে প্রথম নারিকেল ধরিয়াছে। তাহারই একটি জমিদারকে উপহার দেওয়ার জন্য লইয়া আসিয়াছে। প্রজার ডাক শুনিয়া নিতাই বাহিরে আসিতেই রহিম হাত যোড় করিয়া কহিল,—আজ্ঞে কর্ত্তা আপনার জন্য এই ডাব—

আর যায় কোথায়? মুহূর্ত্ত মধ্যে নিতাই সেই মোটা লাঠি লইয়া রহিমকে তাড়া করিল।

পিছনে পিছনে ছুটিল মেয়েদের দল। নিতাই ছুটিয়া ছুটিয়া হাঁপাইতে লাগিল এবং আর চলিতে না পারিয়া একটা গাছতলায় বসিয়া পড়িল। সন্ধ্যা-



বেলায় অনেক খুঁজিয়া পিসিমা তাহাকে বাহির করিলেন। সেই রাত্রে নিতাই স্বপ্ন দেখিল যেন সমস্ত গ্রামের লোক তাহার জানালায় দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে, ডাববাচ্য। ঘুম ভাঙ্গিলে, একখানা কাপড় মাত্র সম্বল করিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই অন্ধকার রাত্রে সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পিসিমার জন্যে একখানা চিঠি রাখিয়া গেল,—পিসিমা, আমি এমন দেশে চলিলাম যেখানে মানুষ নাই। ইচ্ছা আছে, দণ্ডকবনে গিয়া যমরাজের তপস্যা করিব। যদি সিদ্ধিলাভ করিতে পারি, এই বর চাহিব যেন, এক নিমেষের মধ্যে এই গ্রামের সমস্ত লোক মুখে রক্ত উঠিয়া মরিয়া যায়।

বছরের পর বছর গিয়াছে। নিতাই ফিরিয়া আসে নাই। হয়তো তাহার তপস্যা শেষ হয় নাই। গ্রামের লোকে তাহার কথা এক রকম ভুলিয়া গিয়াছে। শুধু পিসিমার চোখে ঘুম নাই। একটা শব্দ হইলেই মনে করেন, এই বুঝি নিতাই আসিয়াছে।

---

# পারস্য—সেকাল ও একাল

যে কয়টা মুসলমানের দেশ জাগিয়া উঠিয়াছে পারস্য তাহার একটি। তুরুস্কের মত শিক্ষা বা সভ্যতা তাহার এখনও হয় নাই, কিন্তু কাবুলীদের দেশের চেয়ে পারস্য অনেক উন্নত।

দেশটা নেহাৎ ছোট নয়, প্রায় ৮টী বাঙ্গলা দেশের মত; লোক কিন্তু অনেক কম, বাংলা দেশের প্রায় ৫ ভাগের ১ ভাগ। পারস্যের অনেক জায়গা মরুভূমি, কতকটা পাহাড়ে ঢাকা—পূবের দিক্ নুনে বোঝাই, তাই লোক এত কম।

লোক কম হইলেও বহু প্রাচীন কাল হইতে পারসীকেরা লোকের মত লোক ছিল, আর ছিল ইহারা আমাদের ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতিরই জ্ঞাতি ভাই। আর্য্যজাতি ইউরোপের অনেক দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যের সহিত পারসীক আর্য্যের যতটা মিল দেখা যায় এতটা অন্য কোন দেশের আর্য্যের সঙ্গে ছিল না।

সেকালে এমন দিনও গিয়াছে যখন পারস্যের রাজার দাপটে ইউরোপ কাঁপিত, ইজিপ্ট কাঁপিত, কাবলীওয়ালা মাথা নোয়াইত, পশ্চিম-এসিয়ার গ্রীক্ ও পশ্চিম ভারতবর্ষের হিন্দু কর পাঠাইত। প্রাচীন কালের গৌরব এমন যে নিনিভা নগর, তাহার কাজ শেষ করিয়া দিয়াছিল পারসীকেরা। তার পর ব্যাবিলন! সেই যে ঝুলন্ত-বাগানওয়ালা নদীগহনা-পরা প্রাচীন কালের আশ্চর্য্য রাজধানী, তাহা শেষে লুটাইয়া পড়িয়াছিল কিনা পারস্যের রাজার পায়ে। ব্যাবিলন জয় করিতে গিয়া পারসীকেরা একটা প্রকাণ্ড নদীর—ইউফ্রেটিশের—জলস্রোতই ঘুরাইয়া দিয়াছিল।

কত সুন্দর সুন্দর রাজধানী ছিল সেই সাবেক কালের পারসীকদের হাতে গড়া, আর কত রকমের কত কারুকার্য্য! পার্সিপোলিস্, একবাটানা, সুসা—সেকালকার পারস্যের রাজারা কত চমৎকার করিয়াই এগুলি বানাইয়াছিলেন। মাটি খুঁড়িয়া যাহা ভাঙ্গাচুরা অবস্থায় পাওয়া যায় তাহাতেই লোকে অবাক্ হইয়া যায়। পার্সিপোলিসে যে বাড়ী ছিল তাহার সিঁড়ির মত চমৎকার সিঁড়ি এখনও পৃথিবীর কোন জায়গায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পারস্যের রাজা ১ম দারা দানিয়ুব্ পার হইয়া শকদের তাড়া করিয়াছিলেন। আর গ্রীসের উপর যে কত চোটপাট পড়িয়াছিল তাহার ত কথাই নাই। ম্যারাথন্, থর্ম্মাপিলি প্রভৃতি স্থানে গ্রীকেরা নিজেদের বাড়ী-ঘর রক্ষার জন্য যে অমানুষিক বীরত্ব দেখাইয়াছিল, সে পারস্যের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়াই ত।

সকল দেশে সকল সময়ে বীর ত আর সমান হয় না—ক্রমে গ্রীসের একপাশে এমন এক বীর দেখা দিল যাহার তুলনা সেকালকার ইতিহাসে নাই; আর এই বীরের ইচ্ছাও হইল একবার পূবমুখে বাহির হইয়া গায়ের তেজ দেখাইতে। এই বীরটী কে বুঝিয়াছ ত? আর কেহ নয়, আলেকজান্দার।

আলেকজান্দারের সময় পারস্যের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন ৩য় দারা। লোক তিনি মন্দ ছিলেন না কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের সে বীরত্ব তিনি পান নাই। আলেকজান্দার যুদ্ধের পর যুদ্ধ জিতিয়া দারার বিপুল সৈন্য লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিলেন, এত বড় পারস্য সাম্রাজ্য চুরমার করিয়া দিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ঐ দেশে আরও বড় রকমের কিছু একটা করিবেন। পার্সিপোলিস তিনি পোড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন; আড্ডা গাড়িলেন ব্যাবিলনে। কিন্তু ভগবান্ তাঁহাকে আর বাড়িতে দিলেন না। ব্যাবিলনে আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য ভাগ বাটোয়ারা হইয়া গেল। অনেক মারামারি কাটাকাটির পর পারস্য পড়িল



সেনাপতি সেলুকসের ভাগে। তার পর গ্রীকেরা কিছুকাল পারস্যে রাজত্ব করিয়াছিল। কিন্তু এত গোলযোগ, এত মারামারি, এত বিদ্রোহ হইতে লাগিল যে, সে রাজত্ব সুখে কাটিল না। এ দিকে পার্থিয়ান্ নামে আর একটি জাতি প্রবল হইয়া উঠিল ও ক্রমে পারস্যের কর্ত্তৃত্ব গিয়া পড়িল তাহাদের হাতে। প্রায় ৬০০ বৎসর বিদেশী রাজার অধীনে থাকিয়া পারস্য আবার মাথা তুলিল। গ্রীক্ ও পার্থিয়ান্ শাসনের পর পারস্য নিজের যে রাজাকে পাইল তাঁহার নাম আর্দাশির। পার্থিয়ানদের দেবদেবী ছিল অনেক। আর্দাশিরের সময় এই সব দেবদেবীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল এবং আবার পারসীকদের অগ্নিপূজা দেশে জোরের সহিত চলিতে লাগিল। আর্দাশির ও তাঁহার বংশীয় রাজারা ছিলেন স্বাধীন রাজা। তাঁহারা দেশের যে কত রকমের উন্নতি করিয়াছিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা কঠিন। স্তাম্বুলের রোমান বাদশাহদের প্রায়ই পারস্যের এই বাদশাহদের সহিত লড়াই বাধিত। কখন ইঁহারা, কখন উঁহারা যুদ্ধে জিতিতেন—ফলে এই দুই দলই কাবু হইয়া পড়িলেন।

রোমান বাদশাহেরা পারস্যের কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু প্রাচীন পারস্যের দফা শেষ করিয়া দিল মুসলমানেরা—হজরত মহাম্মদের ইস্লামধর্ম্ম স্থাপনের অল্পদিন পরেই। এই পরাজয়ের ফলে পারস্যকে আবার ৮০০ বৎসর পর্য্যন্ত বিদেশী রাজার নিকট মাথা নোয়াইয়া থাকিতে হইল। পারস্যের ধর্ম্ম, পারস্যের স্বাধীনতা কোথায় চলিয়া গেল। অল্পসংখ্যক পারসী দেশ হইতে পলাইয়া আশ্রয় লইল বম্বে নগরে। অগ্নিপূজক পারসী স্বদেশে থাকিল খুব কমই। প্রায় লোকই মুসলমান হইয়া গেল।

তার পর পারস্যের বুকের উপর পড়িয়া কত লোক কত অত্যাচার করিল—জেঙ্গিস্ খাঁ, তৈমুরলঙ্গ যে যত পারিল লুটপাট করিল। কত রাজবংশ গেল,—কত কাটাকাটি, কত রক্তারক্তির পর ডাকাতের সর্দ্দার নাদির খাঁ পারস্যের কর্ত্তা হইয়া বসিল। এই নরপিশাচের নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে কে না জানে? ইহার শুভাগমন হইয়াছিল দিল্লী পর্য্যন্ত। অনেক লোকের প্রাণ ইহার অনুগ্রহে উধাও হইয়া গিয়াছিল। আর জিনিষ-পত্রের লুটপাট? তার ত কথাই নাই। নিজের দেশেই কি সে কম অত্যাচার করিয়াছে? এমন অত্যাচারী লোক কতদিন টিকিতে পারে? সে মারা গেল শেষে ঘাতকের হাতে। আবার মারামারি, কাটাকাটির পর পারস্যে কাজরবংশ বড় হইয়া দাঁড়াইল। এই বংশের প্রথম রাজা আগামহাম্মদ খাঁ দুষ্টবুদ্ধিতে ছিলেন নাদির শারও উপরে। এই সেদিন পর্য্যন্তও ইঁহার বংশ

পারস্যে রাজত্ব করিতেছিল। কিন্তু আজকালকার লোকের চক্ষু সকল দেশেই ফুটিয়াছে—পারস্যেও বন্ধ নাই। রাজা যাহা ইচ্ছা করিবেন, প্রজার মতে চলিবেন না—এ ব্যবস্থা এখন কোন জাতিই মানিতে চায় না। পারস্যের প্রজারা ক্রমে দেশে নিজেদের অধিকার চাহিয়া বসিল। তখন কাজর বংশের যিনি শা বা রাজা ছিলেন, তিনি অগত্যা তাহাই স্বীকার করিলেন। ১৯০৬—০৭ সনে পারস্য দেশে মজ্‌লিস্—পার্লিমেণ্টের ধরণে—বসিল। লোকে বাছুনি করিয়া মজ্‌লিসের সভ্য ঠিক করিয়া দিল, মন্ত্রিসভা বসিল। তখন রাজা মনে করিলেন, এতটা করা ভাল হয় নাই। মজ্‌লিসের উপর অত্যাচার হইতে লাগিল। যে রাজা মজ্‌লিস্ বসাইয়াছিলেন তিনি ঐ মজ্‌লিস্ বসার পর বেশী দিন এ জগতে ছিলেন না। তাঁহার পুত্র আহমদ্ শা আমোদ করিয়া স্থানে স্থানে বেড়াইয়াই দিন কাটাইবেন, না রাজকার্য্য দেখিবেন? কর্ম্মচারীরা নিজ নিজ স্বার্থই দেখিবে, না দেশের কাজ মন দিয়া করিবে? এই গোলমালের মধ্যে পার্লিমেণ্টের আদত কাজ কিছুই হইতেছিল না। লোক বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। আবার একদিকে রুসিয়া, অন্যদিকে ইংরাজ,—যিনি যতটুকু পারেন পারস্যের খরচে উদরপূরণের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। পারস্য নিজের ঘর সামলাইতে পারিল না।

ইউরোপে মহাসমর বাধিল—একদিকে জার্ম্মাণী ও তুরুস্ক, অন্যদিকে ইংরাজ ও রুস, পারস্য চাপা পড়িয়া মারা যাইবার মত হইল। পারস্যকে দলে রাখিবার জন্য ইউরোপের মহাপ্রভুরা টাকা বিলাইতে কসুর করিলেন না। কিন্তু পারস্যে তখন এমন ক্ষমতা কাহারও ছিল না যে বেশী কিছু করিয়া উঠিতে পারে। বড় কর্ম্মচারীদের টাকা হজম করিতে আপত্তি ছিল না; কিন্তু ব্যস, ঐ পর্য্যন্তই। ব্রিটেনের সহিত পারস্যের সন্ধি হইল; পারস্যের খনি হইতে ইংরাজ বণিকেরা টাকা তুলিবার সুবিধাটা করিয়া লইলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে পারস্য বুঝি বা শীঘ্রই ব্রিটিস সাম্রাজ্যের পেটে ঢুকিয়া পড়ে। কিন্তু পারস্যের মজ্‌লিস্ তখনও একেবারে মরে নাই। মজ্‌লিস্ ঐ সন্ধি বাহাল করিতে স্বীকার করিল না। ইংরাজের অর্থ মন্ত্রীদের পেটে গিয়াও কিছু করিতে পারিল না। যে মন্ত্রীরা সন্ধির মধ্যে ছিলেন তাঁহারা তাড়া খাইলেন। রুসিয়ার জার ইংলণ্ডের সহায় ছিলেন, কিন্তু এই সময়ে জারের রাজত্ব চলিয়া গিয়াছে, রুসিয়ায় সাধারণতন্ত্র বসিয়াছে—এই সাধারণতন্ত্র পারস্য বখ্‌রা করিয়া নিতে রাজী হইল না। ইংলণ্ডের সহিত পূর্ব্বে রুসিয়া যে সন্ধি করিয়াছিল তাহা উড়িয়া গেল; পারস্যের সহিত রুসিয়া যে নূতন সন্ধি করিল তাহাতে সে নিজের সাবেক দাবী-দাওয়া প্রায় সবই ছাড়িয়া দিল।



এদিকে, ইংরাজ পারস্যে বেশী বেশী অধিকার ভোগ করিবে ইহা আমেরিকারও ভাল লাগিল না। তাহার ইচ্ছা সেও কিছু ভাগ বসায়।

এইরূপ গোলমাল চলিতেছে, রাজভাণ্ডারে টাকাকড়ি নাই, পারস্য যে আবার ভাল দিনের মুখ দেখিবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, এমন সময়ে পারস্যের এক সুপুত্র মাথা তুলিলেন—রেজা খাঁ।

এই রেজা খাঁ কে? আগে তাঁহাকে কেহ চিনিত না, এখন তিনি পারস্যের সম্রাট্ বা শা। এখন তাঁহার উপাধি জান কি? "সর্ব্বশক্তিমানের ছায়া, ভগবানের রাজপ্রতিনিধি, রাজার রাজা, জগতের কেন্দ্র।"

বড় হওয়ার পর তাঁহার বংশটাও বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর তাঁহার নাম হইয়া দাঁড়াইয়াছে রেজা শা পহ্লবী।

পাহাড়ের উপর এক চাষার ঘরে রেজার জন্ম। ছেলেবেলায় তাঁহার অদৃষ্টে লেখাপড়া-শিক্ষা ঘটে নাই। বয়স যখন বছর কুড়ি, তখন তিনি রাজধানী তিহারণে আসিয়া "ভৃত্য"গিরি করিতে থাকেন। শুনা যায়, কিছুদিন সহিসের কাজও করিয়াছিলেন। তার পর ঢুকিলেন ফৌজে—অবশ্য সামান্য সৈনিকরূপে। কিছুকাল পরে ফৌজের মধ্যেই একটু বড় কাজ পাইলেন, তারপর আরও বড়, আরও বড়। রেজার চেহারাটা বেশ লম্বা, মানুষটাও বলবান্—লেখাপড়া না জানিলে কি হয়, বুদ্ধিও বেশ ধারালো। পারস্য সৈন্যে আর কি চাই? তিনি ধাঁ ধাঁ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন।

এদিকে মন্ত্রীরা যেমন অকর্ম্মা তেমনি ঘুসপ্রিয়—পারস্যের নবীনদলের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব দেখা দিল—রাজভাণ্ডারে টাকা নাই, ভাল সৈন্য মিলিবে কোথা হইতে? কসাক সৈন্য বরং অনেকটা কাজের ছিল, আর রেজা ছিলেন সেই সৈন্য-দলে। কয়েকজনে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন, রেজাই সেনাপতি হইয়া তাঁহার দলের লোক লইয়া রাজধানীতে গিয়া সরকারী আফিস্ দখল করিয়া ফেলিবেন, তারপর নূতন লোক রাজকার্য্যের ভার লইবে—ফলে তাহাই হইল। রাজার ক্ষমতাই বা কি, তিনি করিবেনই বা কি? রেজার বয়স তখন ৪০, দলে মোট ২৫০০ সৈন্য। তিনি তাহা লইয়াই হুড়মুড় করিয়া রাজধানীতে গিয়া রাতারাতি সব সরকারী আফিস্ দখল করিয়া বসিলেন—মারামারির দরকার হইল না। কেই বা কিসের খোঁজ লয়? কেহ কেহ পর দিন খাবার সময় টের পাইল যে রাতারাতি এমন একটা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ইহা ১৯২১ সনের ঘটনা—৮ বৎসর আগেকার।

এবার রেজা হইয়া পড়িলেন প্রধান সেনাপতি—তাঁহার উপাধি হইল সর্দ্দার সিপা। নামে প্রধান সেনাপতি, কাজে তিনি এই সময় হইতেই হইলেন সর্ব্বেসর্ব্বা। যিনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন তিনি রেজার কথা মানিয়া চলিতেন—না চলিয়া উপায় কি? রেজার কথায় টাকা আদায়ের জন্য বড় বড় লোককে ধরিয়া জেলে পর্য্যন্ত দেওয়া হইতে লাগিল, কেহ ত আর সহজে রাজসরকারে কিছু দিত না। এই সকল কাজ তখনকার প্রধান মন্ত্রী সামাল দিয়া উঠিতে পারিলেন না। রেজা তখন নূতন মন্ত্রী ঠিক করিলেন। জেলখানা হইতে আনিয়া একজনকে প্রধান মন্ত্রী করা হইল, আর রেজা হইলেন যুদ্ধ-মন্ত্রী।

সৈন্যসামন্ত নিজের হাতে, রেজা দেশের বিদ্রোহী সর্দ্দারগুলিকে বশে আনিতে লাগিলেন। সৈন্য বাড়াইলেন, তাহাদের জন্য যে টাকাকড়ি আবশ্যক নিজেই চেষ্টা করিয়া তাহার যোগাড় করিতে লাগিলেন। সৈন্যের মধ্যে বেশ শৃঙ্খলা আনিয়া তাহাদিগকে কাজের লোক করিয়া তুলিলেন।

ক্রমে রেজাই হইলেন প্রধান মন্ত্রী। আবার যুদ্ধমন্ত্রীও তিনি, প্রধান সেনাপতিও তিনি। এ অবস্থায় যাহা হইবার তাহা হইল। লোকে বুঝিতে লাগিল দেশ ত রেজার, "শা" বা রাজা সাক্ষিগোপাল মাত্র। তখনকার রাজা আহমদ শাও ছিলেন অকর্ম্মণ্য। তিনি বেড়াইতেন আর আমোদপ্রমোদ করিতেন। লোকের এই পুতুলনাচ আর ভাল লাগিল না। মজলিস্ বা পারস্যের পার্লিমেণ্ট ঠিক করিল, এই শ্বেতহস্তীকে আর রাখা হইবে না। আহ্মদ-শা বিদেশেই ছিলেন, যুবরাজকে সীমানা পার করিয়া দিয়া আসা হইল। কিছুদিন রেজার কর্ত্তৃত্বে এক সভা কর্ত্তৃক রাজকার্য্য চলিল। ১৯২৬ সনে রেজাকে রাজমুকুট পরাইয়া একেবারে পারস্যের শাহ করিয়া দেওয়া হইল। সেই রাজমুকুট পরার সময় কত জাঁকজমক, কত ধূমধাম! অভিষেকের সময় রেজা কোন্ সিংহাসনে বসিয়াছিলেন জান? দিল্লী হইতে নাদিরশাহ যে একটী ভাল সিংহাসন দেশে নিয়া গিয়াছিল তাহারই উপরে।

রেজা শা এখন একটু লেখাপড়া শিখিয়াছেন। এখনকার "রেজা শা" কিন্তু সেই রেজা হইতে একটু আলাহিদা ধরণের লোক। এখন রাজা কি না, তাই মজলিস্‌কে ও প্রধান মন্ত্রী-কে কাজকর্ম্ম করিতে দিতে হয়। কাজেই নিজে আছেন একটু সারিয়া। এখন তাঁহার দেখা পাওয়াও দুর্ঘট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার শক্ত হাত সরিয়া যাওয়ায় সৈন্যেরাও কিছু বেয়াদব হইয়া পড়িয়াছে। ফলে পারস্যের অদৃষ্টে আবার কি দাঁড়ায় বলা কঠিন। তুরুস্কের



সহিত সন্ধি পারস্যের পক্ষে বেশ সুবিধাজনক হইয়াছে। ব্রিটেনও এখন পারস্যকে একটু খাতির করিয়া চলেন। পারস্য নিজের পায়ে দাঁড়াইয়াছে কি না, তাই।

রেজা শা পহ্লবী

বড় হওয়ার পর রেজার নামে সাহেবেরা কত সময় কত আজ-গুবি গল্প রটাইয়াছে। তিনি নাকি কবে রুসিয়ার কোন্ কলেজে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন, কত রকম ভাষা জানা ছিল, কেমন ভালো পিয়ানো বাজাইতে পারিতেন—ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহার সব মিথ্যা, সব মিথ্যা, সব মিথ্যা।—রেজা চাষার ছেলে, তবে চাষার মধ্যে তাঁহার বংশটা একটু ভাল রকমের হইতে পারে। লেখাপড়া তিনি ছেলেবেলায় বা যৌবনে মোটেই শিখেন নাই, কোন কলেজের ত্রিসীমানাও মাড়ান নাই। তিনি যাহা হইয়া পড়িয়াছেন নিজের গুণে।

---

# কমল ও পঙ্ক

( শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ )

সুন্দর কমল এক ফুটি' সরোবরে,
পঙ্ক-পানে চাহি কহে তাচ্ছীল্যের স্বরে !
"হায় পঙ্ক ! রূপ তোর কদর্য্য এমন ;
হেরি তোরে জন্মে ঘৃণা হৃদে অনুক্ষণ !
আমার সৌন্দর্য্য,—দেখ্ নয়ন ভরিয়া—
রেখেছে এ সরোবর উজল করিয়া ।"
হাসিয়া কহিল পঙ্ক,—"সত্য তোর কথা,
আমার সর্ব্বাঙ্গ জুড়ে আছে কদর্য্যতা ।
কিন্তু কেন ভুলে যাস্ কদর্য্যতা মোর
গড়েছে ললিত অই রূপরাশি তোর ।
আমার বক্ষেতে তোর হ'য়েছে জনম,
তাইতে "পঙ্কজ" তোরে কহে সর্ব্বজন !
হ'লেও আমার দেহ কদর্য্যতাধার,—
তোর মাতা আমি,— এই গৌরব আমার !
কিন্তু এই দুঃখ বড় বাজিল অন্তরে—
সন্তান হইয়া ঘৃণা করিলি মাতারে !"

---

# পদ্মরাগ

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর ]

( অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম-এ )

## রণজিতের সন্দেহ

দস্যুরা ছকা-কাশিকে চুরি করিয়া উধাও হইবার পর হইতেই রাজা বাহাদুর যেন একেবারে মুষ্ড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। পদ্মরাগ ফিরিয়া পাইবার সমস্ত আশা ভরসা সেই দিন হইতেই তিনি জলাঞ্জলি দিলেন, দেখিয়া শুনিয়া ডাক্তারের দল ভড়্কাইয়া গেল। এই বয়সে এত বড় আঘাতটা সহ্য করিতে না পারায় স্বাস্থ্য যদি তাঁর একবার ভাঙ্গিতে সুরু করে, তবে সে কি আর সহজে জোড়া লাগিবে ? কাজেই এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। ব্যবস্থা হইল, সমস্ত রকমের উত্তেজনা হইতে সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে হইবে। তাঁর এখন পূরাপূরি বিশ্রামের দরকার।

দুপুর বেলা। রাজা বাহাদুর তাঁর নিজের ঘরটীতে নিরিবিলি ঘুমাইতেছেন, কোন দিকে টুঁ শব্দটী নাই—চারিদিক্ একেবারে নীরব, নিথর নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ধীরে, ধীরে, পা টিপিতে টিপিতে একটী মনুষ্যমূর্ত্তি আসিয়া অতি সঙ্গোপনে ঘরে ঢুকিল। সমস্ত চোখে মুখে তার উৎকণ্ঠার স্পষ্ট ছাপ মারা। ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই সে খুব সন্তর্পণে রাজা বাহাদুরের বিছানার কাছে গিয়া একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ঘুমটী তাঁহার বেশ গাঢ় হইয়া আসিয়াছে কিনা। যখন বুঝিল ঘুম বেশ গাঢ়ই বইয়াছে, হঠাৎ জাগিয়া উঠার সম্ভাবনা খুবই অল্প, তখন দরজার সামনে গিয়া গলা বাড়াইয়া আশপাশটা খুব মনোযোগের সহিত পরখ করিয়া লইল। সে দিকেও যখন লোকজনের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, লোকটী তখন নিশ্চিন্ত হইল—যে কাজের জন্য সে আসিয়াছে, তাহা সুসম্পন্ন করার সময়ই তো এই !

লোকটী হইতেছে রাজা বাহাদুরের রসুয়ে বামুন গণেশ ঠাকুর—যাহার সম্বন্ধে হুকাকাশি প্রথম দিন অতগুলি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য খবর দিয়া সকলকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা বাহাদুর সে দিন জোর গলায় সকলকে বলিয়াছিলেন যে পাচকটী তাঁহার একটী খাঁটী রত্ন—কোথাও এতটুকু গলদ্ নাই এবং সে কথায় সম্পূর্ণ সায় দিয়াছিলেন হুকা-কাশি স্বয়ং। কিন্তু রাজা বাহাদুরই যদি আজ টের পাইতেন যে হুকা-কাশি রণজিতের নিকট চিঠিতে যে পেজকাটারের ভাঙ্গা হ্যাণ্ডেলটীর উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেই হ্যাণ্ডেলটীরই খোঁজে, তাঁহার এতটা বিশ্বাসের পাত্র গণেশ ঠাকুর এই নির্জ্জন দুপুরে চোরের মত চুপিচুপি তাঁহার ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছে, তাহা হইলে তাঁহার মনের ভাব কেমন হইত, কে জানে ?

টেবিলের পিছনে, সোফার পাশে, খাটের নীচে কোন জায়গাই খুঁজিতে

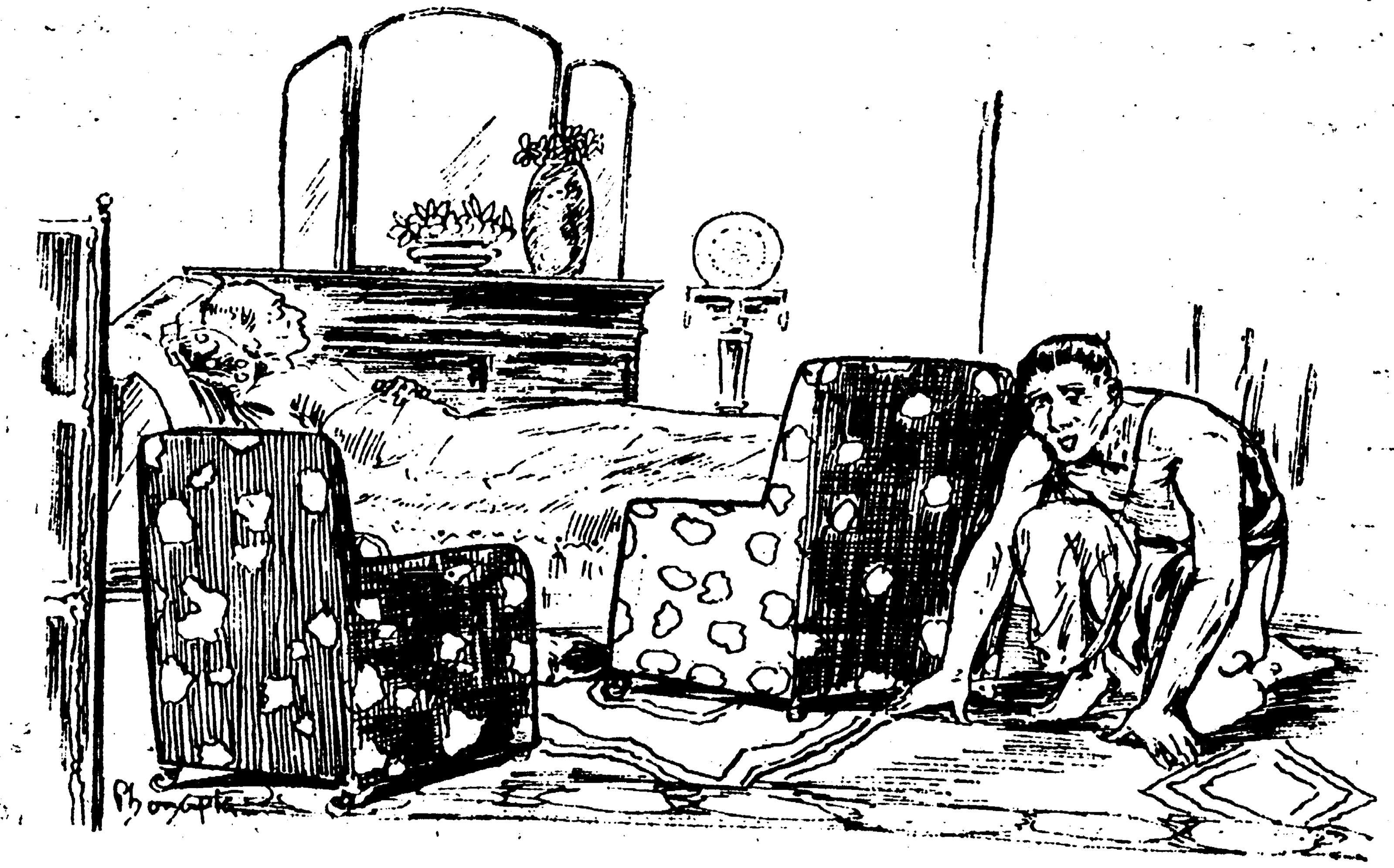

টেবিলের পিছনে, সোফার পাশে, খাটের নীচে কোন জায়গাই খুঁজিতে গণেশ বাকী রাখিল না

গণেশ বাকী রাখিল না; কিন্তু কোথাও সে ভাঙ্গা হ্যাণ্ডেলের খণ্ডটুকু মিলিল না। অখণ্ড মনোযোগের সহিত বেচারা খুঁজিয়াই চলিয়াছিল, টেরও পায় নাই, কখন যে



রণজিৎ আসিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইয়াছে। হুঁস্ হইল তার রণজিতেরই গলার আওয়াজে—"কি ঠাকুর মশাই, অত খোঁজা হচ্ছে কি ?"

অন্ধকার রাত্রে সাপের পিছল পিঠে পা দিলে, মানুষ যেমন আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া দশহাত পিছাইয়া যায়, রণজিতের গলার আওয়াজে গণেশ ঠাকুরের অবস্থাটাও প্রায় সেই রকমই হইল। একটী কথাও তাহার মুখে জোগাইল না, বার কয়েক হাঁ-না, হাঁ-না করিয়া শেষটায় সে থামিয়া গেল।

কঠিন গলায় রণজিৎ বলিল, "না, চুপ্ করে থাক্‌লে চল্‌বে না, জবাব আমি চাই-ই।" সন্দেহের মেঘে সমস্ত মুখখানা তখন তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে।

ইহারও উত্তরে কিন্তু গণেশ কোন কথা কহিল না, কুণ্ঠিত মুখে মাথা নীচু করিয়া যেমনটী কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক তেমনটীই দাঁড়াইয়া রহিল।

কী যে এখন তাহার কর্ত্তব্য সে কথা রণজিৎকে কে বলিয়া দিবে ? কোন কাজেই ঘাব্ড়াইয়া যাওয়া তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। ভারতবর্ষের কত জায়গায় হাজার হাজার দর্শকের সম্মুখে কত রকম ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় সে নামিয়াছে, কিন্তু কই কোথাও তো কোন দিন তাকে কেউ বিচলিত হইতে দেখে নাই। কিন্তু এতো তা নয়! হয়তো তাহার একটি মুখের কথায় পদ্মরাগের সমস্ত ভবিষ্যৎ বদ্‌লাইয়া যাইবে, তখন আর হুকা-কাশির শত চেষ্টাতেও সে ভুল শোধরান সম্ভবপর হইবে না। নিকটেই যে সোফাটা পাইল তাহাতেই বসিয়া পড়িয়া সে গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গেল। গণেশ ঠাকুর যে গোপনে গোপনে কিছু একটা খুঁজিতেছিল সে তো তাহার সন্ত্রস্তভাবেই স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে। এবং সে জিনিষটাও হুকা-কাশি-বর্ণিত পেজকাটারের সেই ভাঙ্গা হ্যণ্ডেলটী হইবারই ষোল আনা সম্ভাবনা। অথচ হুকা-কাশি সেদিন সবাইকার সম্মুখে এক রকম হলফ করিয়াই বলিয়াছেন যে গণেশ ঠাকুর সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। রাজাবাহাদুর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে পৃথিবীর সমস্ত ধন-রত্ন একত্রে আনিয়া দিলেও যে কাজ নীচ তা' গণেশ ঠাকুর বা শ্রীমন্ত ভৃত্য কিছুতেই করিবে না।...কিন্তু সে কি বাস্তবিকই সত্যি ? যে লোক পদ্মরাগ চুরির সহিত এমন রহস্যভাবে জড়িত হ্যাণ্ডেলটাকে গোপনে

গোপনে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, সে কি সত্যি সত্যিই নির্দ্দোষ ? রণজিতের সন্দেহ হইল। কিন্তু...ওদিক্ দিয়াও তো ভাবিবার অনেক কিছু আছে। বামুন ঠাকুরের সাথে ব্যাপারটার যে একটু সম্পর্ক আছে সে কথার আভাষ ছকা-কাশি প্রথম দিনের কথাবার্ত্তাতেই দিয়াছেন। যে মানুষ প্রত্যেক জিনিষটাই এতখানি আগাইয়া দেখিতে পারে, তারও কি আবার ভুল হয় ? গণেশ ঠাকুরের মত একজন নিরক্ষর বৃদ্ধের কি সম্ভব তাহারও চোখে ধূলা দেওয়া ? দারুণ সন্দেহে মন তাহার একবার এদিক্ আর একবার ওদিক্ ঝুঁকিতে লাগিল, অথচ সিদ্ধান্ত সে কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। সেই যে ভাল ভাষায় যাহাকে বলে "দোলায়মান মতি", তাহাই হইল রণজিতের।

চিন্তায় সে আরও কতক্ষণ কাটাইয়া দিত বলা কঠিন, যদি না খানিক বাদে রাজবাড়ীর বেহারাটা আসিয়া একখানা টেলিগ্রাম হাতে দিয়া তাহার স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গিয়া দিত। টেলিগ্রামখানা গিয়াছিল রণজিতেরই বাড়ীতে, শিবনন্দন জরুরী বোধে বুদ্ধি খাটাইয়া রাজবাড়ীতে লইয়া আসিয়াছে।

তারখানা খুলিয়া রণজিৎ যার পর নাই আশ্চর্য্য বোধ করিল। দীপেনের তার, মর্ম্ম এই যে,—একটী লোককে সন্দেহ করিয়া তাহার পিছু পিছু সে ও কুমারেশ ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। লোকটী গাড়ীতে উঠিয়া পড়ে, কিন্তু গাড়ী থামাইয়া তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ছদ্মবেশে লোকটী নিশ্চয়ই গাড়ীর কোথাও আছে, এই বিশ্বাসে তাহারা তুই জন গোপনে মাঝিহাটী যাইতেছে—রণজিৎ যেন সমসেরপুর সামলায়।

পকেটে তারখানা পূরিয়া রণজিৎ সোজা বাড়ীর দিকে রওনা হইল। বাড়ীতে ঢুকিতেই সর্ব্বপ্রথমে দেখা হইল তার দাদার সাথে। রণজিতের দাদা আবার একটু স্বতন্ত্র ধরণের মানুষ—বৈজ্ঞানিক—দিনরাত নানা রকমের যন্ত্রপাতির মধ্যে ডুবিয়া থাকেন। বারান্দায় দাঁড়াইয়া তিনি একটী দূরবীণ চোখে দিয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন, রণজিৎকে দেখিয়াই বলিলেন, "দেখ রণজিৎ, কি পাওয়ার-ফুল দূরবীণ, নতুন কিনেছি !"



"ও সবের আমার সময় নেই, দাদা।"

"আরে এটা একবার দেখ্‌ই না, কেমন পাওয়ারফুল। ঐ কতদূরে মোটরখানা দাঁড়িয়ে, মনে হচ্ছে এই তো হাতের কাছে! আরে দেখ্ দেখ্ মজা—মোটরের সাম্‌নে দু'তিন জন লোক ঠিক আমার মত দূরবীণ দিয়ে কি দেখ্‌ছে।"

"মোটর ? দূরবীণ ? কৈ দাদা, দেখি ?" বলিয়া রণজিৎ দূরবীণটা তার দাদার হাত হইতে এক রকম কাড়িয়াই লইল। পরক্ষণে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "দাদা, গ্যারেজে আমাদের গাড়ীখানা আছে ?"

"না, নেই তো।"

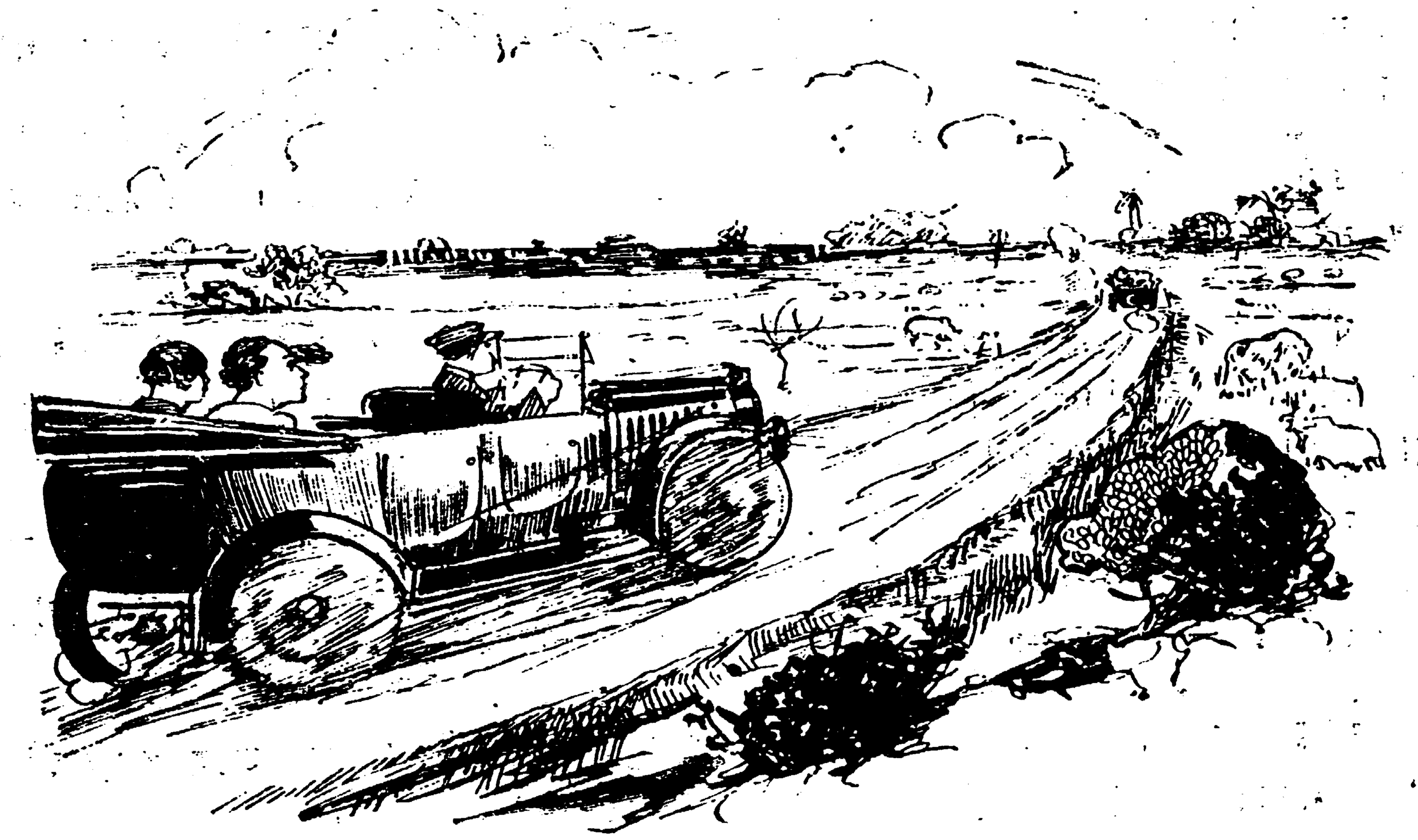

"ঐ যে দূরে গাড়ীখানা দেখ্‌ছ, ওখানা হচ্ছে ডাকাতদের গাড়ী, ওখানাকে ধরতে হবে।"

"নেই ? আচ্ছা, তোমার এ দূরবীণটা আমি নিয়ে চল্লাম। কয়েকদিনের জন্য সমসেরপুর ছেড়ে আমি বাইরে যাচ্ছি।"

"সে কিরে, কোথায় ?" কিন্তু ততক্ষণে রণজিৎ সরিয়া পড়িয়াছে।

খানিকক্ষণের মধ্যেই রাজবাড়ীর সব চাইতে দ্রুতগামী মোটরখানাকে

পেট্রোলে বোঝাই করিয়া রণজিৎ, সেই গাড়ীর শোফার ও আর একটী লোক একেবারে সমসেরপুর রোডে আসিয়া পৌছিল।

শোফারের হাতে দূরবীণটা দিয়া রণজিৎ বলিল, "ঐ যে দূরে গাড়ীখানা দেখছ, ওখানা হচ্ছে ডাকাতদের গাড়ী। ওখানাকে ধরতে হবে।"

তখন সমসেরপুর রোড্ কাঁপাইয়া দুই গাড়ীতে 'রেস্' সুরু হইল।

( ক্রমশঃ )

---

## মেয়েদের জানা দরকার

রূপা বিশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেলে যদি আলুসিদ্ধকরা জলের মধ্যে তাহা খানিকক্ষণ রাখিয়া দাও তবে দেখিবে তাহা ঠিক নূতন রূপার মতই উজ্জ্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

* * * *

এলুমিনিয়ামের পাত্র যেন তোমরা কখনো সোডা দিয়া মাজিওনা। উহাতে পাত্রটী খাইয়া যায়, আর অল্পদিনের মধ্যেই কেমন কালচে কালচে হইয়া উঠে।

* * * *

ঘরের কার্পেটে অনেক সময় তেল পড়িয়া দামী জিনিষটা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ইহার ওষুধ হইতেছে সাজিমাটী আর জল কাদার মত করিয়া সেই তেলপড়া জায়গাটায় লাগাইয়া দেওয়া। দেখিবে তাহাতে তেলের দাগ দিব্যি উঠিয়া গিয়াছে।

সাবানের ভাঙ্গাচোরা টুক্‌রাগুলি অনেকে ফেলিয়া দেয়। সেগুলি না ফেলিয়া রাখিয়া দিলে অনেক কাজে আসে। জলের সাথে ফুটাইলে তাহা হইতে চমৎকার ফেনা হয়, আর সেই ফেনায় অনেক জিনিষ পরিষ্কার করা যায়।

* * * *

হাল্কা রংকরা সিল্কের কাপড় কাচা শেষ হইলে যদি ধুইবার জলে খানিকটা দুধ মিশাইয়া লওয়া হয় তবে কাপড় নূতনের মত দেখাইবে।

* * * *

দরজা জানালার কব্জায় অনেক সময় মরিচা পড়িয়া বিশ্রী ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ হয়। কব্জার উপর খানিকটা সাবান ঘসিয়া দিলে আর ওরকম হইবে না।

* * * *

চায়ের পেয়ালা, সসার প্রভৃতি চিনামাটীর বাসন ধুইবার সময় যদি সাজিমাটী দিয়া ঘষিয়া লওয়া যায় তবে সেগুলি দেখিতে খুব পরিষ্কার ও ঝক্‌ঝকে হয়।

---

## সখার আশায়

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

( ধুলগ্রাম, যশোহর )

তুমি নাকি রোজই এসে ডাক, সখা, মোরে,
সাথে করে নিয়ে যেতে কোন্ সুদূরের পারে!
কাণে আমার লেগেই আছে তোমার মধুর হাসি,
হৃদয় আমার তৃপ্ত করে তোমার মোহন বাঁশী।
দেখতে আমি পাইনা তোমায়, শুনছি তোমার গাথা,
তাতে আমি তুষ্ট নহি—যায় না তাতে ব্যথা।
কোন্ দেশেতে থাক তুমি, সে দেশ কত দূর?
রাখাল কিগো সেথায় এমন বাজায় বাঁশী-সুর?
সেথায় কিগো কোকিল করে এমনি ধারা গান?
সেথায় কিগো সূয্যিমামা আলোক করে দান?
নিঝুম রেতে, ঘুমের দেশে ডাক বাঁশীর সুরে,
অজানা এক বেদনাতে বুকটী উঠে ভ'রে।
তোমার আশায় আমি যখন উঠাই অলস দেহ,
নিরাশ হয়ে চেয়ে থাকি—নাইক কোথায় কেহ।
গভীর রাতে বসে থাকি তোমায় পাব ব'লে,
রাতের আঁধার মিলিয়ে যায় সূয্যিমামার কোলে।
পাখীগুলো ডেকে উঠে সুপ্তিবিহীন চোখে,
সবুজ গাছের কালো ছায়া দোলে জলের বুকে।
দুপুর বেলায় সূর্য্য যখন মাথার 'পরে থাকে,
গাছের ফাঁকে কোকিলগুলি কুহু কুহু ডাকে,

ব্যাকুল প্রাণে ডাকি তোমায় শিউলি গাছের তলে,
নীরব ব্যথায় ত্বপুর যথা ক্লান্ত নিশাস ফেলে।
দিনের শেষে ক্লান্ত রবি অস্তাচলে যায়,
তবুও তুমি কওনা কথা, দেওনা দেখা, হায়।
আকাশ নদীর জেলে তাহার জাল গুটিয়ে রাখে,
কালো মেঘের জোয়ার আসে গাছের ফাঁকে ফাঁকে।
নিরাশ হ'য়ে ফিরি আমি কুটীরখানার পানে,
বিভোর হয়ে থাকি আবার তোমার বাঁশীর তানে॥

---

# নিরানব্বইএর ধাক্কা

শ্রীবাণীকান্ত ভট্টাচার্য্য

(গড়পার, কলিকাতা।)

এক গ্রামে এক ছুতার ও এক বণিক্ বাস করিত। প্রতিদিন ছুতার যাহা উপার্জ্জন করিত তাহা সমস্তই খরচ করিয়া ফেলিত। বণিক্ অত্যন্ত কৃপণ, সুতরাং তাহার টাকা কেবল জমিতই। বণিকের স্ত্রী ও ছুতারের স্ত্রী দুজনাই গ্রামের এক পুকুরে স্নান করিত এবং প্রত্যহ সাংসারিক বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিত। বণিকের স্ত্রী নিজের সংসারের বিষয় লজ্জায় কিছুই বলিতে পারিত না। একদিন সে বণিক্‌কে তাহার এই বিভ্রাটের কথাটা জানাইল। তার পর দিনই বণিক্ ছুতারের বাড়ীতে উপস্থিত। ছুতার বণিক্‌কে বেশ আপ্যায়িত করিল, খাওয়াইল পর্য্যন্ত। যাওয়ার সময় বণিক্ একটী থলিতে ৯৯টী টাকা পুরিয়া ছুতারের বিছানায় চুপ করিয়া ফেলিয়া গেল। ছুতার বিছানায় টাকার থলি দেখিতে পাইয়া বণিকের বাড়ীতে গিয়া বলিল, "মশাই, আপনি এই থলিটী ফেলে গেছেন"! বণিক্ বলিল "সে কি, আমি ত কোন থলি ফেলে আসিনি।" অবশেষে ছুতার ভাবিল 'নিশ্চয়ই টাকা ভগবান্ দিয়াছেন।' সে বাড়ীতে গিয়া থলিটী বেশ সাবধানে রাখিল এবং ৯৯৲ টাকা একেবারে হাতে পাওয়ায় তাহার ১০০৲ টাকা জমাইবার লোভ হইল। সে কাজটা খুব শীঘ্রই হইয়া গেল। তখন বণিক্ দুই শত টাকা জমাইতে লাগিয়া পড়িল। ২০০ টাকা—শেষে ৪০০৲। এখন বণিকের যে দশা ছুতারেরও সেই দশাই।

একদিন বণিক্ ছুতারকে বলিল "ভাই, এখন আমার ৯৯ টাকা দাও।" ছুতার আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "টাকাটা কি তোমার ছিল"? বণিক্ বলিল "নয় ত কি"? তারপর সে ছুতারকে তাহার মৎলবটা বুঝাইয়া দিল; ছুতারও বণিকের টাকা শোধ করিল। বণিক্ বলিল "ভাই, তোমায় নিরানব্বইএর ধাক্কায় ফেল্‌বার জন্য এ রকমটা করেছিলাম"। বণিকের ধাক্কায় পড়িয়া ছুতার ক্রমে বেশী রকমের মিতব্যয়ী হইয়া পড়িল।

---

## কর্ণেল বার্কার

কর্ণেল বার্কার

পাশের ছবিটী দেখিয়া তোমরা হয় তো মনে করিবে, আচ্ছা গাঁট্টা গোট্টা এক সাহেবের ছবি এটা। কিন্তু যদি বলি এটী একটী মেয়ের ফটো, তবে বোধ হয় বিস্ময়ে তোমরা একেবারে ইঞ্চিখানেক হাঁ করিয়া ফেলিবে। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু তাই-ই। ছয় বৎসর ইনি লোকের চোখে ধূলা দিয়া পুরুষ সাজিয়া বেড়াইয়াছেন; তখন লোকে ইঁহাকে জানিত "কর্ণেল বার্কার" বলিয়া। শুধু কি তাই? "কর্ণেল সাহেব" আবার একটী মেয়েকে বিবাহ পর্য্যন্ত না করিয়া ছাড়েন নাই। সেদিন খবরের কাগজে দেখা গেল যে মিথ্যা পরিচয়ে শপথ লওয়ার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে একটী মামলা আনা হইয়াছে—সেই মামলায় এই এত বড় জাঁদরেল "কর্ণেলটী" একেবারে "মেয়েদের" মত ফুপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন।

## নামের বহর

লোকের নাম অনেক সময়ে খুব লম্বা শুনা যায় কেননা ইচ্ছা করিলেই যে কেউ সে রকম নাম রাখিতে পারে। কিন্তু জায়গার নাম সম্বন্ধে তো আর সে কথা খাটে না! সেদিন কিন্তু বিলাতের পার্লামেন্টে ওয়েল্‌স্ প্রদেশের একটি সহরের নাম নিয়া বেশ একটু হাসাহাসি হইয়া গিয়াছে। উচ্চারণ করিতে গিয়া অনেক হোমড়া-চোমড়াই ঘায়েল হইয়াছেন। দেখ দেখি

তোমরা উচ্চারণটা ঠিক মত করিতে পার কিনা। নামটী হইতেছে Llanfairpwllgwyngillgogerchwyrndrobullllandysiliogogogoch. একজন সভ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছেন মাটী টেলিগ্রামে একটী কথা ধরা হইবে কি না? ডাক-বিভাগের কর্ত্তা তাহার উত্তরে জানাইয়াছেন, হাঁ হইবে।

## নিস্তব্ধ ঘর

বৈজ্ঞানিকদের কতকগুলি পরীক্ষা আছে যা নিতান্ত নিস্তব্ধ ঘর না হইলে আদৌ হয় না। পরীক্ষার সময়ে সামান্য একটু গোলমাল হইলেই সব মাটী হইয়া যাইবে। এই রকম পরীক্ষা করার জন্য হল্যাণ্ডের একজন অধ্যাপক এক তোফা ঘর তৈরি করিয়া ফেলিয়াছেন। সে ঘরের বাহিরে ডাকাতই পড়ুক, আর বোমাই ফাটুক, ভিতরে টুঁ শব্দটীও হইবে না।

## চোরের দাবী

সেখ ইসমাইল নামে একটী লোককে ৪৫ বার জেল খাটার পর এবার আবার খালি ঘুরিয়া বেড়াইবার অপরাধে কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হইয়াছিল। এতবার কে জেলে যাইতে পারিয়াছে? লোকটা গতবার এই কৃতিত্বের জন্য মেডাল্ দাবী করিয়া বসিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, কেহই তাহার জন্য মেডাল গড়াইল না। এবার সে অপরাধ স্বীকার করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিল, "হুজুর, জেলে ত আমাকে অনেক বারই পাঠাইয়াছেন, এবার না হয় ছাড়িয়াই দিন।" বেরসিক ম্যাজিষ্ট্রেট লোকটার আবদার রাখেন নাই, আবার তিন মাসের জন্য শ্রীঘরের ব্যবস্থা হইয়াছে।

---

## চিত্র পরিচয়ঃ—

বাল্যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার পিতার সহিত কলিকাতায় আসিতেছিলেন। পথে মাইল ষ্টোন দেখিয়া এগুলি কি, পিতার নিকট বুঝিয়া লইলেন। তার পর ১৯ হইতে ১০ এর মাইলষ্টোন পর্য্যন্ত আসিয়া ইংরাজী এক হইতে দশ পর্য্যন্ত সব অঙ্ক শিখিয়া ফেলিলেন। পিতা ঠাকুরদাস পুত্রকে পরীক্ষার জন্য পর পর অঙ্ক না দেখাইয়া ৬ এর অঙ্ক চাপা দিয়া ৭ এর পরে একেবারে ৫ এর অঙ্ক দেখাইলেন—কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র ঠিক ঠিক বলিয়াছিলেন। চিত্রে ঈশ্বরচন্দ্র মাইলষ্টোন জিনিষটা কি তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

---

# গতমাসের ধাঁধার উত্তর

১

ক

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | প | | |
| | ক | র | রী | |
| প | র | দি | ব | স |
| | বী | ব | র | |
| | | স | | |

খ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | গ | | |
| | গ | ন্ধ | ক | |
| গ | ন্ধ | মা | দ | ন |
| | ক | দ | লী | |
| | | ন | | |

২

কমল——কমলা।

---

# উত্তর দাতাদিগের নাম

## যাঁহারা ৩টী ধাঁধারই নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন :—

কৃষ্ণ, কুঞ্জ, কমল ও লাবণ্য (ইটালী, কলিকাতা), সুনন্দা ভৌমিক (রংপুর), হিমাংশুকুমার নিয়োগী (জলপাইগুড়ী), শিশিরকুমার রায় (বসিরহাট), সাধনাপ্রসাদ দাসগুপ্ত (দমদমা), মুকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (সিরাজগঞ্জ), 'বয়েজ ওন লাইব্রেরী'র সভ্যবৃন্দ (সাটীরপাড়া), লক্ষ্মীময়ী সেন (সাওগাঁ), মধ্য বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমস্থ ঋষিবিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (জয়দেবপুর, ঢাকা), রেণুকা দেবী (পাটনা); দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় (পাটনা), সেরাজল আবেদিন (শ্যামাডাঙ্গা), তোফা ও বজলুল (গাইবাঁধা), সুধা কণা সেন (ডিব্রুগড়), জ্যোতিরিন্দ্র (বাজিতপুর), পীযূষকুমার সেন (হেনজাদা, বর্ম্মা), কালিদাস সান্যাল (বেনারস), নগেন্দ্র চন্দ্র বণিক্ (কামালপুর), শিবপদ সেনগুপ্ত (বাইশরশি, ফরিদপুর), 'ফয়জন্নেছা বালিকাবিদ্যালয়ে'র ছাত্রীবৃন্দ (কুমিল্লা), শান্তিপ্রসাদ নাগ (গাইবাঁধা), খগেন, সুরেশ ও দীনেন (কলিকাতা), কুমুদবিহারী ঘোষ (ধুবড়ী), বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (রায়গড়, মধ্যপ্রদেশ), ব্রজগোপাল রায় (রায়গড়, মধ্যপ্রদেশ), বৃন্দাবন চক উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ (মেদিনীপুর), বীরেন্দ্রনাথ বসু (জলপাইগুড়ী), বেঙ্গল প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রবৃন্দ (মান্দালয় বর্ম্মা), প্রিয়দাস বড়ুয়া (আকিয়াব বর্ম্মা), মনীষা সেন (গৌহাটী), গৌরীশঙ্কর মিত্র (খুলনা), মাখনলাল অধিকারী (কিশোরগঞ্জ), রণেন্দ্রমোহন রায় (কিশোরগঞ্জ), চিত্তরঞ্জন ও অদ্বৈতচন্দ্র বর্ম্মণ (ত্রিপুরা), যোগেশচন্দ্র সাহা (নরসিংহদী), হরিদাস বণিক্ (কামালপুর), দ্বিজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (মুর্শিদাবাদ), সুষমা সুন্দরী দেব (সিলেট)।

## যাঁহারা ২টী ধাঁধার নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন :—

পুসু, নিরু ও অজু (ডাল্টনগঞ্জ), বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় (বালী), অমিয়কুমার বসাট (পাটনা),

'বয়েজ ইউনিয়ন ক্লাবে'র সভ্যগণ ( বগুরা ), শম্ভুনাথ দত্ত ( ফণীন্দ্র দেব ইন্‌ষ্টিটিউসন্‌, জলপাইগুড়ী ), অশোক-কুমার দাস ( কলিকাতা ), কমলচন্দ্র সরকার ( ডায়মণ্ড হারবার ), সরোজমোহন চট্টোপাধ্যায় ( এলাহাবাদ ), গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ( কলিকাতা ), অমরেশচন্দ্র বসু ( হাওড়া ), সুশীলচন্দ্র সাহা ( ত্রিপুরা ), 'বীণাপাণি লাইব্রেরীর সভ্যগণ ( মৈমনসিংহ ), প্রতুলচন্দ্র ঘোষ ( রাইগঞ্জ, দিনাজপুর ), পারিজাত রেণু দেবী ( মহিমাগঞ্জ ) কিরণ্ময় দাসগুপ্ত ( চট্টগ্রাম ), বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী ( চট্টগ্রাম ), 'ধামরাই যশোমাধব সাহিত্য সঙ্ঘে'র সভ্যবৃন্দ ( ধামরাই, ঢাকা ), 'তিলৈ পাঠমন্দিরে'র সভ্যগণ (ফরিদপুর), সদানন্দ সাহা শোভারাণী সাহা (মেদিনীপুর ), নির্ম্মলেন্দু সর্ব্বাধিকারী ( ভবানীপুর ), সুধাংশুকুমার দত্ত ( জব্বলপুর ), লক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী ( শ্রীরামপুর ), পুলিনবিহারী ও নীলিমাকুমারী বিশ্বাস ( কলিকাতা ), সুধামাধব ঘোষ ( জামালপুর )।

## যিনি ১টী ধাঁধার নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন ঃ—

কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় ( লাহোর )।

---

## নূতন ধাঁধা

১। ভাই-বোন বলিতে ত্রিসংসারে আমার কেহই নাই, অথচ এমনই আশ্চর্য্য, এ ছেলেটীর বাবা হইতেছেন আমারই পিতার পুত্র! এও কি সম্ভব হইতে পারে? তোমরা কি বল?

২। (ক) ১৫টা কাঠীকে ১নং ছবির মত সাজাও, তারপর তাহা হইতে এরকম ভাবে ৩টী কাঠী উঠাইয়া লও যাহাতে ঠিক ৩টী সমচতুষ্কোণ বাকী থাকে।

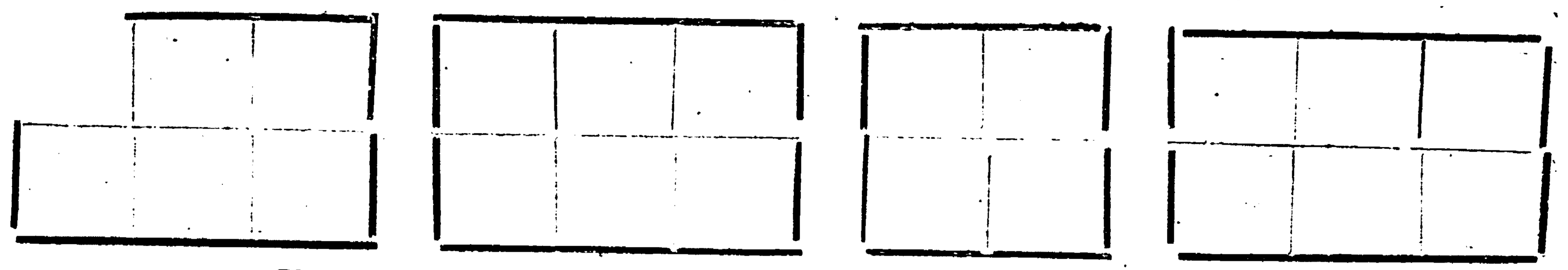

১ নং ২ নং ৩ নং ৪ নং

(খ) ১৭টা কাঠীকে ৩নং ছবির মত সাজাও, তারপর তাহা হইতে এরকম ভাবে পাঁচটী কাঠী তুলিয়া লইয়া যাও যাহাতে ঠিক ৩টী সমচতুষ্কোণ বাকী থাকে।

(গ) ১২টা কাঠীকে ৩নং ছবির মত সাজাইয়া তাহা হইতে এরকম ভাবে ৫টী কাঠী তুলিয়া লও যাহাতে ঠিক ৩টী সমচতুষ্কোণ বাকী থাকে।

(ঘ) টেবিলের উপর ১৭টী কাঠী ৪নং ছবির মত সাজাইয়া, তাহা হইতে এরকম ভাবে ছয়টী কাঠী তুলিয়া লও, যাহাতে টেবিলের উপর ২টী সমচতুষ্কোণ পড়িয়া থাকে।

---

চিত্রে বিদ্যাসাগর জীবনী—৪

"কশুরে যৈ"

শিল্পী—শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত ] [ চিত্র পরিচয় দেখ

INTENTIONAL

২য় বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬ { ৫ম সংখ্যা

## অশথের আতিথ্য

( শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ )

ঊর্দ্ধে তপন ছিটায় বহ্নি—
    কি ভীষণ খর দৃষ্টি—
অনিল, তাপেতে অনল হইয়া,
    গ্রাসিবারে চাহে সৃষ্টি।
তপ্তপাংশু-পথেতে চলেছি,
    সারা দেহে ঝরে ঘর্ম্ম,
পল্লীর মাঠে মরুর দৃশ্য—
    এ কোন্ বিধির কর্ম্ম !

শ্রান্ত-ক্লান্ত চলেনা চরণ,
ছায়া নাই, ছায়া নাই গো—
ফাঁফর হরিণ, মরীচিকা পানে
শুধু প্রাণপণে ধাই গো।
সহসা অদূরে হেরিনু একি এ—
নয়ন জুড়ানো বর্ণ,
সোণালী, শ্যামল সুকোমলকচি
একি বিচিত্র পর্ণ।

মাঠের মাঝারে কে দাতা দিয়েছে
এমন মধুর সত্র ?
কোকিল-কণ্ঠে ডাকিল আমারে
হস্তে ব্যজন-পত্র।
মৌনী বাবার মৌন-আদরে
ভকতি জাগিল বক্ষে,
কৃতজ্ঞতায় নয়নের নীর
দেখা দিল মোর চক্ষে।

মানসে উদিল—বহুদিন আগে
লছমন-ঝোলা তীর্থে
পাষাণ-ভূমির পাষাণ-পথেতে
বেলা হয়েছিল ফির্‌তে।
আদরে আমায় সন্ন্যাসী তার
শৈল কুটীরে ডাক্‌লো,
দিল মোরে পরমান্ন-প্রসাদ,
অমৃতের মত লাগ্‌লো।



মরুর এ তরু তাঁহারি মতন
স্নেহ-মমতায় পূর্ণ,
হৃদিহীন বলে যে ভ্রম আছিল
আজি তাহা হল চূর্ণ।
বিটপীরা নহে শুধু প্রাণময়,
প্রেমময় তারা সত্য,
করুণাময়ের করুণা আমারে
জানালো আজি এ তথ্য।

---

# চন্দ্রগুপ্ত

## ( ১ )

"কি কচ্ছ, ঠাকুর ?"

"আরে দেখ্‌ছ না, এই কুশগুলো কি বেয়াদব, আমার পা'টাকে আর রাখে নি, কত হুল ফুটিয়ে দিয়েছে; এদের দফা শেষ করব, তবে আমি বিষ্ণুগুপ্ত।"

"বেশ, বেশ, কাজটা শেষ করুন, তার পর আমার সঙ্গে কথা হবে।"

চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার গুরু চাণক্যের প্রথম দিন দেখার সময় এই রকমের একটা কথাবার্ত্তা হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। চাণক্যের আদত নাম বিষ্ণুগুপ্ত, চণকের পুত্র বলিয়া তিনি চাণক্য, আর তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের বাড়ীতে ধানে ভরা কলসী জমা করিয়া রাখা হইত বলিয়া তিনি কৌটিল্য।*

যতদূর জানা যায় বিষ্ণুগুপ্তের আদত বাড়ী ছিল পঞ্জাবে তক্ষশিলায়। তিনি লোকটী ছিলেন বেজায় পণ্ডিত, আর তাঁর মনে ছিল বেজায় তেজ। বুদ্ধির ত কূলকিনারাই ছিল না। যেদিকে রোখ্ চড়িত সে দিকে যেমন করিয়া হউক—অন্যের পক্ষে অসম্ভব হইলেও—কাজ হাঁসিল না করিয়া তিনি ছাড়িতেন না। তবে

* কুট শব্দের অর্থ কলস, তাহা হইতে কৌটিল্য।

তাঁহার চেহারাটা মোটেই সুন্দর ছিল না। পাশের ছবিটী দেখিতেছ ? তিনি লোক ছিলেন কতকটা এই রকমের। মগধদেশ (এখনকার বেহার প্রদেশের দক্ষিণভাগ) ছিল তখন ভারতবর্ষের মধ্যে সেরা জায়গা, আর মগধের পাটলিপুত্র নগর (এখনকার পাটনা) ছিল তখন ভারতবর্ষে সব চেয়ে বড় রাজধানী। এখন কলিকাতার যে গৌরব তখন ছিল তাহা পাটলিপুত্রের। তোমরা পশ্চিমে গিয়া থাকিলে বোধ হয় শোণ নদের উপরকার প্রকাণ্ড পুল দেখিয়াছ। এই শোণ এখন পাটনার অনেক পশ্চিমে গিয়া গঙ্গায় মিশিয়াছে, কিন্তু তখন পাটলিপুত্রের নীচেই শোণ আসিয়া গঙ্গায় গা ঢালিয়া দিত। কাজেই বাণিজ্যের খুব সুবিধা ছিল। একে বাণিজ্যের জায়গা, তাহার উপর বড় রাজধানী। নানা জায়গার লোক দলে দলে আসিয়া এখানে জমিত আর সহরটীকে গুলজার করিয়া তুলিত। চাণক্য পণ্ডিতও পঞ্জাব হইতে আসিয়া পাটলিপুত্রে যুটিয়াছিলেন। প্রবাদ, পাটলিপুত্রের আশে পাশে কোন জায়গায় কুশে পা বিঁধিয়া যাওয়ায় ঠাকুর একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া পড়িয়াছিলেন আর কুশের বেয়াদবির প্রতিফল দিবার জন্য শিকড় শুদ্ধ উপড়াইয়া আগুন লাগাইয়া দিতেছিলেন—এই অবস্থায় চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তাঁহার দেখা।

তিনি লোক ছিলেন কতকটা এই রকমের

(২)

এই চন্দ্রগুপ্ত কে ? যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন নন্দবংশ পাটলি-



পুত্রের রাজা। মহাপদ্ম নন্দ নামে খুব বড় এক রাজার বাপ ছিল ক্ষত্রিয় আর মা ছিল জাতিতে শূদ্র। ইঁহাকে শূদ্র বলিয়াই ধরা হইত আর (সেই রাগেই বোধ হয়) ইনি দ্বিতীয় পরশুরামের মত ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে যতদূর সাধ্য নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছিলেন। বীরত্বে ইঁহাকে কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। ইঁহার নয় পুত্র নবনন্দ নামে প্রসিদ্ধ। এই নবনন্দের কোন এক নন্দের আমলে চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব। চন্দ্রগুপ্তের জন্ম ও বংশ সম্বন্ধে নানা রকমের প্রবাদ আছে, কোন মতে তিনি নন্দবংশীয় কোন রাজার মুরা নামে শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীর পেটের সন্তান, কোন মতে মুরা তাঁহার মায়ের নাম নয়, ঠাকুরমার নাম। মুরার নাম হইতেই নাকি চন্দ্রগুপ্তের বংশকে মৌর্য্যবংশ বলে। বৌদ্ধদিগের পুঁথিতে কিন্তু পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে চিত্রলের কাছে মোরীয় বা মৌর্য্য নামক স্থান চন্দ্রগুপ্তের আদত দেশ। তাঁহার বাপ ছিলেন সে দেশের রাজা, সেখানেই চন্দ্রগুপ্তের জন্ম। আবার অন্যমতে মৌর্য্য তাঁহার বাপের দেশ হইলেও, নিজের জন্ম পাটলিপুত্রে—তাঁহার পিতা যুদ্ধে মারা পড়ায় তাঁহার মাতা গর্ভাবস্থায় পাটলিপুত্রে চলিয়া আসেন। সকল মত বিবেচনা করিলে এবং চন্দ্রগুপ্তের জীবনের সকল কথা ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, তিনি আদতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লোক, তবে মগধের নন্দরাজবংশের সহিত তাঁহার কোন রকম সম্পর্ক ছিল এবং বাল্যকাল হইতে তিনি মগধে ছিলেন।

(৩)

চাণক্যের সহিত যখন পরিচয় তখন চন্দ্রগুপ্তের বয়স অল্প। কদাকার চাণক্যকে তাঁহার এত পছন্দ হইল কেন ? চন্দ্রগুপ্ত নন্দরাজ-সরকারে কাজকর্ম্ম করিতেন কিন্তু কোন কারণে রাজা তাঁহার উপর চটিয়া যান।

যাঁহারা চন্দ্রগুপ্তকে মুরার পৌত্র বলেন তাঁহাদের মতে চন্দ্রগুপ্তের ভাই ছিল অনেকগুলি। নন্দ রাজা সবকটী ভাইকে এবং চন্দ্রগুপ্তের বাপকে কারাগারে রাখিয়া কষ্ট দেন, তাহার ফলে চন্দ্রগুপ্ত ছাড়া আর সকলেরই ভবলীলা শেষ হইয়া যায়। এই সময় লঙ্কার রাজা লোহার খাঁচার মধ্যে এক কৃত্রিম সিংহকে

পূরিয়া নন্দ রাজার নিকট পাঠাইয়া দেন। সিংহটী ছিল চেহারায় ভীষণ এবং দেখিতে ঠিক যেন খাঁটি সিংহ। লঙ্কার রাজা বলিয়া পাঠান, লোহার শিক না সরাইয়া সিংহকে বাহির করা চাই। কেহই তাহা পারিল না, কেহই ব্যাপারটা বুঝিল না। তখন চন্দ্রগুপ্তের তলব হইল। কারাগার হইতে আনিয়া তাঁহাকে খাঁচার নিকট দাঁড় করান হইল। চন্দ্রগুপ্তের ধারাল বুদ্ধি, তিনি বুঝিলেন—সিংহটী আদতে মোমের। তিনি কাঠিতে আগুন ধরাইয়া সিংহের নিকট উপস্থিত করিলেন, মোমের সিংহও গলিয়া গেল, খাঁচা কাটার প্রয়োজন হইল না। চন্দ্রগুপ্তের নাম পড়িয়া গেল—রাজারও হিংসা বাড়িয়া গেল। রাজার চেষ্টা থাকিল কেমন করিয়া চন্দ্রগুপ্তের সর্ব্বনাশ করা যায়। চন্দ্রগুপ্তও রাজার সর্ব্বনাশ-সাধনের মতলবে থাকিলেন।

এই গল্পের মধ্যে সত্য থাকুক বা নাই থাকুক, চন্দ্রগুপ্ত যে নন্দ রাজার বিষ-দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। তাই চাণক্যের মত একজন উগ্রপ্রকৃতি বুদ্ধিমান্ মন্ত্রীর দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। চাণক্য আলাপপরিচয়ের পর চন্দ্রগুপ্তকে নিজের শিষ্য করিয়া লইলেন।

চাণক্যের নিজেরও নন্দ রাজার উপর রাগের কারণ ছিল। প্রবাদ, একদিন ঠাকুর রাজবাড়ী আহার করিতে গিয়া খুব ভাল আসনে বসিয়াছিলেন। তাঁহার কুৎসিত চেহারা দেখিয়া এবং ভিতরে যে কত গুণ তাহা বুঝিতে না পারিয়া নন্দরাজ তাঁহাকে জোর করিয়া আসন হইতে উঠাইয়া দেন। চাণক্য রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া আসেন এবং মাথার টিকিটী খুলিয়া ফেলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন, যে পর্য্যন্ত নন্দবংশ-ধ্বংস না হইবে সে পর্য্যন্ত আর টিকি বাঁধিবেন না।

চন্দ্রগুপ্তের প্রাণের ভয়, চাণক্যের প্রতিহিংসা—দুইজনে বেশ মিলিয়া গেলেন।

( ৪ )

ইহার পরই রাজ্যলাভের চেষ্টা। চাণক্য নানা উপায়ে টাকাকড়ি জমাইতে লাগিলেন, চন্দ্রগুপ্ত বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দিগ্বিজয়ী বীর আলেক্‌জান্দারের



শিবিরে পৌঁছিলেন। প্রবাদ, একদিন চন্দ্রগুপ্ত বনের মধ্যে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার শরীর হইতে ঘাম ছুটিতেছে এমন সময়ে এক প্রকাণ্ড সিংহ আসিয়া সেই ঘাম চাটিতে লাগিল। ক্রমে চন্দ্রগুপ্ত জাগিয়া উঠিলেন, সিংহও আস্তে আস্তে সরিয়া গেল, তাঁহার কোন রকমের অনিষ্ট করিল না। চন্দ্রগুপ্ত বুঝিলেন, যখন সিংহ তাঁহার সহিত এমন ব্যবহার করে তখন নিশ্চয়ই তাঁহার রাজ্যলাভ ঘটিবে। কেহ বড় হইয়া পড়িলে তাঁহার সম্বন্ধে এরকম প্রবাদ প্রায়ই রটে।

চন্দ্রগুপ্তের বোধ হয় ইচ্ছা ছিল, আলেক্‌জান্দার মগধরাজ্য আক্রমণ করিয়া দেশটাকে লণ্ডভণ্ড করিয়া দেন। কিন্তু সে ইচ্ছামত কাজ হইল না। আলেক্‌-জান্দারের সৈন্য পঞ্জাব ছাড়িয়া আর পূর্ব্বদিকে আসিতে স্বীকার করিল না। আলেক্‌জান্দার পঞ্জাব জয় করিয়াছিলেন, তিনি তাহার শাসনের বন্দোবস্ত করিয়া পারস্যের দিকে সরিয়া পড়িলেন।

( ৫ )

ইহার অল্পদিন পরেই আলেক্‌জান্দার মারা যান। তিনি যাহাদের উপর দেশ-শাসনের ভার দিয়া গিয়াছিলেন তাহারা পঞ্জাব ঠিক রাখিতে পারিল না। কেহ কেহ ঘাতকের হস্তে মারা গেল। চন্দ্রগুপ্ত দেখিলেন পঞ্জাবকে গ্রীক্‌দের হাত হইতে ছাড়াইয়া আবার স্বাধীন করার এই সুযোগ। তিনি দলবল যোটাইয়া গ্রীক্‌দিগকে তাড়া করিলেন। গ্রীকেরা সে তাড়া সহ্য করিতে পারিল না। পঞ্জাব—ঠিক স্বাধীন না হউক—চন্দ্রগুপ্তের অধীন হইল।

( ৬ )

চন্দ্রগুপ্তের সৈন্য যুটিল অনেক, আর অনেক রকমের। মন্ত্রী চাণক্য আর সৈন্য ভীষণ—তাঁহাকে তখন পায় কে? সীমান্ত-প্রদেশের পার্ব্বত্য সৈন্য, শক, যবন, পারসী প্রভৃতি চন্দ্রগুপ্তের দলে যোগ দিল। চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত মগধে গিয়া নন্দ রাজার সহিত লড়াই বাধাইয়া দিলেন—উদ্দেশ্য একদিকে শত্রুতা-সাধন, অন্য-দিকে রাজ্যলাভ। একদিকে চাণক্যের ক্ষুরধার বুদ্ধি, অন্যদিকে চন্দ্রগুপ্তের বিপুল

বীরত্ব ও সৈন্যবল—নন্দ রাজা কাবু হইয়া পড়িলেন। অনেক মারামারি কাটাকাটির পর মগধ চন্দ্রগুপ্তের হাতে আসিল। নন্দবংশ লোপ পাইল। চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রেই রাজধানী করিলেন কিন্তু তাঁহার বিক্রমে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত, দাক্ষিণাত্যেরও কতকটা পায়ে লুটাইয়া পড়িল। তাঁহার সৈন্যবল কি যেমন তেমন ছিল? বিদেশী লেখকদিগের বই হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল ৩০০০০, হাতী ৯০০০, পদাতিক ৬ লক্ষ, আর যুদ্ধরথ অনেক। ভারতবর্ষের কোন রাজার সাধ্য ছিল না যে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়ায়। এদিকে বাংলাদেশ ওদিকে গুজরাট-কাঠিয়াড়—এদিকে সমুদ্র, ওদিকে সমুদ্র—চন্দ্রগুপ্তের জয়জয়কারে ভরিয়া গেল।

( ৭ )

ভারতবর্ষে কেহ মাথা তুলিতে পারিল না কিন্তু তাঁহার সহিত পাল্লা লড়িতে আসিল বাহিরের লোক। আলেক্‌জান্দারের মৃত্যুর পর অনেক রক্তারক্তির মধ্য দিয়া তাঁহার সেনাপতি সেলিউকস্ পশ্চিম এসিয়ার সম্রাট হইয়া পড়িলেন। ভূমধ্যসাগর হইতে ভারতবর্ষের সীমানা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ তাঁহার দখলে আসিল। সেলিউকসের তখন মনে হইল, পঞ্জাবটা গ্রীক্‌দের হাত-ছাড়া হইয়া গিয়াছে, উহা আবার হাতে আনিতে হইবে। বিপুল সৈন্য লইয়া তিনি সিন্ধুনদ পার হইলেন। কিন্তু আলেক্‌জান্দার যখন দিগ্বিজয়ে আসিয়াছিলেন তখন দেশে ছিল ছোট খাট অনেক রাজ্য, আর রাজারা ছিলেন—কে কার গলায় ছোরা বসাইবেন সেই চিন্তায়—মগ্ন। এবার চন্দ্রগুপ্ত আর্য্যাবর্ত্তের একচ্ছত্র সম্রাট্। তিনি গ্রীক্ বীরকে দেখাইয়া দিলেন, ভারতবাসীও ইউরোপের দর্প চূর্ণ করিতে পারে। চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে সেলিউকস্‌কে লেজ গুটাইতে হইল। পঞ্জাব ত ছাড়িতে হইলই, বাড়ার ভাগ তাঁহার নিজের রাজ্যের অনেকটা—এখন যেটা আফ্‌গানদের দেশ—দিয়া তবে চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি করিতে হইল। এখন যেখানে কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট সে সমস্ত সেলিউকসের হাত হইতে ছুটিয়া চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের মধ্যে আসিল। তাঁহার রাজ্যের সীমা হইল হিন্দুকুশ পর্ব্বত। মুসলমান বা ইংরাজ আমলেও কেহ



ভারত-সাম্রাজ্যের সীমা এতদূর ঠেলিয়া লইয়া যাইতে পারেন নাই। চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধির ফলে সেলিউকস্ ৫০০ হাতী উপহার পাইলেন। দুই রাজার মধ্যে কুটুম্বিতাও হইয়া গেল।

সেলিউকস্

( ৮ )

যাঁহার সৈন্যমধ্যে ৯০০০ হাতী ছিল তাঁহার পক্ষে ৫০০ হাতী কুটুম্বকে দান বিশেষ কিছুই নয়। কিন্তু কুটুম্বিতাটা একটু ভাবিবার বিষয়। কুটুম্বিতার খবর অবশ্য আমরা পাই গ্রীক্ লেখকদিগের নিকট হইতে। এদেশের লেখকেরা আষাঢ়ে গল্প ছাড়া খুব কম কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। অনেকেই মনে করেন এই কুটুম্বিতার অর্থ চন্দ্রগুপ্তকে সেলিউকসের কন্যা-দান*। সেটা অনুমান মাত্র, অনুমানটা ঠিক নাও হইতে পাবে। চন্দ্রগুপ্তকে কন্যাদানই হউক কি অন্য বিবাহ-বন্ধনই হউক তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। ২২।২৩ শত বৎসর পূর্ব্বে যখন পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সভ্য দুইটী জাতির—গ্রীক্ ও হিন্দুর—মধ্যে, হিন্দুর যুদ্ধে জয়লাভের পর কুটুম্বিতা হইতেছে দেখা যায় তখন হিন্দুসন্তানের বুক গর্ব্বে আপনা হইতেই ফুলিয়া উঠে। আর একটা কথা এখানে দেখা যাইতেছে—হিন্দু ও অহিন্দুর মধ্যে বিবাহ। কিন্তু যে সময়ের কথা তখন হিন্দু

* মিঃ ডি, এল, রায় তাঁহার নাটকে সেলিউকসের কন্যার একটা নামও দিয়াছেন কিন্তু নাটক ইতিহাস নহে।

ও গ্রীক দুই জাতিই দেবদেবীর পূজক। রাজারা এসব বিষয়ে জাতি সম্বন্ধে খুব কড়াকড় বান্ধুনীর মধ্যে কখনই থাকিতেন না। চন্দ্রগুপ্ত যে আবার খাঁটি ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহাও নহে, সেকালে অনেক বীরজাতি রাজ্য লাভ করিয়া ক্ষত্রিয় হইয়া পড়িত—চন্দ্রগুপ্তও সেই শ্রেণীর। তাঁহার এক স্ত্রী বৈশ্যকন্যা ছিল এমন একটা কথাও আছে।

( ৯ )

চন্দ্রগুপ্ত ২৪।২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর এত কাণ্ড-কারখানা করিয়া যে রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা তৃণের মত ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন ধর্ম্মসাধনায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তিনি খাঁটি ক্ষত্রিয় ছিলেন না। ক্রমে জৈন ধর্ম্মের উপর তাঁহার টান আসে। তিনি এক জৈন মহাপুরুষের সঙ্গে সাধুবেশে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং তাঁহার মৃত্যু হয় তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্যের বাহিরে মহীশূর দেশে। তিনি রাজ্য ছাড়িয়া গেলে রাজা হয় তাঁহার পুত্র বিন্দুসার। চন্দ্রগুপ্তের বয়স তখন ৫৪ বৎসরের কাছাকাছি।

( ১০ )

চন্দ্রগুপ্তের সময়ে আমাদের দেশের অবস্থা কেমন ছিল একটু বলি। তখন অবশ্য রেলগাড়ী বা টেলিগ্রাফ ছিল না, কিন্তু ঘোড়া হাতীর চল ছিল খুব, রাজাদের রথও ছিল যথেষ্ট। রাজ্যশাসনের জন্য সাম্রাজ্যের স্থানে স্থানে রাজার প্রতিনিধি থাকিতেন। রাজতন্ত্র প্রণালীতেই শাসনকার্য্য চলিত, প্রজাতন্ত্র প্রণালীতে নয়; আর, চন্দ্রগুপ্তের শাসনও ছিল খুব কড়া। অনেক সময়ে লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিয়া তিনি প্রজাদিগকে ঠিক রাখিতেন। চুরী খুব কম হইত, মিথ্যা কথা লোকে কহিত না বলিলেই হয়।* চন্দ্রগুপ্তও তাঁহার বিপুল সৈন্যকে নিয়মিতভাবে বেতন দিয়া কার্য্যক্ষম রাখিতেন। সেজন্য নানা রকমের কর সংগ্রহ করিতে হইত। জমীতে যাহা উৎপন্ন হইত তাহার চারিভাগের এক ভাগের দাম, বাজারে যাহা বিক্রী

* সেলিউকসের দুত মেগাস্থিনিস্ পাটলিপুত্রে আসিয়া তখনকার কথা লিখিয়া গিয়াছিলেন। সেই বিবরণের কিছু কিছু এখন পাওয়া যায়।



হইত তাহার দামের মোটের উপর দশ ভাগের এক ভাগ রাজার প্রাপ্য ছিল। চাষালোক চাষই করিত, তাহাদিগকে দিয়া সৈন্যের কাজ করান হইত না। চাষ-বাস যাহাতে ভাল হয় তাহার জন্য জমীতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা রাজসরকার হইতে করা হইত। সুদূর কাঠিয়াড় প্রদেশে এই উদ্দেশ্যে চন্দ্রগুপ্তের আমলে 'সুদর্শন' নামে একটী সুন্দর হ্রদের সৃষ্টি হয়। রাস্তাঘাট মেরামত করিয়া ভাল ভাবে রাখার চেষ্টা ছিল। একালে যেমন রাস্তার ধারে পাথর বসাইয়া দূরত্ব ঠিক করার নিয়ম আছে চন্দ্রগুপ্তের আমলেও তাহা ছিল। লেখাপড়ার চল ছিল। লেখা হইত গাছের ছালে অথবা কাপাসের কাপড়ের উপর। ব্রাহ্মণদের সম্মান ছিল।

রাজার জাঁকজমক ছিল খুব। সোণার পাত্র, নানা রকমের কাজকরা বসিবার আসন, মণিমুক্তা বসান ঝক্‌মকে কাপড় ইত্যাদি রাজদরবারে খুব বেশী পরিমাণে দেখা যাইত। রাজা সোণার পাল্কীতে চড়িতেন, নানা রকমের জরীর কাজ করা ঝল্‌মলে পাত্‌লা কাপড়ে পাল্কী সাজান হইত। রাজধানীর চারিদিক মোটা কাঠের প্রাচীরে ঘেরা ছিল। রাজবাড়ীর ঘর দরজায় কাঠের ব্যবহার বেশী থাকিলেও সোণার কাজ করা থাম, সোণার লতা, রূপার পাখী ইত্যাদি দিয়া খুব বাহার করিয়া তাহা সাজান হইত। ধনুর্ব্বাণ হাতে করিয়া মেয়ে লোকেরা পাহারা দিত। রাজা শিকার ভাল বাসিতেন আর শিকারে যাওয়ার সময় ধূমধামও হইত খুব। সৈন্যেরা ঢাল, তরোয়াল, ধনুর্ব্বাণ, বল্লম ইত্যাদি দিয়া যুদ্ধ করিত। ধনুক গুলি ছিল খুব বড় বড়। পাটলিপুত্র নগরের কাজ কর্ম্মের বন্দোবস্তের জন্য ৩০ জন সভ্য লইয়া একটী সমিতি ছিল। কারিকরদিগের কাজ ও বেতন ঠিক করা, বিদেশী লোকের উপর লক্ষ্য রাখা ও তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখা, বাণিজ্যের নিয়ম বাঁধা, ওজন ঠিক রাখা, বিক্রয়ের উপর মাশুল আদায় করা ইত্যাদি ছিল এই সমিতির কাজ। জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আমলে এ দেশে নূতন হয় নাই। যীশুখৃষ্টের জন্মের ৩০০ বৎসর আগে চন্দ্রগুপ্তের আমলেও উহা ছিল।

# পদ্মরাগ

( অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম-এ )

[ পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর ]

## ১১

## ঠাকুর-চরিত

সন্ধ্যার সময় দীপেন শুষ্কমুখে কুমারেশকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সারাটা দিনই থাকিয়া থাকিয়া আজ যে সন্দেহ তাহার মনের মধ্যে উঁকি দিতেছিল, শেষটায় দেখা গেল তাহাই ঠিক, সমস্তটা দিন কেবল মাত্র আলেয়ার পেছনে ছুটাই তাহাদের সার হইয়াছে। ট্রেন থামাইয়া সমস্ত গাড়ীগুলি তাহারা গরু খোঁজা করিয়া ছাড়িয়াছে, কিন্তু কোথাও সে লোকটির সাক্ষাৎ মেলে নাই। অবশ্য জোর করিয়া কিছুই বলা যায় না, হয়তো বা উহার মধ্যেই ছদ্মবেশে সে কোথাও রহিয়া থাকিবে, কিন্তু সে ছদ্মবেশ ধরা যে মানুষের সাধ্য অন্ততঃ দীপেন তাহা বিশ্বাস করিতে রাজী নয়।

সারা দিনের পরিশ্রম ও উৎকণ্ঠায় দীপেনের ভুঁড়িটা যেন একেবারে চুপসিয়া গিয়াছিল। কাজেই বাড়ী ফিরিতেই যখন সে শুনিল, দিবেন তাহার খোঁড়া পা লইয়াই মোটরে রণজিতের বাড়ীর উদ্দেশে রওয়ানা হইয়াছে, তখন আর অনর্থক জিজ্ঞাসাবাদের অভিরুচি তাহার আদবেই রহিল না। সাদাসিধে কারণটাই তাহার মনে আসিল—নিশ্চয়ই দাদা তাহার টেলিগ্রামের কথা শুনিয়া মনের উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য দমাইয়া রাখিতে পারে নাই, সরাসর রণজিতের নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আসলে যে ব্যাপার কতখানি গড়াইয়াছে তখন পর্য্যন্ত তাহা সে বেচারার কল্পনারও অতীত!

গরম গরম টাট্‌কা-ভাজা এক ডিস্ কুচো নিম্‌কি ও এক কাপ্ চায়ের ফরমাস করিয়া দীপেন তাহার ঘরের ইজি চেয়ারটা টানিয়া শুইয়া পড়িতে আপনা হইতেই তাহার মুখ দিয়া একটা আরামের নিঃশ্বাস বাহির হইয়া গেল—আঃ। সন্ধ্যা তখন ঘোর হইয়া আসিয়াছে, আকাশে একটির পর একটি তারার বাতি জ্বলিয়া উঠিতেছে আর সমস্তটা ঘরের ভিতর ফুরফুরে দক্ষিণা বাতাস নাচিয়া বেড়াইতেছে। আরামে দীপেনের চক্ষু বুজিয়া আসিতে চাহিল।



কিন্তু তখনই চট্ করিয়া একটা কথা তার মনে পড়িয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে এত আয়েসের আরাম-কেদারা ছাড়িয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কয়েকদিন হইতেই শ্রীমন্ত বাড়ীর ভিতর একটু আধটু হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইতেছিল, আজ ভোর হইতে সে বায়না ধরিয়াছে, একবার বাড়ীর বাহিরে বেড়াইতে যাইবে। নহিলে এতদিন ধরিয়া ঘরে আবদ্ধ থাকিতে কি মানুষে পারে? উত্তরে দীপেন বলিয়াছিল বেলা চারিটার সময় ডাক্তারের আসার কথা আছে, যদি তিনি অনুমতি দেন তো তখন সে কথা দেখা যাইবে।

নিরিবিলিতে কথাটা এখন আবার মনে আসিতেই উঠিয়া সে নীচে এক তালায় শ্রীমন্তের সেই শোয়ার ঘরটাতে গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু যে লোক এতদিন পরে আজ আবার চন্দ্র সূর্য্যের মুখ দেখিবে, গ্রীষ্ম-কালের সন্ধ্যা বেলায় তাহাকে ঘরে পাইবার আশা করিয়া দীপেন যে প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছিল, শীঘই তাহা সে টের পাইল—শ্রীমন্ত বাড়ী নাই! ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কিন্তু সত্যিকার আশ্চর্য্য সে বোধ করিল হঠাৎ 'গণেশমহল্লা'র দিকে নজর পড়িতে। গণেশমহল্লা বলিতে তোমরা যেন আবার কাশীর গণেশমহল্লা মনে করিয়া বসিও না,—এ সে নয়। শ্রীমন্তের ঘরের পাশের কুঠুরিটা ছিল গণেশ ঠাকুরের থাকার জন্য নির্দ্দিষ্ট, এবং গণেশ ঠাকুরের

খিল লাগাইয়া বন্ধকরা কেন?

মহল বলিয়া বাড়ীর লোকে ঠাট্টা করিয়া তাহার নাম দিয়াছিল গণেশমহল্লা। কিন্তু সে যাই হউক, এমন অসময়ে ঠাকুরের ঘর ভিতর হইতে খিল লাগাইয়া বন্ধ করা

কেন? দীপেন কৌতূহল বোধ করিল, আস্তে আস্তে দরজায় সে কয়েকটা ঘা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে কেমন একটা ঘড়্ ঘড়্ শব্দ আসিতে লাগিল—কিন্তু সে কেবল মিনিট দুয়েকের জন্য; তারপর সব চুপ! চাপা গম্ভীর গলায় ভিতর হইতে প্রশ্ন আসিল—"কে? দাঁড়াও, খুল্‌ছি।"

দরজা খুলিতেই দীপেন দেখিল গণেশ ঠাকুর, ঠাকুর দেখিল ছোট বাবু। সন্ধ্যা তখন এতটা গাঢ় হইয়া আসিয়াছে যে বিনা আলোতে মানুষের মুখের ভাব আর নজরে আসে না। আসিলে দীপেন নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিত যে ভূত দেখিলে মানুষ যেমন আড়ষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে দেখিয়া গণেশ ঠাকুরেরও প্রায় সেই দশাই ঘটিয়াছে।

"ব্যাপারখানা কি, এ সময়ে ঘরের ভেতর চারদিক্‌কার জান্‌লা কপাট বন্ধ করে চুপ্‌চাপ্ বসে যে?" দীপেন জিজ্ঞাসা করিল।

জবাবে গণেশ আর কি বলিবে, কথাটা নানারূপে এড়াইবার চেষ্টা করা ছাড়া?

"শ্রীমন্ত কোথায়, বল্‌তে পার?"

যাক্; কথাটা তবে চাপা পড়িয়া গেল—গণেশ ঠাকুর হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সোৎসাহে জবাব দিল, "আর কি শ্রীমন্তকে কেউ এখন ঠেকিয়ে রাখতে পারে? বিকেলে ডাক্তার এসে যেই বলেছে, বেরোতে পার, অমনি লখাকে সাথে করে বেরিয়ে পড়েছে।"

হাতের ঘড়িটার প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দীপেন বলিল, "আচ্ছা, আমি খাবার তৈরী করতে বলে এসেছি, তুমি গিয়ে বরং দেখ তার কতদূর কি হলো। দেরী করবার সময় আমার খুব বেশী নেই, কতগুলি জরুরী কাজ আছে।"

দীপেন দৃষ্টির বাহির হইতেই গণেশ ঠাকুর এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া আবার দরজায় খিল লাগাইল। তক্তপোষের নীচে আবার সেই ঘড় ঘড় শব্দ, এবং সে শব্দ থামিতেই তক্তপোষের সহিত কুস্তি সারা করিয়া যে লোকটী বাহির হইয়া আসিল, তাহাকে একটু আগে দীপেন্দ্র দেখিলে যে কী তুমুল কাণ্ড হইত তাহা আমি ভাবিতেই পারি না। খোঁড়ার অভিনয় করিতে যাহার জুড়ি মেলা ভার, সামান্য একটু চাল চালিয়া রণজিৎকে যে ঘোল খাওয়াইয়া ছাড়িয়াছিল, যার লাঠির আঘাতে দিবেন সেদিন পর্য্যন্ত শয্যাশায়ী ছিল, তক্তপোষের তলা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন স্বয়ং সেই কীর্ত্তিমান্ পুরুষ!

গণেশ ঠাকুরের কপাল দিয়া দর্‌দর্ ধারায় ঘাম ঝরিতেছিল, মুছিতে মুছিতে সে বলিল



"উঃ, ধরা পড়েছিলাম আর কি ছোটবাবুর কাছে। আর কিন্তু এখানে আসা আপনার চল্‌বে না, গোঁসাই মশায়।"

"হুঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু আরও যে অনেক কথা বল্‌বার ছিল।"

"না, না, এখানে আর সে সব চল্‌বে না। বড় দিঘীর কালী মন্দিরেই বরং আমি যাবো। আচ্ছা, আপনি তবে আসুন এখন গোঁসাই মশায়!"

১২

## অদৃশ্য-আলোক

খাটুয়া ষ্টেশনটী খুব বড় নয়, তাহাতে আবার রাত্রি তখন এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। কাজেই যাত্রীর ভিড় ষ্টেশনে নাই বলিলেই চলে। হিন্দুস্থানী ষ্টেশনমাষ্টার ধুতির উপর ওয়েষ্টকোট্ পরিয়া ও ফোঁটা-তিলক কাটা মাথায় তেল-চিট্‌চিটে কোম্পানীর টুপিটী আঁটিয়া গাড়ী 'পাশ' করিতে ছিলেন। যাত্রী যে কয়জন তা প্রায় সবই দেশী লোক, তবে ভিন্নদেশী লোক যে একেবারেই নাই, একথা বলা চলে না। দু'জন মান্দ্রাজী ভদ্রলোক, এক জন মারাঠী ব্রাহ্মণ, এক জন পাঞ্জাবী মুসলমান—যাত্রীদের মধ্যে এরাও ছিল।

ষ্টেশনের পেছনেই একটা প্রকাণ্ড ফাঁকা মাঠ। সেই মাঠটীকে মাঝে রাখিয়া উত্তর দক্ষিণ দিক্ দিয়া দুইটী রাস্তা ঘুরিয়া সহরতলীর দিকে চলিয়া গিয়াছে। দক্ষিণের রাস্তাটা দিয়াই কিন্তু সহর-তলীতে যাতায়াত করা সুবিধাজনক, এবং প্রায় সকলেই সেই রাস্তা ধরিয়া বাহির হইয়াছে। উত্তর দিকের রাস্তাটী নিরিবিলি, সে রাস্তায় গিয়াছে মাত্র দুইটী লোক—মারাঠী ব্রাহ্মণটী ও পাঞ্জাবী মুসলমানটী। প্রথম প্রথম তাহারা তফাৎ তফাৎই যাইতেছিল, কিন্তু যেই ষ্টেশনের পাকা বাড়ীটী দৃষ্টির আড়াল হইল, অমনি দুইজনে একত্র মিলিয়া পাকা রাস্তা ছাড়িয়া মাঠে আসিয়া পৌঁছিল। খানিকটা আগাইতেই দেখা গেল, ষ্টেশনের সেই মান্দ্রাজী ভদ্রলোক দুইটীও এদিক্ পানেই আসিতেছেন। দুই দল আসিয়া মিলিতেই, ব্রাহ্মণ মুসলমানটীকে বলিল, "বিমল, তুমি যাও, এখনো দোকান-পাট নিশ্চয়ই বন্ধ হয়নি, দেখ যদি কিছু চিঁড়ে আর গুড়ের সন্ধান কর্‌তে পার। কাল কতক্ষণে খালাস পাব কে জানে? সময় কিন্তু বেশী পাবে না,—কুড়ি মিনিট্। এখন বেজেছে এগারটা পনেরো। পাকা পাঁচ পাঁচটী মাইল আমাদেরকে জোরে হাঁট্‌তে হবে। একটার মধ্যে ধা—জঙ্গলে পৌঁছান আমাদের চাই-ই। যাও, তুমি আর একটী সেকেণ্ড্‌ও নষ্ট করো না। আমরা ততক্ষণে পোষাক টোষাক পরে তৈরি হয়ে নি!"

মৃগাঙ্ক বলিল, "হ্যাঁ উদয় দা, আর এ কাছাশূন্য মান্দ্রাজী কাপড় পরে থাকা চলে না, মনে হয় এই বুঝি সব শুদ্ধ খুলে পড়্‌লো।"

উদয়েন্দু কহিল, "কিন্তু কি করা, বল? ও ছাড়া কি আর কোন উপায় ছিল? এটাতো বুঝতেই পারছ যে, যে কাজে সবাই বেরিয়েছি সেটা কিছু ভয়ানক পুণ্যের কাজ নয়, এবং ধরা পড়্‌লে পুলিশ বা পাব্‌লিক কেউই যে খুব আদর আপ্যায়িত করবে, তাও মনে হয় না। কাজেই একটু আগু-পেছু না দেখে কি চলা যায়? ধর, যদি আমরা চার বীরপুরুষ একেবারে মিলিটারি চালে এসে খাটুয়ার মত ছোট ষ্টেশনে নামতাম, তো জিনিষটা কতদূর গড়াতে পারতো ভাব দেখি! ধা—জঙ্গলের ব্যাপারটা আজ না হোক্ কাল এ অঞ্চলের সবাই জানতে পারবেই। জঙ্গলের সব চাইতে কাছেকার ষ্টেশন হচ্ছে এই খাটুয়া। এখানকার ষ্টেশনমাষ্টার যদি তখন দয়া করে জানান যে চারটি বীরপুরুষ এখানে নেবেছিলেন, তখন পুলিশের কাজটা কতখানি সোজা হ'য়ে যাবে ভাব দেখিনি! কিন্তু সে গুড়ে বালি! এই জন্যে আর আমি একসাথে খাটুয়ার চারখানা টিকিট পর্য্যন্ত করলাম না। ভাল কথা, শাবলটা কার স্যুটকেসে, সতীশের না বিমলের?"

মৃগাঙ্ক বলিল "শাবল সতীশের কাছে, আর দা'দুটো আমার কাছে।"

"বেশ, তোমরা এখন চট্‌পট্ পোষাক পরে নাও।"

ধা—জঙ্গলের দিকে সবাই প্রায় মাইল দেড়েক অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় এক অভাবনীয় কাণ্ডে সকলে অভিভূত হইয়া পড়িল। পেছন দিকে কোথা হইতে যেন এক অতি তীব্র আলোক মুহূর্ত্তের জন্য সকলের উপর পড়িয়া সমস্ত পথ ঘাটকে দিনের মত সাদা করিয়া ফেলিল। কিন্তু সে শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্য—সঙ্গে সঙ্গে সে আলোক কোথায় মিলাইয়া গেল। আবার সেই ঘুর্‌ঘুট্টি অন্ধকার।

উদয়েন্দু ভয়ানক বিচলিত হইয়া পড়িল—"একি! এ আলো এলো কোত্থেকে?"

তাইতো! এ আলো কোথা হইতে আসিল! সকলে চারিদিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। হঠাৎ মৃগাঙ্ক বলিয়া উঠিল, "বোঝা গেছে, বোঝা গেছে। নদী এখান থেকে খুব দূরে নয়। এ কোন ষ্টিমারের সার্চ্চ লাইট্।"

"বোধ হয় তাই হবে, সার্চ্চ লাইটের মতই অনেকটা বটে! কিন্তু যাই হোক, সাবধান।"

সময় সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত উদয়েন্দুর কোন দিন এতটুকু এদিক্ ওদিক্ হয় নাই, আজও হইল না। পৌণে একটার মধ্যেই সকলে ধা—জঙ্গলে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রকাণ্ড জঙ্গল,



হিংস্র জন্তুও কিছু কম নাই। কিন্তু মানুষ এমনি জীব যে ইহার ভিতর দিয়াও যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে—সের শা'র আমলের রাস্তা, আজ কাল যাকে বলা হয় গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোড্ তাহা ইহার ভিতর দিয়াই চলিয়া গিয়াছে।

রাস্তার ধারে বসিয়া উদয়েন্দু বলিল, "সাজ সরঞ্জাম সব আগে ঠিক্ ঠাক্ করে নাও। দেখো, ডালটা যেন বেশ মোটাসোটা হয়।"

দেখিতে দেখিতে রাত্রি দু'টা বাজিয়া গেল। দূর হইতে একটা ক্ষীণ বাঁশীর আওয়াজ বাতাসে ভাসিয়া এদিকে আসিতেছিল, সে আওয়াজ শুনিয়া সকলেই যেন কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। উদয়েন্দু সন্দিগ্ধ স্বরে কহিল, "সেকি? এত তাড়াতাড়িই?" কিন্তু শব্দ যে একটা আসিতেছিল, তাহাতে আর কোন ভুল নাই। আর সে শব্দও যেন ক্রমেই কাছে আসিতেছে। সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। উদয়েন্দু বলিল, "বি রেডি।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে ইলেকট্রিক্ হর্ণ টিপিয়া হুহু শব্দে একখানা মোটর গাড়ী তাহাদের সাম্‌নে আসিয়া পড়িল। দৃঢ়কণ্ঠে উদয়েন্দু হাঁকিল—"কাকে চাই?"

গাড়ীর ভিতর হইতে উত্তর আসিল, "উদয়েন্দু?"

সকলে সরিয়া গেল, গাড়ী তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া, ধীরে ধীরে একটু আগাইয়া সামনে মোড় ফিরিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গেই উদয়েন্দুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "বিমল এইবার।" বিদ্যুতের বেগে বিমল রাস্তার এপাশ হইতে ওপাশে চলিয়া গেল ও চাপাস্বরে কহিল, "সব ঠিক্, উদয়দা।" চারিজন যুবকই তখন গাছপালার আড়ালে গিয়া লুকাইয়া পড়িল।

কয়েক মিনিট্ যাইতে না যাইতেই সকলে দেখিল, উন্মত্ত ঝড়ের মত আর একখানা মোটর এদিকে ছুটিয়া আসিতেছে। হায়রে বেচারা রণজিৎ! এই তিনশো মাইল পথ সে অবিশ্রান্ত 'ডাকাতে' মোটরখানাকে তাড়া করিয়া এতদূরে লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে তো জানেনা, এইমাত্র বিমল রাস্তা জুড়িয়া কি ভীষণ ফাঁদ পাতিয়া গেল—সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে তাহার চোখেই আসিল না যে এক মাথা গাছের গুঁড়ির সহিত বাঁধা ও আর এক মাথা খুঁটির সহিত আঁটা উদয়েন্দুর সেই "রামকাছি" তাহার মোটরের সহিত কোলাকুলি করার জন্য দানবের মত দু'হাত বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে তো জানেনা যে তাহার তাড়া খাইয়া আগের গাড়ীখানা হইতে কখন কে নামিয়া, উদয়েন্দুর সহিত সাঙ্কেতিক ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে।

নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া রণজিৎকে এ পর্য্যন্ত আসিতে হইয়াছে। প্রথমতঃ,

৩১

আগের গাড়ীখানাকে খালি চোখে প্রায়ই দেখা যায় নাই, দূরবীণ দিয়া ঠাহর করিতে হইয়াছে। তার পর, তার সঙ্গের তৃতীয় লোকটী সমসেরপুর ছাড়াইতেই কয়েকটা ওজোর-আপত্তির দোহাই দিয়া নামিয়া গিয়াছে, কাজেই কাহাকেও যে নামাইয়া একবার পুলিশে খবর দিবে, তাহার পর্য্যন্ত উপায়টী ছিল না। কিন্তু সব চাইতে মুস্কিলের কথা হইতেছে এই যে, রাজবাড়ী উজাড় করিয়া যতগুলি পেট্রোলের টিন সে আনিয়াছিল তা প্রায় সবই নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। এখন শুধু গাড়ীর গতির উপর নির্ভর। যদি বাকী তেলটুকুও ফুরাইয়া যায়, তাহা হইলেই

সাজ-সরঞ্জাম

কাজ সারিয়াছে—নিকটে যে দশ মাইলের মধ্যে আর কোথাও তেল মিলিবে, সে আশা নাই। কিন্তু কী আশ্চর্য্য ? আগের ও গাড়ীখানার তেল কি অফুরন্ত ?

…এই, এই,—ব্যস্! কাছিতে বাধিয়া রণজিতের মোটর রাস্তার উপর ডিগ্‌বাজী খাইয়া একেবারেই উল্‌টাইয়া পড়িল।

উদয়েন্দু এক লাফে আগাইয়া আসিয়া রণজিৎকে একেবারে কোলে তুলিয়া লইল। দেখিল—কপাল কাটিয়া দরদর ধারায় রক্ত ছুটিতেছে—জ্ঞান নাই। ড্রাইভারও সংজ্ঞাহীন হইয়া রাস্তার পাশে পড়িয়া আছে।



নিজের রুমাল দিয়া তাড়াতাড়ি রণজিতের মাথাটা বাঁধিতে বাঁধিতে উদয়েন্দু যেন আপনার মনেই বলিল, "কি করি, কোন উপায় নেই, সবশুদ্ধ জেলে পচ্‌তে হত, নইলে তোমার মত বীরের সাথে এরকম কাপুরুষের মত ব্যবহার উদয়েন্দুর জীবনে এই প্রথম। বিমল, ড্রাইভারকে তোল, এদেরকে মোটরে করে নিয়ে যেতে হবে।"

কিন্তু হঠাৎ সেই মুহূর্ত্তে সমস্ত বনভূমি কাঁপিয়া উঠিল। সকলে চাহিয়া দেখে, মশাল জ্বালিয়া প্রায় পঞ্চাশ ষাট্ জন লোক তীরের মত বেগে তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। চক্ষুর নিমেষে উদয়েন্দু ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "সার্চ্চ লাইটের মানে এবার বোঝা গেল—মৃগাঙ্ক শীগ্‌গির আগের মোটরে উঠে পড়—ষ্টার্ট দিতে বল।"

"কেন উদয়দা, আসুক না কে আস্‌বে ? সঙ্গে পিস্তল রয়েছে—মাথা ছাতু করে দেব না ?"

"পাগল ? ওদের হাতে রাইফেল আছে। দূর থেকে কুকুরের মত গুলি করে মারবে।" হাফ্‌প্যাণ্টের পকেট হইতে খান কয়েক নোট বাহির করিয়া রণজিতের পকেটে রাখিয়া দিয়া আবার আপনার মনে সে বলিল, "পাল্লাম না, ভাই, নিয়ে যেতে। যদি ওরা মানুষ হয়, তবে এই টাকা নিয়েই থাম্‌বে, এ অবস্থায় আর তোমাকে নিগ্রহ কর্‌বে না।"

মিনিট কয়েকের মধ্যেই আগেকার গাড়ীখানায় সকলে উঠিয়া পড়িল ও গাড়ী চলিতে সুরু করিল। ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তেই সকলে সভয়ে দেখিল—গাড়ীর পাশ দিয়া শাঁ শাঁ করিয়া কয়েকটা বন্দুকের গুলি উড়িয়া যাইতেছে। (ক্রমশঃ)

---

# রসায়নে যুগান্তর

( শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য )

এক টুক্‌রা কয়লা আগুনের মধ্যে ধরিলাম, খানিক পরে দেখা গেল কয়লা রং বদলাইয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। যদি জিজ্ঞাসা করি, "বলত, কি হইল ?" তোমরা হাসিয়া জবাব দিবে "কি আর হবে, কয়লাটা পুড়ে গেল"। বেশ সহজ উত্তর সন্দেহ নাই, কিন্তু পোড়া ব্যাপারটা আসলে কি তাহাই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি। তোমরা তখন হাসি বন্ধ করিয়া ভাবিতে বসিবে,—তাই ত কয়লাটার বাস্তবিকই কি যে হইল সেটা ত ঠিক বোঝা যাইতেছে না।

ঠিক এই সমস্যাটা লইয়া বড় বড় হোমড়া চোমড়া পণ্ডিতরাও এক সময় রীতিমত মাথা ঘামাইতেন, কিন্তু কিছুই কুল কিনারা করিতে পারিতেন না।

এমনি করিয়া দিন যায়। তারপর একদিন—সেও প্রায় আড়াইশ বছর আগেকার কথা—ষ্টাল নামে এক মস্ত পণ্ডিত ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা করিয়া ফেলিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নানা পরীক্ষার পর তাঁহার মাথায় এক অদ্ভুত ধারণা আসিল। তিনি বলিলেন—যে সব জিনিষ পোড়ান' যায় তার সবগুলির মধ্যেই ফ্লজিষ্টন বলিয়া একটা জিনিষ আছে। যখনই আমরা কোন জিনিষ আগুনে পোড়াই তখন তাহার মধ্য হইতে এই ফ্লজিষ্টন জিনিষটা বাহির হইয়া গিয়া আশে পাশের বাতাসের সাথে মিশিয়া যায়, আর ফ্লজিষ্টন উড়িয়া গেলে যাহা পড়িয়া থাকে তাহাই হইতেছে ছাই। ফ্লজিষ্টন জিনিষটাকে কিন্তু চোখে দেখা যায় না।

ব্যাখ্যাটা লোকের বড় ভাল লাগিয়া গেল, ফলে ষ্টালের বিস্তর ভক্তও জুটিয়া গেল, বিশেষতঃ এই ধারণার সাহায্যে অনেক খুঁটিনাটী ব্যাপারেরও দিব্যি ব্যাখ্যা করা চলিল। ধর—মোমবাতি এমনি বাতাসের মধ্যে দিব্যি জ্বলিতে থাকে কিন্তু এমন একটা জায়গায় লইয়া যাও যেখানে বাতাস নাই বলিলেই চলে, দেখিবে মোমবাতি নিভিয়া যাইতেছে। কেন? না অল্প বাতাসে বেশী ফ্লজিষ্টন মিশিতে পারিতেছে না, কাজেই ফ্লজিষ্টন বাহির হইতে না পারায় মোমবাতি নিভিয়া যাইতেছে। সুন্দর কথা, নয় কি? আবার ধর আমরা যে নিঃশ্বাস লই সেটা কি? ফ্লজিষ্টন-পন্থীরা বলিলেন—সেও এক রকম "পোড়া।" নিঃশ্বাস টানিয়া বাতাস ছাড়িয়া দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ফ্লজিষ্টন বাহির হইয়া আশে পাশের বাতাসে গিয়া মিশিল। কিন্তু এমন একটা জায়গায় যাও যেখানে বাতাস নাই· বাতাস না থাকিলে ফ্লজিষ্টন কিসের সাথে মিশিবে? কাজেই ফ্লজিষ্টনও বাহির হইতে পারিবে না—নিঃশ্বাসও বন্ধ হইয়া যাইবে।

এই ধরণের আরও কত ব্যাপার, যাহার কারণ এতদিন কিছুই বোঝা যাইত.



না, সব জলের মত সহজ হইয়া গেল। এর পর কি আর কেউ ফ্লজিষ্টনের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারে?

কিন্তু একজন করিল, প্রায় শ'খানেক বছর পরে। এই লোকটি আর কেউ নয়—ইঁহার নাম এণ্টনি লরেণ্ট লাভয়সিয়র। ইঁহার কথাই আজ তোমাদের বলিব।

লাভয়সিয়রের বাড়ী ছিল ফ্রান্সে। বড় বংশে তিনি জন্মিয়াছিলেন, আর অল্প বয়স হইতেই বিজ্ঞানের দিকে তাঁহার ঝোঁক্‌টা একটু বেশী রকম ছিল।

ঠিক লাভয়সিয়রের সময় আরও কয়েকজন মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন—শিলি, প্রিষ্টলি ও ক্যাভেণ্ডিশ।

প্রিষ্টলি

লাভয়সিয়র, শিলি ও প্রিষ্টলি বাতাস লইয়া নানা রকম পরীক্ষা করিতেন। পরীক্ষা করিতে করিতে একদিন জানা গেল যে, বাতাসে দুই রকম জিনিষ আছে। এই দুইটার মধ্যে একটা আছে বাতাসের ৪ ভাগ জুড়িয়া, আর একটা মাত্র ১ ভাগ। কিন্তু ঐ এক ভাগ জিনিষটাই বেশী কাজের। আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে এই ১ ভাগ অংশটাই টানিয়া লই! ইহাকেই আমরা বলি অক্সিজেন। অন্য ভাগটাকে বলা হয় নাইট্রোজেন। অক্সিজেনের গুণ সম্বন্ধে কি রকম পরীক্ষা করা হইল

শুনিবে ? একটা বোতলে খানিকটা নাইট্রোজেন ভরিয়া তাহার মধ্যে কতকগুলি ইঁদুর ও পোকা মাকড় ছাড়িয়া দেওয়া হইল—আর দেওয়া হইল তাহাদের জন্য কিছু খাবার। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল না, জন্তুগুলি সবই মরিয়া গেল। অথচ ঠিক অমনি ভাবে নাইট্রোজেনের বদলে অক্সিজেনের মধ্যে রাখিয়া দেখা গেল, সেগুলি বেশ ফূর্ত্তিতে আছে।

অক্সিজেন গ্যাস্‌টা আবিষ্কার করিলেন প্রিস্টলি, কিন্তু তাহা দিয়া কাণ্ডটা যাহা করিবার তাহা করিলেন লাভয়সিয়র। ফ্লজিষ্টনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রিস্টলির কোন রকম সন্দেহ ছিল না, তিনি ভাবিতেন অক্সিজেনটা আর কিছুই না, বাতাস হইতে ফ্লজিষ্টনটুকু সরাইয়া ফেলিলে যাহা থাকে তাই। তিনি ইহার নাম দিলেন "ফ্লজিষ্টন-হীন বাতাস"।

লাভয়সিয়রের কিন্তু ফ্লজিষ্টনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তিনি বলিতেন, "চোখে না দেখিয়া কি করিয়া বিশ্বাস করি রে বাপু ?" অক্সিজেন লইয়া তিনি নানা রকম পরীক্ষা জুড়িয়া দিলেন।

ইতি মধ্যে ক্যাভেণ্ডিশ এক মস্ত কাণ্ড করিয়া বসিলেন। তখনকার লোকে জানিত—জল মাটী, আগুন, বাতাস এগুলি এক একটা মৌলিক জিনিষ। বাতাস ত' এক নয় জানা গেল। ক্যাভেণ্ডিশ দেখাইলেন জলটাও আসলে এক জিনিষ নয়। ২ রকম গ্যাস ( হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন ) মিলিয়া জল হয়। ফ্লজিষ্টন-পন্থীরা এরও একটা ব্যাখ্যা করিল বটে, কিন্তু এই আবিষ্কারের ফলে লাভয়সিয়র যেন একটা নূতন দিক দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সন্দেহ বদ্ধমূল হইল।

লাভয়সিয়র তখন ভাবিলেন—আচ্ছা, পোড়া মানে যদি ফ্লজিষ্টন্ বাহির হইয়া যাওয়াই হয়, তবে কোন জিনিষ পোড়াইলে তাহার ওজনটা নিশ্চয়ই আগের চেয়ে কম হইবে।

তিনি তখন একটা চারিদিক বন্ধ-করা পাত্র লইলেন, পাত্রটার একদিকে শুধু একটা লম্বা বাঁকান চোঙ্গা রহিল। চোঙ্গার মুখটা রহিল নীচের দিকে আর সেদিক্‌টায় তিনি বাতাস আটকাইয়া জড় করিবার একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন।



পাত্রটার ওজন জানা রহিল। তার পর তিনি খানিকটা পারা ওজন করিয়া সেই বন্ধ-করা পাত্রে পূরিয়া দিলেন। তারপর ১২ দিন ধরিয়া পাত্রটা জ্বলন্ত চুল্লীর উপর বসাইয়া রাখিলেন।

১২ দিন পরে দেখা গেল পারা পুড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার ওজন কমা দূরে থাক, ওজন গিয়াছে বাড়িয়া। আরও মজা—বদ্ধ পাত্রে যে বাতাসটুকু পড়িয়া আছে তাহা হইতেছে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন-টুকু নাই। শুধু তাই নয়, বাতাসের ওজন আগের চাইতে যতটা কমিয়া গিয়াছে (অর্থাৎ অক্সিজেনের ওজনটুকু) পারার ওজন ঠিক ততটা বাড়িয়া গিয়াছে।

ক্যাভেণ্ডিশ

লাভয়সিয়র তখন চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ফ্লজিষ্টনজিনিষটা একেবারে গাঁজাখুরী, ফ্লজিষ্টন বলিয়া কিছু নাই, কোন দিন ছিলও না, "পোড়া" কথাটার আসল মানে হইতেছে, বাতাসের অক্সিজেনের সাথে মিশিয়া যাওয়া। লাভয়সিয়র দেখাইলেন অক্সিজেন না থাকিলে কোন জিনিষই পুড়িতে পারে না ; কয়লা যে পোড়ে তার মানে হইতেছে কয়লার মধ্যে যে কার্ব্বন বলিয়া

অংশটুকু আছে তাহাই বাতাসের অক্সিজেনের সাথে মিশিয়া গিয়া এক রকম গ্যাস তৈরী হয়। গ্যাসটা উড়িয়া যায়, আর বাকী যাহা পড়িয়া থাকে তাহাই ছাই। পারার বেলাও তাই হইয়াছিল—পারা অক্সিজেনের সাথে মিশিয়া গিয়াছিল।

লাভয়সিয়র বিজ্ঞানের জগতে এক নূতন পথ খুলিয়া দিলেন। যে সব জিনিষের এত দিন ফ্লজিষ্টন দিয়া অদ্ভুত ব্যাখ্যা হইত সব তিনি নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন, আর সে সব হাতে নাতে পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন। যে সব জিনিষ ফ্লজিষ্টন দিয়া বুঝান যাইত না, পণ্ডিতরা গোঁজামিল দিয়া চালাইতেন তাহাও লাভয়সিয়রের নূতন আবিষ্কারের সাহায্যে জলের মত সহজ হইয়া গেল।

পরীক্ষাগারে লাভয়সিয়র ও সে যুগের একজন বড় বৈজ্ঞানিক বার্থোলেট (ডান দিকে লাভয়সিয়ার)

বিজ্ঞানের ধারা একেবারে বদলাইয়া গেল। সমস্ত পুরাণো ধারণা উল্টাইয়া গেল, সব ভাঙ্গিয়া চূরিয়া নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিল। এত বড় যুগান্তর বিজ্ঞানের ইতিহাসে খুব কমই হইয়াছে।

লাভয়সিয়ার নিত্য নূতন আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। লোকে তাঁহাকে



নব্য রসায়নের জন্মদাতা (Father of modern chemistry) বলিয়া মানিয়া লইল।

লাভয়সিয়রের জীবনের কথা তোমাদের বিশেষ কিছু বলি নাই, এইবার একটু বলিব। লাভয়সিয়র ছিলেন বড় ঘরের ছেলে, বিজ্ঞান ছাড়া তিনি আর একটা জিনিষ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেন। তাহা হইতেছে রাজনীতি। সেই সময় ফ্রান্সে একটা সমিতি ছিল। সমিতির কাজ ছিল নানারকমে কর আদায় করিয়া রাজকোষ বাড়ান। লাভয়সিয়রকে এই সমিতির একজন সভ্য করা হইয়াছিল। লাভয়সিয়র লোক হিসাবে ছিলেন খুবই ভাল, কিন্তু এই সমিতির সভ্য ছিলেন বলিয়া অনেকে তাঁহাকে দেখিতে পারিত না।

ইহার কিছু দিন পরে ফ্রান্সে বিপ্লব জাগিয়া উঠিল। সেই ফরাসী-বিপ্লবের গল্প তোমরা অনেকেই হয়ত শুনিয়াছ। বিপ্লবীরা রাজসরকারের যত লোক সকলকে ধরিয়া হত্যা করিতে লাগিল; শেষে তাহারা লাভয়সিয়রকেও ধরিল।

লাভয়সিয়র তখন সমস্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের এক জন,—তাঁহার নামে ফ্রান্সের গৌরব, কিন্তু বিপ্লবীরা সে কথা শুনিল না। লাভয়সিয়রের বয়স তখন ৫১ বৎসর। পৃথিবীকে তিনি আরও কত জিনিষ দিয়া যাইতে পারেন; এত বড় মাথাওয়ালা লোককে কি হত্যা করা উচিত? সমস্ত শিক্ষিত জগৎ না না করিয়া উঠিল। কিন্তু বিপ্লবীদের তখন খুনের নেশা চাপিয়াছে, তাহারা উত্তর দিল—ফ্রান্স চায় স্বাধীনতা—দেশের শত্রু নিপাত,—বৈজ্ঞানিক দিয়া তাহার কোনও দরকার নাই।

ঘাতকের শাণিত অস্ত্রে লাভয়সিয়রের মাথা লুটাইয়া পড়িল। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ হারাণটা যে কত বড় ক্ষতি লোকে তাহা বুঝিল না।

লাভয়সিয়রের হত্যার কথা যখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল তখন ল্যাগ্রাঞ্জ নামে সে যুগের এক জন খুব নামজাদা লোক কি বলিয়াছিলেন জান? "লাভয়সিয়রের মাথা কাটিয়া ফেলিতে মাত্র ১ সেকেণ্ড সময় লাগিয়াছে, কিন্তু অমন আর একটা মাথা তৈরী হইতে আরও ক'শ বছর যে লাগিবে কে বলিতে পারে?"

---

# উচিত সাজা

(১)

রাজা দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছেন। যেখানে যান সোণা, রূপা, ধন-রত্ন যাহা পান দুই হাতে লুটিয়া লন। আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকদের চাল চলন, হাবভাব সব খুঁটিয়া খুঁটিয়া জানিয়া লইতেও ছাড়েন না।

রাজ্যের পর রাজ্য ছাড়াইয়া রাজা শেষে এক পাহাড়ে ঘেরা দেশে আসিয়া পড়িলেন। আসিয়াই বুঝিলেন দেশটা একটু অন্য রকমের। আশে পাশের আর কোন রাজ্যের সাথে দেশটার বড় একটা পরিচয় আছে বলিয়া মনে হইল না; আর দেশের লোকগুলিও কেমন যেন একটু অদ্ভুত রকমের। রাজা এ পর্য্যন্ত যত রাজ্যে গিয়াছেন সব জায়গায়ই এক দৃশ্য দেখা গিয়াছে;—রাজার আসাটাকে কেহই তেমন সহজ ভাবে নেয় নাই। দেশ জুড়িয়া তাড়াহুড়া পড়িয়া গিয়াছে, কেউ আসিয়া প্রাণপণে বাধা দিয়াছে—কেউ বেগতিক দেখিয়া পালাইয়াছে, টাকা পয়সা যার যা ছিল যতটা পারিয়াছে লুকাইয়া ফেলিয়াছে; এমনিতর সব।

এখানে কিন্তু সে রকম কোনও তাড়া হুড়ার পরিচয় পাওয়া গেল না, লোক জন যেমন শান্তভাবে দিন কাটাইতেছিল তেমনি রহিল। রাজা বুঝিতে পারিলেন না, ব্যাপার খানা কি?

শিবিরে বসিয়া রাজা কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় প্রহরী আসিয়া জানাইল দেশের দু'জন লোক দেখা করিতে আসিয়াছে। রাজা তাড়াতাড়ি তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন।

লোক দুটি আসিয়া বলিল—"আপনি আসিয়াছেন, আমরা খুব খুসী হইয়াছি। আমাদের সর্দ্দার আমাদের দু'জনকে আপনার কাছে পাঠাইয়া দিলেন, তাঁর ওখানে আপনার নিমন্ত্রণ।"

রাজা ত' অবাক! আরে শত্রু আসিয়াছে, তাহাকে তাড়াইবার জন্য ব্যস্ত



হইবে এই ত' জানি বাপু—তা'না তাহাকে আবার নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান! এমন ত' কোন দিন শুনি নাই। যাই হোক্ ব্যাপারটা দেখিতে হইতেছে।" রাজা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

(২)

দেশের সর্দ্দার রাজাকে যতটা আপ্যায়িত করিবার তাহা করিল, ভাবখানা এই অতিথি ত' নয় যেন দেবতা। তার পর সর্দ্দার রাজাকে লইয়া খাইবার ঘরে ঢুকিল।

বহুমূল্য পাত্রে করিয়া খাবার দেওয়া হইল। রাজা হাসিয়া খাবার তুলিতে গেলেন। কিন্তু একি! ফলগুলি যে সব সোণা দিয়া তৈরী, সোণার ফল বুঝি আবার খাওয়া যায়? রাজাকে চুপ্ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সর্দ্দার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। রাজা বলিলেন—"আপনাদের দেশে কি সকলে সোণার ফলমূল খায় নাকি?" সর্দ্দার হাসিয়া বলিল—"না আমরা কেউ সোণার ফল টল খাই না। আমরা যে সব ফলমূল খাই তাহা তো আপনার দেশেও পাওয়া যায়। কিন্তু আপনি যখন সে সব ছাড়িয়া এতটা দূরে আসিয়াছেন তখন আমরা ভাবিলাম আপনি নিশ্চয়ই অসাধারণ একটা কিছুর খোঁজেই আসিয়াছেন, তাই আপনাকে সব সোণার খাবার দিয়াছি"।

রাজা বড় ফাঁফরে পড়িয়া গেলেন, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন—"না, আমি ঠিক সেজন্য আসি নাই, আমি—আমি আপনাদের দেশের চাল চলন সম্বন্ধে জানিতে আসিয়াছি।"

সর্দ্দার বলিল, "বেশ ভাল কথা, আপনি আমার বাড়ীতে থাকুন, সব জানিতে পারিবেন।"

(৩)

পর দিন সকালে রাজা সর্দ্দারের সাথে বসিয়া আছেন, এমন সময় দুটি লোক বিচারের জন্য সর্দ্দারের কাছে আসিয়া হাজির। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল "দেখুন, এই লোকটি আমাকে খানিকটা জমী বিক্রী করিয়াছিল। আমি

সেই জমী খুঁড়িতে খুঁড়িতে এক ঘড়া মোহর পাইয়াছি। মোহর ইহাকে ফেরৎ দিতে চাই কিন্তু এ বলিতেছে যে মোহর তার নয়, আমার। আমিই বা কি করিয়া নেই বলুন দেখি, আমি ত শুধু জমীটা কিনিয়াছি, মোহর ত কিনি নাই।"

অন্য লোকটি বলিল—"দেখুন, এ লোকটিকে যখন আমি জমী বিক্রী করিয়াছি তখন জমীর মধ্যে যা আছে তাও বিক্রী করিয়াছি। কাজেই এখন আমি এ মোহর কেমন করিয়া ফেরৎ নেই, বলুন।"

সর্দ্দার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল। তার পর বলিল "তোমরা থাম, আমি সমস্যার মীমাংসা করিতেছি"।

তার পর লোক দুটীর একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "তোমার একটি ছেলে আছে, নয়"? লোকটি জবাব দিল "হাঁ"। "আর তোমার? তোমার একটি মেয়ে আছে না"? অপর লোকটি ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল। সর্দ্দার বলিল "এক কাজ কর, তোমার ছেলের সহিত এর মেয়ের বিবাহ দাও, আর মোহরের ঘড়াটা তাদের বিবাহের যৌতুক বলিয়া দাও। তাহা হইলেই সব গোল চুকিয়া যাইবে।" লোক দু'টী খুসী হইয়া চলিয়া গেল।

এই অদ্ভুত বিচার দেখিয়া রাজা তো থ' হইয়া গেলেন। সর্দ্দার বলিল "বিচারটা কি খুব অন্যায় বলিয়া মনে হইতেছে?"

রাজা বলিলেন—"মোটেই না, সে কথা নয়, আমি ভাবিতেছি—এ রকম বিচারের কথা ত' কোন দিন শুনি নাই।"

"আচ্ছা আপনাদের দেশ হইলে বিষয়টার কেমন করিয়া মীমাংসা হইত?"

রাজা ভয়ানক অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। তার পর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আপনাকে সত্যি কথাই বলিব, আমাদের দেশ হইলে কি হইত শুনিবেন?—প্রথমতঃ এমন বিচারের জন্য কেউ আসিতই না, যদি বা আসিত, তবে লোক দুটিকেই কয়েদ করা হইত, আর মোহরের ঘড়াটা রাজ-ভাণ্ডারে যাইত।"

সর্দ্দার কথাটা শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িল, "রাজ ভাণ্ডারে? সে দেশে কি সূর্য্য আলো দেয় না?"



রাজা বলিলেন "কেন দিবে না? ঠিক এখানকার মতই দেয়।"

"তবে সেখানে কি বৃষ্টি হয়?"

"কেন হইবে না?"

সর্দ্দার মুখখানাকে এমন করিল যেন এমন আশ্চর্য্যজনক কথা সে কোন দিন শুনে নাই।

রাজা ভাবিতে লাগিলেন—সূর্য্য আর মেঘের সাথে এ কথাটার এমন কি যোগ থাকিতে পারে? কিন্তু কিছুই কূল কিনারা পাইলেন না।

হঠাৎ সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"আচ্ছা, সে দেশে মাঠে ঘাটে অনেক গরু ভেড়া চরিয়া বেড়ায়, না?"

রাজা বলিলেন "হ্যাঁ, অনেক।"

"তাই বলুন" বলিয়া সর্দ্দার যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তার পর রাজাকে বলিল—"আমি ভাবিতেছিলাম যে দেশের লোকেরা এত নীচ, এত লোভী, ভগবানের আশীর্ব্বাদ রোদ আর বৃষ্টি সে দেশে কেমন করিয়া যায়। এখন বুঝিলাম সেই গরু ভেড়াগুলির জন্যই ভগবান্ তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান রোদ বৃষ্টি পাঠান।"

রাজ লজ্জায় মুখ নীচু করিলেন।

---

# মণিমুক্তার কাহিনী

( শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় )

নাম শুনিয়া হয়ত তোমরা ভাবিতেছ—মণিমুক্তার আবার কাহিনী কি? কিন্তু বাস্তবিক মণি-মুক্তারও কাহিনী আছে। সে সব কাহিনী অনেক রাজার কাহিনীর চেয়েও জমকাল—তা লিখিতে গেলে একখানা প্রকাণ্ড বই হইয়া পড়িবে। তাই তোমাদের বাছিয়া বাছিয়া মণিমুক্তা সম্বন্ধে মজার মজার কথা বলিতেছি।

প্রথমেই ধর 'ওপ্যাল' পাথরটার কথা, সেই যে চ্যাপ্টা মতন পাথরগুলি, যা তোমাদের দিদি বৌদিদিরা এত সখ করিয়া পরেন। তাঁরা জিনিষটাকে এত আদর করেন, অথচ এই কিছুদিন আগেও বেচারার কিন্তু খৃষ্টান মহলে আদবেই কদর ছিল না। কেন জান ? তাদের মধ্যে ধারণা ছিল 'ওপ্যাল' পাথর পরিলে একটা না একটা অমঙ্গল তাহাদের হইবেই। ফ্রান্সের সম্রাজ্ঞী ইউজিনের মত দামী পাথরের সখ খুব অল্প লোকেরই দেখা গিয়াছে—এমন পাথর নাই বলিলেই চলে যা তিনি গায়ে দেন নাই। কিন্তু তিনি পর্য্যন্ত কখনও 'ওপ্যালের' ধার দিয়া যান নাই।

আমাদের দেশে মণিমুক্তা সম্বন্ধে নানা রকম সংস্কার আছে। কিন্তু সাহেবরাও এবিষয়ে আমাদের চেয়ে বিশেষ কিছু কম যায় না। তাদের প্রত্যেক মাসের নামে এক একটা, কখনো বা দুইটা করিয়া পাথর আছে। ধারণা—যার যে মাসে জন্ম সে যদি সেই মাসের পাথর খানা পরে তবে তার কোন না কোন বিষয়ে খুব মঙ্গল হইবেই।

চন্দ্রকান্ত মণি সম্বন্ধেও খৃষ্টানদের ভারী একটা মজার ধারণা আছে। তাদের বিশ্বাস যদি মুখের মধ্যে ঐ মণি রাখিয়া কোন কথা মনে করিবার চেষ্টা করা যায়, তবে সে কথা নিশ্চয়ই মনে আসিবে। এই পাথর কিন্তু আমাদের কাছেও খুব পবিত্র। এই পাথরকে সব সময় গেরুয়া রংএর কাপড়ের উপর রাখা হয়। কলিকাতার যাদুঘরে কয়েকখানি চমৎকার চন্দ্রকান্ত মণি আছে।

আমাদের পুরাণে অনেক পাথরের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভারী মজার মজার সব গল্প পাওয়া যায়। পদ্মরাগের উৎপত্তিটা পুরাণের মতে কি রকম শুনিবে ? ইন্দ্র যখন দৈত্যপতিকে মারিলেন, তখন তার রক্তটা যাহাতে গিয়া পৃথিবীতে না পড়ে সেইজন্য সূর্য্যদেব আসিয়া সেই রক্ত ধরিয়া রাখিলেন। এমন সময় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন স্বয়ং লঙ্কার রাজা রাবণ। ওঃ, তাহাকে দেখিয়া সূর্য্যঠাকুরের সে কি কাঁপুনি ! তাঁহাকে কে ধরিয়া রাখে তারই ঠিক নাই, তিনি আবার ধরিয়া রাখিবেন রক্ত ! ভয়ের চোটে, তাঁহার হাতের রক্ত পড়িল গিয়া একেবারে লঙ্কার রাবণগঙ্গা নদীতে। তখন সেই নদীর দুইপারে পদ্মরাগের সৃষ্টি হইল এবং রাত্রে



সকলে অবাক্ হইয়া দেখিল সেগুলি জোনাকি পোকার মত জ্বলিতেছে। সেইরূপ নাকি দৈত্যপতির পিত্ত হইতে মরকত ও নখ হইতে পুলকমণির সৃষ্টি হয়।

প্রাচীনকালে লোকের ধারণা ছিল, মদ যদি খাইতেই হয় তবে খাওয়া উচিত স্ফটিকের পাত্রে, কেন না তাহাতে মদের মাদকতা দোষ নষ্ট হইবে আর লোকেও মাতাল হইবে না। এই জন্য তাঁহারা স্ফটিকের পানপাত্র তৈরী করাইতেন। বছর ত্রিশেক আগে যখন উইলিয়াম ক্যাক্স্‌টন পিপ্‌ সাহেব নেপালের পিপ্রাহ্বা স্তূপ খোঁড়াইতেছিলেন তখন কয়েকটা স্ফটিকের পাত্র বাহির হইয়া পড়ে। এই স্তূপটী বড় কম দিনের নয়—যীশুখৃষ্টের জন্মেরও শ'পাঁচেক বছর আগেকার। ইহার মধ্যে একটী পাত্র এখন কলিকাতার যাদুঘরে আছে। মাঝে মাঝে ভাবি স্ফটিক জিনিষটা কি এতই সস্তা ছিল ? রোমের রাণী লিভিয়ার নাকি একখানি আধমণ ওজনের স্ফটিক ছিল। মহাভারতকার ত' যুধিষ্ঠিরের গোটা সভাটাই দিলেন স্ফটিক দিয়া তৈরী করিয়া !

অবশ্য ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই কেননা সিংহলের শ্রীগিরি পর্ব্বতের চূড়ার উপর যে রাজপ্রাসাদ দেখা গিয়াছে তাহার অনেকটাই স্ফটিকের তৈয়ারী।

খুব জোর বরাত বলিতে হইবে নীলকান্ত মণির। বাইবেলে লেখা আছে স্বয়ং ভগবান্ নাকি ইহার উপর তাঁর উপদেশগুলি নিজহাতে লিখিয়া তাঁর প্রিয়পাত্র মোজেসের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। প্যারী সহরের Musee-de-Mineralogieতে (যাদুঘর) একখানা নীলকান্ত মণি আছে, তার নামটা তোমাদের প্রত্যেকেরই জানিয়া রাখা উচিত—নামটীর অর্থ হইতেছে "কাঠের হাতা নির্ম্মাতা"। কি করিয়া এ নাম হইল জান ? এ পাথরখানা প্রথমে পাইয়াছিল এক গরীব বাঙ্গালী—সে বেচারা কাঠের হাতা বিক্রী করিয়া কোন রকমে দিন গুজরান করিত। সেই হইতেই এই নাম। বেচারাকে শেষ কালে পেটের দায়ে ওখানা নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়। তারপর সেখানা ঘুরিতে ঘুরিতে একেবারে ফরাসী দেশের যাদুঘরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

নামটী অদ্ভুত বটে কিন্তু বেখাপ্পা নয়। অমন সুন্দর সুন্দর পাথরগুলি, তাদের নাম যদি খটমট হয় তবে কেমন বেখাপ্পা ঠেকে বলতো ? যেমন ধর মেক্সিকোতে। আমরা বলি 'মরকত'—কী মোলায়েম নাম—আর তারা বলে "কোয়েট্‌জেলিট্‌জ্‌লি"। কথাটার অর্থ হইতেছে 'কোয়েট্‌জেল' পাখীর পাথর। সবুজ রংয়ের পাখীগুলি, দেখিতে চমৎকার—ঠিক মরকত মণির মত! মেক্সিকোর আদিম জাতির রাজারা এই পাখীর পালক নিয়া নিজেদের মুকুটে গুঁজিতেন, কাজেই মরকত ছিল রাজকীয় পাথর।

শ্যামদেশে একটী মরকতের উপর খোদাই করা বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটী লম্বায় ২ ফিট। শুনা যায় এই মূর্ত্তিটী নাকি একখানি আস্ত মরকত। তবে তাহা

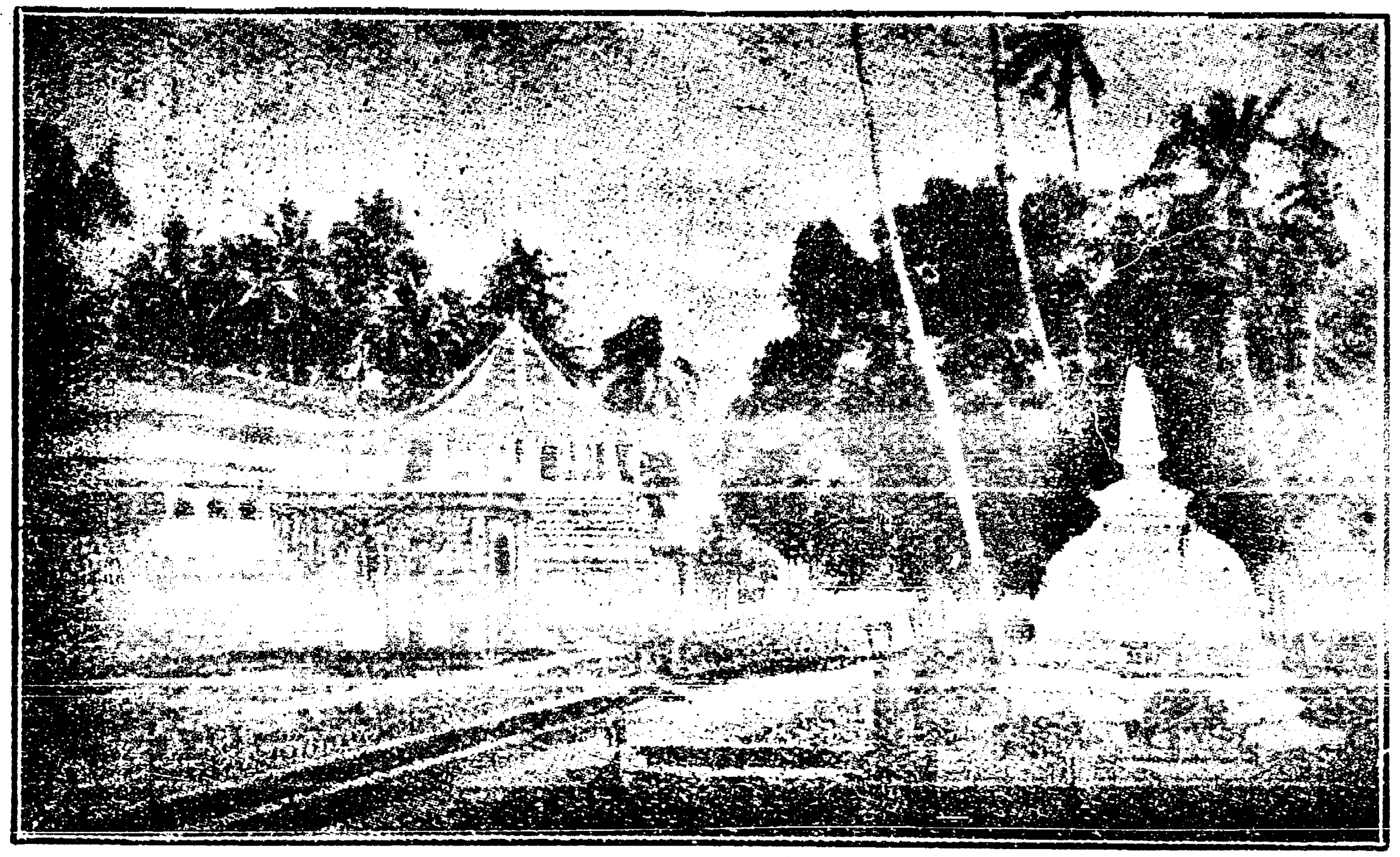

সিংহলের দন্ত-মন্দির

নাও হইতে পারে—কেননা মরকতকে গালাইয়া ইচ্ছামত ছাঁচে ঢালা যায়। কাজেই বহু মরকত একত্র করিয়া গালাইয়া ছাঁচে ঢালা অসম্ভব নয়। তবে এইরূপ ছাঁচে ঢালা মরকতে বহু দোষ থাকিয়া যায়। কিন্তু এই মূর্ত্তিটীতে সে সব দোষ নাই।

নামজাদা মণিমুক্তা সিংহলেও অনেক আছে। সেখানকার কান্দীর



দন্তমন্দিরে ( যেখানে বুদ্ধদেবের একটী দাঁত আছে ) বহু চমৎকার মণিমুক্তা আছে। তার মধ্যে দুই খানি চমৎকার বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আছে। একখানি স্ফটিকের—অন্য খানি মরকতের। আকারে অবশ্য একখানিও বড় নয়। যাঁহারা এই মন্দির দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে এগুলি বাস্তবিকই দেখিবার জিনিষ।

এক নিউইয়র্কের Natural History Museumএই কম্‌সে কম চার হাজার দামী পাথর আছে। পারস্য দেশের যে 'টার্কুইজ' জাতীয় পাথর খানা সেখানে আছে, তাহাতে আবার কোরাণের একটা অধ্যায় পর্য্যন্ত লেখা আছে। কলিকাতার যাদুঘরেও (Indian Museum) বহু সুন্দর সুন্দর পাথর আছে। তোমরা একদিন গিয়া দেখিয়া আসিও।

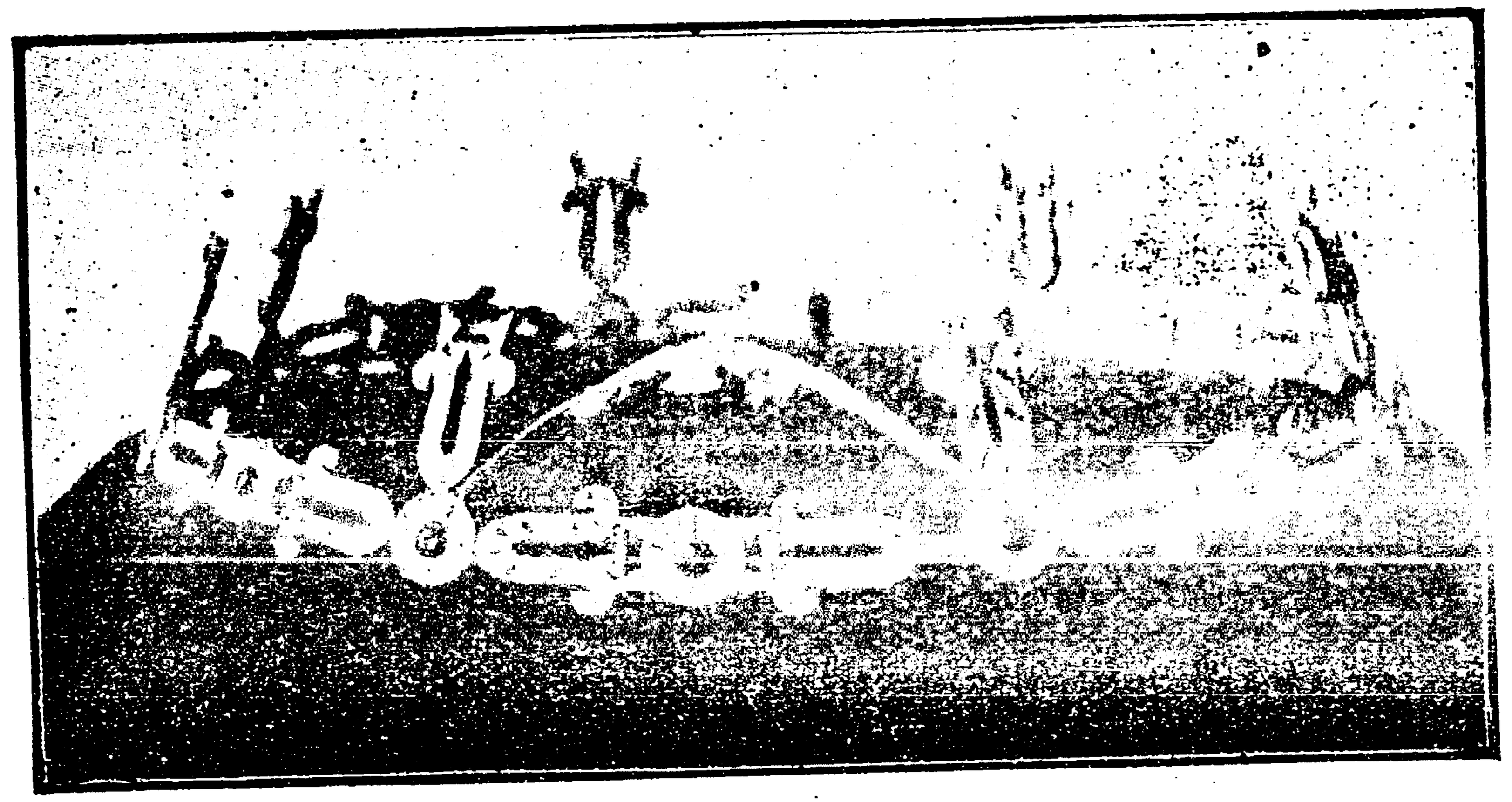

প্রায় চার হাজার বছর আগে কোন মিশর রাজকুমারী এই মুকুটটি পরিতেন

প্রায় সবদেশেই একটা ধারণা আছে যে মুক্তাচূর্ণ করিয়া খাইলেই স্বাস্থ্য ভাল হয়। এইজন্য সেকালের বড় বড় লোকেরা খুব সুন্দর সুন্দর মুক্তা চূর্ণ করিয়া খাইয়া ফেলিতেন। সে সব মুক্তার এক একটার দাম শুনিলেও অবাক হইতে হয়। ইজিপ্টের রাণী ক্লিওপেট্রা নাকি একটা দেড় লক্ষ টাকার মুক্তা খাইয়া ফেলিয়াছিলেন। আবার এলিজাবেথের সময়ে এক সাহেব নাকি একটা আড়াই লক্ষ টাকা দামের মুক্তার মালা চূর্ণ করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

সে কালের লোকেরা কি রকম অলঙ্কার ব্যবহার করিত তার একটু নমুনা দেখিবে? তোমরা হয়ত ভাবিতেছ সেকালের অলঙ্কার নিশ্চয়ই কিম্ভুত কিমাকার হইবে, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। আগের পৃষ্ঠার ছবিতে দেখ কি সুন্দর একখানি মুকুট! প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিশরদেশের কোন রাজকুমারী এই মুকুটখানি ব্যবহার করিতেন। এখানি এখন কাইরোর (Cairo Museum) যাতুঘরে আছে।

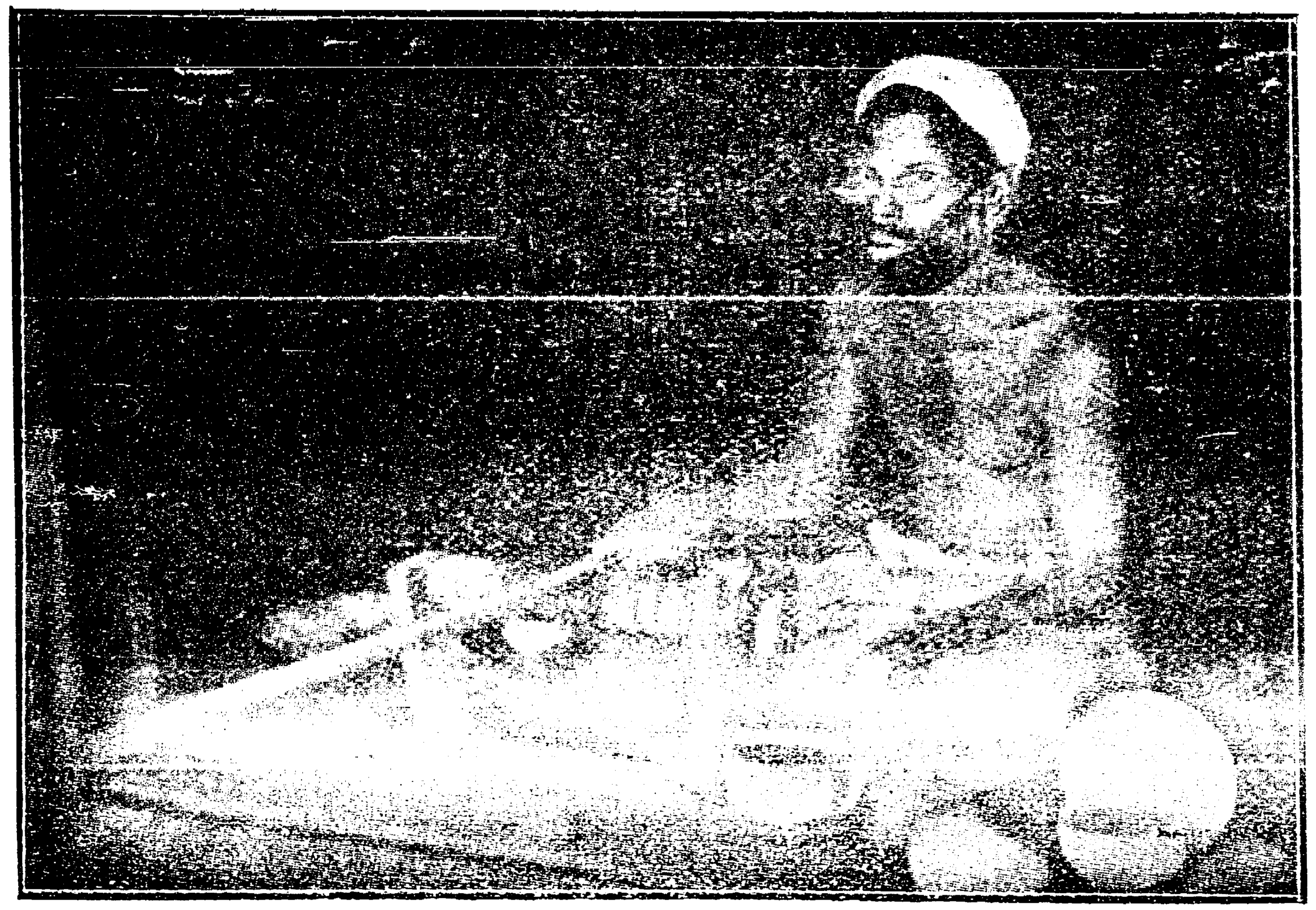

ছবিতে দেখ একজন সিংহলী জহুরী কেমন হীরা কাটিতেছে

এমন এক সময় ছিল যখন কাচকেও মণিমুক্তার সামিল ধরা হইত। শোনা যায় রোমের সম্রাট্ নীরো নাকি প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা দিয়া এক জোড়া স্বচ্ছ কাচের পানপাত্র কিনিয়াছিলেন। বেশী দিন নয়—এই শ'চারেক বছর আগেও ইংলণ্ডে যার বাড়ীতে কাচ থাকিত তাহাকে বড় লোক বলিয়া ধরা হইত—এবং সেই জন্য তাহাদের বেশী ট্যাক্স দিতে হইত। তাই তখন অনেকে জানলায় কাচ লাগাইত না—কেননা তাহা হইলেই ত বেশী ট্যাক্স দিতে হইবে।

# ভজহরি মাষ্টার

(শ্রীবিকাশ দত্ত)

ভজহরি মাষ্টার একদিন স্কুলেরে—
বলে, "এই শোন, শোন, আজ প্রাণ খুলেরে—
ব'লে যাবো দুনিয়ায় আছে যাহা অদ্ভুৎ,
চুপ্ চাপ্ শুনে যাও ক'রোনাকো খুঁৎখুৎ।
কাঁঠালের আমসৎ চাখ্‌তে কে চায় না?
বড় বেশী দাম তার তাই লোকে খায় না;
দশটাকা প'ড়ে যায় শুধু এক ছটাকে,
বড় যার সংসার খাওয়াবে সে কটাকে?
খাসা লাগে খেতে শোন ডালিমের ছ্যাঁচ্‌ড়া,
এই শেমো, শুনছিস—ভারি তুই ঘ্যাঁচ্‌ড়া!
বল্‌ছি যা শুনে যা'না, তাতে কিবা দোষটা?
কি বলিস্, ঠিক্ কিনা বল্‌নারে গোষ্টা!
আর এক অভিনব পিঁয়াজের চাট্‌না,
বল্‌বো কি বানাতে তা? ভারি জোর খাট্‌নি;
ক'রে তায় তিনদিন ঝোলাগুড়ে সিদ্ধ
(হুঁসিয়ার, দই নুন বেবাক নিষিদ্ধ)
ঢেলে রাখো গামলায় গোয়াটাক্ থাকতে,
মাস দুই গেলে পরে পারো বটে চাখ্‌তে।
ডুমুরের ঘুঘনী কি কেউ তোরা খাস্‌নি?
বাড়ীতেও কোনদিন খেতেও তো চাস্‌নি!
ঠিক্‌কিনা বল্‌নারে, জানা আছে নামটা?
নেই? তাই বল খুলে—মিছে কেন আম্‌তা।

কলায়ের ডালে রাঁধা খেয়েছিস্ খিচুড়ি ?
তোরা দেখি খোঁজটে'জ রাখিস না কিছুরি ।
বাড়ী গিয়ে মার কাছে ভাল ক'রে গুছিয়ে
যা যা আমি বল্‌ছি তা বল্‌বিরে বুঝিয়ে ।
ওকি, ওকি, হাস্‌লি যে, কেন কেন বল্‌তো,
সব বাজে ?—তাই বটে তোরা ভারি খল্ তো !
সত্যি যা তাকি আর কান পেতে শুনবি ?
মিথ্যার ভূয়ো-জাল প্রাণে মনে বুনবি ।"

---

## ব্রাহ্মণের দাম

(পৌরাণিক)

চ্যবন ঋষি এক সময়ে প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার জলে অনেককাল কাটাইয়া দিয়াছিলেন। শরীরটাকে কাঠের মত করিয়া কখন জলের মধ্যে শুইয়া থাকিতেন, কখন বসিয়া থাকিতেন। আর তাঁর মনটা তখন কেমন ছিল ? না ছিল অভিমান, না ছিল আনন্দ, না ছিল রাগ। হুড়মুড় করিয়া জলের স্রোত আসিয়া ঋষির গায়ের উপর পড়িত আর চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়া যাইত। জলচর জীবগুলা তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে মনে করিতে লাগিল, ইনি আমাদেরই একজন। মাছগুলা কাছে আসিত আর তাঁহার গা শুঁকিয়া চলিয়া যাইত।

বারটা বৎসর এই রকমে গেল। তখন একবার কতকগুলি জেলে আসিল ঐ জলে মাছ ধরিতে। কী তাহাদের শরীরের চেহারা আর কী তাহাদের গায়ের জোর! নূতন সূতায় গাঁথা প্রকাণ্ড শক্ত জাল তাহারা জলের মধ্যে ছাড়িয়া দিল। তার পর জাল টানিয়া উঠাইলে মাছটাছ ত অনেক উঠিলই—আর উঠিলেন জালে আট্‌কাইয়া—ও বাবা! সেই চ্যবন ঋষি। ইয়া লম্বা কাঁচা কাঁচা তাঁর দাড়ি, আর ইয়া বড় বড় জটা মাথায়—কত শ্যাওলা,



কত শঙ্খ-শামুক তাঁর গায়ে জড়ান। মুনিকে দেখিয়াই ত জেলেদের চক্ষু স্থির। তাহারা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যোড়হাতে ঋষিকে বার বার প্রণাম করিতে লাগিল। আর মাছগুলো, তারা জালে আট্‌কা পড়িয়া উপরে উঠিয়া আর কতক্ষণ বাঁচিবে ?

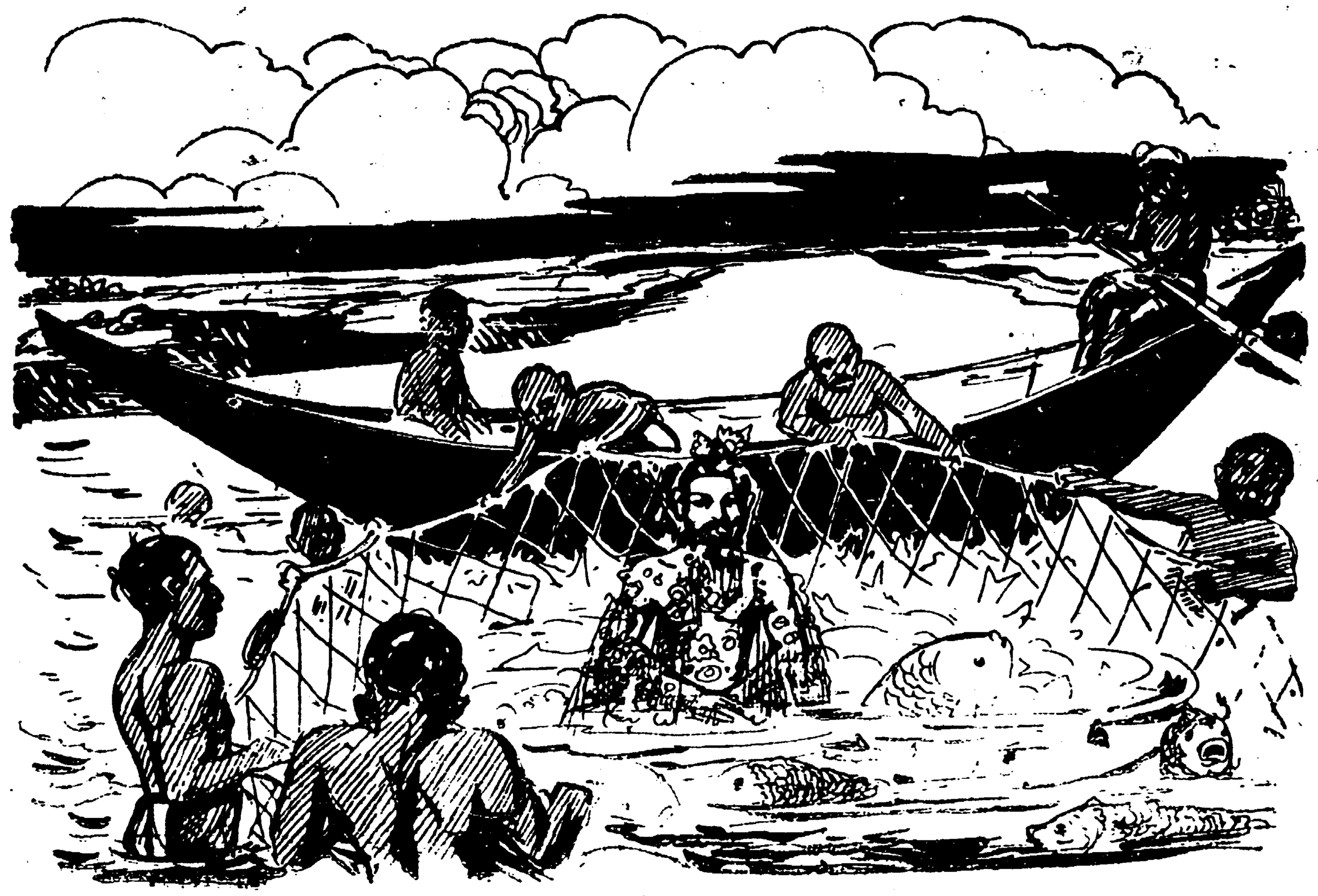

আর উঠিলেন জালে আট্‌কাইয়া—ও বাবা! সেই চ্যবন ঋষি

পটাপট্ মরিতে লাগিল আর মুনি তাহাদের অবস্থা দেখিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

জেলেরা তখন কি করিবে ? খুব বিনয় করিয়া মুনিকে বলিল, "ঠাকুর, আমরা না বুঝে ভয়ানক খারাপ কাজ করে ফেলেছি। এখন কি কর্‌লে আপনি খুসী হন ?" ঋষি বলিলেন, "দেখ, হয় আমি এই মাছগুলোর সঙ্গে মর্‌ব, নয়ত এই মাছের সঙ্গে বিক্রী হয়ে যাব। এতকাল এদের সঙ্গে এক সঙ্গে রয়েছি, এখন এদেরকে ছাড়্‌তে পারব না।"

জেলেরা খুব বেজার হইয়া চলিল নহুষ রাজার কাছে। গিয়া সব কথা রাজাকে বলিল। চ্যবন যে ছিলেন নহুষেরই পুরোহিত। নহুষ জেলেদের

কথা শুনিয়াই ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রীদের সঙ্গে চলিলেন চ্যবন ঋষির কাছে। রাজা নিজের পরিচয় দিলেন, চ্যবনও তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন।

নহুষ তখন বলিলেন, "ঠাকুর, এখন আমি আপনার প্রিয় কি কাজ করতে পারি ?"

ঋষি বলিলেন, "দেখ, এই জেলেদের খুব পরিশ্রম হয়েছে; তুমি এদের মাছগুলো কিনে নাও আর সেই সঙ্গে আমাকেও ওদের কাছ থেকে কিনে নাও।"

নহুষ বলিলেন, "ঠাকুর, আপনি যদি খুসী হন, তবে আপনার জন্য জেলেদেরকে হাজার টাকা দেওয়া যাক্।"

চ্যবন ঋষি বলিলেন, "হাজার টাকা আমার দাম ? একটু বিবেচনা ক'রেই আমার দামটা দাও।"

নহুষ তখন বলিলেন, "আচ্ছা, লাখ টাকা দেওয়া যাক্।"

ঋষি সেটাও তাঁহার উপযুক্ত দাম বলিয়া স্বীকার করিলেন না। কোটী টাকা দিবার কথা হইল, তাহাতেও সেই কথা। চ্যবন বলিলেন, "কোটী টাকার বেশী দিলেও আমার দাম হবে না। তুমি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আমার দামটা ঠিক কর।" তখন নহুষ ঋষির বদলে রাজ্যের অর্দ্ধেক, এমন কি গোটা রাজ্যটাই দিতে চাহিলেন। কিন্তু ঋষি বলিলেন, "এও আমার ঠিক দাম নয়। আরে, তুমি একবার ঋষিদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেই দেখ না ?"

নহুষ রাজা হতভম্ব হইয়া গেলেন। এমন সময়ে সেখানে আর এক ঋষি আসিয়া উপস্থিত। গরুর পেটে তাঁহার জন্ম, ফলমূল খাইয়াই তিনি থাকিতেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আপনার ভাবনা কিসের ? সব কথা আমার কাছে খুলে বলুন ত। আমি আপনাকে খুসী ক'রে দেব। আমি ঠাট্টা করতে গিয়েও কখন মিছে কথা কই না। আমি যা বল্‌ছি তা ঠিক জান্‌বেন।"

রাজা বলিলেন, "ঠাকুর, আমাকে ঠিক ক'রে বলে দিন, এই চ্যবন ঋষির দাম কত; আমার গায়ের জোরই আছে, তপস্যার জোর ত নাই। ঋষি রাগ করলে সব পুড়িয়ে ফেল্‌তে পারেন। আমি মহাভাবনায় পড়ে গেছি।"



তখন সেই গরুর ছেলে ঋষি বলিলেন, "মহারাজ, ব্রাহ্মণ যে সকলের বড়; এক গরু ছাড়া তার আর দামই হ'তে পারে না।"*

রাজা ভারী খুসী হইয়া জেলেদেরকে ব্রাহ্মণের দাম ধরিয়া একটা গাই দিয়া দিলেন। গাই দিতেই চ্যবন ঋষি জল হইতে উঠিয়া পড়িলেন—'হাঁ, এই ঠিক দাম'। তিনি গরুর অনেক মাহাত্ম্য রাজাকে শুনাইয়া দিলেন।

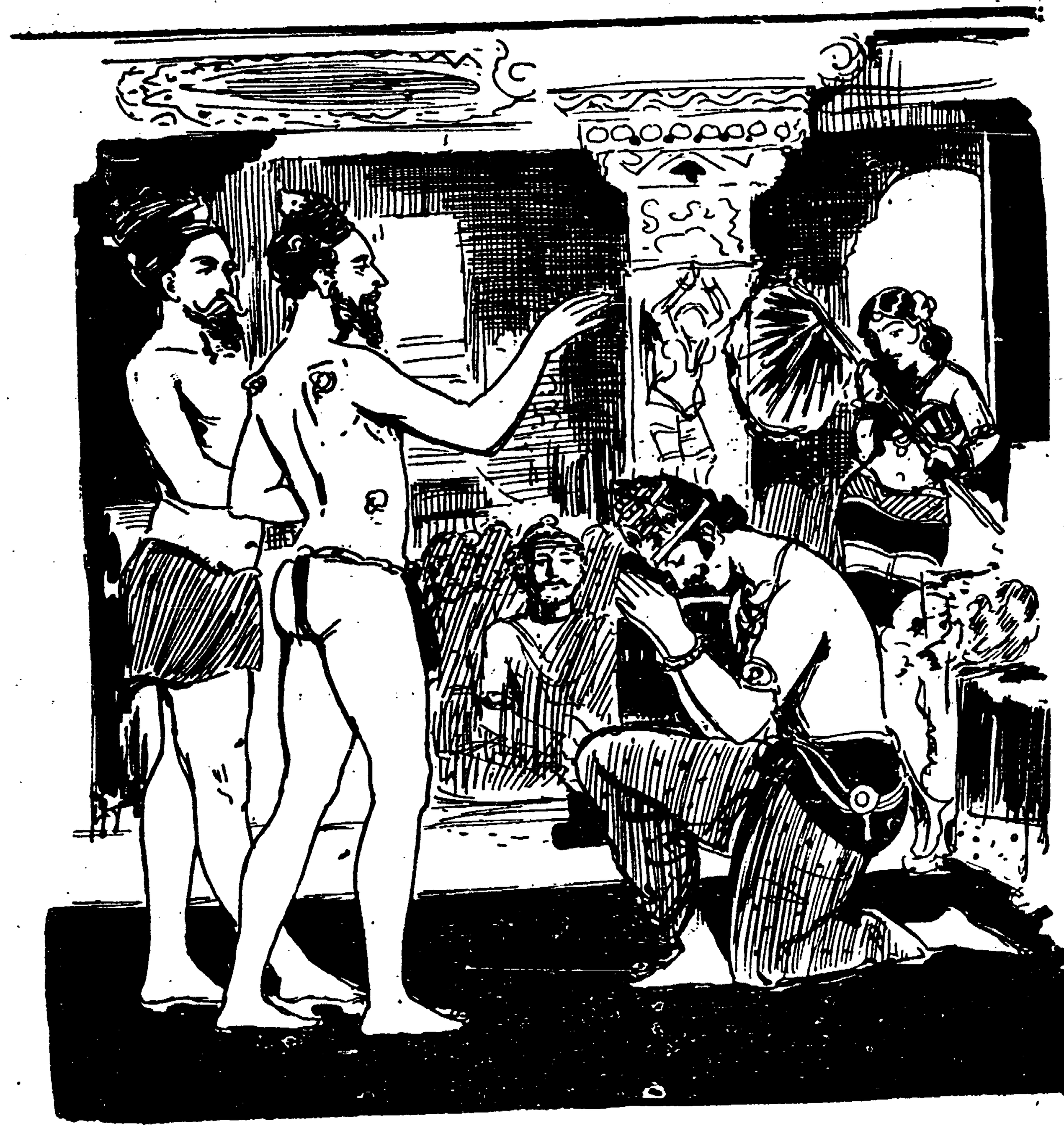

আমার যেন ধর্ম্মে খুব ভক্তি থাকে

চ্যবন ঋষি ত জাল হইতে খালাস পাইলেন কিন্তু জেলেরা তখনও তাঁহাকে ছাড়ে না। সাত পা যাইতে যতটা সময় লাগে, ততটা সময় সাধুদের সঙ্গে একত্র থাকিলেই বন্ধুত্ব হইয়া যায়, আর জেলেরা এতক্ষণ মুনির কাছে রহিয়াছে, মুনি কোন বন্ধুত্বের কাজ করিবেন না ? জেলেরা মুনিকে খুব করিয়া ধরিয়া বসিল আর গাভীটী তাঁহাকেই দিতে চাহিল।

তখন চ্যবন বলিলেন, "দেখ, যেমন খড়কুটা আগুন লাগ্‌লেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তেমনি মানুষ ভস্ম হয় তপস্বীদের আর গরীবদের রাগে। তোমরা গরীব, তোমাদের কথা আমি

* দুইটী কি একই শ্রেণীর ?

অমান্য করব না। গাভীটা আমি নিলাম, তোমাদেরও পাপ চ'লে গেল, তোমরাও মাছদের সঙ্গে স্বর্গে যাও।"

নহুষ রাজা ত সব কাণ্ড দেখিয়া অবাক্! তখন দুই ঋষি রাজাকে বলিলেন, "তুমিও ইচ্ছামত বর নাও।" রাজা খুসী হইয়া বলিলেন, "আমার যেন ধর্ম্মে খুব ভক্তি থাকে।" মুনিরা তাহাই হইবে বলিয়া যার যার আশ্রমে চলিয়া গেলেন। নহুষও খুব খুসী হইয়া নিজের বাড়ীতে ফিরিলেন।

---

## সাবাস্ ডাক্তারি!

(শ্রী——        )

কোন এক ভদ্রলোকের ভাই দুইবার ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করিয়াছিল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল "ভায়া আপনার এইবারে কি কর্‌বে?" জবাবে তিনি বলিলেন "আরও একবার পরীক্ষা দেবে। যদি তাতেও পাশ না কর্‌তে পারে তো হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী লাইনে ঢুকিয়ে দেব।"

কথাটা শুনিয়া তোমরা হয়তো খুবই অবাক্ হইয়া যাইবে। সে কি গো? এরূপ অসাধারণ যার প্রতিভা তার হাতে আবার মানুষের জীবন-মরণের ভার? সে যে হাতে রোগী পাইলেই পট্ পট্ দফা নিকাশ করিবে!

অবাক্ হইবার কথাই বটে! কিন্তু আজ যে কাহিনী তোমাদের শুনাইব, তাহার তুলনায় এ কিছুই নয়। সে কাহিনী এতই আশ্চর্য্য যে, ভয় হয়, পাছে তোমরা মনে করিয়া বস যে আমি যা খুসী তাই আষাঢ়ে গল্প তৈরী করিয়া বলিতেছি।

বলিব সাবেকী আমলের বিলাতী ডাক্তারদের কথা। একজন সাহেব লেখক ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন, ভাগ্যিস্ সে সময়ে লোকের ডাক্তার ডাকিবার মত তেমন টাকাকড়ি ছিল না, তাই বাঁচোয়া। নহিলে এতদিনে বোধহয় সে ডাক্তারদের কল্যাণে বিলাতে একটি মানুষও বাঁচিয়া থাকিত কিনা সন্দেহ। অথচ একটি



নয়, দুইটী নয়, প্রায় হাজার খানেক বছর ধরিয়া এই মহাপ্রভুরা মানুষের প্রাণ লইয়া খেলা করিয়াছেন।

প্রথমেই শোন ডাক্তারদের একটু বিবরণ। মস্ত সুবিধার কথা ছিল এই যে কোন রকম বিদ্যাশিক্ষার দরকার হইত না। শরীরের কোথায় কি কলকব্জা, কোন্‌টার কি কাজ, কোন্‌টা কি জন্য বিগ্‌ড়ায়--এ সব যে ডাক্তারদের আবার জানিতে হয়, তাদের মগজে সেটা ঢুকিত না। তুমি ডাক্তার হইতে চাও, চিন্তা কি? ঘরের দেয়ালে গোটা কয়েক মরা কুমীর টানাইয়া দাও, মানুষের শরীর যত রকমে কাটা ছেঁড়া করা যাইতে পারে তার উপযোগী ছুরি ছোরা জোটাও, মরা জীবজন্তুর হাড়গোড় লইয়া টেবিলের উপর সাজাও, ব্যস্, ডাক্তার বনিয়া গেলে। আর সঙ্গে সঙ্গে যদি একটু মন্ত্র তন্ত্র কিম্বা ভেল্কির জ্ঞান থাকে, তবে তো তুমি একেবারে নীলরতন সরকার!

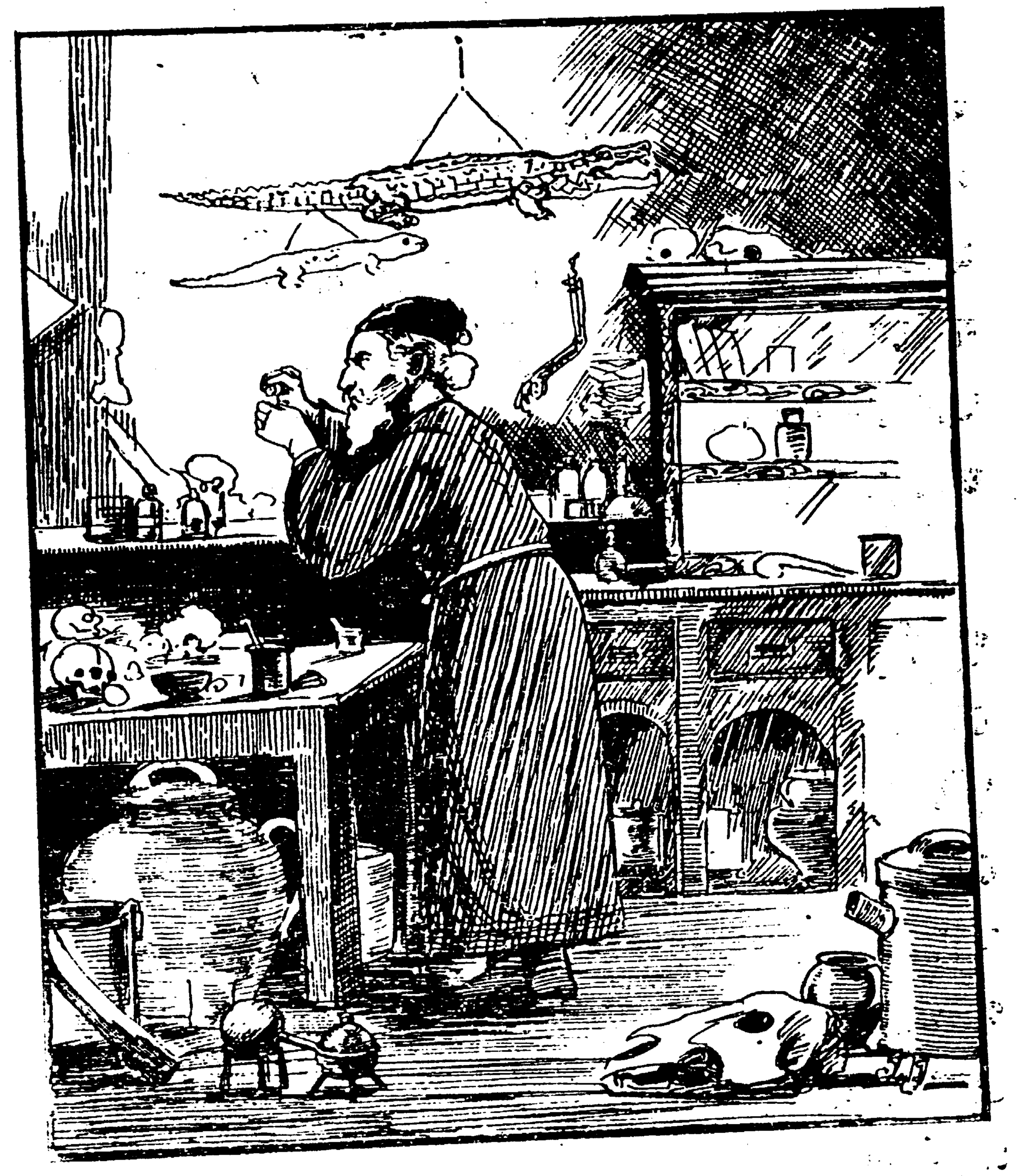

ডাক্তারখানা

এবার ডাক্তারীর নমুনা শোন। রোগীকে সাপে কাটিয়াছে, ডাক্তার যেই

শুনিলেন সাপের গায়ে চক্র চক্র দাগ ছিল, অমনি এমন একটা পাতা বাহির করিলেন যার গায়ে ঠিক ঐ ধরণের দাগ আছে। সে পাতার রস রোগীকে ধরিয়া খাওয়ান হইল। সাপের গায়ে যখন দাগ, আর পাতারও যখন গায়ে দাগ, তখন নিশ্চয়ই সেই পাতার রসে সাপের বিষ মরিয়া যাইতে বাধ্য। রোগী তখন ভাল না হইয়া যায় কোথায়?

দুই নম্বর রোগী আসিয়া জানাইল, তাহার কলিজায় দারুণ ব্যথা হইয়াছে। কলিজায় ব্যথা? আচ্ছা। এখন ডাক্তার সাহেব জানেন যে মানুষের কলিজা বা হৃৎপিণ্ডটা দেখিতে হরতনের মত। ব্যস্, চিকিৎসা ঠিক হইয়া গেল—দেখিতে হরতনের মত এমন একটা কিছু রোগীকে খাওয়াইয়া দিলেই সব গোল চুকিয়া যাইবে। কচুর পাতা জিনিষটা দেখিতে অনেকটা ঐ রকমই বটে। সুতরাং দাও তাহাকে যত পার কচুর পাতা খাওয়াইয়া। কচুর পাতা যখন দেখিতে হৃৎপিণ্ডের জাত ভাইয়েরই মত তখন এটা খাইলে ওটার উপকার হইবে না কেন?

এবার বসন্ত রোগের চিকিৎসাটা শোন। রোগী দেখিয়া ডাক্তার সাহেব খুব বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হুঁ, বেশ গরমে রাখতে হবে একে। খুব মোটা সোটা ভুঁড়িওয়ালা লোক পাওয়া যাবে?" ডাক্তারের আদেশ মত কয়েকটি ভুঁড়ো লোক আনিয়া হাজির করা হইল। দেখিয়া শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন, বেশ, এদের দিয়েই আমার কাজ চল্‌বে; গা' এদের চর্ব্বিতে ভরা, কাজেই উত্তাপও আছে যথেষ্ট। সারাটা ক্ষণ এরা রোগীর গায়ে গা লাগিয়ে থাকবে—তবে না রোগীর গা গরম হবে?" ডাক্তারের কিন্তু একথা কখনও মনে আসিত না যে বসন্তের ক্লেদ একবার গায়ে লাগিলে এই ভুঁড়ো লোকদের শরীর আর বেশীক্ষণ গরম থাকিবে না, শীঘ্রই চিরদিনের মত ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে।

কিন্তু মৃগী রোগের কি রকম চিকিৎসা ছিল সে সম্বন্ধে একজন বিলাতী লেখক যা লিখিয়াছেন তাহা আর সব রকম চিকিৎসার উপর টেক্কা দিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, এ রোগে নাকি ব্যবস্থা ছিল, একটা কাল বিড়ালের লেজের ডগা হইতে তিন ফোঁটা রক্ত লইয়া দুধের সহিত মিশাইয়া তিনদিন খাইতে



দেওয়া। যদি তাহাতেও না উপকার হইত তবে, রোগীকে মাথা নীচু করিয়া তিন দিন, দিনে তিনবার তিনটি সিঁড়ি হামাগুড়ি দিতে হইত! আরও কয়েকটা চিকিৎসারও তিনি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। তাহার মধ্যে প্লেগের প্রতিষেধকটা তোমরা জানিও রাখিও, কি জানি, যদি কোন দিন দরকার পড়ে! সহরে প্লেগ দেখা দিয়াছে, অমনি ডাক্তার সাহেবেরা নোটিস্ জারি করিলেন, ছেলে বুড়ো যে

হাতুড়ের কাণ্ড! রোগীর এবার দফা সারা। (শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক পেন্সিলে আঁকা।)

যেখানে আছ যত পার দিনরাত তামাক খাও। প্লেগ তাহা হইলে তোমাদের ধারে পাশেও ঘেঁষিতে পারিবে না। যে সব জিনিষের নাম শুনিলে অন্নপ্রাশনের ভাত পর্য্যন্ত বমি হইয়া যায়, তাই নাকি ছিল এসব ডাক্তারদের প্রিয় ওষুধ—যেমন ধর, মড়ার চুল-দাড়ি, টিক্‌টিকির লেজ, ছুঁচোর চর্ব্বি ইত্যাদি।

কাটা-ছেঁড়ার কাজে ওস্তাদ ছিলেন নাপিত ভায়ারা। আমাদের দেশের নাপিত ভায়ারাও কিছু কাজটা কম করিতেন না। শরীরের কোথায় যে কোন্ শিরা উপশিরা আছে, সে সম্বন্ধে কোন কালেই তাহাদের কোন ধারণা ছিল না, কাজেই বে-পরোয়া ছুরি চালাইতে তাহাদের এতটুকু বাধিত না। এ সম্বন্ধে ছোট বেলা ঠাকুরদাদার কাছে ভারী মজার এক গল্প শুনিতাম। একবার নাকি এক ডাক্তারকে একটা ফোঁড়া অস্ত্র করার জন্য ডাকা হয়। ডাক্তার দেখিলেন, ফোঁড়ার সাথে এমন একটা শিরা আছে যে ফোঁড়া কাটিতে গেলে সেই শিরা কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা পূরা মাত্রায়। তাই তিনি কাটিতে রাজী হইলেন না। তখন তলব পড়িল নাপিত ভায়ার। সে কিন্তু বে-পরোয়া নরুণ চালাইয়া দিল। কিছুদিন পরে ডাক্তার শুনিলেন এক নাপিত সেই ফোঁড়াটী অস্ত্র করিয়া সারাইয়া দিয়াছে। তিনি তাকে ডাকিয়া বলিলেন "তুমি তো আচ্ছা গুণী লোক হে! এসো তোমাকে কোথায় কি শিরা আছে দেখিয়ে দি"। সেই শিরা-জ্ঞানই নাপিতের কাল হইল। আর কখনো সে অস্ত্র করিতে পারিত না, মনে হইত এই বুঝি কোন্ শিরা কাটিয়া ফেলিল!

বিলাতী হাতুড়েদের কথা শুনিলে। অথচ আমাদের দেশে ইহার বহু শত বৎসর আগে চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিরা চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সব পুঁথি লিখিয়া গিয়াছেন তাহা দেখিয়া আজ পর্য্যন্ত বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা হাঁ করিয়া থাকেন।

আজকালকার বিলাতী চিকিৎসাও অসম্ভব রকম উন্নতি লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ অস্ত্র-চিকিৎসা। এই মাত্র সেদিন সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ কি মারাত্মক অসুখেই না পড়িয়াছিলেন! বিলাতের ডাক্তারেরা তখন অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া দিয়াছে; বুকের পাঁজর কাটিয়া বুক ফুটা করিয়া ফুস্ ফুস্ হইতে পূঁয বাহির করিয়া আনিয়া তাঁহাকে একেবারে সারাইয়া তুলিয়াছে। আর এরাই হইল কিনা সেই হাতুড়েদের—অথবা তাহাদের জাতভাইদের—বংশধর!

---

# দু'পায়া ভুত

(অধ্যাপক শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ, এম্-এ, বি-এল্)

কন্‌কনে শীতের রাত; কোনো রকমে খাওয়া দাওয়া শেষ করে যে যার ঘরে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়েছে। রাত তখন একটা, হঠাৎ হরি ভট্‌চার্য্যির দুয়ারে ঘন ঘন ধাক্কা পড়্‌ল। "ভট্‌চার্য্যি মশাই, ভট্‌চার্য্যি মশাই বাড়ী আছেন" বলে বারে বারে একটা লোক উৎকণ্ঠার সঙ্গে ব্রাহ্মণকে ডাক্‌তে লাগ্‌ল। গ্রামে চোর ডাকাতের ভয় না থাকলেও ভুত ডাইনের উপদ্রব বেশ ছিল। তাই ব্রাহ্মণ দরজা না খুলে জানলা হতে বিরক্তির স্বরে বল্‌লেন "বাড়ী থাকবনা ত কি আর রাত দুপুরে মাঠে চরে বেড়াব? কে হে, কি চাই?" লোকটী কাতর কণ্ঠে বল্‌ল "ভট্‌চার্য্যি মশাই, একবার দয়া করে সঙ্গে যেতে হবে, আমি নন্দীগ্রামের গয়ারাম। বড় বিপদ, আমার দাদার শেষ অবস্থা, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। শীগ্‌গির লণ্ঠন ও লাঠি-গাছটা নিয়ে আসুন, গাড়ী এনেছি।" গয়ারামের দুপয়সা আছে, দক্ষিণাটাও ভাল দেয়, তাই ব্রাহ্মণ শীত ও কষ্ট সত্ত্বেও লোভ সাম্‌লাতে পারলেন না। কম্বলটা মুড়ি দিয়ে হাতে মোটা বাঁশের লাঠিটা নিয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে শ্রীহরি বলে একেবারে গাড়ীর উপর এসে শুয়ে পড়লেন। ভাল গরু ছিল, তিন ক্রোশ পথ দু-ঘণ্টায় পৌঁছে গেল।

ঘরে ঢুকে ব্রাহ্মণ দেখলেন্ যার প্রায়শ্চিত্ত হবে তার অবস্থা শোচনীয়, অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ ব্যবস্থা দিলেন অজ্ঞান অবস্থাতে প্রায়শ্চিত্ত হবার পথে কোনো বাধাই নেই, তবে চট্ করে সেরে নিতে হবে। এই বলে হরি ঠাকুর গরুর বাবদ এত টাকা, অমুক বাবদ এত টাকা ইত্যাদি পাই পয়সা হিসাব ক'রে এক লম্বা ফর্দ্দ ক'রে দিলেন। মোট পঁচিশটা টাকা সুমুখে রেখে ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্ত সুরু করতে করতেই লোকটী মারা গেল। "ওই হয়েছে, ওই হয়েছে" বলে ব্রাহ্মণ তড়াক্ করে এক লাফে ঘরের দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কান্নাকাটি সুরু হল; ব্রাহ্মণ আস্তে আস্তে গাড়ীতে উঠে বসলেন। তখন রাত্রি ৪টা।

চারি দিকে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে গাড়ী চল্‌তে লাগ্‌ল। বাঁশ গাছের ঝাড়ে শোঁ শোঁ শব্দ হয় আর হরি ঠাকুরের গা ছম্‌ ছম্‌ করে উঠে, দু' একটা বাদুর হুস্‌ হুস্‌ করে চলে যায়, আর ব্রাহ্মণ পৈতা আঁকড়ে' "রাম রাম" বল্‌তে থাকেন। এইভাবে ঘণ্টাখানেক ত্রাহি ত্রাহি করে কাটাবার পর ভোরের আলো দেখে ব্রাহ্মণের একটু সাহস হ'ল। আহ্নিক ক'রবার জন্য কোন একটা পুকুরের ধারে গাড়োয়ানকে গাড়ী নিয়ে যেতে বললেন। সেও সাধ্যমত "হ্যা দে" "হ্যা দে" থেকে আরম্ভ করে গরুর সঙ্গে নানা রকম সম্বন্ধ পাতিয়ে দিয়ে গাড়ী চালিয়ে দিলে। হঠাৎ খানিক দূর গিয়ে গরু আর চল্‌লো না। মার ধোর, মিষ্টি কথা সত্ত্বেও কার সাধ্যি তাদের এক পাও নড়ায়। তারা এক একবার দক্ষিণদিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকায় আর জোরে নিশ্বাস ফেলে মুখটা ঘুরিয়ে ছায়। গাড়োয়ান চুপি চুপি ব্রাহ্মণকে বল্‌লে "দাদাঠাকুর, আজও বুঝি তবে দেখেছে।" ব্রাহ্মণের বুক ধরাস্‌ করে উঠ্‌লো কিন্তু সাহসের ভান ক'রে বললেন, "কি দেখ্‌বে আবার?" "সেই বেটাকে ঠাকুর সেই বেটাকে, আর গাড়ী টাড়ী চালাতে দিলে না।"

"য়্যাঁ! গাড়ী চলবে না ত আমি কি এখানে বসে থাক্‌বো, ব্রাহ্মণের সঙ্গে স্যাক্‌রা—গরুর চোখে গামছা বেঁধে হাঁকিয়ে চল্‌"। চোখে গামছা বাঁধা গরু একেবারে টেনে দৌড় দিয়ে থানার ধারে গাড়ী এনে ফেল্‌লে। ব্রাহ্মণ তড়াক্‌ ক'রে লাফিয়ে প'ড়ে যা দেখ্‌লেন তাতে তাঁর রক্ত জল হ'য়ে গেল। তখন ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা ভাব রয়েছে—অন্ধকার একেবারে যায় নি। দূরে দেখ্‌লেন কতকগুলো গরু চরছে আর তাদের পাশে লম্বা লম্বা দুটো সাদা পা দাঁড়িয়ে আছে। মাথাও নেই, ধড়ও নেই, শুধু কোমর থেকে দুটো লম্বা মোটা পা আর তা'র উপর কেলে হাঁড়ির মতন একটা কি। ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করে সে দুটো পা একটা বিকট শব্দ ক'রলে আর ক্রমশঃ এগুতে লাগ্‌লো। গাড়োয়ান ত ঐ দেখেই "বাপ্‌" বলেই ছুটে গিয়ে পুকুরে পড়লো। ব্রাহ্মণ লাঠি গাছটা ধরে থর থর কাঁপতে কাঁপতে "রাম রাম" ব'লে জোরে চীৎকার করতে লাগ্‌লেন। সে লম্বা পা দুটো অম্‌নি থামলো। কিন্তু যেমন ব্রাহ্মণ চল্‌তে আরম্ভ করলেন, অমনি পা দুটো এগোতে লাগ্‌লো



আর শব্দ হ'তে লাগলো "মশ্‌ মশ্‌ ছলক্‌ ছলক্‌"। তিনিও চলেন পাও চলে, তিনিও থামেন, পাও থামে—কিন্তু খুব কাছে আসে না, হাত কুড়ি তফাতে থাকে। হরি ঠাকুর দেখ্‌লেন যে—ভূতের পাল্লায় পড়ে এদিকেও মরেছি ওদিকেও মরেছি। তখন ভূত ঝাড়া অব্যর্থ মন্ত্রটা তিনবার জপ্‌ করে নিয়ে, লাঠিতে পৈতাটা জড়িয়ে মরিয়া হয়ে বোঁ বোঁ শব্দে লাঠি ঘুরোতে লাগ্‌লেন। খানিকক্ষণ পরে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লেন, "তুই জানিস্‌ আমি ব্রাহ্মণ, আমাকে ভয় দেখাস্‌নি, এক্ষুনি মারণ—চটেন—ব্রহ্মউৎপীড়ন মন্ত্রে তোকে ছারখার ক'রে দোব। তুই কি চাস্‌? টাকা, এই নে।" এই ব'লে ব্রাহ্মণ তাঁর সদ্য প্রাপ্ত পঁচিশটী টাকা ছুড়ে ফেলে দিলেন। তাঁর ধারণা, যে লোকটা সম্প্রতি মারা গেছে তারই ভূত পঁচিশটা টাকা ঠকিয়ে নিয়েছেন ব'লে তাঁর পিছু পিছু তাড়া করেছে। ভূত কিন্তু টাকা ছুঁলে না, তাঁকে অনুসরণ ক'রল। ব্রাহ্মণ বড়ই মুস্কিলে প'ড়লেন এবং অতি মিষ্ট কথায় ভূতকে বল্‌লেন "বাপু এত ভোরে কেন বেরিয়েছ, এখন কি কিছু হয়? কি চাও বল না?" একটা বিকট খিল্‌ খিল্‌ হাসি উঠ্‌লো। হরিঠাকুরের গা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করে মাথা ঘুর্‌তে লাগ্‌লো, অতি কষ্টে ব'ল্‌লেন, "ফের জিজ্ঞাসা কর্‌ছি বল, কি চাও, না হ'লে ব্রহ্মকোপে পড়বে।" উত্তরে শুধু একটা কর্কশ হঃ হ হঃ শব্দ হ'ল। ব্রাহ্মণের অবস্থা শোচনীয় দেখে পা দুটো এবার খুব কাছে এল। তাঁর আর দাঁড়াবার শক্তি ছিল না, আর কোন উপায় নেই দেখে লাঠিগাছটা ছুড়ে মারলেন এবং সেই সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে প'ড়ে গেলেন। কাণের মধ্যে একটা "ধরাস্‌" শব্দ আর "উ-উহুহু" চীৎকার পৌঁছল।

আধ ঘণ্টা পরে যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখ্‌লেন দুধ আর রক্তে সে যায়গাটা ভেসে গেছে। একটা ভাঙ্গা হাঁড়ি আর একটা মাথা পর্য্যন্ত পা-জামা প'ড়ে আছে। হাত পাঁচ দূরে দামু গয়লা মড়ার মতন পড়ে রয়েছে। আর তার মাথায় গাড়োয়ানটা ভিজে গামছা চেপে ধ'রে আছে। কিছুক্ষণ পরে মিট্‌ মিট্‌ করে চেয়ে দামু ব'ল্‌লে "ঠাকুর, ঠিক্‌ শাস্তিই দিয়েছ, লোকের গরুর দুধ চুরি ক'রে অনেক কাল চালিয়েছি, আর চল্‌লো না। বামুনের চোখে কি আর ধুলো দেওয়া যায়"। হরি ভট্টাচার্য্য গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন, "বলেছিলাম ত ব্রহ্মকোপে পড়্‌বি,—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, কই পঁচিশটা টাকা দে।"

---

## মেয়েদের জানা দরকার

এলুমিনিয়ামের বাসনপত্রের ভিতর দিকটা যদি পুড়িয়া কালো হইয়া যায়, তবে তাহার ভিতর খানিকটা পেঁয়াজ বসাইয়া তাহাতে জল দিয়া অল্প আঁচে জ্বাল দিতে হয়। খানিক পরে দেখা যাইবে পোড়া কালিগুলি জলের সহিত ভাসিয়া উঠিতেছে। এলুমিনিয়াম ভাল না হইলে কিন্তু এ নিয়ম খাটিবে না।

* * * *

দুধ ফুটাইবার সময় একটু অসাবধান হইলে অনেক সময় উৎলাইয়া পড়িয়া যায়। পাত্রের গায়ে সামান্য একটু মাখন মাখাইয়া দিলে আর ওরকম হইবে না।

* * * *

ভেলভেটের জামা ছিঁড়িয়া গেলে সেগুলি ফেলিয়া না দিয়া রাখিয়া দিলে, তাহা দিয়া গিল্টি করা জিনিষ খুব সহজে পরিষ্কার করা যায়।

* * * *

আচারের শিশি কখনও শেল্‌ফের সকলের উপরের তাকে রাখিও না, কেননা বাতাস গরম হইলে উপরের দিকে উঠিবে, আর তাহাতে আচার তাড়াতাড়ি পচিয়া যাইবার ভয় আছে।

* * * *

চুল আঁচড়াইবার ব্রাশ বার বার ধুইলে নরম হইয়া যায়। সে রকম হইলে খানিকটা জলে একটু বেশী করিয়া ফিটকিরি গুলিয়া তাহার মধ্যে ব্রাশটা ডুবাইয়া তাড়াতাড়ি শুখাইয়া লইও। তাহাতে ব্রাশের চুল গুলি আবার শক্ত হইবে।

---

## "আম খাব" খেলা

( শ্রীননীগোপাল মজুমদার )

খেলাটা খেল্‌তে হলে সব্বার আগে সবাইকে গোল হয়ে বস্‌তে হবে। এখন, তোমাদের একজন বল্‌বে ১, তারপরের জন ২, তারপর তিন, চার, কিন্তু যার পাঁচ বল্‌বার কথা, সে পাঁচ বলতে পাবে না, তার বলতে হবে 'আম' আর যার বল্‌বার কথা সাত সে বলবে 'খাব', এখন পাঁচের প্রতিগুণেই যেমন ১০, ১৫, ২০, প্রভৃতিতেও আম বল্‌তে হবে, তেম্‌নি সাতের গুণে বল্‌তে হবে 'খাবো'। যদি কারও ৫৭ হয় তাকে তখন 'আম খাবো' বলতে হবে। যদি ৬৭ তবে 'ছয় খাবো'। যদি ৫১ তবে "আম এক" এম্‌নি ভাবে বল্‌তে হবে। যে ঠিক বলতে পারবে না, তাকে খেলা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। যে শেষ অবধি টিকে থাকবে সে-ই জিত্‌বে।

---

## ক্ষণিকা

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

( কৃষ্ণনগর, নদীয়া )

ছোট্ট মেয়েটি সে। নাম ক্ষণিকা। তার দৌরাত্ম্য আর দুষ্টামিতে সমস্তটা পাড়া ব্যতিব্যস্ত। একটা পথের ধারের কাঠবেড়ালীর মত তার প্রাণটা আনন্দময়। পথের পথিকের সঙ্গে সে খেলা করতে ছুটে আসে।

ক্ষণিকা বড় হ'লো—সুন্দর, সুশ্রী একটা আধ-ফোটা পুষ্পকোরকের মতো। মৌ-মাছির সঙ্গে সে খেলে—গাছপালার সঙ্গে সে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয়, বিড়াল কুকুরকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ায়।

কিন্তু ক্ষণিকার আনন্দ সবাইকে তৃপ্তি দিলে না। তারা ব'ললে—"ক্ষণু যে বড় হ'চ্ছে।" তবু ও ক্ষণিকা বড় হ'লো—বিড়াল, কুকুর, গাছপালাকে ভালবেসে, শকুন্তলার মতো। তার অনাবিল হাস্য-কৌতুকের ভিতর দিয়ে সে ফাগুনের হাওয়াকেও জয় করতে চায়। সংসারের হিসাব নিকাশের ভিতর সে নেই ;—তার অশান্ত আনন্দের ভিতর দিয়ে জেগে উঠ্‌ল একটা অনাসৃষ্টির খেয়াল !

অশ্রান্ত বারিপাতের মধ্যে সে নিজেকে বাঁধন হারা ক'রে ছেড়ে দেয়।

রৌদ্রে তার চেতনা নেই—রাত্রে তার ভয় নেই।

পাড়ার ছেলেমেয়ের দল নিয়ে সে নদীর জলে সাঁতার কাটে। হাঁসের পালের সঙ্গে সে ছুটোছুটি ক'রে ঝাঁপিয়ে চোখ রাঙা ক'রে বকুনি খেতে খেতে উপরে উঠে আসে।

পথের লোক জিজ্ঞাসা করে—"মেয়েটি কে গা ?"

সবচেয়ে তার নিজের লোক ছিল যারা তারাও তাকে ধমক দিয়ে ব'ল্‌ল—"পাগলি, তুই যে, বড় হ'য়েচিস!"

কিন্তু বড় হওয়ায় ক্ষণিকার একটুও আপত্তি ছিল না। পাশের বাড়ীর লতিকার বোন লম্বায় তার চেয়ে অনেক বড় ব'লে রোজ রোজ সে ভাল কাঁঠালিচাঁপাগুলো ছিঁড়ে নিয়ে যায়। ক্ষণিকা ভাবলে—ওদের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, কাল সকালে উঠেই যেন দেখতে পাই যে মণ্টু, বিলু, শেফালি, ও নীতি সবার চেয়ে আমি একহাত বড় হ'য়ে গেছি!

গল্পের ক্ষুদিরামের নাকের মত একরাত্রে ক্ষণিকা একেবারে সাড়ে চা'র হাত লম্বা হ'ল না।

আর সব দিনের মত সেদিনও সে লাফিয়ে লাফিয়ে গাছের ডাল নুইয়ে ধ'রে চেঁচামিচি ক'রে ফুল পাড়ছিল। তার আঁচলে বাঁধা একরাশ বকুল আর ভুঁই চাপার ফুল।

ছোট ভাই অপু লাফাতে লাফাতে এসে সংবাদ দিয়ে গেল—"ইস্‌! আর ফল পাড়তে হ'চ্ছে না; কারা এসেছে। মা ব'লেছে তোকে আর বাইরে যেতে হবে না। কেমন জব্দ।"

তার দিদি ছবি এসে ধমক দিয়ে ব'ললে—"লক্ষীছাড়া মেয়ে! বাইরের ঘরের পাশে লাফালাফি করা হ'চ্ছে! কাল রাত্রে যে তোকে দেখতে এসেছে!"

কণক দিদি এসে অবাক হ'য়ে ব'ললে "একটুও লজ্জা নেই!—ওমা কী বেয়াড়া মেয়ে!"

বড়দা' অমরেশবাবু সেই পথ দিয়ে যাবার সময় ক্ষণুর দিকে একবার চোখ কটমটিয়ে চ'লে গেলেন!

* * * *

ক্ষণিকার বিয়ে হ'ল। শানাইয়ে বিদায় রাগিনীর সুর বাজিয়ে তারা ক্ষণিকাকে নিয়ে গেল।

আজ হাঁসের দল চুপ্‌টি ক'রে চোখ বুজে জলের ধারে ব'সে কার কথা যেন ভাবচে! গাছের ফুলগুলো আজ একটা দস্যি মেয়ের দৌরাত্ম্যের অভাবে শুকিয়ে ঝ'রে প'ড়েচে। পথের লোক নদীর চড়াঘাটটার দিকে চেয়ে চেয়ে চ'লে যায়—যেন কার একটা বিরহ ব্যথা নিয়ে জলের ছোট ছোট ঢেউগুলো সাদা বালুর উপর আছড়িয়ে লুটিয়ে প'ড়ছে। ছেলেমেয়েরা আর জলে সাঁতার কাটে না। ঠানদির পূজোর জলে ছেড়ে দেওয়া ফুল জলেই ভেসে যায়; তা' ধরবার জন্য কোমর বেঁধে আর কেউ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে না! জলের ধারে পূজো ক'রতে ব'সে দেবতার চেয়ে ঠানদির কাছে সেই বেয়াড়া মেয়েটার কথাই আজ বেশী ক'রে মনে প'ড়চে।



কলরব-হীন ক্ষুদ্র পাড়াটির সুখ-প্রিয় লোকগুলো আজ অন্তর্বেদনায় গুমরিয়ে ম'রচে সেই অবাধ্য মেয়ের কলহাস্য ও উপদ্রবের অভাবে।

---

# জাম্‌সেদপুর ও তাহার কারখানা

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন সেন,
( রসা রোড )

জাম্‌সেদ্‌জী টাটা ছিলেন একজন ধনী পার্শী। তাঁহার মনে হইল এদেশে খুব বড় একটা লোহার কারখানা বসাইবেন। তিনি বিদেশ হইতে লোকজন আনাইলেন কিন্তু প্রথমতঃ নানা স্থান তন্ন তন্ন করিয়াও এমন খনি পাওয়া গেল না যাহার বলে ভারতে একটা কারখানার মত কারখানা স্থাপন করা যাইতে পারে। জাম্‌সেদ্‌জী দমিবার লোক ছিলেন না, আবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। খনি মিলিল—প্রধানতঃ এক ভারতবাসীর চেষ্টায়।

তখন টাটা ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশ হইতে এঞ্জিনিয়ার আনিয়া কারখানা স্থাপনের কাজে লাগিয়া গেলেন। তাঁহার বোধ হয় ইচ্ছা ছিল তাহারা এদেশী লোককে সমস্ত কাজ শিখাইয়া দিবে এবং উপযুক্ত মজুরী লইয়া দেশে ফিরিবে। হতভাগ্য দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ লোকমান্য টাটা কিছুকাল পরেই মৃত্যুর কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শ্বেতাঙ্গের দলও রহিয়া গেলেন। এখনও তাঁহারা কারখানার ওপরওয়ালা, জাম্‌সেদ্‌জীর সন্তানেরা পরিচালক।

যেখানে কারখানা, তাহা আগে ছিল জঙ্গলে ভরা—জায়গাটার নাম ছিল সাকৃচি। এখন ইহা লোকজনে পূর্ণ এক মস্ত সহর হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বড়লাট সাহেব ইহার নাম দিয়াছেন জাম্‌সেদ্‌পুর। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কারখানা প্রায় ২ মাইল দূরে। ষ্টেশনের নাম ছিল আগে কালীমাটী এখন হইয়াছে টাটানগর।

বর্ত্তমান জগতে যে সমস্ত বড় বড় কারখানা আছে টাটাকারখানা তাহার একটী। ইহার পরিধি প্রায় ৪½ ক্রোশ। চারিদিকে দরজা, সম্মুখের দরজায় জাম্‌সেদ্‌জীর পাথরের মূর্ত্তি। কারখানায় ঢুকিতে প্রথমেই বড় দপ্তর খানা। ইহার নীচের তলাটি মাটীর নীচে, দোতলায় একটী চওড়া রাস্তা—তাহার উপর মোটর গাড়ীও লোকজন চলাচল করে। তেতলায় জেনারেল ম্যানেজারের অফিস্‌! দোতলায় একটা অফিস্‌ আছে যাহার একমাত্র কাজ নূতন লোক বহাল করা। রোজ প্রায় ২০ হইতে ৭০ জন লোক নিযুক্ত হয়, অবশ্য ইহাদের বেশীর ভাগই

কুলী। প্রত্যহ প্রায় ৬০০।৭০০ লোক চাকরীর আশায় সম্মুখের ময়দানে আসিয়া জটলা করে। ভারতবর্ষের নানা জায়গা হইতেই লোক আসে। কারিকরের কাজে বেশী লাগিয়া যায় পঞ্জাবীরা—বাঙ্গালীদের হাত কোমল, সে দিকে বেশী ঝোঁকে না। গোটা কারখানায় প্রায় ৪০ হাজার লোক কাজ করে। আরও কত রকমের কাজ আছে। মোটের উপর নগরটী হইয়া পড়িয়াছে ঢাকা অপেক্ষাও অনেক বড়—লোক সংখ্যা এক লক্ষের উপর।

কারখানায় নানারকমের লোহার ও ইস্পাতের কাজ হয়, আর মালগাড়ী বোঝাই করিয়া জিনিষপত্র নানাস্থানে চালান দেওয়া হইয়া থাকে। গত মহাযুদ্ধের সময় এই কারখানা বিদেশে যুদ্ধের সরঞ্জাম পাঠাইয়া গবর্ণমেণ্টের যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলা কঠিন।

নগরে মিউনিসিপ্যালিটী আছে, তাহারও পরিচালনা টাটা কোম্পানীর হাতে। বড় বড় রাস্তা, ভাল ভাল বাড়ী, ডাক্তারখানা, জলের কল ইত্যাদি জাম্‌সেদ্‌পুর সহরকে সরগরম করিয়া ফেলিয়াছে। সন্ধ্যাবেলা সহরটী দেখিতে কি চমৎকার! পাহাড়ের উপর যখন আলো জ্বলিয়া উঠে তখন নীচ হইতে দেখিতে কি সুন্দর!

নগরের এক পাশে শিখদের ধর্ম্মমন্দির—মন্দিরটি বেশ বড়, দুই দিকে ফুলের বাগান।

বিদেশ হইতে কত লোক ভারতবাসীর এই কীর্ত্তি দেখিতে আসে। প্রকাণ্ড কারখানাটী ভারতে এক অপূর্ব্ব জিনিষ। নগরটীও দেখিবার জিনিষ বটে।

---

## চিত্র-পরিচয়

বালক ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমে কলিকাতায় আসিয়া তো স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। এই একটুখানি ছেলে, মাথায় কিন্তু প্রকাণ্ড এক ছাতা দিয়া স্কুলে আসিতেন। দূর হইতে দেখিলে মনে হইত বুঝিবা শুধু একটা ছাতাই রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছে। শরীরের আন্দাজে মাথাটা ছিল আবার বড়, তাই ছেলেরা ঠাট্টা করিয়া ক্ষেপাইত "যশুরে কৈ"। ঈশ্বরচন্দ্র মহা খাপ্পা হইয়া যাইতেন আর তোৎলাইতেন। ছোট বেলায় তিনি একটু তোৎলা ছিলেন, চটিয়া গেলেই সেটা ধরা পড়িত। ছেলেরা তখন ভারী মজা পাইয়া আরও ক্ষেপাইত আর কথাটাকে উল্টাইয়া বলিত,—"কশুরে জৈ, কশুরে জৈ"।

---

### টেলিফোনওয়ালা সহর

পৃথিবীর মধ্যে ৩১টি এমন সহর আছে যেখানে ১লক্ষের উপর টেলিফোন আছে। বৃটীশ রাজ্যের মধ্যে কেবল মাত্র লণ্ডন সহরই ইহার মধ্যে পড়ে।

### গণ্ডারের ঘ্রাণ-শক্তি

কুকুর প্রভৃতি অনেক জানোয়ারের গন্ধ শুঁকিবার অদ্ভুত ক্ষমতার কথা তোমরা জান। তবে এ বিষয়ে বোধ হয় গণ্ডার প্রভুই সব চেয়ে ওস্তাদ, সে নাকি দু'মাইল দূর হইতেও মানুষের গন্ধ টের পায়।

### দয়ালু গুলি

কিছুদিন আগে Mercy Bullet নামে একরকম নতুন ধরণের বন্দুকের গুলি তৈরী হইয়াছে। নামটার মানে হইতেছে 'দয়ালু গুলি'। এ গুলি দিয়া জানোয়ার মারা যায় তবে এই গুলি খাইলে নাকি কোন রকম যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। তাই এই নাম।

### পাঁচ ভাষার খবরের কাগজ

ফ্রান্সে "L' Arlequin" নামে একখানা খবরের কাগজ আছে। এই কাগজ খানায় প্রবন্ধগুলি পাঁচ রকম ভাষায় বাহির হয়। ভাষাগুলি হইতেছে জার্ম্মান, ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, স্পেনিশ ও ইটালিয়ান্। পাঁচ পাঁচটি দেশের লোক কাগজ খানি পড়িতে পারে।

### তামা আর জল

বিদ্যুতের শক্তিটা সব জিনিষের ভিতর দিয়া সমান ভাবে বহিতে পারে না। এক ইঞ্চির ২৫ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ বিশুদ্ধ জলের ভিতর দিয়া বিদ্যুতের যাইতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণে সে কতখানি তামার তারের ভিতর দিয়া বহিতে পারে শুনিবে? সে তামার তারটুকু দিয়া গোটা পৃথিবীটাকে কম করিয়া হাজার খানেক বার পাক দেওয়া যায়।

### তিন হাজার বছর পরের মানুষ

ভবিষ্যতে মানুষের অবস্থা কেমন দাঁড়াইবে সে বিষয়ে সম্প্রতি আমেরিকার বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা মিলিয়া এক সভায় নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। একটা বিষয়ে সকলেই এক মত হইয়াছেন—বুদ্ধিতে মানুষ ৩।৪ হাজার বছর পরে একটা প্রকাণ্ড কিছু হইয়া দাঁড়াইবে।

মানুষের শারীরিক আকার সম্বন্ধে এক দলের মত—মানুষ চেহারায়ও এক একটি ছোট খাট দৈত্য হইয়া দাঁড়াইবে। আর এক দল বলিতেছেন মানুষের মাথাটা হইবে প্রকাণ্ড, কিন্তু শরীরটা হইয়া যাইবে ছোট। ( ইংরাজী কাগজে মাঝে মাঝে যেমন 'কার্টুন' ছবি দেখা যায় বোধ হয় তেমনি )।

ডাক্তার আর্ডলিকার ও ওয়াশিংটন ভবিষ্যৎ মানুষের চেহারার একটা মোটামুটি বর্ণনা দিয়াছেন। মানুষের মাথাটা হইবে বড়, খুলিটা আরও পাৎলা। চোখ আরও বসিয়া যাইবে। নাক হইবে খগরাজের মত লম্বা, দাঁত অনেক কমিয়া যাইবে, আকারেও সেগুলি ছোট হইবে। হাত, পা সরু হইয়া যাইবে। চেহারাটা একটু লম্বা হইবারই সম্ভাবনা। মুখ চোখ দেখিতে আরও সুন্দর হইবে।

---

## গতমাসের ধাঁধা

গত মাসের "নূতন ধাঁধায়" ছাপার দোষে ২টি ভুল হইয়া গিয়াছে।—২নং ধাঁধা (খ)তে "১৭টি কাঠিকে ৩নং ছবির মত সাজাও" আছে; তাহার বদলে "২নং ছবির মত সাজাও" হইবে।

২নং ধাঁধা ( গ )—"৫টি কাঠি তুলিয়া লও" আছে। তাহার বদলে "৪টি কাঠি তুলিয়া লইয়া সেগুলি এমন ভাবে সাজাও" হইবে।

অধিকাংশ গ্রাহকই ভুল ২টা ধরিতে পারিয়াছেন; তবুও সকলে সম্পূর্ণ উত্তর পাঠান নাই বলিয়া আমরা কোন ধাঁধারই উত্তর বাহির করিলাম না। আগামী বারে সবগুলি উত্তর এক সঙ্গে দিব। যাঁহারা উত্তর পাঠাইয়াছেন এবং যাঁহারা ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে বৈশাখের ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে পারিবেন তাঁহাদের সকলের নামই আষাঢ় সংখ্যায় বাহির হইবে। তাহা ছাড়া জ্যৈষ্ঠ মাসে যে নূতন ধাঁধা দেওয়া হইল তাহার উত্তরদাতাদের নামও পৃথক্ ভাবে ছাপা হইবে।

---

## নূতন ধাঁধা

১। মাষ্টার মশাই আমাকে এমন একটা প্রশ্ন করলেন যার ঠিক উত্তর দিতে গিয়ে আমার "হাঁ" ভিন্ন আর কোন কথাই বলবার উপায় রইল না, বলতো প্রশ্নটা কি ?

২। ১ থেকে ৯ পর্য্যন্ত সংখ্যা গুলো নিয়ে এমন ভাবে যোগ আর গুণ কর যে উত্তর হবে ঠিক ১০০। একটা সংখ্যা কিন্তু এক বারের বেশী ব্যবহার করতে পারবে না।

---



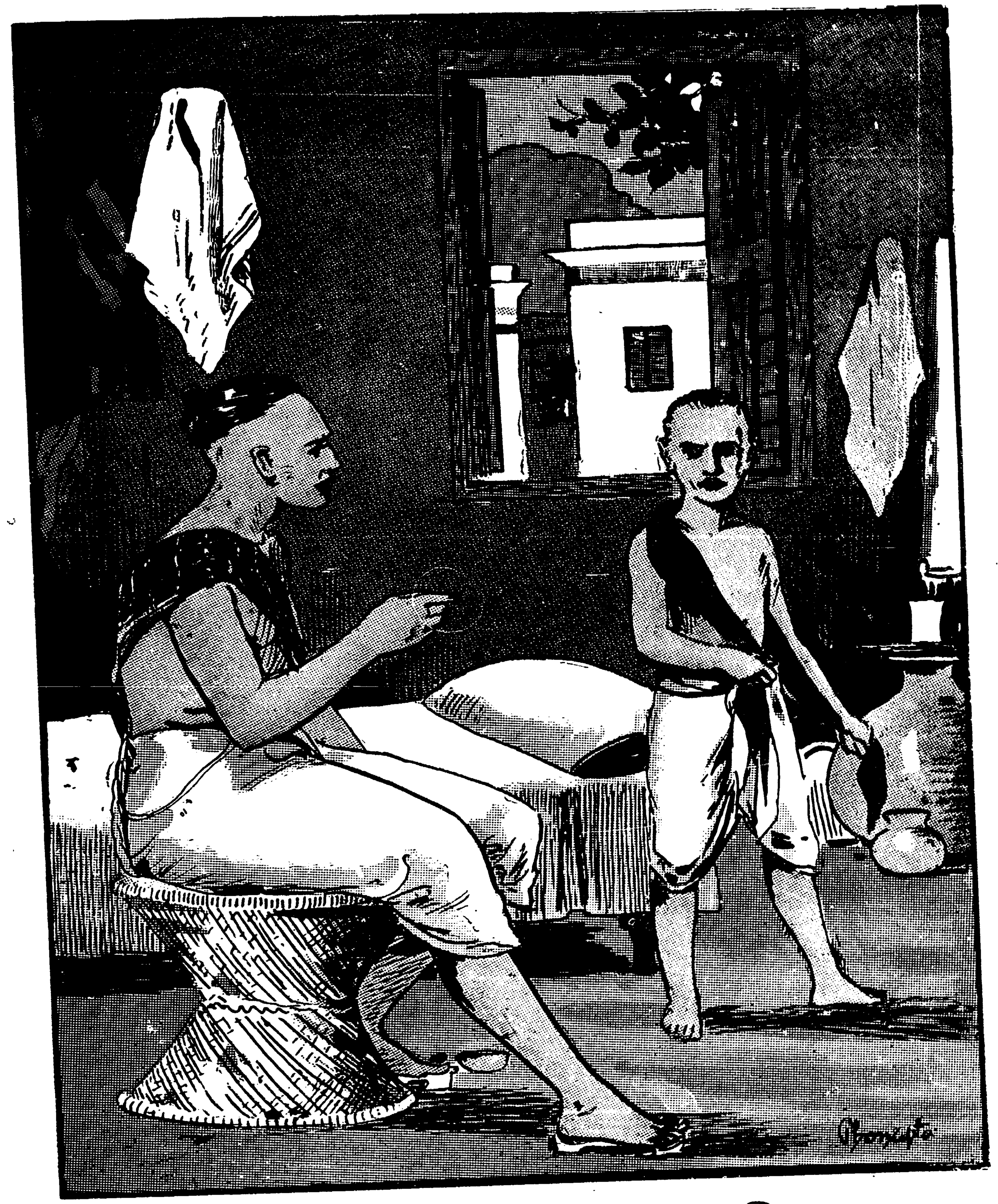

চিত্রে বিদ্যাসাগর জীবনী—৮

"নাইবো ই নাইবো"

[ চিত্র পরিচয় দেখ

শিল্পী—শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত ]

মানুষের শারীরিক আকার সম্বন্ধে এক দলের মত—মানুষ চেহারায়ও এক একটি ছোট খাট দৈত্য হইয়া দাঁড়াইবে। আর এক দল বলিতেছেন মানুষের মাথাটা হইবে প্রকাণ্ড, কিন্তু শরীরটা হইয়া যাইবে ছোট। ( ইংরাজী কাগজে মাঝে মাঝে যেমন 'কার্টুন' ছবি দেখা যায় বোধ হয় তেমনি )।

ডাক্তার আর্ডলিকার ও ওয়াশিংটন ভবিষ্যৎ মানুষের চেহারার একটা মোটামুটি বর্ণনা দিয়াছেন। মানুষের মাথাটা হইবে বড়, খুলিটা আরও পাৎলা। চোখ আরও বসিয়া যাইবে। নাক হইবে খগরাজের মত লম্বা, দাঁত অনেক কমিয়া যাইবে, আকারেও সেগুলি ছোট হইবে। হাত, পা সরু হইয়া যাইবে। চেহারাটা একটু লম্বা হইবারই সম্ভাবনা। মুখ চোখ দেখিতে আরও সুন্দর হইবে।

## গতমাসের ধাঁধা

গত মাসের "নূতন ধাঁধায়" ছাপার দোষে ২টি ভুল হইয়া গিয়াছে।—২নং ধাঁধা (খ)তে "১৭টি কাঠিকে ৩নং ছবির মত সাজাও" আছে ; তাহার বদলে "২নং ছবির মত সাজাও" হইবে।

২নং ধাঁধা ( গ )—"৫টি কাঠি তুলিয়া লও" আছে। তাহার বদলে "৪টি কাঠি তুলিয়া লইয়া সেগুলি এমন ভাবে সাজাও" হইবে।

অধিকাংশ গ্রাহকই ভুল ২টা ধরিতে পারিয়াছেন ; তবুও সকলে সম্পূর্ণ উত্তর পাঠান নাই বলিয়া আমরা কোন ধাঁধারই উত্তর বাহির করিলাম না। আগামী বারে সবগুলি উত্তর এক সঙ্গে দিব। যাঁহারা উত্তর পাঠাইয়াছেন এবং যাঁহারা ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে বৈশাখের ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে পারিবেন তাঁহাদের সকলের নামই আষাঢ় সংখ্যায় বাহির হইবে। তাহা ছাড়া জ্যৈষ্ঠ মাসে যে নূতন ধাঁধা দেওয়া হইল তাহার উত্তরদাতাদের নামও পৃথক্ ভাবে ছাপা হইবে।

## নূতন ধাঁধা

১। মাষ্টার মশাই আমাকে এমন একটা প্রশ্ন করলেন যার ঠিক উত্তর দিতে গিয়ে আমার "হাঁ" ভিন্ন আর কোন কথাই বলবার উপায় রইল না, বলতো প্রশ্নটা কি ?

২। ১ থেকে ৯ পর্য্যন্ত সংখ্যা গুলো নিয়ে এমন ভাবে যোগ আর গুণ কর যে উত্তর হবে ঠিক ১০০। একটা সংখ্যা কিন্তু এক বারের বেশী ব্যবহার করতে পারবে না।



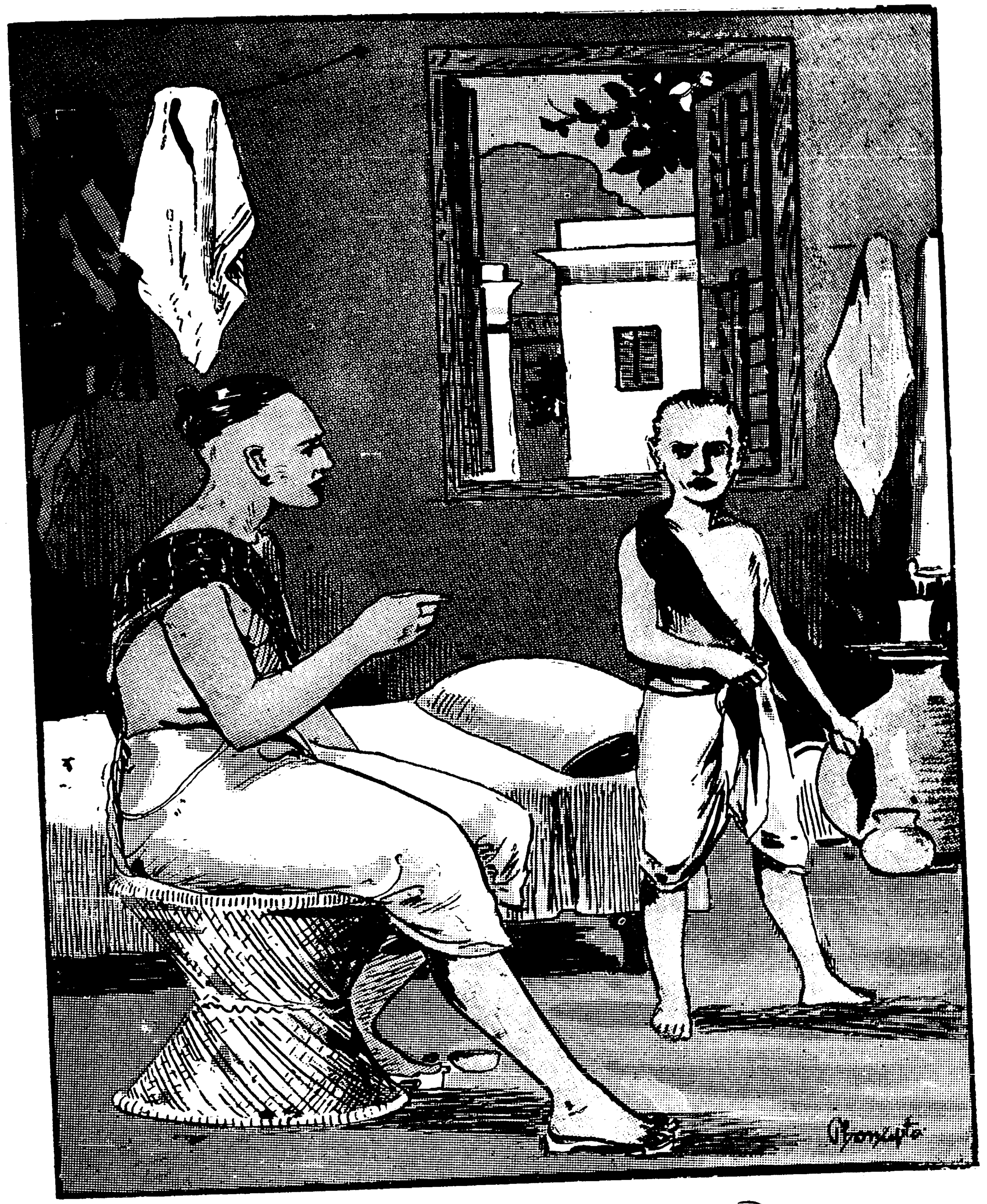

চিত্রে বিদ্যাসাগর জীবনী—৫

"নাইবো ই নাইবো"

[ চিত্র পরিচয় দেখ

শিল্পী—শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত ]

INTENTIONAL

২য় বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৩৬ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

# বাজিকরের দেশ

( শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ )

সেথা আম গাছে জাম ফলে, তাল গাছে বেল,
বৈঁচির গাছে ফলে তাল নারিকেল।
মাটী সেথা শর্করা, কর্দ্দম গুড়,
বালি সেথা সোনারেণু, নীলা হীরা চূর।
সেথা গোলাপে বেদানা ফলে মধুর দানা
দ্রাক্ষায় ফলে থোলো হাসানুহানা।
ইক্ষুর গাছে ফলে লীচু বারমাস,
তেঁতুলের ডালে ঝোলে কচি তালশাঁস।

সেথা ময়ূরের কণ্ঠেতে কোকিলের স্বর,
সমীরণে সন্দেশ ঝরে ঝর ঝর।
পুস্তকই করে সেথা তৈরী পড়া,
খাতা কসে অঙ্ক যে আপনি ত্বরা,
'ফি' দিলেই পাস করা যেখানে সোজা,
বৃত্তি সবাই পায়, বোঝ কি মজা!
শ্রম বিনা কাজ সেথা হয় আপনি,
নাহিক গরীব, সবে ধনী ও গুণী।
বিঘ্নের সাথে সেথা দ্বন্দ্ব নাহি,
সফলতা মিলে সেথা কেবলি চাহি।
নাই তপ আরাধনা, ভকতি বিরল,
বক্ষের শিলা ভাঙ্গা নাই আঁখিজল।
তোমরা চেওনা যেন যেতে সে দেশে
গৌরব মিলে যেথা বিনা আয়াসে।

---

# ছবির কথা

বাড়ীতে মাসিক পত্রিকা আসিলে প্রথমেই আমি দেখি তার মধ্যে কি কি ছবি বাহির হইয়াছে। আমার বিশ্বাস তোমরা অনেকেই প্রায় তাই কর, নয় কি? ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ছবি ভাল লাগে না এমন লোক খুব কমই আছে, বিশেষতঃ সে ছবি যদি তেমন কোন ভাল চিত্রকরের আঁকা হয়।

ভাল চিত্রকর বলিতে আমি তাঁহাদের কথাই বলিতেছি—যাঁহারা তুলি দিয়া এমন সব ছবি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন যাহা দেখিলে কখন বা তোমার চোখে সত্যি সত্যিই জল আসিয়া পড়িবে, কখনও বা মনে হইবে তুমি যেন কোন জীবন্ত দৃশ্য দেখিতেছ, আবার কখনও বা অবাক্ হইয়া ভাবিবে—আচ্ছা,



মানুষের চিন্তাকে মনের মধ্য হইতে টানিয়া আনিয়া ছবির মধ্যে গাঁথিল কেমন করিয়া! সেই সব জীবন্ত আশ্চর্য্য ছবির ছোট্ট নকল ফটোগ্রাফ দেখিয়াই আমরা হাঁ করিয়া থাকি; রং বেরংএর, বিরাট আকারের আসল জিনিষটা দেখিলে কি করিতাম কে জানে?

পৃথিবীর মধ্যে এ পর্য্যন্ত যত চিত্রকর জন্মিয়াছেন তার মধ্যে সব চেয়ে বড় কে বল দেখি? কেউ বলে টিসিয়ান্, কেউ বলে র‍্যাফেল, আবার কেউ কেউ বলে মাইকেল এঞ্জোলোই সব চেয়ে বড়। ইঁহাদের তিন জনেই ইটালীদেশের লোক।

টিসিয়ান্ ছিলেন রংএর রাজা; রংএর কারিকুরীতে তাঁহার কাছে কেহ বড় একটা ঘেঁষিতে পারে না। মানুষের চেহারা বল, ধর্ম্মবিষয়ক দৃশ্য বল, কাল্পনিক কোন বিষয়ের ছবিই বল—প্রত্যেকটি আঁচড়ের মধ্যে টিসিয়ান্ এক একটি নূতন ভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন। শুধু রংএর কৌশলই নয়, ছবিকে সজীব করিয়া তুলিতেও টিসিয়ান কম ওস্তাদ ছিলেন না। টিসিয়ান্ কত বড় শিল্পী ছিলেন তাঁহার সম্বন্ধে ২।১টা গল্প বলিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে।

দেশবিদেশের যত বড় বড় রাজা টিসিয়ান্‌কে দিয়া ছবি আঁকাইতে পারিলে নিজেদের রীতিমত ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতেন। সম্রাট্ পঞ্চম চার্লসের সভায় তখন টিসিয়ানের ভয়ানক কদর। সভার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত সভ্যের চোখে এটা তেমন ভাল লাগিত না। কথাটা রাজার কাণে গেলে তিনি হাসিয়া বলিলেন "আমার সভায় বড় বড় সভ্য তো অনেকেই আছে, কিন্তু টিসিয়ান তো দুটি নাই"। আর একদিন ছবি আঁকিতে গিয়া টিসিয়ানের হাত হইতে তুলিটা পড়িয়া গেল। সম্রাট্ ছুটিয়া আসিয়া নিজে সেটা তুলিয়া দিয়া বলিলেন "এত বড় একজন চিত্রকরের চাকরের কাজ করিয়া দেওয়াও সম্মানজনক।"

স্পেনের রাজপ্রাসাদে আগুন লাগিল, কত লাখে লাখে টাকার মাল নষ্ট হইয়া গেল; রাজা সেখানে ছিলেন না, খবর পাইতেই ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়াই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার ঘরে টিসিয়ানের আঁকা সেই ভিনাসের

সেথা ময়ূরের কণ্ঠেতে কোকিলের স্বর,
সমীরণে সন্দেশ ঝরে ঝর ঝর।
পুস্তকই করে সেথা তৈরী পড়া,
খাতা কসে অঙ্ক যে আপনি ত্বরা,
'ফি' দিলেই পাস করা যেখানে সোজা,
বৃত্তি সবাই পায়, বোঝ কি মজা!
শ্রম বিনা কাজ সেথা হয় আপনি,
নাহিক গরীব, সবে ধনী ও গুণী।
বিঘ্নের সাথে সেথা দ্বন্দ্ব নাহি,
সফলতা মিলে সেথা কেবলি চাহি।
নাই তপ আরাধনা, ভকতি বিরল,
বক্ষের শিলা ভাঙ্গা নাই আঁখিজল।
তোমরা চেওনা যেন যেতে সে দেশে
গৌরব মিলে যেথা বিনা আয়াসে।

---

# ছবির কথা

বাড়ীতে মাসিক পত্রিকা আসিলে প্রথমেই আমি দেখি তার মধ্যে কি কি ছবি বাহির হইয়াছে। আমার বিশ্বাস তোমরা অনেকেই প্রায় তাই কর, নয় কি? ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ছবি ভাল লাগে না এমন লোক খুব কমই আছে, বিশেষতঃ সে ছবি যদি তেমন কোন ভাল চিত্রকরের আঁকা হয়।

ভাল চিত্রকর বলিতে আমি তাঁহাদের কথাই বলিতেছি—যাঁহারা তুলি দিয়া এমন সব ছবি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন যাহা দেখিলে কখন বা তোমার চোখে সত্যি সত্যিই জল আসিয়া পড়িবে, কখনও বা মনে হইবে তুমি যেন কোন জীবন্ত দৃশ্য দেখিতেছ, আবার কখনও বা অবাক্ হইয়া ভাবিবে—আচ্ছা,



মানুষের চিন্তাকে মনের মধ্য হইতে টানিয়া আনিয়া ছবির মধ্যে গাঁথিল কেমন করিয়া! সেই সব জীবন্ত আশ্চর্য্য ছবির ছোট্ট নকল ফটোগ্রাফ দেখিয়াই আমরা হাঁ করিয়া থাকি; রং বেরংএর, বিরাট আকারের আসল জিনিষটা দেখিলে কি করিতাম কে জানে?

পৃথিবীর মধ্যে এ পর্য্যন্ত যত চিত্রকর জন্মিয়াছেন তার মধ্যে সব চেয়ে বড় কে বল দেখি? কেউ বলে টিসিয়ান, কেউ বলে র‍্যাফেল, আবার কেউ কেউ বলে মাইকেল এঞ্জোলোই সব চেয়ে বড়। ইঁহাদের তিন জনেই ইটালীদেশের লোক।

টিসিয়ান্ ছিলেন রংএর রাজা; রংএর কারিকুরীতে তাঁহার কাছে কেহ বড় একটা ঘেঁষিতে পারে না। মানুষের চেহারা বল, ধর্ম্মবিষয়ক দৃশ্য বল, কাল্পনিক কোন বিষয়ের ছবিই বল—প্রত্যেকটি আঁচড়ের মধ্যে টিসিয়ান্ এক একটি নূতন ভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন। শুধু রংএর কৌশলই নয়, ছবিকে সজীব করিয়া তুলিতেও টিসিয়ান কম ওস্তাদ ছিলেন না। টিসিয়ান্ কত বড় শিল্পী ছিলেন তাঁহার সম্বন্ধে ২।১টা গল্প বলিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে।

দেশবিদেশের যত বড় বড় রাজা টিসিয়ান্‌কে দিয়া ছবি আঁকাইতে পারিলে নিজেদের রীতিমত ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতেন। সম্রাট্ পঞ্চম চার্লসের সভায় তখন টিসিয়ানের ভয়ানক কদর। সভার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত সভ্যের চোখে এটা তেমন ভাল লাগিত না। কথাটা রাজার কাণে গেলে তিনি হাসিয়া বলিলেন "আমার সভায় বড় বড় সভ্য তো অনেকেই আছে, কিন্তু টিসিয়ান তো দুটি নাই"। আর একদিন ছবি আঁকিতে গিয়া টিসিয়ানের হাত হইতে তুলিটা পড়িয়া গেল। সম্রাট্ ছুটিয়া আসিয়া নিজে সেটা তুলিয়া দিয়া বলিলেন "এত বড় একজন চিত্রকরের চাকরের কাজ করিয়া দেওয়াও সম্মানজনক।"

স্পেনের রাজপ্রাসাদে আগুন লাগিল, কত লাখে লাখে টাকার মাল নষ্ট হইয়া গেল; রাজা সেখানে ছিলেন না, খবর পাইতেই ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়াই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার ঘরে টিসিয়ানের আঁকা সেই ভিনাসের

ছবিখানা—সেখানাও কি পুড়িয়া গিয়াছে ?" চাকরেরা বলিল "না, বহু কষ্টে সেটা বাঁচাইয়াছি ;" শুনিয়া রাজার সমস্ত শোক চলিয়া গেল। তিনি হাসিয়া বলিলেন "তাহা হইলেই হইল, আর কিছুর জন্য আমার দুঃখ নাই।"

টিসিয়ানের আঁকা "ভালবাসার বাগান"

টিসিয়ানের আঁকা একখানা ছবির ফটো এখানে দিলাম। আসল ছবিখানার রং এর কারিকুরী, জীবন্ত ভাব ইহার মধ্যে নাই, তবুও ছবিখানা কি রকম বল দেখি। ছবিখানার নাম 'ভালবাসার বাগান'। জীবনের সজীবতা, চাঞ্চল্য কেমন চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখ দেখি। ছবিখানা ৪০০ বছর আগে আঁকা কিন্তু প্রত্যেকটি আঁচড় এখনও তেমনি উজ্জ্বল হইয়া আছে।

র্যাফেলের নাম তোমরা অনেকেই বোধ হয় শুনিয়াছ। ছেলেবেলায় র্যাফেল এক মস্ত শিল্পীর কাছে ছবি আঁকা শিখিতেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল ছাত্রের বিদ্যা গুরুমারা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। র্যাফেল তাঁহার আগেকার সমস্ত বড় বড় শিল্পীর কৌশল প্রাণ দিয়া আয়ত্ত করিয়াছিলেন, আর



সে সমস্ত একত্র করিয়া তিনি নিজে যে ছবিগুলি দাঁড় করাইতেন এক কথায় সেগুলিকে বলা হয় নিখুঁত। এইখানেই তাঁহার বাহাদুরী। র্যাফেলের বেশীর ভাগ ছবিই যীশুখ্রীষ্ট ও তাঁর মা ম্যাডোনার। মাতৃস্নেহের যে অদ্ভুত রূপ তিনি তাঁর ছবিগুলিতে ফুটাইতে পারিতেন সে রকমটি এ পর্য্যন্ত আর কাহারও সাধ্যে কুলায় নাই। অথচ এই র্যাফেল মাত্র ৩৭ বছর বাঁচিয়াছিলেন। র্যাফেল কারিগরও কম ছিলেন না। রোমের যে বিখ্যাত সেণ্টপিটার্স গির্জ্জা—যার চেয়ে বড় গির্জ্জা আর পৃথিবীতে নাই—তাও র্যাফেলেরই হাতে গড়া।

"মায়ের কোলে যীশু"—র্যাফেলের আঁকা

মাইকেল এঞ্জেলোটিও কম নহেন, অনেকে তাঁকে র্যাফেলের চেয়েও উঁচু আসনে বসায়। তিনি মূর্ত্তি গড়িতেও ছিলেন বেজায় পটু, আর তুলির হাতটাও ছিল তাঁর যাদুকরেরই মত। একা তিনি যে কত বড় বড় গির্জ্জার ছাদ, বেদী চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন তাহার হিসাব করিলেও অবাক্ হইতে হয়। আর সে সব চিত্রের যোড়া খুব কমই পাওয়া গিয়াছে।

এবার আর একজনের কথা বলি। ইঁহাকে বলা হয় টিণ্টোরেটো অর্থাৎ ছোট্ট রংওয়ালা। ইঁহার বাবা ছিলেন রংওয়ালা, তাই এই নাম। নিতান্ত ছোট বয়সে ইনি করিতেন কি—ঘরে কেউ না থাকিলেই বাপের রংএর বাক্স খুলিয়া বসিতেন আর বিছানা, বালিশ, দেওয়াল, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি হাতের কাছে যাহা দেখিতেন তাহাই চিত্র করিতে আরম্ভ করিতেন। বাপ-মা ব্যাপার

দেখিয়া ভাবিতেন—হোক্, ছেলেটা যখন ছবি আঁকিতে এত ভালবাসে তখন তাই শিখুক। তাঁহারা টিণ্টোরেটোকে টিসিয়ানের কাছে শিখিতে পাঠাইয়া দিলেন।

২।১ দিন পরেই একদিন টিসিয়ান তাঁহার ছবি আঁকিবার ঘরে ঢুকিয়া দেখেন, মেজের উপর এক গাদা ছবি পড়িয়া আছে। ছবি দেখিয়া ত' তিনি অবাক, কে ছবি আঁকিয়াছে? বালক টিণ্টোরেটো মাথা নীচু করিয়া বলিলেন—তিনিই আঁকিয়াছেন। টিসিয়ান দেখিলেন এ ছোক্‌রা কালে তাঁহাকেও ছাড়াইয়া যাইতে পারে। তিনি তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন। তারপর—বলিতে লজ্জা হয়—বালককে সেদিনই সেখান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইল।

কিন্তু টিণ্টোরেটো ছাড়িবার ছেলে নন, তিনি সম্মুখে টিসিয়ান আর মাইকেল এঞ্জেলোর আদর্শ রাখিয়া নিজের চেষ্টায় ছবি আঁকা শিখিলেন। শুধু তাই নয়, যখনই সুবিধা পাইতেন বড় বড় চিত্রকরের ঘরে গিয়া তিনি উঁকি মারিতেন—তাদের কৌশল শিখিবার জন্য। কোথায় নতুন বাড়ী তৈরী হইতেছে—টিণ্টোরেটো গিয়া হাজির—তিনি বাড়ী চিত্র করিবেন। কর্ত্তা হয়তো রাজী হইলেন না। কিন্তু টিণ্টোরেটো ছাড়িবার পাত্র নন। তিনি বলিলেন "আমি মজুরী চাই না, অমনি খাটিয়া দিব।" তখন আর আপত্তি করে এমন বোকা কে আছে?

সান রক্কো স্কুলের বাড়ী তৈরী হইয়াছে, তাহার ছাদ চিত্রিত করা হইবে। ভেনিসের বড় বড় চিত্রকরদের বলা হইল যদি কেউ কাজ পাইতে চাও ত' শীগ্‌গীর ছবির এক একটা মোটা মুটী নক্সা করিয়া পাঠাও, সময় অল্প। অন্যান্য শিল্পীরা তাড়াতাড়ি এক একটা যেমন তেমন নক্সা পাঠাইয়া দিল। কিন্তু টিণ্টোরেটো করিলেন কি, দিন-রাত খাটিয়া দুইদিনের মধ্যে আসল ছবিখানাই আঁকিয়া ফেলিলেন। তার পর নানা কৌশল করিয়া গোপনে ছবিখানা সেই বাড়ীর ছাদে আঁটিয়া দিয়া আসিলেন।

যেদিন ছবির বিচার হইবে সেদিন সমস্ত চিত্রকর গিয়া সেই বাড়ীতে জড় হইল। তার পর সকলে একে একে নিজ নিজ ছবির নক্সা দেখাইতে লাগিল।



টিণ্টোরেটোর পালা আসিলে তিনি যে কাপড়খানা দিয়া ছাদ ঢাকা ছিল সেটা টানিলেন। সকলে অবাক্ হইয়া দেখে ছাদের মধ্যে চমৎকার ছবি আঁকা রহিয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া কর্ত্তারা ত' রাগিয়া লাল। ছবি লাগাইতে কে হুকুম দিল? টিণ্টোরেটো বলিলেন—"আচ্ছা, আপনাদের দাম দিতে হইবে না, আমি ছবিখানা অমনি আঁকিয়া দিলাম।" তখন কর্ত্তাদের রাগ পড়িল। তার পর তাঁহারা ছবিটা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং সকলেই স্বীকার করিলেন এত চমৎকার ছবি সচরাচর দেখা যায় না। টিণ্টোরেটো তখন উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলেন।

"হাটের গাড়ী"—গেনস্‌বরোর আঁকা

এইবার ইংলণ্ডের ২।১টী চিত্রকরের কথা বলি। "হাটের গাড়ী" নামে যে ছবিখানা দেখিতেছ ওটা হইতেছে গেনস্‌বরোর আঁকা। মানুষের চেহারা আঁকিতে ইনি যেমন ওস্তাদ ছিলেন প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকিতেও তেমনি ভালবাসিতেন। ইঁহার অনেক ছবিই

চিত্রজগতে খুব উঁচু আসন পাইয়াছে। ছেলেবেলায় গেন্‌সবরো লেখাপড়ার বদলে ছবি আঁকিয়া সময় কাটাইতেই বেশী ভালবাসিতেন। আর আর ছেলেরা যখন খেলা করিয়া বেড়াইত তিনি তখন পথে ঘাটে, ফুল, ফল, পাখী যা দেখিতেন তারই ছবি আঁকিয়া লইতেন। একবার বালক গেন্‌সবরো দেখিলেন তাঁহার বাবার বাগানে একটা লোক উঁকি মারিতেছে। তিনি তাঁহার পকেটবুকে লোকটীর একটা ছবি আঁকিয়া ফেলিলেন। সেইদিন রাত্রে তাঁহাদের বাড়ীতে চুরি হইল। তার পরে দেখা গেল গেন্‌স্‌বরো সেই চোরেরই ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে ঠিক করিল—না একে ছবি আঁকানই শিখাইতে হইবে। ফলে আমরা শিল্পী গেন্‌স্‌বরোকে পাইলাম। বিলাতের প্রসিদ্ধ চিত্র সমালোচক রাস্কিন্‌ বলেন "গেন্‌স্‌বরো চিত্রজগতের ইতিহাসে চিরকালের মত অমর হইয়া থাকিবেন"।

রেনল্ড্‌সের আঁকা "সরলতা"



গেন্‌স্‌বরোর সময়কার বিলাতের আর একজন বড় শিল্পী ছিলেন সার্‌ যোশুয়া রেনল্ড্‌স্‌। রংএর বাহাদুরী দেখাইতে ইঁহার জুড়িদার সে সময় ছিল না বলিলেই হয়। রেনল্ড্‌সের "সরলতা" ছবিখানা জগদ্‌-বিখ্যাত। রেনল্ডসের শেষ জীবনটা বড় দুঃখের। অল্প বয়সে তিনি কাণে কালা হইয়া গিয়াছিলেন। বুড়া বয়সে আবার অন্ধ হইয়া যান।

ইংলণ্ডের আর একজন বড় চিত্রকর হোগার্থ। ইঁহার সম্বন্ধে ভারী মজার একটা গল্প আছে। হোগার্থ আগে ছিলেন ভয়ানক গরীব। তার পর ছবি আঁকিয়া তিনি অনেক টাকা রোজগার করেন। হাতে টাকা হইলে একদিন তিনি একখানা গাড়ী কিনিয়া লণ্ডনের লর্ড মেয়রের সাথে দেখা করিতে গেলেন। যখন ফিরিলেন তখন তাঁহার আর গাড়ীর কথা মনে নাই। বেশ বৃষ্টি পড়িতেছিল। হোগার্থ একখানা ভাড়াটে গাড়ীর জন্য অনেকক্ষণ খোঁজ করিলেন; তার পর না পাইয়া ভিজিতে ভিজিতে হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিলেন; অথচ দুয়ারে যে তাঁহার নিজের গাড়ী তাঁহারই জন্য পড়িয়া রহিল সে কথা তাঁহার খেয়ালই হইল না।

এতক্ষণ বিলাতী চিত্রকরদের কথাই বলিলাম। আমাদের দেশের পুরাণো শিল্পীদের কথা আজ আর বলা হইল না।

---

# বৈজ্ঞানিক

(শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী এম্‌-এ, বি-এল)

নিশিকান্তের বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন এক দৈবজ্ঞ তাহার হাত দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এ ছেলে বড় যে-সে ছেলে নয়—কালে কালে এ একজন মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক হ'বে। বছর দুই না যাইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। সন্ধ্যাবেলা নতুনবৌদিদি চুল বাঁধিবার জন্য ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, নিশিকান্ত তাহার দাদার বিয়ের ঘড়িটার সমস্ত যন্ত্রপাতি ছুরী দিয়া খুলিয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে

আবার যোড়া দিবার চেষ্টায় আছে। এইটুকুন বয়সে এতখানি জ্ঞান-পিপাসা আমি তো কোথাও শুনি নাই। কিন্তু তাহার দাদা নিতান্তই বেরসিক লোক, ও সব কিছুই বুঝিলেন না। "নিশে" বলিয়া এক হাঁক দিলেন, এবং বেচারীর কাণ এবং গালের উপর এমন সব কাণ্ড করিলেন যাহাকে মোটেই বৈজ্ঞানিকের পুরস্কার বলা যায় না।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নিশিকান্ত ক্রমেই কেমন যেন আন্‌মনা হইয়া পড়িল। পড়াশুনা, খাওয়া পড়া, কিছুতেই মন নাই। মাষ্টার মশায় যদি জিজ্ঞাসা করেন,—"কিরে নিশি, তোর ভূগোল কোথায় ?" সে চমকিয়া উঠিয়া বলে,—"আজ্ঞে আমরা তিন ভাই।" তাহার বাবা বড়ই বিপদে পড়িলেন। শেষটায় নিশিকে কলিকাতায় মামার বাড়ী পাঠানো হইল, যদি সেখানে কিছু হয়। মাসখানেকের মধ্যেই নিশি এক গলির মোড়ে গোরুর গাড়ী চাপা পড়িয়া হাত ভাঙ্গিয়া লইল। মামা বলিলেন,—কাজ নাই বাপু, তুমি ভালোয় ভালোয় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

কলিকাতা যাওয়া-আসা উপলক্ষে নিশি সেই প্রথম রেলগাড়ী দেখিল। তাহার বাবা বুঝাইয়া দিলেন, "ঐ যে ইঞ্জিন দেখ্‌ছ, ওটা বাষ্পে চলে ; জল গরম কর্‌লেই বাষ্প হয়।" দিন পাঁচ ছয় পরে হঠাৎ একদিন নিশিকান্তের আর দেখা নাই। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। অবশেষে বাড়ীর পিছনে যে জঙ্গলটা আছে তাহারি মধ্যে তাহাকে পাওয়া গেল। একটা ষ্টোভ জ্বলিতেছে, তাহার উপরে এক হাঁড়ি জল ; মুখে একটা সরার ঢাক্‌নি এবং তাহার চারিধার কাদা দিয়া আটকানো। একটা দড়ির একদিক সেই হাঁড়ির গলায়, আর অন্য দিকটা কাছেই একখানি চেয়ারের পায়ের সঙ্গে বাঁধা। নিশিকান্ত চেয়ারে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছে কখন্ বাষ্পের জোরে রেলগাড়ীর মত সেও চলিতে সুরু করিবে। ব্যাপার দেখিয়া মা ত' অবাক্! কহিলেন—"হতভাগা ছেলে, যত সব বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড, চল্, বাড়ী চল্।" নিশিকান্ত কহিল, "দাঁড়াও,—কথা কয়োনা।" হঠাৎ ঠাস্ করিয়া হাঁড়ি ফাটা, আর সঙ্গে সঙ্গে ফুটন্ত জল একেবারে নিশিকান্তের পায়ের উপর। তার পর পূরা একটি মাস বিছানায়।



বাষ্প গেল, এবার বিদ্যুৎ। নিশিকান্ত স্থির করিয়া ফেলিল, বাড়ীতে যদি ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বালিতে না পারে তবে সে একটা মানুষই নয়। বাবার কাছে শোনা ছিল, যে কোন জিনিষ চলে তাহাতেই বিদ্যুৎ জন্মে। চলার বেগ যত বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের পরিমাণও তেমনি বাড়িয়া যায়। সেই বিদ্যুৎ তার-যোগে নানা স্থানে চালান হয় এবং তাহা হইতে আলো জ্বলে, পাখা চলে।...উঠানে কাপড় শুকাইবার জন্য তার আনা হইয়াছিল, তাহারই অনেকটা নিশিকান্ত যোগাড় করিয়া ফেলিল। তাহার একটা মুখ ঘরে জানালার সঙ্গে জড়াইয়া একটা তেল মাখানো সলিতা বাঁধিয়া দিল। বাকী মুখটা হাতে লইয়া নিশিকান্ত রাস্তায় গিয়া একবার এদিক, একবার ওদিক অত্যন্ত বেগে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। পাড়ার যত ছেলে বুড়ো দল বাঁধিয়া আসিয়া দেখিল, নিশিকান্তের সমস্ত দেহ ঘামিয়া গিয়াছে, তবু বিশ্রাম নাই—একবার এদিক, একবার ওদিক। সবাই কহিল, "ওরে নিশি, তোর হ'ল কি ?" নিশি কহিল,—"বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ, গিয়ে দ্যাখ ঘরে আলো জ্বলছে।" কিন্তু আলো জ্বলিবার আগেই তাহার দাদা বেজায় জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং নিশিকান্তের কাণ ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া নিয়া চাকরকে বলিলেন,—ওটাকে হাওয়া কর, নিশি এখ্‌খুনি মরবে।

ইহার পর নিশিকান্তের বিজ্ঞান-চর্চ্চাটা অনেকদিন বন্ধ রহিল। কিন্তু সে তো দমিবার ছেলে নয়। দমিলে চলিবেই বা কেন ? পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা বড় বড় আবিষ্কার করিয়াছেন, গোড়ার দিকে তাঁহাদের সবাইকেই এমনি করিয়া ফেল করিতে হইয়াছিল। বার বার হারিয়া তবে তো জিত।

সেবার জ্যৈষ্ঠ মাসে বেজায় গরম। সকলে বলাবলি করিল,—এরকম আর তিনদিন চলিলে মানুষ বাঁচিবে না। নিশি কহিল,—কি বাঁচিবে না ? আচ্ছা দেখা যাক্। দুই এক ঘণ্টা ভাবিতেই নিশিকান্তের মাথায় এক চমৎকার ফন্দি জুটিল। বাড়ীতে একটা পুরাণো পৃথিবীর ম্যাপ ছিল ; তাহা হইতে উত্তর মেরু, আর দক্ষিণ মেরুর ছবি দুইটা কাটিয়া সে দেয়ালে টাঙ্গাইয়া দিল। এ ছাড়া অন্য কতগুলি ছবিও যোগাড় করিল,—এই, যেমন টেম্‌স্‌নদীর জল বরফ হইয়া গিয়াছে ;

সাহেবরা দলে দলে 'স্কেটিং' খেলিতেছে; হিমালয়ের মাথায় বরফের তাল জমিয়া আছে; নরওয়ের কোন্ গ্রামে তুলার মত বরফ পড়িতেছে আর তাহার মধ্য দিয়া এক মেমসাহেব সমস্ত গায়ে মাথায় টুপি, ওভার কোট্ চাপাইয়া গুটি সুটি হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়াছে, ইত্যাদি। এত সব ভয়ানক ভয়ানক শীতের আড্ডা এক সঙ্গে জড় করিলে গরমের সাধ্য কি টিকিয়া থাকে? রামায়ণে আছে, রত্নাকর ছিল ডাকাত, কেবল মাত্র 'রাম' নামের জোরে হইয়া গেল বাল্মীকি ঋষি। সুতরাং মেরুদেশের নামে গরম ঘর ঠাণ্ডা হইবে, এ আর বেশী কি? নিশিকান্ত কিন্তু ঐখানেই থামিল না, আরো ঠাণ্ডার আয়োজন করিল। সমস্ত ঘরময় খড়ি দিয়া লিখিল,—মাঘমাস, এঁদো পুকুরের পচা জল, মিছরির সরবৎ, তরমুজ, রাখাল (রাখাল নিশির ছোট ভাই, খুব ঠাণ্ডা ছেলে)। নিশিকান্ত বুঝিল, দশমিনিটের মধ্যেই ঘরে একেবারে মাঘমাসের পাহাড়ে শীত ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তাই আগে থাকিতেই গোটা ছুই মোটা কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিল।

ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত কি হইল, তোমাদের শুনিবার দরকার নাই। তবে এইটুকু জানিয়া রাখ যে, নিশিকান্তের সেই বেরসিক দাদাটি সেদিনও বাড়ীতেই ছিলেন। ইহার পরে আরো ছুই চারিটা বড় বড় আবিষ্কার নিশিকান্ত করিয়াছিল, কিন্তু সে কথা তোমাদের বলিব না। আমি বেশ বুঝিতেছি, তোমরা ইহারি মধ্যে রীতিমত হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছ। তা তো হাসিবেই। নিজেরা তো কিছুই পারোনা; অন্যে যদি কিছু পারে, তাহাও ঠাট্টা করিয়া উড়াইবে। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ, তাহার দাড়ি আবিষ্কার জিনিষটা কত বড়?

অনেকদিন পরের কথা। মনের ছুঃখে নিশিকান্ত মাঝখানে একবার দেশান্তরী হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বেশীদিন থাকিতে পারে নাই। যখন ফিরিল, দেখিলাম, তাহার মুখে প্রায় ছুইহাত লম্বা দাড়ি। সকলে কহিল, "একি নিশিকান্ত, এই বয়সেই সন্ন্যাসী হ'লে?" নিশিকান্ত রাগিয়া উঠিল,—"সন্ন্যাসী নয়, এই দাড়ি দিয়ে দেশের কষ্ট মেটাবো।"



সে কি রকম?

দাড়ি দিয়ে দেশের কষ্ট মেটাবো

নিশিকান্ত কহিল, "খবর রাখো, কত কোটী টাকার কাপড় বছর বছর বিদেশ থেকে আমাদের আনতে হয়? ষাট্ কোটী!! অথচ ইচ্ছা কর্‌লেই সমস্ত টাকাটা আমরা বাঁচাতে পারি। কেমন করে, জানতে চাও? আমার মত দাড়ি রাখ। এক বছরেই এতটা হয়েছে, আর ছুবছর পরে মাটীতে গড়াবে। তখন কেটে নিয়ে তাঁতী-বাড়ী দিলেই ব্যস। ছুখানা কাপড় হ'বে, আর টিকবে অন্ততঃ তিন বছর।"

কথা শুনিয়া সমস্ত লোক হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। নিশিকান্ত আবার বলিল,—"আর শুধু কি কাপড়? মাঘমাসের শীতে"—বলিয়া দাড়িগুলা গলায় জড়াইয়া কহিল—"চমৎকার গলা বন্ধ। রোদে কষ্ট পাচ্ছ? কুছ পরোয়া নেই"—বলিয়া দাড়ির বোঝা মাথায় তুলিয়া কহিল—"ছাতার পয়সা লাগ্‌বে না।"

সমস্ত লোক 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া উঠিল। এক সঙ্গে কাপড়, গলাবন্ধ

আর ছাতা। অথচ একটী পয়সা খরচ নাই। বরং নাপিতের পয়সাটা আরো বাঁচিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে নিশিকান্তের খ্যাতি দেশ বিদেশ ভরিয়া ফেলিল। সে যে একটা মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক একথা আর না মানিয়া উপায় নাই। এমন কি, তাহার দাদাও সে কথা স্বীকার করিলেন।

## উড়োজাহাজে ভারতবাসী

বিমান-বীর মিঃ কাবালি

উড়োজাহাজ চালাইয়া সমুদ্র ডিঙ্গাইয়া বিলাত হইতে এ পর্য্যন্ত যাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বিদেশী। আমাদের দেশের কেউ এ পর্য্যন্ত এ কাজে নামিতে পারেন নাই। সম্প্রতি মিঃ পি, এম্ কাবালি নামে এক হিন্দু যুবক আমাদের এ দুর্নাম ঘুচাইয়াছেন, মিঃ কাবালির বয়স মাত্র ২২ বছর।

তিনি উড়োজাহাজ করিয়া ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে যাত্রী লইয়া আসিবার লাইসেন্স পাইয়াছেন।

ভারতবর্ষ ও বিলাতের অনেক বড় বড় লোক সেদিন মিঃ কাবালিকে মহা



সমারোহে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। তিনি যে এয়ারোপ্লেনে করিয়া ভারতবর্ষে আসিবেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাহার নাম ঠিক করিয়া দিয়াছেন—"Feather of the dawn" অর্থাৎ "ভোরের পালক।" কুচবেহারের মহারাণী নামকরণের উৎসব সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। "রামধনু" ছাপা হইবার সময় মিঃ কাবালি ভারতের পথে অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছেন।

তোমরা শুনিয়া নিশ্চয়ই সুখী হইবে যে মিঃ কাবালির মত আরও কয়েক জন ভারতীয় যুবক বিলাতে উড়োজাহাজ চালান শিখিতেছেন।

## গ্রীসের পণ্ডিত

তোমারা কখন সক্রেটিসের ছবি দেখিয়াছ কি? মস্ত একখানা গোল মুখ, চক্ষু দুটী যেন তোমাকে খাইয়া ফেলিতে চায়, চ্যাপ্টা নাক, ছোট ঘাড়, চওড়া কান্ধ, চওড়া বুক, মাথায় টাক্—কি অদ্ভুতই মূর্ত্তিখানা! আবার, পোষাক ছিল মূর্ত্তির চেয়েও অদ্ভুত। দিনের পর দিন একই সামান্য পোষাক চলিয়াছে—শীতেও যা গ্রীষ্মেও তাই। মাথার উপর দিয়া রৌদ্র যাইতেছে, বৃষ্টি যাইতেছে, ভ্রূক্ষেপ নাই। পা কোন কালে জুতা পরিবার ধার ধারে না। নিজে এখানে ওখানে ঘুরিতেছেন, বড় বড় লোকের সঙ্গে তর্ক করিতেছেন, ঘরে দুরন্ত গৃহিণীর মুখে যা আসে তাই চুপ্ চাপ্ শুনিতেছেন—এই রকম ছিলেন লোকটী। চেহারা দেখিলে মনে হইত একটী মুটে—ফোঁটা কি টিকি ত আর ছিল না—কিন্তু আদতে তিনিই ছিলেন গ্রীসের জ্ঞানী লোকের গুরু।

গ্রীসের জ্ঞানী লোকের গুরু! কথাটা বড় সোজা নয়। গ্রীস্ই ইউরোপ্কে জ্ঞান দিয়াছে, সভ্য করিয়াছে। সেই গ্রীস্কে যাহারা জ্ঞান দিয়াছে তিনি ছিলেন তাহাদের গুরু—প্লেটোর গুরু, এরিষ্টটলের গুরুর গুরু।

সক্রেটিসের বাপ ছিলেন এক ভাস্কর, মা ছিলেন ধাত্রী। সক্রেটিস্ বাপের ব্যবসা শিখিয়াছিলেন, লেখাপড়াও শিখিয়াছিলেন। কয়েকটা যুদ্ধে গিয়া লড়াইও করিয়াছিলেন—বেশ বীরত্বের সঙ্গেই,—কিন্তু তাঁহার আদত কাজ

হইয়াছিল লোকের ভুল ধরা, লোককে বুঝান। সেকালে জ্যোতিষ্, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন—এ সকল লোকে ভাল বুঝিত না, অনেকে মনে করিত এসব দেবতাদের কাণ্ড, মানুষ কেমন করিয়া বুঝিবে? কিন্তু মানুষ কেমন করিয়া চলিবে, রাজকার্য্য কেমন করিয়া চালাইতে হইবে এ সকলের আলোচনা হইত খুব—অন্ততঃ সক্রেটিসের জন্মভূমি আথেন্স নগরে।

সক্রেটিস্ চলাফেরাতে ত ছিলেন একেবারে সাদাসিদে—খাইতেনও সামান্য যা তা কিছু। বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণে তাহাদের খরচে মদের বোতল উড়াইয়া দিতে পারিতেন না এমন নয় কিন্তু নিজের বাড়ীতে উহা যুটিবে কেমন করিয়া?

সক্রেটিস্ প্লেটো

উপার্জ্জন ত বিশেষ কিছু ছিল না—এদিকে আবার কোন রকমের নেশা বা ঝোঁকও ছিল না।

সকলের উপরে ছিল তাঁহার স্বভাবটী। কাহাকেও দুর্ব্বাক্য বলা ছিলনা, কোন পাপের কাজ তাঁহার ধারেপাশেও আসিতে পারিত না, অহঙ্কার কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। সেকালে গ্রীসে লোকের দেবতাদের উপর খুব ভক্তি ছিল। ডেলফাই নামক জায়গায় দেবতা কি বলেন তাহা জানিতে অনেকে যাইত।



সেখানে দৈববাণী বলিয়া পুরোহিত ঠাকুরাণী যাহা বলিতেন তাহা সকলেই বিশ্বাস করিত—সক্রেটিস্ও করিতেন। একজন সেখানে গিয়া জানিতে চাহিল, সকলকার চেয়ে জ্ঞানী লোক কে? দৈববাণী হইল—সক্রেটিস্। সক্রেটিস্ ত শুনিয়া অবাক্—"আরে, আমার আবার জ্ঞান কোথায়? আমি যে কিছুই জানি না।" শেষে ভাবিয়া ঠিক করিলেন,—আচ্ছা, একটু দেখাই যাক্ না; এত বড় বড় নামজাদা লোক আছে এরাই বা কতদূর জানে। তিনি রাস্তায়, বাজারে, অন্যান্য স্থানে নামকরা লোকদের সঙ্গে তর্ক জুড়িয়া দিতেন। জেরায় জেরায় তাহাদের মূর্খতা ধরিয়া দিতেন, তাহারা যাহা বোঝে ও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে তাহার মধ্যেকার সব গলদ্ বাহির করিয়া দিতেন। তাঁহার কথাবার্ত্তার মধ্যে আবার ব্যঙ্গ যথেষ্ট থাকিত। অনেক বড় বড় লোক বিরক্ত হইত কিন্তু সক্রেটিস্ বুঝিলেন,—ইহারা না জানিয়াও নিজেরা জানি মনে করে আর তিনি যে জানেন না এইটুকু বোঝেন,—এইখানেই তাহাদের সঙ্গে তাঁহার তফাৎ, আর তাই তিনি জ্ঞানী।

সক্রেটিস্ বলিতেন,—ভাল কাজ করাই মানুষের পক্ষে সব চেয়ে ভাল, জ্ঞানের অভাবেই লোক দুষ্ট হয়। গ্রীসের লোক বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস করিত, সক্রেটিস্ যে করিতেন না তাহা নয়, তবে তিনি বুঝিলেন সকলের উপর এক কর্ত্তা আছেন, আর দেবদেবীদের অনেক মানুষের মনগড়া। আবার আথেন্স নগরে যে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া শাসন-সভার সভ্য ঠিক করা হইত, ইহাও সক্রেটিসের পছন্দ হইত না। তিনি মনে করিতেন ইহা একটা ঘোর মূর্খতা। এই সকল মতের জন্য কতক লোক সক্রেটিসের উপর নারাজ হইল। অনেক বুদ্ধিমান্ যুবক তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিতে আসিত, তাঁহার কাছে কাছে থাকিত, তাঁহাকে ভালবাসিত। ইহাতে অনেক বাপ-মা চটিয়া গেল। সক্রেটিসের জেরায় বিরক্ত হইয়া অনেক বড় বড় লোক চটিয়া গেল। তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া নাটক তৈয়ারী হইল; তাহা থিয়েটারে দেখান হইত, লোকে হাসিত।

কখন কখন সক্রেটিসের এক রকম ভাব আসিত। কোন কাজ করিতে

যাইবেন, কে যেন ভিতর হইতে বলিয়া দিত—ইহা করিও না; তিনি থামিয়া যাইতেন। কখন কখন ভাবের সময় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইত। অনেকক্ষণ পর জ্ঞান ফিরিলে মনে হইত যেন কিছুই হয় নাই।

অনেককাল এইরূপে কাটিয়া গেল। সক্রেটিস্ বৃদ্ধ হইলেন, বয়স ৭০ বৎসর হইল। কিন্তু এ বয়সেও তাঁহার শত্রুরা তাঁহাকে শান্তিতে মরিতে দিল না।

যাহারা সক্রেটিসের উপর বিরক্ত তাহাদের মধ্যে তিনজন শাসন-দরবারে গিয়া নালিশ করিল—সক্রেটিস্ অবিশ্বাসী, সক্রেটিস্ দেশের যুবকগণকে নষ্ট করিতেছেন—তিনি প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত।

দল বাঁধিয়া আথেন্সের শাসন-সভার সভ্যেরা বিচারে বসিলেন। যাহারা নালিশ করিয়াছিল তাহারা তাহাদের কথা বলিল। সক্রেটিস্ উত্তর দিলেন। কিন্তু অনেকেই দেশের লোকের বিশ্বাস বদ্‌লাইবার জন্য ও অন্যান্য কারণে এই দেবচরিত্র লোকটীর উপর চটিয়াছিল। বেশী সভ্যের মতে সক্রেটিস্ দোষী সাব্যস্ত হইলেন। তাঁহার প্রাণদণ্ডের হুকুম হইল। একটু চেষ্টা করিলেই যাহাতে প্রাণদণ্ডটা না হয় তাহা তিনি করিতে পারিতেন, কিন্তু সে চেষ্টা তিনি করিলেন না। কোন রকম কাকুতি মিনতি না করিয়া তিনি বীরের মত নিজে পক্ষ সমর্থন করিলেন—বীরের মত প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহাকে কারাগারে নিয়া পায়ে শিকল পরাইয়া রাখা হইল। কারাগারেও তিনি ইহকাল ও পরকাল লইয়া অনেক আলোচনা করিলেন। এক শিষ্য তাঁহার পলায়নের বন্দোবস্ত করিলেন কিন্তু সক্রেটিস্ কি পলায়নের পাত্র? যে দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে তাহা তিনি পালন করিবেনই—মৃত্যুতে তাঁহার ভয় কি?

যথাসময়ে বিষের পাত্র আসিল। সক্রেটিস্ বিষ পান করিলেন—ক্রমে অনন্তশয্যায় শুইয়া পড়িলেন। জীবনে তিনি বড় ছিলেন, মরণে আরও বড় হইয়া গেলেন। আথেন্সের গৌরবে একটা প্রকাণ্ড কালীর লেপ পড়িয়া গেল।

ইহা প্রায় ২৩০০ বৎসর আগেকার কথা। সক্রেটিস্ নিজে কিছু লিখিয়া যান নাই। তাঁহার উপদেশ ও মত পাই আমরা প্লেটো ও জেনোফনের লেখায়। প্লেটো বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক আর জেনোফন নামকরা ঐতিহাসিক। গ্রীসকে—ইউরোপকে—পৃথিবীকে যাঁহারা বড় করিয়াছেন ইঁহারা তাঁহাদের মধ্যে। প্লেটোর ছাত্রই নানাশাস্ত্রবিৎ, মহাবীর আলেকজান্দারের শিক্ষাগুরু এরিষ্টটল্। ইউরোপে বাহ্য বিষয়ে জ্ঞানের উন্নতি বলিতে গেলে ইঁহা হইতেই।



---

## জটিল প্রশ্ন

( শ্রীবিকাশ দত্ত )

বকর বকর থামাও, দাদা, থামাও—
দু'পুর রোদে মিথ্যে মাথা ঘামাও!
ঘাম ঝরে যে বিরাট বপু বেয়ে,
হুঁস্ কিগো নেই পড়বে যে ছাই নেয়ে?
শেষকালে কি ফাটবে নেড়া মাথা—
পয়সা আছে? আনবো কিনে ছাতা?
একটুখানি এধার স'রে এসো,
এই যে আসুন ফটিকচাঁদের মেসো।
বল্‌তে পারেন দাদার কি ছাই হোলো?
ও দাদা, তোর কেউ কি কোথাও মোলো?
কওগো কথা একটিবারের তরে,
ভক্ত যে তোর আর বাঁচে না, মরে।
বল্‌ল দাদা উদাস দু'চোখ মেলি'—
ঝোড়ো হাওয়ার মত নিশাস ফেলি'—
ধীরে ধীরে কষ্ট ক'রে অনেক,
"সেদিন হেথায় অতিথ এসে জনেক

প্রশ্ন যে এক কর্‌লো আমায় ওরে—
যতই ভাবি ততই মাথা ঘোরে,—
কুল কিনারা কিছুই না পাই তার—
শেষটা বুঝি মান্‌তে হ'ল হার।
মানুষ ম'লে খায় কি জানিষ, ভজা,
হাস্‌লি যে তুই—অইটে হ'ল মজা।
মর্‌লে মানুষ তার তো হ'ল ইতি—
পুড়িয়ে ফেলে এই তো জানি রীতি।
কেমন ক'রে চাইবে খেতে তারা—
হায় গো, দাদা, ভেবেই আমি সারা।
শাস্ত্র পুঁথি কর্‌ছি নাড়া চাড়া,
জবাব তো ছাই হয় না কিছুই খাড়া।
ডাকিয়েছিলাম শ্যাম গাঙুলীর কাকায়
সেও শুনে হায় ফ্যাল্‌ফেলিয়ে তাকায়;
কেউ পারে না, প্রশ্ন জটিল বটে,
জবাব দিতে বুদ্ধি নাহি ঘটে।"
জগার মামার আপন পিসের খুড়ো
হাস্‌ছে ব'সে এক্‌লা গেঁজেল বুড়ো।
বল্‌লো, "আরে প্রশ্নটা তো খাঁটি—
উল্টো ভেবে করছো মাথা মাটি;
জবাব নেহাৎ জলের মত সোজা,
যেই শুনেছি অম্‌নি গেছে বোঝা;
জ্যান্ত মানুষ? তার কথাটাই ছেড়ে—
মরার কথাই ভাব্‌ছো হা হা বেড়ে!
মানুষ ম'লে খায় যে ওরে গাঁজা,
মগজে কি গোবর-ঘুঁটের পাঁজা?"



সবাই শুনে হেসেই লুটোপুটি
আহ্লাদেতে দুল্‌লো দাদার ঝুঁটি।

---

# বাঘের মন্ত্রী

( পৌরাণিক )

সেকালে পুরিকা নামে এক জমকাল সহর ছিল কিন্তু সহরটীর রাজা ছিলেন দুষ্টের শিরোমণি—কাহারও ভাল তিনি দেখিতে পারিতেন না। দুষ্ট হউক শিষ্ট হউক, কেহই ত চিরকাল বাঁচে না—রাজাও কিছুদিন পরে মারা গেলেন। আর তাঁর কর্ম্মের ফলে তিনি মরার পরে রাজা ত হইলেনই না, হইলেন কিনা এক শেয়াল।

শেয়ালের পূর্ব্ব জন্মের সব কথা মনে পড়ায় ভারী দুঃখ হইতে লাগিল। সে তখন ভাবিল, এবার একটু ভাল করিয়া চলি ফিরি। সকলের প্রতি দয়া দেখাইতে লাগিল, সত্য কথা কহিতে লাগিল, মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিল, গাছ হইতে যে ফল পড়িত সেই ফল খাইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। শ্মশানে সে জন্মিয়াছিল, শ্মশানেই অন্য শেয়ালের সঙ্গে বসবাস করিতে লাগিল, কোথাও যাইতে তাহার ভাল লাগিত না। তাহার ভাল স্বভাব দেখিয়া আর সব শেয়ালের হিংসা হইল। তাহারা বলিল, "ভাই, তুমি কি বোকা, হয়েছ ত শেয়াল, আর থাক শ্মশানে, বলি মাসটাংস খাও না কেন? আমাদের মত খাওদাও, তোমার খোরাকটা না হয় আমরাই যোগাব।"

আমাদের শেয়াল বলিল, "ওহে, খারাপ বংশে জন্মিলেই যে খারাপ কাজ কর্‌তে হবে এমন কথা কি আছে? স্বভাবেই লোকে ভাল হয়, স্বভাবেই মন্দ হয়। আমার যশ যাতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আমি তারই চেষ্টা কর্‌ছি, আত্মাটা ভাল হ'লেই না কাজ ভাল হয়? তোমাদের আছে লোভ, তোমরা বোঝ শুধু পেটটা। পরে খারাপ হবে মনে করেই আমি খারাপ কাজে যাচ্ছিনা।"

শেয়ালে শেয়ালে কথাবার্ত্তা হইতেছে সেই কথা গেল এক বেজায় জোরদার বাঘের কাণে। বাঘও সেই শ্মশানেই থাকিত। বাঘ মনে করিল, এ শেয়ালের ত বড় ভাল স্বভাব, এ দেখিতেছি শেয়াল পণ্ডিত। সে শেয়ালকে নিজের মন্ত্রী করিবে স্থির করিয়া বলিল, "শেয়াল মশায়, আমি তোমার স্বভাব বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি ইচ্ছামত খাওদাও আর আমার সঙ্গে রাজকার্য্য চালাও। আমরা হ'লাম কড়া মেজাজের জানোয়ার, তোমার মত মোলায়েম ধাতের জীব কাছে থাক্‌লে আমার ভালই হবে"।

শেয়াল বাঘের কথা শুনিয়া নরম ভাবে বলিল, "আপনি যে ভাল স্বভাবের ধার্ম্মিক জীবের সাহায্য চাচ্ছেন এটা ত' খুব ভাল কথা। ভাল মন্ত্রী না হ'লে রাজা বড় হতে পারে না। কিন্তু আপনার আশ্রয়ে থেকে সুখভোগ—সেটাও আমার ইচ্ছা হচ্ছে না। আপনার আগেকার কর্ম্মচারীরা আছে, তাদের সঙ্গে আমার স্বভাব মিশবে না। তারা চেষ্টা কর্‌বে—আমার উপর আপনার রাগ জন্মিয়ে দিতে। আমি আবার কখনও চাকরি বাকরি করিনি—নিজের ইচ্ছামত বনে বনে ঘুরেই বেড়িয়েছি। বনে নির্ভয়ে ধর্ম্মকার্য্য করা যায়। রাজার কাছে এ ওর নিন্দা করে, তাতে কষ্টে পড়্‌তে হয়। রাজা চাকরকে ডেকে পাঠালেই চাকরের প্রাণটা দুর্ দুর্ করে ওঠে। বনে ফলমূল খাও, চ'রে বেড়াও, ও সব বালাই নাই। না হয় জল খেয়েই থাক্‌লাম, তবু ত ভয় খেতে হয় না। যা' হোক, যদি নেহাতই আমাকে মন্ত্রী করবেন তাহলে আমি যা বলি তা শুনুন। আমি আপনার মঙ্গলের জন্য যা বল্‌ব তা আদর করে শুন্‌বেন, আর আমার জন্য যে ব্যবস্থা করবেন তা' ঠিক রাখবেন। আমি আপনাকে যে পরামর্শ দেব তা' গোপনে হবে, অন্য কেউ সেখানে থাক্‌তে পারবে না। আর আমার কথা শুনে রাগের মাথায় আমার বা অন্য মন্ত্রীদের সাজা দিতে পার্‌বেন না"।

বাঘ তাহাই স্বীকার করিল। তখন শেয়াল হইল বাঘ রাজার মন্ত্রী। আগেও ত রাজার সব কর্ম্মচারী ছিল। তাহারা শেয়ালের সমাদরে ভারী বিরক্ত হইয়া উঠিল, ভাবিতে লাগিল—কেমন করিয়া শেয়ালের সর্ব্বনাশ করিবে। কর্ম্ম-



চারীদের অভ্যাস ছিল মাংস চুরি করা। শেয়ালের গতিকে সেটা হইতে পারিত না বলিয়া তাহারা ভারী খাপ্পা হইয়া পড়িল। শেয়ালকে কত রকম লোভ দেখাইতে লাগিল, কিন্তু শেয়াল ভুলিল না। তখন কর্ম্মচারীদের মাথায় এক ফন্দি খেলিল। তাহারা বাঘের খাবার মাংস চুরি করিয়া নিয়া রাখিল ঐ শেয়ালের ঘরে। শেয়াল মাংস দেখিয়াই বুঝিতে পারিল ব্যাপারটা কি। তাহার কিন্তু ভয় হইল পাছে অন্য কর্ম্মচারীদের সঙ্গে ঝগড়া বাধে। তাই সে চুপ করিয়া রহিল। এদিকে বাঘ মাংস না পাইয়া মহা খাপ্পা।

নিজের চোখেই ব্যাপারটা দেখুন না!

কোথায় গেল মাংস? "খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ"—চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল। কর্ম্মচারীরা আসিয়া তখন বলিল, মহারাজ, এ কর্ম্ম সেই বক-ধার্ম্মিকের। নিজের চোখেই ব্যাপারটা দেখুন না! তাহারা শেয়ালের বাড়ী গিয়া মাংস আনিয়া রাজার কাছে হাজির করিল।

বাঘ ত রাজা! শেয়ালের ঘর হইতে মাংস আসিয়াছে দেখিয়াই রাগে তাহার চক্ষু লাল হইয়া গেল। কী! এত বড় কাজ শেয়ালের, মার তাকে।

এইবার সেখানে আসিলেন বাঘ রাজার মা। তিনি আসিয়া বলিলেন,

"বাছা, দুষ্টদের কথায় ভুল না, দুষ্টদের কাজ ভালর মন্দ করা। বনে থাকে মুনিরা, তাদের পর্য্যন্ত শত্রু আছে। তোমার মন্ত্রী শেয়ালকে তুমি মাংস দিলেও সে নেয় নি, এখন কি না সে মাংস চুরি কর্‌তে গেল? এটা কি একটা কথা? একবার ভাল করে খোঁজ নাও, যা হঠাৎ মনে হয় তা ত সব সময়ে ঠিক হয়না। আকাশটাকে দেখা যায় কড়াইয়ের মত আর জোনাকী পোকাকে দেখা যায় আগুনের মত; কিন্তু আকাশও কড়াই নয়, জোনাকীও আগুন নয়। এই মন্ত্রীর দরুণ তোমার কত যশ হয়েছে, ওকে মেরে ফেলা তোমার মত রাজার পক্ষে কিছুই নয়"।

বাঘ রাজার মা এই সব বলিতেছেন এমন সময়ে সেখানে আসিল শেয়ালের এক ধার্ম্মিক চর। সে আসিয়াই কর্ম্মচারীদের দুষ্টামির সব কথা খুলিয়া বলিল। বাঘরাজা সব কথা শুনিল, আর অমনি চরের কথায় তাহার বিশ্বাস হইল। তখন কোথায় সে শেয়ালকে মারিবে, না, গেল তার সঙ্গে বন্ধুত্বের কোলাকুলি করিতে। শেয়াল বলিল, "আপনি, আমার সমাদরও করেছেন যথেষ্ট, আবার অপমানও করেছেন যথেষ্ট। এখন ত আর আপনার কাছে থাকা চলে না। আপনারও আর তেমন বিশ্বাস হবে না, আমিও ভয়ে ভয়ে থাক্‌ব। তার চেয়ে আমার আর এখানে না থাকাই ঠিক"।

বাঘের কথায় শেয়াল আর তাহার কাছে কিছুতেই থাকিল না। সে চলিয়া গেল বনে আর, তার পর উপবাসাদির পর শরীর ছাড়িয়া—একেবারে স্বর্গে।

---

# মরুভূমিতে বত্রিশ বছর

( শ্রীননীগোপাল মজুমদার )

১

বিলাতের একটা ঘরে বসিয়া এক বৃদ্ধ এবং একজন যুবক গল্প করিতেছিলেন, বৃদ্ধ বলিলেন —"সত্যি বেচারীদের কি কষ্ট, তারাও যে আমাদের মত মানুষ, আমাদের মতই যে তাদের



প্রাণ বলে একটা জিনিষ আছে, আশা ও আকাঙ্ক্ষা আছে, এ বোধটাই তাদের নেই, শুধু কি তাই—তাদের না আছে ঘরবাড়ী না আছে পরবার কাপড়, না আছে শান্তি দেবার একটা লোক। তাদের—"

যুবক এতক্ষণ মন দিয়া শুনিতেছিলেন,—কথাটা হইতেছিল আফ্রিকা দেশের লোকদের সম্বন্ধে; শুনিতে শুনিতে তাঁহার প্রাণ ব্যথায় কাঁদিয়া উঠিল। তাঁর প্রাণটা ছিল বড় উদার। পরের উপকারের জন্য জীবন কাটাইবেন ছেলেবেলা হইতেই তাঁর ছিল এই জেদ, তাই প্রাণপণে খাটিয়া পয়সা রোজগার করিয়া তিনি নিজের টাকায় ডাক্তারী শিখিয়াছিলেন। শুনিতে শুনিতে যুবক আর থাকিতে পারিলেন না, বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"থাক্, আর আমি শুন্‌তে চাইনে। এখন বলুন আমি আফ্রিকার জন্য কিছু কর্‌তে পারি কিনা।"

বৃদ্ধ সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়ই, তবে তোমার বাপ-দাদার গড়া বাড়ীতে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না।—ভীষণ অরণ্যের মাঝে চলে যেতে হবে—কেমন পারবে?"

"কেন পার্‌বোনা?"—যুবক উঠিয়া পড়িলেন। তার পর আর সময় নষ্ট করিলেন না, ২।১ দিনের মধ্যেই তাঁহার জিনিষপত্র গোছাইয়া লইয়া আফ্রিকার দিকে রওনা হইলেন।

এই যুবকই বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার লিভিংষ্টোন। আর বৃদ্ধটি—বিশ্ববিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক ডাক্তার মোফাট।

লিভিংষ্টোনের সমস্ত শৈশবটা প্রায় কাটিয়া গিয়াছিল কাপড়ের কলে। প্রতিদিন প্রায় পনেরো ঘণ্টা করিয়া তাঁহাকে খাটিতে হইত; কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে?—তিনি যে 'বাপকা বেটা'; তিনি তাঁহার বাবার মতই তাঁতের উপর বই খুলিয়া রাখিতেন, আর 'মাকু' চালাইবার ফাঁকে ফাঁকে পড়িয়া বইখানা শেষ করিতেন। এরকম ভাবে কত বই যে তিনি পড়িয়াছিলেন তাঁহার ইয়ত্তা নাই। এমনিভাবে অতি অল্প বয়সেই তিনি অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

২

লিভিংষ্টোনের জাহাজ যখন আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপের কেপটাউনে যাইয়া নঙর করিল, তখনই তাঁহার মনে প্রাণে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহাকে এখানে অনেক কিছু করিতে হইবে।

প্রথমে তিনি এক ধর্ম্মপ্রচারকের আড্ডায় গিয়া উঠিলেন; কিন্তু সেখানে যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশ্রমের উপর তাঁহার ভক্তি চটিয়া গেল। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ত আছেই,

তার পর, এমন কয়েকজন চমৎকার লোক আসিয়া সেখানে জুটিয়াছিল, যাহারা সুনাম হইতে দুর্নামই কিনিতেছিল বেশী।

লিভিংষ্টোন্ ব্যাপার দেখিয়া তাহাদের আশ্রম ত্যাগ করিলেন এবং ডাক্তার মোফাটের আশ্রমে চলিয়া গেলেন। এ আশ্রমটা ছিল বেচুয়ানাল্যাণ্ডের কুরুমান নামক স্থানে। মোফাট সাহেব তখনও ফিরেন নাই। লিভিংষ্টোন্ আর কি করেন—আশ্রমের চারি পাশের গ্রামগুলিতে ঘুরিতে লাগিলেন, সেখানকার ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন, তাহাদের আচার ব্যবহার গুলিও জানিয়া লইলেন।

লিভিংষ্টোন্

৩

এই রকম ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি অনেক কালো (কাফ্রী) বন্ধু জুটাইয়া লইলেন। তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য ও বুদ্ধি তাঁহাকে সকলের প্রিয় করিয়া তুলিল। তাহার উপর তাঁহার অদ্ভুত চিকিৎসার গুণে তিনি আফ্রিকাবাসীদের কাছে 'যাদুকর' বনিয়া গেলেন। তাহাদের বিশ্বাস ছিল তিনি সমস্ত প্রকারের রোগই সারাইতে পারেন। একদিন একজন সর্দ্দার তাঁহাকে আসিয়া বলিয়াছিল, "আপনাকে আমার ভারী প্রয়োজন, আমার এই হৃদয়টাকে সারানো দরকার। এটা ভারী অহঙ্কারী হয়ে উঠেছে।" লিভিংষ্টোন তাঁহাকে ধর্ম্মের বাণী শুনাইতে গেলে সে বলিল, "ও সব রাখুন, আমাকে খেতে



কিছু ঔষধ দিন যাতে হৃদয়টা একটু ভাল হয়, কারণ এটা ভারী বদ্, সব সময়েই কারও না কারও ওপর চটে আছে।" এমনি ছিল তাদের বিশ্বাস।

একবার তিনি এক দেশের উপর দিয়া যাইতেছিলেন। দেখিলেন, তাঁহার চারিদিকে সব দলে দলে রোগীরা আসিয়া হাজির। তারপর সে দেশের রাজা আসিয়া বলিলেন—

"কর্ত্তা, আমার দলের ডাক্তার বৃষ্টি আন্‌তে পারে,* কিন্তু এবার সে বিফল হয়েছে; আমরা সব জলের অভাবে শুকিয়ে মরৃছি; আপনার অসাধ্য ত কিছু নেই; মরা মানুষকে আপনি জীয়ন্ত করেন, আমার রাজ্যে জল এনে দিন।"

লিভিংষ্টোন একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বেশ।" তার পর তিনি তাহাদের লইয়া এক খাল কাটিতে আরম্ভ করিলেন, দেখিতে দেখিতে সেটা জলে ভরিয়া গেল—সকলে বাঁচিয়া গেল।

এই সময় তিনি সরকার হইতে নিজে একটী আশ্রম খুলিবার আদেশ পাইলেন, এবং কুরুমানের উত্তরপূর্ব্ব দিকে মোবাট্‌সা প্রান্তরে নিজের হাতে এক আশ্রম গড়িয়া তুলিলেন।

একবার এখানে ভারী সিংহের উপদ্রব আরম্ভ হইল। লিভিংষ্টোন্ গ্রামবাসীদিগকে জড় করিয়া সিংহ বাহির করিতে চলিলেন। তাঁহারা গাছে ঢাকা একটা ছোট পাহাড়ের উপর অনেক গুলি সিংহ দেখিতে পাইলেন। লিভিংষ্টোন সকলকে পাহাড়টার চারিধার ঘিরিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন, তারপর সকলে চলিলেন সিংহের দিকে। সিংহগুলি অদূরে দেখা গেল। 'মাব'লুই' নামে একজন কাফ্রী শিক্ষক একটা গুলি করিলেন কিন্তু তাহা সিংহের গায়ে লাগিল না। সে সিংহটী লোকদের উপর দিয়া পলাইল। আবার একটি সিংহ দেখা গেল। এবার লিভিংষ্টোন নিজে গুলি করিলেন। সিংহ আহত হইল কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল এবং তাঁহার বাঁ হাতটা টানিয়া প্রায় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তবে মরিল।

সেখান হইতে লিভিংষ্টোন ডাক্তার মোফাটের কন্যা মেরী মোফাটকে বিবাহ করিয়া শিকিলির দেশে চলিয়া আসিলেন। এই শিকিলির দেশেই একদিন তিনি খাল কাটিয়া জল আনিয়াছিলেন। সেখান হইতে সকলকে লইয়া তিনি কোলাব্যাঙ নামক স্থানে চলিয়া আসিলেন। সেখান হইতে তিনি সম্মুখের মরুভূমি পার হইতে রওয়ানা হইলেন। এক সর্দ্দার

* আফ্রিকার প্রত্যেক দলের সহিত একজন ডাক্তার থাকিত—সে চিকিৎসাও করিত, আবার নাকি তন্ত্রমন্ত্র-বলে বৃষ্টিও আনিতে পারিত।

বলিল, "অসম্ভব কর্ত্তা, অসম্ভব! আপনি কিছুতেই এ মরুভূমি পার হতে পার্‌বেন না। যদি আপনি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মারা যান তবে যে আমার নিন্দা হবে।" কিন্তু বীর লিভিংষ্টোন তাহা শুনিলেন না। তিনি চলিলেন এবং Zouga নদী ধরিয়া যাইতে যাইতে Ngami হ্রদ আবিষ্কার করিলেন। ইহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার।

৪

এই মরু-যাত্রা হইতে ফিরিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রী পুত্রকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন। তার পর তিনি কোলব্যাঙ-এর পাশ দিয়া লিনিয়াস্তি নগরে গিয়া পঁহুছিলেন। সেখান হইতে তিনি পশ্চিম সীমান্তের লোয়ানডা প্রদেশের দিকে চলিলেন। পথে, 'কাতেমা' নামে এক সর্দ্দারের দেশ পড়িল।

কাতেমা বারবার বুক ঠুকিয়া বলিল, "আমি কে জানেন ত, আমি হলুম কাতেমা, সর্দ্দারদের রাজা, যার নাম সারা আফ্রিকায় শোনা যায়—বুঝ্‌লেন?"

লিভিংষ্টোন ঘাড় নাড়িয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, তিনি তাহার কথা শুনিয়াছেন। কাতেমা ত ভারী খুসী; সে অনেক খাদ্যদ্রব্য আর ভৃত্য তাঁহাকে দিয়া দিল, আর আসিবার সময় কাণে কাণে বলিয়া দিল, "দেখুন, লোয়ানডা থেকে ফিরবার পথে আমার জন্য একটা ভাল কোট যদি—"

লিভিংষ্টোন তাহার এই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি ফিরিবার পথে তাহার জন্য রং চংএ একটা পোষাক আনিয়াছিলেন।

৫

এই রকম ভাবে কখনও বা বাঘের মুখে পড়িয়া, কখনও কুমীরের সাথে লড়াই করিয়া আবার কখনও বা মহিষের হাত হইতে প্রাণ বাঁচাইয়া তিনি জেম্বেসী নদী আর তার শাখা-প্রশাখাগুলি আবিষ্কার করিলেন; এই প্রকারে ক্রমে তিনি ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত, নায়েসা হ্রদও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এক কথায় নিজের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া তিনি আফ্রিকার দুর্গম মধ্যপ্রদেশ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানেই তাঁহার স্ত্রীকে তাঁহার হারাইতে হইয়াছিল।

তাঁহার আবিষ্কার-কাহিনী ছোট প্রবন্ধে লিখিয়া শেষ করা কঠিন। আমি তাঁহার চরিত্রের আর একটী দিকের কথা লিখিয়াই শেষ করিব।

৬

Lualaba নদীর তীরে Nyangeve সহর। আজ হাটবার। সব লোকজন হাটে



আসিয়াছে, বেচাকেনা পূরাদমে চলিতেছে, সমস্ত বাজার সরগরম। কেহ দরদস্তর করিতেছে, কেহ মূল্য কম দেওয়ায় গ্রাহককে গালি দিতেছে, কোথাও বা দুই বন্ধু গল্প করিতেছে, কোথাও বা উচ্চকণ্ঠে দোকানদার চেঁচাইয়া ক্রেতা ডাকিতেছে,—হঠাৎ বাজারের এক প্রান্ত হইতে শব্দ হইল "গুড়ুম" "গুড়ুম"—সকলে চাহিয়া দেখিল আরব দাসব্যবসায়িগণ বন্দুক লইয়া তাহাদিগকে মারিতে আসিতেছে। সকলে চারিদিকে পলাইতে লাগিল। কেবল বীর লিভিংষ্টোন সেই বৃদ্ধ বয়সেও সেই নিষ্ঠুর বলি হইতে সকলকে বাঁচাইতে লাগিলেন। তবু প্রায় চারিশত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

লিভিংষ্টোন রাগে, দুঃখে, ঘৃণায় উহার নিকটবর্ত্তী এক সহরে আসিয়া পড়িলেন। তার পর তিনি তেজোদীপ্ত, অগ্নিময়, সমবেদনাভরা এক পত্র বিলাতে প্রেরণ করিলেন। এই পত্রই দাসব্যবসায়ের কাল হইল। এই ঋষির প্রাণের কথাগুলিই ইংরেজদিগকে দাস-ব্যবসায় নির্ম্মূল করিতে বদ্ধপরিকর করিল।

লিভিংষ্টোনের ইহাই শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

৭

আজও বিলাতের Westminster Abbeyতে লিভিংষ্টোনের কবর দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার কবরের উপর একটী স্মৃতিস্তম্ভ তোলা হইয়াছে, তার উপর খোদিত রহিয়াছে,—Other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring and they shall hear my voice".

আজ লিভিংষ্টোনের মৃত্যুর প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর পরেও আফ্রিকায় এমন সব বৃদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা তাঁহার নামে কাঁদিয়া ফেলে। তাহারা বলে, "আমরা—ভালবাস্‌তাম তাঁকে প্রাণ দিয়ে; সারা শক্তি নিঃশেষ করে তাঁর কাজ কর্‌তাম। তিনি ছিলেন আমাদের প্রভু, কোন দিন তিনি কাউকে মারেন নি। তাই ত আমরা তাঁর দেহটা পাঠিয়ে দিয়েছি সব চেয়ে বড় রাণীর কাছে। তিনিই ত' তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, আমাদের নূতন জ্ঞান দিতে, আর, আমাদের নিষ্ঠুর দাসব্যবসায়ীদের হাত থেকে বাঁচাতে। আর তাঁর হৃদয়টা?—সেটা আমরা ছাড়্‌তে পারিনি, সেটা আজও তাঁর এই প্রিয় দেশে Chitambor Mvula গাছের নীচে আমরা রেখে দিয়েছি।"

# পদ্মরাগ

( অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্ট'চার্য্য, এম, এ )

[ পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর ]

## ১৩

## পাগলের ডিম

গুলি যাহারা ছুড়িয়াছিল, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহারা অগ্রসর হইয়া আসিল। উদয়েন্দু ঠিকই ধরিয়াছিল, এরা ডাকাতই বটে। ডাকাতির জন্য এ অঞ্চলটা যে বেশ বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে তাহাও তাহার অজানা ছিল না। কিন্তু তবুও ধা—জঙ্গলে ঢুকিবার পূর্ব্বে তাহাদের উপর যখন অদৃশ্য আলোক-রশ্মি পড়িল তখন সে ধারণাই করিতে পারে নাই যে তা' এই ডাকাতদের কাণ্ড।

দলের মধ্যে সবার আগে যে লোকটী আসিতেছিল, ভাবে মনে হইল সেই বোধহয় দলের পাণ্ডা হইবে। হিন্দুস্থানী—বয়স্ প্রায় চল্লিশের কোঠায় পা' দিয়াছে, গাঁট্টা গোট্টা চেহারা—ভারী জোয়ান। সে যে এক কালে বাংলা মুলুকেও ছিল তাও প্রমাণ হইয়া গেল তার সহচর বাঙ্গালী গুণ্ডাটীর সহিত কথা-বার্ত্তায়—বাঙ্গালীর সহিত হিন্দিতে কথা বলিতে তাহাকে খুব বেশী ইচ্ছুক বলিয়া বোধ হইল না। মোটর গাড়ীখানা ও তার হতভাগ্য আরোহী দুইটীর প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই সে বলিয়া উঠিল, "আরে মোহিস্, ( মহেশ ) শালা লোক সব ডাকু ছিল রে। দেখিচিস্,—ডোরী বান্‌হিয়ে হাওয়া গাড়ী ফেলেইচে। এই মনিব হোবে, আর উও ইন্‌কো ডাইভার হোবে, মালুম হোচ্ছে।"

"সে তো বুঝ্‌লাম সিংজী, কিন্তু শিকার যে ফস্‌কালো!"

সিংজী ততক্ষণে রণজিতের হাত্ হইতে সোণার রিষ্টওয়াচ, আঙ্গুল হইতে আংটী ও গলা হইতে বোতাম খুলিতে লাগিয়া গিয়াছেন। পকেট হইতে উদয়েন্দুর দেওয়া নোটের তাড়াটী বাহির হইতেই হাসিতে সিংহের দাঁত বাহির হইয়া পড়িল। নোটের সঙ্গে এক টুক্‌রা ভাঁজ করা গোলাপী কাগজও পকেট হইতে বাহির হইয়া আসিল।

"এ কি আছে?" বলিয়া সিং একবার কাগজটা হাতে লইয়া দেখিল, নীল পেন্সিলে ইংরাজীতে কি সব লেখা। সে লেখা পড়া সিংহের সাধ্যে কুলাইল না। কাগজখানাকে



পুনরায় ভাঁজ করিয়া রণজিতের পকেটে রাখিয়া দিতে দিতে বলিল, "যা, এটা তোকে ছেড়ে দিলাম।" বলিয়া যেন কত বড় একটা হাসির কথা হইল এম্‌নি ভাবে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভাবটা এই, আচ্ছা যাও, এ মহামূল্য কাগজটা তোমার আর লইব না।

তার পর আসিল ড্রাইভারের পালা। সে বেচারা গরীব মানুষ, তার কাছে আর কি পাওয়া যাইবে? গেল শুধু একটা অল্প-দামী হাত-ঘড়ি ও থলির মধ্যে গোটা তিনেক টাকা।

দেহ-তালাস শেষ হইলে সিংজী মহেশকে লইয়া মোটর গাড়ী খানা পরীক্ষা করিতে সুরু করিল। হঠাৎ বাধা পাইয়া উল্টাইয়া পড়াতে গাড়ীর "বডি"টা খুবই জখম হইয়াছিল, কিন্তু দামী গাড়ী বলিয়া এঞ্জিন বিগ্‌ড়ায় নাই। বুঝা গেল গাড়ী চালান যাইবে। সিং তখন রণজিৎকে দেখাইয়া দিয়া হুকুম ছাড়িল "আরে ইস্‌কো গাড্ডীপর চঢ়া দেও।" মহেশকে বলিল, "এ বহুৎ বড়ো আদ্‌মী আছেরে মোহিস, ছাড়া হোবে না। আটক রেখে সর্দ্দার বহুৎ রূপেয়া আদায় কোরে লেবে।"

"এ তো থাক্‌বে গারদে, টাকা দেবে কে?"

"আরে তা সর্দ্দার বুঝিয়া লিবে।"

"আর ড্রাইভার? তাকেও সাথে করে নিতে হবে নাকি?"

"ছোঃ, ও রূপেয়া কোথা পাবে? ওকে লিয়ে কি হোবে, ও এহি খানে থাক্‌বে। হামাদের তো আর কেউ দেখে নাই।'

কিন্তু কথাটা বলিতে বলিতে সিংজী থামিয়া গেল, তাহার যেন মনে হইল একটু দূরে বনের মধ্যে কে গান গাহিতেছে। ব্যাপারটা ভাল করিয়া জানিবার জন্য একটু অগ্রসর হইয়া সে যাহা দেখিল তাহাতে বিস্ময় আর তার বাঁধন মানিল না—সেই ঘন বনের মধ্যে গলা ছাড়িয়া একটা লোক প্রাণপণে গান গাহিতেছে, আর দুই হাত উপরে তুলিয়া ক্রমাগত নাচিতেছে। সে একখানা দৃশ্য বটে!

জঙ্গলের মধ্যে একটু আগেই যে কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে তাহাতে বোধ করি নিতান্ত শিশুও চঞ্চল হইয়া উঠে, কিন্তু এ লোকটীর ব্যবহারে চাঞ্চল্যের লেশটুকুও নাই। গভীর বনের আড়ালে থাকিয়া সে যে সমস্ত ব্যাপার আগাগোড়া লক্ষ্য করিয়াছে তাহাতে তিল-মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু নাচ-গানের জিনিষ সে ইহার মধ্যে কোথায় পাইল? সে নাচ-গানও আবার আপন মনেই—নিজেই তার শ্রোতা, নিজেই তার দ্রষ্টা। ব্যাপার বুঝিতে সিংজীর দেরী হইল না, বলিল, "তিনি পাগল আছেন।"

কিন্তু পাগলই থাক্ আর যাই থাক্ যখন ব্যাপারটা আগাগোড়া সে লক্ষ্য করিয়াছে, তখন এক বার ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিয়া তাকে ছাড়িয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না; তাই সে হুকুম ছাড়িল—"উস্‌কো পাকড়কে হিঁয়া লে আও।"

দুই জন বলিষ্ঠ লোক গিয়া পাগলের ঘাড় ধরিয়া সিংজীর নিকট তাহাকে হাজির করিল। ঘাড়ে দারুণ চাপ পড়াতে পাগলের গান বন্ধ হইল বটে, কিন্তু নাচ থামিল না, তালে তালে নাচিতে নাচিতে সে সিংজীর কাছে আসিয়া প্রকাণ্ড এক সেলাম ঠুকিয়া কহিল "মি বীট্ নট্, আই নট্ টেল।" সিংজী ইংরাজি জানিত না, কথাটা তাই সে বুঝিতে

সে একখানা দৃশ্য বটে!

পারিল না। মহেশের বিদ্যাও প্রায় তথৈবচ, কিন্তু তবুও বুদ্ধি খাটাইয়া কথাটার অর্থ সে ধরিয়া ফেলিল, বলিল, "আরে পাগলের ডিম তো তবে সব দেখে ফেলেছে! শুনছ সিংজী, কি বল্‌ছে? বল্‌ছে আমায় মার-ধর করনা—আমি কাউকে কিছুই বল্‌ব না।"

সিংজী বলিল "তবে তো এটী বিলকুল পাগল না আছেন! আরে তোম্ কাঁহাসে হিঁয়াপর আয়া?" পাগল জবাব দিল, "আই হিন্দি নট স্পিক, আই ইংলিশ স্পিক" (আমি হিন্দিতে কথা বলি না, ইংরাজীতে কথা বলি)।



সিংহ হুঙ্কার ছাড়িল "আরে ডর মাৎ কিও। জবাব দেও।" পাগল তখন ডান হাতে তার ডান কাণটা চাপিয়া ধরিয়া বাঁ কাণটা সিংজীর দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল "দিস্ ইয়ার হিন্দি হিয়ার," (এই কাণে হিন্দি শুনি) তার পর ডান কাণটা দেখাইয়া বলিল, "দিস্ ইয়ার ইংলিশ হিয়ার"—(এই কাণে ইংরাজী শুনি)। পরে আবার বাঁ কাণটা সিংজীর নিকট বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "হাম পল্টন কা পিছারি আয়া।"

মহেশ চট্ করিয়া কথাটা বুঝিয়া ফেলিয়া কহিল, "পাগল কাজের লোক আছে, ঐ যে খাটুয়া ষ্টেশনের খানিকটা দূরে আমরা খাঁকি প্যাণ্ট-পরা কয়েকটা লোকের ওপর সার্চ্চ লাইট ফেলেছিলাম, তাদের পেছু পেছু সহর থেকে এই জঙ্গলে এসে পৌঁচেছে। আপাততঃ একে সর্দ্দারের কাছে নিয়ে যাওয়া যাক্—নইলে ব্যাটা আবার কোন্ ফ্যাসাদে ফেল্‌বে কে জানে?" সিংজী বলিল "হামি লোকও তো ওহি কথাই বলেছেন।"

আগেই বলিয়াছি রণজিতের মোটর খানা জখম হইলেও এঞ্জিন ভাল অবস্থাতেই ছিল। ষ্টার্ট দিতেই তাহা প্রমাণ হইয়া গেল, কিন্তু দামী গাড়ী, শব্দ হইল না একটুকুও। রণজিৎকে আগেই গাড়ীতে তোলা হইয়াছিল, সিংজী মহেশ প্রভৃতি কয়েকজন মোটরে চাপিয়া বসিল। পাগলকে জোর করিয়া উঠাইতে হইল না—মোটরে চড়িবার লোভে সে এত খুসী হইয়া উঠিল যে, সে যে আনন্দের চোটে গাড়ীতেই দ্বিতীয় বার নাচ শুরু করিল না এই রক্ষা।

দলের মধ্যে আলিবক্স্ ছিল মোটর চালাইতে সবার চাইতে দক্ষ। ঘণ্টায় ৭০।৮০ মাইল মোটর চালান তাহার নিকট ডাল ভাত, সে গিয়া ষ্টিয়ারিং হুইলে বসিল। ভাঙ্গা মোটরই তখন নক্ষত্র-বেগে ছুটিল। দলের আর সকলে যেমন হঠাৎ আসিয়াছিল, ঠিক তেমনই হঠাৎ মিলাইয়া গেল।

ভোর হইতে তখনও খানিকটা বাকী, তাহাদের গাড়ী একটা একতালা বাড়ীর সামনে আসিয়া থামিল। সিংজী নামিয়া গিয়া দরজায় করাঘাত করিয়া ডাকিল "শিবু মাহ্‌তো, শিবু মাহ্‌তো হো।" একটী বেহারী দ্বারোয়ান আসিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই সিংজী বলিল "দো ঠো চোরা কোঠরী মাংতা, সর্দ্দার হ্যায়?"

"হ্যায়।"

১৪

## উদয়েন্দুর খট্‌কা

ডাকাতদের তাড়া খাইয়া উদয়েন্দুর দল প্রথমে প্রাণপণ শক্তিতে গাড়ী চালাইয়া

দিয়াছিল। কিন্তু ছোট গাড়ী—বোঝাইও হইয়াছে যতদূর হইবার, কাজেই মিনিট সাত আট যাইতেই যখন সকলে লক্ষ্য করিল কেউ তাহাদের পিছু নেয় নাই, তখন তাহারা গাড়ীর বেগ কমাইয়া শেষটায় একেবারে থামাইয়া দিল। ভোর হইতে আর জোর ঘণ্টা দুই বাকী, আলো উঠিয়া গেলে এ.অবস্থায় ফুটবোর্ডের উপর তাহাদের দাঁড়াইয়া অথবা ঝুলিয়া যাওয়াটা খুব নিরাপদ হইবে না। যদি লোকের মনে কোন রকমে সন্দেহ একবার জাগিয়া উঠে তাহা হইলে আর রক্ষা নাই, কেননা ইতিহাস-বিখ্যাত সমসেরপুরের সেই পদ্মরাগ মণি এখন এই গাড়ীখানায়। তাই উদয়েন্দু বলিল, "আমরা চার জন যেমন এসেছিলাম, ঠিক তেম্‌নি টী ট্রেণেই এলাহাবাদে ফিরে যাব। তোমরা মোটর হাঁকিয়ে বেনারস চ'লে যাও। সেখানে এক লাখের ওপর বাঙ্গালী, অনায়াসে নিজেদেরকে গোপন করে চল্‌তে পার্‌বে। পদ্মরাগ

চোরা কোঠরী মাংতা

আমার সাথে যাবে—মোটর গাড়ীতে ওসব জিনিষ নিয়ে চলা-ফেরা করা সব সময়ে নিরাপদ নয়। খাটুয়াতেই আমরা গাড়ী ধরবো, ভোর পাঁচটায় যে গাড়ীখানা ছাড়ে, সেটা খুব ফাষ্ট ট্রেণ, সেটা ধর্‌তেই আমাদের চেষ্টা কর্‌তে হবে, নইলে ফস্‌কালে ট্রেণ আবার সেই সাতটায়—এলাহাবাদ পৌছুতে বেলা সাড়ে বারোটা! আচ্ছা, আমরা তবে এখন চলি, পথে তো আবার পোষাক বদল কর্‌তে হবে—এ বেশে তো আর যাওয়া চল্‌বে না!"



গাড়ীর ভিতর হইতে তখন একজন অতি সন্তর্পণে একটা ছোট টিনের কৌটা উঠাইয়া উদয়েন্দুর হাতে দিল এবং মানুষে শালগ্রাম শিলা যেরূপ ভক্তিতে হাতে নেয়, ঠিক তেমনি সন্ত্রস্তভাবে উদয়েন্দু সেই কৌটাটী গ্রহণ করিল। ইহার ভিতরেই সমসেরপুরের পদ্মরাগ মণি।

সদর পথে ষ্টেশনে ঘুরিয়া যাইতে হয়, সময়ও একটু বেশী লাগে। কাজেই উদয়েন্দু বিমল প্রভৃতি জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিল। পথে পোষাক বদ্‌লাইয়া ছদ্মবেশ ধরিতে যা একটু সময় লাগিয়াছিল, তা ছাড়া আর এতটুকু সময় তাহারা বাজে নষ্ট করে নাই। আধ ঘণ্টার উপর চলিবার পর হঠাৎ উদয়েন্দু থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "একি, কে ডাক্‌লে পেছন থেকে?"

বিমল, মৃগাঙ্ক, সতীশ প্রভৃতি আশ্চর্য্য হইয়া গেল, বলিল "কই, আমরা তো কারো গলার আওয়াজ পাইনি, উদয় দা?" "তা না পেলে কি হবে, আমি স্পষ্ট শুনলাম, পেছন থেকে কে হেঁকে ডাক্‌লে বিমল, মৃগাঙ্ক!"

"তুমি বোধ হয় ভুল শুনেছ, উদয় দা?"

"দেখ পদ্মরাগ হাতে পেলে মানুষের মাথা ঘুরে যাবারই সম্ভাবনা মনে হয় বটে, তবুও এটা জেনে রাখ্‌তে পার যে, তোমাদের উদয়দার মাথাটা আদবেই ঘোরেনি—যাক্‌, সে চুলোয় যাক্‌, কিন্তু কে ডাক্‌লে সে খোঁজ না নিয়ে তো আর এক পাও এগোনো যাচ্ছেনা; ভেবে দেখ, এখানে বিমল আর মৃগাঙ্কের নাম ধরে ডাক্‌তে পারে এমন কে আছে? যদি কেউ থাকে, তবে খোঁজ না নিয়ে যাওয়াটা কত ভয়ানক হবে! হয়তো দশ বছর শ্রীঘর, আর নয় তো, চতুর্দ্দিকে জল, মধ্যখানে স্থল, আণ্ডামান নামক দ্বীপে যাবজ্জীবন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা।"

এ অতি খাঁটী কথা, এর আর জবাব নাই, কাজেই সকলে আবার পিছনের সেই অনির্দ্দিষ্ট শব্দের উদ্দেশে রওনা হইল। লাভ তাহাতে কিছুই হইল না, পূরা এক ঘণ্টা তাহারা শুধু ঘুরিয়াই মরিল। মৃগাঙ্ক, বিমল ও সতীশের দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে উদয়েন্দু ভুলই শুনিয়াছে, কিন্তু উদয়েন্দুর মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিয়াই রহিল।

পাঁচটার গাড়ী আর পাওয়া গেল না। সাতটার গাড়ীতে রওনা হইয়া, সমস্ত রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি ও অবসাদ লইয়া যুবক কয়েকটি যখন এলাহাবাদের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল তখন বেলা সাড়ে বারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

এতক্ষণে পদ্মরাগটী দেখিবার সুযোগ মিলিল। তেতালায় উদয়েন্দুর ঘরে

সবাই আসিয়া জুটিতেই, ধীরে ধীরে টিনের কৌটাটী খুলিয়া মখ্‌মলের কাপড়ে মোড়া পদ্মরাগটী উদয়েন্দু বাহির করিয়া ফেলিল। ব্যস্‌, আর কাহারো সাধ্যেই কুলাইল না যে সেই অপূর্ব্ব পদার্থটী হইতে তাদের চোখ ফিরাইয়া লয়। কী অপূর্ব্ব তার দ্যুতি, কী তার অপূর্ব্ব রূপ! মন্ত্রমুগ্ধের মত সকলে নির্ব্বাক্‌ বিস্ময়ে সেদিকে তাকাইয়া রহিল। বুঝিতে কাহারোই বাকী রহিল না যে, পৃথিবীর কোন ধনীই ইহার বদলে চার পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করাটাকে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনিবে না।

বেলা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছিল, উদয়েন্দু কহিল, "আর না, এবার সবাই খাওয়া দাওয়া সার গে। আপাততঃ পদ্মরাগ আমার স্যুটকেসেই রইল, ও বেলার দিক্‌ দিয়ে এটাকে কোন নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে তবে আমার ছুটি। যতক্ষণ না তা হচ্ছে ততক্ষণ এ ঘরেই আমায় থাক্‌তে হবে। আমায় না হয় যা হোক্‌ চাট্টি কিছু খাবার এখানেই পাঠিয়ে দিও।"

বেলা প্রায় পাঁচটার সময় নীচের সদর দরজায় ঘা পড়িল। প্রাতে দশটায় যারা বাড়ীর বাহিরে গিয়াছিল তাহারা ফিরিয়াছে। ঘুম-জড়ান চোখে বিমল টলিতে টলিতে গিয়া কোন মতে দরজা খুলিয়া দিয়া আসিল। সিঁড়ি বাহিতে বাহিতে আগন্তুক যুবক দুইটি কহিল "তার পর? ক'টায় ফেরা হোলো? আমরা আশা করেছিলাম ৯টার গাড়ীতে ফিরবে।"

"নাঃ, সে গাড়ী ধরা গেল না" বলিতে বলিতে যে ঘরে মৃগাঙ্ক, সতীশ ও বাড়ীর আর দু' একজন যুবক বিশ্রাম করিতেছিল সকলে সেই ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। তাহারা সবে মাত্র তখনই উঠিয়া হাই তুলিতেছে।

আগন্তুকের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর, কি কাজে গেছ্‌লে? হাঁসিল তো তা'?"

"নিশ্চয়। সমসের পুরের পদ্মরাগ এখন এই বাড়ীতে।"

"বটে নাকি? চল, চল, দেখ্‌তে হচ্ছে তো জিনিষটা কেমন।" "অপূর্ব্ব!" বলিয়া বিমল সকলকে সঙ্গে লইয়া উপরে উদয়েন্দুর ঘরের দিকে চলিল।

কিন্তু ভূমিকম্পে গোটা বাড়ীখানা সেই সময়ে ধ্বসিয়া পড়িলেও বোধ হয় কেউ ততখানি আশ্চর্য্য হইত না, যতখানি আশ্চর্য্য হইল সবাই উদয়েন্দুর ঘরে পা দিতে। মেঝের উপর পড়িয়া উদয়েন্দু লুটাইতেছে, দু'হাতে কে বা কাহারা হাতকড়ি পরাইয়া দিয়াছে, মুখের ভিতরে একটা কাপড় গোঁজা ও পিঠের পাশে একটা দেড় ইঞ্চি পরিমাণ গভীর ক্ষত



হইতে রক্ত পড়িয়া অনেকটা জায়গা রাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। একটা ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে চামড়ার স্যুটকেশটা এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত কাটা।

সকলে মিলিয়া উদয়েন্দুকে তুলিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। নিকটবর্ত্তী ডাক্তারখানা হইতে খানিকটা ব্রাণ্ডি আনিয়া খাওয়াইয়া দিতেই, খানিক বাদে উদয়েন্দু চোখ খুলিয়া চারিদিকে চাহিল। প্রথমটায় সে যেন কিছু মনেই করিতে পারিল না, শুধু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। কিন্তু ধীরে ধীরে স্মৃতি ফিরিয়া আসিতেই আকুলভাবে বলিয়া উঠিল, "বিমল, আমায় আর কেউ বিশ্বাস কর্‌বে না। দুনিয়ার চোখে আমি জোচ্চোর হয়ে গেলাম।"

বিমল গর্জ্জিয়া উঠিল, "সাধ্য কি দুনিয়ার উদয় দা। যতক্ষণ পেরেছ, তুমি লড়েছ; তার পর ছোরার ঘায়ে যখন বেহুঁস্‌ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে, তখন কি তোমার দোষ? এর পরও যদি কেউ তোমার বিরুদ্ধে 'টুঁ' শব্দটী করে, তবে এই যে দেখছ, এই হাতই তার টুঁটি চেপে ধরবে, তা সে যেই হোক্‌ না কেন।" বলিয়া বিমল তার বলিষ্ঠ ডান হাতটী একবার শূন্যে কাঁপাইয়া লইল।

পদ্মরাগ যে সরান হইয়াছে তা' তো সুনিশ্চিত, তবুও মৃগাঙ্ক একবার স্যুট্‌কেশটা খুঁজিয়া দেখিল। সবই ঠিক জায়গা মত আছে, বাদ কেবল টিনের কৌটাটী।

ক্রমে কথা উঠিল, শত্রু আসিল কোথা হইতে? নীচেকার দরজা যখন ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, তখন নিশ্চয়ই তাহারা বাহিরের দেয়াল বাহিয়া আসিয়াছে। তেমন বে-পরোয়া লোক হইলে পাশের ঐ সরু গলির অপর পারে যে মান্দ্রাজী সাহেবটির বাড়ীটা, তার উপরকার ফ্ল্যাট্‌ হইতেও এ বাড়ীর দোতালায় লাফাইয়া পড়া কিছু বিচিত্র নয়। ফ্ল্যাটটা এতদিন খালি ছিল, আজ হইতে আবার এক ঘর মান্দ্রাজী ভাড়াটে আসিয়াছে। বারান্দার ওপাশে বসিয়া তাদের দুই জন চা খাইতেছিল, কিন্তু মুখের শান্ত ভাব দেখিয়া কাহারো মনে নিমেষের জন্যও সন্দেহ হইল না যে, তারা এ সব ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও কিছু জানে।

(ক্রমশঃ)

## কুকুরকে লাই দিলে

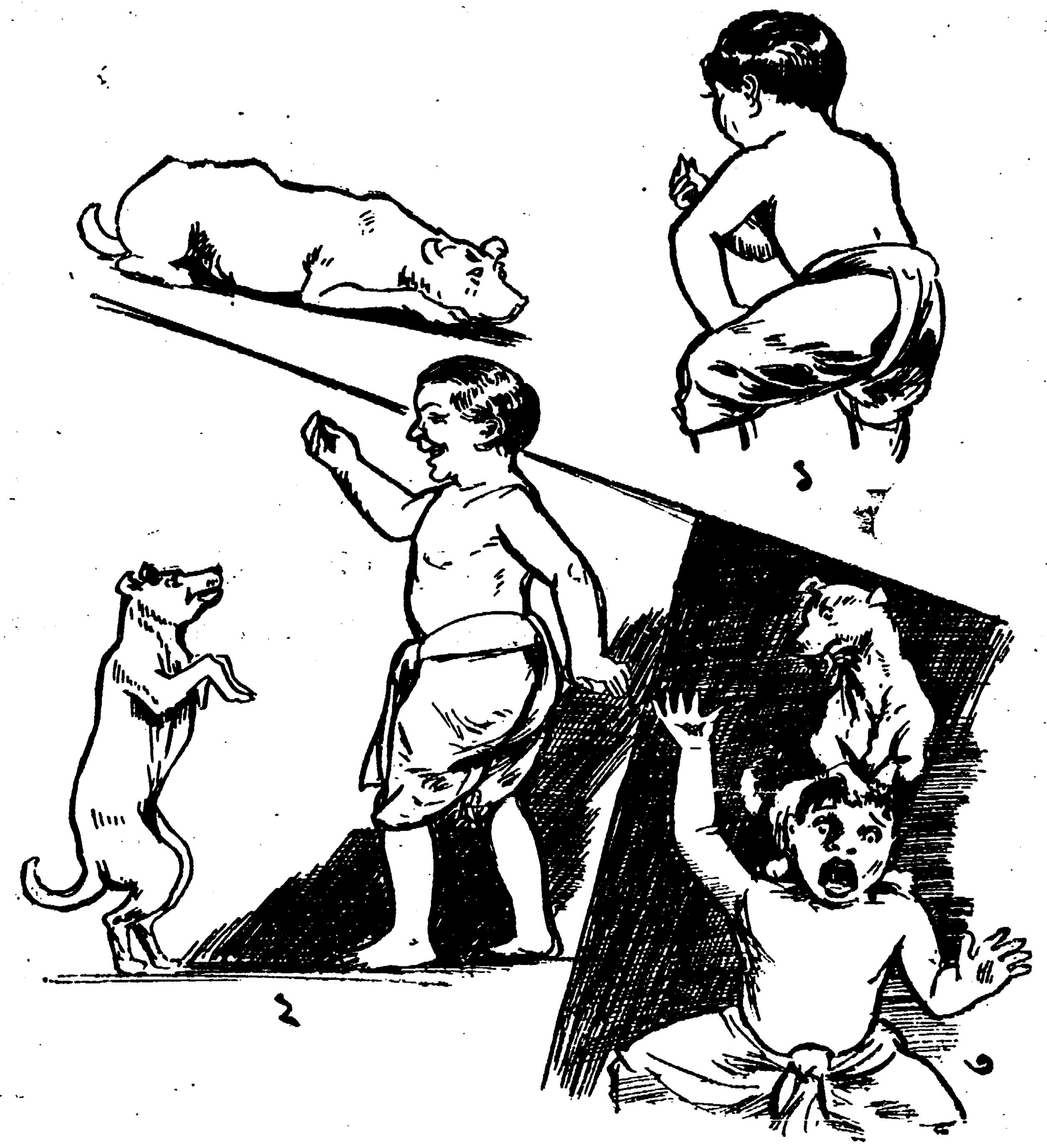


মাথায় চড়ে

## "জ্যান্ত" আলো

( শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য )

হাজার হাজার বছর আগে যখন এক অসভ্য মানুষ পাহাড়ের গুহায় বসিয়া দুখানা পাথর ঠুকিয়া আলো জ্বালাইতে শিখিল, তখনই সে বুঝিল পৃথিবীর রাজা হইবে সেই। বাস্তবিকই হইল তাই। আমরা আজও জানি আগুনের সাথে পরিচয়



হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বরাত ফিরিয়া গিয়াছে। কিন্তু মানুষ জন্মাইবার হাজার হাজার বছর আগেও যে এক শ্রেণীর জীব আলো জ্বালাইতে শিখিয়াছিল এবং দিব্যি নিরিবিলি নিজের নিজের প্রদীপ জ্বালাইয়া আরামে ঘরকন্না করিয়া যাইত সে কথা তোমরা অনেকেই বোধ হয় জান না।

একবার একখানা জাহাজ অন্ধকার রাত্রে সমুদ্রের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; হঠাৎ দেখা গেল সম্মুখের সমুদ্রের জলে যেন আগুন লাগিয়া গিয়াছে। জাহাজ কাছে আসিলে সকলে দেখিল—জল হইতে এক রকম আলো বাহির হইতেছে, আর তাহাতেই সমস্ত জলটা আগুনের মত দেখাইতেছে। মাইলের পর মাইল ধরিয়া জাহাজকে সেই তরল আগুনের ভিতর দিয়া চলিতে হইল। জাহাজের ক্যাপটেন এই অদ্ভুত জলের খানিকটা নমুনা লইবেন বলিয়া এক বালতী জল তুলিয়া লইলেন—তখন দেখা গেল সে জলের মধ্যে এক রকম সামুদ্রিক পোকা কিল বিল করিতেছে—আর তাহাদেরই শরীর হইতে এক রকম আলো বাহির হইয়া জলটাকে অমন করিয়া তুলিয়াছে।

সামুদ্রিক জীবের মধ্যে এই রকম অনেক জানোয়ারই নিজের নিজের শরীর হইতে অদ্ভুত আলো বাহির করিতে পারে। জেলিফিশ, নক্টিলুকা—আরও কত রকম মাছ এই ধরণের জীব। সমুদ্রের তলায় এই সব আলোর খুবই দরকার হয়। জলের তলায় কয়েক শ' হাত নীচে সূর্য্যের আলো আর তেমন ভাবে ঢুকিতে পারে না; আরও নীচে যাও, সেখানে দেখিবে—যাহাকে বলে সূচীভেদ্য অন্ধকার; অথচ অনেক জানোয়ারকে সে সব রাজ্যেও বাস করিতে হয়। এই সব জীবন্ত লণ্ঠনের সেখানে ভয়ানক কদর। খাবারের খোঁজই বল, বন্ধু বান্ধবের সাথে আলাপ করাই বল, আবার শত্রুদের ভয় দেখাইতেও বল, সবটাতেই এগুলি খুব কাজে আসে।

কিন্তু অনেক জানোয়ার আছে যাহারা সমুদ্রের তলায় থাকে না—সমুদ্রের উপরের দিকে কিংবা ডাঙ্গায় থাকে—অথচ শরীর হইতে আলো বাহির করিতে পারে। ইহাদের আলোর কি দরকার? বৈজ্ঞানিকেরা ইহাও ভাবিয়া দেখিয়াছেন। একটা মজা হইতেছে এই যে একটু উচুদরের জানোয়ারদের

মধ্যে আর এই ধরণের আলো দেখা যায় না—দেখা যায় শুধু সেই সব জীবের মধ্যে যাহারা লক্ষ লক্ষ বছর আগে—সেই পৃথিবীর ছেলে বেলা হইতে—তাহার উপর বাস করিতেছে। তখন পৃথিবীর চেহারাটা অনেকটা অন্য রকম ছিল। নানা রকম গ্যাস, বাষ্প, মেঘে আকাশ প্রায়ই ঘেরা থাকিত—কাজেই অনেক সময়ই সূর্য্যের আলোর অভাবে লণ্ঠনের দরকার হইয়া পড়িত। এই সব জানোয়ার তখন নিজ নিজ শরীর হইতে আলো বাহির করিয়া দরকার মত কাজকর্ম্ম চালাইত। ইহাদের বংশধরেরা এখনও সেই সব আলো লইয়া ঘোরে, কিন্তু পৃথিবীর অবস্থা বদলাইয়া যাওয়ার পরে যে সব জানোয়ার জন্মিয়াছে তাহারা আর এই ধরণের আলো জ্বালাইতে পারে না।

আর একটা কাজে এই সব জানোয়াররা তাদের আলো খাটায়। সেটা শুনিতে ভারী অদ্ভুত। আমরা যেমন গরু-ছাগল পুষি—তাহাদের খাওয়াইয়া মোটা করি, তারপর তাহাদের শরীর হইতে দুধ বাহির করিয়া লই—এই সব জানোয়ারও অনেকটা তাই করে। সমুদ্রের জলে নানারকম শ্যাওলাজাতীয় জিনিষ ভাসে। আসলে এগুলি গাছ। আর ঐ সব জানোয়ারের ইহাই খাদ্য। এখন, তোমরা বোধ হয় জান যে গাছেরা সূর্য্যের আলোর সাহায্যে তাহাদের শরীরের মধ্যে খাবার তৈরী করে—আর তাই খাইয়াই জীবন বাঁচায়। সমুদ্রের ভিতর ভাল রকম সূর্য্যের আলো যাইতে পারে না, আর আলো না হইলে শ্যাওলারাও তাদের নিজেদের খাবার তৈরী করিতে পারে না। তখন এই সব আলোধারী জানোয়াররা করে কি, নিজেদের শরীর হইতে আলো দিয়া শ্যাওলাদের খাবার তৈরী করিবার সুবিধা করিয়া দেয়। তার পর যখন শ্যাওলাগুলি পুষ্ট হয় তখন তাহাদের ধরিয়া খাইয়া ফেলে। এ সব ব্যাপার বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন।

আচ্ছা, এই জানোয়াররা নিজেদের গায়ের মধ্যে কেমন করিয়া আলো জ্বালায় তাহা জানিবার জন্য তোমরা নিশ্চয়ই ব্যস্ত হইয়াছ। এবার তাই বলি। তোমরা জান কিনা জানি না, অনেক জিনিষ আছে যেগুলি আলোর মধ্যে রাখিলে



খানিক পরে নিজেরাই আলো ছড়াইতে থাকে—যেমন হীরা, ফস্‌ফরেসেণ্ট পেণ্ট প্রভৃতি। এসব জানোয়ারের আলো কিন্তু মোটেই সে রকমের নয়। বরঞ্চ আলোর মধ্যে রাখিলে ইহাদের আলো দিবার শক্তি কমিয়া যায়। কয়লা পোড়াইলে আলো আর তাপ বাহির হয় কেন তাহা তোমাদের গেল মাসে বলিয়াছি। বাতাসের অক্সিজেনের সাথে কয়লার কার্ব্বন অংশটুকু মিশিয়া কাণ্ডটা হয়। এই সব জানোয়ারের বেলায়ও ঠিক তাই। ইহাদের শরীরের মধ্যে এক ধরণের জিনিষ আছে; বাতাসের অক্সিজেনের সাথে সেটা মিশিলেই আলো বাহির হইতে থাকে। কিন্তু এই ব্যাপারটার মধ্যে একটা আশ্চর্য্য রকম বাহাদুরী আছে। আমরা যখন আলো জ্বালাই তখন সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা তাপও সৃষ্টি করি। উত্তাপটা বাদ দিয়া আলো তৈরী করিতে আমরা পারি না—কিন্তু এই সব জানোয়ারেরা যে আলো বাহির করে তাহার সাথে তাপ থাকে না বলিলেই হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে একটা মোমবাতি খানিকটা আলোর সঙ্গে যতটা উত্তাপ সৃষ্টি করে জোনাকি পোকা সেইটুকু আলো তৈরী করিতে তার ৮০ হাজার ভাগ মাত্র তাপ বাহির করে। এ বিষয়ে মানুষের এই পোকার কাছেও অনেক শিখিবার আছে।—কেন না মানুষ যেদিন ঠিক এমনি ধারা আলো তৈরী করিতে শিখিবে তখন আলো এত সস্তা হইবে যে তা' জ্বালাইতে আর পয়সা খরচ হইল বলিয়া মনে হইবে না।

বৈজ্ঞানিকেরা অবশ্য চুপ চাপ নাই। তাঁহারা এই সব পোকাদের কৌশল, তাদের ভিতর কি কি জিনিষ আছে তাহার খানিকটা ধরিয়াও ফেলিয়াছেন। ডাক্তার মলীশ নামে এক মস্ত বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। মলীশ সেদিন কলিকাতা আসিয়াছিলেন। আচার্য্য জগদীশ বসুর বোস্ ইন্‌ষ্টিটিউটে এক সভায় তিনি নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন নানা রকম জীবাণু আর নীচ শ্রেণীর উদ্ভিদ্ এই রকম আলো দিতে পারে। বাতাসের সাথে মিশিয়া এই সব জীবাণু কেমন করিয়া জ্বলিয়া উঠে আবার বাতাস না থাকিলে কেমন নিভিয়া যায় তাহা তিনি আমাদের সামনে পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন। এই সব জীবাণু দিয়া তিনি এক অদ্ভুত প্রদীপও তৈরী করিয়াছেন।

আগেই বলিয়াছি সমুদ্রের মধ্যেই এই ধরণের বড় জানোয়ার বেশী দেখা যায়। জীবাণু অবশ্য সব জায়গায়ই আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন জায়গায় এই সব প্রাণী এত বেশী যে কেহ সমুদ্রে স্নান করিয়া উঠিলে মনে হয় যেন সে আলোর পোষাক পরিয়া উঠিয়াছে। সেখানে অনেক লোক রাত্রে সমুদ্রের ধারে বসিয়া জলের আলোয় বই পড়ে। এই সব জীবের মধ্যে বোধ হয় নকটিলুকাই সংখ্যায় সব চেয়ে বেশী, তবে আকারে বোধ হয় জেলিফিস্ই সব চেয়ে বড়। জেলিফিস্ নামে মাছ হইলেও আসলে মাছ নয়।—কোন জানোয়ারের মতই নয়। সেই আদিম যুগ হইতে ইহারা সমুদ্রে বাস করিতেছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে একতাল কাদাই বুঝি পড়িয়া আছে। ইহাদের শরীরের ৮৫ ভাগই জল। আকারে ইহারা ৬।৭ ফিট লম্বাও হয়। ইহাদের চারদিকে কতকগুলি দড়ির মত লাগান থাকে, সেগুলি এক একটা ১০০ ফিটও হয়।

মাছের মধ্যেও অনেকে এই রকম আলো বাহির করিতে পারে। এক ধরণের মাছ আছে, তাহাদের বলা হয় "লণ্ঠন মাছ"। ইহাদের কোন কোনটার শরীরের দুপাশে বোতামের মত বসান থাকে, দরকার মত সেগুলি জ্বলিয়া উঠে; কোনটার বা শুধু মাথাটা জ্বলে—ঠিক রেল গাড়ীর ইঞ্জিনের মত। প্রবালের মধ্যেও অনেক সময় এই ধরণের আলোধারী জীব দেখা যায়, ইহাদের কোন কোনটা আবার রং বে রং এর আলোও বাহির করে।

জলের তুলনায় ডাঙ্গায় এই ধরণের জানোয়ার এখন খুব কম। জোনাকি পোকা আর সেই ধরণের কয়েকটা পোকা—ইহারাই শুধু ডাঙ্গায় লণ্ঠন ঘাড়ে করিয়া বেড়ায়। জোনাকি পোকাকে মানুষ কত রকম কাজে লাগায় শুনিবে? অনেক জায়গায় জোনাকি পোকাকে কাচের মধ্যে ভরিয়া লণ্ঠন তৈরী করার কথা শুনা গিয়াছে। সে আলোতে খাওয়া দাওয়া, বই পড়া সবই চলে। আবার আমেরিকার অনেক জায়গার লোকে রাত্রে জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে হইলে পায়ের জুতায় আঠা দিয়া জোনাকি আঁটিয়া লয়, তাহাতে পথ চলিতে খুবই সুবিধা হয়। স্পেন দেশের অনেক মেয়ে রাত্রে মাথার খোঁপা জোনাকি দিয়া



সাজায়। সেখানকার অনেক যুবকও রাত্রে তাহাদের পোষাকের মধ্যে জোনাকি পরিতে ভালবাসে।

## গাধা পিটিয়ে ঘোড়া হয়?

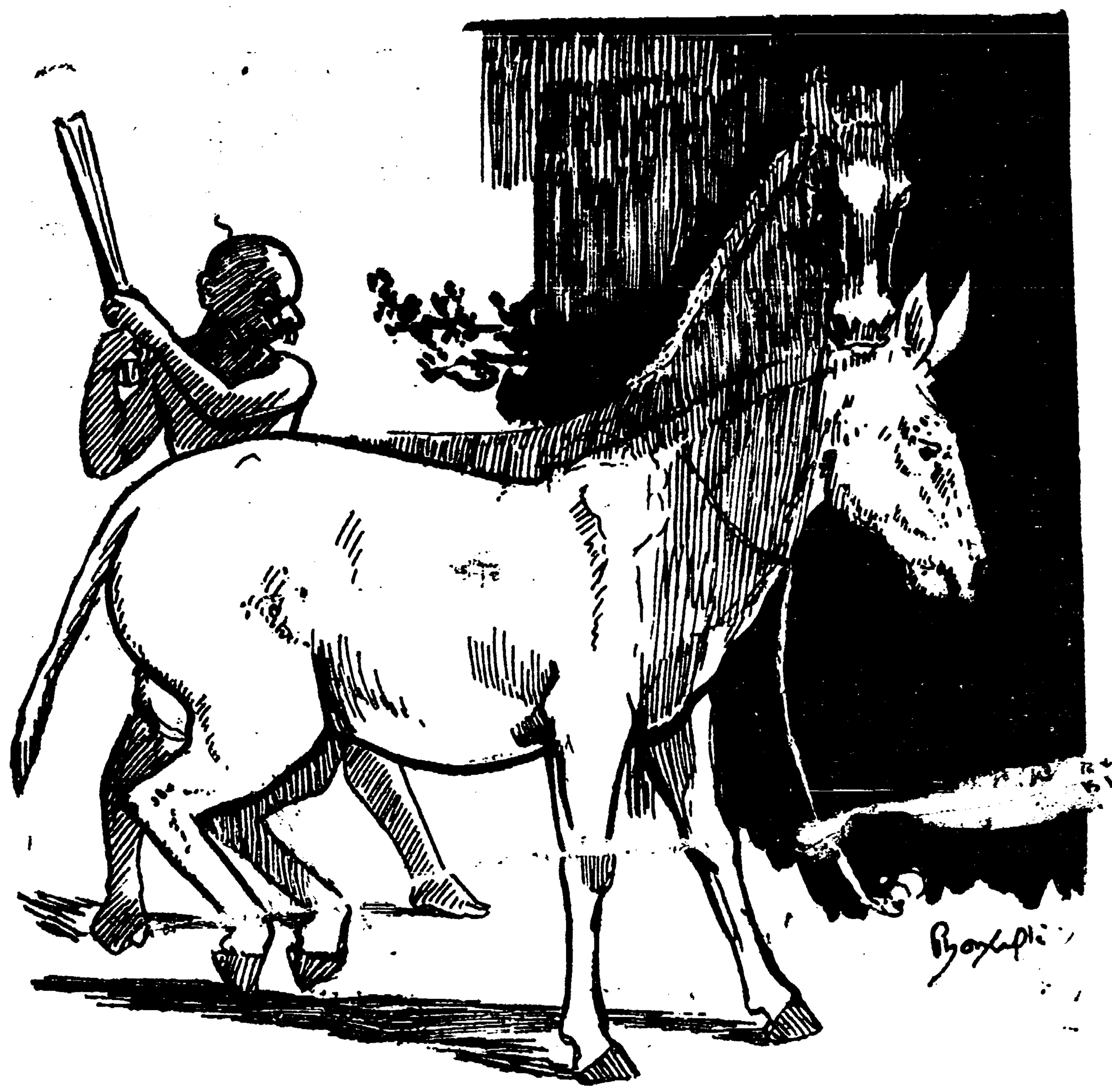

## কেন?

### দুধ ফুটাইলে কেন উথলাইয়া পড়ে?

যখনই আমরা কোন তরল জিনিষকে ফুটাই, তখন তাহার খানিকটা অংশ বদলাইয়া হইয়া যায় গরম বাষ্প। এখন এই বাষ্প জিনিষটা তরল জিনিষের চেয়ে হাল্কা; হাল্কা জিনিষ কখনও

ভারী জিনিষের নীচে থাকিতে পারে না, কাজেই সেটা বুদ্বুদের আকারে উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠে। বুদ্বুদ উপরে উঠিয়া ফাটিয়া যায়—অর্থাৎ বাষ্পটা উড়িয়া গিয়া বাতাসের সাথে মেশে।

জল ফুটাইলেও এই রকম বুদ্বুদ উঠিতে থাকে, আর উপরে উঠিয়া সেগুলি ফাটিয়া যায়, কিন্তু জল উথলায় না। তার কারণ, জলটা আগাগোড়া এক জিনিষ। কাজেই বুদ্বুদটা উপরের দিকে উঠিবার সময় কোন্ বাধা পায় না। দুধের বেলা কিন্তু সেটা হয় না। দুধের মধ্যে অনেক জিনিষ আছে; তার মধ্যে বেশীর ভাগই জল। গরম করিলে এই জলটাই ফুটিতে থাকে। জল ছাড়া দুধের মধ্যে আরও অনেক জিনিষ আছে, সেগুলি সব তরল নয়, কতক কঠিন। দুধ গরম করিলে এই কঠিন জিনিষটা উপরে একটা পর্দ্দার মত জমিতে থাকে (যাকে আমরা বলি সর), কাজেই পর্দ্দার তলায় যে বুদ্বুদগুলি উঠিতেছে সেগুলি পর্দ্দায় বাধা পাইয়া ফাটিতে পারে না, ফলে সেগুলি ক্রমাগত পর্দ্দাটাকে উপরে ঠেলিতে থাকে, আর দুধও সঙ্গে সঙ্গে উথ্‌লাইয়া পড়ে। পর্দ্দাটা যাদ হাতা দিয়া নাড়িয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে বুদ্বুদ গুলি উপরে আসিবার পথ পাইবে, দুধ ও উথ্‌লাইবে না।

## চুল কাটিলে ব্যথা লাগেনা, কিন্তু চুল ধরিয়া টানিলে ব্যথা লাগে কেন?

আমাদের শরীরের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই অনেক শিরা উপশিরা আছে। সেগুলির সাথে আবার আমাদের মগজের যোগ আছে। যেখানে এই শিরা উপশিরা আছে সেখানটায় যদি আঘাত করা যায় তাহা হইলে শিরাগুলিতেও সে আঘাত লাগিবে, আর মগজের সাথে যোগ থাকায় আমরা যন্ত্রণা উপলব্ধি করিব। শরীরের যে অংশটার সাথে শিরার কোন যোগ নাই সেখানটায় আঘাত লাগিলে কোন যন্ত্রণা হইবে না। আবার কোন শিরা যদি নিস্তেজ হইয়া পড়ে তাহা হইলেও সেটায় আঘাত লাগিলে কোন যন্ত্রণা টের পাওয়া যাইবে না। ডাক্তারেরা অস্ত্র করিবার সময় ক্লোরোফর্ম্ম ব্যবহার করেন, ক্লোরোফর্ম্ম শিরাগুলিকে নিস্তেজ করিয়া দেয়, কাজেই তখন গায়ে ছুরী বসাইলেও কোন শিরা দিয়া সে খবর মগজে যাইতে পারে না; রোগীও কোন ব্যথা টের পায় না। মাথার চুলেও এই ব্যাপার। চুলের গোড়া গুলির সাথে শিরার যোগ আছে। চুল টানিলে এই শিরাগুলিতেও টান পড়িবে, কাজেই ব্যথা লাগিবে। কিন্তু চুলের ভিতর কোন শিরা নাই; কাজেই চুলের মাঝখানে কাটিলে কোন শিরাতেই সে আঘাত লাগিবে না, কোন ব্যথাও টের পাওয়া যাইবে না।

---

# অন্ধ-মেয়ে

[ জাপানী গল্প ]

( অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল এম্-এ, বি-এল )

মিয়াগি জাপানের একজন উঁচুদরের সেপাই। গ্রীষ্মকাল। সুন্দর সন্ধ্যা। সে একটা ছোট নৌকা ভাড়া কোরে' নদীতে বেড়াচ্ছিলো, এমন সময়ে সে দেখ্‌লে ও-পারে কতকগুলো ছোট মেয়ে, কালো-চুল, ফুট্‌ফুটে চেহারা, জোনাকীর পেছন পেছন ছুটোছুটি কর্‌ছে। তারা জোনাকি ধর্‌ছে,—চুলে পর্‌ছে—আবার ছেড়ে দিচ্ছে—আহা, বেচারারা বড়ো ভালো, কেমন মিট্‌মিট্ কোরে' আলো দ্যায়, অন্ধকারে পাছে কেউ পথ হারায়, তাই।

মিয়াগি কতোক্ষণ যে তোদের দেখলে তার ঠিক নেই। হঠাৎ সে একটা চীৎকার শুন্‌লে। একটি মেয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে আচমকা জলে পড়ে' গেছে। সে নৌকা থেকে লাফিয়ে সাঁতরে তার কাছে গেলো, তাকে জল থেকে তুল্লে, দুজনে অনেকক্ষণ নদীর ধারে বোসে রইলো,—দুজনে দুজনকে ভালোবেসে ফেল্লে।

আমাদের দেশে মালা-বদল আছে, বিলাতে আছে আংটি-বদল,—জাপানে তখন ছিল পাখা-বদল। মিয়াগি মেয়েটিকে তার পাখা দিলে—মেয়েটিও লজ্জায় মুখ নীচু কোরে' নিজের পাখাটি দিলে মিয়াগিকে। মেয়েটির নাম মিয়ুকি। তার পাখাতে আঁকা ছিলো একটা গোলাপফুল। মিয়াগি তার নিজের পাখায় সেই ফুলের ওপর একটা ছোটো কবিতা লিখে দিলে। তার পর তারা যে যার ঘরে ফিরে গেলো।

মিয়ুকি বাড়ী গিয়ে শুন্‌লে, তার নাকি কোথায় কার সঙ্গে বিয়ের ঠিক হোয়ে গিয়েছে। এতো বড়ো জ্বালাতন! কে—না—কে, তার সঙ্গে বিয়ে! মিয়ুকির কান্না পেতে লাগলো। কিন্তু বাপ-মায়ের ওপর নাকি কথা কইতে নেই, তাই সে কিছু বল্লে না,—চুপ কোরে শুয়ে রইলো আর আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো। বেশীক্ষণ সে নিজেকে ঠিক রাখতে পারলে না,—তার চোখের সাম্‌নে থেকে থেকে ভেসে ওঠে সেই নদীর তীর, সেই জোনাকির আলো, আর মিয়াগির সুন্দর মুখখানি। নিশীথ রাতে যখন সব নিশুতি হোয়ে গিয়েছে, মিয়ুকি আস্তে আস্তে দরোজা খুল্লো, চললো—কোথায় তার কোনো ঠিকানা নেই। হঠাৎ তার খেয়াল হোলো, যাই না সহরে, সেখানে মিয়াগির দেখা পাবো। সহরে এসে পৌছলো সে ঠিক যখন সকাল হোয়েছে। কোথায় মিয়াগি? ভোরের বেলা সে সহর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে,—কোথায় তা' কেউ জানে না।

ভারী জিনিষের নীচে থাকিতে পারে না, কাজেই সেটা বুদ্বুদের আকারে উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠে। বুদ্বুদ উপরে উঠিয়া ফাটিয়া যায়—অর্থাৎ বাষ্পটা উড়িয়া গিয়া বাতাসের সাথে মেশে।

জল ফুটাইলেও এই রকম বুদ্বুদ উঠিতে থাকে, আর উপরে উঠিয়া সেগুলি ফাটিয়া যায়, কিন্তু জল উথলায় না। তার কারণ, জলটা আগাগোড়া এক জিনিষ। কাজেই বুদ্বুদটা উপরের দিকে উঠিবার সময় কোন বাধা পায় না। দুধের বেলা কিন্তু সেটা হয় না। দুধের মধ্যে অনেক জিনিষ আছে; তার মধ্যে বেশীর ভাগই জল। গরম করিলে এই জলটাই ফুটিতে থাকে। জল ছাড়া দুধের মধ্যে আরও অনেক জিনিষ আছে, সেগুলি সব তরল নয়, কতক কঠিন। দুধ গরম করিলে এই কঠিন জিনিষটা উপরে একটা পর্দ্দার মত জমিতে থাকে (যাকে আমরা বলি সর), কাজেই পর্দ্দার তলায় যে বুদ্বুদগুলি উঠিতেছে সেগুলি পর্দ্দায় বাধা পাইয়া ফাটিতে পারে না, ফলে সেগুলি ক্রমাগত পর্দ্দাটাকে উপরে ঠেলিতে থাকে, আর দুধও সঙ্গে সঙ্গে উথ্‌লাইয়া পড়ে। পর্দ্দাটা যদি হাতা দিয়া নাড়িয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে বুদ্বুদ গুলি উপরে আসিবার পথ পাইবে, দুধ ও উথ্‌লাইবে না।

## চুল কাটিলে ব্যথা লাগেনা, কিন্তু চুল ধরিয়া টানিলে ব্যথা লাগে কেন?

আমাদের শরীরের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই অনেক শিরা উপশিরা আছে। সেগুলির সাথে আবার আমাদের মগজের যোগ আছে। যেখানে এই শিরা উপশিরা আছে সেখানটায় যদি আঘাত করা যায় তাহা হইলে শিরাগুলিতেও সে আঘাত লাগিবে, আর মগজের সাথে যোগ থাকায় আমরা যন্ত্রণা উপলব্ধি করিব। শরীরের যে অংশটার সাথে শিরার কোন যোগ নাই সেখানটায় আঘাত লাগিলে কোন যন্ত্রণা হইবে না। আবার কোন শিরা যদি নিস্তেজ হইয়া পড়ে তাহা হইলেও সেটায় আঘাত লাগিলে কোন যন্ত্রণা টের পাওয়া যাইবে না। ডাক্তারেরা অস্ত্র করিবার সময় ক্লোরোফর্ম্ম ব্যবহার করেন, ক্লোরোফর্ম্ম শিরাগুলিকে নিস্তেজ করিয়া দেয়, কাজেই তখন গায়ে ছুরী বসাইলেও কোন শিরা দিয়া সে খবর মগজে যাইতে পারে না; রোগীও কোন ব্যথা টের পায় না। মাথার চুলেও এই ব্যাপার। চুলের গোড়াগুলির সাথে শিরার যোগ আছে। চুল টানিলে এই শিরাগুলিতেও টান পড়িবে, কাজেই ব্যথা লাগিবে। কিন্তু চুলের ভিতর কোন শিরা নাই; কাজেই চুলের মাঝখানে কাটিলে কোন শিরাতেই সে আঘাত লাগিবে না, কোন ব্যথাও টের পাওয়া যাইবে না।

---

# অন্ধ-মেয়ে

[ জাপানী গল্প ]

( অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল এম্-এ, বি-এল )

মিয়াগি জাপানের একজন উঁচুদরের সেপাই। গ্রীষ্মকাল। সুন্দর সন্ধ্যা। সে একটা ছোট নৌকা ভাড়া কোরে' নদীতে বেড়াচ্ছিলো, এমন সময়ে সে দেখ্‌লে ও-পারে কতকগুলো ছোট মেয়ে, কালো-চুল, ফুট্‌ফুটে চেহারা, জোনাকীর পেছন পেছন ছুটোছুটি কর্‌ছে। তারা জোনাকি ধর্‌ছে,—চুলে পর্‌ছে—আবার ছেড়ে দিচ্ছে—আহা, বেচারারা বড়ো ভালো, কেমন মিট্‌মিট্ কোরে' আলো দ্যায়, অন্ধকারে পাছে কেউ পথ হারায়, তাই।

মিয়াগি কতোক্ষণ যে তোদের দেখলে তার ঠিক নেই। হঠাৎ সে একটা চীৎকার শুন্‌লে। একটি মেয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে আচমকা জলে পড়ে' গেছে। সে নৌকা থেকে লাফিয়ে সাঁতরে তার কাছে গেলো, তাকে জল থেকে তুল্লে, দুজনে অনেকক্ষণ নদীর ধারে বোসে রইলো,—দুজনে দুজনকে ভালোবেসে ফেল্লে।

আমাদের দেশে মালা-বদল আছে, বিলাতে আছে আংটি-বদল,—জাপানে তখন ছিল পাখা-বদল। মিয়াগি মেয়েটিকে তার পাখা দিলে—মেয়েটিও লজ্জায় মুখ নীচু কোরে' নিজের পাখাটি দিলে মিয়াগিকে। মেয়েটির নাম মিয়ুকি। তার পাখাতে আঁকা ছিলো একটা গোলাপফুল। মিয়াগি তার নিজের পাখায় সেই ফুলের ওপর একটা ছোটো কবিতা লিখে দিলে। তার পর তারা যে যার ঘরে ফিরে গেলো।

মিয়ুকি বাড়ী গিয়ে শুন্‌লে, তার নাকি কোথায় কার সঙ্গে বিয়ের ঠিক হোয়ে গিয়েছে। এতো বড়ো জ্বালাতন! কে—না—কে, তার সঙ্গে বিয়ে! মিয়ুকির কান্না পেতে লাগলো। কিন্তু বাপ-মায়ের ওপর নাকি কথা কইতে নেই, তাই সে কিছু বল্লে না,—চুপ কোরে শুয়ে রইলো আর আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো। বেশীক্ষণ সে নিজেকে ঠিক রাখতে পারলে না,—তার চোখের সামনে থেকে থেকে ভেসে ওঠে সেই নদীর তীর, সেই জোনাকির আলো, আর মিয়াগির সুন্দর মুখখানি। নিশীথ রাতে যখন সব নিশুতি হোয়ে গিয়েছে, মিয়ুকি আস্তে আস্তে দরোজা খুল্লো, চললো—কোথায় তার কোনো ঠিকানা নেই। হঠাৎ তার খেয়াল হোলো, যাই না সহরে, সেখানে মিয়াগির দেখা পাবো। সহরে এসে পৌছলো সে ঠিক যখন সকাল হোয়েছে। কোথায় মিয়াগি? ভোরের বেলা সে সহর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে,—কোথায় তা' কেউ জানে না।

মিয়ুকির কি দুঃখ! কতো কান্নাই না সে কাঁদলে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাঁদতে কাঁদতে কাটলো তার। চোখের জলের আর শেষ নেই। শীঘ্রই তার সুন্দর চোখ দুটোর জ্যোতি নিভে গেলো। অন্ধ মিয়ুকির দিন আর কাটে না। মাঝে মাঝে ভাবে,—জীবনটা বেরিয়ে যায় তো ভালো হয়। আবার ভাবে, তাই বা কেন? মিয়াগিকে খুঁজে পাবোই পাবো—সেই আসায় বেঁচে থাকতে হবে।

বেঁচে থাকতে তো হ'বে—কিন্তু খোরাক চাই যে। সে ভাবলে,—চোখ গিয়েছে, তাতে কি? আমার গলা তো আছে,—গান গেয়ে খাবো। সেদিন থেকে সে রাস্তায় চায়ের দোকানের সামনে বীণা বাজিয়ে গাইতে লাগলো,—সেই গানটি যা' মিয়াগি তার পাখায় লিখে দিয়েছিলো। একে তার মিষ্টি গলা, তায় সে অন্ধ এবং সুন্দর,—কাজেই লোকে তাকে খুব কদর করতে লাগলো—তারা আদর করে তার নাম দিলে আসাগাও বা ফুলের রাণী।

অন্ধ মেয়েটি গান গায়—আর তাকে এখান থেকে ওখানে হাত ধরে নিয়ে যায় তার সঙ্গিনী আসাকা (মিঠে গন্ধ)। অদৃষ্টের ফের একেই বলে। আসাকাকে হঠাৎ কে মেরে ফেল্লে—সেদিন থেকে মিয়ুকি একেবারে একলা—হাত ধরে নিয়ে যাবার তার কেউ রইলো না। শুধু তার আঁধার মনে একটা সান্ত্বনা মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মতো দপ্ দপ্ কোরে জ্বলছিলো। সেটা হচ্ছে এই যে, কখনো না কখনো সে মিয়াগির দেখা পাবে।

বছরের পর বছর যায় মিয়ুকির বুকে তার কালো ছাপ রেখে। একদিন দৈবাৎ প্রভুর কি একটা কাজে মিয়াগি এসে পড়লো সেই সহরে যেখানকার রাস্তাঘাটে গান গেয়ে বেড়ায় অন্ধ মিয়ুকি। তার সঙ্গী ছিলো তকিতা। তারা দুজনে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হোয়ে একটা চায়ের দোকানে এসে বসলো। তকিতার মনটা কেমন খারাপ ছিলো,—সে মুখখানা অন্ধকার কোরে এক পাশে বোসে রইলো। কিন্তু মিয়াগি এদিক ওদিক তাকাতে লাগ্‌লো। হঠাৎ তার নজরে পড়লো, একটা পর্দ্দার গায়ে লেখা আছে তার সেই ছোট্ট কবিতা—যেটি সে একদিনের দেখা সেই মেয়েটির পাখায় অনেক যত্নে আঁকবার মতন কোরে লিখে দিয়েছিলো অনেক বছর আগে। মিয়াগির আকাশ-পাতাল ভাবনার মাঝখানে চায়ের দোকানের মালিক ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে সেখানে এসে হাজির হোলো। মিয়াগি তাকে কবিতাটির কথা জিজ্ঞাসা করলে। সে বোল্‌তে লাগলো।—

"সে বড়ো দুঃখের কথা, মশাই। একটি গরীব অন্ধ মেয়ের গান এটি। তার বাপ মা যার সঙ্গে তার বে দিতে চায় সে তাকে বে কর্ব্বে না বোলে বাড়ী থেকে পালিয়ে



এসেছিলো। সে আর একজনকে ভালোবাসে। তার খোঁজে সে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারই বাঁধা এই গানটি গেয়ে বেড়াচ্ছে—তার শোকেই সে অন্ধ হোয়ে গেছে। এখনো তার আশা একদিন না একদিন সে তার সেই মনের মানুষটিকে খুঁজে পাবে। মশাই, তাকে এখুনি ডেকে আনতে পারি,—সে আমারি চায়ের বাগানে আছে।"

মিয়াগি তার আনন্দ চেপে রাখতে পারলে না। সে চায়ের দোকানের মালিককে তখুনি মেয়েটিকে আন্‌তে অনুরোধ করলে।

চোখের নিমেষ ফেলতে না ফেলতে আসাগাও তার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। অনেক বছরের দুঃখ কষ্ট তার ওপর দিয়ে গেছে—কিন্তু আশার আলো যেন তার মুখে একটা চোখ ঝল্‌সানো জ্যোতি ফুটিয়ে রেখেছে।

আসাগাও বীণার ঝঙ্কার তুলে মৃদু সুরে গাইতে লাগলো—

"রোদের তাপে শুকিয়ে ওঠে শিশির-ভেজা ফুল;
ইলশে-গুঁড়ি বৃষ্টি তারে করলে গো মসগুল!"

মিয়াগি খুব মন দিয়ে গানটা শুন্‌তে লাগ্‌লো। কথা কইবার, পরিচয় দেবার ইচ্ছা তার প্রাণের ভেতর তোলপাড় করছিলো। কিন্তু প্যাঁচা-মুখো সঙ্গীটার সাম্‌নে সে কিছু বোল্‌তে সাহস পেলে না। আসাগাওর জ্যোতিহীন চোখ দুটোর দিকে সে চেয়ে রইলো। ঘরটা গানের সুরে, বীণার ঝঙ্কারে রুণু রুণু করতে লাগ্‌লো। মিয়াগি কোনো প্রাণের কথা না বোলে' মেয়েটির পাওনা দিয়ে তাকে বিদায় দিলে। আসাগাও ঘর ছেড়ে যাবার সময় যেন একটা নতুন বেদনা পেলে। এই অজানা লোকটির গলার স্বরে যেন কতো করুণা, যেন এমন একটা কিছু ছিলো যা' তা'র ব্যাকুলতা বাড়িয়ে দিয়ে গেলো।

পরের দিন মিয়াগি সেই চায়ের দোকানের মালিককে একটা পাখা আর কিছু টাকা দিয়ে বোল্লে,—"আসাগাওকে এই পাখা আর টাকা ক'টি দিও। সে সবি বুঝতে পারবে।" এই কথা বোলে' সে আর তা'র সঙ্গী দুজনে নিজেদের কাজে সহর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

আসাগাও পাখাটা পেয়ে তার ছোটো সাদা আঙুলগুলো তার ওপর বার বার বুলোতে লাগ্‌লো। বোল্লে সে,—"কে আমায় এই পাখা আর টাকা দিলে? ওগো, বলো না? পাখাটা কি রকম দেখতে। এতে কি একটা গোলাপ ফুল আঁকা আছে।"

চায়ের দোকানের মালিক তার দিকে কোমলভাবে চেয়ে বোল্লে—"তুমি কাল রাত্তিরে যাকে গান শুনিয়েছিলে, সেই দিয়েছে। হাঁ, এতে একটা গোলাপ ফুল আঁকা আছে।"

আসাগাও আহ্লাদে চীৎকার কোরে' উঠ্‌লো। তার পর, ধীরে ধীরে বোল্লে,—"কাল রাত্তিরে তার কাছে ছিলুম আমি। আর এখন, এখন........."

ঠিক সেই সময়ে আসাগাওর বাপের বাড়ীর এক জন চাকর সেখানে এসে খবর দিলে যে, তাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সে এসেছে। কিন্তু আসাগাও তো ফিরে যেতে চায় না—সে কিছুতেই গেলো না।

চায়ের দোকানের মালিক আসাগাওর বাপের পরিচয় পাবা মাত্রই ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়ালো। সে এককালে আসাগাওর বাপের কাছে কাজ কর্‌তো। সে সময়ে সে একটা এমন গুরুতর অপরাধ করেছিলো—যা'র একমাত্র সাজা মৃত্যু। আসাগাওর বাপ তার ওপর দয়া কোরে' তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলো। সে কিছু টাকা দিয়ে তাকে বিদায় কোরে দিয়েছিলো,— আর সেই টাকাতেই সে চায়ের ব্যবসা সুরু কোরেছে;......সে যখন দেখ্‌লে আসাগাও কোনো মতে বাড়ী ফিরে' যাচ্ছে না, আর না গেলে অনাহারে তাকে মর্‌তে হবে, তখন সে নিজের পিত্ত * দিয়ে প্রভুকন্যার চোখ সারাবার মতলব কোর্লে। তখুনি সে বুকে ছোরা মেরে আত্মহত্যা কর্লে,—আর আসাগাও তার হারানো চোখ দুটো ফিরিয়ে পেলে।

সে রাত্তিরে ভীষণ ঝড় উঠ্‌লো। কিন্তু আসাগাও তা গ্রাহ্য না কোরে তার বাপের পাঠানো কয়েকটী বিশ্বাসী চাকর সঙ্গে নিয়ে মিয়াগির খোঁজে বেরুলো। সারারাত সে চল্লো উঁচু-নীচু রাস্তা দিয়ে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিলো,—তার পায়ের তলায় রক্ত ঝরছিলো—কিন্তু সে কিছুতে ভ্রূক্ষেপ না কোরে, চোল্‌তে লাগলো মিয়াগির সন্ধানে।

সকাল হোলো। তখন সে একটা উঁচু পাহাড়ে উঠ্‌ছিলো। হঠাৎ তার মনে হোলো, কে যেন তার নাম ধোরে' ডাক্‌ছে। এদিক ওদিক চেয়ে দেখ্‌লে সে, কাছেই রোয়েছে মিয়াগি। এত দিনকার হারানো শান্তি তার বুকে আবার ফিরে' এলো। দুঃখ-কষ্ট সবি সে এক মুহূর্ত্তে ভুলে গেলো। সেই খানেই তাদের বিয়ে হোলো।

---

## চিত্র-পরিচয়

ছেলেবেলায় ঈশ্বরচন্দ্র যে দেখিতে ছিলেন 'যশুরে কই'এর মত, তাহা গত মাসে তোমরা শুনিয়াছ। স্বভাবটী ছিল আবার অতি মাত্রায় এক গুঁয়ে। যে গোঁ একবার ধরিবেন, কার সাধ্য তার বিপরীত কাজ তাঁকে দিয়া করায়? শুধু তাই নয়, যদি তাঁর বাবা অথবা অন্য কোন গুরুজন বলিতেন, "অমুক কাজটা কর," অমনি তিনি বাঁকিয়া বসিতেন, "উঁহু, কিছুতেই করবো না"। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস তাই ভারী এক মজার কাণ্ড করিতেন। যদি দেখিলেন, সেদিন ঈশ্বরচন্দ্রের স্নান করা দরকার, অমনি বলিতেন "ঈশ্বর, আজ কিন্তু নাইতে পাবে না"।

অমনি ঈশ্বরচন্দ্র গামছা হাতে লইয়া গোঁ ধরিলেন, "নাইবোই নাইবো।"

[ ২৭৬ পৃষ্ঠায় মিঃ কাবালীর যে ছবি দেওয়া হইয়াছে তাহার ব্লক Modern Reviewর সৌজন্যে প্রাপ্ত ]

---

* আগে জাপানের লোকেরা বিশ্বাস করতো যে, মানুষ বা জন্তুর পিত্ত অনেক কঠিন রোগ আরাম করে।

### ঘুমাও, ঘুমাও

( শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ধুলগ্রাম, খুলনা )

[ ইংরাজী কবিতার ভাব অবলম্বনে ]

নাহি হেথা পৃথিবীর পাপপূর্ণ কল কোলাহল,
পৃথিবীর চিন্তা নাই, নিদ্রা তব হউক সফল।
ঘুমাও শুনিয়া ঐ পিক আর পাপিয়ার গান,
ঘুমাও নীরবে; শুন নদীজলে কুলুকুলু তান।
ধীরে ধীরে আঁখিপাতা নিদ্রাবেশে হউক মুদিত,
গান মোর দোল খেয়ে ধীরে ধীরে হো'ক প্রবাহিত।
উজল আলোকে প্রাতে ভেঙ্গে যাবে সোনার স্বপন,
যবে তুমি ঘুমাইবে পাহারাতে রহিব তখন।

—:o⊂⊃o:—

### ভোরের আলো

( শ্রীজ্যোৎস্না দেবী, লক্ষ্মীপুর )

পুব আকাশের
দিক্ মাতিয়ে
সবুজ পাতা
টগর বেলি
ভোমরা বধূ
ঝির ঝির ঝির্
উষারাণীর
আকাশ পথে

ভোরের আলোয়
ঘোমটা খুলে
পূত হাওয়ায়
আনন্দেতে
রঙীন্ ফুলে
বইছে বাতাস
মাথার কিরীট
পায়ের নূপুর

স্বপন গেল টুটে,
উঠ্‌ল কুসুম ফুটে।
দিল্ কাঁপিয়ে তোলে,
হাস্‌ছে দুলে দুলে।
কি যেন কয় কাণে;
আবেশ আনে প্রাণে।
দেখে' নয়ন্ ঝলে,
বাজ্‌ছে তালে তালে।

উষায় উঠে
"আর দেখি না
উত্তরেতে
সেথায় চেয়ে
লোহিত যে গো
অরুণ আলো
মৃদু মন্দ
উষা রবির

খোকন্ সোণা
চাঁদা মামায়,
একটি তারা
খোকন বলে
পূবের আকাশ,
ছড়িয়ে গেছে,
বইছে হাওয়া
মিলন এখন,

বলছে কুতূহলে
কোথায় গেল চলে ?"
বিমল হাসি হাসে ;
"তুমি কেন বসে ?"
হঠাৎ চেয়ে দেখি
আস্‌ছে রবি নাকি ?
ভোর না হতে আজ,
ও প্রভাতী সাজ।

---

## জগাই খুড়ো

( শ্রীঅনিলকুমার সরকার, হাওড়া )

আজকে কেন জগাই খুড়োর বদন দেখি ভারী ?
আঁধার মুখে, সজল চোখে ফির্‌ছে হেঁটে বাড়ী।
নাইকো মুখে হাসির ছটা মাথা তাহার নীচু ;
কোথায় তাহার টেরীর বাহার, ঠিক হয়েছে কিছু।

এই না দেখে নন্দ দুলাল সাম্‌নে ছুটে গিয়ে,
বল্লে ডেকে—"জগাই খুড়ো, ব্যাপারখানা কিহে ?
বিপদটা কি আমায় বলো, উপায় করি তার,
কাম্‌ড়েছে কি পাগ্‌লা কুকুর বিষ্টুচরণ দাঁ'র ?

কিম্বা ভুতের স্বপন দেখে চোখ রাঙ্গালে কি ?
গফুর চাচা তোমার আজি ঘুম ভাঙ্গালে কি ?"
বল্লে জগাই থামিয়ে কাঁদন চক্ষু দুটি মুছে,
নিমেষ তরে শূন্যে চেয়ে তার পরে চোখ বুজে।

"আজ স্বপনে হঠাৎ দেখি টাকার যত কাঁড়ি,
ঝুর ঝুরিয়ে পড়ছে এসে, ভর্‌ছে আমার বাড়ী।
হাত বাড়িয়ে যেই গিয়েছি সকল টাকা নিতে,
চম্‌কে দেখি—ধরেছি' এক কোলাব্যাঙের মিতে॥"

—:o⊂⊃o:—

## অদ্ভুত ঘড়ী

বিলাতের পিকাডেলি সার্কাস ষ্টেশনের কাছে কিছুদিন হইল এক ভারী অদ্ভুত ঘড়ী বসান হইয়াছে। ঘড়ীটার উপর একটা পৃথিবীর ম্যাপ বসান আছে, আর উপরে লেখা আছে "What's the time" ( কটা বেজেছে ) ? এই ঘড়ী দেখিয়া একই সময়ে পৃথিবীর কোন্ জায়গায় ক'টা বাজিল বলিয়া দেওয়া যায়।

## বলের মত বাড়ী

নীচের ছবিখানায় দেখ একটা রাস্তার দুধারে কেমন সার বাঁধিয়া কতকগুলি বলের মত

বলের মত বাড়ী

বাড়ী দাঁড়াইয়া। জার্ম্মেনীর ড্রেস্‌ডেন সহরে এই রকম বাড়ী তৈরী হইতেছে। এই ধরণের বাড়ী নাকি যেমনি সুবিধার তেমনি স্বাস্থ্যকর।

## মঙ্গল গ্রহে যাত্রা

প্রফেসার এভারেট্ হাণ্ট্ নামে এক বৈজ্ঞানিক এক অদ্ভুত উপায়ে মঙ্গল গ্রহে যাইবার মতলব করিয়াছেন। তিনি বলেন, তিনি এমন এক খানা গাড়ী তৈরী করিতে পারিবেন যাহা সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে, অর্থাৎ আলো যতটা জোরে যায় ঠিক ততটা জোরে ছুটিতে পারিবে। এই গাড়ীতে করিয়া তিনি ৫ মিনিটেই মঙ্গল গ্রহে গিয়া হাজির হইতে পারিবেন। মঙ্গল গিয়া সেখানে খানিকক্ষণ বেড়াইয়া আবার ফিরিয়া আসাও চলিবে। গাড়ী চালাইতে কোনও তেল কিংবা অন্য মাল মশলা লাগিবেনা—আলো যেমন করিয়া যায় ইহাও তেমনি ভাবে যাইবে। বৈজ্ঞানিক মহাশয় তাঁহার গাড়ীর চেহারা কেমন হইবে তাহারও একটা খসড়া করিয়া ফেলিয়াছেন। দেখিতে তাহা হইবে অনেকটা পেয়ারার মত।

## মেকি টাকা ধরার কল।

আমেরিকার এক বৈজ্ঞানিক মেকি টাকা ধরিবার এক কল বাহির করিয়াছেন। কোন টাকা মেকি বলিয়া সন্দেহ হইলে উহার মধ্যে ফেলিয়া দিলেই হইল, টাকা যদি খারাপ হয় তবে কল তৎক্ষণাৎ তাহা ফেরৎ দিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে "ভাল টাকা দেবেন মশাই" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে।

## কাবুলে হুলস্থূল ব্যাপার

আফ্গানিস্থানে পুরাদমে গোলমাল চলিতেছে। আমীর আমানুল্লা কান্দাহার হইতে দলবল লইয়া কাবুল দখল করিতে আসিতেছিলেন, পথে ধাক্কা খাইয়া সরিয়া আসিয়াছেন একেবারে ভারতবর্ষে। বোম্বাইয়ে আসার পর তাঁহার রাণী সৌরিয়া একটী কন্যা প্রসব করিয়াছেন। এখন ইহারা সমুদ্র পাড়ি দিয়া ইটালীতে যাওয়ার উদ্যোগে আছেন। সেখানে নাকি আমানুল্লা কৃষিকার্য্য যুড়িয়া দিবেন। তাঁহার কুটুম্ব আলী আহম্মদজান আমানুল্লার পলায়নের পর নিজেকে আমীর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহার পাত্তা পাওয়াই কঠিন। বাচ্চা এখনও কাবুলে কর্ত্তা, কিন্তু নানাদিক্ হইতে তাঁহার উপর চোট্ পড়িতেছে। নাদির খাঁ ও তাঁর ভাইএরা ত আছেনই—মস্কো হইতে আবার গোলাম নবী খাঁ আসিয়া উত্তর দিক্ আক্রমণ করিয়াছেন। ইনি আকাশ হইতে বোমা ছুড়িতেও কসুর করিতেছেন না। দেখা যাক্ কিসে কি হয়।

---

# আত্ম-সম্মান

(শ্রী————)

পাহাড়ের উপর দুর্গ মেরামত হইতেছে। কয়েক জন সৈন্য একটা ভারী কাঠের কড়ি তুলিতে চেষ্টা করিতেছিল, আর নিকটে দাঁড়াইয়া এক মোটা অফিসার হেঁড়ে গলায় সৈন্যদের হুকুম করিতেছিলেন। কড়িটা ভয়ানক ভারী, সৈন্যদের সারা গা বহিয়া ঘাম ঝরিতেছিল; আর একজন লোকের সাহায্য পাইলেই তাহারা কাজটা সহজে করিতে পারিত, কিন্তু সেই মোটা অফিসারের সে দিকে হুঁস্ ছিল না। নিজে সাহায্য করা দূরে থাক্ তিনি শুধু বেচারাদের ধমকাইতেছিলেন—"ভাল করে ধরনা হে, কাঁধটা লাগাও—আঃ ওদিকে কি দেখ্ছ,—আবার? সাগু খাও নাকি?"

সেখান দিয়া একটি ভদ্রলোক যাইতেছিলেন। চীৎকার শুনিয়া তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। অফিসারের কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার বেশ একটু রাগ হইল, বলিলেন "মশাই, আপনি নিজে একটু সাহায্য করলেই ত' এরা তুলতে পারে।" অফিসার মহাশয় তাঁহার প্যাঁচার মত মুখখানাকে এমন করিয়া ভদ্রলোকটির দিকে তাকাইলেন যেন এমন আহাম্মকের মত কথা তিনি জীবনে শুনেন নাই। "হ্যাঃ, আমার আর আত্মসম্মান জ্ঞান নেই, আমি কে জানেন?"

ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিলেন। "আমি সৈন্য বিভাগের একজন অফিসার।" "কি অফিসার?" "বলুন দেখি কি মনে হয়;" "আপনি তবে প্রাইভেটের উঁচুতে?"—"তার অনেক উচুতে।" "তবে আপনি বুঝি ল্যান্স করপোরাল?" "না আরও উচু।" "তবে কি করপোরাল?" "হ্যাঁ—হ্যাঁ।"

ভদ্রলোকটি যেন একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন "ওঃ, ক্ষমা করবেন, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।" এই বলিয়া তিনি নিজের কোটটা খুলিয়া সৈন্যদের সঙ্গে গিয়া কড়িটা ধরিলেন।" শীঘ্রই কড়ি ঠিক যায়গায় উঠিল; ভদ্রলোকটি আসিয়া আবার কোট গায় দিলেন। করপোরাল মহাশয় তাঁহাকে একটা ধন্যবাদ দেওয়াও আবশ্যক বোধ করিলেন না। ভদ্রলোকটিই আবার কথা বলিলেন—"আপনার যদি আর কখনও কড়ি তোলার দরকার হয় আর সঙ্গে যথেষ্ট লোক না থাকে তা হ'লে আমাকে খবর দেবেন, আমি এসে কড়ি তুলে দেব।" করপোরাল এবার কথা কহিলেন—"আপনি কে?"

"আমিও সৈন্য বিভাগে কাজ করি; আন্দাজ করুন ত।" অবজ্ঞাভরে প্রশ্ন হইল—"প্রাইভেট বুঝি?" "আজ্ঞে না—আর একটু উচু।" "তবে ল্যান্সকরপোরাল নিশ্চয়ই।"

"না, আর একটু উচু।" করপোরাল মহাশয় নিজেকে একটু বিপন্ন বোধ করিলেন। বলিলেন "তবে আপনিও করপোরাল বুঝি?"

"না আর একটু উচু"। করপোরাল মহাশয় এবার মাথার টুপিটা নামাইতে বাধ্য হইলেন। তার পর ধরা গলায় বলিলেন, "আপনি সার্জ্জেণ্ট বুঝি?"

"আজ্ঞে না, আর একটু উঁচুতে।" "তবে কি সেকেণ্ড লেফ্‌টেনাণ্ট?" "না, আর একটু উঁচু।" "লেফটেনাণ্ট?" "না, আরও উঁচু।" "তবে কি ক্যাপ্টেন?" করপোরাল মহাশয়ের গলা ক্রমেই ধরিয়া আসিতেছিল। "আজ্ঞে, না আর একটু উঁচুতে।" "তবে—তবে কি মেজর?" "না, আর একটু উঁচু।" "তবে বুঝি লেফটেনাণ্ট কর্ণেল?" "না, আর একটু উঁচু।" "তবে কি কর্ণেল?" "না, আর একটু উপরে।" করপোরাল চোখ কাণ বুজিয়া বলিলেন—"তবে—তবে কি আপনিই ফিল্ড মার্শাল?"

ভদ্রলোকটি মুচকি হাসিয়া বলিলেন "আজ্ঞে না, আর একটু উঁচুতে।" করপোরাল মহাশয়ের চোখ ফাটিয়া এবার জল আসিল। কেননা ইহার উপরেই যাঁহার পদ তিনি হইতেছেন সৈন্য বিভাগের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা—কমাণ্ডার ইন্ চিফ, অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি। ভদ্রলোকটি আর কেউ নন্, স্বয়ং প্রধান সেনাপতি। *

# বৈশাখ মাসের ধাঁধার উত্তর

১। ছেলেটি প্রশ্নকর্ত্তারই পুত্র।

(২)

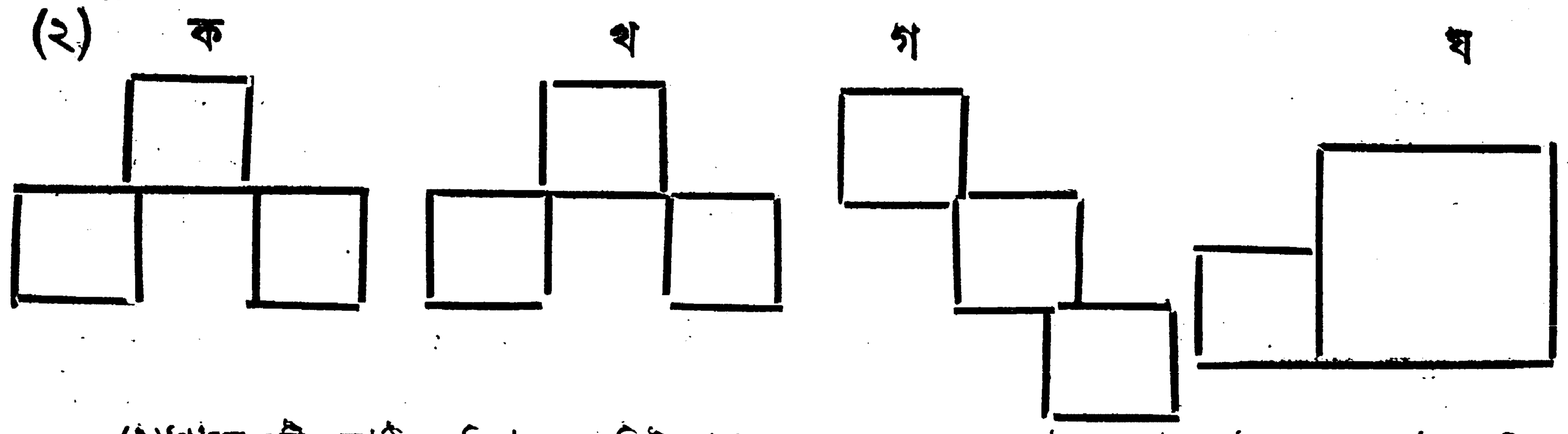


(২)'গ'তে ৪টি কাঠি তুলিয়া সেগুলিই আবার নূতনভাবে সাজাইতে হইবে, ইহা অনেকেই ধরিতে পারেন নাই।

## উত্তর দাতাদের নাম

কেহই নির্ভুল উত্তর দিতে পারেন নাই।

যাঁহারা ৪টি ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন :—

সদানন্দ সাহা (মেদিনীপুর), রণেশকুমার গুপ্ত (জামসেদপুর), উমাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), যোগেশচন্দ্র সাহা (নরসিংহদি), রতনমণি ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর), হরিদাস বারিক, সৌদামিনী ও শশী (কমলপুর), অনিলবরণ মজুমদার (চাঁইবাসা), শান্তিলতা ঘোষ (শ্যামবাজার, কলিকাতা), রামকৃষ্ণ সেন (পুষা), তোফাতল হোসেন ও বজলুল হক (গাইবান্ধা)।

যাঁহারা তিনটি ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন :—

* কোন সত্য ঘটনা অবলম্বনে



প্রিয়দাস বড়ুয়া (আকিয়াব), নরেন্দ্রনাথ রায় (কিশোরগঞ্জ), মাখনলাল অধিকারী (কিশোরগঞ্জ), সুধীরচন্দ্র রায় (জলপাইগুড়ি), নগেন্দ্রচন্দ্র বারিক ও জালালউদ্দিন খান্দাকর (কমলপুর), প্রফুল্ল গুপ্ত (কুমারখালী), গোরা ঘোষ (ভবানীপুর)।

যাঁহারা ২টি ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন :—

সুশীলচন্দ্র সাহা (আখাউরা বাজার), কামাখ্যাচরণ দেব, অরুণ মাধব ও মণীন্দ্রলাল (কুমিল্লা), মলিনা সেন (নোয়াখালী), অমরেশচন্দ্র বসু (হাওড়া), অপর্ণা, অজিত, নিখিল, প্রমোদ, টুকু, ফুল, শান্তি ও জগদীশ (ভোলা)।

যাঁহারা ১টির উত্তর দিয়াছেন :—

পারিজাত রেণু দেবী (মহিমাগঞ্জ), কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় (লাহোর), কৃষ্ণ, কুঞ্জ, কমল, লাবণ্য (ইটালি কলিকাতা), লাবণ্যপ্রভা, বিদ্যুৎপ্রভা, বাসন্তী. বীণারাণী ও সুধামতী দেবী (উদীশা, ভারতী নিকেতন), লক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী (শ্রীরামপুর), সুনীতি দেবী (ভাগলপুর), দ্বিজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভুতি, দ্বিজেন, ইন্দু, মণি, লতিকা (আড়াই হাজার), সুষমাসুন্দরী দেব (সিলেট)।

# জ্যৈষ্ঠ মাসের ধাঁধার উত্তর

১। 'হ' য় চন্দ্রবিন্দু আকারের কি উচ্চারণ? (অন্য কোন প্রশ্নের উত্তর ইচ্ছা করিলে ঘুরাইয়া অন্য ভাবে বলা চলে, কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর ঘুরাইয়া বলা সম্ভব নয়।)

২। ১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮×৯=১০০

## উত্তর দাতাদের নাম

যাঁহারা ২টির উত্তর দিয়াছেন :—

রতনমণি ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর), অনিলবরণ মজুমদার (চাঁইবাসা), মনীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও স্মৃতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (বরিশাল), হিমাংশুকুমার নিয়োগী (জলপাইগুড়ী), অমিয়া, ইন্দিরা, হিমাংশু, অশোক মিত্র (পাবনা), কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় (লাহোর), সুধীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ (দিনাজপুর)।

যাঁহারা ১টির উত্তর দিয়াছেন :—

হরিদাস বারিক (কমলপুর), শান্তিলতা ঘোষ (শ্যামবাজার, কলিকাতা), গোরা ঘোষ (ভবানীপুর), অমরেশচন্দ্র বসু (হাওড়া), পারিজাতরেণু দেবী (মহিমাগঞ্জ), বিভুতি, দ্বিজেন, ইন্দু, মণি, লতিকা (আড়াই হাজার) সুষমাসুন্দরী দেব (সিলেট), মাখনলাল অধিকারী (কিশোর গঞ্জ), বসন্তকুমার ঘোষ (লক্ষ্মীপুর), রামকৃষ্ণ সেন (পুষা), রবীন্দ্রকুমার বসু (হাতুয়া), কৃষ্ণ, কুঞ্জ, কমল, লাবণ্য (ইটালি, কলিকাতা), সদানন্দ সাহা (মেদিনীপুর), শিবপদ সেনগুপ্ত (বাইশরাশি, ফরিদপুর), প্রিয়দাস বড়ুয়া (আকিয়াব), নগেন্দ্র, নৃপেন্দ্র ও জালালউদ্দীন, খান্দাকর (কমলপুর), এ-করিম, সুশীল সাহা (আখাউরা), দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় (চুঁচুড়া)।

ইহা ছাড়া আর একজন বৈশাখের ১টির ও জৈষ্ঠের ২টির ঠিক উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু চিঠিতে তাঁহার নাম নাই।

# নূতন ধাঁধা

নীচে ৯টি পশু পক্ষীর নাম লুকান আছে খুঁজিয়া বাহির কর :—

দ্বারোয়ানজী গণেশ সিংহ যেমন ওস্তাদ গাইয়ে, তেমনি তার দোস্ত চোবেজী। ছকু, মীর মহম্মদ, খগা, ধান চাঁদ এঁরা ও কম যান না। সে দিন ত কাণ্ডই হয়েছিল। ভগবান রক্ষে করলেন নইলে বাছা গণেশজীকে আর দেখতে হত না। বন্ধুদেরও যা ছিরি হয়েছিল গোবর, মাটী গা ময়, নাকালের একশেষ।

এই বৈশাখে সগৌরবে দ্বিতীয় বর্ষে পড়িল

ছোট্টদের সুলভতম সচিত্র মাসিক

নমুনা সংখ্যা ৵১০

# মাস পয়লা

বার্ষিক সডাক ১৸৵০

রায়বাহাদুর জলধর সেন, হেমেন্দ্রলাল রায়, নরেন দেব, গিরিজাকুমার বসু, সুনির্ম্মল বসু, সত্যেন্দ্রনাথ সেন, ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী, ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিশুসাহিত্যের নামকরা সব লেখকেরা মাস পয়লায় নিয়মিত লিখিয়া থাকেন।

বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের ছবিতে ভরপূর হইয়া মাস পয়লা প্রতি মাস পয়লায় বাহির হয়।

গত বৎসরে ছোট্টদের লেখার জন্য ১৭০টি পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। মাস-পয়লায় ছোট্টদের যত লেখা বাহির হইয়াছে এ পর্য্যন্ত কোনো শিশুমাসিকে তেমনটি হয় নাই।

## আজই গ্রাহক হউন

আমাদের প্রকাশিত উপহারের বই

| | | |
|---|---|---|
| সুরথ রাজা ।৵০ | বাঘমামা ।৵০ | সূর্য্যমুখী ৵০ |
| শ্রীচৈতন্য ।৵০ | পরীর দৃষ্টি ।৵০ | শাহজলাল ।০ |
| কৃতবোধ ।০ | ভেল্কী ।/০ | বীররাজা ৵০ |
| দধীচি ।০ | মশারযুদ্ধ ।০ | বাতাসের কথা ৷৵০ |
| রঘুনাথ ।০ | অদ্বৈতাচার্য্য ।৵০ | হুলুস্থুল ।৵০ |

কুলজা সাহিত্য-মন্দির

৩০নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

'রামধনু' সম্পাদক শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রণীত

# দিগ্বিজয়ী বীর

(আলেকজান্দারের জীবন-কথা)

এই আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগেই বাহির হইবে

মুল্য ৷৹ আট আনা



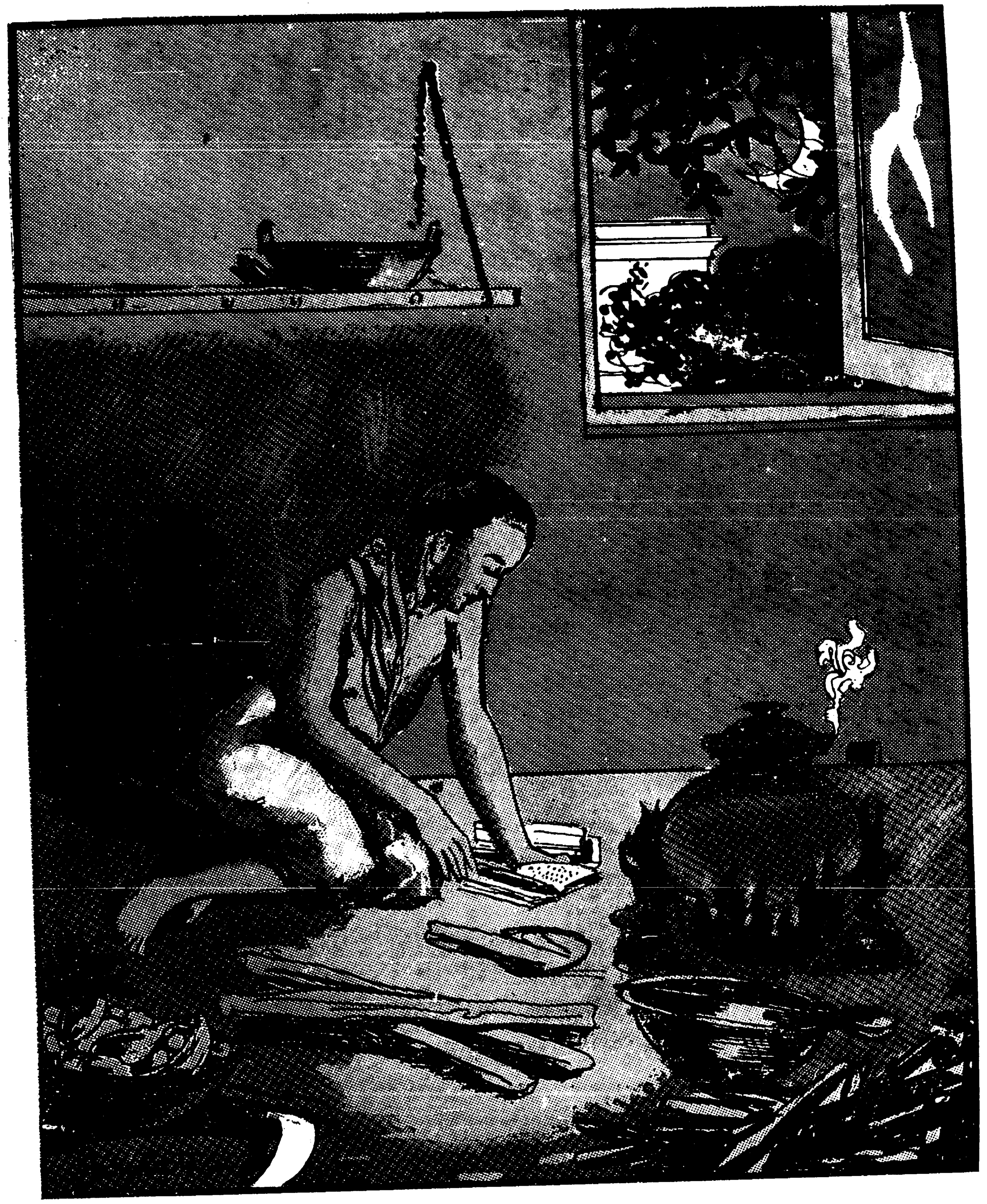

চিত্রে বিদ্যাসাগর জীবনী—৬

রান্না, পড়া এক সাথে।

শিল্পী—শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত ]

[ চিত্র পরিচয় দেখ

এই বৈশাখে সগৌরবে দ্বিতীয় বর্ষে পড়িল

ছোট্টদের সুলভতম সচিত্র মাসিক

নমুনা সংখ্যা ৵১০ **মাস পয়লা** বার্ষিক সডাক ১৷৵০

রায়বাহাদুর জলধর সেন, হেমেন্দ্রলাল রায়, নরেন দেব, গিরিজাকুমার বসু, সুনির্ম্মল বসু, সত্যেন্দ্রনাথ সেন, ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী, ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিশুসাহিত্যের নামকরা সব লেখকেরা মাস পয়লায় নিয়মিত লিখিয়া থাকেন।

বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের ছবিতে ভরপূর হইয়া মাস পয়লা প্রতি মাস পয়লায় বাহির হয়।

গত বৎসরে ছোট্টদের লেখার জন্য ১৭০টি পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। মাস-পয়লায় ছোট্টদের যত লেখা বাহির হইয়াছে এ পর্য্যন্ত কোনো শিশুমাসিকে তেমনটি হয় নাই।

**আজই গ্রাহক হউন**

**আমাদের প্রকাশিত উপহারের বই**

| | | |
|---|---|---|
| সুরথ রাজা ।৵০ | বাঘমামা ।৵০ | সূর্য্যমুখী ৵০ |
| শ্রীচৈতন্য ।৵০ | পরীর দৃষ্টি ।৵০ | শাহজলাল ।০ |
| কৃতবোধ ।০ | ভেল্কী ।৴০ | বীররাজা ৵০ |
| দধীচি ।০ | মশারযুদ্ধ ।০ | বাতাসের কথা ৷৵০ |
| রঘুনাথ ।০ | অদ্বৈতাচার্য্য ।৵০ | হুলুস্থুল ।৵০ |

**কুলজা সাহিত্য-মন্দির**

**৩০নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা**

---

'রামধনু' সম্পাদক শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

প্রণীত

# দিগ্বিজয়ী বীর

**( আলেকজান্দারের জীবন-কথা )**

**এই আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগেই বাহির হইবে**

**মূল্য ৷০ আট আনা**

**চিত্রে বিদ্যাসাগর জীবনী—৬**

রান্না, পড়া এক সাথে।

শিল্পী—শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত ]

[ চিত্র পরিচয় দেখ

INTENTIONAL

২য় বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৩৬ { ৭ম সংখ্যা

# শ্রাবণে

[ শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ]

মুষল-ধারে বৃষ্টি পড়ে বান্ ডেকে যায় গাঙ্গে ;
স্রোতের জোরে জলের তোড়ে পাড়ের মাটী ভাঙ্গে !
নদী-নালায় নৌকা চলে, হাল্কা যেন শোলা ;
নৌকা-নৌকা খেলে শিশু ভাসিয়ে মোচার খোলা ।
গাছেরা সব বর্ষাধারা নিচ্ছে মাথা পেতে,
বৃষ্টি-রসে পুষ্ট হয়ে শস্য বাড়ে ক্ষেতে !
মাঠে মাঠে সুখের আশায় চাষারা গায় গান,—
বৃষ্টি-ধারায় দয়ার ঝরা ঢালেন ভগবান্ ।

# জলের কাণ্ড

( শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য )

সে দিন সকাল বেলা কলতলায় গিয়াছি, হঠাৎ চোখে পড়িল যেখানটায় জল পড়িতেছে সে জায়গাটায় বেশ একটু গর্ত্ত হইয়া আছে। নরম মাটী নয়—সিমেণ্ট আর ইট দিয়া বাঁধান শক্ত জায়গা, তাহার মধ্যে আবার কে গর্ত্ত করিতে আসিল বাপু! আর এমন নিখুঁত ভাবে কাটিয়া গর্ত্ত তৈরী করাও ত' কম ক্ষমতার দরকার নয়। খানিক খোঁজ করিয়া বুঝা গেল—কাণ্ডটি জলের। কল দিয়া টিপ্ টিপ্ করিয়া জল পড়িতেছে, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর,—আর সেই ফোঁটা ফোঁটা জলই শেষে এমন কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে।

সামান্য কয়েক ফোঁটা জল, যার চাইতে ক্ষীণ, দুর্ব্বল জিনিষের কথা আমরা ভাবিতেও পারিনা, তাই একত্র হইলে কি অদ্ভুত শক্তি ধরিতে পারে দেখ দেখি। কিন্তু এ ত' ছোট একটা গর্ত্ত—অতি তুচ্ছ ব্যাপার, এই ফোঁটা ফোঁটা জল তেমন ভাবে একত্র হইলে যে পৃথিবীর যে কোন কাজ করিয়া দিতে পারে তা' বোধ হয় অনেকেই জান না।

নদীর ধারে যখন আমরা বসিয়া থাকি—নদী কুল কুল করিয়া বহিয়া যায়, আমরা চাহিয়া দেখি। আমরা জানি নদী সাগরের দিকে চলিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে যে সে কত ভয়ানক ভয়ানক কাণ্ড করিয়া যাইতেছে তা' আমাদের মনেই আসেনা। কত পাহাড় পর্ব্বত বহিয়া নদী ছুটিয়াছে, তার ফোঁটা ফোঁটা জল একত্র হইয়া সেই সব পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গুঁড়া করিয়া দিয়া চলিয়াছে; কখনও বা হাজার হাজার মণ ভারী পাথরকে টানিয়া শত শত মাইল দূরে লইয়া ফেলিতেছে; কোথাও বা পাহাড়ের গায়ে চুঁ মারিয়া মারিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গহ্বর তৈরী করিতেছে। এ সব ত' নিত্যকার ব্যাপার।

আগে মানুষের চোখটা এদিকে বড় একটা পড়ে নাই। জলের সমস্ত শক্তিই প্রায় তখন পাহাড়, আর বেচারা মাটীর উপর বীরত্ব দেখাইয়া গায়ের



ঝাল মিটাইত। হঠাৎ একদিন মানুষের নজর পড়িল—"তাই ত', এত বড় একটা শক্তি এমনি ভাবে মাঠে মারা যাইতেছে, আর আমরা বেচারীরা দুর্ব্বল শরীরে গাধার খাটুনী খাটিয়া আর টাকার শ্রাদ্ধ করিয়াও কাজ সারিয়া উঠিতে পারিতেছিনা। ও সব চলিবেনা,—জলকে ধরিয়া নিজেদের কাজ করাইয়া লইতে হইবে।"

আজকালকার যুগে বিদ্যুতের মত শক্তি আর কোন কিছুর মধ্যেই নাই। আলো বল, পাখা বল, কল কারখানা বল, যেখানেই জোরের কাজ সেখানেই বিদ্যুতের দরকার। কিন্তু বিদ্যুৎ ত' আর অমনি আসেনা, সেটাকে তৈরী করিতে

নায়গ্রা জল-প্রপাত

বেশ কিছু শক্তির দরকার; আর সেটা জোগাড় করিতে খরচটাও নেহাৎ কম পড়ে না। পণ্ডিতেরা ভাবিলেন জলের শক্তিটাকে বিদ্যুৎ তৈরী করার কাজে লাগাইলে কেমন হয়? পণ্ডিতদের গায়ের জোর থাকুক না থাকুক মগজের জোর যথেষ্ট আছে। কাজেই যেমন মাথায় ফন্দী আসিল অমনি নানা রকম কলকব্জা তৈরী করিয়া যেখানে ঝরণা, জলপ্রপাত কিংবা তেমন স্রোতওয়ালা নদী দেখিলেন, তারই ধারে গিয়া বসাইয়া দিলেন।

তোমরা নায়গ্রা জলপ্রপাতের নাম নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। পৃথিবীর মধ্যে

সেটাই হইল সব চেয়ে বড় জলপ্রপাত। সে এক বিষম ব্যাপার। কোটী কোটী মন জল ভীম বেগে ছুটিয়া আসিয়া হঠাৎ প্রায় শ দেড়েক ফুট নীচে লাফাইয়া পড়িতেছে—এমনি হাজার হাজার বছর ধরিয়া চলিয়াছে। জলের শব্দটা সেখানে কি রকম শুনিবে? নায়গ্রার আশে পাশে মাইল খানেকের মধ্যে দাঁড়াইয়া তুমি যদি আমার সাথে কথা বলিতে চাও তবেই মুস্কিল। তুমি চীৎকার করিয়া বলিলেও তোমার পাশে দাঁড়াইয়া আমি একটি কথাও শুনিতে পাইব না। জলের আওয়াজের চাপে পড়িয়া সে স্বর কোথায় উড়িয়া যাইবে! তার পর স্রোতের বেগটা সেখানে কি রকম তাও শুনিয়া লও। জল, পাহাড়ের কিনারায় আসিয়া হঠাৎ নীচে লাফাইয়া পড়িল, কিন্তু সে জল এত জোরে আসিতেছে যে পড়িবার সময় সেটা পাহাড়ের গা' বাহিয়া পড়িল না, একেবারে ষাট ফুট দূর দিয়া ছিটকাইয়া পড়িল। কাজেই বুঝিতেছ ব্যাপারখানা কি রকম।

বলা বাহুল্য পণ্ডিতদের নজর অনেকদিন হইল নায়গ্রার উপর পড়িয়াছে। এত বড় একটা শক্তিকে তাঁরা এমনি ভাবে নষ্ট করিতে দিতে একেবারে নারাজ। বছর পঞ্চাশেক হইল তাঁহারা কাজে নামিয়াছেন। জলপ্রপাতের ঠিক উপরে তাঁহারা সরঞ্জাম বসাইয়াছেন; এমনি ভাবে বসান হইয়াছে যাহাতে নায়গ্রার প্রাকৃতিক দৃশ্যের একটুও হানি না হয়। জলপ্রপাতের উপর হইতে প্রায় ১৮০ ফুট লম্বা নল—ভিতরটা তার ৪০ ফুট চওড়া—সেই নল দিয়া ভীম বেগে জল আসিয়া সেই ১৮০ ফুট নীচে লাফাইয়া পড়িতেছে। সেখানে সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড, প্রায় ৩।৪তালা বাড়ীর মত বড় ইস্পাতের চাকা রহিয়াছে আর এই বিরাট জলরাশি সেই চাকার উপর আছড়াইয়া পড়িয়া সেগুলিকে অনবরত ঘুরাইতেছে। চাকা ঘুরিবার সঙ্গে বিদ্যুৎ তৈরী হইয়া উপরে উঠিতেছে, তার পর সেই বিদ্যুৎ তারের ভিতর দিয়া চারিদিকে ছুটিতেছে।

বিদ্যুতের পরিমাণটাও নেহাৎ কম নয়। দশ লক্ষ ঘোড়াকে একসঙ্গে খাটাইলেও অতটা বিদ্যুৎ পাওয়া যাইত না। আশে পাশে তিন শ' মাইলের ভিতর যত সহর আছে তাদের সব কল কারখানা, ট্রাম, মোটর, ইঞ্জিন, আলো,



পাখা সবই এই বিদ্যুতের সাহায্যে চলিয়াছে। অন্য কোন রকম শক্তি সেখানে খাটাইবার দরকার হয় না—কেননা এই বিদ্যুৎ সেখানে এত সুবিধায় ও সস্তায় পাওয়া যায় যে আর কিছুর পক্ষে ইহার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সহজ নয়। নায়গ্রার

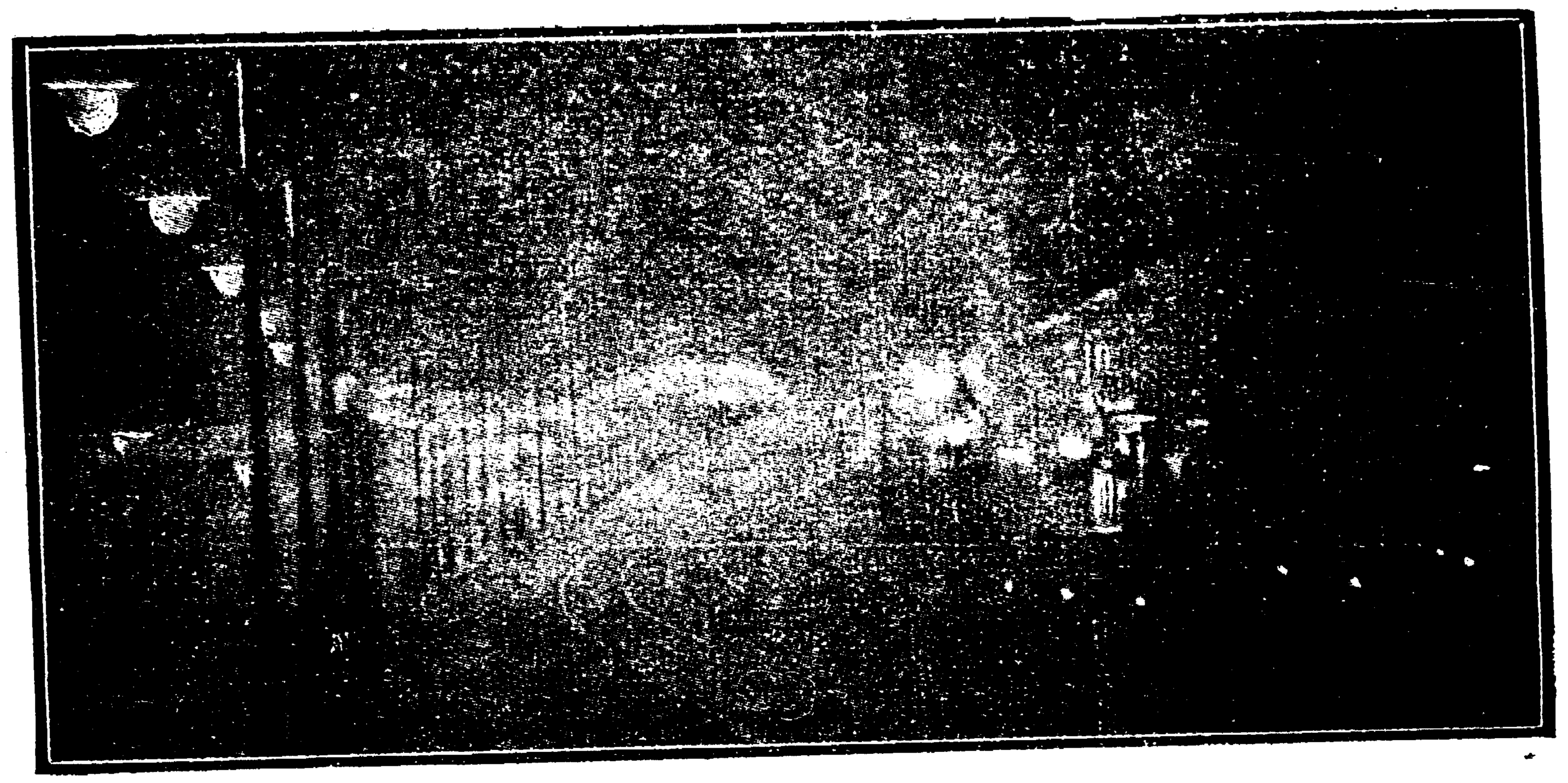

জলের একটি কাণ্ড—রাতকে দিন করিবার চেষ্টা

কাছে বাফেলো বলিয়া একটা সহর আছে। সেখানে অনেক কারখানা,—আর কয়লা এত সস্তা যে টাকায় ৫।৬ মণ কয়লাও পাওয়া যায়। কিন্তু তবু সেখানকার লোকেরা বিদ্যুৎ ছাড়িয়া কেহ কয়লা কিনিতে চায় না।

এত অসম্ভব কাণ্ডটাকে কে সম্ভব করিয়াছে মনে আছে ত?—সামান্য জল।

—:*:—

## অদল-বদল

(পৌরাণিক)

চ্যবন মুনি জানিতে পারিলেন যে তাঁহার বংশে কুশিক রাজার বংশ হইতে ক্ষত্রিয় ভাব আসিবে। জানিতে পারিয়া তাহার দোষ গুণ আন্দাজ করিয়া চঞ্চল হইয়া পড়িলেন—য়্যাঁ, এটা ত' থামাইতেই হইবে। তাঁহার ইচ্ছা হইল

কুশিকের বংশটা পোড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলেন। তিনি চলিলেন একেবারে কুশিক রাজার কাছে। মনের ভাবটা গোপন করিয়া রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ, আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে তোমার সঙ্গে থাকি, তুমি কি বল ?"

রাজা বলিলেন, "ঠাকুর, স্বামী আর স্ত্রী-ই বরাবর এক সঙ্গে থাকে, আর কারও ত' সে রকম থাকার নিয়ম নেই। যা হোক, যখন আপনার ইচ্ছে হয়েছে আমার সঙ্গে একত্র থাকবেন, তখন আমি রাজী হ'লাম।" রাজা এই বলিয়া চ্যবন ঋষিকে আসন দিলেন, পা ধুইয়া দিলেন; রাণীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নানা রকম সেবা করিলেন। তার পর বলিলেন, "ঠাকুর, আমরা আপনার অধীন, যা আজ্ঞা হয় করুন। এই রাজ্য, ধন, গরু—যা ইচ্ছে হয় বলুন, আপনাকে দিচ্ছি; বাড়ীঘর, রাজ্য, রাজসিংহাসন সবই আপনার দখলে; আপনিই না হয় রাজা হয়ে পৃথিবীটা শাসন করুন।"

চ্যবন ঋষি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"মহারাজ, ওসব আমি চাই না। আমার যা ইচ্ছে, বল্‌ছি শোন। আমার একটা নিয়ম পালন কর্‌তে হবে। ঐ সময় তুমি আর রাণী আমার সেবা কর্‌বে।" রাজা ও রাণী বলিলেন—"আপনার হুকুম অবশ্যই পালন কর্‌ব।" রাজা এই কথা বলিয়া মুনিকে এক ভাল ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া সেখানকার জিনিষপত্র দেখাইলেন আর বলিলেন—"ঠাকুর, আপনার জন্য এই বিছানা প্রস্তুত; আপনি ইচ্ছেমত বসুন, আমরা দু'জনা যতদূর সাধ্য আপনাকে খুসী রাখবার চেষ্টা কর্‌ব।"

তাঁহারা কথাবার্ত্তা কহিতেছেন এমন সময় সন্ধ্যা হইল। তখন মুনি রাজাকে খাওয়া দাওয়ার জিনিষ আনিতে বলিলেন। রাজা প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কিরকম খাওয়া দাওয়ার জিনিষ চান ? যে রকম আপনার হুকুম সেই রকমই আন্‌ছি।" চ্যবন মুনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"এখন ঘরে যেমন তৈরী আছে তাই আন।" খাওয়া দাওয়ার জিনিষ আসিলে মুনি ইচ্ছামত খাইলেন; তার পর বলিলেন, "আমার ঘুমোবার সময় হয়েছে, আমি এখন শোব।" রাজা তখন রাণীর সঙ্গে মুনিকে শয়ন-ঘরে লইয়া গেলেন। মুনি বেশ তোফা



বিছানায় শুইয়া পড়িয়া রাজাকে বলিলেন, "দেখ, আমি ঘুমিয়ে পড়্‌লে তোমরা কখন জাগাবে না, আর নিজেরা সর্ব্বদা জেগে থেকে আমার পা টিপ্‌বে।" রাজা বলিলেন "যে আজ্ঞে।"

রাত্রি পোহাইল, কিন্তু মুনি আর জাগেন না। রাজা ও রাণী তাঁহাকে জাগাইলেন না। তাঁহারা আহার নিদ্রা ছাড়িয়া দিয়া কেবল মুনির সেবায় লাগিয়া রহিলেন।

এক দিন, দুই দিন করিয়া একুশ দিন চলিয়া গেল। তখন চ্যবন ঠাকুর নিজেই বিছানা হইতে উঠিলেন এবং রাজা ও রাণীকে কিছু না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। রাজা ও রাণী—একে ক্ষুধা তাহার উপর আবার সেবা করিতে করিতে পরিশ্রম—বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই অবস্থায়ই তাঁহারা মুনির পেছনে পেছনে চলিলেন। মুনি তাঁহাদের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না—খানিক দূরে গিয়া তাঁহাদের সাম্‌নেই অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। রাজার বড় দুঃখ হইল, তিনি মাটিতে বসিয়া পড়িলেন আর রাণী তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। তার পরে রাজা-রাণী মুনিকে কত জায়গায় খুঁজিয়া বেড়াইলেন কিন্তু কোথাও তাঁহার দেখা নাই। দু'জনার লজ্জাও হইল খুব, পরিশ্রমও হইল খুব—তাঁহারা অজ্ঞানের মত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। তার পর ঋষির কথা ভাবিতে ভাবিতে শুইবার ঘরে গেলেন—গিয়াই দেখেন,—একি ? মুনি যে এখানে—তিনি সেই বিছানার আর এক পাশে শুইয়া আগেকার মত দিব্যি ঘুমাইতেছেন। রাজারাণী ত' অবাক্। তাঁহারা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে আবার না খাইয়া না দাইয়া মুনির পা টিপিতে লাগিলেন।

আবার ২১ দিন কাবার করিয়া মুনি ঘুম হইতে উঠিলেন। উঠিয়াই বলিলেন, "আমার ইচ্ছে হচ্ছে স্নান কর্‌তে, আমার গায়ে তেল মাখিয়ে দাও"। তখন রাজা আর রাণী খুব দামী তেল আনিয়া মুনির সমস্ত গায়ে বেশ করিয়া মাখিয়া দিলেন। মুনি দেখিলেন, রাজারাণী এত করিয়াও বিরক্ত হন নাই। তখন তিনি উঠিয়া গেলেন স্নানের জায়গায়। রাজার স্নানের জায়গা ত'!, কত

ভাল ভাল জিনিষ ছিল সেখানে। মুনি কিন্তু সে সব ছুঁইলেনও না, তিনি সেখান হইতে আবার হইলেন অদৃশ্য। খানিক পরে রাজারাণী দেখেন—মুনির স্নান হইয়া গিয়াছে আর তিনি বসিয়া আছেন সিংহাসনের উপর। রাজা বলিলেন, "ঠাকুর, আপনার হুকুম হইলে রাঁধা জিনিব আনি"। মুনি বলিলেন—"আন যা কিছু খাবার জিনিষ তোমার ঘরে আছে"। রাজা আর রাণী তখন খাবার আনিয়া হাজির করিলেন—রাঁধা ভাত, নানারকম মাংস, শাক, ডাল পিঠে, সুন্দর মোয়া, নানারকমের ফল, আরও কত কি। তখন মুনি ঠাকুর করিলেন কি—বিছানা, আসন, আর অন্যান্য দামী দামী জিনিষ সব আনিয়া ঐ খাবার জিনিষের সঙ্গে একত্র করিলেন, করিয়াই সবটাতে দিলেন আগুন ধরাইয়া। রাজারাণী দেখিলেন কিন্তু রাগিলেন না। মুনি ত তখনই চম্পট। পরদিন সকালবেলা মুনি আসিয়া আবার হুকুম করিলেন—"স্নানের জিনিষ, খাবার, বিছানা, কাপড় সব আন।"

এই রকমে ৪৯ দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু চ্যবন মুনি রাজার কোন ছিদ্র পাইলেন না।

৫০ দিনের দিন মুনি রাজার কাছে আসিয়া বলিলেন—"মহারাজ, তুমি শীঘ্র আমাকে রথে চড়াও আর তুমি আর রাণী মিলে সেই রথ টান। আমার যেখানে যেতে ইচ্ছে হয়, সেখানে নিয়ে যেতে হবে"। রাজা বলিলেন—"আমার বেড়াবার রথ আছে, যুদ্ধের রথও আছে, কোন্ রথ আন্‌ব"? মুনি বলিলেন—'আরে, তুমি সেই সাজানগোজান অস্ত্রশস্ত্রওয়ালা যুদ্ধের রথ আন।' রাজা সেই রথই আনিলেন। ঘোড়ার বদলে বাঁ দিকে টানিতে লাগিলেন রাণী আর ডান্ দিকে রাজা নিজে। মুনি হীরার চাবুক হাতে করিয়া রথে চড়িয়া বসিলেন। রাজা মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথা যে'তে হ'বে?" মুনি বলিলেন—"সব লোকের সাম্‌নে আস্তে আস্তে আমার রথ চালাও; যেন আমার পরিশ্রম না হয়; আর রাস্তার মধ্যে কোন পথিক কি ব্রাহ্মণ কিছু চাইলে, তাদের আমি খুব করে দিতে চাই; তুমি তারও বন্দোবস্ত কর।" রাজা তখন



চাকরদের হুকুম দিলেন সব জিনিষপত্র সঙ্গে নিতে। চাকরেরাও মুনির হুকুম মত দানের জন্য সব দামী দামী জিনিষ লইয়া চলিল। মন্ত্রীরাও পেছনে পেছনে চলিলেন। মুনির হাতে যে ধারাল চাবুক ছিল তিনি হঠাৎ সেই চাবুক দিয়া রাজা-রাণীকে সপাসপ্ মারিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পিঠ কাটিয়া গেল, গাল কাটিয়া গেল, শরীর রক্তময় হইয়া গেল—তাঁহারা রথই টানিতেছেন। লোকের অবশ্য খুব দুঃখ হইতে লাগিল, কিন্তু ভয়ে তাহারা কিছু বলিতে পারিল না, পাছে মুনি শাপ দেন।

চাবুক দিয়া সপাসপ্ মারিতে লাগিলেন

মুনি, কুবেরের মত, যাহাকে যাহা ইচ্ছা দান করিতে লাগিলেন—কিন্তু রাজা-রাণীর তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই, তাঁহারা না খাইয়া না দাইয়া রথই টানিতেছেন।

এইবার মুনি খুব খুসী হইয়া রথ হইতে নামিলেন। রাজা-রাণীকে রথ হইতে ছাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদের কাজ দেখে খুব খুসী হয়েছি। তোমরা যে বর চাও তাই দেব।" মুনি এই কথা বলিয়া রাজা-রাণীর গায়ে অমৃতের মত হাত বুলাইয়া দিলেন—তখন কোথায় গেল সেই চাবুকের ঘা, আর

কোথায় গেল সে ক্লান্তি! মুনি বলিলেন, "এই গঙ্গার তীর খুব সুন্দর ও পবিত্র, আমি কিছুদিন এখানে থাক্‌ব; তোমরা বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম কর; কাল এখানে এলেই দেখা হবে; তোমাদের এখন ভাল সময় পড়েছে, তোমাদের মনে যা ইচ্ছা আছে সব ফল্‌বে।"

রাজা মুনিকে আপ্যায়িত করিয়া প্রণাম করিলেন। তার পর বাড়ী গিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া শুইলেন। শরীর এমন হইল যে তাঁহার মনে হইল যেন নূতন যৌবন আবার আসিয়াছে। এদিকে চ্যবন মুনি—শুধু তপস্যার জোরে—সেই গঙ্গাতীরটাকে সাজাইয়া গোজাইয়া ইন্দ্রের পুরীর মত করিয়া ফেলিলেন।

সকালবেলা রাজা রাণীকে সঙ্গে লইয়া সেই গঙ্গাতীরে বনের দিকে চলিলেন।

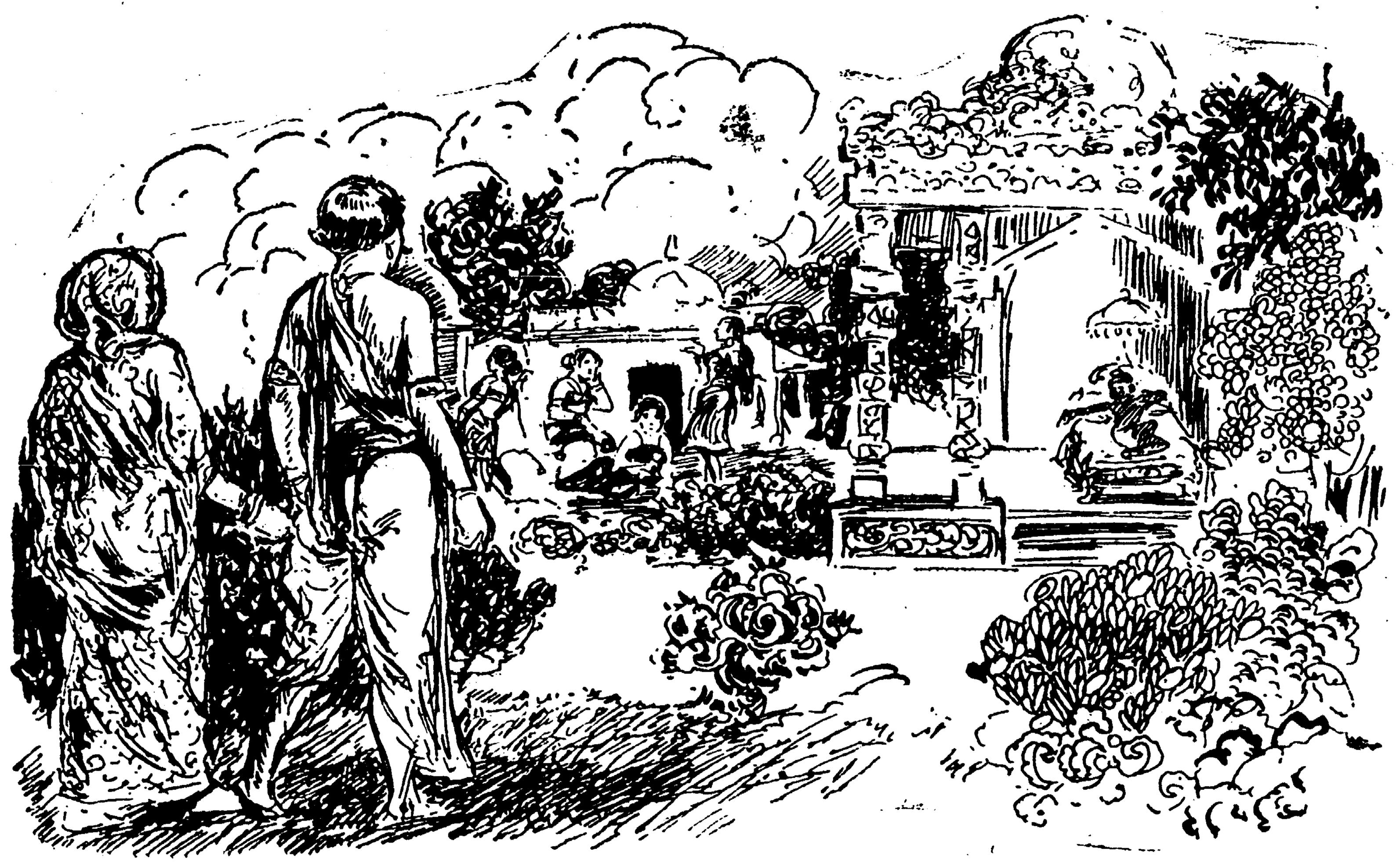

কোথায় বন! দেখেন আশ্চর্য্য ব্যাপার—

কোথায় বন! দেখেন আশ্চর্য্য ব্যাপার,—কত সোণা রূপা, কত রূপার চূড়াওয়ালা পর্ব্বত, কত পদ্ম-ফোটা সরোবর, কত সুন্দর সুন্দর ঘর, বাড়ী, গাছপালা, জীবজন্তু, বিছানাপত্র, খাবার জিনিষ—আরও কত কি! রাজা ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না;—আবার এই সব ব্যাপার কখন দেখা যায়, কখন অদৃশ্য হইয়া



যায়। রাজা ভাবিতেছেন আর চারিদিকে তাকাইতেছেন এমন সময় দেখিলেন, চ্যবন মুনি এক সোণার ঘরে খুব দামী বিছানায় শোয়া, ঘরের থামগুলি মণির। রাজা-রাণী যেই কাছে গিয়াছেন অমনি কোথায় গেলেন সে মুনি আর কোথায় গেল তাঁহার বিছানা—কিছুই দেখা গেল না। তার পর রাজা দেখেন—মুনি অন্য এক বনের মধ্যে—কুশাসনে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, আর গাছলতা যা কিছু সেখানে দেখা যাইতেছিল কোথায় সব চলিয়া গেল—থাকিল কেবল সেই গঙ্গার তীর, কুশের গাছ আর উইয়ের ঢিপি।

এ সমস্ত অবশ্য হইয়াছিল চ্যবন মুনির যোগের ফলে। রাজা রাণীকে চ্যবন মুনির তপস্যার তেজ সম্বন্ধে অনেক কথা বুঝাইলেন। মুনি যোগবলে সে সবই টের পাইলেন। শেষে চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, "মহারাজ, তুমি শীগ্‌গির আমার কাছে এস।" মহারাজ রাণীর সঙ্গে তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়া মুনির পায়ে প্রণাম করিলেন। মুনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বসাইলেন, শেষে বলিলেন—"মহারাজ, তুমি ইন্দ্রিয়গুলিকে আর মনকে বশে এনেছ, তাই তোমার কোন অনিষ্ট হয় নাই; তুমি আমার খুব সেবা করেছ। এখন আমি চলে যেতে চাই, তুমি মত দাও আর বর চাও, তোমাকে আমি বর দেব।" রাজা বলিলেন, "আমি যে আগুনের মধ্যে প'ড়েও পুড়ি নাই, তাই ত' যথেষ্ট, আর আপনি যে আমার সেবায় খুসী হয়েছেন, আপনার রাগে যে আমার বংশ নষ্ট হয় নি, এই আমার খুব; বরং যদি আপনি আমার উপর খুসী থাকেন, তবে একটা বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, সেই সন্দেহ দূর করুন।"

মুনি বলিলেন, "তোমার যা কিছু সন্দেহ থাকে খুলে বল, আমি দূর ক'রে দেব আর তোমাকে বরও দেব।" তখন তাঁহার বাড়ীতে মুনি যে কাণ্ডটা করিয়াছিলেন তাহার কথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ সকল করার কারণ কি?

মুনি বলিলেন, "মহারাজ, তুমি যখন জিজ্ঞাসা করলে তখন বলাই উচিত; একদিন দেবতাদের সভায় ব্রহ্মার কাছে শুন্‌লাম যে তোমার বংশ থেকে

আমার বংশে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আসবে আর তোমার পৌত্র ব্রাহ্মণ হবে; এই কথা শুনে তোমার বংশ নষ্ট করার জন্য তোমার বাড়ী গিয়েছিলাম, তোমাকে রাগাবার জন্য অনেক কাণ্ড করেছি কিন্তু তুমি রাগ নি, তোমার কোন দোষ পাইনি, তাই তুমি বেঁচে আছ, আমি শাপ দিতে পারিনি। শেষে তোমার উপর খুসী হয়ে এই বনের মধ্যে তোমাকে সশরীরে স্বর্গ দেখিয়েছি। স্বর্গ দেখেও তুমি ভোলনি—তোমার ইচ্ছা হয়েছে ব্রাহ্মণত্ব পাওয়ার। তুমি নিজে তা পাবে না, কিন্তু তোমার পৌত্র পাবে। এখন বর চাও, তোমাকে বর দিয়েই আমি তীর্থে যাব।"

রাজা বলিলেন—"ঠাকুর, এই বর দিন যে আমার বংশে সব যেন ব্রাহ্মণ হয়ে যায়। এখন আমাকে বলুন কেমন ক'রে সেটা হবে।"

চ্যবন বলিলেন—"তোমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব যাবে বলেই ত' বংশটা একেবারে নির্ম্মূল করতে চেয়েছিলাম। কেমন করে যাবে সেটা শোন। এটা ত' সকলেই বেশ জানে যে ক্ষত্রিয়েরা ভৃগুবংশের যজমান। এখন, কোন কারণে একটা ঝগড়া বেধে গেলে ক্ষত্রিয়েরা চেষ্টা করবে ভৃগুবংশের লোকগুলিকে মেরে ফেলতে—পেটের ছেলেদের পর্য্যন্ত। ভৃগুবংশের এক গর্ভবতী স্ত্রী গিয়ে এক পর্ব্বতের উপর লুকিয়ে থাকবে। আর, তার পেটে হবে সূর্য্য ও আগুনের মত তেজস্বী ঊর্ব্ব। ঊর্ব্বের পুত্র ঋচীক ধনুর্ব্বিদ্যা সবটা শিখে ফেলবে আর সে বিয়ে করবে তোমার ছেলে গাধির মেয়েকে। গাধির কোন পুত্র না হওয়ায় সে ভারী দুঃখিত হয়ে থাকবে। তার পর ঋচীক নিজের স্ত্রী ও শাশুড়ীর ছেলে হবার জন্য দু'রকমের চরু তৈরী করবে, এক রকম ব্রাহ্মণের উপযুক্ত, আর এক রকম ক্ষত্রিয়ের। কিন্তু তোমার পুত্রবধূ ভাল ছেলে হবার লোভে নিজের মেয়েকে ব'লে ক'য়ে সেই ব্রাহ্মণের উপযুক্ত চরুটা খেয়ে ফেলবে। ঋচীক এই কথা জানতে পেরে কার কি রকমের ছেলে হবে তা' তাদেরকে বুঝিয়ে দেবে। তখন ঋচীকের স্ত্রীর ভয় হবে, সে চাইবে যেন ক্ষত্রিয়ত্ব তার ছেলের না হয়ে ছেলের ছেলের হয়। ঋচীক তাই স্বীকার করবে। ঋচীকের ছেলে হবে জমদগ্নি



—ঋচীক থেকে সমস্ত ধনুর্ব্বিদ্যা সেই পুত্রে চলে আসবে। জমদগ্নির পুত্র রাম সেই চরু খাওয়ার ফলে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পাবে আর পাবে ধনুর্ব্বিদ্যা। আর এদিকে তোমার পুত্রবধূর সেই চরু খাওয়ার ফলে বিশ্বামিত্র নামে এক ধার্ম্মিক পুত্র হবে। বিশ্বামিত্র ঘোর তপস্যা ক'রে ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে।"

মুনি আবার রাজাকে বর চাহিতে বলিলেন। রাজা বলিলেন, "আপনার অনুগ্রহে আমার বংশে সব যেন ব্রাহ্মণ হয়ে যায় আর তাদের যেন ধর্ম্মে মতি থাকে।" মুনি "তাই হবে" বলিয়া রাজার নিকট বিদায় লইয়া তীর্থে চলিয়া গেলেন।

---

# পদ্মরাগ

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ)

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

১৫

## মারাত্মক খবর

উদয়েন্দু একটু সুস্থ হইতেই সেই রাত্রিতেই বাড়ীর আর সব যুবকদের পরামর্শ-সভা বসিল। একটা বিষয়ে দেখা গেল সকলেই একমত—এ কাণ্ড যে করিয়াছে সে নিশ্চয় পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল। হয়ত বা সে আগাগোড়া সব ঘটনাই জানে—মোটর রেস হইতে আরম্ভ করিয়া ধা—জঙ্গলের ডাকাতি পর্য্যন্ত কিছুই হয়তো তার অজানা নাই। লুকারগঞ্জের বাড়ীতে আসিয়া তেতালায় উদয়েন্দুর ঘরে যখন টিনের কৌটাটী খোলা হয় তখন মানুষের পক্ষে যতটা সতর্কতা নেওয়া সম্ভব তার একটুও বাদ পড়ে নাই। এ বিষয়ে যুবকেরা আগাগোড়াই খুব সাবধান ছিল। বরাবর তারা দৃষ্টি রাখিয়াছে পাড়ার আশে পাশের কোন বাড়ী হইতে কেউ তাদের কাজ লক্ষ্য করিতেছে কিনা, এবং লক্ষ্য যে কেউ করে নাই একথাও তারা হলফ্ করিয়া বলিতে রাজী আছে। ষ্টেসন

হইতে ফিরিতেই উদয়েন্দুর প্রায় সাড়ে বারোটা বাজিয়া গিয়াছিল এবং তার দু' তিন ঘণ্টার মধ্যেই কাণ্ডটা ঘটিয়া গিয়াছে। এই অত্যল্প সময়টুকুর মধ্যে কোন নূতন লোক যে ব্যাপারটী টের পাইয়া পদ্মরাগ খানা নির্ব্বিবাদে সরাইয়া ফেলিয়াছে, এ মোটেই বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়, এবং বলিলেও কেহ বিশ্বাস করিবে না।

ক্ষীণ কণ্ঠে বিমলকে উদ্দেশ করিয়া উদয়েন্দু কহিল, "খাটুয়া ষ্টেসনে ফির্‌তে পথে যখন তোমাদের নাম ধরে পেছু থেকে কে ডাক্‌ছে শুন্‌লাম তখনই যেন আমার মনটা কেমন করে উঠ্‌লো। তোমরা সবাই বল্লে আমারই ভুল হয়েছে, আমি ভাব্‌লাম তা হবেও বা! নইলে আমার কিন্তু আরও ভাল করে সন্ধানটা নেবার ইচ্ছে ছিল। এখন যেন আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌ছি তার সঙ্গে এ ব্যাপারের একটা সাক্ষাৎ যোগ রয়েছে।"

কথাটা সত্য হইবারই ষোল আনা সম্ভাবনা, কাজেই বিমল সহসা কোন জবাব দিতে পারিল না। কিন্তু মৃগাঙ্ক আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "তবুও তো একটা কেমন খট্‌কা রইলো উদয় দা, যে পদ্মরাগ চুরি করবে বলে মনে মনে মৎলব ফেঁদে বসে আছে, সে কেন আবার চীৎকার করে আমাদের পেছু ডাক্‌তে যাবে? নিজেকে বেশ ভাল করে গোপন করে চলাটাই না তার সব চেয়ে স্বাভাবিক?"

উদয়েন্দু হাসিল, কহিল, "তুমি যে 'সে' মনে করে বসে আছ এটাই ত একটা মস্ত ভুল হতে পারে—'সে' কি 'তারা' তা' তুমি জান্‌ছ কোত্থেকে? যে লোক পেছন থেকে নাম ধরে ডেকেছে তার সঙ্গে যে আরও দশ বারো জন লোক ছিল না তা' তোমায় কে বল্লে? এমনও তো হতে পারে যে দলে পুরু বলেই তারা আমাদেরকে ডাক্‌ছিল, কাছে গেলে গায়ের জোরে পদ্মরাগ কেড়ে নেবে বলে। আমার তো এখনও বদ্ধ ধারণা জন্মেছে যে যারা পেছন থেকে ডাক্‌ছিল তারা আমাদেরই চেনা লোক এবং বাঙ্গালী। নইলে ওখানে তারা আমাদের নাম জোগাড় করবে কোত্থেকে?"

"কিন্তু তাই বা কি ক'রে বলা যায়? ব্যাপারটা ঘট্‌ল ধা—জঙ্গলের



কাছে, যার ত্রিসীমানার মধ্যে মানুষের নাম গন্ধ নেই। তার ওপর আবার মোটর দু'খানা বোম্বাই মেলের চাইতেও জোরে এতটা পথ ছুটে এসেছে। এখানে হঠাৎ দশ বারটী চেনা বাঙ্গালী এনে হাজির করা যে বড়ই কষ্ট-কল্পনা, উদয় দা!"

"হুঁ, ওই শুধু একটী মাত্র কথা যার আমি ভেবে ভেবে কোনই কূল কিনারা পাচ্ছিনা—যাক্ সে ভাব্‌বার অবকাশ ঢের হবে, আপাততঃ যার যার নিজেদের ভাব্‌না ভাব্‌তে হচ্ছে। এ কথা হয়ত তোমরা সবাই স্বীকার করবে যে এর পর আর লুকারগঞ্জের এ বাড়ীতে থাকা চলেনা—যে কোন দিন তা' হলে বিপদে পড়্‌তে হবে। আজকে রাতারাতি পাত্‌তাড়ি গুটোতে পারলেই হোতো ভাল, কিন্তু তা' আর হয় না, পাড়ার লোকে তা' হলে নানা রকম সন্দেহ কর্‌বে। কিন্তু কাল্‌কে আর এখানে থাকা চল্‌বে না। দুটো দল হয়ে যেতে হবে আমাদেরকে। একদল কাশীতে ভেলুপুরা গিয়ে ওঠ, সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাক্‌বে, খবর পেলেই চলে আস্‌বে এখানে। আমি আর কয়েকজন পদ্মরাগের সন্ধান করবার জন্য এখানেই থাক্‌বো। অবশ্য এক বাড়ীতে থাকা আর চল্‌বে না—কেউ সিভিল্ লাইনে, কেউ আর কোথাও, এমনি সহরময় ছড়িয়ে পড়্‌তে হবে।"

কিন্তু মানুষে ভাবে এক, হয় আর এক। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল; পরদিন প্রাতেই এমন একটা কাণ্ড ঘটিল যাহাতে উদয়েন্দুর পূর্ব্বরাত্রির কল্পনা জল্পনা সমস্তই এক নিমিষে ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

এখানকার বাস উঠাইয়া দেওয়া সংক্রান্তই কি একটা জরুরী কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য প্রাতে বিমল বাহির হইয়াছিল। একটু অগ্রসর হইয়া দূর হইতে লক্ষ্য করিল, সমসেরপুর হইতে রণজিতের তাড়া খাইয়া যে লোকটী বোম্বাই মেলের গতিকেও হেলায় পরাজিত করিয়া ভীমবেগে ধা—জঙ্গল পর্য্যন্ত মোটর চালাইয়া আসিয়াছিল, সেই জগদীশ আসিতেছে। মনে তাহার দারুণ বিস্ময় জন্মিল। কাল উদয়েন্দু স্পষ্ট করিয়া তাহাকে মোটর হাঁকাইয়া বেনারস চলিয়া যাইতে আদেশ করিল, অথচ রাত ভোর হইতে না হইতেই এ' আসিয়া

এলাহাবাদে জুটিল কিসের জন্য ? কিন্তু আরও একটু অগ্রসর হইয়া জগদীশের মুখের পানে তাকাইতে বিস্ময় তার চারগুণ বাড়িয়া গেল—জগদীশের চুল উস্কো খুস্কো, চোক দুইটী লাল টক্‌টক্, যেন মনের মধ্যে কত বড়ই না একটা উৎকণ্ঠা সে বহিয়া বেড়াইতেছে ! বিমল একেবারে সোজা সম্মুখে গিয়া প্রশ্ন করিল, "এ কি জগদীশ, এসময়ে তুমি এখানে কোত্থেকে ?"

জগদীশ আপনার মনে পথ চলিতেছিল, রাস্তার কাহারো দিকে নজর করে নাই ; হঠাৎ এই প্রশ্নে সে চমকাইয়া উঠিল।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই চিনিতে পারিয়া কহিল, "বিমল ওঃ, কাল তোমাদের ডেকে ডেকে হয়রাণ হয়ে গেলাম, কিন্তু একটী সাড়াও পেলাম না।"

বিমলের বুকের ভিতর দিয়া যেন বিদ্যুৎ বহিয়া গেল, কহিল, "আমাদের ডাকছিলে ? কখন্ বলতো, কখন্ ?"

"তোমরা খাটুয়া ষ্টেসনের দিকে রওনা হয়ে গেলে পরে। কেন, তোমরা কি কিছুই শুনতে পাও নি ?"

"পেয়েওছিলাম, আবার পাইও নি। অর্থাৎ উদয় দা ঠিকই শুনেছিলেন, কিন্তু আমরা তিনজনে শুনিনি বলে শেষটায় তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে ও তার নিজেরই ভুল। তা সত্বেও আমরা পেছু হঠে গিয়ে অনেকক্ষণ তোমাদের খুজেছি, কিন্তু সন্ধান করে উঠতে পারিনি ; কোন বাঁধা রাস্তায় না গিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে 'শর্ট্ কাট' করেছিলাম কিনা আমরা।"

"ওঃ, তাই বল, নইলে প্রায় ঘণ্টা দুই তো আমরা তোমাদের খুঁজে বেড়িয়েছি। কোথাও শেষটায় না পেয়ে, আমি বল্লাম চল, মোটরে কাশী না গিয়ে এলাহাবাদে গিয়েই ওদের ধরা যাক, কিন্তু শশধর বল্লে, যাক্ এত তাড়াই বা কি ; আজ আমরা কাশীই যাই, কাল না হয় ট্রেণে করেই খবরটা দিয়ে যাওয়া যাবে। তাই আমরা আর এদিক পানে না এসে কাশীর দিকেই চলে গেলাম।"

বিমল অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি হে, খবর কি খুবই জরুরী ?"



"শুধু জরুরী ? মারাত্মক বল্লেই হয়।" বলিয়া জগদীশ রাস্তায় এদিক ওদিক্ চারিপাশে সন্ত্রস্তভাবে তাকাইয়া বিমলের কাণে কাণে গুটী দুই কথা কহিল।

"বল কিহে, এ যে সর্ব্বনেশে কথা" বলিয়া রাস্তার ধারে যে প্রকাণ্ড পাথরখানা ছিল, সর্পদষ্টের মত বিমল তাহার উপর বসিয়া পড়িল। মুখখানা তখন তার মড়ার মত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

মিনিট খানেক মাটীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বিমল আবার কথা কহিল ; বলিল, "কি ভুলই যে করেছ জগদীশ, তা আর বল্‌বার নয়। সামান্য এক মুহূর্ত্তের ভুলে সময় সময় মানুষের গোটা জীবনটাই নষ্ট হয়ে যায়, এ ক্ষেত্রেও তাই.

উপস্থিত সকলের মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গেল

হয়েছে। ওঃ, কাল যদি তোমরা কাশী না গিয়ে সটান মোটরে এলাহাবাদ এসে খবরটা আমাদের দিতে, তবে বোধ হয়—তবে বোধ হয় উদয় দা'র বুকে ছোরা বসিয়ে ওরা পদ্মরাগ নিয়ে পালাতে পারতো না।"

এবার অবাক্ হইবার পালা জগদীশের, হাঁ করিয়া সে বিমলের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু শীঘ্রই ব্যাপারটা তাহার বোধগম্য হইল, রুদ্ধশ্বাসে সে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন উপায় ?"

কী উপায় বিমল বলিয়া দিবে—নির্ভীক বিমলের স্বরভঙ্গ হইয়া আসিল, কহিল, "চলত এখন উদয়দা'র কাছে।"

উদয়েন্দু তাহার ঘরেই ছিল, আরও কয়েকজন সেখানে বসিয়া। জগদীশকে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কথা কিন্তু কহিল সর্ব্বপ্রথমে বিমল। কোন রকম ভূমিকা না করিয়াই বলিল, "তুমি ঠিকই শুনেছিলে উদয়দা, আমাদের নাম ধরে যে কাল ডাকছিল সে কথা খুবই ঠিক। তবে বিরুদ্ধ দলের লোক তারা কেউই নয়, সে হচ্ছে এই জগদীশরাই। কি সর্ব্বনেশে মারাত্মক খবর সে নিয়ে এসেছে শোন। এ খবরটা যদি ঠিক মত সময়ে পেতাম,—কারুর সাধ্য ছিল না পদ্মরাগ এখান থেকে সরিয়ে নেয়।" বলিয়া জগদীশ তাহার কাণে কাণে যে গোপনীয় কথাটী কহিয়াছিল, বিমল তাহাই প্রকাশ্যে জ্ঞাপন করিল। শুনিয়া এক মুহূর্ত্তেই উপস্থিত সকলের মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গেল।

( ক্রমশঃ )

---

# তিমির গল্প

( শ্রীহীরেন্দ্র চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় )

"আরে বাপু, এই মাত্র একটা হাজার বছরের বুড়ো জানোয়ার দেখে এলাম।" কথাটা শুনিলে গাঁজাখুরী বলিয়াই মনে হইবে, কিন্তু সত্যি সত্যিই কোন কোন তিমি মাছ নাকি হাজার বছরেরও বেশী বাঁচে; অর্থাৎ, পৃথ্বীরাজের সময়ে কিংবা তারও ২।৩ শ' বছর আগে যে তিমিটা দিব্যি আরামে সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইত এখনও ঠিক তেমনি আরামে সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভাবিয়া দেখ একবার কাণ্ডখানা! অবশ্য তাই বলিয়া সব তিমিই যে হাজার বছর বাঁচে তা নয়, তবে শ'পাঁচেক বছর নাকি অনেকেই বাঁচে। আহা রে, বেচারারা যে কথা বলিতে পারে না! যদি পারিত তবে কি আর ইতিহাস লিখিতে কোন বেচারীকেই কষ্ট পাইতে হইত?

'মাছ' বলিলাম বটে, কিন্তু তিমিগুলি সত্যি সত্যিই মাছ নয়। সেকালে নাকি তিমিরও ঠিক কুমীরের মত চারিটা পা ছিল, আর চামড়াও ছিল তেমনি শক্ত। কাহারও কাহারও নাকি আবার ভালুকের মত লোমও ছিল। এখন কিন্তু ওসব



বালাই নাই,—সকলেরই দিব্যি চমৎকার তেলতেলে গা। তিমিরা থাকে জলের তলায়, কিন্তু জলের ভিতরে নিঃশ্বাস লইতে পারে না, মাঝে মাঝে মাথা তুলিয়া জলের উপর উঠিতে হয়। আমাদের যেমন নিঃশ্বাস লইবার সময় বুকটা ওঠা নামা করে তিমিরও ঠিক তাই হয়। জলের মধ্যে যখন থাকে তখন তাদের শরীরটা বেশ হাল্কা বোধ হয়, কাজেই বুক ওরকম উঠাইতে নামাইতে বিশেষ কষ্ট হয় না; কিন্তু ঐ সব তিমি যখন ডাঙ্গায় উঠে তখন তাহাদের শরীরটা ভয়ানক ভারী বোধ হয়—আর সহজে নিঃশ্বাস লইতে না পারায় দম আটকাইয়া মারা যায়। এ রকম প্রায়ই হয়। এই ত' সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় এক কাণ্ড হইয়া গেল;—অনেকগুলি তিমি এক পাল মাছকে তাড়া করিয়াছিল কিন্তু ঢেউএর বেগ সামলাইতে না পারিয়া ডাঙ্গায় গিয়া পড়ে, তার পর দম আটকাইয়া মারা যায়। যাঁহারা ব্যাপারটা দেখিয়াছিলেন তাঁহারা বলেন মরিবার সময় তিমিগুলির কাতর চীৎকারে তাঁদের চোখেও জল আসিয়াছিল। কলিকাতার যাদুঘরে একটা তিমির চোয়ালের ২ খানা হাড় আছে, বোধ হয় তোমরা অনেকেই তা দেখিয়াছ। হাড় ২ খানা একটা প্রকাণ্ড গেটের মত বড়। এই তিমিটাও নাকি ঠিক এই ভাবে বছর পঞ্চাশেক আগে ব্রহ্মদেশে মারা পড়িয়াছিল।

একপাল তিমি ডাঙ্গায় আসিয়া দম আটকাইয়া মারা গিয়াছে

তিমি বাঁচেও যেমন চেহারাটাও এদের তেমনি। সেকালে একালে কোন কালেই তিমির চেয়ে বড় জানোয়ার দেখা যায় নাই। অনেক দিন আগে ইংলণ্ডে একটা তিমি মাছ ধরা পড়ে—সেটা লম্বায় ছিল ৮৮ হাত, আর ওজনে ছিল প্রায়

৬০০০ মণ। তার মুখের ভিতরটা এত বড় ছিল যে তার মধ্যে অনায়াসে ৩৫২ জন ছোট ছেলে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিত। মুখ এত বড় হইলে কি হয়, অনেক তিমিরই কিন্তু একটা ফুটবলের মত জিনিষকেও আস্ত গিলিবার সাধ্য নাই। কেন, জান? গলার ছিদ্রটা তাদের এত ছোট যে তুমি তোমার হাতটা মুঠা করিয়া তাদের মুখের ভিতর ঢুকাইয়া দিলেও গলার ছিদ্র দিয়া সে হাত ঢুকিবে না। তিমির জিভটা কিন্তু ভারী মজার। একবার লণ্ডনে একটা প্রকাণ্ড তিমি মাছ দেখান হইতেছে, তিমির মুখের ভিতরটা দেখাইবার জন্য বাঁশের ঠেকনা দিয়া মুখটা খুলিয়া রাখা হইয়াছে—এক সাহেব সেটা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য একেবারে মুখের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া জিভের উপর চড়িয়া বসিলেন। এখন মজা হইতেছে কি—তিমির জিভটা হইতেছে ভয়ানক নরম, কাজেই সাহেব যেই জিভের উপর চড়িয়াছেন অমনি বেশী কাদা থাকিলে পা যেমন কাদার মধ্যে বসিয়া যায় সাহেবের শরীরটাও তেমনি তিমির জিভের মধ্যে ঢুকিয়া যাইতে লাগিল। তোমরা এখন ব্যাপার শুনিয়া হাসিতেছ, সেই সাহেব কিন্তু চীৎকার সুরু করিয়া দিলেন। সকলে আসিয়া তখন দড়ি কাছি দিয়া তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিল, ততক্ষণে কিন্তু সাহেবের গলা পর্য্যন্ত তিমির জিভের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছিল।

তিমি মাছ দুই রকমের। এক দলের দাঁত আছে আর এক দলের নাই। দাঁতহীন তিমিই সচরাচর বেশী দেখা যায়। ইহারা খুব নিরীহ। দাঁতওয়ালা তিমিগুলির স্বভাব কিন্তু ঠিক ইহাদের উল্টা। তাহার উপর ইহাদের গলার ছিদ্রটাও বেশ বড়। টপাটপ্ ৩।৪ টা সীল মাছ গিলিতে ইহাদের একটুও কষ্ট হয় না।

ইহাদের প্রধান খাদ্য হইতেছে—কাটল ফিশ। কাটল ফিশকেও নেহাৎ সহজ জিনিষ বলিয়া মনে করিও না। ইহারা অক্টোপাসেরই মাসতুতো ভাই। অক্টোপাসের নাম নিশ্চয়ই শুনিয়াছ।—সেই আটটা শুঁড়ওয়ালা বিকট জানোয়ার—গভীর জলে থাকে, আর যে কোন ভয়ানক জানোয়ারের সঙ্গে নির্ব্বিচারে লড়িতে কসুর করে না। শুঁড়ের কাছে কাহাকেও পাইলেই পিষিয়া ধরে,



আর রক্ত শুষিয়া লয়। কাটল ফিশ্ও তেমনি; একবার কাউকে ধরিলে সাধ্য কি যে কুড়াল দিয়া এই মাছের শুঁড় গুলি না কাটিয়া সে রক্ষা পায়? এই মাছকে ধরিতে গিয়া তিমি বাবাজীকেও বেশ বেগ পাইতে হয়। একবার একখানা জাহাজ হইতে কয়েক জন সাহেব জলে নামিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক কাটল ফিশ্ আসিয়া তাঁহাদের একজনকে ধরিল। সঙ্গীরা কুড়াল দিয়া বহু কষ্টে শুঁড় কাটিয়া তাঁহাকে বাঁচাইল—শুঁড়টা নাকি ঠিক একটা থামের মত মোটা ছিল।

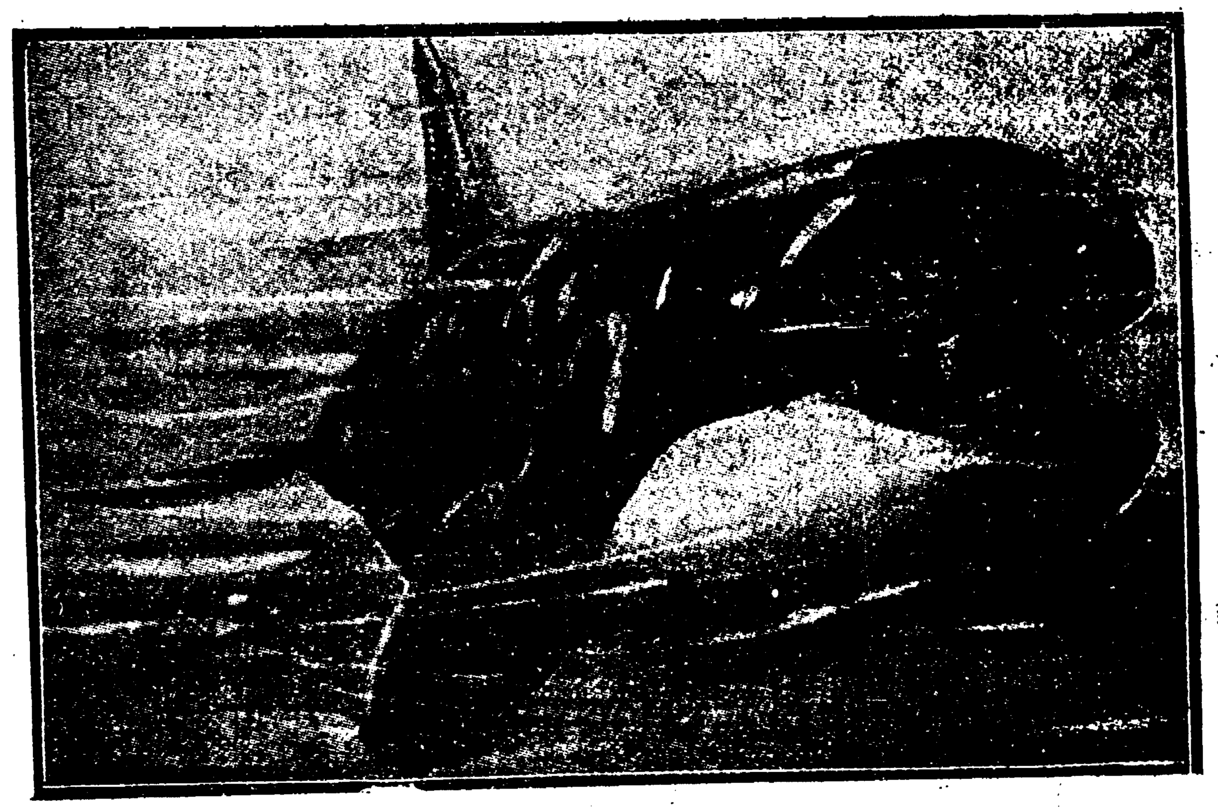

দাঁতওয়ালা তিমি (দেখিলে শুধু একটা মাথা বলিয়াই মনে হইবে, কিন্তু আসলে সমস্ত শরীরটাই এ রকম)

দাঁতওয়ালা তিমিরা দেখিতে দাঁতহীন তিমির চেয়ে অনেক ছোট; কিন্তু ছোট হইলে কি হয়? দাঁতওয়ালা তিমিরা দাঁতহীন তিমি দেখিলেই তাকে মারিয়া ফেলে। বড় একটা তিমি দেখিলেই তার দুধারে দুই দল দাঁতওয়ালা তিমি দাঁড়াইয়া যায়। তার পর দুই দলের নেতা গিয়া বড় তিমিটার দুই ঠোঁট ধরিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। ইতিমধ্যে অন্য তিমিগুলি দুধার হইতে বড় তিমিটাকে কামড়াইতে থাকে। ফলে, বেচারা শীঘ্রই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন দাঁতওয়ালা তিমিরা তাহার জিভটা টানিয়া ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলে। বড় তিমিটা কিন্তু তখনও বাঁচিয়া থাকে—তার পর হাঙ্গরের পালের মুখে পড়িলে মারা যায়; কেননা তিমির মাংস খাইতে হাঙ্গররা খুব ওস্তাদ।

দক্ষিণ আমেরিকার কাছে 'ইনিয়া' বলিয়া এক ধরণের তিমি আছে। তারা

মানুষের মাংসটা একটু অতিরিক্ত রকম পছন্দ করে। কিন্তু সেখানেই আবার "সোটালিয়া" বলিয়া এক জাতের তিমি আছে। তারা আবার কিছুতেই 'ইনিয়া' তিমিদের মানুষের কাছে ঘেঁষিতে দেয় না। খুব আশ্চর্য্য নয় কি? সেখানকার লোকেও তাই প্রাণ গেলেও 'সোটালিয়া' তিমির কোন রকম অনিষ্ট হইতে দেয় না।

তিমির সম্বন্ধে আর একটা গল্প বলিয়া শেষ করিব। একবার এক সাহেব দক্ষিণ মেরুতে কতকগুলি দাঁতওয়ালা তিমি দেখিতে পাইলেন। সেখানকার খানিকটা জল জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছিল। সাহেব সেটার উপর চড়িয়া তিমির ফটো তুলিতে গেলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল যেন পায়ের নীচের বরফটা কেহ ঠেলিতেছে। তার পরেই সাহেবের পাশের সমস্ত বরফ ফাটিয়া গেল এবং তিনি ছোট এক টুক্‌রা বরফের উপর ভাসিতে লাগিলেন—আর তাঁহার চারিদিকে সব তিমি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। তাদের গরম নিঃশ্বাসে সাহেব ঘামিতে লাগিলেন। তার পরেই তিমিগুলির প্রধান চেষ্টা হইল—কি করিয়া সাহেবের পায়ের তলার বরফটা ফাটাইয়া তাঁহাকে জলে ফেলিবে, তার পর তাঁহাকে দিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ সারিয়া লইবে। এই সময় সাহেবের বরাতের জোরে সেই বরফের চাঁইটা ভাসিতে ভাসিতে ডাঙ্গার অনেকটা কাছে আসিয়া পড়িল। অমনি সাহেবের সঙ্গীরা চীৎকার করিয়া উঠিল—"লাফ দাও, লাফ দাও"। সাহেব মরি-বাঁচি হইয়া লাফাইয়া পড়িলেন; ঠিক তাহার পর মুহূর্ত্তেই সাহেব যেখানটায় দাঁড়াইয়াছিলেন সেই বরফটা ফাটিয়া গেল—আর সেখানে ভাসিয়া উঠিল কয়েকটা বড় বড় কাল কাল মূর্ত্তি আর কয়েকপাটি দাঁত। আর এক মুহূর্ত্ত দেরী করিলে সাহেব বাড়ী না গিয়া যাইতেন তিমির পেটে।

—:*:—

## চিত্র-পরিচয়

স্কুলে পড়িবার সময় ঈশ্বরচন্দ্রকে নিজে রান্না করিতে হইত। সময়টা নষ্ট না হয় এজন্য তিনি রান্না চাপাইয়া দিয়া বইএর মধ্যে তন্ময় হইয়া যাইতেন। রঙ্গীন চিত্রে তাহাই দেখান হইয়াছে।



## দু'নৌকায় পা দিলে

এমনি দশা হয়।

## মেঘ্‌লা রাতে

(শ্রীবিকাশ দত্ত)

মেঘ্‌লা রাতের মেঘ জমানো আঁধারে—
উঠবে না আর, উঠবে না কো চাঁদারে!
নাইরে আলো, নাইরে জানি,
আশ্‌মানেতে একটু খানি
নাই জোনাকি, নাইরে তারা,
আজকে বুঝি ক্লান্ত তারা।

ঝোপের মাঝে ডাকছে ঝিঁঝিঁ
বিরাম-হারা হিজি বিজি ;
নাইরে সাড়া, আঁধার নাচে
ঝাপ্‌সা ঝোপে বনের পাছে।
ঘোলাট মেঘ উঠ্‌ছে রেগে—
দিচ্ছে কভু কামান দেগে ;
প্রাণের মাঝে আঁৎকে ওঠে,
মুখ দিয়ে না বাক্যি ফোটে।

মেঘ্‌লা রাতের মেঘের মাঝে হো—
চড়্ চড়া চড়্ বাজনা বাজে গো !

হাঁক্‌ছে হুহু দস্যি হাওয়া,
গর্জ্জে ফুঁসে করছে ধাওয়া,
ভাঙছে বাড়ী, ভাঙছে চালা—
আচ্ছা আপদ, সাতশো জ্বালা !
উড়ছে বালি, উড়ছে ধূলো—
ডাক ছেড়েছে শিয়াল গুলো,
ডাক্‌ছে পাখী আর্ত্তস্বরে—
ঝড় দানবে নৃত্য করে ;
ভাঙছে বাসা, পড়ছে ছানা,
হায়, কারো বা ভাঙছে ডানা।

নাম্‌লো রাতের বাদল ধারা, ভাই—
ব্যাঙ্ ব্যাঙাচি আপন-হারা তাই !

ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর শব্দ যুড়ে
মনের সুখে গাইছে তুড়ে।



মিষ্টি জলে সৃষ্টি, ওরে,
দিচ্ছে আজি নূতন ক'রে।
ঝাপ্‌টা আসে, জান্‌লা দে'রে,
রাত দুপুরে উঠলো কে রে ?
আর ওধারে বক্‌ছে কারা ?
যাচ্ছি আমি, একটু দাঁড়া।
যা, শুগে যা দুষ্টু ছেলে,
রইলি তবু চক্ষু মেলে !

রাত যে অনেক এখন ঘুমো যা—
বাইরে নাচে হুতুম থুমোর ছা।

বাইরে বাজে টাপুর টুপুর
বৃষ্টি ধারার মধুর নূপুর।
আজকে এল নাচের বেশে
মন ভোলাতে মিষ্টি হেসে।
দেখ্‌রে চেয়ে জান্‌লা খুলে
গাছ পালা যে উঠ্‌ছে দুলে ;
নদীর বুকে তুফান মেলা—
জল-পরীরা করছে খেলা,
শুক্তি-গড়া নৌকা ছাড়ি'
নীল-সায়রে দিচ্ছে পাড়ি।

বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝমা ঝম্ ঝম্
মুষল-ধারে, একটু নাহি কম্ !

# ডান্‌পিটে

( শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য )

সুবোধের নামটা রাখিবার সময় ঠাকুরমা একটু ভুল করিয়াছিলেন—আগে জানিলে হয়ত তিনি কোন ঠাকুর-দেবতার নাম দিয়া তা'কে ছাড়িয়া দিতেন। বাড়ীর লোকে অবশ্য নামটা একটু সংশোধন করিয়া লইয়াছিল—ফলে স্কুলের খাতায় সুবোধচন্দ্র থাকিলেও লোকে বলিত কুবোধ চন্দ্র। তা' ছাড়া আরও কয়েক্‌টা নাম তাহার ছিল। বাবা ডাকিতেন 'ইডিয়ট্‌', দিদি ডাকিত বাঁদর, আর পাড়া—শুধু পাড়া কেন, সহর শুদ্ধ সবাই বলিত ডান্‌পিটে।

ডান্‌পিটেই বটে। সে দিনটা রবিবার, ভোরবেলা ঠাকুরমা সবে মাত্র স্নান সারিয়া একটু জপে বসিয়াছেন—মূর্ত্তিমান্ নাতি আসিয়া বাসি কাপড়ে ছুঁইয়া টুঁইয়া একাকার করিয়া দিল। বুড়ীর বয়স হইয়াছে ষাটের উপর—এখন নাকি আবার বারবার স্নান করা সহ্য হয়, না পোষায়? ঠাকুরমা রাগে গজ্‌ গজ্‌ করিতে করিতে আবার পুকুর-ঘাটে চলিলেন, সুবোধও পরম তৃপ্তিতে বারান্দায় ঢুকিল।

একটু পরেই ঠাকুর চায়ের জল দিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে সুবোধের উচ্চ কণ্ঠে বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল—"দিদী—ঈ—ঈ, দিদী—ঈ—ঈ"! "গলাখানা দেখ্ না একবার, যেন জালায় মুখ দিয়ে কথা বল্‌ছে" বলিতে বলিতে সুবোধের বছর দু'য়েকের বড় দিদি ইলা চোখ কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিছানাত্যাগ ব্যাপারটাকে সে বেশী প্রীতির চক্ষে দেখিত না। "চেঁচাবে না?—একদিনও যদি সময় মত চা পাওয়া যায়! আজ যদি ১২টার আগে ভাত খাই ত'—কি বলেছি" সুবোধ বিকট মুখভঙ্গী করিয়া উঠিল। "দেখ্‌ বাঁদর, অমন প্যাঁচার মত মুখ বাঁকা করবি ত—" "করবে না! ঘুম ভাঙ্গতে বেলা বাজবে ন'টা, আজই যদি বাবাকে না বলি ত'—" "যা-না, এক্ষুণি বল্‌গে, গেলিনে, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?" "যাবই ত' চা টা খেয়েনি আগে।" ইতিমধ্যে আর সকলে আসিয়া জুটিল, ইলাও চা ভিজাইয়া দিল।

চা খাইবার সময় সুবোধ আর বিশেষ কিছু গোলমাল করিল না, শুধু ইলার অসাক্ষাতে তার পেয়ালায় এক মুঠা চিনি ফেলিয়া দিয়া ইলা টের পাইবার আগেই এক লাফে উঠান পার হইয়া লেবু গাছের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সুবোধের ছোট ভাই ভুতো পড়িতে বসিয়াছে। বইখানি ভুগোলের—ইংরাজীতে



লেখা। সম্মুখে বইটা খোলা থাকিলেও চোখ দু'টা তার দেওয়ালে একটা টিকটিক্রির গতিবিধির দিকে পড়িয়াছিল। মুখে সে আওড়াইয়া যাইতেছিল—"পপুলেশন্ অব্ ইণ্ডিয়া—থ্রি হাণ্ড্রেড মাইল্‌স্।" "বাঃ বাঃ, ছেলের পড়া ত' হচ্ছে বেশ, বলি ওটা মাইল্ না মিলিয়ান্?" বলিতে বলিতে সুবোধ ঘরে ঢুকিল; সকলে হাসিয়া উঠিল। ঠাকুরমা ব্যাপারটা অতশত বুঝিলেন না—লজ্জিত ছোট নাতির দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তা, ও ছেলে মানুষ, ইংরিজীর ও কি বুঝবে?" "না, কচি খোকা কিনা?" বলিয়া ইলা হাসিয়া উঠিল। "ঠাকুরমা, পয়সা দাওনা একটা চুষি নিয়ে আসি, তোমার দুধের নাতু চুষবে।" "য্যাচ্ছা, ত্যামার ষ্যার স্যাদ্দারি ক্যারতে হ্যাবে না" বলিয়া ঠাকুরমা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সুবোধের দিকে চাহিলেন। "সকাল থেকে বলছি—যা, পাশের পুরুত-বাড়ী থেকে জেনে আয় আজ পটল খেতে আছে কিনা, তা ছেলে আমার হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছেন।" "পুরুতবাড়ী যাবার কি দরকার, আমরা বুঝি দেখতে পারিনা?" সুবোধ এক লাফে ঘরে ঢুকিয়া এক বিরাট পঞ্জিকা টানিয়া আনিল—তার পর চীৎকার করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল—"বৈশাখ—বৈশাখ—বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ—জ্যৈষ্ঠ—আজ সতেরই না? হুঁ, এই যে রবিবার বিংশোত্তরী, যাক্....১০।৩।১২ গতে, যাক্—কই পটল ত' দেখি না, বার্ত্তাকু ভক্ষণ নিষেধ বটে।" "বার্ত্তাকু কিরে?" বার্ত্তাকু মানে বেগুন, কিন্তু সুবোধ সকাল বেলা দেখিয়াছিল ঠাকুরমা ভাজার জন্য বেশ বড় বড় কয়েক্‌টা বেগুন রাখিয়াছেন; পাছে সে গুলি ফস্‌কাইয়া যায় সে জন্য বলিয়া উঠিল "বার্ত্তাকু—বার্ত্তাকু ঠাকুরমা? বার্ত্তাকু? বার্ত্তাকু মানে বুঝলে ঠাকুরমা, বার্ত্তাকু মানে বা—বা বাতাবি লেবু।" আর সকলে মুখ টিপিয়া হাসিল—কিছু বলিল না, সেদিন সকলের পাতেই বেগুন ভাজা পড়িয়াছিল।

"সুবুধ—সুবুধ অ সুবুধ; লক্ষ্মী বাবা, খোকাকে একটু মহাভারতটা নিয়ে ছবি দেখা না?" খোকা কান্না থামাইয়া বলিল—"এঁ ছেই জওয়াছন্দ বদ।" সুবোধ গোহাল ঘরে ঢুকিয়া গরুর লেজ মলিয়া কেমন করিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী হাঁকান যায়, মিনিকে তাহাই শিখাইতেছিল; ডাক শুনিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল "ছবি দেখে কি করবি রে বোকা, আমি তোকে আসল ব্যাপারটা দেখিয়ে দিচ্ছি।" বলিয়া হঠাৎ সে খোকাকে তুলিয়া দুই হাতে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিতে আরম্ভ করিল—

"পুনরপি ধরি তারে কুন্তীর কুমার
দুই করে ধরিয়া ভ্রমায় চক্রাকার।"

খোকা বেচারী জরাসন্ধের ছবিটাই পছন্দ করে, নিজেকে জরাসন্ধ সাজাইতে সে মোটেই

তৈরী ছিল না। বেচারা ক্ষাত্রধর্ম্ম ভুলিয়া চীৎকার করিয়া দিদিকে তাহার বিপদ্ জানাইয়া দিল। "মা তোকে ছবি দেখাতে বল্‌লে না বাঁদরামি করতে বল্‌লে রে বাঁদর?—মা, তোমার গুণধর পুত্রের কাণ্ড দেখ'সে।" মা ছুটিয়া আসিলেন—"কচ্ছিস্ কি হতভাগা!" "তুমি বুঝ্‌ছ না মা, সে দিন হেড মাষ্টার মশাই বল্লেন হাজার বই পড়েও যা না হয় একটা উদাহরণে তার পাঁচগুণ কাজ হয়। ছবি দেখে ও শুধু ভীমের ধরার কায়দাটাই জানতে পারত কিন্তু কতখানি জোরে ভীমের হাতটা আর জরাসন্ধের মাথাটা ঘুরছিল তা ত' বুঝতে পারত না।" মা বলিলেন "ঘাট হয়েছে, এবার ফাজলেমি রেখে নাইতে যা ত, হতভাগা।"

আধ ঘণ্টা পুকুর তোলপাড় করিয়া, হারুর ছোট ভাইটাকে সাঁতার শিখাইবার নাম করিয়া কয়েকটা চুবুনি দিয়া এবং কয়েক ঢোঁক জল খাওয়াইয়া সুবোধ বাড়ী আসিয়া খাইতে বসিল। ঠাকুরমা কাছে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিলেন "ছেলেটা হল কি! এই সে দিন পৈতে হল—মাথার চুল এখনও ভাল করে গজায় নি, আর তুই পঞ্চ দেবতাকে নিবেদন করলি নে?" সুবোধ ভাত চিবাইতে চিবাইতে বলিল "হুঁঃ, আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, আলস্যের প্রশ্রয় দেই আর কি! সারা বাংলার বামুনদের কাছ থেকে এই পাঁচ দেবতা রোজ ক'মণ ভাত মারেন জান?" ঠাকুরমা কি বলিবেন, কলিকালের ছেলেদের কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার যা অবস্থা হইল তোমাদের পণ্ডিত মহাশয়কে তাহার বর্ণনা করিতে বলিলে তিনি হয়তো বলিতেন "কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়"।

গাব্বে হাউসে যা না



ইলা পান সাজিতেছিল। সুবোধ পেছন হইতে তাহার চুলে সজোরে টান দিয়া বলিল "পান দে, দিদি"। "উঃ, এক গোছা চুল ছিঁড়ে দিয়েছে রে—বেরো বাঁদর,—এখানে কেন, তোর গাব্‌বে হাউসে যা না।" আলিপুরের চিড়িয়াখানায় বাঁদরদের থাকিবার জন্য যে ঘরটা আছে সেটার নাম গাব্বে হাউস্; সেবার পূজার ছুটিতে কলিকাতায় গিয়া ইলা সেটা জানিয়া আসিয়াছিল। তাহার কথা শেষ হইবার আগেই সুবোধ এক মুঠা পান তুলিয়া লইয়াছিল—কাজেই সময় নষ্ট না করিয়া বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল "কি মিষ্টি কথাগুলো তোর দিদি, ভগবান্ তোকে গড়বার সময় তোর মুখের ভিতর জিভ বসাতে গিয়ে বোধ হয় ভুলে একখানা বড় বাতাসা বসিয়ে দিয়েছিলেন।"

দুপুর রোদের ভিতর দিয়া সুবোধ আর তার চার বন্ধু চলিয়াছে—"মিত্তির বুড়ো"র বাগান হইতে আম চুরি করিতে। বুড়া ভারী কৃপণ; বাগান ভরা ফল ফলারি, কিন্তু কাউকে একটি ছুঁইতে দেয় না। তাই তারা ঠিক করিয়াছে আজ ছুটির দিনটা নষ্ট না করিয়া বুড়াকে একটু নাকাল করিবে। বুড়া আবার বাগান পাহারা দিবার জন্য এক খোট্টা দ্বারোয়ান রাখিয়াছে। তা, সে কি আর এই দুপুর রোদে বাগান আগলাইবার জন্য জাগিয়া থাকিবে?—না হয় ১৫টা টাকা মাহিনাই লয়—তাই বলিয়া ত' আর তার খাইয়া দাইয়া কাজ নাই।

বাস্তবিকই ছেলেদের আন্দাজ আছে বলিতে হইবে। দ্বারোয়ান গাছের তলায় তার দড়ির খাটিয়াটি পাতিয়া পাগড়ী খুলিয়া মাথার তলায় রাখিয়া দিব্যি আরামে নাক ডাকাইতে ডাকাইতে কর্ত্তব্য রক্ষা করিতেছিল,—কাজেই আম-চুরি নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইল। ফিরিবার সময় সুবোধের নজর পড়িল—দ্বারোয়ানজীর বহুযত্ন-পালিত টিকিটি দিব্যি খাটিয়া হইতে ঝুলিয়া বাতাসে দোল খাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল—আহা বেচারী, ওকে একটা আম উপহার দেওয়া যাক্—ঘুম ভাঙ্গিলে খাইবে। সুরেশ গিয়া সন্তর্পণে টিকির সাথে একটি আম বাঁধিয়া দিল। সুবোধ বলিল "উঁহু, হল না, পিঁপড়েদের জন্য একটা পথ রাখতে হবে ত', আমের একটা দিকের খানিকটা খোসা বরঞ্চ কেটে দেওয়া যাক্।" যথাকর্ত্তব্য শেষ করিয়া পাঁচ বন্ধু কোঁচড় ভরা আম লইয়া বাগানের বাহির হইল, এবং দ্বারোয়ানজী জাগিলে পিঁপড়ার কামড়ে তাঁহার মাথাটা কতখানি ফুলিবার সম্ভাবনা এবং ক'পোয়া ছাতু খাইতে পাইলে তিনি সে যন্ত্রণা ভুলিতে পারিবেন তাহারই আলোচনা করিতে করিতে চলিতে আরম্ভ করিল। পেছন হইতে একজন লোক যে তাহাদের সব কাণ্ড দেখিয়াছে কিন্তু একা বলিয়া এই ৫টি নামকরা ডান্‌পিটের কাছে আগাইতে সাহস পায় নাই তাহা তাহারা জানিতে পারিল না।

"বাবা, মোঙ্গোল হোবে বাবা, কুছু খাওয়া হোল না আজ, একটা আম দিয়ে যাও,

বাবা”—খোঁড়া ভিখারী পথের ধারে চীৎকার করিতেছিল। সুরেশ তাকে ভেঙ্গাইয়া বলিল, “বাবা, একটা রাজভোগ দাওনা বাবা, আজ সারাটা দিন টিফিন খাইনি বাবা, আচ্ছা অন্ততঃ দুটো রসগোল্লা, না হয় দু’খানা কচুরী বাবা, খাস্তা হলেই ভাল হয় বাবা”। তাহার বন্ধুরা হাসিয়া উঠিল।

খানিক দূর যাইতেই সুবোধ একটু উস্‌খুস্ করিতে লাগিল; তার পর হঠাৎ পকেটে হাত দিয়া বলিয়া উঠিল “এই রে, আমার রুমালটা কোথায় পড়ে গেছে—তোরা এগো, আমি দেখে আস্‌ছি।” বলিয়া সে ফিরিল। খানিক পরে যখন সে আবার ফিরিয়া আসিল তখন তাহার কোঁচড় খালি,—বন্ধুরাও চলিয়া গিয়াছে।

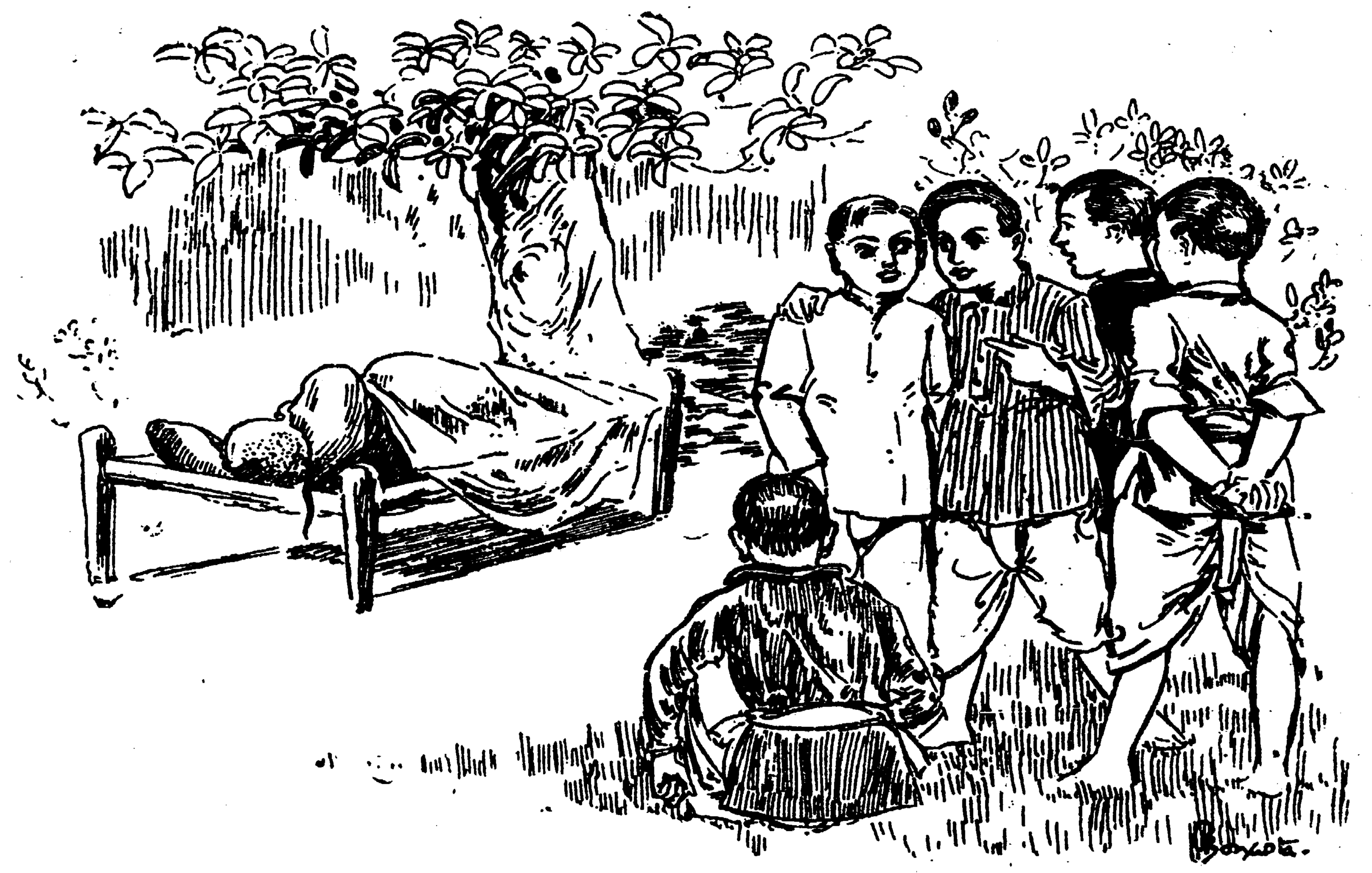

দ্বারোয়ানজীর…টিকিটি বাতাসে দোল খাইতেছে

সন্ধ্যার পর মাষ্টার মহাশয় আসিলেন। সারাদিনের পর এইবার সুবোধ বই লইয়া বসিয়াছে। “স্যার, এত শক্ত অঙ্ক কখনো ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে দেখেছেন?” “আঃ, ভারী বেয়াদব ত’, যা দিয়েছি কষ।” ‘কৈ দেখি, এ কি! এ কেমন করে হবে—৭জন মানুষ কিংবা ১২ জন বালক যদি একটা কাজ ৮ দিনে করতে পারে তবে ৫ জন বালক আর ৫ জন মানুষ সেটা ক’ দিনে করতে পারবে। আচ্ছা স্যার, আপনিই বলুন না, সব গুলি বালকই যে এক বয়সী তার কি কথা আছে, আর সকলের গায়েই যে সমান জোর



তাই বা কে বল্লে? ধরুন ভুতোও বালক, আর আমাকেও লোকে বালকই বল্‌বে—তাই বলে আমি আর ভুতো—?” মাষ্টার মহাশয় বলিলেন “ধরে নিতে হবে সব সমান।” “তাইলে, স্যার, এও ধরে নিন না যে আমি অঙ্কটা কষে ফেলেছি।” “এই ইডিয়ট্, তোর পরীক্ষা কবে রে?” পাশের ঘর হইতে সুবোধের বাবা হাঁকিলেন। “এঁ—এ—পরশুদিন।” “আর তুই এমনি ফাজলেমি লাগিয়েছিস্—এবার যদি—”কর্ত্তা কথাটা শেষ না করিয়াই কোথায় বাহির হইয়া গেলেন। মাষ্টার মশাই জিজ্ঞাসা করিলেন “সংস্কৃত তৈরী হয়েছে?” “আজ্ঞে, জিজ্ঞাসা করুন না?” “দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে?” “আজ্ঞে যার দুটো পদই প্রধান।” “যেমন?” সুবোধ লক্ষ্মী ছেলের মত উত্তর দিল “মানুষ।” “য়্যাঁ?” মাষ্টার মশাই যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। “কেন স্যার, আপনি ত’ মানুষ, আপনার দুটো পা ই প্রধান না, একটা কেটে দিলে পারেন হাঁট্‌তে?” মাষ্টার মহাশয় গম্ভীর হইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। সুবোধ বুঝিল স্যার চটিয়াছেন। সে তখন সুর করিয়া পড়িতে সুরু করিল—“লেট্ এ বি সি বি এ ট্র্যাঙ্গল্ য়্যাণ্ড লেট্ পি কিউ বি এ—আচ্ছা, স্যার, মোহন বাগানের গোষ্ঠ পালের গায় বেশী জোর না ডালহউসির ডানকানের গায় বেশী জোর?” মাষ্টার মহাশয় বাস্তবিকই রাগিয়াছিলেন—এবার উঠিয়া পড়িলেন। সুবোধও দেরাজের আড়ালে লুকান একখানা ডিটেকটিভ উপন্যাস খুলিয়া আলোর সামনে ঝুঁকিয়া পড়িল।

খাওয়া দাওয়া সারিয়া উঠিতেই মিনি আসিয়া বলিল “দাদা, মার বড্ড জ্বর হয়েছে, তোমাকে ডাকছিলেন।” “য়্যাঁ; জ্বর হয়েছে, খুব বেশী নাকি রে?” বলিয়া সুবোধ ভীত হৃদয়ে গিয়া মা’র পায়ের কাছে বসিল। মা পা সরাইয়া লইয়া বলিলেন “কে, সুবোধ? যা সর, আমি গেলেই ত’ তোরা বাঁচিস্।” সুবোধ কথা বলিল না, পায়ের কাছে আর একটু আগাইয়া বসিল। মা’র রাগ পড়ে নাই,—বলিলেন “তোর জ্বালায় কি গলায় দড়ি দেব, শুনলুম আজ আবার কার বাগানে আম চুরি করেছিস্!” সুবোধ মাথা নীচু করিয়া রহিল। “কি করেছিস্ সে গুলো বল্?” সুবোধ কথা কহে না। “বল্, কিছু বল্‌ব না।” “এক ভিখেরীকে দিয়েছি, আর অমন কাজ করব না মা, এবার ভাল হব, তুমি ভাল হয়ে যাও।” সুবোধ মা’র পায়ের উপর মুখ রাখিল। মা দেখিলেন সুবোধের চোখ দিয়া জল পড়িতেছে; তিনি আর কিছু বলিলেন না।—ছেলের উপর যত রাগ, যত ঘৃণা সব তাঁর নিমিষে মুছিয়া গেল। হোক্ তাঁর ছেলে দুরন্ত, ডান্‌পিটে—কিন্তু তার মত হৃদয় ক’জনের আছে?

# ফরাসীদেশের বীর মেয়ে

[ শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত ]

তোমরা নিশ্চয়ই ফ্রান্সের নাম্ সকলে শুনেছ, আর সে দেশের দু'এক জন বড় লোকের নামও জান। প্রাচীন যুগে গ্রীস ও রোম যেমন তাদের সভ্যতার বাতি জ্বেলে দিয়েছিল, তেমনি মধ্য যুগে ও বর্ত্তমান সময়ে ফ্রান্স তার শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে য়ুরোপকে সতেজ করে তুলেছে। সেকাল থেকে এই দেশে যে কত বড় বড় রাজা, যোদ্ধা, জ্ঞানী জন্মেছেন তা বলে শেষ করা যায় না। ১৪০ বছর আগে এই দেশে এমন একটা ব্যাপার ঘটেছিল যা সমস্ত য়ুরোপকে নাচিয়ে তুলেছিল। সেটা হচ্ছে ফরাসী বিদ্রোহ। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্রোহ আরম্ভ হয়; কি রকম করে এটা আরম্ভ হয়েছিল তা তোমাদের একটু পরিষ্কার করে বলছি। চতুর্দ্দশ লুই নামে একজন খুব নামজাদা রাজা ফ্রান্সের অধিপতি হন। তিনি অনেক যুদ্ধ করেছিলেন এবং সেজন্য রাজ্যের অনেক ঋণ হয়ে পড়ে, তারপর রাজা হলেন পঞ্চদশ লুই। তিনি মরে যাবার পর যখন ষোড়শ লুই রাজা হলেন, তখন তিনি দেখ্‌লেন যে দেশের অবস্থা অতি শোচনীয় হয়েছে। তিনি লোক খুব ভাল ছিলেন কিন্তু তাঁর প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত দুর্ব্বল, সেজন্য তিনি দেশের কোনও উন্নতি কর্‌তে পারলেন না। দেশের অবস্থা এরকম দাঁড়াল যে এক দিকে যারা খেটে খায় তারা না খেতে পেয়ে মারা যেতে বসেছে, অন্য দিকে বড় লোকেরা তাদেরই রক্ত শুষে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদে মত্ত আছে। যারা কষ্ট পাচ্ছিল তারা জ্বলে উঠ্‌ল—তারা বল্লে "এ কি রকম অবিচার! আমরা থাক্‌ব অনাহারে আর বড় লোকরা থাক্‌বে আমোদে! আমরা এর প্রতিবিধান কর্‌ব।" এই অত্যাচারের প্রতিবিধান কর্‌তে যে দলটী গঠিত হল সেটী সমস্ত ফ্রান্সের—শুধু ফ্রান্সের নয় সমস্ত য়ুরোপের কুজ্ঝটিকাময় হৈমন্তিক আকাশে বিদ্রোহের আকাশ-প্রদীপ জ্বেলে দিলে। এই বিদ্রোহই হচ্ছে ফরাসী বিদ্রোহ। এর নেতা ছিলেন তিন জন প্রতিভাশালী লোক—দাঁতো, রোবস্‌পিয়ের ও মারা। এঁরা দেশের লোকের পক্ষে থাক্‌লেও অত্যন্ত নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ছিলেন। সব চেয়ে নিষ্ঠুর ছিলেন মারা। এত লোকের মৃত্যুদণ্ডাদেশ ইনি দিয়েছিলেন যে তা শুনলে তোমরা বোধ হয় বিশ্বাসই কর্‌বে না। একবার ৫ দিনে তিনি প্রায় ১২০০ লোকের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিয়েছিলেন। এই প্রসিদ্ধ মারাকে যিনি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেন তিনি ফ্রান্সের এক বীর মেয়ে। এঁর নাম হচ্ছে সার্লোৎ কর্দে। তিনি দেশকে কি রকম ভালবাস্‌তেন আর দেশের



মঙ্গলের জন্য তিনি কি রকম করে মারাকে বধ করে আত্মবিসর্জ্জন করেন সেই কথাই আজ তোমাদের বল্‌ব।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুলাই ভিক নামে একটী ছোট গ্রামে সার্লোৎ জন্মেছিলেন। তাঁর বাবার নাম ছিল ফ্রাসোয়া দ কর্দে, মার নাম জাক্‌লিন্ সার্লোৎ মারি। এঁরা দুজনেই বনেদি ঘরে জন্মেছিলেন, কিন্তু তাঁদের টাকা পয়সা কিছুই ছিল না। টাকার অভাবে তাঁরা বালিকা সার্লোৎকে তাঁর কাকার কাছে রেখে দেন। সেখানে কিছু দিন থাক্‌বার পর যখন তাঁর বয়স আট তখন তাঁকে তাঁর বাপ মা নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। কেননা, বাড়ীতে তো আর চাকর বাকর ছিল না, মাকে কাজকর্ম্মে সাহায্য করে কে? এই অল্প বয়স থেকেই সার্লোৎ আপনার অসাধারণ সাহস ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়েছিলেন।

সার্লোৎ কর্দে

তিনি ছিলেন খুব কাজের মেয়ে, স্বাস্থ্যও ছিল চমৎকার, কখনও চুপ করে এক জায়গায় বসে থাক্‌তে ভাল বাসতেন না। ভোরবেলায় উঠে মাকে গৃহস্থালী কাজে সাহায্য কর্‌তেন, তারপর অনেক দিন ভাইদের সঙ্গে ক্ষেতে চলে যেতেন জমি দেখতে, আবার একটু ফুরসুৎ পেলেই চরকাতে সুতো কাট্‌তে ও তাঁতে কাপড় বুনতে বসে যেতেন। এই রকম ভাবে দিন কেটে যাচ্ছিল; তার পর তাঁর বয়স যখন ১৩ বছর সে সময় তাঁর মা মারা যান। এই দুর্ঘটনার কিছুকাল পরে তাঁদের পরিবারেরই একজন হিতৈষিণী মহিলা সার্লোৎ ও তাঁর ছোট বোনকে কন্‌ভেণ্টে ভর্ত্তি করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হন। বুদ্ধিমতী সার্লোৎ এতে রাজী হন; তাঁকে একটী কন্‌ভেণ্টে ভর্ত্তি করে

দেওয়াও হয়। তিনি যখন কনভেন্টে ভর্ত্তি হন সে সময় সকলে ভেবেছিল যে তিনি ধর্ম্ম-যাজিকা হবেন—তাঁর অন্তঃকরণটী ছিল ধর্ম্মপ্রবণ ও সরল। কন্‌ভেন্টে পড়বার সময়েই তিনি আপনার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। সেই কন্‌ভেন্টে অনেক ভদ্রলোক ধর্ম্মযাজিকাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। একজনের নাম ছিল আঁরি। আঁরির সঙ্গে সার্লোতের আলাপ হয়। পরে তাঁদের ভেতর ভালবাসা হয় ও তাঁরা বিয়ে করবেন বলে ঠিক করেন। কিন্তু এ বিয়ে হয়নি, কারণ বিয়ের আগেই আঁরি মারার ষড়যন্ত্রে মারা যান। আঁরিও সার্লোৎকে নিয়ে ফ্রান্সে অনেক গল্প প্রচলিত আছে; তার ভেতর একটী গল্প হচ্ছে, আঁরিকে ষড়যন্ত্র করে মারবার জন্যই নাকি সার্লোৎ মারাকে হত্যা করেন। ইতিহাস পড়লে কিন্তু জানা যায় যে সার্লোৎ যে মারাকে মেরেছিলেন তার কারণ এটা নয়, অসাধারণ দেশ-প্রেমই তাঁকে এই কাজে চালনা করেছিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়, ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে সার্লোৎ কনভেন্ট থেকে তাঁর এক বোনের কাছে থাকবার জন্য আসেন।

সেই সময় তাঁর দুজন বন্ধু জুটে যায়—একজন হচ্ছে ইলোনোর্ ও আর একজন লেভাই-আ। একদিন তাঁরা ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়ছিলেন। ইংলণ্ডে চার্লস বলে এক রাজাকে সে দেশের লোক মেরে ফেলেছিল। সেইটী পড়বার সময় লেভাইআ বলে উঠ্‌লেন "দেখ, ফ্রান্সের রাজার যদি এ রকম অবস্থা কখনও হয় তা হলে আমি তাকে আমার প্রাণ দিয়ে বাঁচাব"। ইলোনোরও বলে উঠ্‌লেন যে তিনিও তাই করবেন। তখন এই তিনটী সরলা কিশোরীর ভেতর কেউই জানত না যে এক বছরের মধ্যেই সার্লোৎ ও ইলোনোরকে মেরে ফেলা হবে।

এই সময় একটা কাণ্ড ঘট্‌ল। এক জায়গায় ভোজ হচ্ছিল। সেখানে সার্লোৎ, তাঁর বাবা, ভাইবোনেরা সব গেলেন। এখন, সে দেশে নিয়ম ছিল, ভোজের আগে রাজার দীর্ঘজীবন চাওয়া হ'ত। সেদিনও তাই করা হচ্ছিল, হঠাৎ সার্লোৎ এর প্রতিবাদ করলেন। একজন ভদ্রলোক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, রাজা ত খুব ভাল ধার্ম্মিক, তাঁর দীর্ঘায়ুর জন্য মদ্যপান করতে অস্বীকার করছেন কেন?' সার্লোৎ নম্রভাবে উত্তর দিলেন, "তিনি ধার্ম্মিক তা আমি জানি, কিন্তু এত দুর্ব্বল প্রকৃতির তিনি, যে নিজে দেশের কিছু মঙ্গলই করতে পার্‌বেন না। দুর্ব্বল রাজা নিয়ে দেশের কি লাভ হবে? আমার নিজের বিশ্বাস—যে রাজা দেশের মঙ্গল কর্‌তে অসমর্থ, তাঁকে দিয়ে দেশের কোনও কাজ হবে না।" সকলে সার্লোতের কথা শুনে অবাক্ হয়ে গেল। সে সময় থেকে সার্লোৎ বুঝতে পারলেন যে দেশের ভাল করাই হচ্ছে তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় কাজ, আগে দেশ, তারপর নিজের প্রাণ। সে সময় তিনি খালি খবরের কাগজ পড়তেন ও কি করলে দেশের সামান্য মঙ্গলও করা যায় তার চিন্তাতে বিভোর হয়ে থাকতেন।



এ সময় যাকে সার্লোৎ ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় শত্রু বলে জানতেন সেই মারা পারীতে আসেন। মারা জন্মেছিলেন সুইট্‌জারলাণ্ডে; বর্দো ও পারীতে চিকিৎসাবিদ্যা পড়ে লণ্ডনে যান; সেখানে ডাক্তার হন। বাইরে ডাক্তার হলেও মারা ভিতর ভিতর ছিলেন একজন চৌকস রাজনৈতিক। অবশেষে মারা হলেন ফ্রান্সের হর্ত্তাকর্ত্তা। কত লোক যে তাঁর আদেশে মরতে লাগল তা বলে শেষ করা যায় না! এই সব নিষ্ঠুরতায় সার্লোতের দেশপ্রেমিক প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল। তিনি বুঝতে পারলেন যে মারাই হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু। এ রকম লোক যদি বেঁচে থাকে তা হলে মাতৃভূমির কি দুর্দ্দশা হবে! সার্লোৎ বুঝতে পারলেন যে মারাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেল্‌তে পারলে ফ্রান্স আবার শান্তিময় হয়ে উঠ্‌বে। মারাকে হত্যা করা জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ মনে করে সার্লোৎ চলে গেলেন পারীতে।

সার্লোৎ পারীতে যে হোটেলে উঠলেন সেখানকার চাকরের মুখে শুনতে পেলেন—মারার ভয়ানক অসুখ হয়েছে। তিনি একটু দমে গেলেন, কারণ তিনি ঠিক করেছিলেন যে মারাকে রাজসভাতেই হত্যা করবেন। যাক্, তিনি একেবারে হতাশ হলেন না; মনে মনে ঠিক কর্‌লেন যে মারাকে তার বাড়ীতেই মার্‌বেন।

সেটা ১৭৯৩ সন। ১৩ই জুলাই সার্লোৎ খুব ভোরে উঠ্‌লেন—কন্‌কনে শীত, সমস্ত প্রকৃতি নিঝুম হয়ে' রয়েছে। তিনি আস্তে আস্তে একটী বাগানে গিয়ে ঘণ্টাখানেক ধরে ভাবলেন—কি করে মারাকে হত্যা করবেন। সাড়ে সাতটার সময় তিনি একটী দোকানে গেলেন ও সেখান থেকে একটী ধারাল শক্ত ছুরি কিনে আনলেন। তার পরে হোটেলে এসে একটী গাড়ী ভাড়া করে উঠে বস্‌লেন; গাড়োয়ানকে বল্লেন মারার বাড়ী যেতে। সার্লোৎ মারার বাড়ীতে এলেন বটে কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হল না; বাড়ীর চাকরেরা বল্লে যে মারা এখন কারও সঙ্গে দেখা করবেন না। সার্লোৎ হোটেলে ফিরে এসে মারাকে একখানা চিঠি লিখিলেন—তাতে লিখ্‌লেন যে মারা যেন তাঁর সঙ্গে অন্ততঃ একটীবার অনুগ্রহ করে দেখা করেন। মারা রাজী হলেন।

সার্লোৎ মারার বাড়ীতে এলেন—আস্তে আস্তে মারার ঘরে ঢুকলেন। ঘরটী ছোট, চুণ সুরকি মাঝে মাঝে খসে পড়ে গেছে, সূর্য্যের আলো খুব অল্পই আস্‌ছে—মারা কি যেন লিখ্‌ছিলেন। সার্লোৎ তাঁর কাছে আসলেন—সার্লোতের পরনে সাদা পোষাক ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং পবিত্রতা দেবী এই পৃথিবীতে এসেছেন। দু' একটী কথা হবার পর সার্লোৎ হঠাৎ তাঁর বুকের ভেতর থেকে ছুরি টেনে বের কর্‌লেন—ছুরিটা ঝল্‌সে উঠ্‌ল, মারা ভয়ে আঁৎকে উঠ্‌লেন, সার্লোৎ মুহূর্ত্তের ভেতর দু হাত দিয়ে ছুরিটী ধরে মারার বুকে

আমূল বসিয়ে দিলেন। 'রক্ষা কর, রক্ষা কর,' বলে মারা চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন; তার পর এক মিনিটের মধ্যেই সব শেষ।

মারার চীৎকার শুনে সকলে দৌড়ে এল। সার্লোৎকে গ্রেপ্তার করা হল। তাকে সকলে জিজ্ঞেস কল্লে—কেন তিনি এমন কাজ কল্লেন। সার্লোৎ নির্ভীকভাবে উত্তর দিলেন যে স্বদেশকে তিনি নিজের প্রাণের চেয়ে ভাল বাসেন, তাই নিজের প্রাণের বদলে এ কাজ করেছেন। তাঁকে কয়েদ করা হ'ল। তিনি জেলে থেকে যে সব চিঠি পত্র লিখতেন তা' থেকেই তাঁর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ ১৬ই জুলাই সার্লোতের বিচারের দিন জগতের ইতিহাসে একটী চির-স্মরণীয় ঘটনা। বিচারালয়ে তিনি নির্ভীকভাবে স্বীকার করলেন যে মারাকে মারবার জন্যই তিনি পারীতে এসেছিলেন এবং এও বল্লেন যে ফ্রান্সের সব চেয়ে বড় অনিষ্টকারীকে পৃথিবী থেকে সরিয়েছেন—এটাকে তিনি গৌরব বলে মনে করেন। ১৭ই জুলাই, আবার বিচার আরম্ভ হল। যে শুভ্রবাস পরে তিনি মারাকে হত্যা করেন সেই শুভ্রবাসে তিনি বিচারালয়ে উপস্থিত হন। বিচার শেষ হয়ে গেলে দণ্ডাদেশ হল। দণ্ডাদেশ—মৃত্যু।

দণ্ডাদেশ হয়ে গেলে সার্লোৎ জেলখানায় ফিরে এলেন; মরবার আগে তাঁর নিজের এক খানা ছবি আঁকাবার সাধ হল। শিল্পী জা জাক্‌হোরকে ডাকা হল। সার্লোৎ এসে স্থিরভাবে বসলেন—নবীন রূপদক্ষ এক ঘণ্টা ধরে ছবি আঁকলেন। তোমরা সার্লোতের যে ছবিখানি দেখছ এটী তাঁরই আঁকা ছবি। মৃত্যুর ৩।৪ ঘণ্টা আগে সার্লোতের যে চেহারা ছিল এটী তারই প্রতিকৃতি। কি প্রশান্ত দৃষ্টি! কি মনোহর লাবণ্য! সমস্ত শরীরে যেন জ্যোতি খেলে বেড়াচ্ছে!

ছবি আঁকা শেষ হয়ে গেলে ঘাতক এসে তাঁকে লাল পোষাক পরতে বল্লে। নির্ভীক সার্লোৎ ঘোর লাল রঙের পোষাকটী পরে আপনার অনন্যসাধারণ কেশদাম কেটে নবীন রূপ-দক্ষকে স্মৃতিচিহ্নরূপে উপহার দিলেন। তার পর বধ্যভূমিতে যাবার জন্য তিনি যেই গাড়ীতে উঠ্‌লেন, অমনি ভীষণ ঝড় এল। ভীষণ ঝড়; প্রকৃতি আলোড়িত হয়ে উঠ্‌ছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর সার্লোৎ দাঁড়িয়ে আছেন সেই ঘোড়ার গাড়ীতে—নির্ভীক, নিশ্চল, মুখে মৃদুহাসি। ইতিহাসের পাতাতে দিব্যাক্ষরে লেখা আছে যে এই মরণ-যাত্রা অনবদ্য, স্বর্গীয় হয়েছিল। তার পর বধ্যভূমিতে ফরাসী বীরাঙ্গনা সার্লোৎ দেহ রক্ষা করলেন।



ফ্রান্সের কি গেল, জগৎ তা বুঝল না! প্রসিদ্ধ লেখক কারলাইল বলেছেন—সার্লোৎ নক্ষত্রের মত আপনার আলোতে সকলের চোখ ঝল্‌সে দিয়েছে; একবার মনে হয় যে সে নিষ্ঠুর, আবার মনে হয় যে সে সরলা।

গুপ্তহত্যা কোন কালেই প্রশংসা বা অনুকরণের বিষয় নয়—ইতিহাসও তাকে প্রীতির চক্ষে দেখে না। তবে এই সরল মহিলাটী যে ভাবে এক ঝলক আলো ছড়িয়ে দিয়ে আবার নিবে গেলেন তা ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভোলে নি।

——:*:——

# সাজাহানের সমাধি

গল্প

( শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য )

জ্যৈষ্ঠের ছুটির আর দিন দু'য়েক বাকী আছে। কি কারণে সেদিন স্কুলটাও বন্ধ ছিল। বোর্ডিংএর ছেলেরা তাই দুপুরবেলা কতক গিয়েছে আড্ডা দিতে, কতক তাস পিট্‌তে; বাকী কয়েক জন মিলে এ'-ও' বিচার নিয়ে আলোচনা কচ্ছে; কেউবা চিৎ হয়ে শুয়ে এক-আধখানা গল্পের বই পড়্‌ছে;—মোটের উপর কাজগুলোর কোনটাই যে ইস্কুল-এক্সারসাইজ নয়, তা' হলপ ক'রে বলা যেতে পারে!

মনতোষ ছেলেটি ফার্ষ্ট্‌ ক্লাসে পড়ে; ভালো ছেলে বলে' বেশ একটু সুনামও তার আছে। সেই শুধু নিয়ম ভঙ্গ কচ্ছিল…Algebra খুলে equation-এর একটা আঁক নিয়ে।

কিন্তু বেশীক্ষণ ধরে' এমনি অপরাধ কর্ব্বার সুযোগ সে আর পেয়ে উঠ্‌লো না। ফোর্থ ক্লাসের অনন্ত গিয়ে খাতা-পেন্সিল নিয়ে তাকে ধরে' বস্‌লো—বন্ধের জন্যে তাকে একটা রুটিন্ ক'রে দিতে হবে।

তাদের এক গাঁয়েরই ছেলে, মনতোষের সহাধ্যায়ী হরেন অমনি সেখানে উপস্থিত।

"কি হচ্ছে,—রুটিন্? বহুৎ আচ্ছা,—লেখো,"—বলে' সে সুর করে' বলে' চল্ল,…

"Play, Play and play,
To pass the vacation t'is the way,—
And th' only way!"

থার্ড্‌ ক্লাসের খগেন এসে' বল্ল, "না হরেনদা, ঠাট্টা নয়। স্কুল খুল্‌লেই তো আবার হাফ্‌-ইয়ার্লি; কয়েকটা Essay বেছে' দিন্ না মুখস্থ কর্ব্বার জন্যে! এই যে বই—"

"রাখো তোমার বই। মুখেই বল্‌ছি, শুনে' নাও—Idleness, foot ball match and how have you spent the summer Vacation,—পড়্‌তে হয় তো বাড়ী বসে' এগুলি পড়ে' রেখো। এর একটা-না একটা অবিশ্যিই পড়্‌বে।"

অনন্ত বল্ল, "আর যদি না পড়ে ?"

"না পড়ে তো আমার ভারী ব'য়েই গেল।"

ঘরে একটা হাসির রোল পড়ে গেল। এমন সময় তার চারগুণ হাসি মুখে নিয়ে সত্য বলে' ছেলেটি এসে বল্ল, "হরেনদা, হরেনদা,—দেখে' যান আপনাদের সুখময়ের কাণ্ড!"

সবাই গিয়ে দেখে, এই দুপুর রোদ্দুরে গ্রীষ্মের যে অসহ্য গরম,—তার ভিতরও শ্রীযুক্ত সুখময় বাবু···একখানি লেপ মুড়ি দিয়ে দিব্যি আরাম ক'রে নাক ডাকিয়ে ঘুম দিচ্ছেন।

বাবা গো—একি মানুষ,—না, আর কিছু!

সবাই ডেকে ডু'কে' তুল্ল তাকে!

খগেন বল্ল, "নাঃ,···লোকটা একটা রত্ন যে, তা'তে আর ভুল নেই!"

বস্তুতঃ একটি রত্নই সে ছিল। শুধু এ' বিষয়ে নয়···সব বিষয়েই! পূর্ব্বজন্মে তার বাবা নাকি মা সরস্বতীর কাছ থেকে কিছু ধার এনেছিল। ইহজন্মে প্রচুর ধন-দৌলতের মালিক হ'য়ে সে দেনাটা সে একেবারেই অস্বীকার করে বস্‌লো; শুধ্‌ বার নামও আর মুখে আন্‌লো না। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানোন্মেষ হ'তেই সুখময় বুঝ্‌লো, বাবা কাজটা বড় ভালো করেন নি। সিক্‌স্‌থ্‌-ক্লাসে উঠবার পর পিতৃ-ঋণ পরিশোধার্থ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হ'য়ে সে বারবার দু'বার ক'রে ফেল মেরে' পিতাকে কিছু পরিমাণে ঋণমুক্ত কল্লে। তার পর কোন এক মহেন্দ্র-ক্ষণে যেন ফিফ্‌থ্‌-ক্লাসে উঠে' পিছন দিক্‌কার বেঞ্চখানিতে আবার কায়েমী স্বত্ব লিখে' নিয়ে আজ তিন বছর পর্য্যন্ত টি'কে' আছে। আশা আছে, আরো কিছুদিন সেখানে তার দখলী স্বত্ব অচল থাক্‌বে।

কিন্তু জীবনী যখন এসেই পড়্‌লো, তখন আর একটু গোড়া থেকেই আরম্ভ করা যাক্‌। বনগ্রাম ফরিদপুর জেলার ভিতর একখানি বিপুল বনময় গ্রাম। গ্রামের শীর্ষস্থানীয় বৃক্ষলতাদি সগর্ব্বে শির তুলে' দাঁড়িয়ে নিশিদিন আকাশের চন্দ্রসূর্য্যকে যেন শাসিয়ে বল্‌ছে,—No admission,···তফাৎ রহো। বেচারীরা ভয়ে-ভয়ে তফাৎ-ই থাকে;—ক্বচিৎ ফাঁকে টাকে উঁকি ঝুঁকি মারে; শত হ'লেও স্বভাব তো!



কিন্তু—যাক্‌ সে কথা।

এই বনগ্রামের পরমেশ্বর রায় একজন অখণ্ড-মার্ত্তণ্ড-চণ্ড দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ পাষণ্ড জমিদার,···'টাকাৎ' এবং ডাকাত, প্রজার রক্ত চুষে' শক্ত পোক্ত ইয়া 'যম'কালো চেহারা আর ইয়া জম্‌কালো ভুঁড়ি তার! সে কালের লোকে বল্‌তো, দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা; আর এই বনগাঁবাসীদের কাছে তাদের জমিদার তো নামে-কামে সকল বিষয়েই···একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ পরমেশ্বরম্‌।

তারি পুত্র শ্রীমান্‌ সুখময়। হ্যাঁ, সুখময় বই কি?—কোন্‌ দুঃখে সে তিনকড়ি, কাঙালীচরণ বা ফেলারাম হ'তে যাবে? কি তার এমন অভাবটা?

সে সুখময়,—দস্তুরমতো সুখময়। বেশে, ভূষায়,···হাবে, ভাবে,···চালে, চলনে,···ঠিক্‌ ঠিক্‌ সত্যিকার সুখময় সে! ক্ষুর-চষা ঘাড়, নাকের ডগায় লুটিয়ে পড়া ঝুঁটি, ছড়ি, ঘড়ী, চশ্‌মা, রুমাল, ইয়ার,বন্ধু, সবি আছে তার! সত্যিই সে একটি সুখের পায়রা।

বিদ্যা না থাক্‌,—বুদ্ধিটি ছিল তার টন্‌টনে। জীবনে, কথায় সে কারুর কাছে কোন দিন হটে নি। সে দিন ইস্কুলে বাংলার ঘণ্টায় রিডিং পড়্‌বার সময় টিচার যখন সুধোলেন, "পৃথিবী কার্য্যক্ষেত্র; আমরা তাহার কর্ম্মকারক।—এখানে 'আমরা' কোন্‌ কারক?"

চট্‌পট্‌-ই সে জবাব দিয়েছিল' আজ্ঞে, কর্ম্ম কারক।

বিস্ময়ে টিচারের তো চক্ষু চড়ক গাছ!—"কর্ম্ম কারক!···কি করে'?"

"—কেন, এখানেই তো লেখা আছে Sir,···আমরা তাহার কর্ম্মকারক।"

শুনে' ক্লাসশুদ্ধ সবাই তো হেসেই অস্থির। শিক্ষকও বুঝলেন, হ্যাঁ, ছেলেটির মাথার সার পদার্থের ভাগ কিছু বেশীই!

এ-হেন সুখময় আর আর সবাইকার মতো জ্যৈষ্ঠের ছুটিতে বাড়ী এলো।—দস্তুরমতো ফ্যাশান্‌ দুরস্ত ষ্টাইলে···গ্রামের অনাবৃত, নগ্ন, সরল চোখে এক বিস্ময় জাগিয়ে তুলে।

গ্রামে হ'বে থিয়েটার। ছেলেরা চাঁদা তুলে, তার জন্যে কয়েক খানি নাটক আনালো।—

সেদিন দুপুর বেলা রিডিং-রুমে আরাম কেদারায় অঙ্গ এলিয়ে সুখময় তা'রি একখানি নাটক নিয়ে একাগ্রমনে পড়ে' যাচ্ছিল। বোধ হচ্ছিল যেন বইএর প্রত্যেকটি অক্ষর তা'র 'চোখের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,—আকুল করিল মন-প্রাণ!' এম্নি তন্ময়,—এম্নি আত্মভোলা সে!

বই খানির নাম 'নূরজাহান'।

'৫ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য, স্থান—গোলকুণ্ডা। কাল—রাত্রি।' অংশটায় সে তখন সাজাহান আর খাদিজা (মমতাজ)এর কথোপকথন পড়্‌ছে।

খাদিজা জিজ্ঞাসা করলে, "সাম্রাজ্যের জন্য ?"

সাজাহান। "হাঁ, সাম্রাজ্যের জন্য।" পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"দেখ খাদিজা, তোমার পিতা লিখেছেন, নূরজাহান সাম্রাজ্যের জন্য যুদ্ধ কর্ব্বেন। তিনি সহজে সাম্রাজ্য আমার হাতে দেবেন না।"

খাদিজা। "কি হ'বে সাম্রাজ্যে ? চল আমরা দূর বনগ্রামে যাই; সেখানে কৃষক দম্পতী হ'য়ে সুখে জীবন অতিবাহিত করি। ভূখণ্ডের জন্য মারামারি কাটাকাটি কেন ?"

কিন্তু সাজাহানের এ কথায় মন উঠ্‌ল না; সে যুদ্ধ কর্ব্বেই,—নূরজাহানের হাত থেকে সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নেবেই,—এই তার পণ!

পড়্‌তেই টক্‌ ক'রে সুখময়ের মনটা সাজাহানের উপর হঠাৎ বিতৃষ্ণ হ'য়ে উঠলো। কেন সে মমতাজ বা খাদিজার কথা শুন্‌লো না ? কেন সেই প্রগল্‌ভ দাম্ভিক তার কথামত যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে তা'কে নিয়ে দূর বনগ্রামে চ'লে এলো না ? তা হ'লে—

সুখময় ভাব্‌লো, সেই কোন্‌ সুদূর পশ্চিম-অঞ্চলে দিল্লী, লাহোর, আগ্রা, অযোধ্যা—সেখান থেকে কোন্‌ দূর বনগ্রাম ? সেকি……যশোর—বনগ্রাম,—না,…তা'র চাইতেও আরো দূরের কোন…………? সম্ভব তাই।…তা'হ'লে—তা'হ'লে—

হা মূর্খ অর্ব্বাচীন সাজাহান!…তোমার জন্যেই—শুধু তোমার, তোমার জন্যেই… মমতাজ, সুখময়ের স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমি বনগ্রামের বুকে একদিন—যে ভাবে, যে বেশেই হোক্‌—আস্‌তে পারেনি। তা' যদি পার্‌তো…তবে কি তার সমাধিসৌধ দুনিয়ার সপ্তাশ্চর্য্যের এক আশ্চর্য্য অমন সুন্দর 'তাজমহল' আজ বনগ্রাম ছেড়ে আগ্রার বুকে বিরাজ কর্‌ত ?…হায়!

সাজাহানের উপর রাগে—দুঃখে—ক্ষোভে সুখময় কী যে কর্ব্বে, কিছুই স্থির কর্‌তে পার্ল্ল না। বইটাকে টেবিলের উপর চিৎ ক'রে ফেলে' রেখে' সাজাহানের প্রেতাত্মার উদ্দেশে সে তার অভ্যস্ত কয়েকটা ইংরেজী গালাগাল বারবার ব্যবহার করতে লাগ্‌লো; আর সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে দাঁতে দাঁত ঘষে' শূন্যের বুকে দু'একটা ঘুষিও চালিয়ে নিল।

হঠাৎ, জান্‌লার ধারের আমগাছটার উপর কর্কশ-কণ্ঠে একটা কাক ডেকে উঠ্‌লো, খা—খা—খা—।



সুখময়ের মনের অবস্থাও তাই। হাতের গোড়ায় পেলে পরে সাজাহানকে সে আজ একেবারে খেয়েই ফেল্‌তো—পাজী, ষ্টুপিড, 'ফুল' কোথাকার!…

নাঃ,—এর একটা প্রতীকার চাই! যেমন করে'ই হোক্‌, এ'র প্রতিশোধ নিতেই হ'বে! অমনি গুম্‌গুম্‌ ক'রে সুখময়ের বুকের ভিতর লক্ষ প্রতিহিংসা গর্জ্জে উঠ্‌লো—প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!

সে আর পার্ল্ল না। তড়াক্‌ করে' লাফিয়ে উঠে' আলমারী খুলে' ঘরে যতগুলি ইণ্ডিয়ান্‌ হিষ্ট্রী আর ভারত-ইতিহাস ছিল, সবগুলি বের করে' নিয়ে তার ভিতরকার সাজাহানের ছবি-গুলি কাঁচি দিয়ে কেটে' একত্র কর্ল্ল।

তার পর একটা সচল দেশ্‌লাইয়ের বাক্স আর সেই প্রতিকৃতিগুলো নিয়ে সরাসর চলে' এলো বাইরের আমগাছতলায়। কোন কথা নেই,—বার্ত্তা নেই—সঙ্গে সঙ্গে—সে গোটা কয়েক দেশ্‌লাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে একে একে ছবিগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিল।

ছবিগুলির কোনটার অর্দ্ধেক, কোনটার সিকি, কোনটার বারো-আনী পরিমাণ যখন পুড়ে গেছে, তখন কয়েকটি সমবয়সী ছেলে তাকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে সেখানে এসে উপস্থিত। এরা কেউ বা তার সঙ্গে এক স্কুলেই পড়ে, কেউ বা অন্যত্র; কেউ বা তা'র সহাধ্যায়ী, কেউ বা নয়; যারা নয় তারাও অনেকে পুরাকালে তার সঙ্গে একত্র পড়্‌তো কোনদিন।

অনন্ত এদের অগ্রণী। তার কাণ্ড দেখে' গম্ভীরভাবেই সে সুধোলো "ব্যাপারটা কি ?"

সুখময় ঘটনাটা সব তাদের ভেঙ্গে বল্‌তেই ফণী ফোঁস করে' বলে' উঠ্‌লো, "সর্ব্বনাশ! ক'রেছিস্‌ কি,—য়্যাঁ ?"

সুখময় বল্ল, "কেন,—কি ক'রেছি ?"

"—মুসলমানের ছেলে, তার উপর দিল্লীর বাদ্‌শা,…তাকে লেগেছিস্‌ তুই অগ্নি-সৎকার কর্ত্তে ? মৌলবীসাহেবেরা যদি একবার কথাটা শোনে তো মজাটা টের পাবে চাঁদ!"

কাঁচুমাচু-মুখে সুখময় বল্লে, "তাইতো,…এখন উপায় ?"

সুধাংশু তার সমাধান করে' দিল, "গোর দে,—শীগ্‌গির গোর দে—"

"—কিন্তু কতকটা যে পোড়ান হ'লো,—তার কি ?"

"—সে তো ইতিহাসেই আছে। আকবরের রাজপুত মহিষীর গর্ভজাত জাহাঙ্গীর বাদ্‌শা তাঁর মাতৃকুল থেকে প্রথম চার-আনী পরিমাণ হিন্দুত্ব পান। তাঁরো আবার পত্নী রাজপুতানী। তাঁর সন্তান সাজাহান তাই আট-আনা আন্দাজ হিন্দু হয়েছিলেন। অতএব শাস্ত্রমতে তাঁর

অর্দ্ধেক আগুন আর অর্দ্ধেক মাটি পাওয়াই উচিত। সুতরাং ভয় কি? শীগ্‌গির গোর দিয়ে ফেল্‌।"

সবাই দেখ্‌লো কথাটা যুক্তিযুক্ত। তাই তারা সবাই মিলে' তখন হল্লা করে' মাটি খুঁড়ে সেখানে অর্দ্ধদগ্ধ সাজাহানের প্রতিকৃতিগুলি কবরস্থ কল্ল।

কিন্তু এতবড় একটা বাদ্‌শার কবর,...তার উপর একটা সমাধি-স্মৃতি স্থাপন না কল্লে তাঁর যে এক বিরাট্‌ অবমাননা করা হয়। কে কর্ব্বে তার প্রতিষ্ঠা,—কেইবা কর্ব্বে তার সে বিপুল ব্যয়ভার বহন? সুখময়দের আর্থিক অবস্থাই অবিশ্যি এখানে সব চাইতে উন্নত। কিন্তু এত বড় একটা মহতী কীর্ত্তির কাছে সে অর্থ কত তুচ্ছ! আর তা'ও তো ঠিক্‌ তার করতলগত নয়; সে যে তার পিতৃদেবতার গুপ্ত ধনাগারের অন্ধকার ভূতল-গহ্বরে! সুতরাং তার আশা দুরাশা।

অতএব এর একমাত্র উপায় হচ্ছে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতানির্ব্বিশেষে হিন্দু মোস্লেম সবার কাছে থেকে চাঁদা তোলা। চাঁদাও আজকাল ওঠে অনেকটা বিজ্ঞাপনের বলে। সেই চাঁদা আদায়ের বিজ্ঞাপনের জন্যেই আমার এই—'সাজাহানের সমাধি' শিশুমহলে লিখে পাঠাতে হ'লো।

আশা করি, দেশের ছোট ছোট ভাইবোনেরা এই মহৎ উদ্দেশ্যের অনুকূলে তাদের যথাশক্তি সাহায্যদানে কার্পণ্য 'না' ক'রে কিছু কিছু 'না' পাঠিয়ে কীর্ত্তিটিকে সত্য সত্যই জীবন্ত করে তুল্‌বে।

---

## মেয়েদের জানা দরকার

কাচের আয়না কিংবা সার্সির উপর রংএর দাগ লাগিলে অনেক সময় সে দাগ উঠিতে চায় না। অল্প একটু স্পিরিট দিয়া ঘসিলেই কিন্তু সে দাগ উঠিয়া যাইবে।

* * * * * *

নূতন কাচের গ্লাস কিনিয়া আনিয়া সেটাকে একদিন ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়া রাখিলে অনেক দিন টিকিবে।

* * * * * *

সেলাইয়ের সূচগুলি যদি এক টুক্‌রা সাবানের মধ্যে বিঁধাইয়া রাখা যায় তবে সেগুলি থাকেও ভাল, সেলাই করিবার সময় চলেও খুব তাড়াতাড়ি।

* * * * * *

চীনামাটীর কিং এনামেলের বাসনে দাগ লাগিলে একটা বোতলের ছিপি লইয়া লবণ জলে খানিকক্ষণ ভিজাইয়া রাখিও। তার পর সেটা দিয়া বাসনের যেখানটায় দাগ পড়িয়াছে সেখানটা ঘসিও।

---

# পরলোকে নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল

রামধনুর পাঠকদের বোধ হয় আর অজানা নাই—যে বাঙ্গালীর প্রিয় নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু আর বাঁচিয়া নাই। হাসির সে অফুরন্ত ভাণ্ডার চিরকালের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

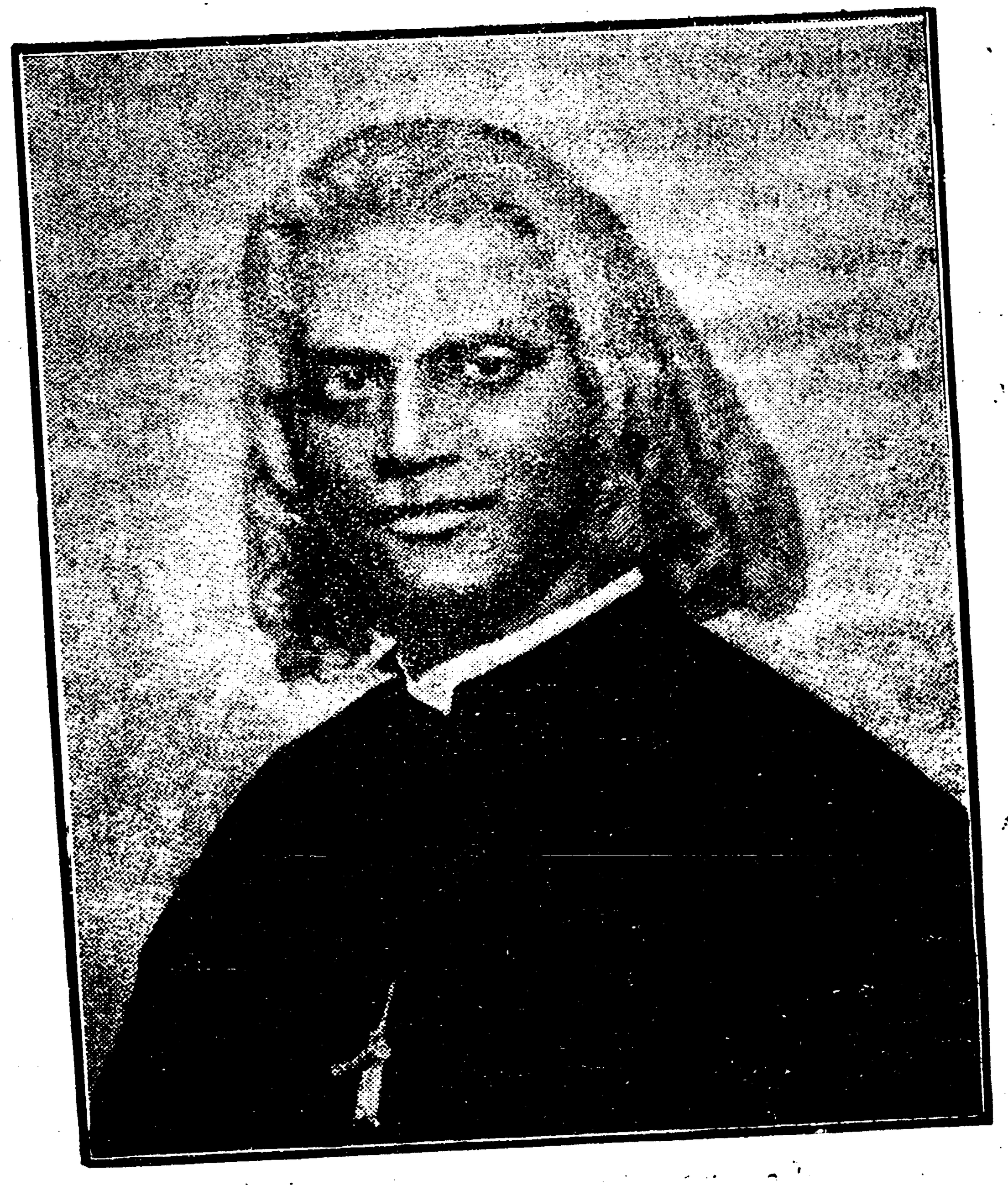

রসরাজ অমৃতলাল বসু

অমৃতলালের নাম তোমাদের অনেকেই নিশ্চয় জান। বাঙ্গালীর দুঃখময় জীবনের মধ্যে তিনি হাসির দূত হইয়া আসিয়াছিলেন। ছেলেবেলা হইতেই অভিনয়ের দিকে তাঁর ভয়ানক ঝোঁক ছিল,—আর এই অভিনেতা হিসাবেই প্রথম তিনি আমাদের কাছে পরিচিত হন। বিখ্যাত ষ্টার থিয়েটারের তিনি এক রকম কর্ত্তা ছিলেন বলিলেই চলে।

অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাংলা সাহিত্যের আসরে নামেন। সেখানেও তিনি কম ছিলেন না। বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁহার আসন ছিল। তাঁর লেখা সামাজিক, পৌরাণিক, বিশেষতঃ হাসির নাটক এবং কবিতা সাহিত্যে তাঁর অমূল্য দান। বছর কয়েক আগে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে অমৃতলাল সাহিত্য-বিভাগে সভাপতি হইয়াছিলেন।

মনে পড়ে তিনি কৌতুকচ্ছলে বলিয়াছিলেন—তিনি সভার পতি, কিন্তু গহনা-পত্র কিছু দিতে পারিবেন না, সভা তাঁহাকে পছন্দ না করিলে "পত্যান্তর" গ্রহণ করিতে পারেন।

সাহিত্য এবং অভিনয় ছাড়া অন্যান্য কাজেও এই লোকটি কম যাইতেন না; নানা জনহিতকর কাজে তিনি যোগ দিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও শ্যামবাজার এ ভি স্কুল চালাইবার ভার লইয়াছিলেন; মাঝে মাঝে সেখানে তিনি ছাত্রদের পড়াইতেন।

অমৃতলাল আজ নাই, কিন্তু বাঙ্গালীর কাছে চিরকাল হাস্যরসিক বলিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন। শেষ বয়সেও তাঁহার রসের স্রোতে একটুও ভাঁটা পড়ে নাই। ৭২।৭৩ বছরের বৃদ্ধ যখন বায়স্কোপে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' কৃষ্ণকান্ত সাজিয়া নামিলেন তখন আশ্চর্য্য হয় নাই এমন লোক নাই। মাসখানেক আগেও ভবানীপুরে এক সভায় তরুণদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—তাঁহার হৃদয়টা এখনও তরুণই আছে। মৃত্যুর ২।৩ ঘণ্টা আগেও তাঁহার রসিকতা যায় নাই। আমাদের একটি বন্ধু তাঁকে দেখিতে গেলে অমৃতলাল তাকে বলিলেন "আজ ডেথ্ রিহার্সাল দিচ্ছি।" মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ৭৭ বছর হইয়াছিল।

---

# কৃপণের সাজা

( শ্রী..................)

অনেক দিন আগে গ্রীসদেশে একটি লোক বাস করিত। লোকটির টাকা ছিল বিস্তর, কিন্তু তার মত কৃপণ সে অঞ্চলে আর একটিও ছিল না। এক একটি টাকাকে যেন তার এক এক ফোঁটা রক্ত বলিয়া মনে হইত। একটি পয়সা কেহ তাহাকে কোন দিন খরচ করিতে দেখে নাই।

চিরদিন কেহই বাঁচে না, কৃপণও একদিন মারা গেল। মৃত্যুর পর যমলোকে যাইতে হইলে বৈতরিণী নদী পার হইতে হয়। খেয়ার মাঝি আসিয়া কৃপণের কাছে পারের কড়ি চাহিল। পয়সা? ওঃ বাবা, কৃপণের মাথায় টনক নড়িল। পয়সা সে কিছুতেই দিতে পারিবে না, অথচ বৈতরিণী পার না হইলেই নয়। অনেক ভাবিয়া হঠাৎ সে ঝুপ করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, তার পর সাঁতরাইয়া ওপারে গিয়া উঠিল।

এদিকে পাতালপুরীতে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। সকলের মুখেই এক কথা—"আজ



এক কৃপণ এক কাণ্ড করে বসেছে—পারের কড়ি না দিয়েই বৈতরিণী পার হয়ে এসেছে। এ যে ভয়ানক কথা! এর দেখাদেখি সবাই যদি পারের কড়ি ফাঁকি দিতে আরম্ভ করে তবে যমলোক চলবে কেমন করে? আয় হবে কোথ' থেকে?"

তখনই পাতালের বিচারকেরা বিচার করিতে বসিয়া গেলেন। শাস্তিটা বেশ একটু গুরু হওয়া দরকার; কাজেই নানা জল্পনা চলিতে লাগিল।

একজন বলিলেন "একে প্রমিথিয়াসের মত শিকল দিয়ে পাহাড়ের ওপর বেঁধে রাখা হোক্।" প্রমিথিয়াস সহজ লোক ছিলেন না। স্বর্গ হইতে আগুন চুরি করিয়া পৃথিবীর লোকদের আনিয়া দিবার অপরাধে তাঁহার শাস্তি হয় যে—তাঁহাকে পাহাড়ের চূড়ায় শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইবে আর এক শকুনি আসিয়া রোজ রোজ তাঁহার যকৃৎ কুড়িয়া কুড়িয়া খাইবে। যকৃৎ রোজ গজাইবে, শকুনিও রোজ আসিয়া সেটা খাইবে।

আর একজন বলিলেন—"তার চেয়ে বরঞ্চ একে সিসিফাসের মত পাথর গড়িয়ে তুলতে দেওয়া হোক্।" সিসিফাস আর এক জন পাপী। প্রকাণ্ড ভারী গোল একটা পাথর ঢালু পাহাড়ের উপর তুলিবার ভার তাহার উপর দেওয়া হইয়াছে—পাথর তুলিতে পারিলেই তাহার ছুটী। সিসিফাস্ রোজ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া পাথরখানা পাহাড়ের প্রায় চূড়ার কাছাকাছি তোলে তার পর শেষ মুহূর্ত্তে সেটা গড়াইয়া আবার একেবারে নীচে পড়িয়া যায়। বছরের পর বছর কাটিয়া যায়, পাথর আর উপরে উঠে না।

আরও কয়েক জন বিচারক গোটা কয়েক শাস্তির কথা তুলিলেন। কিন্তু কোনটাই সকলের মনঃপূত হইল না।

হঠাৎ প্রধান বিচারক মাইনস্ উঠিয়া বলিলেন—"এক কাজ করা যাক্, একে আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও, সেখানে গিয়ে ও দেখুক যে ওর উত্তরাধিকারীরা ওর টাকা দিয়ে কি করছে; সেই হবে ওর সবচেয়ে বড় শাস্তি।" *

---

* ফরাসী গল্প।

## গাঁয়ের চাষী

( শ্রীজ্যোৎস্না দেবী, লক্ষ্মীপুর )

গাঁয়ের চাষী ভাই !
তোমার মত এমন্ সুখী কোথাও বুঝি নাই।
সরল তোমার মনের মাঝে নাইকো কুটিলতা,
আলস্য নাই, নাইকো তোমার শ্রমের কাতরতা।
স্বাস্থ্য আছে সবল দেহে, শান্তি আছে প্রাণে ;
দিনের শ্রান্তি রাতের বেলায় গভীর নিদ্রা আনে।
উচ্চ আশা হয়তো বা নাই, নাই হতাশার ব্যথা,
কয় বিঘা ভুঁই নিয়েই তোমার সকল আকুলতা।
সহজ জীবন ; বসন ভূষণ তেমন কিছুই নয়,
মোটা ভাত আর মোটা কাপড়—তাতেই তোমার হয়।
বলে বলুক চাষা
আমি দেখি সবার চেয়ে তুমিই আছ খাসা।
চোখ জুড়ান বাংলা দেশের শস্য-শ্যামল মাঠে,
ক্ষেতের মাঝে ক্ষেতের কাজে সারাটা দিন কাটে।
বিজ্‌লী বাতি, বিজ্‌লী পাখা হয়তো দেখ নাই,
সকাল সাঁঝে মুক্তবাতাস তোমার আছে ভাই।
দেশের যাহা ঋদ্ধি তাহা আনে তোমার হলে,
সোনার বাংলা—সোনার ক্ষেতে সোনার ফসল ফলে।



দেশের লক্ষ্মী তুমিই জাগাও, সীতায় জাগে সীতা,
অন্ন যোগাও, পণ্য যোগাও, তুমি সবার পিতা।
মধুর শ্রীতে ভরা
খড়ের ছাওয়া কুটিরখানি শান্তি সুখে ঘেরা।
অরুণ আলো, চাঁদের হাসি তোমার আঙ্গিনায়
বনের পাখী আড়াল থেকে মধুর গীতি গায়।
তোমার স্বচ্ছ পুকুর-জলে পদ্ম আছে ফুটি,
রং বেরংএর মাছগুলি সব কর্‌ছে ছুটাছুটি।
ঘরের পাশে বাঁশের মাচায় লাউএর লতা দোলে,
কুম্‌ড়ো লতায় চালটা ভরা—কুম্‌ড়ো কত ফলে।
দুধেরও ত' নাইকো অভাব, কামধেনু দুই গাই,
শাক হ'য়েছে আর এক পাশে, ভাবনা তোমার নাই।
তুমিই বোঝ, চাষী,
কত মধুর ঘরের মাঝে ছেলে মেয়ের হাসি।
ক্লান্ত দেহে সন্ধ্যাকালে যখন আস ফিরে,
আবেগ ভরে ছেলে-মেয়ে জড়িয়ে তোমা ধরে।
হয়তো তোমার জীবনে নাই কিছুই স্মরণীয়,
তবু ভাবি তোমার জীবন শ্রেষ্ঠ বরণীয়।
নিরক্ষর বা হলেই তুমি, তোমার আছে জ্ঞান,
তোমার ধর্ম্ম তুমিই রাখ, তোমার আছে প্রাণ।
হিন্দু তুমি, তুলসী-তলে নিত্য প্রণাম কর ;
মুসলমান,—সকাল সাঁঝে নিত্য নমাজ পড়॥

---

## চুমো

( কুমারী উষারাণী দেবী, পিরোজপুর )

ফুল-পরীদের আবেশ-মাথা
এই যে মিঠে চুমো,
দেব তোমায়, এস খোকন্
আমার বুকে ঘুমো।

বলবো তোমায় রূপকথাটীর
সেই যে স্বপন পুরী ;
আধেক রাতে রাজকুমারের
রাজকন্যা চুরি ।
ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্ আকাশ তলে
পরীদলের খেলা ;
সাত সাগরের সেঁচা মাণিক
পড়ছে চাঁদের মেলা ।
বলবো তোরে নীল সাগরে
মৎস্য-রাজের কথা ;
পাতালপুরে যক্ষী বুড়ীর
মায়া রাজ্য পাতা ।
বলবো তোরে ফুল-পরীদের
আবেশ-মাখা বাণী ;
সোণার খাটে ঘুমিয়েছিলো
স্বপন দেশের রাণী ।
বলবো তোরে সোণার গাছে
হীরা চুণীর ডালে
যেথায় বসে সবুজ পাখী
রাধা কৃষ্ণ বলে ।
সাত ভাই বোন পারুল চাঁপা
পারলো না কেউ ছুঁতে,
ছাইয়ের গাদায় সৎ মায়েরা
রাখলো তাদের পুঁতে ।

বলবো তোরে রাক্ষসীদের
কত রকম মায়া,
পাথর করে' রাখলো তারা
শত রাজার কায়া ।
হীরার ভাঁটে চুণীর ঝালর
ঘেরা খাটের বুক ;
পদ্মফুলে ফুটে ছিল
রাজকন্যার মুখ ।
দেখছে বসে রাজার ছেলে
রঙ্গীন চক্ষু দিয়ে,
সোণার কাঠী ছুঁইয়ে আবার
করল তারে বিয়ে ।
আরও কতো আবেশ-মাখা
'অচিন অভিন' পুরী ।
বলবো তোরে ভোমরা বধূর
ফুলকুমারী চুরি—
হাসলে সোণা, কাঁদলে হীরা
পড়তো মেয়ের মুখে ;
ফল খেয়ে নাক লম্বা হোল
ঝরলো আঁখি দুখে ।
আয়রে যাদু, বলবো তোরে
দেব মিঠে চুমো ;
আয়রে আমার মাণিক সোণা,
আমার বুকে ঘুমো ।

---

## অসভ্যদের পাখী শিকার

নীচের ছবিখানা দেখ। একটি লোক লম্বা নলের এক দিকে ফুঁ দিতেছে। নলটি বড় সহজ নয়—নলের অন্য দিকে এক রকম বিষাক্ত গাছের রস মাখান ফলক বসান আছে। ফুঁ দিলেই সেটা নিঃশব্দে বাহির হইয়া জোরে আকাশের দিকে চলিয়া যায়। আর গাছের উপর পাখী থাকিলে সে টের পাইবার আগেই মারা পড়ে।

অসভ্যদের পাখী শিকার

## মাকড়সার জাল

এক একটী মাকড়সা নাকি অন্ততঃ ৩৪,৮০০ গজ জাল বুনিতে পারে। কিন্তু মাকড়সার জাল এত হাল্কা যে আধ সের জাল বুনিতে ৭ লক্ষ মাকড়সার দরকার হয়।

## জাপানী বাজনা

আমাদের দেশে যেমন বীণা, সেতার, তানপূরা প্রভৃতি বাজনা আছে জাপানেও

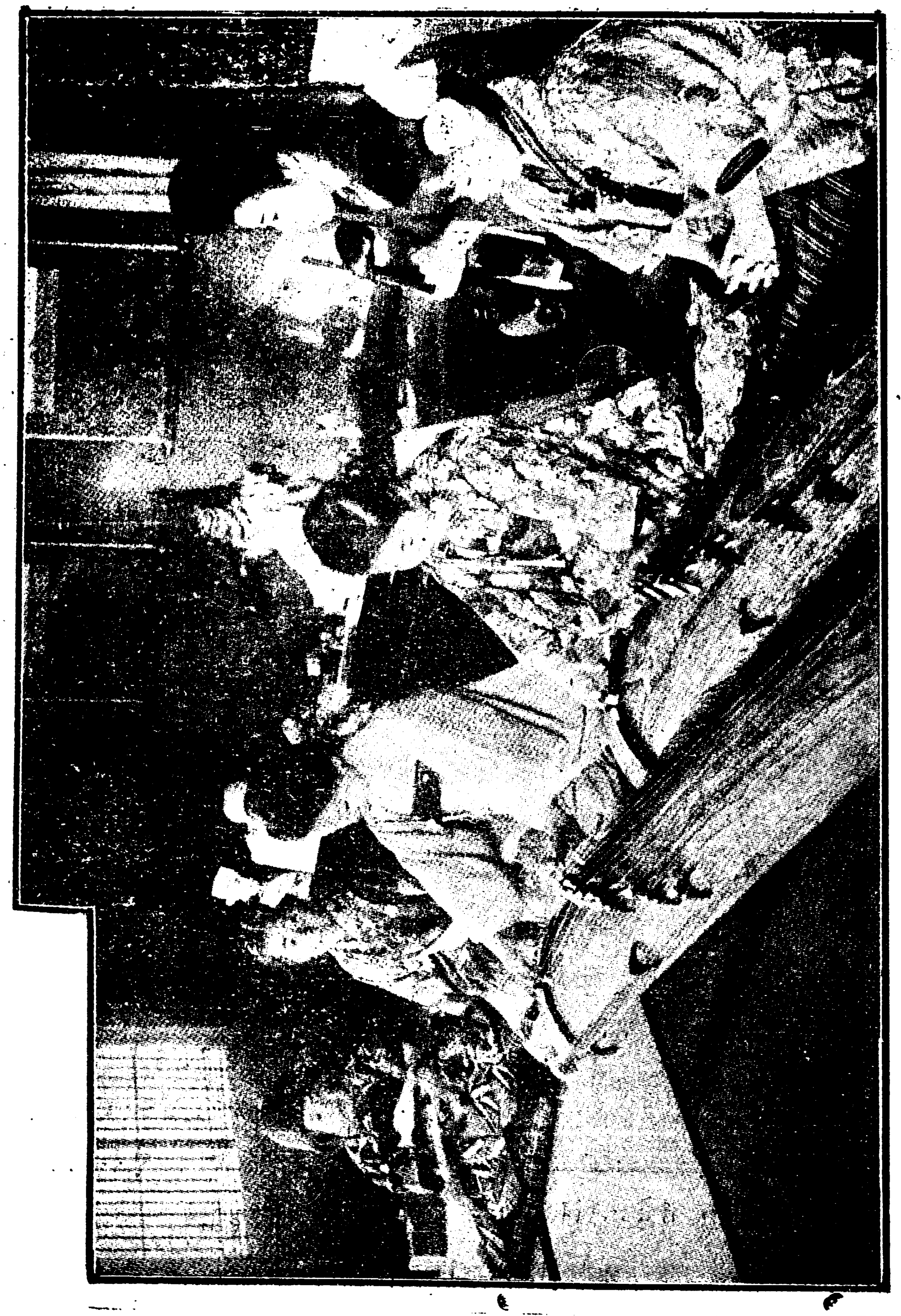

কয়েকটী জাপানী মেয়ে কোটো বাজাইতেছে।



সেই রকম এক ধরণের তারের বাদ্যযন্ত্র আছে। যন্ত্রটির নাম "কোটো"। জাপানে কোটোর ভয়ানক কদর। ছবিতে দেখ কয়েকটি জাপানী মেয়ে কেমন কোটো বাজাইতেছে।

## আলো হইতে চিনি

ডাঃ বেলী নামে লিভারপুলের এক বৈজ্ঞানিক এক অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করিয়াছেন। এক রকম গ্যাসের উপর খুব তেজঃ সম্পন্ন আলো ফেলিয়া তিনি চিনি তৈরী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

## ডাক্তারীর বাহাদুরী

বোষ্টন সহরের এক ডাক্তার অস্ত্র করিয়া একটি স্ত্রীলোকের মুখ অদ্ভুতভাবে বদ্‌লাইয়া দিয়াছেন। মুখের ডান দিক্ দেখিলে মনে হয় মেয়েটির বয়স ৬০ বছর, বাঁ দিক্ দেখিলে মনে হয়—না, ৬০ নয়, বড় জোর ত্রিশ।

## তিমির ব্যবসা

এবারকার রামধনুতে তিমির গল্প পড়িয়াছ। তিমির ব্যবসা আজকাল বেশ একটা লাভজনক ব্যবসা। নিউজিলণ্ডে রস্ সি হোয়েলিং কোম্পানি বলিয়া একটা দল আছে। তাহারা তিমির শিকার করিয়া তাহার ব্যবসা করে। গেল ৬ বছরের মধ্যে তাহারা পাঁচ হাজার তিমি মারিয়াছে।

## ৫৪ বছরে ম্যাট্রিক পাশ

এবার দলিল বাজা সরকার নামে একটি মুসলমান ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। তাহার বয়স মাত্র ৫৪ বছর। তাহার ছেলেরা লেখাপড়ায় ভয়ানক অমনোযোগী, তাই বুড়া তাহাদের দেখাইবার জন্য এই বয়সে পরীক্ষা দিয়াছে। লোকটির বাড়ী সিরাজগঞ্জের কাছে মেঘলা গ্রামে। গেল বছরও সে পরীক্ষা দিয়াছিল, কিন্তু পাশ করিতে পারে নাই, তাই এবার আবার পরীক্ষা। লোকটির ধৈর্য্য দেখিয়াছ?

---

# গত মাসের ধাঁধার উত্তর

সিংহ, গাই, বেজী, কুমীর, গাধা, বানর, ছাগ, গো, ময়না।

# উত্তর দাতাদের নাম

## যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন ঃ—

অরুণকুমার ঘোষ (আসানসোল), লক্ষ্মীময়ী দেবী (সাওগাঁ), রবীন্দ্রকুমার বসু (হাতুয়া), দীনেন, মুকুল ও খাটু (ইটালি, কলিকাতা), কল্যাণেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), সুনীতি দেবী (ভাগলপুর), বরেন্দ্রকুমার পাল (বাসরা-বাদ, কটক), কীর্ত্তীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও ভোঁন্দু (বরিশাল), নারায়ণদাস নন্দী (নবদ্বীপ), মাখনলাল অধিকারী (কিশোর-গঞ্জ), দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (চন্দননগর), বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় (বালী), ভ্রাতৃসঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ (চাপাই, নবাবগঞ্জ,) গোকুলানন্দ দাস (রংপুর), সনৎকুমার মজুমদার (কালিম্পং), গোলকেন্দ্রনাথ ঘোষ, অমূল্য, অজিত, নন্দ, নিতাই, ভূপেন (মধ্য বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম, জয়দেবপুর), পরমেশ, অরুণা ও প্রীতিকা সরকার (কালিম্পং), তোফাজল-হোসেন, বজলুল হক্, ইদ্রিস আলি, কোরবাণ আলি, সতীশ, কিরণ, গুরুদাস, কৃষ্ণ, অতুল (কামার জানি,) বনবিহারী রায়, সুরেন্দ্রচন্দ্র সাহা ( গফরগাঁও ), শিবানী দেবী ও রামকৃষ্ণ সেন ( পুষা ), দ্বিজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (বহরমপুর), শান্তিপ্রসাদ নাগ, নৃপেন্দ্র (গাইবাঁধা),শিবপদ সেনগুপ্ত (বাইশরাশি),মনিষা সেন (গৌহাটী), সদানন্দ সাহা, হীরালাল, অমরেন্দ্র (মেদিনীপুর), প্রিয়দাস বড়ুয়া (আকিয়াব), সরোজমোহন চট্টোপাধ্যায় (এলাহাবাদ), পুরুষোত্তম, যুবসঙ্ঘ ও সাধারণ পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ, কালিদাস পাঠমন্দির ও অনুশীলন—সঙ্ঘের সভ্যগণ (কণেশ্বর), প্রতুলচন্দ্র ঘোষ (রায়গঞ্জ) নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ধূলগ্রাম), রতনমণি ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর), দ্বিজেন, মণি, ইন্দু, স্নেহময় ও সুখময় আড়াই হাজার), সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বহরমপুর), শান্তিরাণী পাল (শ্যামবাজার, কলিকাতা )।

## যাঁহারা আংশিক উত্তর দিয়াছেন ঃ—

অনিলকুমার সরকার (হাওড়া), সর্ব্বাধিকারী পারিবারিক লাইব্রেরীর সভ্যগণ (ভবানীপুর), সুধা ও মণিকা সেন (ডিব্রুগড়), মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় (কটক), পতিতপাবন দাশগুপ্ত (লালবাগ, মুর্শিদাবাদ), দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় (চুঁচুড়া), উমাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), মনোরমা দেবী (জলপাইগুড়ী), শৈলেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (জলপাইগুড়ী), গুণেন্দ্রমোহন সিংহ (ভবানীপুর), মলিন সেন (নোয়াখালী), নিরুপমা দেবী (জলপাইগুড়ী), সুধাংশুবালা মজুমদার (জলপাইগুড়ী), জ্যোৎস্নাকুমারী দাস (কাসারিয়), কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় (লাহোর), অনুপমা লাহিড়ী (হেনজাডা, বর্ম্মা), সুধীরচন্দ্র রায় (ভবানীপুর). মিস্ মাহমুদা হোসেন (টাঙ্গাইল), হরিদাস বারিক, সৌদামিনী, শ্রীবাস (কমলপুর,) ইন্দুবিকাশ দত্ত (শিবসাগর), বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী (কানুনগোর পাড়া), লক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী (শ্রীরামপুর), অপর্ণা, টুকু, ফুল, স্বদেশ, শান্তি, অজিত, নিখিল, প্রমোদ (ভোলা), ইন্দিরা, অমিয়া, অশোক ও অজিত মিত্র, অমিতাভ আচার্য্য চৌধুরী ও জয়ন্তী দেবী (মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ), অনিলবরণ মজুমদার (চাইবাসা), রাজলক্ষ্মী দাসী, মণ্টু, গুগু, নণ্টু, ঝুণ্টু (আকুই বাঁকুড়া), মদনকুমার চট্টোপাধ্যায় (বোয়ালমারি, ফরিদপুর), প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত (দিনাজপুর), টুনু ও তাহার বন্ধুরা (সৈদপুর, রংপুর,) সুধাংশুকুমার দত্ত (জব্বলপুর) নিরঞ্জন, পরেশ,রমণী, কামাখ্যা দেব (কুমিল্লা) বাণীকান্ত ভট্টাচার্য্য, উষা, উমা, বিমান (গড়পাড়, কলিকাতা) বয়েজ লাইব্রেরীর সভ্যগণ (দ্বিপাড়া, ঢাকা), জ্যোৎস্না দেবী (লক্ষ্মীপুর), মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (কালীঘাট)।

---

# নূতন ধাঁধা

( ১ )

কোন্ জিনিষটা কাউকে দিয়ে আবার তা'রাখা যেতে পারে ?

শ্রীসুনীলবরণ রায়।



( ২ )

সুরেশ তার দিদির সঙ্গে বাজী রেখেছে—সে হেঁটে নতুনগঞ্জ থেকে কালিনগর যাবে। ন'দিনের মধ্যে তার পৌছান চাই—রাস্তা কিন্তু কম নয়, ঠিক ১১৭ মাইল। রবিবার সকালে কিছু খেয়ে নিয়ে সুরেশ রওনা হ'ল। সেদিনটা হেঁটে তার মনে হ'ল—এত কম হাঁটলে সে সময় মত পৌছুতে পারবে না। পরদিন তাই সে প্রথম দিন যতটা হেঁটেছিল তার চাইতে এক মাইল বেশী হাঁট্‌ল। সেদিনটার শেষেও তার মনে হ'ল—নাঃ, বড্ড কম হাঁটা হচ্ছে; তার পরের দিন সে আর এক মাইল পথ বেশী হাঁট্‌ল। এমনি করে রোজই সে আগের দিনের চাইতে এক মাইল করে বেশী রাস্তা হাঁটতে আরম্ভ করল। পরের সপ্তাহের সোমবার বিকেলে সে কালিনগর পৌছে গেল। কাজেই দিদি বেচারীকে শেষ পর্য্যন্ত বাজী হারতে হ'ল। তোমরা বল দেখি সুরেশ কোন্ দিন কতখানি পথ হেঁটেছিল?

---

[ ৩৩৭ পৃষ্ঠার তিমির ব্লক্‌খানি 'প্রবাসী'র ও সন্দেশের ব্লক্ ২ খানি 'মানসী ও মর্ম্মবাণীর' সৌজন্যে প্রাপ্ত ]

# রামধনু পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

যাহাতে প্রত্যেক অল্প বয়সের গ্রাহক গ্রাহিকাই এবারকার প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারে সেজন্য আমরা তিনটি বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা দিলাম। যাহার খুসী সে একটি, দু'টি কিংবা ইচ্ছা করিলে তিনটিতেই যোগ দিতে পারিবে। প্রত্যেক বিষয়ে আলাদা ভাবে পুরস্কার দেওয়া হইবে। কেহ এক বিষয়ে পুরস্কার পাইলেও অন্য বিষয়ে পাইতে পারিবে।

কেবলমাত্র রামধনুর গ্রাহক-গ্রাহিকারাই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারিবে। যাহারা গ্রাহক নয় তাহারা ইচ্ছা করিলে গ্রাহক হইয়া প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারে। প্রতিযোগীর বয়স ষোল বছরের বেশী না হয়। প্রত্যেক লেখার সঙ্গে নিজের গ্রাহক নম্বর চাই ( কোন লাইব্রেরী কিংবা স্কুলের গ্রাহক নম্বর দিলে চলিবে না )। খামের উপর "প্রতিযোগিতার লেখা" কথাটি লিখিয়া দিতে হইবে। লেখা যে গ্রাহকের নিজের তাহা অভিভাবককে দিয়া লিখাইয়া লইতে হইবে।

## এবার সবশুদ্ধ ১২টি পুরস্কার দেওয়া হইবে:

| | | | |
|---|---|---|---|
| তিন বিষয়ে তিনটি | ১ম পুরস্কার—প্রত্যেকটী— | ৩্ | দামের বই |
| | ২য় পুরস্কার— | ” ২্ | দামের বই |
| ” ” ৬টি | ৩য় ও ৪র্থ পুরস্কার | ” ১্ | দামের বই |

### ১ম বিষয় ঃ—

রামমোহন রায়ের সময় ( ১৭৭৪ সন ) হইতে এ পর্য্যন্ত বাংলাদেশে যত বড় বড় লোক জন্মিয়াছেন ( জীবিত ও মৃত ) তাঁদের ২০ জনের নাম পর পর ( কে সব চেয়ে বড়, কে ২য়,

কে ৩য় এমনিভাবে ) দিতে হইবে। সমস্ত ভোট লইয়া আমরা একটা তালিকা প্রস্তুত করিব। যাহার তালিকা ঐ তালিকার সব চেয়ে কাছাকাছি হইবে সে ১ম পুরস্কার পাইবে, তার পর ২য়, ৩য় প্রভৃতি।

### ২য় বিষয় :—

"কারা বড়—ছেলেরা না মেয়েরা ?"

এই বিষয়ে একটি সরস রচনা চাই। কাগজের একদিকে লিখিতে হইবে। লেখা যেন রামধনুর ২ পৃষ্ঠার বেশী না হয়।

### ৩য় বিষয় :—

নীচের তিনটি প্রবাদের যে কোন একটি লইয়া একটি ব্যঙ্গচিত্র আঁকিতে হইবে।

( ক ) তোর শিল তোর নোড়া, তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।

( খ ) কারও সর্ব্বনাশ, কারও পৌষ মাস।

( গ ) হাতী চল্‌তা রাস্তা পর, কুত্তা ফুকারতা হাজার।

রঙ্গীন, এক রংএর, পেন্সিলস্কেচ, কিংবা রেখাচিত্র যাহা খুসী পাঠাইলেই হইবে। লেখা বা ছবি প্রকাশের উপযুক্ত বিবেচিত হইলে রামধনুতে বাহির হইবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল সম্বন্ধে রামধনুর সম্পাদকের মতই চূড়ান্ত হইবে। লেখা আগামী কার্ত্তিক মাসের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌছান চাই। লেখা ডাকে খোয়া গেলে কি পৌছিতে বিলম্ব হইলে আমরা দায়ী নই। রেজিষ্ট্রী করিয়া পাঠাইলেই ভাল হয়।

ঠিকানা :—সম্পাদক, রামধনু,
১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা


রামধনু সম্পাদক শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রণীত ছেলেমেয়েদের উপহারের দু'খানা সুন্দর বই

## ( ১ ) মহাভারতের গল্পগুচ্ছ ( ১ম খণ্ড )

সংস্কৃত না জানিয়াও মহাভারতের সুন্দর সুন্দর গল্প ইহাতে পাইবে, অনেক ছবি আছে। মূল্য ॥০ আনা, বুকপোষ্টে ॥৴১০ পড়িবে।

## (২) দিগ্বিজয়ী বীর (মহাবীর আলেক্‌জান্দারের জীবন-কথা)

আজকালকার আজগুবি গল্পের দিনে একজন সত্যিকারের বীরের অদ্ভুত জীবনের কথা ইহাতে পাইবে। কতক গুলি আর্ট পেপারে ছাপা ছবি ও একখানি মানচিত্র আছে।

মূল্য ॥০ আনা, বুকপোষ্টে ॥৴০ পড়িবে।

প্রাপ্তিস্থান—রামধনু কার্য্যালয় ও কলিকাতার প্রধান প্রধান বাংলা পুস্তকের দোকান।


রামধনু—

বীরাঙ্গনা

শিল্পী—শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত ] [ গোল্ড্‌কুইন কোম্পানীর সৌজন্যে

( শেষ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )

কে ৩য় এমনিভাবে ) দিতে হইবে। সমস্ত ভোট লইয়া আমরা একটা তালিকা প্রস্তুত করিব। যাহার তালিকা ঐ তালিকার সব চেয়ে কাছাকাছি হইবে সে ১ম পুস্কার পাইবে, তার পর ২য়, ৩য় প্রভৃতি।

## ২য় বিষয় :—

“কারা বড়—ছেলেরা না মেয়েরা ?”

এই বিষয়ে একটি সরস রচনা চাই। কাগজের একদিকে লিখিতে হইবে। লেখা যেন রামধনুর ২ পৃষ্ঠার বেশী না হয়।

## ৩য় বিষয় :—

নীচের তিনটি প্রবাদের যে কোন একটি লইয়া একটি ব্যঙ্গচিত্র আঁকিতে হইবে।

( ক ) তোর শিল তোর নোড়া, তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।
( খ ) কারও সর্ব্বনাশ, কারও পৌষ মাস।
( গ ) হাতী চল্‌তা রাস্তা পর, কুত্তা ফুকারতা হাজার।

রঙ্গীন, এক রংএর, পেন্সিলস্কেচ, কিংবা রেখাচিত্র যাহা খুসী পাঠাইলেই হইবে। লেখা বা ছবি প্রকাশের উপযুক্ত বিবেচিত হইলে রামধনুতে বাহির হইবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল সম্বন্ধে রামধনুর সম্পাদকের মতই চূড়ান্ত হইবে। লেখা আগামী কার্ত্তিক মাসের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌছান চাই। লেখা ডাকে খোয়া গেলে কি পৌছিতে বিলম্ব হইলে আমরা দায়ী নই। রেজিষ্ট্রী করিয়া পাঠাইলেই ভাল হয়।

ঠিকানা :—সম্পাদক, রামধনু,
১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

---

রামধনু সম্পাদক শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রণীত ছেলেমেয়েদের উপহারের দু'খানা সুন্দর বই

( ১ ) মহাভারতের গল্পগুচ্ছ ( ১ম খণ্ড )

সংস্কৃত না জানিয়াও মহাভারতের সুন্দর সুন্দর গল্প ইহাতে পাইবে, অনেক ছবি আছে। মূল্য ॥০ আনা, বুকপোষ্টে ॥/১০ পড়িবে।

(২) দিগ্বিজয়ী বীর (মহাবীর আলেক্‌জান্দারের জীবন-কথা)

আজকালকার আজগুবি গল্পের দিনে একজন সত্যিকারের বীরের অদ্ভুত জীবনের কথা ইহাতে পাইবে। কতক গুলি আর্ট পেপারে ছাপা ছবি ও একখানি মানচিত্র আছে।

মূল্য ॥০ আনা, বুকপোষ্টে ॥/০ পড়িবে।

প্রাপ্তিস্থান—রামধনু কার্য্যালয় ও কলিকাতার প্রধান প্রধান বাংলা পুস্তকের দোকান।

রামধনু—

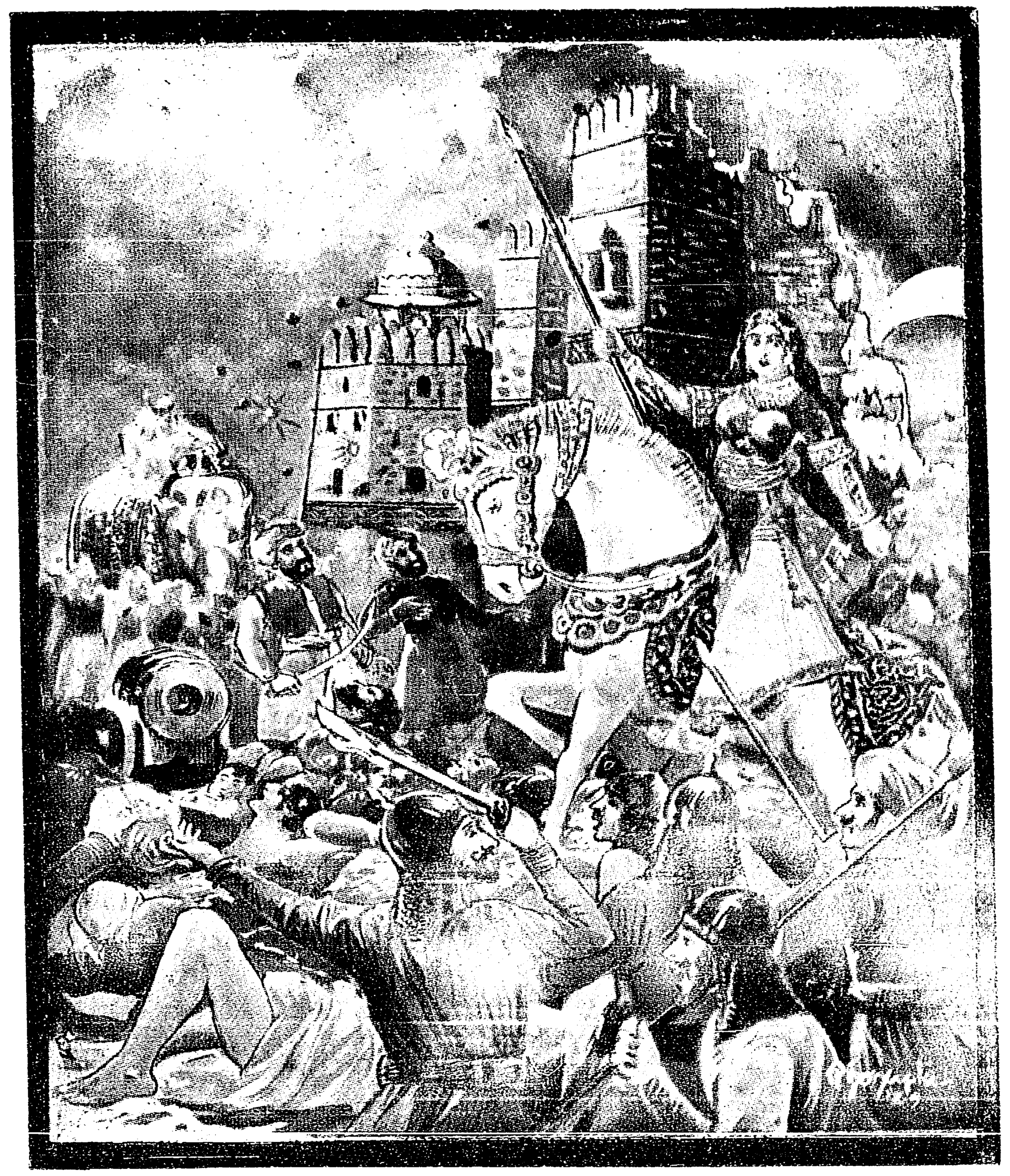

বীরাঙ্গনা

শিল্পী—শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত ] [ গোল্ড্ কুইন কোম্পানীর সৌজন্যে

( শেষ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

২য় বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৩৬ { ৮ম সংখ্যা

## রামধনু

[ শ্রীনবজীবন ঘোষ ]

নন্দ বাবুর খোকা
বেজায় সে এক-রোখা,
বায়না যা ধরে তাই পায়।
না পেলে সে সুর ভাঁজে,
শুনে গাধা মরে লাজে,
পড়শীর তিষ্ঠান দায় ॥

রামধনু দেখে তার
সুরু হল চীৎকার
বারবেলা বৃহস্পতির।

খাইয়া নভেল ফেলে
দেখিনু সুধীর ছেলে
আঙ্গিনায় জমায়েছে ভিড় ॥

সান্ত্বনা দেয় সবে,
কাঁদে খোকা ভীম-রবে,
হার মানে ধর্ম্মের ষাঁড় ।
ঘণ্টা দু'তিন ধ'রে
চেষ্টা বৃথাই ক'রে,
মাসী-পিসী সবে মানে হার ॥

গ্রামের ঠাকুরদাদা
কহে "তোরা সব গাধা,
আয়না একটা দেখি আন ।"
খোকা দেখে আয়নায়
রামধনু ধরা যায়,
থেমে গেল অশ্রুর বান ॥

——:※:——

## যমজ ছেলে

( শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্-সি )

ছেলে বেলায় একটা ছড়া পড়িয়াছিলাম—

"আকারে প্রকারে রামু ও শ্যামুতে কিছুই প্রভেদ নাই
গরীবের ঘরে জনমিয়া ছিল দুইটি যমজ ভাই ।"

দু'টি ভাইই ছিল অবিকল এক রকম। স্কুলের গুরুমহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীতে বাপ-মা—কেহই চিনিয়া উঠিতে পারিতেন না—কোন্‌টি রামু,



কোন্‌টি শ্যামু ! ফলে রামুর অসুখ হইলে শ্যামুকে জোর করিয়া ধরিয়া ওষুধ খাওয়াইয়া দেওয়া হইত, আর শ্যামু পড়া না পারিলে বেত পড়িত রামুর ঘাড়ে। গল্পের শেষটা কিন্তু আরও ভয়ানক । একদিন ভাই দুটির একজন হঠাৎ সাপের কামড়ে মারা গেল, আত্মীয়েরা ভুল করিয়া আর একজনকে ধরিয়া শ্মশানে পোড়াইয়া আসিল ।

অবশ্য এত বড় ভুলটা আর সত্য সত্যই হয় না, কিন্তু যমজ ভাইদের লইয়া ছোট খাট ভুল যে অনেক সময়ই হয় একথা বোধ হয় অনেকেই জান ;—কাহারও কাহারও চেহারায় এত আশ্চর্য্য রকম মিল থাকে। আমাদেরই ত' একটি বন্ধু আছে তার যমজ ভাইটিকে লইয়া আমরা প্রায়ই বিপদে পড়িতাম। আমাদের এক প্রফেসার প্রায়ই ট্রামে কি বাসে সেই বন্ধুর ভাইটির সাথে দেখা হইলে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিতেন, আর নানা রকম প্রশ্ন করিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতেন ; অথচ সে বেচারী তাঁহার ছাত্রও নয়, তাঁহার সাথে তাহার কোনদিন পরিচয়ও ছিল না।

দু'টী কি আলাদা মানুষ ?

এ রকম অদ্ভুত মিলের কথা অনেক সময় শোনা যায়। পাশের ছবিখানা দেখ না ! দু'টি সাহেবের ছেলে কেমন দু'জনে দু'জনার গলা জড়াইয়া ধরিয়া হাসিতেছে—ভাবখানা যেন "বলতো বাপু আমাদের মধ্যে কোন্‌টি কে ? তবে বুঝিব তুমি বাহাদুর লোক"। বাস্তবিকই তফাৎ কোথাও নাই। দু'টিকে আলাদা করিয়া দেখাইলে

কাহারও সাধ্য নাই ইহাদের তুইজন লোক বলিয়া মনে করে। ফোক্‌লা দাঁত দু'টি অবধি দু'জনার ঠিক এক রকম। ডাক্তারেরা ইহাদের শরীরের প্রত্যেকটি অংশ খুঁটিনাটি করিয়া মাপিয়া দেখিয়াছেন—কোন তফাৎ ধরিতে পারেন নাই। একজনের ডান হাত ঠিক যতটা লম্বা, যতটা মোটা, আর একজনেরও ঠিক তাই। এমন কি গায়ের তিল, আঁচিলগুলি শুদ্ধ দু'জনের হুবহু এক রকম।

কিছুদিন আগে এই রকম এক জোড়া যমজ ভাই লইয়া এক আদালতে বড়ই মুস্কিল বাধিয়াছিল। ভাই দু'টির নাম মার্ক্‌ ও ক্লার্ক্‌। কি একটা অপরাধে পুলিশ দু'জনকেই ধরিয়া হাজতে পূরিল ; তার পর তাহাদের বিচার হইল। বিচারে জজ সাহেব ঠিক করিলেন—এদের প্রত্যেকের তিন মাস করিয়া জেল হওয়া উচিত। কিন্তু তার আগেই ক্লার্ক্‌ ২ মাস ও মার্ক্‌ এক মাস জেলে আটক আছে। কাজেই এক জনের মেয়াদ আর মাত্র ১ মাস, আর এক জনের ২ মাস। জেলার সাহেব সাধাসিধা মানুষ, অত ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করেন না—তিনি দু'টিকে এক ঘরেই পূরিয়া দিলেন। এক মাস পরে ক্লার্কের ছাড়া পাইবার কথা, কিন্তু তখন কে যে ক্লার্ক আর কে যে মার্ক্‌ সেটা ঠিক করা আর কাহারও সাধ্যে কুলাইয়া উঠিল না। দু'জনেই নিজেকে ক্লার্ক বলিয়া পরিচয় দিল। জজ সাহেব তখন ফাঁপরে পড়িয়া সিদ্ধান্ত করিলেন দু'জনকেই ছাড়িয়া দিতে হইবে। চেহারার কল্যাণে মার্ক্‌ বাবাজী আদালতকেও ফাঁকী দিয়া আসিলেন।

ঠিক এমনি এক ব্যাপার সেদিন আমেরিকার নিউইয়র্কেও হইয়াছিল। দুই যমজ ভাই—দু'টিরই অসাধারণ গুণ, পরামর্শ করিয়া চেক জাল করিয়া বেশ কিছু টাকা হাতড়াইয়াছে ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হজম করিতে পারে নাই, ধরা পড়িয়াছে। আদালতে বিচার আরম্ভ হইল। এখন, যে নিজের হাতে চেকটি ভাঙ্গাইয়াছে তার শাস্তিটা একটু বেশী হইবার কথা, কিন্তু দু'ভাইয়ের মধ্যে সে মহাপুরুষটি যে কে তাহা কেহই ধরিতে পারিল না—যে গোয়েন্দারা গ্রেপ্তার করিয়াছে তারাও না। আসামীরা ভাবিল তাদের বরাতটা বুঝি ভালই, কিন্তু



রাধামাধব! জজ সাহেবের মেজাজটি মোটেই মোলায়েম ছিল না। তিনি সহজে ছাড়িলেন না। সেই কঠিন শাস্তিটা দু'জনের ঘাড়েই চাপাইয়া দিলেন।

এগুলি ত' গেল চেহারার সাদৃশ্য। শুধু কি তাই! যমজ ভাইদের মধ্যে মানসিক মিলও অনেক সময় আশ্চর্য্য রকম দেখা যায়। কথাবার্ত্তায়, চাল চলনে, সহজে মনেই আসে না যে দু'টি আসলে একবারে আলাদা লোক। সেকালে অনেক পণ্ডিত নাকি মনে করিতেন যে যমজ ভাইদের মনের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রকম ভূতুড়ে সম্বন্ধ আছে। লণ্ডনের "গাই হাসপাতালের" এক ডাক্তার একবার

কয়েক জোড়া যমজ ছেলেমেয়ে—এদের মধ্যে কার কার চেহারার মিল আছে বলতো?

ভারী অদ্ভুত ২টি যমজ ভাইয়ের খবর দিয়াছিলেন। এ দু'টিতে শুধু যে হাবভাব, চালচলনে এক রকম ছিল তাহাই নহে, মগজের ব্যাপারেও ছিল ঠিক এক রকম। স্কুলের পরীক্ষায় নাকি তাহারা বরাবর এক রকম নম্বর পাইয়া আসিয়াছে। একবার তাহাদের দু'জনকে দু'ঘরে বসাইয়া একটা ম্যাপ আঁকিতে দেওয়া হইল। আঁকা শেষ হইলে দেখা গেল, দু'জনেই ঠিক এক জায়গায় ভুল করিয়া বসিয়াছে। আবার একজনের যে অংশটা সব চেয়ে ভাল হইয়াছে, আর এক

জনেরও ঠিক সেইটাই সব চেয়ে ভাল। আর একদিন তাহাদের দুটি পৃথক জায়গায় রাখিয়া দু'জায়গায়ই নজর রাখা হইল, তারপর দেখা গেল ঠিক বেলা ১২টার সময় একজন যে কাজটা করিতেছে, আর একজন অন্য জায়গায় বসিয়া তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে সেই সময় ঠিক সেই কাজটাই করিতেছে।

মগজের মিলের আর একটা গল্প শোন। একবার এই রকম দু'টি যমজ রোগীকে এক হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইল। একজনের মগজের মধ্যে একটা টিউমার হইয়াছিল; সে শীঘ্রই মারা গেল! ও হরি! পরের বছর দেখা গেল তাহার যমজ ভাইটীরও ঠিক মগজের সেই জায়গাটায় ঠিক তেমনি একটা টিউমার। শেষ পর্য্যন্ত এটিকেও বাঁচান গেল না।

এসব দেখিয়া শুনিয়া আজকাল একদল পণ্ডিত যমজ ভাইদের লইয়া রীতিমত গবেষণা যুড়িয়া দিয়াছেন। কেনইবা এমনটা হয় তার একটা কারণও বাহির করিয়াছেন। আমাদের এই যে শরীরটা দেখিতেছ এটা আগাগোড়া কতকগুলি জীবকোষ মিলিয়া তৈরী হইয়াছে। সেগুলিকে বলা হয় সেল্ (cell)। মৌমাছির চাক তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ; অনেকগুলি ছোট ছোট ঘর মিলিয়া যেমন প্রকাণ্ড একটা চাক তৈরী হয়, তেমনি অনেকগুলি ছোট ছোট সেল্ মিলিয়া আমাদের শরীরটা তৈরী হইয়াছে। কথাটা আর একটু বুঝাইয়া বলি। ধর একটা জাতির কথা বলা হইতেছে—যেমন অনেকগুলি মানুষ মিলিয়া একটা জাতি গড়িয়া তোলে—তেমনি অনেকগুলি সেল্ মিলিয়া আমাদের শরীরটা গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু মজা হইতেছে এই—প্রথম যখন শরীরটা তৈরী হয় তখন এতগুলি "সেলের" বালাই থাকে না—মাত্র একটি সেল্ লইয়া শরীর গড়া আরম্ভ হয়। সেল্‌টি খাইয়া দাইয়া বড় হয়, তার পর ভাঙ্গিয়া দু'টী "সেল্" হইয়া যায়। সে দু'টিও আবার আগেকারটির মত বড় হইয়া প্রত্যেকে ২টী করিয়া সেল্ তৈরী করে; এমনি ভাবে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ক্রমে অনেক সেল্ হইয়া পড়ে আর সকলে মিলিয়া শরীরটা গড়িয়া তোলে। কিন্তু সকলের গোড়ায় যে সেল্‌টী থাকে, সেটিই আসল। ভাবী শিশুর হাব ভাব, স্বভাব, মগজ প্রভৃতি যা কিছু গুণ সব আসে



ঐ সেল্‌টি হইতে। এই সেল্‌টি দেখিতে অনেকটা ডিমের মত। সাধারণ মানুষের বেলা এই প্রথম সেল্‌টাই ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে শেষে একটা শিশুর শরীর গড়িয়া তোলে। কিন্তু যমজদের বেলা নাকি ব্যাপারটা হয় একটু অন্য রকমের; প্রথম সেল্‌টি গোড়াতেই কোন রকমে চিরিয়া দু'ভাগ হইয়া যায়। তার পর সেই দুই খণ্ডের প্রত্যেকটি আলাদা ভাবে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে শেষ পর্য্যন্ত দু'টি শিশুর শরীর গড়িয়া তোলে। মানুষ দু'টির যা কিছু গুণ সবই কিন্তু আসে সেই প্রথমকার সেল্‌টি হইতে। কাজেই এই ধরণের যমজ ভাইদের মধ্যে অমন আশ্চর্য্য চেহারার আর স্বভাবের মিল দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে যমজ দু'টি আসলে একই মানুষ, দৈবাৎ ভাঙ্গিয়া আলাদা হইয়া গিয়াছে।

যমজ ছেলে কিন্তু আর এক ভাবেও হয়। সকলের গোড়ায় যেমন একটি সেলের কথা বলিয়াছি—অনেক সময় তাহার বদলে গোড়াতেই ঐ রকম দু'টি সেল্ লইয়া আরম্ভ হয়। এ দু'টি সেল্ কিন্তু একেবারে তফাৎ, একটির সাথে অন্যটির কোনও সম্পর্ক নাই। প্রত্যেকটি হইতে একটি আলাদা শিশু গড়িয়া উঠে। কাজেই এই ধরণের যমজদের মধ্যে বিশেষ মিল দেখা যায় না। এ ক্ষেত্রে ত' যমজ দু'টি এক মানুষ নয়, দু'টি আলাদা ভাইয়েরই মত।

ক্যালিফর্ণিয়া সহরে যে মস্ত বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেখানকার জোন্স নামে এক অধ্যাপক এই যমজ-সমস্যা লইয়া আজকাল খুব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তিনি নাকি শীঘ্রই সেখানে যমজদের লইয়া এক মস্ত পরীক্ষাগার খুলিয়া বসিবেন।—সেখানে কম করিয়া শ'পাঁচেক জোড়া যমজ লইয়া তাহাদের জন্ম হইতে গোটা জীবনটারই যত খুঁটিনাটি পরীক্ষা চলিবে। যে সব যমজদের মধ্যে অদ্ভুত চেহারার মিল আছে শুধু যে তাদের লইয়াই পরীক্ষা হইবে তাহা নয়, যাহাদের মধ্যে মোটেই মিল নাই এমন যমজদেরও ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। ব্যাপারটা শেষ হইলে যে যমজদের সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন খবর গোপন থাকিবে না তাহা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝিতেছ।

বেশীর ভাগ বাপমারই যমজ ছেলেমেয়ে ২।১ জোড়ার বেশী হয় না; কিন্তু

এমন অনেক বাপমাও নাকি আছেন যাঁহাদের একটির জায়গায় প্রায় বরাবরই ১ জোড়া করিয়া বংশবৃদ্ধি হয়। এ ব্যাপারে ওমাহার কোজের পরিবারের নামটা করা যাইতে পারে। দশ বছরের মধ্যে ইঁহাদের ৪ জোড়া ছেলে মেয়ে হইয়াছে। আমরা এই আট ভাইবোনের একটী ছবি দিলাম।

দশ বছরের মধ্যে ওমাহার কোজের দম্পতীর এই চার জোড়া যমজ ছেলেমেয়ে হইয়াছে।

এক সাথে তিনটি ছেলেও অনেক বাপমার হয়। ব্যাপারটা হয় যমজদের মত করিয়াই। কানসাস সহরের এক ভদ্রলোকের তিনটি মেয়ে আছে। তাদের বয়স এখন বছর ১৮।১৯, তারা নাকি চেহারায় আর স্বভাবে অবিকল এক রকম। আর তিনটি ঠিক ঐ রকম ভাইয়ের কথাও শুনিয়াছিলাম। তাঁরা সত্তর বছর বয়স পর্য্যন্ত কোনও বিষয়ে একটুও পার্থক্য দেখান নাই। আর তিনটী ত' ভালই, এ পর্য্যন্ত এক সাথে ৪টী, ৫টী, ৬টী এমন কি সাতটী পর্য্যন্ত ছেলে হইবার কথাও শোনা গিয়াছে।

---



# ত্রিপুর-বিনাশ

( পৌরাণিক )

সেকালে দেবতাদের সাথে দানবদের ভয়ানক যুদ্ধ হইত। তারক নামে এক অসুর ছিল দানবদের সর্দ্দার। তারকের দলবল দেবতাদের সঙ্গে অনেকদিন লড়িয়া শেষে হারিয়া গেল। তখন তাহার তিন পুত্র ভীষণ তপস্যা আরম্ভ করিয়া দিল। পুত্র তিনটির নাম তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী।

পিতামহ ব্রহ্মা দেখিলেন ইহাদের তপস্যার ভারী জোর। তিনি খুসী হইয়া বর দিতে আসিলেন। তখন অসুরের বেটারা সবাই মিলিয়া ব্রহ্মার কাছে বলিল "ঠাকুর, যদি খুসী হয়ে থাকেন তবে বর দিন যেন কেউ আমাদের মার্‌তে না পারে"। ব্রহ্মা বলিলেন "আরে, তাও কি হয়? এমন কেউ নেই যাকে কেউ মার্‌তে পারে না। আর কোন বর চাও"। তখন অসুরেরা পরামর্শ করিয়া বলিল "আমরা এই বর চাই যে, তিন জনা তিন পুরীতে থাক্‌বো আর পৃথিবীতে বেড়াব, সবাই আমাদের মান্‌বে আর হাজার বছর চলে গেলে আবার তিনজন একত্র হব; তখন সেই পুরী তিনটাও মিলে একটা হয়ে যাবে। সেই সময় যে এক বাণে আমাদের সেই পুরী তিনটা নষ্ট কর্‌তে পার্‌বে, তার হাতেই শুধু আমরা মর্‌বো"। ব্রহ্মা 'তাই হোক্' বলিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

অসুর তিনটা তখন পুরী তৈয়ারী করিবার জন্য তলব করিল ময় দানবকে। ময় দানবের তপস্যার জোর ছিল বেজায়। সে একটা পুরী তৈয়ার করিল সোণা দিয়া—সেটা থাকিল স্বর্গে; আর একটা রূপা দিয়া—সেটা থাকিল আকাশে; আর একটা লোহা দিয়া—সেটা থাকিল পৃথিবীতে। সে কি যে সে পুরী? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এক একটা,—তার মধ্যে কত ঘর বাড়ী, দালান কোঠা, প্রাচীর, ফটক, রাজপথ ইত্যাদি। তারকাক্ষ থাকিল সোণার পুরীতে, কমলাক্ষ রূপার পুরীতে, আর বিদ্যুন্মালী লোহার পুরীতে। তারা তো আর যোদ্ধা কম ছিল না—মা'র ধর করিয়া সকলের উপর মনিব হইয়া বসিল; এমন হইল যে ব্রহ্মাকে পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করে না। দেবতাদের কাছে মার খাইয়া যে সব দানব পলাইয়া গিয়াছিল তাহারাও দলে দলে আসিয়া ঐ তিন পুরীতে যুটিল। তখন এই অসুরদের পায় কে? যে যাহা চাহিতে লাগিল, ময় দানব মায়ার জোরে তাহাই যোগাইতে লাগিল।

তারকাক্ষের এক পুত্রের নাম ছিল হরি। সে আবার ভয়ানক তপস্যা করিয়া ব্রহ্মাকে

খুশী করিয়া ফেলিল। ব্রহ্মা বর দিতে আসিলে হবি বলিল, "ঠাকুর, আমি চাই আমাদের পুরীর মধ্যে এমন একটা পুকুর কর্‌তে যার মধ্যে ফেলে দিলে, আমাদের যে যে বীর অস্ত্রে কাটা পড়বে তারা আবার বেঁচে উঠ্‌বে, তাদের গায়ের জোর আরও বেশী হবে"। ব্রহ্মা বলিলেন, "তাই হোক্"।

তখন হবি সেই রকম একটা পুষ্করিণী কাটিয়া ফেলিল। দানবদের মরার সময় যে রকম কাপড় চোপড় পরা থাকিত ঠিক সেই রকম কাপড় চোপড় পরিয়াই তাহারা পুষ্করিণীর মধ্য হইতে উঠিয়া আসিত। দানবেরা এই সুবিধা পাইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য পাতালে ভয়ানক উপদ্রব করিতে লাগিল। দেবতারা ভয় পাইয়া গেলেন।

দানবেরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করে, কাহারও মান মর্য্যাদা রাখে না,—এই দাঁড়াইল অবস্থা। ইন্দ্র অসুরদের উপর বজ্র ছুড়িতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রহ্মার বর, বজ্র কিছুই করিতে পারিল না। তখন তিনি দেবতাদের সঙ্গে করিয়া নিজেই চলিলেন ব্রহ্মার নিকট। ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া নিজেদের দুঃখের কথা জানাইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন "বেটারা ভারী দুষ্টু হয়েছে, ওদের মার্‌তে হবে, কিন্তু পুরী তিনটা এক বাণে ভেদ করা চাই,—মহাদেব ছাড়া কারও সাধ্য নেই যে তা পারে। তোমরা মহাদেবকেই যুদ্ধের জন্য বরণ কর"।

দেবতারা ব্রহ্মাকে সম্মুখে করিয়া মহাদেবের নিকট গিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। দেবতারা মহাদেবকে কি রকম দেখিতে পাইবেন তাহা এক এক জন এক এক রকম ভাবিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন—যিনি মহাদেবকে মনে মনে যেমন ভাবিয়া ছিলেন তাঁহার নিকট মহাদেব তেমনটী হইয়াই দেখা দিয়াছেন। সকলে তো অবাক্!

মহাদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি জন্যে তোমাদের আসা? আমাকে কি কর্‌তে হবে?" ব্রহ্মা সব কথা খুলিয়া বলিলেন—তাঁহার বরেই ত এই সব গণ্ডগোল। তিনি মহাদেবকে বলিলেন,—"তুমি ভিন্ন কেহই এই দানবদের মার্‌তে পার্‌বে না। তুমি তাদের মেরে সকলকে সুখী কর"।

মহাদেব দেবতাদিগকে বলিলেন—"এই শত্রুদের মারা তো উচিতই, কিন্তু একা আমি ভরসা পাচ্ছি না, তোমরা সবাই মিলে আমার অর্দ্ধেক বল নিয়ে ওদের মার"। দেবতারা বলিলেন "অসুরদের জোর আমাদের দ্বিগুণ হবে, আর, আমাদের সাধ্য কি যে আপনার অর্দ্ধেক তেজ ধর্‌তে পারি? আপনিই বরং আমাদের অর্দ্ধেক বল নিন, আপনিই ওদের মারুন।"



মহাদেব বলিলেন,—"তোমরা না পার্‌লে তাই করতে হবে; তোমরা আমার রথ, ধনুর্ব্বাণ এই সব তৈরী কর। আমি রথে চড়ে ধনুর্ব্বাণ নিয়ে ওদের মার্‌বো।" দেবতারা তখন বিশ্বকর্ম্মার সাহায্যে মহাদেবের জন্য এক রথ তৈয়ার করিলেন, পাহাড় পর্ব্বত সমেত গোটা পৃথিবীটাই হইল তাঁর রথ। বিষ্ণু, চন্দ্র ও অগ্নি ইঁহারা মিলিয়া হইলেন বাণ, সংবৎসর হইল ধনুক।

রথ ও ধনুর্ব্বাণ তো হইল, মহাদেবও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত; এখন রথের সারথি হয় কে? মহাদেব দেবতাদিগকে বলিলেন "যিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে তোমরা সারথি কর।"

মহাদেব বাণ ছাড়িলেন

দেবতারা এমন সারথি কোথায় পাইবেন? অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া ব্রহ্মাকে সারথির পদে বসাইয়া দিলেন। মহাদেব তখন যুদ্ধে চলিলেন; চারিদিকে তাঁহার ভূতের দল,—কেহ মাংস খাইতেছে, কেহ নাচিতেছে। ঋষিগণ স্তব করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্বেরা বাজনা বাজাইতে লাগিল। ব্রহ্মার রথ চালান দেখিয়া মহাদেব তাঁহাকে বাহবা দিয়া বলিলেন, "চালাও ঘোড়া এবার সেই দৈত্যদের দিকে"। ব্রহ্মা রথ চালাইতে লাগিলেন, আর রথের ধ্বজার উপর বসিয়া মহাদেবের ষাঁড় ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই গর্জ্জনেই কত

দৈত্যের দফা রফা হইয়া গেল। কিন্তু উপরে যে ভীষণ ভার, রথ আর সামাল দিতে পারে না। তখন মহাদেবের বাণ হইতে নারায়ণ বাহির হইয়া পড়িলেন এবং নিজে ষাঁড় হইয়া রথটাকে তুলিয়া ধরিলেন। আবার, রথের দুরবস্থা দেখিয়া মহাদেব চড়িয়া বসিলেন ঘোড়া আর ষাঁড়ের উপর। আর করিলেন কি?—ঘোড়ার স্তন কাটিয়া ফেলিলেন আর ষাঁড়ের খুর কাটিয়া দুইভাগ করিয়া দিলেন। সেই হইতে ঘোড়ার স্তন নাই—আর গরুর খুর কাটা।

মহাদেব ধনুকে ছিলা পরাইয়া পাশুপত অস্ত্র যুড়িলেন; আর তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন, পুরী তিনটি কখন মিশিয়া একটি হয়। দেখিতে দেখিতে পুরী তিনটী মিশিয়া গেল, মহাদেবও তাঁহার বাণ ছাড়িলেন। পুরী তিনটী সঙ্গে সঙ্গে মাটীতে পড়িয়া গেল। বিকট স্বরে অসুরদের কান্নাকাটি উঠিল। মহাদেব তাহাদের বাণে পোড়াইয়া একেবারে ফেলিয়া দিলেন পশ্চিম সমুদ্রে।

দৈত্যেরা তো পোড়া গেল কিন্তু মহাদেবের রাগে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল সে আগুন এখন থামায় কে? থামাইলেন মহাদেব নিজেই। তিনি বলিলেন "আগুন, তুমি এই তিন লোক ভস্ম কোর না"। আগুন থামিল।

দেবতাদের কাজ হাঁসিল হইল। তাঁহারা মহাদেবকে স্তবস্তুতি করিয়া নিজেদের বাড়ী ঘরে চলিয়া গেলেন।

মহাদেব এই হইতেই হইয়া গেলেন ত্রিপুরারি।

---

# সুয়েজের খাল

( শ্রী—— )

আজকাল বিলাতের সাথে যাতায়াত করায় সুবিধার আর অন্ত নাই। এরোপ্লেনে যদি একবার চাপিয়া বসিতে পার তবেতো কথাই নাই, চার পাঁচ দিনেই সাগর পাড়ি। তবে এরোপ্লেন জিনিষটার এদেশে এখনও তেমন রেওয়াজ হয় নাই, বিলাত যাইতে হইলে আমরা সটান জাহাজেই গিয়া চড়ি। তাতেই বা আর কত সময় লাগে, জোর ১৮।২০ দিন?

কিন্তু বেশী দিন নয়, মাত্র বছর ষাটেক আগে, অর্থাৎ তোমাদের ঠাকুর দাদাদের ছেলেবেলায় বিলাত যাওয়া ছিল যেন এক মহামারি কাণ্ড! ধর, বোম্বাই



হইতে জাহাজে চড়িলে। তোমাকে যাইতে হইবে উত্তর-পশ্চিম কোণে, তোমার জাহাজ কিন্তু ছুটিল সোজা দক্ষিণে। তারপর আফ্রিকা নামে যে বিরাট্ দৈত্য-মহাদেশটী ভুঁড়ি উঁচাইয়া শুইয়া আছে, তাকে আগাগোড়া ঘুরিয়া তবে তোমায় উত্তর-মুখী হইতে হইত। সেই যে আমাদের দেশে একটা কথা আছে না যে মাথার পেছন দিয়া হাত ঘুরাইয়া নাক দেখান, ব্যাপারটা ছিল অবিকল তাই। যেমন হইত অসুবিধা যাত্রীদের, তেম্‌নি ছিল অসুবিধা ব্যবসা-বাণিজ্যের। মাল তৈরী করিতে তোমার হয়তো সময় লাগে মোটে তিন দিন, কিন্তু নানাদেশের লোকের হাতে সেই মাল পৌঁছাইয়া দিতেই লাগিয়া যাইবে তিন মাস! রামচন্দ্রঃ!

অসুবিধাটা সকলে হাড়ে হাড়ে টের পাইত, কিন্তু মুখ বুজিয়া সহ্য করা ছাড়া আর উপায় কি বল? হায়রে, লোহিত সাগর হইতে কোন মতে যদি একবার ভূমধ্য সাগরে গিয়া পড়া যাইত, কি মজাটাই না তবে হইত রে? কিন্তু সে গুড়ে বালি, সুয়েজ নামে একটা যোজক এই পথটী বন্ধ করিয়া এশিয়া ও আফ্রিকা এই দুই মহাদেশকে যোগ করিয়া লম্বা টান টান হইয়া শুইয়া আছে। আরে হতভাগা, থাক্‌না তুই শুইয়া, তোর শোয়ায় আর কার আপত্তি, কিন্তু লোহিত সাগর হইতে ভূমধ্য সাগরে যাইবার পথটা যে তুই তোর ওই জাম্বুবানের মত শরীরটা দিয়া আগ্‌লাইয়া আছিস্! এদিক্ হইতে ওদিক্ যাইবার যদি এতটুকু রাস্তা তুই ছাড়িয়া দিতি, তো কত বড় একটা ঘুর্ণির হাত হইতে আমরা বাঁচিয়া যাইতাম বল দেখি!

সুয়েজ যখন মানুষের মনের কথাটা বুঝিল না, তখন মানুষও চটিয়া গেল,—রোসো, তোমার ওই ভুঁড়ি ভেদ করিয়া আমরা খাল কাটিব, আর তারপর সেই খাল দিয়া লোহিত সাগর হইতে টুক্ করিয়া গিয়া ভূমধ্য সাগরে পড়িব! মুখ বুজিয়া আমরা যে এতখানি ঘুর্ণির পথে রোজ যাওয়া আসা করিব, সেটী হইতেছে না!

কথাটা বলা সোজা বটে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটাকে অসম্ভব বলিলেই হয়। যেখানে খাল কাটা হইবে, সেখানেও শ্রীমানের বপুখানা নিতান্ত কম

মনে করিও না। তার উপর আবার খাল কাটার যন্ত্রপাতির তখন আবিষ্কার হয় নাই বলিলেই চলে। ভরসার মধ্যে এক কোদাল। তারই একটী একটী করিয়া কোপ বসাইয়া, জাহাজ চলিতে পারে এতটা গভীর করিয়া এতখানি জায়গা কাটিতে হইবে। এ যেন একটী একটী করিয়া টিপিয়া একঘর ছার-পোকা মারা। কাজেই সুয়েজকে শাস্তি দিবার ইচ্ছা থাকিলেও এ কাজে হাত দিতে এ পর্য্যন্ত কারো সাহসেই কুলায় নাই! কিন্তু জানই তো ইয়োরোপীয়ান্ ভায়ারা চিরকালই বে-পরোয়া! অসম্ভবকে সম্ভব করাই তাদের কাজ। এক্ষেত্রেও তাই হইল।

ফরাসী দেশে এই সময় ডি লেসেপ্স্ নামে একটী অদ্ভুত লোক বাস করিতেছিলেন। ভদ্রলোক যেদিকেই যান, সাঁই সাঁই করিয়া একেবারে মাথায় গিয়া উঠেন। কিন্তু বেচারার কপাল মন্দ, রাজা গেলেন তাঁর উপর খাপ্পা হইয়া। কি আর করেন ভদ্রলোক, চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া দেশে গিয়া চাষ-বাস আরম্ভ করিয়া দিলেন।

হঠাৎ একদিন খবর আসিল, মিশরের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ পাশা তাঁর সাথে একবার মোলাকাৎ করিতে চান, উদ্দেশ্যটা নাকি সুয়েজের ভিতর দিয়া খাল কাটা সম্ভব কিনা, তাই আলোচনা করা। ডি লেসেপ্স্ তো সোজা মিশরের রাজধানী কায়রো সহরে গিয়া উপস্থিত। ভাল ভাল ফরাসী এঞ্জিনিয়ার দিয়া সুয়েজের মাপ জোঁক সব নেওয়া হইল। সৈয়দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সাহেব, পারিবে তো?" সাহেব মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হুঁ—উ, কিন্তু একটা কথা, টাকা? আমাদের ফরাসী দেশের লোকেরা যে এত টাকার যোগাড় দিয়া উঠিবে, এ তো আমার মনে হয় না।" সৈয়দ বলিলেন, "কুছ্ পরোয়া নাই, তুমি লাগিয়া যাও, টাকা যোগাড় করিব আমি।"

লাগিয়া তো যাইবেন, কিন্তু "নাকানি চুবুনি" আরম্ভ হইল প্রথম হইতেই। মিশর ছিল তখন তুর্কীর অধীনে, সৈয়দ পাশাও ছিলেন তুর্কী সুলতানেরই চাকর। সুয়েজের ভিতর দিয়া খাল কাটিতে হইলে, সুলতানের একটা হুকুম তো নেওয়া



চাই! এখানেই যত গোল। "ফরমাণ্" দিতে সুলতানের অবশ্য নিজের কোনই আপত্তি ছিল না, কিন্তু বাঁকিয়া বসিল ইংরাজ। তোমরা জিজ্ঞাসা করিবে, সে কিরে বাপু, ইংরাজ আবার কোথা হইতে আসিল, আর আসিলই যদি তবে তাদের আপত্তিই বা সুলতান শুনিতে যাইবেন কেন? আসলে ব্যাপারটা হইতেছে এই যে, সেই সময়টায় ইংরাজ তুর্কীর একজন মস্ত মুরুব্বি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তুর্কীতে লর্ড্ ষ্ট্র্যাট্ফোর্ড নামে একজন ইংরাজ দূত ছিলেন, তিনি ছিলেন একটী বিধাতা পুরুষ। ঠাট্টা করিয়া লোকে তাঁকে "সুলতান" ষ্ট্র্যাট্ফোর্ড্ বলিয়া ডাকিত, ভাবটা এই যে সুলতান নিজে তো কলের পুতুল, ষ্ট্র্যাট্ফোর্ড্ই তাঁকে নিজের মর্জ্জি মত চালান। এই ষ্ট্র্যাট্ফোর্ড্ সাহেবটীর মাথায় খেলিত নানা রকম ঘোরাল-প্যাঁচালো বুদ্ধি। তিনি ভাবিলেন তাইতো, এ ফরাসীর বাচ্চা আবার খাল কাটিতে চায় কেন, কুমৎলব একটা কিছু আছেই আছে। জলযুদ্ধে এখন আমরাই হইতেছি পৃথিবীর সেরা, এই খাল কাটার দরুণ ফরাসীরা যদি আমাদেরকে ছাড়াইয়া যায়, তবে সেতো বড়ই খারাপ কথা হইবে! আচ্ছা বাছা, রোসো, খাল তোমার ভালমতেই কাটাইতেছি। তিনি সুল্তানকে বলিলেন, "খবর্দ্দার, ফরমাণ টরমান পাছে দাও, ইংরাজ কিন্তু তবে চটিয়া আগুন হইবে!"

ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া সৈয়দ পাশা গেলেন ভ্যাবাচাকা খাইয়া। লোকটী তিনি বেশ ভালই ছিলেন,—ভাবিলেন, কি জানি এ নিয়া আবার কোন্ নূতন ফ্যাসাদের সৃষ্টি হইবে, তার চেয়ে পিছাইয়া পড়াই ভাল। আস্তে আস্তে তিনি নিজের হাত গুটাইয়া লইলেন। ডি লেসেপ্সের তখন যা অবস্থা! পৃথিবীতে যে কাজ কেউ কখনো ভাবিতে পারে নাই, সেই কাজে তিনি হাত দিয়াছেন, প্রাণে কত আশা আকাঙ্ক্ষা আর গোড়াতেই কিনা এই বাধা। ভাবিলেন, যাই ষ্ট্র্যাট্ফোর্ড্কে একটু বুঝাইয়া শুনাইয়া রাজী করিতে পারি কিনা দেখি। সেই মৎলবে একদিন তুর্কীর তখনকার রাজধানী কন্ষ্টান্টিনোপলে গিয়া হাজির হইলেন। কিন্তু ষ্ট্র্যাট্ফোর্ড্ কি ভোলার ছেলে? আদর আপ্যায়িত খুবই করিলেন, কিন্তু আসল কাজের বেলায় সবটাই ঢুঁ ঢুঁ।

লর্ড্ ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড্ হাজার হইলেও রাজদুত মাত্র, তাই তিনি জোর ছোট কর্ত্তা, আসলে বড়-কর্ত্তা ছিলেন ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিবর লর্ড্ পামারষ্টোন। প্যাঁচালো-বুদ্ধিতে ইনি আবার ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডের বড় দাদা। ভদ্রলোককে লইয়া মাঝে মাঝে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে পর্য্যন্ত ফ্যাসাদে পড়িতে হইত। পামারষ্টোন্ তো সুয়েজের নাম শুনিয়াই খাপ্পা! ডি লেসেপ্‌স্ নিজে লণ্ডনে গিয়া কত খোসামোদ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই 'উঁহু' 'উঁহু'ই রহিয়া গেল। পামারষ্টোনের পর যাঁরা কর্ত্তা হইলেন, তাঁরাও বেচারাকে আমল দিলেন না। এই রকম তো অবস্থা ইংল্যাণ্ডে।

নিজের দেশেই বেচারার যা কিছু সুবিধা হইল। তার একটু কারণ ছিল। ইউজেনি তখন ফ্রান্সের মহারাণী। রাণী হইবার আগে ইউজেনি ডি লেসেপ্‌সের কাছে কিছু উপকার পাইয়াছিলেন, সে উপকারটুকু এত বড় হইয়াও তিনি ভুলেন নাই। এইবার সেই ঋণশোধের সুযোগ উপস্থিত হইল। রাণী নানা রকমে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিসে ডি লেসেপ্‌সের সুবিধা হয়। আর ব্যাপারটা তো শুধু তাই নয়, সুয়েজখাল কাটা হইলে লাভ তো আর ডি লেসেপ্‌সের একারই নয়, ফ্রান্সের গৌরবও যে তাতে কতখানি বাড়িয়া যাইবে, বুদ্ধিমতী রাণী সেটাও বেশ বুঝিতে পারিলেন। রথ-চাইল্‌ড্ পরিবারের নাম তোমরা কেউ কেউ শুনিয়া থাকিবে। টাকা লেন-দেনের কারবারে এঁরা এত বড় লোক হইয়াছেন যে সে রকম বড় লোক সারা দুনিয়া খুঁজিলে হয়তো দু'এক জন মিলিতে পারে। লোকে অপরকে বড়লোক বলিতে হইলে বলে, তুমি তো একটী রথ্‌চাইল্‌ড্! এমনি সে পরিবারের হাঁকডাক! রথচাইল্‌ড্‌দের ফরাসী দেশেও কারবার ছিল, কাজেই যখন সে দেশের রাণী আসিয়া ধরিলেন, ওহে বাপুরা, সুয়েজখাল কাটার দরুণ যে টাকাটা দরকার সে কিন্তু ডি লেসেপ্‌স্‌কে তোমাদের ধার দিতেই হইবে, আমার অনুরোধ, তখন ভদ্রলোকেরা রাজী হইয়া গেলেন। রথচাইল্‌ড্‌দের মত পাকা ব্যবসাদারেরা টাকা ধার দিতেছেন, কাজেই অন্যান্য দেশের, এমন কি ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কগুলিও আর টাকা ছাড়িতে আপত্তি করিল না।



ডি লেসেপ্‌স্ কিন্তু এখানেই থামিলেন না; সমস্ত ইউরোপময় হৈ চৈ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—ওগো মশয়রা, সুয়েজ খালটা যে কত দরকারী জিনিষ তা কি আপনারা এখনো বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না? পণ্ডিত মহলে তখন বেশ একটু সাড়া পড়িয়া গেল, বড় বড় মাথাওয়ালা লোক সব একত্র হইয়া মাথা নাড়িয়া একবাক্যে রায় দিলেন,—হ্যাঁ এ একটা কথার মত কথা বটে, সুয়েজ খালটা কাটা খুবই দরকার।

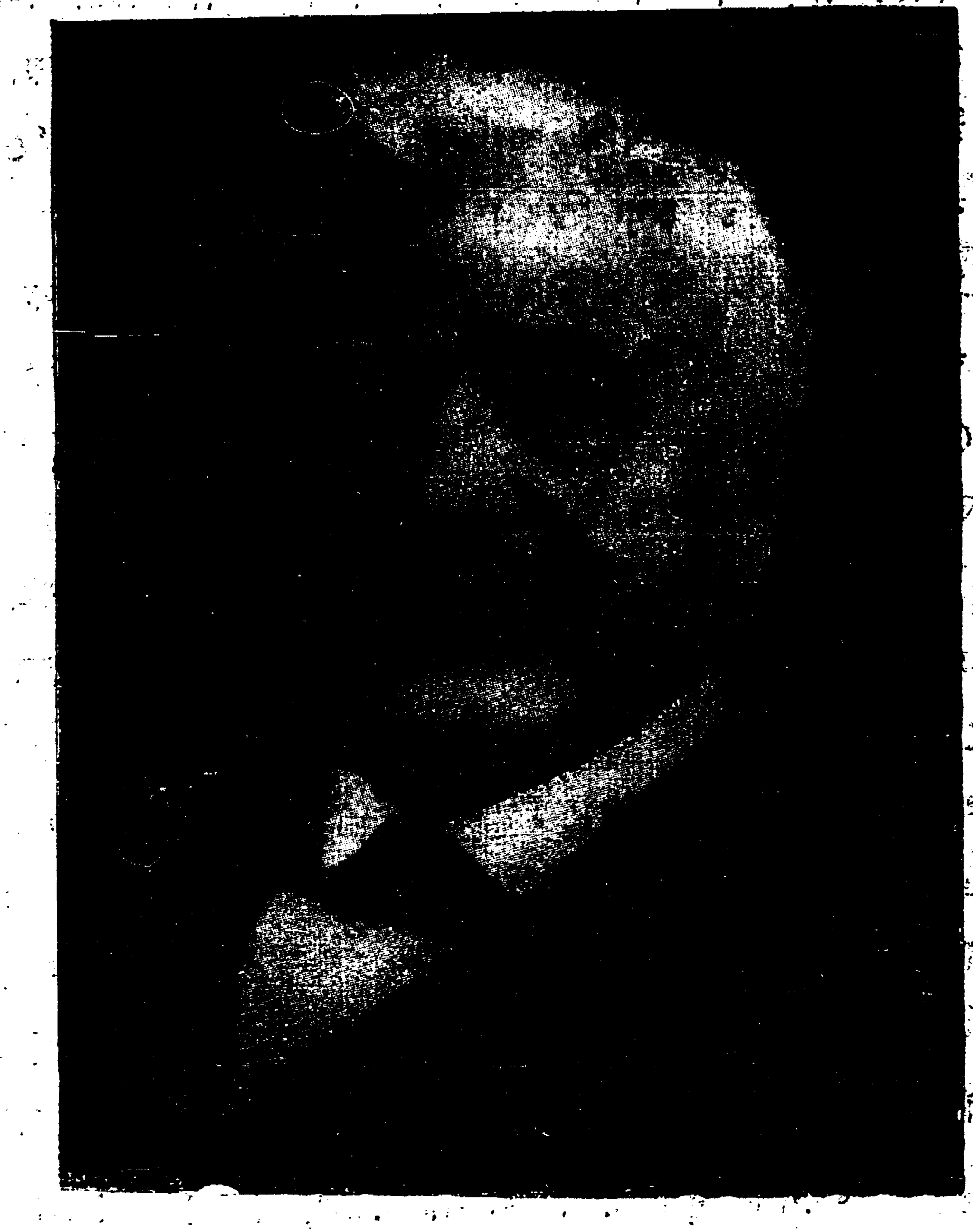

ডি লেসেপ্‌স্

এইবার এতদিনে কাজ সুরু হইল; পঁচিশ ত্রিশ হাজার কুলি কোদাল হাতে কাজে যোগ দিল। তা ছাড়া আর উপায় কি, মাটী কাটার রকমারি যন্ত্র কি আর তখন বাহির হইয়াছে? স্যাণ্ড্ ড্রেজার নামে একটা যন্ত্রের শুধু সাহায্য তাহারা পাইল। কিন্তু ভাল কাজে বাধার কি অন্ত আছে? দু'দিন যাইতে না যাইতেই 'জল জল' রব উঠিল। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, অথচ খাবার উপযুক্ত টাট্‌কা জল মেলে না। তখন কাট আবার আর এক খাল। নীল নদ হইতে খাল কাটিয়া খাবার জল আনা হয়, তবে লোকগুলি জল খাইয়া বাঁচে।

জলকষ্ট দূর হইয়াছে, ডি লেসেপ্‌স্‌ও মহা উৎসাহে আবার কাজকর্ম চালাইতেছেন, এমন সময় এক দারুণ দুঃসংবাদে দলের সবাই একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িল। খবর আসিল সৈয়দ পাশা মারা গিয়াছেন, তাঁর জায়গায় তুর্কী হইতে ইস্‌মাইল পাশা মিশরের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিতেছেন। সর্ব্বনাশ, ইস্‌মাইল পাশা যদি আসিয়া হুকুম দিয়া বসেন, 'ওহে তোমার ও খালকাটা বন্ধ কর', তবেইতো চক্ষু স্থির! ডি লেসেপ্‌স্‌ তো খবর পাইয়াই উর্দ্ধশ্বাসে কায়রোর দিকে ছুটিলেন, আর তাঁর লোকজনেরা দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করিতে লাগিল—কী খবর আসে, কী খবর আসে! যা'হোক্‌ ভগবানের দয়ায় ভালয় ভালয় সব মিটিয়া গেল। টেলিগ্রাম আসিল, 'কাজ চালাও, ইস্‌মাইল পাশা কোন বাধা দিবেন না।' তখন সে কী আনন্দ, ঘাম দিয়া যেন জ্বর ছাড়িল।

এ আনন্দও কিন্তু বেশীদিন টিকিল না। কাজ চলিতেছে, চলিতেছে, হঠাৎ একদিন সকলে টের পাইল যে গোড়াতেই এক মারাত্মক রকমের ভুল হইয়া গিয়াছে। যে পথে খাল যাইবে, দেখা গেল সে রাস্তায় মাটী ফুঁড়িয়া একটা পাহাড়ের খানিকটা অংশ—প্রথম মাপ-জোকের সময় এ কাহারও নজরে আসে নাই। ডি লেসেপ্‌স্‌ একেবারে উতলা হইয়া উঠিলেন, বলিলেন যাও, তোমরা, তাড়াতাড়ি কায়রো থেকে বারুদ আন। তারপর যদি তাহাতে নেহাৎই পাহাড় উড়াইয়া দিতে না পারি, নিজেদের তো উড়াইয়া দিতে পারিব! কিন্তু ভগবান্‌ এবারও মুখ রক্ষা করিলেন, বারুদের তোড়ে পাহাড় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া খালের জন্য পথ ছাড়িয়া দিল।

অনেক দূর তো আসা গেল, কিন্তু আসল কাজ এখনও বাকী, তুর্কী সুলতানের "ফরমাণ" এখনও পাওয়া যায় নাই। সেটা এখন চাই-ই, নহিলে সমস্ত জিনিষই হয়তো বাতিল হইয়া যাইবে। রাণী ইউজেনি তাঁর স্বামী ফরাসীরাজ লুই নেপোলিয়নকে জোর তাড়া দিতে সুরু করিলেন। ঠিক এই সময়ে ঘটনাচক্রে একটা মজার কাণ্ড ঘটিয়া গেল। তুর্কীর প্রধান উজীর যিনি, তিনি কিছুকাল রোগ ভোগ করিয়া হাওয়া বদলাইতে ফরাসীদেশে আসিলেন। লুই নেপোলিয়ন দেখিলেন—এই সুযোগ। উজীরকে ডাকিয়া আদর-আপ্যায়িত



করা দূরে থাকুক তিনি এমনিভাব দেখাইতে লাগিলেন যেন উজীর কেউই নন। তুর্কীর উজীর ভাবিলেন—ব্যাপারটা কি? শেষে একদিন আর থাকিতে না পারিয়া সটান লুই নেপোলিয়নের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সম্রাট্‌ কি কোন কারণে আমার উপর চটিয়াছেন নাকি?" সম্রাটের মুখ দিয়া শুধু একটী কথা বাহির হইল "ফরমাণ।"

সুয়েজ খাল

ইহার পর ফরমাণ্‌ পাইতে আর বেশী দেরী হইল না। অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইল, লোকে যা কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই, ডি লেসেপ্‌স্‌ শুধু তাঁর নিজের মনের জোরে তাই করিলেন। যে দিন সুয়েজ খাল প্রথম খোলা হইল সে দিন যে কী সমারোহ, তা বোধ হয় তোমরা বেশ আন্দাজ করিতে পারিতেছ। ফরাসী দেশ হইতে স্বয়ং মহারাণী ইউজেনি আসিলেন, অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্‌ নিজে আসিলেন, জার্ম্মাণীর যুবরাজ আসিলেন। ইংরাজদেরও আগের মত কড়া মেজাজ আর ছিল না, সেখান হইতেও রাণীর তরফ হইতে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ আসিয়া উৎসবে যোগ দিলেন। খালের এ মুখ হইতে ও মুখ পর্য্যন্ত জাহাজের মিছিল বাহির হইল। একখানা জাহাজে

ছিলেন ডি লেসেপ্‌স্ ও রাণী ইউজেনি। যতক্ষণ না জাহাজগুলি নির্বিঘ্নে সমস্ত খালটা পার হইয়া গেল ততক্ষণ রাণীর মাথায় যেন আগুন জ্বলিতেছিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহার ভয় হইতেছিল, এই বুঝি জাহাজ কোথাও মাটীতে আটকাইয়া গেল, এই বুঝি ফ্রান্সের মাথা নুইয়া পড়িল!

পৃথিবীর সমস্ত দেশ হইতে ডি লেসেপ্‌স্ যে সম্মানটা পাইলেন, খুব বেশী লোকের অদৃষ্টে সে সম্মান ঘটে না।

---

# সওদাগরের কাণ্ড

( শ্রীরসোদর শর্ম্মা )

আরব দেশে এক মস্ত সওদাগর বাস করিতেন। ব্যবসায়-বুদ্ধিটা তাঁর বেশ ভাল রকমেরই ছিল। ফলে টাকা পয়সা যা' করিবার তা' তিনি করিয়াছিলেন। হীরা, পান্না, চুণী প্রভৃতি জহরৎ হইতে আরম্ভ করিয়া গাড়ী, ঘোড়া প্রভৃতিতে, কি কোন রকম আসবাব পত্রে তাঁহার সাথে টক্কর দিতে পারে এমন লোক সে অঞ্চলে খুব কমই ছিল।

সওদাগরের একটী মাত্র ছেলে। তিনি ঠিক করিলেন—ছেলেটাকে একটু ভাল রকম লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়া তুলিবেন। কিন্তু তাঁর নিজের দেশটা? দূর ছাই; সেখানে কি আর লেখাপড়া হয়? মৌলবীদের নিজের পেটেই ত' বিদ্যা ভূর্ ভূর্ করিতেছে, তারা নাকি আবার অপরকে শিখাইবে! ভাবিয়া চিন্তিয়া সওদাগর ছেলেকে বিদেশে পাঠাইয়া দিলেন।

সওদাগরের একটী ক্রীতদাস ছিল। নাম তার নূর আলি। নূর আলি লোকটা বেশ কাজেরই ছিল, তবে তার নিজের বুদ্ধির উপর ছিল তার অগাধ বিশ্বাস। সওদাগর তাঁর নিজের ছেলের জন্য অতটা করিতেন, নূর আলির সেটা পছন্দ হইত না। সওদাগরের ছেলে হইয়া জন্মিয়াছে বলিয়াই কি তার সাত খুন মাপ? কেন, নূর আলি কম কিসে? হইলই না হয় চাকর, কিন্তু বুদ্ধিটা বুঝি দেখিতে হইবে না?



সওদাগর বুড়া হইয়াছিলেন; হঠাৎ একদিন বেড়াইতে গিয়া ঠাণ্ডা লাগাইয়া বসিলেন; ফলে তাঁর জ্বর হইল। বড়লোকের অসুখ—দেখিতে দেখিতে হাকিম আর বদ্যির ভিড়ে বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল। ওষুধপত্রেরও কোন ত্রুটী হইল না। কিন্তু বুড়া হাড়ে ঘুণ ধরিলে কি ত' আর সহজে ছাড়ান যায়? কিছুতেই কিছু হইল না। সওদাগরের দিন ঘনাইয়া আসিল। মুস্কিলের উপর মুস্কিল, সওদাগরের ছেলে তখন বিদেশে। তখনকার দিনে ত' আর আজকালকার মত এত সহজে খবর দেওয়া-নেওয়া চলিত না। খবর দিয়া ছেলে আসিতে আসিতে ক'মাস কাটিয়া যাইবে তাহার কোন ঠিকানা নাই। সওদাগর বড় ভাবনায় পড়িলেন। এত বড় সম্পত্তি, কাহার হাতেই বা দিয়া যান? অপরের জিম্মায় রাখিয়া গেলে কি আর ছেলে তাঁর ফিরিয়া আসিয়া কাণাকড়িও চোখে দেখিবে? রাম বল! তার আগেই যিনি রক্ষক থাকিবেন তিনিই ভক্ষক হইয়া সমস্ত হাত করিয়া ভালমত কাজ গুছাইয়া লইবেন। কাহাকেও ত' আর তাঁর জানিতে বাকি নাই। হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল নূর আলির কথা। সওদাগর তখন সকলকে ডাকিয়া বলিলেন তিনি উইল করিয়া যাইবেন।

উইল লেখা হইল। সকলেই জানিত—উইল করা মানে নিজের ছেলের নামেই সমস্ত লিখিয়া যাওয়া। কিন্তু হরি হরি, একি! উইলে দেখি তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই তিনি ক্রীতদাস নূর আলির নামে লিখিয়া দিয়াছেন। গাড়ীঘোড়া, জমিজমা, হীরা জহরৎ, কোনটাই বাদ যায় নাই, মায় বাড়ীখানা পর্য্যন্ত। আর নিজের ছেলের নামে? তা সেটুকু দয়া তাঁর না করিলেও চলিত! ছেলে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হইতে মাত্র একটী জিনিষ পাইবে;—অবশ্য সেটা সে নিজের ইচ্ছামত বাছিয়া লইতে পারে। বন্ধুবান্ধবেরা শুনিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। মরিবার আগে বুড়ার সত্যি সত্যিই ভীমরতি ধরিয়াছে রে! নূর আলি ত' খুব খুসী। কর্ত্তা তাহার আর যাই হউন না কেন, গুণীর আদরটা তিনি জানেন, কেননা দানটা যে যোগ্য পাত্রেই পড়িয়াছে সে বিষয়ে ত' আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

হাজার হোক্ ক্রীতদাস ত! অত টাকা ত' আর কখনও এক সঙ্গে চোখে

দেখে নাই, কাজেই সম্পত্তি পাইয়া নূর আলি সেগুলিকে যখের মত আগলাইয়া ধরিল। একটী পয়সা খরচ করিতে তার মন উঠে না ; বরঞ্চ কিসে সে সম্পত্তি আরও বাড়িবে সে দিকেই তার ঝোঁকটা বেশী। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন সওদাগরের ছেলে আসিয়া হাজির।

সওদাগরের ছেলে একা আসে নাই। তার সঙ্গে আসিয়াছে সেই বিদেশ হইতে তাহার গুরু এক মৌলবী সাহেব,—যার কাছে সে লেখাপড়া শিখিত। মৌলবী সাহেবটী নাকি ভারী বুদ্ধিমান্। তিনি কি সহজে আসেন? সওদাগরের ছেলে কত করিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে আনিয়াছে। অমন গুরুকে ছাড়িয়া কি আর এখন সে থাকিতে পারে?

সওদাগরের ছেলে আসিয়া শুনিল বাপ তাহার মারা গিয়াছেন। নূর আলি তাহাকে উইল দেখাইল। দেখিয়াই ত' বেচারীর চক্ষু স্থির। বাবা তাহার একি করিলেন! বিদেশে পাঠাইবার নাম করিয়া তাহাকে এমন ভাবে পথে বসাইয়া গেলেন! ছেলে বলিয়াও একবার মন কেমন করিল না; আশ্চর্য্য!

বিষণ্ণ-চিত্তে সওদাগর-পুত্র গুরুর কাছে আসিয়া সকল কথা বলিল। ভাবিল, যাক্ একটু সহানুভূতিও হয়ত' পাওয়া যাইবে। কিন্তু সমস্ত শুনিয়া মৌলবী সাহেব বলিয়া বসিলেন "তোমার বাবার তো অদ্ভুত বুদ্ধি ছিল হে, এত দূর-দৃষ্টি ত' আমি আর কারও দেখেছি বলে মনে হয় না"। সওদাগরের ছেলে ত' অবাক্; গুরুদেবেরও মাথা খারাপ হইল নাকি! সে বলিল, "আপনি একি বল্‌ছেন? আপনার কথার মানে ত' আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না!" মৌলবী বলিলেন—"বাপু হে, তোমার বাবা যদি তাঁর বিষয়টা তোমার নামে লিখে দিয়ে যেতেন, তবে কি আর তুমি ফিরে এসে এর এক চুলও দেখ্‌তে পেতে? কবে তোমাদের ঐ নূর আলি আর পাঁচ ভূতে মিলে সব লুটে পুটে নিত, তার কথা ভেবেছ কি? নূর আলির হাতে সম্পত্তি দেওয়াতে সে কেমন চমৎকার ভাবে সেগুলি রক্ষা কর্‌ছে দেখ দেখি। শুধু কি রক্ষা করা? আরও কত বাড়িয়ে ফেলেছে।" সওদাগর-পুত্র চটিয়াছিল। বিরক্ত ভাবে বলিল, "রক্ষা করেছে, বাড়িয়েছে ত'



আমার মাথা কিনেছে! সম্পত্তি এখন নূর আলির। সে তা' রক্ষা করুক আর বাড়াক্ তাতে আমার কি এসে যায়। আমি ত' আর তা' পাচ্ছি না?"

মৌলবী সাহেব তখন সওদাগরের ছেলের কাণে কাণে কি বলিলেন। শুনিয়া তাহার মুখে আবার হাসি ফুটিল।

উইল অনুসারে সওদাগরের ছেলে তার বাপের সম্পত্তি হইতে একটা জিনিষ ইচ্ছা মত বাছিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু একটার বেশী নয়। নির্দ্দিষ্ট

যে টি খুসী বাছিয়া লও

দিনে সওদাগরের সমস্ত বন্ধুবান্ধবদের সাক্ষী থাকিবার জন্য ডাকা হইল। একটা বড় ঘরে সওদাগরের সমস্ত মূল্যবান্ সম্পত্তি সাজান হইল। তার পর সওদাগরের ছেলের ডাক পড়িল। সে তার গুরুর সাথে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিল। ঘরের একদিকে হীরা, পান্না প্রভৃতি জহরৎ ঝক্‌মক্ করিতেছে, আর একদিকে কত দামী দামী আসবাব, দেখিলেই মুণ্ড ঘুরিয়া যায়। নূর আলি একে একে সমস্ত দেখাইয়া দিল। তার পর মুচ্‌কি হাসিয়া দাঁড়াইল—ভাবখানা 'এবার

যেটা খুসী বাছিয়া লও, বাকীটা ত আমার !" ঘরের সকলে অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল,—সওদাগর-পুত্র কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টা ধরিবে—সবগুলিই যে সমান লোভনীয়। হঠাৎ দেখা গেল সওদাগরপুত্র সমস্ত ফেলিয়া সটান নূর আলির কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিয়াছে। সকলে অবাক্ হইয়া তাকাইল। তখন সওদাগরের ছেলে বলিল, "আমি বাবার সমস্ত সম্পত্তি থেকে মাত্র একটী জিনিষ নিতে পারি। নূর আলি বাবার ক্রীতদাস ছিল, কাজেই সেও বাবার সম্পত্তি। আমি তাকেই নিলুম।" শুনিয়া নূর আলির মুখ শুকাইল; কেননা আইনমতে ক্রীতদাসের আলাদা কোন সম্পত্তি থাকিতে পারে না, তার যা কিছু সবই আসলে তার মনিবের। সে কথা নূর আলি ভাল করিয়াই জানিত।

সওদাগরের বন্ধুরা—যারা সওদাগর মরিবার সময় তার বুদ্ধিহীনতার কথা ভাবিয়া ঠাট্টা করিয়াছিল,—তারা বুঝিল সওদাগর তাদের চাইতে কত বেশী বুদ্ধিমান্। সওদাগর ও মৌলবী সাহেবের বুদ্ধির তারিফ করিতে করিতে তাহারা বাড়ী ফিরিল।

---

## মায়ে ঘুমালো

( শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য )

এই　মায়ে ঘুমালো,—পাড়া জুড়ালো ;—নাকে দিল রে সাড়া ;
ছোট　খোকাবাবুটী—চুপি চুপি কী গা দিল তার নাড়া ?
　শান্তভাবে বলো কে তবে
　এবারে আর বসিয়া রবে ?
তাই　হ'লো গো খোকা নীরবে, ধীরে বিছানাখানি ছাড়া।
যেই　মায়ে ঘুমালো,—পাড়া জুড়ালো ; নাকে দিল রে সাড়া।
ওই　ঘুমিয়েছে মা,…গেছে গো বাঁচা ; পাণের বাটা আনো !
কেউ　—পাণে ও চূণে মিশায়ে নাহি খেলে কি 'বাবু'—মানো ?



　মু'খানি হ'বে টুকটুক কী !
　করিছে যেন খারে খুকু কি ?
জাগো　অধর-কোণে ফুটিবে হাসি মধুরতর…জানো ?
ওই　ঘুমিয়েছে মা, বাঁচা গেছে গো, পাণের বাটা আনো।

এই　নিয়েছি পাণ,—নিয়েছি গুয়ো,—নিয়েছি খয়ের চুণও ;
কিবা　ক'রেছি খিলি, এবারে তবে—মনটি দিয়ে শুনো।
　খোকাবাবু সে খেলো যে পাণ,
　ঘুমিয়েছে মা,…কে ধরে কাণ ?
বাস্,　উঠিল হ'য়ে অধর রাঙা—পনের কুড়ি গুণও !
এই　করিয়া খিলি খেয়েছি পাণ—দিয়ে সে খয়ের চুণও !

পরে,　কিন্তু ওরে বাবা রে, এ কি !…গেছি রে গেছি রে !
বাপ্　থু—থু—থু—থু—থু ! এ কি রে জ্বালা, কর্ম্ম সারা যে !
　উহুঁ উহুঁ উঁ—কি হলো মা-গো ?
　ঘুমটী ছেড়ে' এবারে জাগো ;
ওগো,　পাণ খেতে যে হাঙ্গামা এ'—জানিত বলো কে ?
বাপ্　থু—থু—থু—থু—থু !—ওরে বাবা রে,—গেছি রে গেছি এঁ !

---

## বড়দের জীবনের ছোটখাট ঘটনা

[ শ্রীমতী চারুলতা দেবী ]

বড় বড় লোকদের জীবনে অনেক ছোট খাট অথচ ভারী মজার মজার গল্প শোনা যায়। আজ তোমাদের তারই গোটা কয়েক শুনাইব।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসাধারণ দয়ার কথা তোমরা সকলেই জান। মাঝখানে একবার তাঁহার আর্থিক অবস্থা ভয়ানক খারাপ হইয়া পড়ে। সেই সময় এক পুলিশের কর্ম্মচারী বিদ্যাসাগরের এক বন্ধুকে লইয়া তাঁহার বাড়ী গিয়া

হাজির। দারোগা বাবুর সাথে বিদ্যাসাগরের আলাপ ছিল না, তাই তিনি বন্ধুটিকে সঙ্গে আনিয়াছেন। বিদ্যাসাগর তাঁহাদের বসাইয়া, আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বন্ধুটি দারোগাবাবুর পরিচয় দিয়া বলিলেন—"মিথ্যে মোকদ্দমায় এ বেচারীর উপর ছ'মাস জেলের হুকুম হয়েছে, কিন্তু ইনি একেবারে নির্দ্দোষ; খালাস পাওয়ার আশায় হাইকোর্টে আপীল করেছেন। আজকে মোকদ্দমা আরম্ভ হবে। এঁর পক্ষে মনোমোহন ঘোষ মশাইকে ব্যারিষ্টার ঠিক করা হয়েছে। তাঁকে আজই সাত শ' টাকা দিতে হবে। বাড়ী থেকে কাল টাকা আসবার কথা ছিল, কিন্তু আসেনি। তাই ইনি বড় বিপদে পড়ে গেছেন।" বিদ্যাসাগর বলিলেন, "তা' আমায় কি করতে হবে বলুন ?"

"আর কিছু নয়, আপনি শুধু মনোমোহন বাবুকে একটা চিঠি দিয়ে দেবেন যে তিনি যেন আজকে বিনে টাকাতেই মোকদ্দমাটা আরম্ভ করে দেন, এক সপ্তাহের মধ্যে দেশ থেকে নিশ্চয়ই টাকা আসবে।"

বিদ্যাসাগর খানিক ক্ষণ চুপ্ করিয়া ভাবিলেন, তারপর বলিলেন, "সে কি হয় ? এ ভদ্রলোক একেবারে জেলের মুখে দাঁড়িয়ে, এ অবস্থায় টাকা বাকী রেখে তাঁকে কাজ করতে অনুরোধ করাটা কেমন···, তা ছাড়া ঘোষ মশা'য়ের সাথে আমার তেমন আলাপও নেই। না, এ' আমি পারব না।"

অনেক অনুরোধ করিয়াও বিদ্যাসাগরকে রাজী করা গেল না। তখন দারোগা বাবু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "শুনেছিলাম যার আর কোথাও কিনারা হয় না, সেও এখানে আশ্রয় পায়। আমার অদৃষ্টে তা'ও হল না।" ভদ্রলোকের করুণ মিনতিতে বিদ্যাসাগর বিচলিত হইলেন, তিনি কাগজ টানিয়া চিঠি লিখিতে বসিলেন ; কিন্তু এক লাইন লিখিয়া কলম আর সরিতে চায় না। খানিক ক্ষণ চুপ্ করিয়া শেষে কলম ফেলিয়া দিয়া বিদ্যাসাগর বলিলেন, "না, আমারদ্বারা এ হবে না ; আমি তাঁকে এমন অনুরোধ করতে পারব না।" দারোগা বাবু এবার কাঁদিয়া ফেলিলেন—"তবে কি আমায় জেলেই পচ্‌তে হবে ?" এ কথার পর আর বিদ্যাসাগর থাকিতে পারিলেন না। চিঠি তিনি লিখিলেন না,





কিন্তু আস্তে আস্তে বাক্স হইতে একখানি ব্যাঙ্কের চেকবই বাহির করিয়া সাত শ' টাকার একখানি চেক লিখিয়া দিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল ব্যাঙ্কে তাঁহার পুঁজী তখন একটি পয়সাও নাই। তিনি চেকখানি দারোগাবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, "ঘোষ্ মশাইকে বল্‌বেন, তিনি যেন দয়া করে কাল্ দুপুরের আগে চেকটা না ভাঙ্গান ; তার মধ্যে আমি যে করে পারি ব্যাঙ্কে সাত শ' টাকা জমা দেবই।"

বিচারে দারোগাবাবু খালাস পাইলেন। দিন ৩।৪ পরে দেশ হইতে টাকা আসিলে তিনি সেই বন্ধুটিকে লইয়া বিদ্যাসাগরের সাথে দেখা করিতে গেলেন। তাঁহারা ভাবিয়া ছিলেন—খালাসের কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর খুব আনন্দ প্রকাশ করিবেন, কিন্তু ও হরি ! বিদ্যাসাগর গম্ভীর মুখে বলিয়া বসিলেন, "মশাই, ভদ্রলোক হয়ে আমার সাথে এমন জুয়াচুরিটা কেন করলেন বলুন ত ?" দারোগা বাবু ত' আকাশ হইতে পড়িলেন,—এ আবার কি বলে রে ! বিদ্যাসাগর বলিলেন —"আপনি না বলেছিলেন আপনি পুলিশে কাজ করেন ?" দারোগাবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ করি বই কি, আমি নাটোরে দারোগা ; আপনি খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন।" বন্ধুটি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের দিকে চাহিলেন। বিদ্যাসাগর একটু হাসিয়া বলিলেন—"মিথ্যে কথা ছাড়া আর কি মনে করি বলুন ? এতটা বয়স হ'ল,—কত লোকেই ত' টাকা নিয়ে যায়। গরীবদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, বড়লোকদেরই ধরুন না। 'ফেরৎ দেব' ত অনেকেই বলে, কিন্তু দেয় ক'জন ? যে দেশে কেউ টাকা নিয়ে আর দিতে চায় না, সেই দেশেরই পুলিশের দারোগা হয়ে আপনি সাত দিনের কড়ারে নেওয়া টাকা চারদিন পরে ফেরৎ দিতে এসেছেন, এ আমি কি করে বিশ্বাস করি বলুন।" দারোগা বাবু নিজের প্রশংসায় লজ্জিত হইলেন। একটু থামিয়া বিদ্যাসাগর বলিলেন—"শুনেছিলাম হাইকোর্টের জজেরা অনেক সময় মোকদ্দমা বুঝতে না পেরে আসামীকে খালাস দেয়, আপনার বেলায়ও তাই হয়েছে দেখ্‌ছি ; নইলে আপনার জেল হওয়াই ত' উচিত ছিল। সাতদিনের নাম করে টাকা নিয়ে আপনি চার দিন পরে ফেরৎ দিতে এসেছেন,

তাও আবার পুলিশের দারোগা হয়ে—আপনাকে জেল না দিতে পারলে আর আমাদের বাহাদুরী কি ?"

বলা বাহুল্য সেদিন দারোগাবাবু বেশ মিষ্টি মুখে এবং ভরা পেটেই বাড়ী ফিরিয়াছিলেন।

* * * *

ব্রাহ্মণের ছেলে, মুরগী কি নিতে পারি ?

বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে সাঁওতাল পরগণার কার্মাটাড়ে গিয়া থাকিতেন। সেখানকার সাঁওতালদের তিনি খুব ভাল বাসিতেন ; যখনই যাইতেন তাহাদের জন্য সীতাভোগ, মিহিদানা, রসগোল্লা প্রভৃতি খাবার হইতে আরম্ভ করিয়া বিলাইবার জন্য নতুন কাপড় পর্য্যন্ত সবই লইয়া যাইতেন। সাঁওতালরাও তাঁহাকে খুব ভাল বাসিত। তিনি আসিলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিত। প্রত্যেকবারই তাহারা প্রথম দেখা করিবার সময় নিজের নিজের সাধ্য মত তাঁর জন্য কিছু না কিছু উপহার লইয়া আসিত ;—সে সবের মধ্যে বাগানের তরি-তরকারী, ফলমূল এই সবই বেশী। একবার একটি সাঁওতালের হাতে কিছু না থাকায় সে বিদ্যাসাগরের জন্য একটা মুরগী লইয়া গেল। মুরগী বিদ্যাসাগর কিছুতেই লইবেন না ; পৈতা দেখাইয়া বলিলেন—



"আরে ব্রাহ্মণের ছেলে হ'য়ে মুরগী কি নিতে পারি ?" সাঁওতাল কিছুতেই ছাড়ে না, তারে, সামান্য উপহার বলিয়া বিদ্যাসাগর লইতে চাহিতেছেন না। সে পায়ে ধরিয়া মিনতি করিতে সুরু করিল। শেষে বিদ্যাসাগর দেখিলেন—তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। ভালবাসার এ দান তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর হাসিমুখে সাঁওতালের হাত হইতে মুরগীটি নিজের কোলে তুলিয়া লইলেন।

* * * *

'মেঘনাদবধ' কাব্যের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম তোমরা সকলেই জান। তাঁর মনটা ছিল ঠিক সত্যিকারের কবির মত—তেমনি আত্মভোলা, তেমনি পাগলাটে গোছের।

বিলাতে থাকিবার সময় একবার অর্থাভাবে মাইকেল ভয়ানক বিপন্ন হন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তখন তাঁহাকে সাহায্য করিয়া বাঁচাইয়াছিলেন। সেই হইতে মাইকেল ছিলেন বিদ্যাসাগরের একটি নিতান্ত অনুগত ভক্ত। বিদ্যাসাগরকে তিনি 'ভিড' ( Vid ) বলিয়া ডাকিতেন।

একবার বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্দ্ধমানে সেখানকার রাজার এক বাগান-বাড়ীতে কিছু দিনের জন্য বাস করিতেছিলেন। সেই সময় একদিন মাইকেল তাঁহার সাথে দেখা করিতে গেলেন। দুপুর রোদ, বেলা দু'টা বাজিয়া গিয়াছে, না খাইয়া না দাইয়া ঘর্ম্মাক্ত দেহে মাইকেল গিয়া বর্দ্ধমানে হাজির। পরনে তাঁর খাঁটি সাহেবী পোষাক—প্যাণ্ট কোট্, জুতা, মোজা, এই সব। খোঁজ লইয়া তিনি বিদ্যাসাগর যেখানে আছেন সেই বাগান-বাড়ীতে ঢুকিলেন। রাজার বাগান, দেখিতে যেমনটা হওয়া উচিত তেমনি ; মাঝখানে প্রকাণ্ড এক দীঘি। দেখিয়া মাইকেলের বড় ভাল লাগিয়া গেল। বিদ্যাসাগরের সাথে দেখা করিবার, খাওয়া দাওয়া সারিবার—কোন কথাই তাঁহার মনে আসিল না, "হাউ বিউটিফুল্" ( বাঃ কি সুন্দর ) বলিয়া তিনি সেই স্যুট্ পরা অবস্থায় ঝুপ্ করিয়া জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, দু' ঘণ্টা কাটিয়া যায়, মাইকেলের আর হুঁশ নাই ; তিনি মনের সুখে সাঁতার কাটিতেছেন।

দোতালার জানালা হইতে বিদ্যাসাগর দেখিলেন—এক সাহেব দুপুর রোদে প্যাণ্ট কোট পরিয়া দীঘির মধ্যে সাঁতার কাটিতেছে, উঠিবার নাম নাই। তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন সাঁতারু সাহেব নয়, বাঙ্গালার কবি মাইকেল মধুসূদন। বিদ্যাসাগর যতই চীৎকার করেন "আহা কর কি! কর কি! উঠে এস, সর্দ্দিগর্ম্মীতে মারা যাবে," মাইকেলের ফূর্ত্তি ততই বাড়িয়া যায়; তিনি শুধু বলেন "ভিড্, ইট্ ইজ্ বিউটিফুল"। এমন না হইলে আবার কবি!

* * *

এইবার বাংলার বাঘ (Bengal Tiger) নামে খ্যাত, বাঘের মতই তেজস্বী স্যার আশুতোষের একটি গল্প শোন।

একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে আশুতোষ আলিগড় গিয়াছেন। ফিরিবার পথে ট্রেনে তিনি যে কামরায় উঠিয়াছেন, ঠিক সেই কামরায় একটি সাহেবও উঠিয়াছে। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া আশুতোষের ভাল লাগিতেছিল না, তিনি উঠিয়া ট্রেনের সেই কামরার মধ্যেই পাইচারী করিতে সুরু করিলেন। আশুতোষের পায়ে ছিল এক জোড়া নতুন নাগরা। তিনি হাঁটিতেছিলেন, আর তাঁর জুতায় মশ্ মশ্ আওয়াজ হইতেছিল। সাহেব মহাপ্রভুর ইহাতে বড়ই বিরক্তি বোধ হইল;—ভাবিল, কালা আদমী, একটু চোখ পাকাইলেই সিধা হইয়া যাইবে। কিন্তু আশুতোষ কি চীজ্ সাহেবের তখনও তা জানিতে বাকী আছে; তিনি অম্লানবদনে পাইচারী করিতেই লাগিলেন। খানিক পরে আশুতোষ বসিলেন। তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিতেছিল। তিনি জুতা জোড়া খুলিয়া রাখিয়া শুইয়া চোখ বুজিলেন। আশুতোষকে ঘুমাইতে দেখিয়া সাহেব মহাশয়ের মাথায় এক কুবুদ্ধি আসিল; সে উঠিয়া গিয়া আশুতোষের জুতা জোড়া জানলা গলাইয়া ফেলিয়া দিল।

জাগিয়া উঠিয়া আশুতোষ দেখেন—নাগরা জোড়া অদৃশ্য হইয়াছে। সাহেবের দিকে চাহিয়া তাঁহার কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না; কিন্তু মুখে তিনি কিছুই বলিলেন না। খানিক পরে সাহেবেরও ঘুম পাইল। সে তার কোটটি খুলিয়া



হুকে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া শুইয়া পড়িল। আশুতোষ ধীরে ধীরে উঠিয়া সেই কোটটি লইয়া জানলার বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

সাহেবের ঘুম ভাঙ্গিলে কোটের খোঁজ পড়িল; কিন্তু কোথায় কোট? আশুতোষ মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন। সাহেব চটিয়াছিল, ক্রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "আমার কোট কি হল?" আশুতোষ মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন "আমার জুতো জোড়াটাকে ডেকে আন্‌তে গেছে।" সাহেব বুঝিল এ 'কালা আদমী'-টির কাছে চাল খাটিবে না; পরের ষ্টেশনে সে মানে মানে সরিয়া পড়িল।

আমার কোট্ কি হ'ল?

---

**চিত্র-পরিচয়:**—কুড়ি বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লইয়া বাহির হইলেন। কলেজের বড় বড় অধ্যাপকেরা নানা বিষয়ে তাঁহাকে প্রশংসা-পত্র দিলেন। এ রকম সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ ছাত্র পাওয়া তাঁহাদের ভাগ্যে বড় বিশেষ ঘটে নাই। 'উপাধি-দান' উৎসবের রঙ্গীন ছবি এ মাসে দেওয়া হইল।

# পদ্মরাগ

( অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ )

[ পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর ]

১৬

## আরব্যোপন্যাস

ভোর প্রায় হইয়া আসিয়াছে। নদীর পার দিয়া লম্বা রাস্তা বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, তারই কিনারায় একখানা ভাঙ্গা মোটর দাঁড়াইয়া। রাস্তার আর একটু এধারে, নদীর দিকে, আমাদের রণজিৎ চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে, এবং তাহারই বুকের উপর ঝুঁকিয়া অপর একটা লোক আগ্রহ ভরে তাহা লক্ষ্য করিতেছে। একটু মনোযোগের সহিত সেদিকে তাকাইলে বুঝিতে কাহারো গোল হইত না যে এই অপর লোকটী ধা—জঙ্গলের সেই পাগল। এই জন-মানব শূন্য মাঠের ভিতর পাগল কোথা হইতে রণজিৎকে আনিয়া হাজির করিল তাহা বেশ একটু ভাবিবার কথাই বটে।

অল্প একটু পরেই রণজিৎ চোখ মেলিয়া চাহিল, কিন্তু নিতান্ত উৎকণ্ঠার সহিত যে লোকটী এতক্ষণ উবু হইয়া তাহার এই জাগার প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহাকে সে চিনিয়া উঠিতে পারিল না, কহিল, "একি? কে এ?"

স্থির দৃষ্টিতে রণজিতের চোখের পানে তাকাইয়া পাগল জবাব দিল, "এই দ্বিতীয় বার।"

"দ্বিতীয় বার? দ্বিতীয় বার কি?"

"দ্বিতীয় বার ফেল্ করলেন; থ্যাব্‌ড়া মুখ, চ্যাপ্টা নাক, আর মিট্‌মিটে চোখ দেখেও ঠাওর কর্‌তে পারলেন না যে আমি চ্যাং ব্যাঙেরই জাত ভাই।"

"মিষ্টার হুকা-কাশি, মিষ্টার হুকা-কাশি!" বলিয়া রণজিৎ তার দুই দুর্ব্বল হাতে "পাগলকে" একেবারে জড়াইয়া ধরিল। হুকা-কাশিও নিজের ছোট ভাইটীর মত রণজিৎকে কাছে টানিয়া মাথায় স্নেহের হাত বুলাইতে লাগিল।

আনন্দের প্রথম বেগটা কাটিয়া গেলে রণজিৎ জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কি করে এলাম, তা তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না। সমসেরপুরে কয়েকটা লোককে মোটরে



পালাতে দেখে সন্দেহ হোলো হয়তো পদ্মরাগের সাথে তাদের সংশ্রব আছে। তাই আমিও তাদেরকে মোটরে তাড়া কর্‌লাম—সে দারুণ তাড়া, কয়েক শো মাইল তো বটেই! তারপর হঠাৎ কেমন করে আমাদের গাড়ী খানায় কি যে হয়ে গেল, সেই থেকে আমার আর কিছুই মনে নেই। আপনি কি এ সবের কিছু জানেন নাকি মিষ্টার হুকা-কাশি?"

"জানি। এ খবরটা বোধ হয় আপনার আদবেই জানা ছিল না যে, যে মোটর গাড়ী খানার পেছনে আপনি দৌড়চ্ছিলেন, সেটায় আর দুটো লোকের সাথে আমিও ছিলাম; তবে সজ্ঞানে নয়, অজ্ঞান অবস্থায়। হঠাৎ এক সময়ে চোখ খুলে গেল, দেখি হু হু করে মোটরে দৌড়ুচ্ছি আর সামনের সীটে দুটী লোক ভারী ব্যস্ত হয়ে কি সব বলাবলি কর্‌ছে।

চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে

পাশের দিকে নজর দিতেই একটা ক্লোরোফর্ম্মের শিশি চোখে পড়্‌ল। ব্যাপারটা তখন অনেক খানি পরিষ্কার হয়ে এলো,—আমায় ক্লোরোফর্ম্মে অজ্ঞান করে, এরা ছুটে পালাচ্ছে, আর পেছনে কেউ একজন এদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

"পেছনের এই 'কেউ'টা যে আপনি তা একটু বাদেই ওদের কথাবার্ত্তা থেকে আঁচ করে নিলাম। বেচারারা তাড়া খেয়ে এমনি ভেব্‌ড়ে গিয়েছিল, যে আমার বিষয়ে কোন কথা আর তাদের খেয়ালই হয় নি। আমি মানুষটাও যে ক্লোরোফর্ম্মের ঘোর কাটিয়ে আবার

চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌তে পারি, এ ভাব্‌বার বোধকরি সময় আর তারা পেয়ে উঠেনি। ব্যাপার দেখে শুনে আমিও চুপ চাপ অচৈতন্যের মতই পড়ে রইলাম। কিন্তু একটু পরেই এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল; হতভাগারা বোধকরি আগে থেকে কোন রকমে সংবাদ দিয়ে থাক্‌বে, হঠাৎ দেখি জন চারি খাকি প্যাণ্ট্ পরা লোক আমার সঙ্গী দু'টীকে অভ্যর্থনা কর্‌ছে। গাড়ী খানা একটু এগিয়ে যেতেই সেই লোক ক'টা রাস্তার এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত একটা মোটা কাছি বেঁধে দিলে। তাতে বাধা পেয়ে গেল আপনার গাড়ী খানা উল্টে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনি আর আপনার ড্রাইভার দু'জনা দু'দিকে ছিট্‌কে পড়্‌লেন।

"ছিট্‌কে পড়্‌তেই সবাই এসে আপনাদের ঘিরে দাঁড়াল, আমার সঙ্গী দুটীও কৌতূহল চেপে রাখ্‌তে না পেরে, আমায় সেই অবস্থাতেই ফেলে রেখে তাদের সাথে গিয়ে মিশ্‌লে। আমি দেখ্‌লাম এই সুযোগ। এ ভাবে ছাড়া পেয়েও এত বড় একটা জঙ্গলের ভেতর যদি জনা ছয়েক যুবকের চোখে ধুলো দিতে না পার্‌লাম, তবে আর হুকা-কাশি বলে নিজের পরিচয় দেব না। এধার ওধার হাতড়ে শুধু ক্লোরোফর্ম্মের শিশিটাই পেলাম, নকল দাড়ি-গোঁফ জোড়া তো আগেই বিসর্জ্জন দিয়েছি। সেই শিশিটাকেই কোঁচড়ে ভাল করে লুকিয়ে একটা ঝোঁপের আড়ালে গা-ঢাকা দেওয়া গেল।

"লোকগুলোর কথাবার্ত্তায় তারা যে খুব খারাপ তা কিন্তু মনে হোলো না, আপনাদেরকে বেশ যত্ন-আত্তি করেই সঙ্গে নিয়ে যাবার প্রস্তাব কর্‌লে। কিন্তু এবার জব্দ হওয়ার পালা ছিল তাদের—কোথা থেকে রৈ রৈ করে এক দল ডাকাত ছুটে এলো। গল্প-উপন্যাসের মত লাগ্‌লেও, এতে কিন্তু খুব আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই, কেননা পরে আমি টের পেয়েছি যে সে জঙ্গলটা এলাহাবাদ থেকে খুব বেশী দূরে নয়। গত চার পাঁচ বছর থেকে ডাকাতির জন্যে এ অঞ্চলটা বেশ প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। যাক্ সেকথা—অতগুলো ডাকাত দেখে এ দল তাড়াতাড়ি হুড়-মুড় করে তাদের গাড়ীখানায় সব শুদ্ধ উঠে পড়্‌ল, কিন্তু লোক যে আসলে তারা খুব খারাপ নয় তার আরও একটা প্রমাণ রেখে গেল—যাবার সময় আপনার পকেটে কয়েক-খানা নোট গুঁজে দিয়ে, যাতে ক'রে ডাকাতেরা আপনাদেরকে বেশী নিগ্রহ না করে!

"ডাকাতদের কিন্তু মৎলব দেখ্‌লাম শুধু আপনার টাকা পয়সাই লুঠ করা নয়—আপনাকে শুদ্ধ নিয়ে উধাও হতে চায়! কাজেই আমারও আপনার সঙ্গ নেওয়া দরকার হয়ে পড়্‌লো। জুতো জোড়া খুলে ছুড়ে জঙ্গলের ভেতর ফেলে দিলাম, গায়ের জামাটাকে নিয়ে তাল-গোল পাকিয়ে ঝোঁপের ভেতর বিসর্জ্জন দিলাম। বাকী রইলো শুধু চুলটাকে একটু



উস্কো খুস্কো ক'রে নেওয়া, কাপড়টাকে টেনে হাঁটুর ওপর তোলা, আর গায়ে একটু ধুলো-মাটী-লাগান—ব্যস্ দিব্যি পাগল সেজে গেলাম। তার পর যখন সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে আবার নাচ গান সুরু হোলো, তখন দেখ্‌লে আপনিই বোধ হয় নিয়ে পাগ্‌লা গারদে পুরে দিয়ে আস্‌তেন। ফলে যা ভেবেছিলাম তাই হোলো; ডাকাতেরা হিড়্ হিড়্ করে টেনে নিয়ে এলো। হিন্দুস্থানী কথাটাও বাংলার মত বেশ ভালই বল্‌তে কইতে পারি, কিন্তু তবুও ভয় হোলো, কি জানি কোন্ কথার কোন্ টানে হয়তো ধরা পড়ে যাবো; কাজেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজির বুক্‌নি দিয়ে কথা কইতে লাগ্‌লাম।

"যদি এদের ধারণা জন্মাত আমি পূরোপূরি পাগল, তবে আর কষ্ট করে আমায় এতটা পথ কিছুতেই নিয়ে যেতো না, কিন্তু যদি পূরোপূরি পাগল না ভেবে আধো পাগল আর আধো বোধ-সোধ-ওয়ালা মানুষ ঠাওরাতো, তবেই যা সঙ্গে নেবার ভরসা, কেননা কে জানে, কখন কার কাছে তাদের কোন্ কথা ফাঁস করে দেবো! এই সব ভেবে-চিন্তে মাঝে মাঝে বেশ ভাল মানুষের মতও দু চারটা কথা কইতে লাগলাম। এখানে জুট্‌লাম কোত্থেকে জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলাম, ঐ খাঁকি প্যাণ্ট পরা লোকগুলোর পেছু পেছু এসেছি। এতে করে যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই হোলো, আমায় শুদ্ধ আপনার সাথে বেঁধে নিয়ে চল্লো।

"আস্তানায় এনে দুজনকেই তারা গারদে চালান দিলে, অবশ্য আলাদা আলাদা ঘরে। আপনার ভাগ্যি ভাল যে আপনি অচেতন অবস্থায় ছিলেন, নইলে সে ঘর দেখ্‌লে বোধকরি আপনার পালোয়ানী মনও সাত হাত বসে যেতো। সেখানে ঢুক্‌তে হলে একতালা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে হয়; জানলা-দরজার কোন বালাই নেই, ওপরকার ছাতে গোটা কয়েক ফুটো, তাইতেই নিঃশ্বাস নেওয়ার কাজটা চালিয়ে নিতে হয়।

"আপনার 'খাঁচা'র সাথে আমার 'খাঁচা'র ব্যবধান মাত্র একটা পাৎলা দেয়াল। হঠাৎ বাইরে থেকে একটা শব্দ এলো 'সর্দ্দার, সর্দ্দার' এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার ঘরের ভেতর মানুষের আওয়াজ পেলাম। বুঝে নিতে বাকী রইল না যে সর্দ্দার প্রভু আপনার ঘরে ঢুকেছেন। আমার পালাও শীগ্‌গিরই আস্‌ছে ভেবে, তৈরী হয়ে রইলাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে রাত্রে আমার ওপোর হুজুরের দয়া আর হোল না। হোলো পরের রাত্রে। হু হু করে দারুণ বৃষ্টি পড়্‌ছে, হাওয়াও জোর বইছে, হঠাৎ ঝন্ ঝন্ করে ঘরের দোর খুলে গেল, দেখি একটী মূর্ত্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে আস্‌ছে। তার হাতে একটা আলো মিট্ মিট্ করে জ্বল্‌ছিল বটে, কিন্তু তাতে শুধু তার অপর হাতের চাবিরগোছাটাই দেখা যাচ্ছিল; চেহারা এতটুকু নজরে

আসছিল না। চাবির গোছাটা চোখে পড়তেই এক মুহূর্ত্তে আমি আমার কর্ত্তব্য ঠিক করে ফেল্লাম। আমাদের জাপান দেশে ছোট বড় সবাই 'যুযুৎসু' নামে এক রকম কসরৎ শেখে; তাতে করে ছোট ছেলেটি পর্য্যন্ত বড় বড় পালোয়ানদের ঘাল করে দেয়। সর্দ্দার বেচারা কিছু টের পাবার আগেই আমি তড়াক্ করে উঠে দিলাম যুযুৎসুর এক প্যাঁচ কসে; তার আর নড়বার যোটী পর্য্যন্ত রইল না, গলার ওপর প্যাঁচ পড়ায় চেঁচাবার ক্ষমতাটা পর্য্যন্ত লোপ পেয়ে গেল। তার পর কোঁচড় থেকে ক্লোরোফর্ম্মের শিশিটা খুলে নিয়ে তা'র নাকের ডগায় ধর্‌তেই ধীরে ধীরে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেল্লে। এবার পালাবার পালা। অন্ধকারে হাতড়ে টের পেলাম, সর্দ্দারের গায়ে আছে এক ওয়াটার প্রুফ আর মাথায় একটা রুমাল বাঁধা। ঠিক সর্দ্দারের মত করেই ও দুটো পরে নেওয়া গেল, আর চাবিটা সঙ্গে নিতেও ভুল্‌লাম না। সিঁড়ি বেয়ে একতালার ওপর উঠতেই দেখি দরজার সাম্‌নে ইয়া গালপাট্টা-ওয়ালা এক পালোয়ান গারদ পাহারা দিচ্ছে, কোমরে ইয়া বড় ছোরা ঝোলান। আমার পোষাকে সর্দ্দার ব'লে ভুল ক'রে সে একটু সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল। পাশের কুঠুরীতে আপনি বন্দী আর তার চাবি আমার হাতে, এ লোকটাকে এখন এড়াতে পারলেই বাজী-মাৎ। অসুবিধা কিছুই হোলো না, যুযুৎসু আর ক্লোরোফর্ম্মের দৌলতে দারোয়ানের বাছা'ও ঘাল হয়ে পড়্‌লেন।

দারোয়ানের বাছা ঘাল



"আপনার খাঁচায় ঢুকে, আপনাকে কাঁধে করে আবার একতালায় উঠে এলাম। একটা খোলা জান্‌লা ছিল, তা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়্‌তে কোনই কষ্ট হোল না। বৃষ্টি তখন চারগুণ বেড়ে গেছে, ঝড়ের নাচন সুরু হয়েছে।

"ভগবান্ যখন দেন তখন সব রকমেই দেন; নইলে বাইরে এসে যা দেখ্‌লাম তাতে আমার চোখের ওপরই অবিশ্বাস হোলো। দেখি সাম্‌নেই আপনার সেই ভাঙ্গা মোটর গাড়ী-খানা দাঁড়িয়ে। ব্যাপারটা কি গোড়ায় ধর্‌তে পারলাম না, কিন্তু একটু এগিয়ে যেতেই বেশ বোঝা গেল। গাড়ীখানা ও অবস্থায় নিজেদের কাছে রাখা খুব নিরাপদ হবে না জেনে, ব্যাটারা রাত্তিরে রাত্তিরে ওটার চেহারা বদ্‌লে ফেলার মৎলবে ছিল। আজ রাত্রেও সে কাজ চল্‌ছিল —গাড়ীখানার অবস্থা দেখেই তা বোঝা গেল—কিন্তু হঠাৎ জল এসে পড়ায় ওভাবে রেখে সবাই বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়েছে। দু'হাত তুলে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিয়ে গাড়ীতে চড়ে বস্‌লাম। বনের ভেতরেই টের পেয়েছিলাম গাড়ীখানা সাউণ্ড-লেস্—আর কি পূরোদমে চালিয়ে দিলাম। পথেই আপনার জ্ঞান হ'য়েছিল কিন্তু বেশী দুর্ব্বল বলে আবার ঘুমিয়ে পড়্‌লেন। তার পর এই এখনই সবে জেগে উঠেছেন। কেমন, একখানা ছোট খাট আরব্যোপন্যাস নয়?"

বহুক্ষণ রণজিৎ স্তব্ধ হইয়া রহিল, তার পর ধীরে ধীরে কহিল, "জঙ্গল থেকে বেরিয়ে খানিকটা বাদে নিশ্চয়ই ওরা টের পেয়েছিল যে আপনি শেকল কেটে ভেগে পড়েছেন —তখন ওদের মুখের চেহারাটা কেমন হয়েছিল সেইটে শুধু আমি কল্পনা করছি!"

বাস্তবিকই মুখের ভাব খুব বেশী রকমই খারাপ হইয়াছিল। উদয়েন্দুর মত অসম-সাহসী যুবকের দল জগদীশের যে একটা মাত্র কথায় অমন এলাইয়া পড়িল, সেটী আর কিছুই নয়, এই "মারাত্মক" খবরটী।

কিন্তু তারা আরও একটু আগাইয়া গিয়াছিল, ভাবিয়াছিল পদ্মরাগ কাড়িয়া লওয়ায় হুকা-কাশির হাত নিশ্চয়ই আছে। এটীই হইতেছে ভুল—সে ব্যাপার তখন পর্য্যন্ত হুকা-কাশির সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। রহস্য ক্রমেই গভীর হইয়া উঠিতেছে।

১৭

## গোলাপী কাগজ

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়া গেলে, রণজিৎ দেখিল তাহার সোনার ঘড়ি, আংটী, বোতাম প্রভৃতি যা কিছু ছিল সবই অন্তর্হিত হইয়াছে। বলিল, "ছুঁচোরা কিছুই রাখেনি, যা

পেয়েছে সব লুটে পুটে নিয়েছে।” পকেটে হাত দিতে বুঝিল টাকাকড়িরও সেই অবস্থা— বাহির হইল শুধু একটা ভাঁজ করা গোলাপী কাগজ—সেই কাগজখানা যা' সিংজী ও মহেশ দয়া করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। খুলিয়া পড়িতেই তার বিস্ময়ের আর অবধি রহিলনা—একখানা টেলিগ্রাম, তাতে লেখা আছে “রত্ন যাইতেছে। রণজিৎ। ধা—। টেলিগ্রাম যে করিয়াছে তার নাম গুহ, কিন্তু কোথা হইতে করিয়াছে, বা কা'কে করিরাছে তা' জানার আর কোন উপায়ই নাই, কাঁচি দিয়া সযত্নে সে সব কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। বিহ্বলভাবে তার খানা হুকা-কাশির হাতে দিয়া সে কহিল, “দেখুন, দেখুন একি কাণ্ড!”

ধীরভাবে হুকা-কাশি টেলিগ্রামখানার উপর বার দুই চোখ বুলাইয়া লইলেন, শেষে কহিলেন, “তাই তো', এ খানা আবার আপনার পকেটে এল কি করে, কিছু বুঝে উঠ্‌তে পারছেন কি?”

“বোধ হয় পেরেছি। আপনি যে একটু আগে বল্লেন, ডাকাতদের আস্‌তে দেখে খাঁকি পোষাকপরা লোকগুলো কয়েকখানা নোট আমার পকেটে গুঁজে দিয়ে দিলে, সে সঙ্গে বোধহয় এখানাও দিয়েছে। উদ্দেশ্যটা একটু ঠাট্টা করা—আমার তুলনায় তারা যে কত চালাক সেইটে বুঝিয়ে দেওয়া। অবশ্য ধরা পড়বার ভয়ে নাম-টাম গুলো আগে থেকেই বাদ দিয়ে রাখ্‌তে হয়েছিল।”

“হুঁ।…কিন্তু ঠাট্টা কি?…ঠাট্টা হলেও এ কিন্তু একটু বেশী রকম সাহসের ঠাট্টা!”

রণজিৎ কহিল, “অবশ্য এমনও হতে পারে যে তার খানা পেয়ে গোড়াতেই তারা নাম ঠিকানাগুলো কেটে ফেলে সেটা পকেটে রেখে দিয়েছিল। তার পর জঙ্গলের ভেতর পকেট থেকে নোট বের করবার সময় ডাকাতের তাড়ায় ভড়্‌কে গিয়ে তাড়াতাড়িতে সেই সাথে এটাও চালান দিয়ে দিয়েছে।”

“হুঁ, তাও হ'তে পারে।” বলিয়া হুকা-কাশি আস্তে আস্তে গম্ভীর হইতে আরম্ভ করিলেন। লোকটির রকম সকম বাস্তবিকই অদ্ভুত, কখন যে অট্টহাস্য করিয়া উঠিবেন আর কখনই যে ধ্যানী বুদ্ধ সাজিবেন বলা বড়ই শক্ত।

নীরবতা ভঙ্গ করিলেন প্রথমে কিন্তু হুকা-কাশিই, কহিলেন, “আসবার সময় দু'একটা রেল-ওয়ে ষ্টেশন পেরিয়ে এসেছি, মাইল পোষ্টগুলোও লক্ষ্য করেছি—এলাহাবাদ সহর এখান থেকে খুবই কাছে। আপাততঃ মোটরে সেখানেই যেতে হবে। কথা হচ্ছে এখন টাকার, আমার ট্যাঁক ও শূন্য, আপনার পকেটও শূন্য।”



রণজিৎ বাঁ হাতে তার ডান কনুইটা অনুভব করিয়া কহিল, “সে হ'য়ে যাবে'খন, আমার হাতে একটা সোণার চেনে বাঁধা মাদুলী আছে। দু'পয়সা দামের কারেই কাজ চল্‌তে পারে, সোণার চেন শুধু মায়ের সখ। ওটা বেচ্‌লে ত্রিশ চল্লিশ টাকা কোন্ না পাওয়া যাবে? তা'হলেই দু'তিন দিনের জন্যে নিশ্চিন্তি! তার পর এলাহাবাদে গিয়ে পৌঁছুলে আর টাকার জন্যে ঠেকে থাক্‌বে না—যতক্ষণ দেশে টেলিগ্রাফিক মাণিঅর্ডার বলে জিনিষটা রয়েছে।”

“যাক্, প্রথম ভাবনাটা তবে চুকে গেল! এখন এলাহাবাদে গিয়ে আমাদের সব চাইতে আগে কি কর্ত্তব্য বলুন দেখি!”

“মোটর খানা রাজা বাহাদুরের কাছে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা।”

“সেটা দ্বিতীয় কাজ, প্রথমে খোঁজ নিতে হবে, ভাল থিয়েটার কোন্‌টা।”

রণজিৎ অবাক্ হইয়া গেল, কহিল “থি—য়ে—টা—র?”

“হ্যাঁ, থিয়েটার। দু'জোড়া গোঁফ যোগাড় কর্‌তে হবে, একটু আধটু সতর্ক হওয়া মন্দ নয়!”

এলাহাবাদে পৌঁছিয়া গোছ-গাছ করিয়া নিতেই সে দিনটা কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতে হুকা-কাশি ও রণজিৎ একত্র বাহির হইয়াছিলেন, পথে চলিতে চলিতে হুকা-কাশির ক্ষুধা বোধ হইল। একজন বাঙ্গালীকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মশাই, কাছে কোথাও ভাল রেষ্টুরেণ্ট আছে, বল্‌তে পারেন?” লোকটি ছিল একটু বাচাল, একটী কথার উত্তরে দশটী কথা কহিত। বলিল, “এই তো মশাই একটু এগোলেই সোলোমন সাহেবের বিখ্যাত রেষ্টুরেণ্ট। নতুন এয়েছেন বুঝি? বেড়াতে, না চাকুরী কর্‌তে? নাকি ব্যবসা-ট্যাবসার মৎলব ফেঁদেছেন?

হুকা-কাশি জানাইলেন যে ব্যবসা করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। উত্তরে লোকটি বলিল, “ব্যবসাই তো আদৎ মশাই, ব্যবসাই তো আদৎ। ওর তুল্য কি জিনিষ আছে? এই সোলেমন ট্যাঁস-টাকেই ধরুন না! যখন এলো, কি অবস্থা, যেমন ময়লা রং, তেম্‌নি ময়লা পোষাক-পত্তর, যেন কয়লার খনি থেকে উঠে এয়েছে। আর, পাঁচটী বছর যেতে না যেতে মশাই, হোটেল-রেষ্টুরেণ্টের ব্যবসা ফেঁদে আজ তো ও রাজ-রাজড়া! তা' কিসের ব্যবসা কর্‌বেন মশাই, অরহড়ের না ভুট্টার?”

রণজিৎ মনে মনে বলিল, “ঘাসের, নইলে তুমি খাবে কি?”

সোলোমন সাহেবের রেষ্টুরেণ্টে ঢুকিয়া হুকা-কাশি ও রণজিৎ পাশাপাশি খাইতে বসিলেন।

সাহেব নিজেই উপস্থিত ছিল—দিব্যি হাসি-খুসি, খোস-মেজাজী, আধা-বয়সী লোকটী, প্রত্যেককে মিষ্টি কথায় খাতির আপ্যায়িত করিতেছে। দোকানে লোকজনের যাওয়া-আসাও হরদম।

হঠাৎ হুকা-কাশির চোখে পড়িল, একটী লোক ধীরে ধীরে তাঁহাদের পাশ কাটাইয়া ঠিক সামনের আসনটীতে গিয়া বসিতেছে। সে এদিকে লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু হুকা-কাশি তাহাকে দেখিয়াই অতি মাত্রায় ব্যস্ততার সহিত একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পাশেই ছিল হাত ধোয়ার ঘর, রণজিতের পিঠে মৃদু করাঘাত করিয়া হুকা-কাশি সেই ঘরটীতে গিয়া ঢুকিলেন।

ইঙ্গিত অনুযায়ী রণজিৎ পেছন পেছন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইতেই, হুকা-কাশি কহিলেন, "ব্যাপার হয়েছে মন্দ নয়, আমাদের সামনের টেবিলে যে লোকটা চা' খাচ্ছে ও হচ্ছে সেই লোক, যে আপনার সাথে জঙ্গল পর্য্যন্ত মোটর চালাবার পাল্লা দিয়ে আস্‌ছিল। কিন্তু…" বলিয়াই খপ্‌ করিয়া রণজিতের হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন "ওকি! আপনি অতটা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ছেন কেন? না না না, এখন কিছুই করতে পাবেন না, সমস্ত ভেস্তে যাবে তা হ'লে। সাধারণ শ্রেণীর চোর-ডাকাত এরা মোটে নয়, গলা কেটে ফেল্লেও কিছু কবুল কর্‌বে না। মাঝে থেকে দলের আর সবাই পদ্মরাগ নিয়ে সরে পড়্‌বে।"

"তবে এক্ষুণি পুলিশে খবর দেওয়া যাক্।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া হুকা-কাশি বলিলেন, "সেই তো হয়েছে মুস্কিল, এ কেস্ পুলিশের হাতে আদবেই দেওয়া চল্‌বে না।"

এ উত্তরে রণজিৎ যে খুসী হইতে পারিল না হুকা-কাশি তাহা বুঝিলেন, কহিলেন, "আমার ওপর খানিকটা নির্ভর করুন, রণজিৎ বাবু, একবার নাগালের ভেতরে এসে, এরা আর তার বাইরে যেতে পার্‌বে না। এটুকু বিশ্বাস আপনি রাখুন! আমি এখন এ লোকটার পেছু নেব। আপনি আপাততঃ হোটেলে ফিরে যান, আমার বিশ্বাস, অনেক গুলো খবর সংগ্রহ করে ঘণ্টা দু'তিনের ভেতরেই আমি ফির্‌তে পারবো।"

(ক্রমশঃ)

---

(**দ্রষ্টব্য**ঃ—আগামী মাস হইতে আর একটী বড় গল্প 'রামধনু'তে ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইবে। 'পদ্মরাগ'ও চলিতে থাকিবে।)

# ভূতের বাড়ী

[ সত্য ঘটনা অবলম্বনে ] *

( অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, এম্-এ বি-এল্ )

বর্ষাকাল। সারাদিন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়াতে রাস্তাঘাটে এত কাদা হইয়াছে যে আর বাহির হইতে প্রবৃত্তি হয় না। তাই সন্ধ্যার পর কয়েক বন্ধুতে মিলিয়া আমরা বৈঠকখানাতে বসিয়া গল্পগুজবে সময় কাটাইতেছিলাম। নানাপ্রকার গল্পে রহস্যে আড্ডাটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে সেই দুর্য্যোগের মধ্যে দেখি হঠাৎ আমাদের এক প্রাচীন বন্ধু আসিয়া হাজির। কিম্ভূত কিমাকার চেহারা; গায়ের উপরে চাপাইয়াছেন এক বর্ষাতি, তার নীচে এক প্রকাণ্ড ওভারকোট; গলায় গলাবন্ধ। মোটকথা সেই রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া ঝড়-জলের মধ্যে বন্ধু যখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন বেশ একটু জমকালো গোছই দেখাইতেছিল। বর্ষাতি ও ওভারকোটটি ছাড়িয়া বন্ধু বসিলেন; তার পর গরম এক পেয়ালা চা খুব আরাম-সহকারে পান করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে তোমাদের আড্ডা ত খুব জমেছে দেখ্‌ছি। কি গল্প হচ্ছে?" কয়েকটি বন্ধু সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এই বর্ষার সন্ধ্যায় ঘরে বসে আর কি গল্প হবে? ভূতের গল্প হচ্ছে।" তিনি বলিলেন, "বল কি, ভূতের গল্প? স্বচক্ষে ভূত দেখেছ কখনো যে বড় ভূতের গল্প কর্‌ছ?" আমরা বলিয়া উঠিলাম, "স্বচক্ষে কে আর দেখেছে? তবে খুব বিশ্বাসযোগ্য যে সব গল্প যে শুনেছে, সে সেই গল্পের ঝুলি এখানে আজকে ঝাড়্‌ছে।" বন্ধু তখন গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আরে, সে সব গল্প উড়ো কথা। যদি সত্যি গল্প শুন্‌তে চাও ত আমার কাছে শোন। আমি স্বচক্ষে ভূত দেখেছি। সে আবার একটা আধটা নয়—তিন তিনটে ভূত!" আমরা বলিয়া উঠিলাম "বলেন কি? স্বচক্ষে ভূত দেখেছেন? শীগ্‌গির বলুন কি হয়েছিল।" এই বলিয়া আমরা সবাই খুব উৎসুকভাবে তাঁহার গল্পের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। বন্ধু একটুকাল নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন ঃ—

সে অনেক দিনের কথা। ১৮৯৭ সাল। ত্রিশ বছরেরও ওপর হয়ে

---

* লেখক মহাশয়ের বন্ধু রামধনু সম্পাদককে একবার একটা ভূত দেখাইতে পারেন কি? বয়স ত অনেক হইয়া গিয়াছে কিন্তু চেষ্টা করিয়াও কখন ভূত দেখার সৌভাগ্য ঘটে নাই। আশা করি রামধনুর পাঠক পাঠিকারাও সম্পাদকের মত ভূতের ভয় করিবে না।—রাঃ সঃ

গেছে। তখন আমি কাশীতে চাক্‌রী করি। বিষয়-কর্ম্মেতে আমার বেশ সুনামই ছিল। বোধ হয় কারও কাছে আমার সুখ্যাতি শুনে অযোধ্যা অঞ্চলের এক বড় তালুকদার—খেতাব তাঁর রাজা বাহাদুর—আমাকে তাঁর জমীদারীর দেওয়ান হবার জন্যে আহ্বান কর্‌লেন। ভাবলুম, যাওয়াই যাক্ না, অত বড় একজন তালুকদারের দেওয়ান হওয়া কিছু মন্দ কথা নয়! তাঁকে তার করে দিলাম যে তাঁর আহ্বানে আমি রাজী। আউধ রোহিলখণ্ড রেলওয়েতে একটা ষ্টেশন আছে, নাম আকবরপুর। সেইখানে নেমে ত্রিশ মাইল হাতীর পিঠে চ'ড়ে যেতে হবে আমাকে। আমার কোনই অসুবিধা হ'ল না—তার করা ছিল, কাজেই রাজা বাহাদুর আমার জন্যে সমস্ত বন্দোবস্তই করে রেখেছিলেন; আমি ট্রেণ থেকে নেমে দিব্যি হাতী' পর হাওদা তার ওপরে চ'ড়ে আমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গলুম। গিয়ে রাজা বাহাদুরকে সেলাম জানালুম। তিনি বিশেষ আদর যত্ন করলেন। তাঁর ব্যবহারে বাস্তবিকই খুব ভাল লাগ্‌ল। আহারান্তে একটু বিশ্রাম করার পর রাজা বাহাদুর ডেকে পাঠালেন, এবং বল্লেন, "দেখুন, আপনার থাকবার জায়গা একটু আপনি নিজে দেখে শুনে বেছে পছন্দ করে নিন্। অনেকগুলোই বাড়ী আছে। আমি লোকজন সঙ্গে দিচ্ছি, তারা আপনাকে সাথে করে নিয়ে সব দেখিয়ে দেবে।" আমি লোক জন নিয়ে সেই সব বাড়ী দেখ্‌তে বেরলুম। কিন্তু আসল কথা কি,রাজা বাহাদুর যতই বড় লোক হন,বাড়ীগুলো সেই সব সেকেলে ধরণের—সব অন্ধকার কুঠুরী, তার ওপরে বেশ স্যাঁতসেঁতেও বোধ হল; মোটকথা আমাদের আধুনিক বাঙ্গালী পছন্দে কোনটাই তেমন সুবিধে বোধ হল না। এই ভাব বুঝতে পেরে আমার সঙ্গের একটী লোক বল্লে "দেখুন, আর একটা বাড়ী আছে—বাংলো প্যাটার্ণের। আগে নীলকুঠির এক সাহেবের ছিল, এখন রাজা বাহাদুরের এক আত্মীয় সেটা কিনেছেন। রাজা বাহাদুর ইচ্ছে কর্‌লেই সেটা আপনার জন্যে ঠিক হতে পারে। তবে অসুবিধার মধ্যে এই যে বড় দূর, আর নিকটে কোথাও জন-মানব নেই।" আমি ভাবলুম, নাই বা থাক্‌ল জন-মানব, আর এ দূর কটুহলেই বা ক্ষতি কি, বাড়ীটী ভাল হলেই হল। এই ভেবে ফিরে



গিয়ে রাজা বাহাদুরকে জানালুম যে এই বাড়ীগুলো ত মোটেই আমার পছন্দ হল না, তবে শুন্‌ছি নাকি দূরে সুন্দর একটি সাহেবের বাংলো আছে, সেটা যদি অনুগ্রহ করে বন্দোবস্ত করে দেন তবে বোধ হয় ভাল হয়। আমার এই কথা শুনে তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং একটু বিরক্তভাবেই বল্লেন, "সে বাড়ীর কথা আপনাকে কে বল্লে? সে অনেকটা দূর, আর তা'ছাড়া সে বাড়ীতে আপনাকে কোনমতেই আমি যেতে দিতে পারি না, গুরুতর কারণ আছে।" আমার অত্যন্ত কৌতূহল হল, ব্যাপার কি? অনেক করে পীড়াপীড়ি করলুম, কিছুতেই রাজা বাহাদুর আর কোন কথা ভাঙ্গতে চান না। শেষে আমায় একেবারে নাছোড়বান্দা দেখে বল্‌লেন "দেখুন, সে বাড়ী একটা ভূতুড়ে বাড়ী। যে লোক একরাত সে বাড়ীতে কাটাতে গিয়েছে পরদিন ভোরবেলা আর তাকে জ্যান্ত পাওয়া যায়নি। আপনি একজন বিদেশী লোক, বিশেষতঃ আমি আপনাকে আহ্বান করে আমার কাজের জন্যে এখানে এনেছি, অমন নিশ্চিত বিপদের মুখে কি আপনাকে আমি ফেলে দিতে পারি? সে হতে পারে না।" আমি তখন বল্লুম "রাজা বাহাদুর, আমার কথায় কোন অপরাধ নেবেন না। আমি ওসব ভূত-প্রেত কিছু বিশ্বাসই করি না, কোন ভূত আমায় ভয় দেখাতেও সাহস করবে না। এই ভূতের উপদ্রবই যদি আপনার অমতের একমাত্র কারণ হয় তা'হলে আমায় সেখানে থাক্‌তে অনুমতি দিন। আপনার কোন চিন্তা নেই।" এই রকম করে অনেক বলাতে তিনি শেষে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হলেন, এবং কর্ম্মচারীদের হুকুম দিলেন সে বাড়ীটায় থাকবার সব বন্দোবস্ত করতে।

নতুন বাড়ীতে যাওয়ার জন্যে বিকেলবেলা বেরিয়ে পড়লুম। হেঁটেই চল্লুম; সঙ্গে আমার নিজের এক চাকর। বেড়াতে বেড়াতে যখন বাংলোর কাছে গিয়ে পৌঁছলুম তখন ঘোর সন্ধ্যা। বেশ সুন্দর জায়গাতে বাংলোখানি, আর বেশ উঁচু ভিতের ওপর। চারদিকে অনেক দূর একেবারে ফাঁকা মাঠ। বাংলোখানির ঠিক চারপাশে সুন্দর ফুলবাগান, একটু দূরে দুই একটা বড় গাছও আছে। সাহেবের তৈরী বাড়ী কিনা, সাহেবি পছন্দ মতই সব বন্দোবস্ত। আমার বেশ

ভাল লাগ্‌ল। ভাবলুম রাজা বাহাদুরের কথায় ভয় পেয়ে সেই সব অন্ধকার স্যাঁতসেতে বাড়ীগুলোর একটাতে বাসা নিলে কি আহাম্মুকীই করতুম। এমন দিব্বি সুন্দর ফাঁকা জায়গায় নাকি আবার ভূতের উৎপাত! যত সব কুসংস্কার! বাড়ীখানিতে ঢুকলুম। গুটী চারেক ঘর। তাড়াতাড়িতে সব ঘরগুলি আর খুলে দিতে পারেনি; রাজার লোকজনেরা আজকার জন্যে একটি ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছে, আমার জিনিষপত্র একধারে রেখেছে, খাট পেতে আমার বিছানা পেতে দিয়েছে, আর একটি আলো রেখেছে। দূরে বাইরে একখানা রান্নাঘর আছে, সেখানে আর একটা আলো জ্বলছে। আমার ঘরের দরজা জানালাগুলি খুলে রেখেছে; আর সব ঘরের দরজা জানালা বন্ধ। যাহোক্ আজকে আর হাঙ্গামা করে ওসব ঘর খুলিয়ে কি হবে, পরে দেখা যাবে। এই ভেবে কাপড় চোপড় ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে, বিছানার কাছে একটা টেবিল পাতা ছিল, সেই টেবিলের ওপরে চিঠির কাগজ নিয়ে আমার ভাইয়ের কাছে একখানা চিঠি লিখ্‌তে বসে গেলুম। কতক্ষণ পরে রাজার যে লোকজন ছিল তারা এসে আমার খাবার,আমার ঘরেই দিয়ে গেল,এবং আমার কাছ থেকে বিদায় নিল। সবারই চোখে মুখে দেখলুম যেন কেমন একটা ত্রস্ত শঙ্কিত ভাব—নেহাৎ রাজা বাহাদুরের হুকুমে খাবার দেবার জন্যে এখানে এসেছে। পালাতে পারলেই বাঁচে। বুঝলুম যে ভূতের ভয়ই এর কারণ। যাক্ আমি ত ভূতটূত গ্রাহ্য করি না; মনে মনে একটু বেশ অবজ্ঞার হাসি হেসে আমি তাদেরকে স্বচ্ছন্দে বিদায় দিলুম। আমার সঙ্গে যে চাকরটী ছিল, সেও এখানে এসে পৌঁছবার পরই, তার কে এক আত্মীয় আছে কাছাকাছি কোথাও, এই বলে চলে গিছ্‌ল। কাজেই আমি রইলুম একা। যাক্ তাতে আমার মনে বিশেষ কিছু ভয় হল না।

ভায়াকে চিঠি লিখতে লিখতে বেশ একটু রাত হল। চারদিক্ একেবারে নীরব নির্জ্জন। লেখা শেষ হলে সেই নির্জ্জনতা বেশ অনুভব করতে পারলুম। ভাবলুম যে এখন খাওয়ার যোগাড় করা যাক। তার পরে ঘুম। আর মনে মনে হাসি পেল, কৈ, এত রাত হল, ভূতের ত কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। যত



বাজে গল্প! এই ভেবে একটু এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, হঠাৎ দেখি আমার পাশের ঘরের যে দরজাটা বন্ধ ছিল সে দরজাটা ঈষৎ খুলে গেছে; তারপর বেশ অনেকখানি খুলে গেল; আর তার ভেতর থেকে এক খানা হাত বেরিয়ে এল; হাতের ওপর কালো বনাতের কোটের হাতা—একেবারে স্পষ্ট দেখতে পেলুম। একটু তাকিয়ে থাক্‌তেই সে হাতখানা অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার গা ঝিম ঝিম করে উঠল। এটা হল কি? এই সেই ভূত নাকি? দূর হোক্ গে ছাই, এত সহজে ভয় পেলে ত চলবে না! একবার সাহসে ভর করে দেখেই আসি না ঘরটার ভেতরে; কোন লোকও ত দুষ্টুমী করে এরকম ভয় দেখাতে পারে? টেবিলের ওপর যে মোমবাতি জ্বলছিল সেখানা তুলে নিয়ে, যে দরজার ভেতর দিয়ে হাতখানি বেরিয়েছিল সেই দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকে দেখি যে, সব দরজা জানালা বন্ধ (যেমন আগেও ছিল) কিন্তু কেউ কোথাও নেই। আমাদের এই দুই ঘরের মাঝ খানের দরজা ছাড়া আর কোথাও দিয়ে কোন লোক বেরুবারও সম্ভাবনা নেই। আমি কিছুতেই ব্যাপারটার একটা যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারলুম না। কতক্ষণ মিছে ঘোরা-ঘুরি করে আবার আমার নিজের ঘরে এসে বসলুম। মনকে বোঝাতে লাগলুম যে হয়ত বা চোখেরই একটা ভুল হয়ে থাক্‌বে। কিন্তু নিশ্চিন্ত আর হতে পারলুম না। খাওয়া টাওয়া পড়ে রইল, আর ঘুমের ত কোন সম্ভাবনাই রইল না!

কিছুক্ষণ এই রকম যায়, এমন সময়ে হঠাৎ আমার ঘরের বাইরের দরজার দিকে নজর পড়ল—যে দরজা দিয়ে বাইরে থেকে এসে আমার ঘরে ঢোকা যায়। নজর পড়বার কারণ ছিল, মনে হল—ওদিকে কিসের যেন একটা আবির্ভাব হয়েছে। তাকিয়ে দেখি যে একটা হিন্দুস্থানী চাপরাশীর মত লোক নিঃশব্দে এসে উপস্থিত হয়েছে। উর্দ্দি পরা, কোমরে চাপরাশ আঁটা, ঠিক একটী জ্যান্ত চাপরাশী! কিন্তু মুখ কি ভয়ানক বিবর্ণ, একেবারে মড়ার মুখের মত শাদা। দরজা পার হয়ে এসে ঘরে ঢুকল, কিছু বল্‌লে না, শুধু সেলাম করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল; তারপরে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে কোথায় যেন

মিলিয়ে গেল। এই নতুন ব্যাপারে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম, ভাবলুম, এবার ত আর অবিশ্বাস করা যায় না। সত্যিই ত দেখছি, ভূত এসে বাড়ীতে হানা দিচ্ছে। আবার কখন কি হয় এই আশঙ্কায় অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে সময় কাটাতে লাগলুম। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেল, নতুন কিছুই ঘটল না। বোধহয় এই রকম করে ঘণ্টা দুই কেটে গিয়ে থাক্‌বে নিরুপদ্রবে; তাই ভাবলুম আর কিছু বোধ হয় হবে না; কোন রকমে একবার একটু বিছানায় শুয়ে ঘুমের চেষ্টা দেখা যাক্। এই ভেবে বিছানায় গা ঢেলে দেবার বন্দোবস্ত করছি এমন সময় সেই পাশের ঘরের দরজাটা আবার খুলে গেল, আর তার থেকে ধীরে ধীরে বেরুল একটি স্ত্রীমূর্ত্তি। বেশ সুন্দর চেহারা কিন্তু মুখের ভাব অতি বিষণ্ণ গম্ভীর। আমার ঘরের ভেতর একটু ঢুকে মাথা নীচু করে খানিকটা দাঁড়িয়ে রইল। কোলেতে মনে হল কিসের যেন কাপড় জড়ান একটা পুঁটুলী। আমি ত ভয়ে ততক্ষণে একেবারে কাঠ হয়ে গেছি; নির্নিমেষনেত্রে একেবারে শুধু এই নতুন আবির্ভাবটির দিকে চেয়ে রয়েছি। স্ত্রীমূর্ত্তিটিকে নীরব দেখে একবার মনে হল যে সাহস করে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। মুখ নাড়তে চেষ্টা করলুম কিন্তু কোন শব্দই মুখ থেকে বেরুল না, এমনই আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলুম। হঠাৎ দেখি কি সেই স্ত্রীমূর্ত্তি পুঁটুলীটি আমার টেবিলের দিকে ছুঁড়ে মারল; পড়বার ধাক্কায় টেবিলটা কেঁপে উঠল; তাকিয়ে দেখি, টেবিলের ওপর একটী সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ। আমি একেবারে শিউরে উঠে প্রায় হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। শিশুটীর মৃতদেহের থেকে চোখ সরিয়ে আমি স্ত্রীমূর্ত্তির দিকে তাকাতে গিয়েই দেখি, তৎক্ষণে সে মূর্ত্তি মিলিয়ে গেছে। পরক্ষণেই টেবিলের দিকে চোখ ফেরাতেই দেখি যে শিশুদেহটীও অন্তর্দ্ধান। হতবুদ্ধি হয়ে কি যে কর্‌ব ঠিক পাচ্ছিলাম না। একবার ভাবলুম যে এই ভূতুড়ে বিষম বাড়ী থেকে দৌড়ে কোথাও পালিয়ে যাই। আবার ভাবলুম, যাবই বা কোথায়, এ বাড়ীর কাছাকাছি ত কোন লোকালয় নেই; আর তা ছাড়া রাজাবাহাদুরের কাছে আমার নির্ভীকতার এত বড়াই করবার পর এখান থেকে পলায়ন করলে আমার মানই বা থাকে কি



ক'রে? তা ছাড়া এও মনে হল, হ'ক গে ভূত, তারা ত শুধু দর্শন দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে। কোন অনিষ্ট ত করে নি। দেখাই যাক্ না কতদূর ব্যাপার গড়ায়। এই রকম সাতপাঁচ ভাবছি এমন সময়ে সেই মড়ার মতন দেখতে চাপরাশী আবার ঘরে এসে হাজির। এসে একেবারেই টেবিলের ওপর যে মোমবাতি জ্বলছিল সেটী হাতে তুলে নিয়ে আমায় ইঙ্গিত করলে, তার সঙ্গে যেতে। তার ইঙ্গিত অমান্য করতে সাহস হল না, তার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লুম। সিঁড়ি দিয়ে নেমে ফুলবাগান পেরিয়ে মাঠের ভেতর পড়লুম। কতকদূর গিয়ে দেখি একটা কাঁঠাল গাছ। সেই কাঁঠাল গাছ তলায় গিয়ে আমার সঙ্গীটি থামল; গাছের একটা ডালে বাতিটা লাগিয়ে রেখে দু'হাত দিয়ে গাছের গোড়াটার মাটি আঁচড়াতে লাগ্‌ল। অনেকখানি আঁচড়িয়ে বেশ খানিকটা গর্ত্ত করে হঠাৎ বাতি নিবিয়ে আমার সঙ্গী নিমেষের মধ্যে শূন্যে মিলিয়ে গেল। সেই বিজন প্রান্তরের মধ্যে অন্ধকার সেই গাছতলায় শেষরাত্রিতে আমি তখন একা। আমার অবস্থা তখন কি রকম তা আর বেশী ব্যাখ্যা করে না বল্‌লেও তোমরা ত বুঝতেই পাচ্ছ। কোন রকমে কাঁপতে কাঁপতে হাত-পা জড়িয়ে মাটির ওপর বসে শুধু কখন ভোর হবে তারই প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। যা'হোক্ অনেকক্ষণ পরে আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসতে লাগল। এমন সময়ে দেখি গোটা চার পাঁচ দ্বারোয়ান এসে হাজির; সেলাম ঠুকে বললে, "রাজাবাহাদুর আপনাকে পাহারা দেবার জন্যে আমাদের পাঠিয়েছিলেন, আপনাকে ঘরে কোথাও খুঁজে না পেয়ে এইখানে এসেছি।" বেটাদের কথার এক বর্ণও আমার বিশ্বাস হল না! বেটারা বলে কিনা পাহারা দিচ্ছিল। সব বেটা ভূতের ভয়ে পালিয়েছিল, এখন ভোর হয়েছে দেখে এসে আমায় সেলাম জানাচ্ছে; আমায় কৃতার্থ কর্‌লে আর কি! যা হোক্, ওদের আর কিছু বললুম না, শুধু জানালুম, তাদের দিয়ে আমার কিছুমাত্র দরকার নেই; রাত্রে আমার ভাল ঘুম হয় নি, তাই ভোরের হাওয়া খেতে একটু মাঠে বেরিয়েছিলুম।

যা হোক, রোদ উঠলে পরে রাজাবাহাদুরের কাছে চলে গেলুম। আমার মুখ চোখ দেখেই তাঁর সন্দেহ হল যে রাত্রে ভৌতিক কিছু ঘটে থাক্‌বে। আমি তাড়া-

তাড়ি কিছু ভাঙ্গতে চাইলুম না ; কিন্তু রাজবাহাদুর বিশেষ পীড়াপীড়ি করাতে সব ঘটনা খুলে বল্লুম। রাজাবাহাদুর বল্লেন যে ঐরকম কিছু কিছু তিনিও শুনেছিলেন, তাই তিনি আমাকে ঐ বাংলোতে যেতে বারণ করেছিলেন। এবং এ রকম আবির্ভাব ও উপদ্রবের কারণ কি তার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্লেন যে, শোনা যায়, যে নীলকুঠি সাহেবের ঐ বাংলোটা ছিল তিনি একটু দুরবস্থায় পড়াতে একটা গোরা সৈনিকের কাছে বাড়ীটা বিক্রী করেন। গোরাসাহেব সপরিবারে ঐ বাড়ীতে কিছু কাল বাস করেন। তাঁর একটা চাপরাশীও ছিল। সাহেব ছিলেন ভয়ানক রাগী। একবার কোন কারণে সাহেব তাঁর স্ত্রীর ওপর এবং তাঁর ভৃত্যের উপর ভয়ানক চটে যান; এত রেগে যান, যে স্ত্রীকে পদাঘাত পর্য্যন্ত করেন। তাঁর স্ত্রী তখন আসন্ন-প্রসবা ছিলেন ; ঐ আঘাতের ফলে অবিলম্বেই তাঁর সন্তান প্রসব হয় ; কিন্তু শিশুটী মৃত হয়েই জন্মেছিল। আর সেই চাপরাশীটাকেও হাতের কাছে পেয়ে গোরা সাহেব এমন প্রহার করেন যে তাতেই লোকটা মরে যায়। সব মৃত দেহগুলি তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলবার জন্যে সেই কাঁঠাল গাছ তলায় পুঁতে ফেলেন। তারপর সাহেব এ স্থান ত্যাগ করে কোথায় যে চলে গেলেন কেউ সে খোঁজ জানে না। কি ভয়ানক ব্যাপার !

বলাই বাহুল্য যে আর আমি সেই বাড়ীতে এক রাতও কাটাতে ভরসা করলুম না। আমার জিনিষ-পত্র তখনই লোক পাঠিয়ে আনান হল। আবার সেই পুরোণো অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে বাড়ীগুলোরই একটা বেছে নিয়ে বাস করতে হ'ল।

বন্ধুবরের এই রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিয়া আমাদের আড্ডায় আর কাহারও মুখে কথাটি রহিল না। রাত্রিও তখন বেশ গভীর হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং সভা ভঙ্গ হইল। আড্ডা ভাঙ্গিয়া পথে যাইতে যাইতে সকলেরই গাটা বেশ ছম্ ছম্ করিতে লাগিল।

---

## ভোরের আলো

( শ্রীঅনিল কুমার সরকার, হাওড়া )

আঁধার গেল লুকিয়ে কোথায়, ভোরের আলো ভাসে ;—
মলয় হাওয়া জাগিয়ে দে' যায় মাঠের সবুজ ঘাসে।
বনের পাখী মাত্‌ল গানে,
ফুলের সুবাস সুপ্তি আনে ;
পূব্ দিকেতে লোহিত রবি নম্র লাজে হাসে—।
ভোরের আলো ভাসে ॥
ভোরের আলো আমায় ডেকে জাগিয়ে দিল ভাই,
তাইত আমি বিভোর হয়ে ভোরের গীতি গাই !
প্রণাম করি বিধির পায়ে
সরল মনে শির নোয়ায়ে ;
গোলাপ ফুলের মধুর ঘ্রাণে পাগল হয়ে যাই।
ভোরের গীতি গাই।

---

## কাঁটার ব্যথা

[ ইংরাজী গল্পের ভাব অবলম্বনে, ]

( শ্রীঅরুণা দেবী, পাটনা )

এক প্রকাণ্ড বন। সেই বনে কত রকম পাতা ভরা ফুল ভরা গাছ—বট, অশোক, শাল, বেল, কামিনী, টগর, যুঁই, বন-গোলাপ, আরো অনেক গাছ।

বনের এক পাশে একটী ছোট কাঁটা গাছ। তার না আছে সুন্দর সবুজ পাতা, না আছে তার গন্ধ-ওয়ালা রঙ্গিন ফুল। সেই জন্য গাছটীর বড্ড দুঃখ; সে তার প্রতিবেশী গাছেদের লম্বা লম্বা শাখা দেখে, আর ভাবে, "আহা, আমার যদি ফুল না থেকে অন্ততঃ সবুজ পাতাও থাকত। কেন ভগবান্ ওদের এক সঙ্গে ফুল দিয়েছেন, ফল দিয়েছেন, আবার সারা গা ভরা পাতাও দিয়েছেন, আর আমায় কিছু দেন নি? শুধু যেন তাঁর অভিশাপ স্বরূপ আমার সারা ডাল পালায় কাঁটা দিয়েছেন?"

এমনি করে প্রতিদিনই সেই ছোট গাছটী তার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবে। এক দিন সে দেখ্‌ল কত গুলি ছোট ছোট ছেলে এসে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করে অন্য ফুলের গাছ থেকে ফুল তুলে নিয়ে মালা গেঁথে পরল; তার কাছে কেউই এগুলো না। এতে তার মনের দুঃখ আরোও বেড়ে গেল। সেদিন সে সারাক্ষণই ভাব্‌লো,—আহা! ভগবান্ কেন আমায় ফুল পাতা দিয়ে সাজিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠান নি? এখানের সবই সুন্দর, কেবল আমিই সুন্দরের মাঝে খাপছাড়া হয়ে রয়েছি। ওগো ভগবান্! আমায় ফুল পাতা দাও—আর কিছুই ত আমি চাইছি না; শুধু কাঁটা দিয়ে আমার ইহ-জন্মের গাছলীলা কি করে শেষ হবে?...... এই সব কথা ভাবতে ভাবতে সেই গাছটী কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, সে নিজেও জান্‌তে পারেনি।

সকাল বেলা উঠে দেখে কিনা এত দিন ধরে সে যা চেয়েছে তাই তার হয়েছে; তার সমস্ত কাঁটার বদলে ডালপালায় সুন্দর নরম নরম কচি পাতা হয়েছে। সে বড়ই সুখী হল। সে দিনের সকাল বেলাটা তার বড় ভাল লাগলো। বনের ভিতর বাতাস বয়ে তার কচি কচি সবুজ পাতা গুলোয় একটু কাঁপন লাগিয়ে দিয়ে গেল; তখন সে ভাবলো এই পৃথিবীতে তার মতন সুখী আর কেউই নেই।

বিকেলের দিকে একটা ছাগল তার তিন বাচ্চা নিয়ে এসে গাছটীর সমস্ত সুখই এক নিমেষে শেষ করে দিল। সারাদিন তারা কিছুই খায়নি, কাজেই কচি কচি পাতা তারা যত পারলো খেল, শেষে উপরের দিকের দুচারটী পাতা ছাড়া আর কিছুই তার রইল না। তখন সে আবার ভাবতে লাগল—"উঁহুঁ, সবুজ পাতায় কোনই সুখ নেই; ছাগলে মুড়িয়ে সব শেষ করে দেয়। একটা নূতন কিছু হলে ত মন্দ হয় না; কাঁচের পাতা যদি আমার হয় তো দিব্যি মজা হয়। ছাগলে মুড়োতে পারবে না।"

পরদিন দেখে কিনা তার কাঁচের পাতাই হয়েছে। পাতা গুলো খুব সুন্দর আর রং-বেরংএর। যেন এক একটী রঙিন পাথর—মাণিকের টুকরো! সে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিচ্ছে



এমন সময় হঠাৎ ঝড় এল! সে ঝড়ের কি গোঁ গোঁ শব্দ, যেন কান ঝালাপালা হয়ে যায়। কত যে বড় বড় গাছ ঝড়ে পড়ে গেল, কত গাছের ডাল-পালা ভেঙ্গে গেল তার ঠিকানা নেই। আর সেই কাঁটা গাছের কি হল জান? তার কাঁচের পাতাগুলো একটা আর একটায় লেগে চুরমার হয়ে ভেঙ্গে গেল। তখন সে আবার আগের মতই পাতা-শূন্য কাঁটা গাছ হল। তখন তার আর দুঃখের সীমা নেই। সে এই বলে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো যে কেন সে সোণার পাতা না চেয়ে কাঁচের পাতা চেয়েছিল; কারণ সোণা ছাগলেও মুড়োবে না, আর ঝড়েও ভাঙতে পারবে না। সে বল্ল, আমি সোণার পাতাই চাই।

দু'বার তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ায় সে ভেবেছিল সে যা চাইবে ভগবান্ তাকে তাই দেবেন। হলও তাই! সকালে সে অবাক্ হয়ে দেখলো যে তার পাতাগুলো থেকে এক উজ্জ্বল জ্যোতি বেরুচ্ছে। বেরোবারই কথা, কারণ সেগুলি তখন একেবারে আসল সোণাই হয়ে গিয়েছিল। প্রভাতের তরুণ সূর্য্য তাঁর মিষ্টি কিরণটুকু সোণার পাতায় ঢেলে দেওয়াতে সেগুলি যে কী সুন্দর দেখাচ্ছিল, তা আর বলা যায় না—যেন ভগবান্ তাঁর সমস্ত আশীর্ব্বাদটুকু উজাড় করে সেই গাছটীর মাথায় ঢেলে দিয়েছেন। সেদিনের মত সুখী আর সে কোন দিনই হয় নি।

এখন এক বণিক্ সেই বনের পাশে ঝরণায় জল খেতে গিয়েছিল। জল খেয়ে ফিরে এসে দেখে কিনা একটা সোণার গাছ রয়েছে। সে ভাবল স্বপ্ন দেখছে! একবার, দুবার, তিনবার সে ভাল ক'রে চোখ মুছলো, তবুও সেই সোণার গাছই দেখতে পেল। সে ছিল কালী-ভক্ত। "কালী মায়ের আমার ওপর বড্ড দয়া!" বলে পাতাগুলো ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল। গাছ আবার আগের দশাই ফিরে পেল।

গাছ নিজের মনে ভাবতে লাগল—"সবুজ পাতাও ভাল, কাঁচের পাতাও ভাল, আবার সোণার পাতাও ভাল; কিন্তু সে সব দু দিনেই চলে যায়। আমার আগের শুধু কাঁটাই ছিল ভাল, তারা কেমন আমায় বিপদ্ থেকে রক্ষা করত। আমায় যে ভগবান্ সোণার, সবুজ, আর কাঁচের পাতা দিলেন, সে সব শুধু আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য, সত্যি আমি অত সম্পদ্ পেয়েও সুখী হই কি না তা দেখবার জন্যে! আমি আমার আগের কাঁটাই ফিরে চাই। ও সম্পদের আমি অযোগ্য। আমার আর ওতে দরকার নেই।"

কাঁটাই আবার হল তার!

তার পর সে যেমন সত্যি সুখী হয়েছিল সে রকম আর কেউই হয় না।

---

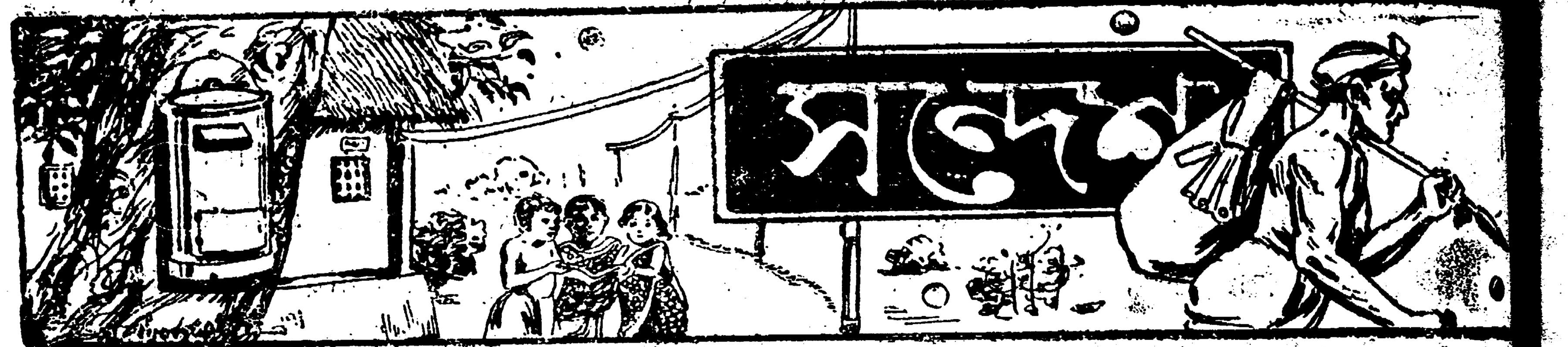


## পৃথিবীর সবচাইতে বড় ঘুড়ি

তোমাদেরই বয়সী কয়েকটী মার্কিন্ ছেলে কি এক দারুণ কাণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে, ছবিতে দেখ। এমন একখানা ঘুড়ি তৈরি করিয়াছে যে দুনিয়ায় আর তার জুড়ি নাই। তারা সবাই লস্ এঞ্জেলেসের সামরিক বিদ্যালয়ে পড়ে। ঘুড়িটী তৈরি করিয়াছিল মাত্র পাঁচ জনে, তাদের সবাইকার বয়সই বার হইতে ষোলর মধ্যে। কিন্তু উড়াইবার সময় চব্বিশটী ছেলে আসিয়া সোজা করিয়া সেটা ধরে, তবে সে ঘুড়ি মশাই উড়িতে রাজী হন।

পৃথিবীর সবচাইতে বড় ঘুড়ী

তোমরাও কেন চেষ্টা-চরিত্র করিয়া এমন কোন একটা ব্যাপারে পৃথিবীময় নাম কিনিয়া ফেল না!

## হাতীর স্মরণশক্তি

বিলাতের সেন্ট টমাসে সেদিন এলিস্ নামে একটা বুড়া হাতীকে লইয়া এক আশ্চর্য্য কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। হাতীটার বয়স ১১০ বছর। বছর পঞ্চাশেক আগে "মারনুমের



সার্কাসে" সে খেলা দেখাইত। সেই সময় জাম্বো নামে আর একটা হাতী তাহার সঙ্গী ছিল। এই জাম্বো হাতীটা খুব নাম-করা। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সে চিড়িয়াখানা হইতে পালাইয়া আসে, তার পর এক রেল লাইন পার হইতে গিয়া ট্রেনে চাপা পড়িয়া মারা যায়। যেখানটায় জাম্বো মারা যায় সেই রেল লাইনের উপর দিয়া সেদিন এলিস্‌কে লওয়া হইতেছিল। জায়গাটা দেখিয়াই তাহার সেই ৩৪ বছর আগে জাম্বোর সেই শোচনীয় মৃত্যুর কথা মনে পড়িল, সে সেখানে বসিয়া করুণভাবে বিলাপ করিতে সুরু করিল। মাহুত বহুকষ্টে তাহাকে উঠাইল। ফিরিবার পথেও আবার সেই দৃশ্য!

## "এক্সরে"তে কেমন দেখায়

'এক্সরে'র নাম বোধ হয় তোমরা অনেকেই শুনিয়াছ। এক্স রে এক রকম আলো। তোমার শরীরের উপর সে আলো ফেলিলে দেখিবে তোমার গায়ের চামড়া মাংস কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে, দেখা যাইতেছে শুধু তোমার গায়ের হাড়গুলি। এ আলো চামড়া মাংস ভেদ করিয়া যায় কিন্তু হাড়ের ভিতর দিয়া যাইতে পারে না, তাই এই ব্যাপার। আজ কাল ডাক্তারীতে এক্স রের ভয়ানক চলন। ছবিতে দেখ এক ডাক্তার এক্স রে দিয়া কেমন শুধু চোখেই আর একটি জ্যান্ত লোকের বুকের পাঁজরগুলি দেখিতেছেন।

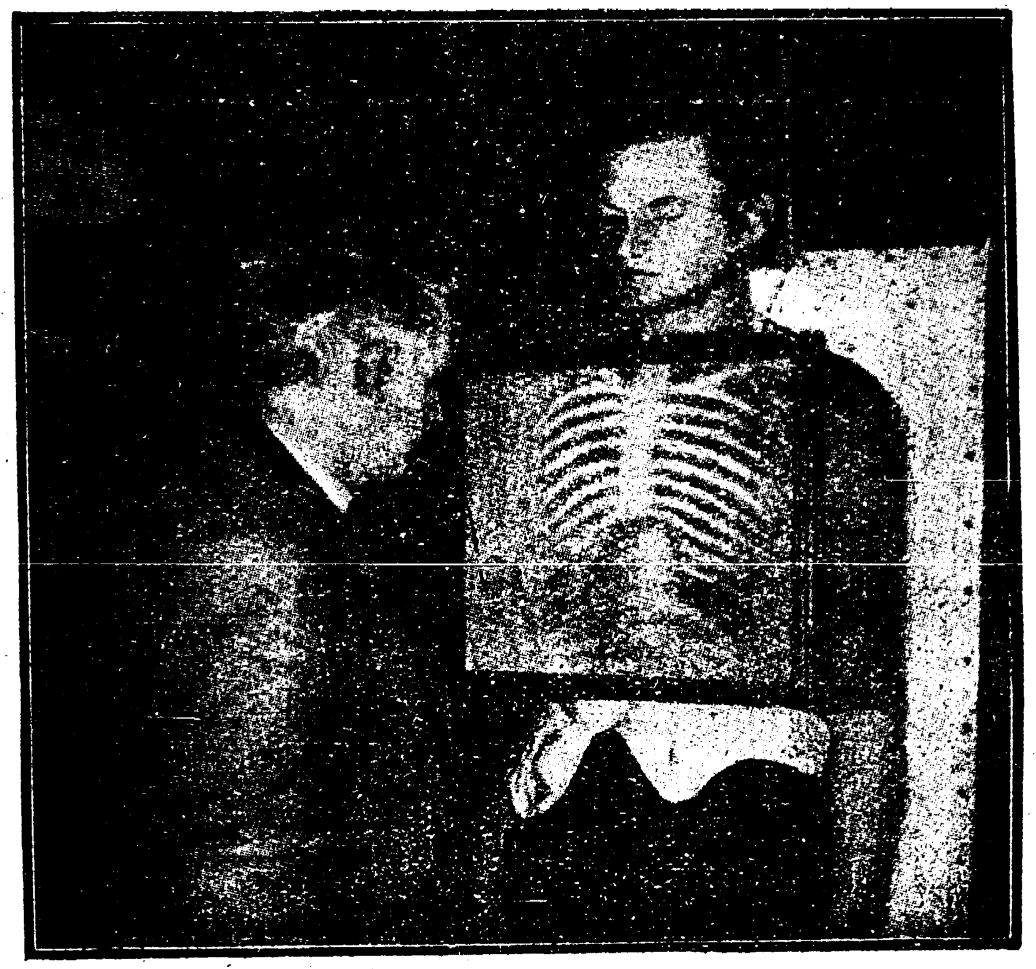
এক্স রে দিয়া বুকের পাঁজর দেখিতেছেন

## করাচীতে বসিয়া লণ্ডনের সাথে আলাপ

সেদিন করাচীর এক সংবাদদাতা টেলিফোণের রিসিভার হাতে লইয়া তাঁর এক বন্ধুকে

ডাকিলেন। বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "কেন ডাক্‌ছ?" করাচীর লোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের ওখানে এখন ক'টা বেজেছে?" "এই দুপুর ১টা।" "সেকি হে, এখানে যে বিকেল! আচ্ছা আজকের দিনটা ওখানে কেমন? এখানে ত' বড্ড গুমোট।" বন্ধু উত্তর দিলেন—"এখানেও প্রায় তাই, সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছে।" তার পর আরও অনেক কথা বার্ত্তা হইল, শেষে শুভেচ্ছা জানাইয়া বন্ধুরা বিদায় লইলেন।

এত গল্প সল্প হইয়া গেল, অথচ বন্ধু দু'টি কে কোথায় ছিলেন জান? একজন ছিলেন করাচীতে, আর একজন লণ্ডনে; মাঝখানে ৬০০০ মাইল ব্যবধান। সেদিন হইতে করাচীর সাথে লণ্ডনের সোজাসুজি টেলিফোনে কথা বলার ব্যবস্থা হইয়াছে। কথা বলা হয় টেলিগ্রাফে তারের ভিতর দিয়া।

---

# গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) কথা। (অনেকে 'বিদ্যা' লিখেছেন। তাঁদের নামও নিভুর্লের মধ্যে দেওয়া গেল। তবে "কথা দিয়ে কথা রাখা"টাই হচ্ছে একটা Idiom.)

(২) রবিবার ··· ৯ মাইল, বৃহস্পতিবার ··· ১৩ মাইল
সোমবার ··· ১০ " শুক্রবার ··· ১৪ "
মঙ্গলবার ··· ১১ " শনিবার ··· ১৫ "
বুধবার ··· ১২ " রবিবার ··· ১৬ "
সোমবার ··· ১৭ মাইল।

---

# উত্তরদাতাদের নাম

## যাঁহারা নিভুর্ল উত্তর দিয়াছেন :—

মিলনমালা ঘোষ (ভবানীপুর), নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ধুলগ্রাম), বয়েজ ওন্ লাইব্রেরীর সভ্যগণ (সাটীর পাড়া); সুধাংশু, কালু, নীলু, নন্তু, টুনু, কমলা ও অমিয়া ঘোষ (বারাকপুর), নারায়ণদাস নন্দী (নবদ্বীপ), লক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী (শ্রীরামপুর), অমিয়া, ইন্দিরা, অশোক ও অজিত মিত্র (পাবনা), তোফাতল হোসেন, বজলুল হক্, ইদ্রীস আলি, কোরবাণ আলি, কিরণচন্দ্র ও গুরুদাস (কামারজানী), শিশিরকুমার রায় (বসিরহাট), পরমেশ, অরুণা ও



প্রীতীশ সরকার (কালিম্পং), নগেন্দ্রচন্দ্র বণিক্, নৃপেন্দ্র, দীনেশ (কামালপুর), সত্যসুন্দর ভট্টাচার্য্য (কৃষ্ণনগর), দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (চন্দন নগর), রবীন্দ্রকুমার বসু (হাতুয়া), নির্ম্মল ও প্রভাস (রামকৃষ্ণ আশ্রম, সরিষা), উমাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), তিলৈ পাব্লিক লাইব্রেরীর সভ্যবৃন্দ, সৌরীন্দ্র, শৈলেন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র (বাজিতপুর), মনোরমা দেবী (জলপাইগুড়ী), সমরেন্দ্র, সন্তোষ, পশুপতি, লালমোহন, বিনোদ, ক্ষিতীশ, পঞ্চানন (সরিষা), সুনীতি দেবী (ভাগলপুর), অরুণকুমার ঘোষ (আসানসোল), শৈলেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (জলপাইগুড়ী), সনৎকুমার, নিত্যানন্দ ও শিবানী (কালিম্পং), সরোজমোহন চট্টোপাধ্যায় (এলাহাবাদ), মাধবেন্দু ভট্টাচার্য্য, বয়েজ লাইব্রেরীর সভ্যবৃন্দ (দ্বিপাড়া), সুকোমল ঘোষ (ভবানীপুর), গুণদাপ্রসাদ মুখার্জ্জী (দিল্লী), রামকৃষ্ণ সেন (পুষা), মাখনলাল অধিকারী (কিশোরগঞ্জ), শান্তিপ্রসাদ নাগ বীরেন্দ্র, নৃপেন্দ্র, ফণী (গাইবান্ধা), কানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী (অমরদহ), বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় (বালী), মনুজেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জী (নলহাটী), ভ্রাতৃসঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), সেরাজল আবেদিন (শ্যামাডাঙ্গা), বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী (কানুনগো পাড়া), কৃষ্ণ, কুঞ্জ, কমল, লাবণ্য (ইটালি, কলিকাতা), অশোক, বিমল, অমল, অরুণ, প্রীতি, মিনু, অমিত (হাওড়া), দীনেন, মুকুল, ঘাটু (ইটালি, কলিকাতা), কালিদাস পাঠমন্দির ও অনুশীলন সঙ্ঘের ভ্রাতৃবৃন্দ (কণেশ্বর), অনিমা, বিশ্বনাথ, খগেন, কেদার (মিয়াংমিয়া, বর্ম্মা), লক্ষ্মীময়ী দেবী (সাওগী) হরিদাস বণিক, সৌদামিনী, শ্রীবাস (কামালপুর), শিবপদ সেনগুপ্ত (বাইশরশি), অনুপমা লাহিড়ী (হেন্‌জাডা, বর্ম্মা), রণেশকুমার গুপ্ত (জামসেদপুর), সদানন্দ সাহা (মেদিনীপুর), পারিজাতরেণু দেবী (মহিমাগঞ্জ), নরেন্দ্রকুমার দেব (রাজানগর), মলিন সেন (ফকিরতলা, নোয়াখালী), গুপ্তেশ্বর, অনিল, নিখিল, সুশীল সাহা এ করিম, এ অদুদ (আথাউরা বাজার), রাজলক্ষ্মী, অখিল, জয়লক্ষ্মী, সতীলক্ষ্মী (আকুই, বাঁকুড়া), কালিদাস সোম (বালুরঘাট), সুধামাধব ঘোষ (জামালপুর), মোহম্মদ মেন্‌হাজ উদ্দীন, গিয়াসউদ্দীন, ফজলর রহমান, চুকুরিয়া নিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ, কামাখ্যা, মণীন্দ্র, নিরঞ্জন, অরুণ, মাধব (কুমিল্লা), কমলা বসু, (আমতা), যশোমাধব সাহিত্যসঙ্ঘের সভ্যগণ (ধামরাই), সুখেন্দুবিকাশ পাল (আকিয়াব), প্রিয়নাথ দাশ গুপ্ত (দিনাজপুর), জ্যোৎস্নাকুমারী দাস (কাঁথি)।

## যাঁহারা একটী ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন :—

আশা (দার্জ্জিলীং), অমরেশচন্দ্র বসু (হাওড়া), গুণেন্দ্রমোহন সিংহ (ভবানীপুর, কলিকাতা), গোকুলানন্দ দাস (রংপুর), কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় (লাহোর), কুমুদবিহারী ঘোষ (ধুবড়ী), ইন্দুবিকাশ দত্ত (শিবসাগর), অনিলকুমার সরকার (হাওড়া), শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী (শ্রীহট্ট), মনোজিত বসু (কুড়িগ্রাম), প্রতুলচন্দ্র ঘোষ (দিনাজপুর), কীর্ত্তীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (বরিশাল), অপর্ণা, টুকু, ফুল, ভাণু, অজিত, নির্ম্মল, প্রমোদ, অর্পিতা, স্বদেশ ও শান্তি (ভোলা), মহবুবুর রব চৌধুরী (ধলছড়া, শ্রীহট্ট), দিলীপের দিদি (সিমলা), অশোক, সনৎ, বাসন্তী দেবী (বর্দ্ধমান)।

---

# নূতন ধাঁধা

(১)

যে আমার নাম করবে সেই আমায় ভেঙ্গে ফেলবে। বল তো কে আমি?

শ্রীসুনীলবরণ রায়

## ( ২ )

### ZigZag Puzzle ( আঁকা বাঁকা ধাঁধা )

**সঙ্কেত ঃ**—নীচে কতকগুলি শব্দ পর পর সাজান আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি অক্ষর বড়। এই বড় অক্ষরগুলি সাপের গতির মত আঁকা বাঁকা ভাবে বসান আছে, আর উপরে নীচে পড়িলে হয় একজন লোকের নাম।

হ রি ণ
স রি ষা
ক ল প
ক দ লী
রা ঘ ব
ন য় ন

আমরা নীচে এই রকম আরও দুটি ধাঁধা দিলাম। তাহাতে যে শব্দগুলি দেওয়া হইল তাহাদের বদলে ঠিক মত এক একটা মানে বসাইয়া এই রকম আঁকা বাঁকা ভাবে উপর নীচে পড়িলে ভারতের দু'টি নাম-করা লোকের নাম পাইবে।

( ১ )

একজন বাদসাহ
গৃহ
রেণু
কয়লা
পৃথিবী
পদ
রাজা
পালন কর্ত্তা
একটি সহর

শ্রীঅমরেন্দ্র রায় ও সুনীলবরণ রায়

( ২ )

ধাতু বিশেষ
রঞ্জন দ্রব্য বিশেষ
শৈলরাজ
সুখ্যাতি
থ'লে
মিষ্টি ফল
এক রকম তরকারী
বিষ

শ্রীমুকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

---

**রঙ্গীন ছবি ঃ**—বড়ই লজ্জার সহিত জানাইতেছি যে এবার ত্রিবর্ণ ছবিখানি লইয়া একটু গোল হইয়া গিয়াছে। "চিত্রে বিদ্যাসাগর জীবনীর" রঙ্গীন ছবি ছাপা হইতেছিল, তদনুসারে ৪০৩ পৃষ্ঠায় চিত্র-পরিচয়ও ছাপা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ২য় বর্ণের ছবিখানি ছাপাইতে গিয়া ব্লকে এক মারাত্মক দোষ বাহির হইয়া গেল, কিছুতেই তাহা শোধরান গেল না। কাগজের দেরী হইয়া যায় দেখিয়া আমরা "বীরাঙ্গনা" ছাপিয়া দিলাম। আশা করি এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য কেহ মনে কিছু করিবেন না।

---



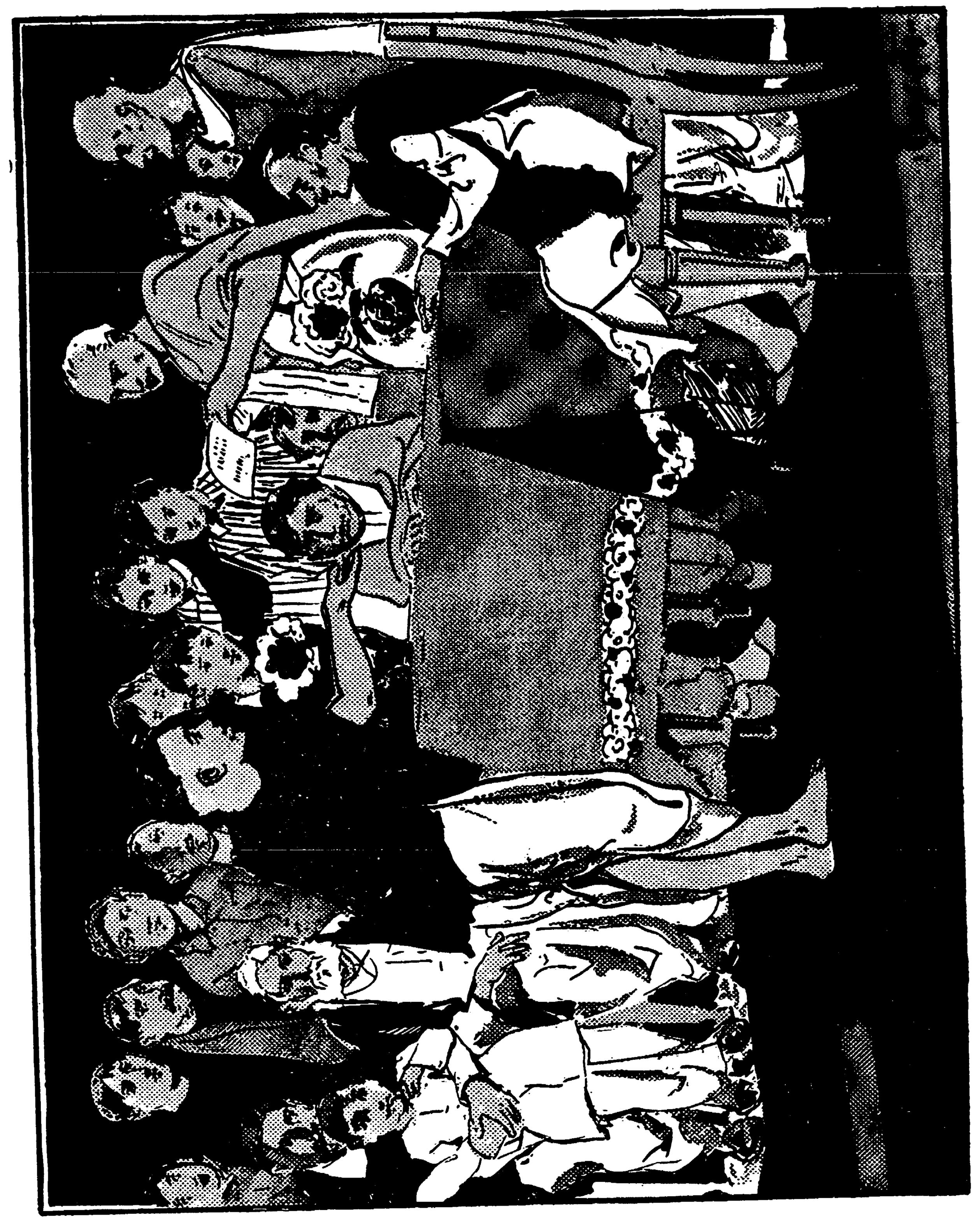

চিত্রে বিদ্যাসাগর-জীবনী—৫
"বিদ্যাসাগর" উপাধি-লাভ।
শিল্পী—শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত ] [ চিত্র পরিচয় দেখ

( ২ )

ZigZag Puzzle ( আঁকা বাঁকা ধাঁধা )

**সঙ্কেত ঃ**—নীচে কতকগুলি শব্দ পর পর সাজান আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি অক্ষর বড়। এই বড় অক্ষরগুলি সাপের গতির মত আঁকা বাঁকা ভাবে বসান আছে, আর উপরে নীচে পড়িলে হয় একজন লোকের নাম।

হ রি ণ
স রি ষা
ক ল প
ক দ লী
রা ঘ ব
ন য় ন

আমরা নীচে এই রকম আরও দুটি ধাঁধা দিলাম। তাহাতে যে শব্দগুলি দেওয়া হইল তাহাদের বদলে ঠিক মত এক একটা মানে বসাইয়া এই রকম আঁকা বাঁকা ভাবে উপর নীচে পড়িলে ভারতের দু'টি নাম-করা লোকের নাম পাইবে।

( ১ )

একজন বাদসাহ
গৃহ
রেণু
কয়লা
পৃথিবী
পদ
রাজা
পালন কর্ত্তা
একটি সহর

শ্রীঅমরেন্দ্র রায় ও সুনীলবরণ রায়

( ২ )

ধাতু বিশেষ
রঞ্জন দ্রব্য বিশেষ
শৈলরাজ
সুখ্যাতি
থ'লে
মিষ্টি ফল
এক রকম তরকারী
বিষ

শ্রীমুকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

---

**রঙ্গীন ছবি ঃ**—বড়ই লজ্জার সহিত জানাইতেছি যে এবার ত্রিবর্ণ ছবিখানি লইয়া একটু গোল হইয়া গিয়াছে। "চিত্রে বিদ্যাসাগর জীবনীর" রঙ্গীন ছবি ছাপা হইতেছিল, তদনুসারে ৪০৩ পৃষ্ঠায় চিত্র-পরিচয়ও ছাপা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ২য় বর্ণের ছবিখানি ছাপাইতে গিয়া ব্লকে এক মারাত্মক দোষ বাহির হইয়া গেল, কিছুতেই তাহা শোধরান গেল না। কাগজের দেরী হইয়া যায় দেখিয়া আমরা "বীরাঙ্গনা" ছাপিয়া দিলাম। আশা করি এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য কেহ মনে কিছু করিবেন না।

---



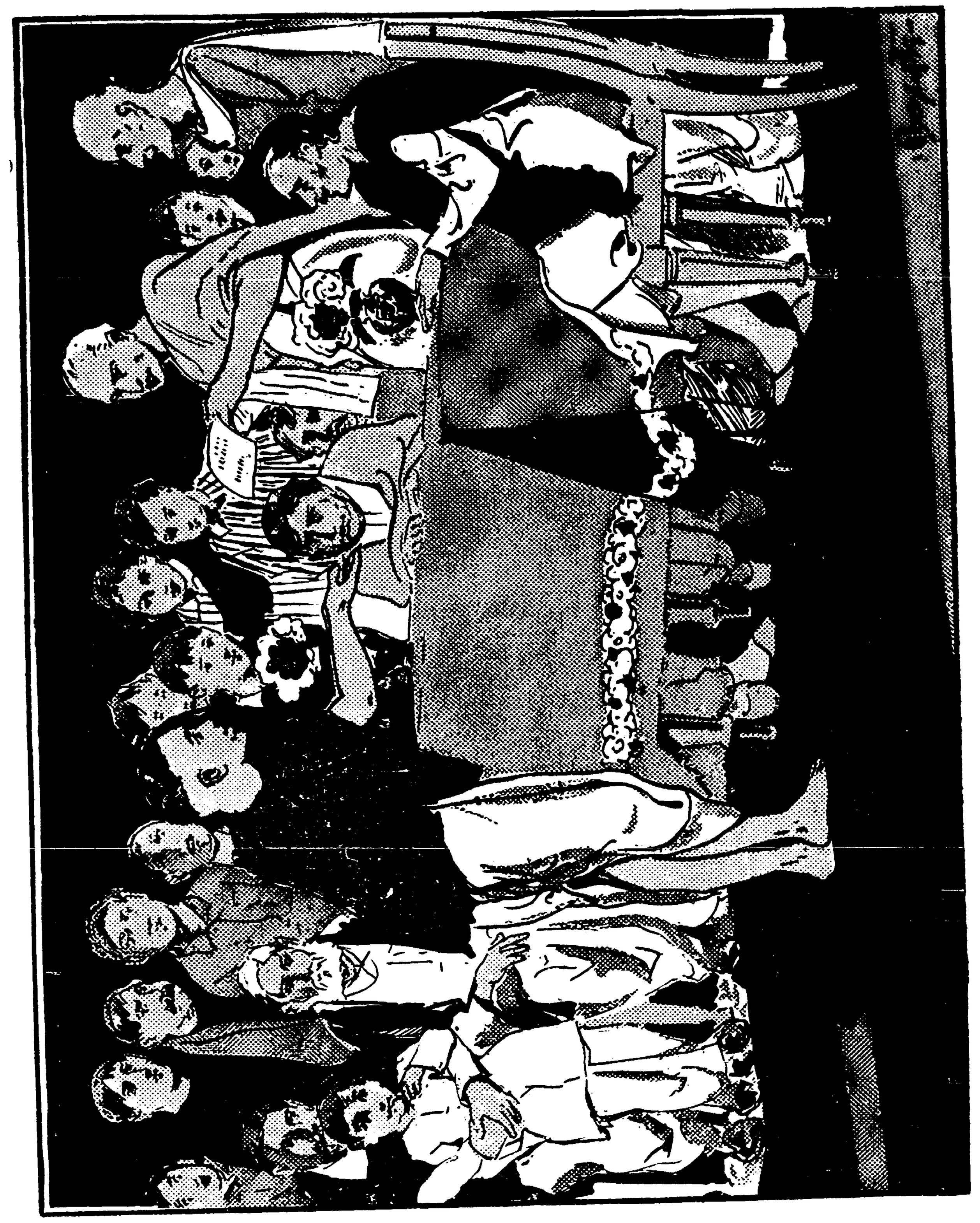

চিত্রে বিদ্যাসাগর-জীবনী—৫

"বিদ্যাসাগর" উপাধি-লাভ।

[ চিত্র পরিচয় দেখ

শিল্পী—শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত ]

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

লক্ষ্মী পেঁচা বালক-বেশে ছল্‌তে এল এখানে
প্রাণটি তাহার প্রবীণ অতি এ রূপটী লোক-দেখানে।
ছেলে সে যে ছেলেমি তার কেমন করে গেলরে ?
শব্দহারা এ ঝুমঝুমি লাগ্‌ছে নাক ভালরে।
ঢুঁ মারে না হরিণ শিশু, লাফায় নাক ছোটে না;
যেথায় থাকে থাকুক যেন ভাগ্যে আবার জোটে না।
কেমন কেমন লাগ্‌বে, হলে সাঁঝের মত প্রভাত যে,
পঞ্চানন আর ষড়াননে অনেকখানি তফাৎ যে !
কোন্ যযাতির এই জরা-ভার স্কন্ধে পেলে অকালে ?
ঝিমোয় শুয়ে উঠছে নাক এমন খাসা সকালে।

——:*:——

# খোদার ওপর খোদ্‌কারী

( শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, বি-এ )

মাংচুদেশের রাজা ফুংচু। ফুংচু ছাখেন—তারও আছে দু-হাত দু-পা নাক কান চোক, আর-আর লোকেরও তাই। বাঃ! তা হলে আর রাজায়-প্রজায় তফাৎ রইল কিসের ?

ফুংচু তাঁর উজীরকে ডেকে বল্‌লেন—'মন্ত্রী, ছাখো তো ভগবানের অবিচার ! —আমারও দিয়েছেন দু-হাত দু-পা ঘাড়ের ওপর একটা মাথা, রেধো-মেধোরও তাই! এতে আমি যে রাজা, আর তারা যে আমার প্রজা—এর বাদ-বিচার রইল কি ? না, মন্ত্রী, এ হ'লে তো রাজ্য চলে না। তুমি ঢ্যাড়া পিটিয়ে দিতে বলো—যাদের আমার মত দু-পা দু-চোখ আছে, তারা হয় এক-একটা পা কেটে ফেলুক, নয় তো এক একটা চোক কাণা করুক্।

উজীর বল্‌লেন—'মহারাজ, আপনি হুকুম করেন তো সে কাজ করতে



কতক্ষণ! কিন্তু রাজ্যের সব লোকই যদি খোঁড়া হয় বা চোখে না দেখে, তা হ'লে রাজ্য চল্‌বে কাদের নিয়ে ?'

রাজা বল্‌লেন—'তাও তো বটে। তা হ'লে ভেবে ছাখো আর কি করা যায়।'

রাজা আর উজীর যুক্তি ক'রে ঠিক করলেন—একটা জিনিস আছে, যা রাখা না-রাখা মানুষেরই হাতে। সেটা হচ্ছে দাড়ি। এই দাড়িতেই রাজায়-প্রজায় তফাৎ কর্‌তে হবে। রাজা নিজে রাখ্‌বেন দাড়ি, আর রাজ্যের বাজে লোকদের দাড়ি রাখা হবে মানা।

রাজা বল্‌লেন—'মন্ত্রী, এ বেশ কথা। এখনই রাজ্যে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দিতে বলো—প্রজারা কেউ দাড়ি রাখ্‌তে পার্‌বে না।'

রাজ্যের কোটাল বুড়ো হয়েছে, রাজা তা'কে বিদায় দিলেন। তার জায়গায় কোটাল হ'লো রাজবাড়ীর নাপিত। নাপিত-কোটাল সারা-রাজ্য ঘুরে' ঘুরে' খবরদারী করে—কেউ দাড়ি রাখ্‌তে না পারে।

রোজ সকালে কোটালের জ্ঞাতি-কুটুমরাও খাস বগলে ক'রে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে, আর যার গালে দ্যাখে দাড়ি, ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ ক'রে কামিয়ে দেয়। যাদের ঘরে পয়সা আছে, তাদের বালাই নেই; যাদের টাকা-পয়সা নেই, তাদের ধ'রে কোটালের কাছে নেওয়া হয়। কোটাল তাদের ভিটেমাটি বেচে' গুণাগারী আদায় করে।

একে কোটালের ভয়, তার ওপর তার জ্ঞাতি-কুটুমের উৎপাত—রাজ্যের লোকের সোয়াস্তি নেই। সবাই রোজ বলাবলি করে—'ভাল আপদেই পড়া গ্যাছে !'

একদিন সন্ধ্যাবেলা সে রাজ্যে কোত্থেকে এক সন্ন্যাসী এলেন। সন্ন্যাসীর মাথায় প্রকাণ্ড জটা, আর মুখে ইয়া-লম্বা দাড়ি।

সন্ন্যাসীকে দেখে' রাজ্যের লোকেরা বল্‌ল—'সন্ন্যাসী-ঠাকুর, পালান্!—পালান্! এ রাজ্যে এসেচেন দাড়ি নিয়ে, কোটাল দেখ্‌লে রক্ষা নেই।'

সন্ন্যাসী বল্‌লেন—'কেন হে ?'

লোকেরা বল্‌ল—'ঠাকুর, আপনি এ রাজ্যের নিয়ম জানেন না। এখানে রাজা-ছাড়া আর কেউ দাড়ি রাখতে পারে না।'

সন্ন্যাসী হেসে বল্‌লেন—'বটে ?···ভালো, যে-রাজ্যে এমন নিয়ম, সে রাজ্যের রাজাটীকে তো একবার দেখ্‌তে হয়। তোমরা কেউ আমাকে রাজার বাড়ীটা দেখিয়ে দিতে পার, বাবারা ?'

লোকজনেরা দূর থেকে সন্ন্যাসীকে রাজবাড়ী দেখিয়ে দিল।

সন্ন্যাসী বম্-ববম্ বম্-ববম্ ক'রে গাল বাজাতে বাজাতে রাজবাড়ীর দিকে চলেচেন, পথে কোটালের সঙ্গে দেখা।

কোটাল বল্‌ল—'কে হে তুমি ?'

সন্ন্যাসী বল্‌লেন—'আমি সন্ন্যাসী।'

—'সন্ন্যাসী,—তা তো দেখ্‌চিই। সন্ন্যাসী আছ তো, বনে-জঙ্গলে যাও,—এখানে কেন ? তার ওপর একগাল দাড়ি ঝুলিয়ে এ রাজ্যে ঘুর্‌তে এসেচ ?'—ব'লেই কোটাল হাঁক্‌লেন—'কোই হ্যায় ?'

ডাক শুনে' একশো সেপাই ছুটে' এল।

কোটাল বল্‌ল—'ব্যাটারা সবাই নাকে সর্‌ষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিস্!—না ?—নইলে, এই দাড়িও'লা লোকটা ঘুর্‌চে রাজ্যের ভেতর—দেখ্‌চিস্ না! যা, একে ধ'রে গারদে আট্‌কে রাখ্। কাল পরামাণিক ডেকে এনে মাথা আর দাড়িগোঁফ মুড়িয়ে গলাধাক্কা দিয়ে রাজ্য থেকে বের করে দিস্।'

একশো সেপাই সন্ন্যাসীকে টেনে নিয়ে গারদে রাখ্‌ল।

পরদিন পরামাণিককে সঙ্গে ক'রে সেপাইরা গারদখানায় গিয়েচে। গারদ খুলে' ছাখে—সন্ন্যাসী নেই !

এ কি ব্যাপার ! সেপাইরা সবাই মিলে' গারদখানায় খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল। খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে ছাখে অন্ধকার এক কোণে একটা রামছাগল !



লোক-জনেরা ছুটে' গিয়ে কোটালকে খবর দিল—গারদে সন্ন্যাসী নেই ! তার বদলে রয়েচে একটা রামছাগল !

কোটালও ছাখে—সত্যিই তাই !

কোটালও ছুটে' গিয়ে ছাখে—সত্যিই তাই !

কোটাল বল্‌ল—'এ নিশ্চয়ই সন্ন্যাসীর যাদু। চল্, এই রামছাগলকেই নিয়ে রাজার কাছে চল্।'

সেপাইরা রামছাগলকে টেনে রাজার কাছে নিয়ে গেল।

কোটাল রাজাকে সব বুঝিয়ে বল্‌ল—'মহারাজ, হুকুম করুন, এর গর্দ্দান নেই। এ রামছাগল কি !—নিশ্চয়ই সেই সন্ন্যাসী। নইলে, সন্ন্যাসীর মত এরও অমন দাড়ি থাকে !'

'দাড়ি !'···রাজা বল্‌লেন—'সে কি ! এ তো একটা চারপেয়ে পশু,—এর আবার দাড়ি কি ?'

কোটাল বল্‌ল—'আজ্ঞে, ঐ দেখুন না, ওর থুঁৎনিতে কত বড় দাড়ি !'

রাজা চেয়ে ছাখেন—তাইতো! উজীরের দিকে ফিরে' তাকালেন। বল্‌লেন—'মন্ত্রী, এ কি রকম ব্যাপার হলো? পশুরও যে দাড়ি হয়, তা তো আমার জানা ছিল না।···কিন্তু...মন্ত্রী,···যে দাড়ি রয়েচে আমার,তা আছে এই রামছাগলটারও!'

উজীর কি জবাব দেবেন ভেবে না-পেয়ে আম্‌তা আম্‌তা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

রাজার মনে দাড়ির কথাই ঘুরপাক খেতে লাগ্‌ল। তিনি একবার রামছাগলের থুঁৎনির দিকে তাকান, আর একবার নিজের দাড়িতে হাত বুলান।

কোটাল বল্‌ল—'মহারাজ, এ রাজ্যে রাজার থাক্‌বে যে-দাড়ি রামছাগলেরও থাক্‌বে তাই? আপনি হুকুম করুন, রামছাগলের দাড়ি এক-একগাছা ক'রে এখনই উপ্‌ড়ে ফেলি।'—ব'লেই কোটাল সত্যি-সত্যিই রামছাগলের দাড়ি ধ'রে এক টান দিল। অমনি কোটালের হাতে খুলে' এল একখানা মুখোস। আর সে মুখোসের নীচে বের হ'লো প্রকাণ্ড জটা আর ইয়া-লম্বা দাড়ি!

সবাই চেয়ে ছাখে—কোথায় রামছাগল?—সেখানে দাঁড়িয়ে এক সন্ন্যাসী!

সন্ন্যাসী বল্‌লেন—'রাজা, তুমি খোদার ওপর খোদ্‌কারী কর্‌তে চেয়েছিলে—মানুষের ওপর যে ক্ষমতা জাহির কর্‌তে পার তা করার কসুর করনি। কিন্তু তুমি যে দাড়ির বড়াই কর, তা যে একটা রামছাগলেরও আছে তা হয়তো মনে কর নাই। আমি তা-ই তোমাকে দেখাতে এলুম। তুমি রাজায়-প্রজায় দাড়ির তফাৎ করেছিলে, কিন্তু খোদা যে তোমাতে আর রামছাগলে সে তফাৎটা রাখেন নি, তা শোধ্‌রাবে কিসে?

সন্ন্যাসীর কথা শুনে' রাজা-উজীর সবাই হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

সন্ন্যাসী আর সেখানে দাঁড়ালেন না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিনি হাওয়ায় কোথায় মিলিয়ে গেলেন।

* * * *

পরদিন সকালে রাজ্যের লোক উঠে' ছাখে—রাজার মুখে দাড়িগোঁফের চিহ্নও নেই! রাত্রেই তিনি নাপিত ডেকে দাড়িগোঁফ ফেলে দিয়েচেন।

এর পরে মাংচুদেশে দাড়ি রাখা না-রাখার কোনো নিয়ম রইল না। যার যেমন খুশী সে তেমন করে।

---

# বন্ধু

( শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্‌-সি )

মাস কয়েক আগে একবার 'রামধনু'তে সেকালের হাতুড়ে ডাক্তারের কথা বাহির হইয়াছিল। বিদ্যার নাম-গন্ধ পেটে থাকুক বা না থাকুক বুজরুকি ছিল তাদের ষোল আনা। যে রোগীর মরিবার কথা একমাসে নানা রকম আজগুবি ওষুধ দিয়া তাহারা পাঁচ দিনেই তাকে সাবাড় করিয়া দিত।

কিন্তু সে দিন ঘুরিয়া গিয়াছে। এখনকার বিলাতী ডাক্তারেরা না সারাইতে পারেন এমন রোগ খুব কমই আছে। শরীরের যে কোন জায়গায় আজকালকার ডাক্তারেরা নির্ব্বিবাদে অস্ত্র চালাইয়া দেন,—দরকার হইলে হাড় ফুটা করিয়াও—অথচ রোগী যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র টের পায় না। শুধু কি তাই? অসুখ কেন হয়, কি করিয়া আগে থাকিতেই সাবধান হওয়া যায়, এসব ব্যাপারের খোঁজও তাঁহারা যথেষ্ট রাখেন।

ডাক্তারী শাস্ত্রের এই যে এত বড় পরিবর্ত্তন—এ যাঁহাদের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে তাঁদেরই কয়েকজনের কথা আজ তোমাদের বলিব। তোমরাই বলিও, এঁদের চেয়ে বড় বন্ধু আমাদের কেউ আছে কি?

প্রায় শ'খানেক বছর আগেকার কথা। ডাক্তারেরা তখন অস্ত্র-চিকিৎসা করিতে শিখিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। রোগীর শেষ মুহূর্ত্ত না আসা পর্য্যন্ত কারও সাধ্য ছিল না তার উপর অস্ত্র চালায়। কেমন করিয়া করে বল? ব্যাপারটা ত' নিতান্ত সহজ নয়! একটা আলপিনের খোঁচা খাইলেই তোমরা লাফাইয়া ওঠ, আর জ্যান্ত মানুষটাকে চাপিয়া ধরিয়া তার পেটে, কি বুকে কি ঠ্যাংএ ছুরি বসাইয়া দিবে আর সে মুখ বুজিয়া সহ্য করিবে? বিশেষতঃ সব সময়ে অস্ত্রটা যে নিতান্ত ছোট-খাট হইবে তারও ত কোন মানে নাই। ফলে ডাক্তারের হাতে ছুরি দেখিলেই রোগীর আত্মারাম শুকাইয়া যাইত—জ্ঞান থাকা পর্য্যন্ত

আর ডাক্তারকে কাছে ঘেঁষিতে দিত না। আর ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কথা ত' আরও ভয়ানক। তাদের হয় ত জোর করিয়া ধরিয়া অস্ত্র করিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু সে দারুণ যন্ত্রণা অতটুকু শিশু সহ্য করিতে পারিল না। অস্ত্রোপচার হয়ত ঠিক মতই হইল কিন্তু কাটা-ছেঁড়ার যন্ত্রণাতেই রোগীর দফা শেষ। এ সব ত' ছিল নিত্যকার ব্যাপার!

তখন ডাক্তারেরা ভাবিতে লাগিলেন, আচ্ছা, এমন কোন একটা উপায় বাহির করা যায় না যাহাতে রোগী খানিক ক্ষণের জন্য অজ্ঞান হইয়া থাকিবে, আর তখন অস্ত্র করিলে একটুও টের পাইবে না। বৈজ্ঞানিকেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। শেষে ডেভি আর ফ্যারাডে নামে দুই মস্ত পণ্ডিত দু'টি ওষুধের নাম করিলেন। সে সময়ে আমেরিকায় মর্টন নামে এক ডাক্তার ছিলেন। তিনি লোকটি ছিলেন বেশ কাজের। তিনি আর দেরী না করিয়া ফ্যারাডের ওষুধটা লইয়া সেটা রোগীদের উপর পরীক্ষা করিতে সুরু করিলেন। ফলও পাইলেন ভালই। শীঘ্রই দেশ-বিদেশে তাঁর নাম ছড়াইয়া পড়িল।

ইংলণ্ডে তখন সিম্প্‌সন্ নামে এক ডাক্তার ছিলেন—কথাটা তাঁরও কাণে গেল। মর্টনের দেখাদেখি তিনিও ওই ওষুধ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু গোড়াতেই বেশ একটু গোল বাধিল। সিম্প্‌সন্ দেখিলেন ওষুধটা দিয়া কাজ চলিলেও বিপদের ভয়টাও আছে যথেষ্ট। হয় ত' কোন রোগীকে ওষুধ দিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলা হইল, অস্ত্রোপচার ও নির্ব্বিবাদে শেষ হইল, কিন্তু রোগী বেচারা সেই যে অজ্ঞান হইয়াছিল আর তার জ্ঞান হইল না। তিনি তখন নিজেই আরএকটা বাহির করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিয়া

ডাক্তার সিম্পসন্



যায়, সিম্প্‌সন্ আর পরীক্ষাগার হইতে বাহির হন না। তার পর একদিন সকালে বাড়ীর লোকেরা আসিয়া দেখে সিম্প্‌সন্ টেবিলের তলায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন। শেষে তাঁহারা মিলিয়া তাঁকে সচেতন করিবার কত চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শেষে তাহারা তাঁর জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল। তার পর ঘণ্টা দুই পরে হঠাৎ দেখা গেল সিম্প্‌সন্ এক লাফে উঠিয়া বসিয়াছেন—মুখ চোখ তাঁর আনন্দে ফাটিয়া পড়িবার যোগাড়। তিনি তাঁর সাধনার ধন পাইয়া গিয়াছেন,—সেটা আর কিছু নয় 'ক্লোরোফর্ম্ম'। আজকাল বড় রকম অস্ত্র করিবার সময় রোগীকে ক্লোরোফর্ম্ম দিয়া অজ্ঞান করিয়া নেওয়া হয়, তা' বোধ হয় তোমরা জান। সিম্প্‌সন্ই এ পথ দেখান। ক্লোরোফর্ম্ম বাহির করিয়া তিনি কার উপর পরীক্ষা করিবেন ভাবিতেছিলেন—শেষে ঠিক করিলেন অপরকে লইয়া টানাটানি করিব কেন, মরিতে হয় নিজে মরিব। নিজের উপর পরীক্ষা করিতে গিয়াই এমন কাণ্ডটা ঘটিয়াছিল।

সিম্প্‌সনের আবিষ্কারের পর সকলে ভাবিল, যাক্ অস্ত্র-চিকিৎসা ব্যাপারটা এবার বেশ সহজ হইয়া গেল।—অবশ্য খানিকটা যে হইল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; অস্ত্র করিবার সময়টা রোগীকে আর সেই অসহ্য যন্ত্রণাটা সহিতে হইত না, কিন্তু গোল বাধিত তার পরের ব্যাপারটিতে। অস্ত্র করিবার দিন দুই পরেই দেখা যাইত—সে জায়গাটা ফুলিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে, পুঁয পড়িতেছে। তার পর আর ২।১ দিনের মধ্যেই সে ঘা পচিয়া 'সেপ্‌টিক্' হইয়া রোগীর দফা সারা।

এই সময় ফ্রান্সে লুই পাস্তুর নামে এক বৈজ্ঞানিক খুব নাম করিতেছিলেন। তোমরা বোধ হয় জান, দুধ প্রভৃতি অনেক জিনিষ বাসি হইলে টক্ হইয়া যায়। পাস্তুর দেখাইলেন যে কতকগুলি অতি ছোট ছোট পোকা বা জীবাণু এই সব কাণ্ড ঘটায়। পোকাগুলি আপনা আপনি জন্মায় না। আমাদের আশে পাশে যে বাতাস দেখিতেছ তার আগাগোড়া এই রকম জীবাণুতে ভরা। শুধু চোখে তাদের দেখা যায় না, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। জীবাণু এই বাতাস হইতেই আসে, তার পর খাইয়া দাইয়া ডিম পাড়িয়া বাড়িতে থাকে।

ফ্রান্সের লোকেরা তখন রেশমের ব্যবসা করিয়া বিস্তর টাকা করিতেছিল। রেশম কেমন করিয়া তৈরী হয় তা বোধ হয় তোমরা অনেকেই জান। গুটিপোকার শরীর হইতে এই রেশম তৈরী হয়। কাজেই রেশম তৈরী করিতে হইলে গুটি-পোকার চাষ করিতে হয়। হঠাৎ একদিন ফ্রান্সে গুটিপোকার মড়ক দেখা দিল। এত বড় একটা ব্যবসা একেবারে মাটী হইবার যোগাড়! ব্যবসাদারেরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তখন পাস্তুরকে বলা হইল, "আপনি এর একটা বিহিত করুন। কেনই বা এমনটা হইতেছে, কিসেই বা এ ব্যারাম সারিবে? দেশ যে একেবারে গরীব হইতে চলিল।" পাস্তুর কয়েকটা অসুস্থ পোকা লইয়া তাঁর অণুবীক্ষণের মধ্যে ধরিলেন,—একি! এক একটা গুটিপোকার গায়ে যে অসংখ্য ছোট, অতি ছোট পোকা কিলবিল করিতেছে। পাস্তুর বুঝিলেন এই জীবাণুগুলিই যত সব নষ্টের গোড়া। তিনি তখন সেগুলি মারিবার উপায় বাহির করিলেন; গুটিপোকার মড়ক বন্ধ হইল।

লুই পাস্তর

পাস্তুরের তখন সন্দেহ হইল আমাদের যে অসুখ বিসুখ হয় তাহাও বোধ হয় এই সব জীবাণুর জন্যই। ব্যাপারটা সত্যি কিনা ধরিবার জন্য তিনি কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন। গরু ভেড়া প্রভৃতি জানোয়ারদের এনথ্রাক্স্ বলিয়া একরকম বিশ্রী ব্যারাম হয়। পাস্তুর করিলেন কি, সেই রোগের কয়েকটা জানোয়ার ধরিয়া তাহাদের রক্ত লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দিলেন। যা ভাবিয়াছিলেন তাই, দেখা গেল— এক রকম জীবাণু ঐ রক্তের ভিতর কিলবিল করিতেছে। তিনি তখন ঐ বিষাক্ত রক্তের খানিকটা লইয়া সুস্থ জানোয়ারের গায়ে ঢুকাইয়া



দিলেন। দেখা গেল—তাহাদেরও ঐ ব্যারামে ধরিয়াছে। পাস্তুর তখনও নিঃসন্দেহ হন নাই। তিনি তখন রক্ত হইতে পোকাগুলি আলাদা করিয়া বাছিয়া সেই পোকাগুলি অন্য একটা সুস্থ প্রাণীর গায়ে ঢুকাইয়া দিলেন; ফলে তারও ঐ রোগ হইল। পাস্তুর বুঝিলেন—এই ক্ষুদে জীবাণুগুলির জন্যই পৃথিবীর যত অসুখ বিসুখ।

পাস্তুর তখন ঐ জীবাণুগুলি লইয়া নানা রকম পরীক্ষা করিতে সুরু করিলেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, গরম করিলে জীবাণুগুলি বেশ কাবু হইয়া যায়। তিনি তখন ঐ রকম কতকগুলি জীবাণু লইয়া, সেগুলিকে এক দিন এক রাত গরম করিয়া, একটা সুস্থ ভেড়ার গায়ে ঢুকাইয়া দিলেন। ভেড়ার অসুখ হইল—কিন্তু সে অতি সামান্য মাত্র। দিন কয়েক পরে তিনি ঐ রকম আরও কিছু জীবাণু আর খানিকটা কম সময় গরম করিয়া আবার সেই ভেড়ার গায়ে ঢুকাইলেন। এবার আর তার বিশেষ কিছু হইল না। তারও কয়েক দিন পরে খানিকটা একেবারে টাট্‌কা জীবাণু একটুও গরম না করিয়া ভেড়াটির রক্তে ঢুকান হইল, তবুও তার কিছু হইল না। পাস্তুর দেখিলেন—মজা মন্দ নয়, এমনি ভাবে যদি কোন একটা ব্যারামের বীজ আস্তে আস্তে—প্রথমে খুব সামান্য, তার পর আর একটু বেশী—এমনি ভাবে শরীরে সহাইয়া লওয়া যায়, তবে কিছু দিন পরে যখন আসল মারাত্মক অসুখটা আসিবে তখন আর তার শরীরে দাঁত বসাইবার ক্ষমতা থাকিবে না। এমনি করিয়া তিনি টীকা লইবার পথ দেখাইলেন।

পাস্তুর আর একটা কাজ করিয়া গেলেন—যার জন্য তাঁর নাম কেহ কখনও ভুলিবে না। পাগলা কুকুর, শেয়াল প্রভৃতি জানোয়ারের কামড় খাইলে সেকালে আর বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। যাহাকে কামড়াইত তাহাকেই জলাতঙ্ক (হাইড্রো-ফোবিয়া) বলিয়া এক রকম রোগে ধরিত। সে বড় সাংঘাতিক ব্যারাম। জল দেখিলেই রোগীর ভয়ে দম বন্ধ হইয়া যায়—শেষে জল না খাইয়া বেচারা প্রাণ হারায়। পাস্তুর করিলেন কি,—পাগলা কুকুরের মাথার রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তার মধ্যেও রাশি রাশি পোকা কিলবিল করিতেছে।—এই

পোকা গুলিই যে রোগের কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন, পাগলা কুকুরে কামড়াইলে জলাতঙ্ক রোগটা ঠিক সঙ্গে সঙ্গে হয় না, হয় প্রায় দিন চল্লিশেক পরে। পাস্তুর ঠিক করিলেন এই চল্লিশ দিন শেষ হইবার আগেই রোগীর শরীরে অল্প অল্প করিয়া ঐ পোকার রস সহাইয়া লইতে হইবে; শেষে আসল ব্যারাম যখন দেখা দিবে, রোগীর তখন তাহা অভ্যাস হইয়া যাইবে—কোন বিপদ্ ঘটিবে না। তিনি তখন ঐ জীবাণুর রস জোগাড় করিয়া ইন্‌জেক্‌সন তৈরী করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু মুস্কিল হইল পরীক্ষা করিবার সময়। হাতের কাছে আর রোগী মেলে না,—এদিকে এত বড় একটা আবিষ্কারের আশা, পাস্তুরের আর সবুর সহে না; তিনি ঠিক [illegible]িলেন শেষ পর্য্যন্ত নিজেই পাগলা কুকুরের কামড় খাইয়া নিজের উপর পরীক্ষা [illegible]লাইবেন। কিন্তু ভগবানের দয়ায় তার আর দরকার হইল না; পাস্তুর খবর পাইলেন কোন্ এক রাখালের ছেলেকে নেকড়ে বাঘে কামড়াইয়াছে। পাস্তুর ছুটিয়া আসিলেন, তার পর ছেলেটির শরীরে তাঁর তৈরী সেই ইন্‌জেক্‌সন দিতে আরম্ভ করিলেন। মাস দেড়েক সময় পাস্তুরের কেমন ভাবে কাটিয়াছিল তা' ভগবান্ জানেন, কিন্তু দেড় মাস পরে যখন ছেলেটি একেবারে সারিয়া গেল তখন তাঁর মত সুখী লোক বোধ হয় গোটা পৃথিবীটা খুঁজিলে বেশী পাওয়া যাইত না।

পাস্তুরের এই নূতন চিকিৎসা আজকাল পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায়ই হইতেছে—আমাদের দেশে কসৌলি, শিলং আর কলিকাতায়ও আছে। পাস্তুরের নাম হইতে এই সমস্ত ডাক্তারখানার নাম দেওয়া হইয়াছে "পাস্তুর ইনষ্টিটিউট"। আজকাল আর পাগলা কুকুরের কামড়ে কাহাকেও বড় একটা মরিতে শোনা যায় না। পাস্তুরের নিজের দেশ ফ্রান্সে যে 'পাস্তুর ইনষ্টিটিউট' আছে তার সম্মুখে ভারী মজার একটা মূর্ত্তি বসান আছে,—একটি ছোট ছেলে বাঘের সাথে লড়াই করিতেছে; ছেলেটি আর কেউ নয়, সেই রাখালের ছেলে।

পাস্তুর ত' আবিষ্কার করিলেন—সমস্ত রোগই হয় ছোট ছোট অদৃশ্য জীবাণুর জন্য;—কিন্তু তিনি ত' নিজে ঠিক ডাক্তার ছিলেন না, তাঁর আবিষ্কার কাজে লাগাইলেন লিষ্টার নামে এক ডাক্তার,—পাস্তুরের চেয়ে বয়সে বছর



পাঁচেকের ছোট। আগেই বলিয়াছি তখনকার দিনে শরীরে অস্ত্র করিবার ২।১ দিন পরেই সে জায়গাটা ফুলিয়া লাল হইয়া যাইত; তার পর সে ঘা পচিয়া মারাত্মক হ ই য়া পড়িত। লিষ্টার প রী ক্ষা ক রি য়া দেখিলেন এই ঘা পচিয়া 'সেপ্‌টিক্' হওয়া ব্যাপারটাও ঐ সব ছোট ছোট জীবাণু বাবাজীদেরই কা র সা জি। পোকাগুলি ত' আর আপনা আপনি জন্মাইতে পারে না—বাহির হইতেই সেগুলি আসে। তিনি ভাবিলেন—বাতাসে যখন ঐ সব জীবাণু ভাসিয়া বেড়ায় তখন ঘায়ে বাতাস লাগিতে না দিলেই গোল চুকিয়া যাইবে। তিনি তখন সমস্ত ঘা সঙ্গে সঙ্গে কার্ব্বলিক এসিড দিয়া পোড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন,—তার ফলে ঘায়ের উপর একটা পর্দ্দা পড়িয়া যাইত—আর ঘাও তাড়াতাড়ি সারিয়া যাইত। কিন্তু গোলমাল তবু রহিয়া গেল। কার্ব্বলিক এসিড জিনিষটা বড় বিশ্রী, ঘা সারিয়া যাইত বটে কিন্তু সেই জায়গাটায় এমনি বিশ্রী একটা পোড়ার দাগ থাকিয়া যাইত যে রোগীর চেহারা একেবারে মাটী হইবার যোগাড় হইত। নিজেকে সুন্দর করিতে সকলেই চায়, কাজেই রোগীরা এতে বড় একটা খুসী হইত না। লিষ্টার আবার

যোসেফ্ লিষ্টার

পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। শেষে দেখিলেন, কার্ব্বলিক এসিড না দিলেও কোন ক্ষতি নাই, কেননা জীবাণুগুলি বাতাস হইতে আসে না। বাতাসে যে ঐ সব জীবাণু লক্ষ লক্ষ ভাসিয়া বেড়ায় সেটা ঠিক, কিন্তু পরিষ্কার বাতাসের পোকা বিশেষ ক্ষতি করে না; ক্ষতি করে—হাতে, পোষাক-পরিচ্ছদে, আর ছুরি কাঁচি প্রভৃতি যন্ত্রপাতির গায়ে যে সব ময়লা থাকে তার ভিতরকার পোকাগুলি। লিষ্টার তখন ঘা-ফোঁড়াগুলি অতিরিক্ত রকম পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করিলেন, —আর পোষাক-পরিচ্ছদ, যন্ত্রপাতি, ব্যাণ্ডেজের ন্যাকড়া প্রভৃতি ওষুধ দিয়া শুদ্ধ করিতে সুরু করিলেন। এক কথায় অস্ত্র-চিকিৎসার যত কিছু গলদ ছিল, লিষ্টার সে সমস্তই শোধরাইয়া দিলেন। তাই ইংল্যাণ্ডের লোকেরা বলে "নেপোলিয়ান্ তাঁর সারা জীবনে সবগুলি যুদ্ধে যত লোক মারিয়াছিলেন, লিষ্টার বছর বছর তার চাইতে বেশী লোককে বাঁচাইতেছেন।"

কেমন? এঁরাই আমাদের আসল বন্ধু নয় কি?

---

# ছাতির মাপ।

(শ্রীদেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ)

মহা-যুদ্ধের কথা আজকাল অনেকে প্রায় ভুলে গেছে—তবে তার বড় বড় ঘটনাগুলো সহজে ভুলবার জিনিষ নয়;—যেমন এই আমাদের দেশের বাঙালী সৈন্যদলের কথা। দেশময় তখন কি উৎসাহই না দেখা গিয়েছিল!

সমস্ত বড় ব্যাপারের মাঝে অনেক ছোট ছোট মজার ব্যাপার থাকে। আজকে, যুদ্ধের সময়কার সে রকম একটা প্রহসন তোমাদের বল্‌ছি।

বাংলা দেশের ছোট্ট একটি সহর। সহর ছোট, সুতরাং তার স্কুলও ছোট —কিন্তু সে স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসের একটি ছাত্রের নাম তত ছোট নয়। শোনা যায় রোল-কলের খাতার বড় সাইজ করা হয়েছিল তার স্কুলে ভর্ত্তি হবার পর থেকে।



নামটি হচ্ছে বজ্রধ্বজ বিরাটবক্ষ পাকড়াশী। লোকে কিন্তু এ দাঁতভাঙ্গা নাম ছোট করে ডাক্‌ত "বেজা" বলে, আমরাও তাকে ঐ নামেই ডাক্‌ব।

বেজার জীবনে দুঃখ অনেক। সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছে অথচ বাবা এখনও লাইন্থ ক্লাসের ছেলের মত তাকে পড়া জিজ্ঞাসা করেন এবং সামান্য ভুল করলে নানা রকম শাস্তি দেন। লম্বায় সে বয়সের তুলনায় বেশ বেড়ে উঠেছে কিন্তু চওড়ায় সেই ছেলেবেলায় যা ছিল প্রায় তাই রয়ে গেছে। পরীক্ষাতে সে প্রায়ই ফার্ষ্ট হয় কিন্তু কেউ তাকে বিশেষ কিছু সমীহ করে না। সবাই বলে বেজাটা ছ্যাবলা। স্কুলের ছেলেরা তার চেয়ে ফুটবল টীমের ব্যাক রাম হাজরাকে অনেক বেশী সম্মান করে। স্কুলের সমস্ত ব্যাপারে পাণ্ডা হয় ঐ রাম হাজরা এবং প্রাইজের দিন ম্যাজিষ্ট্রেট কর-মর্দ্দন করেন ওরই—বেজা বেচারা মোটা মোটা প্রাইজের বই ঘাড়ে ফ্যাল ফ্যাল করে এদৃশ্য দেখে।

অবশ্য নাম করার জন্য বেজার উদ্যোগের অভাব ছিল না, তবে এবিষয়ে তার মস্ত অসুবিধা এই যে তার স্বভাবটা ঠিক ভারিক্কে ধরণের নয়—বেশী কথা বলে, সর্ব্বদা ছটফট করে এবং পনর বছর বয়স হলেও ছেলেবেলার দুষ্টুমি ভাবটা রয়ে গেছে। অবশ্য বেজা হাল ছাড়বার পাত্র নয়—যাতে বয়স বেশী মনে হয় তার জন্য প্রায়ই ফাঁকা গালে ক্ষুর লাগায় এবং মনে মনে ভবিষ্যতে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলেজে পড়ার সময় সহরের ভেতর একটা কেউ-কেটা-নয় ভাবে চলাফেরা করার আশাও রাখে। এম্নি ভাবে দিন যায় এমন সময় একটি ঘটনা ঘটল।

সহরে তখন নতুন বাঙ্গালী সৈন্য-দল তৈরী নিয়ে খুব হৈ চৈ হচ্ছে। সেকেলে সহর, এখনও কেউ নাম লেখায় নি, বোধ হয় ভয় পাচ্ছিল। হাটে-বাজারে পথে-ঘাটে সর্ব্বত্র গভর্ণমেণ্ট থেকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, "সৈন্য চাই —বেতন খোরাকী বাদ ১৮৲; শরীর দৈর্ঘে অন্ততঃ পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি এবং ছাতি অন্ততঃ ৩২ ইঞ্চি হওয়া আবশ্যক।" মাঝে মাঝে সভা-সমিতি হচ্ছিল কিন্তু কেউ এখনও সৈন্য হতে এগিয়ে আসে নি। অথচ বাংলা দেশের সমস্ত জায়গা থেকে খবর আসত যে লোকে দলে দলে নাম লেখাচ্ছে। ব্যাপারটা বেজাদের সহরের পক্ষে

সত্যি বড় কলঙ্কের কারণ হয়ে উঠছিল। সহরের মাথা যাঁরা তাঁরা ত ভেবেই পাচ্ছিলেন না যে কি করা যায়। শেষে তাঁরা ঠিক কর্ল্লেন যে সহরের লোকদের সত্যিকারের বাঙালী সৈন্য এনে দেখালে বোধ হয় অনেকে সাহস করে এগুবে। গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে লেখালেখি করে স্থির হল যে একদিনের জন্য কয়েক জন বাঙালী সৈন্য সহরে আসবে।

খবরটা সহরময় ছড়িয়ে পড়ল এবং এ নিয়ে বেশ খানিকটা হুজুগও বাধ্‌ল। যাতে তাদের আদর-অভ্যর্থনা ঠিক মত হয় তার জন্যে আয়োজন-অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। এমন কি স্কুলের ছেলেদের ভেতর থেকে ভলাণ্টিয়ারও নেয়া হয়েছে। বেজা নিজে একজন ভলাণ্টিয়ার, তবে দুঃখের বিষয় এতেও তার হার হয়েছে কেন না তাকে ক্যাপ্টেন বা ভাইস্ ক্যাপ্টেন কিছুই করা হয় নি!

এই ভলাণ্টিয়ার হওয়াই কি সহজ! ভাগ্যিস্ ঠিক এই সময়টা বেজার বাবা মফঃস্বলে গেছলেন, নইলে বেজা সাহস করে ভলাণ্টিয়ারও হতে পারত না। কিন্তু কপালের লেখা যাবে কোথায়?—সৈন্যদের আসবার আগের রাত্তিরে খেটে খুটে হায়রাণ হয়ে প্রায় রাত এগারোটার সময় বেজা বাড়ী ফিরে দেখে যে দাওয়ায় বসে বাবা তামাক খাচ্ছেন। এর পর ব্যাপারটা হল ভীষণ। বেজার বাবা লোক বড় কড়া আর তাঁর গালাগাল মারের চেয়েও লাগে বেশী। এত রাত্তিরে ছেলেকে ফির্‌তে দেখে তিনি এমনি বক্‌তে সুরু কর্ল্লেন যে বেজা বেচারা তাঁকে কেন দেরী হয়েছে একথা বলবার সুযোগই পেল না—চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই বকুনির নায়গ্রা প্রপাত ঘাড়ে পেতে নিল।

খানিক বাদে চোখের জল মুছে এক রকম না খেয়েই সে যখন শুতে এল তখন অনেক রাত হয়েছে। বেজার চোখে কিন্তু ঘুম নেই। অপমান আর অভিমানে তার মাথার ভিতর পুড়ে যাচ্ছে। হায় রে হায়! বাড়ীতে পর্য্যন্ত তার একটা বয়সোচিত সম্মান নেই! জীবনটা যেন তেতো ওষুধের মত। মনের দুঃখে পড়ার টেবিলের ধারে বসে বেজার কত কথা মনে হচ্ছে—আজ সত্যিই তার মনে বড় লেগেছে। কতক ক্ষণ এম্নি ভাবে কাট্‌তে হঠাৎ তার



নজর পড়্‌ল টেবিলে একটা মাপবার টেপের উপর। অম্নি মনে পড়ল সেই সব বিজ্ঞাপনের কথা—লম্বায় পাঁচ ফুট চার আর চওড়ায় ৩২ ইঞ্চি। আচ্ছা সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে দেশ ছেড়ে গেলে হয় না? হ্যাঁ, সুন্দর বুদ্ধি বটে। বেজা একলাফে উঠে জামা খুলে, টেপটি নিয়ে নিজের শরীর মাপতে লাগল। লম্বায় ঠিক পাঁচ ফুট চার ইঞ্চিই বটে, কিন্তু বুক—হায়রে কপাল—মাত্র ২৯ ইঞ্চি! হতাশ হয়ে বেজা শুয়ে পড়্‌ল।

দেখে যে, দাওয়ায় বসে বাবা তামাক খাচ্ছেন।

শুয়ে শুয়েই বোধ হয় দুষ্টু মৎলবটা মাথায় প্রথম এল—কেননা যখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে তখন তার মুখে হতাশার বদলে ছিল দুষ্টুমি মাখান হাসি।

পরদিন ৩টার সময় মস্ত মিটিং। সহর-শুদ্ধ লোক ভেঙ্গে পড়েছে—সামিয়ানার তলায় আর ধরে না। সভার মাঝখানে দশ জন বাঙ্গালী সৈনিক সমস্ত দুপুর ড্রিল দেখিয়ে হয়রাণ হয়ে বসে ঘাম মুছছে আর তাদের পাশে ম্যাজিষ্ট্রেট্, পুলিশ সাহেব ইত্যাদি হোমড়া চোমড়ার দল—সে এক রাজসূয় কাণ্ড। বেজা

ভলাণ্টিয়ার। সে সৈন্যদের পাশে দাঁড়িয়ে—অন্য সবাইকার চেয়ে সে যেন একটু বেশী ব্যস্ত, কেবল ছট্‌ফট্‌ করছে।

তখন বক্তৃতা দিচ্ছেন সহরের ডেপুটিবাবু। সে কি বক্তৃতা, সমস্ত সভা কাঁপছে। বক্তৃতার শেষে তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন, "এত বড় সভায় কেউ কি নেই যে বাঙ্গালীর মান রাখে—যে দেশের মুখ চেয়ে এগিয়ে এসে সৈনিক হয় ?" এই বলে থেমে তিনি একবার চারি ধারে তাকালেন—নিস্তব্ধ সভা, কোন সাড়া-শব্দ নেই। হঠাৎ শোনা গেল কে যেন বল্‌ছে, "এই যে আমি আছি।" সবাই দেখে এ যে বেজা!

তার পর একটা তুমুল কাণ্ড। চেঁচামেচি—বন্দে মাতরম্‌ চীৎকার—চিকের পেছন থেকে মেয়েদের গোলমাল, কেউ বা দেয় বেজার গলায় মালা—কেউ বা আনে থালাভরা সন্দেশ—মাথা-পাগলা সতীশ ডাক্তার ত' ক্ষেপে উঠে বেজাকে কাঁধে করে নাচতেই আরম্ভ কর্‌লেন। লোকের কি উৎসাহ! যেন বেজার বিয়ে হবে। আর, সব চেয়ে মজা হল এই যে বেজার দেখাদেখি আরও অনেকে সৈন্য হবার জন্য এগিয়ে এল।

সভা ত' ভাঙ্গ্‌ল। এবার সব শরীর পরীক্ষার পালা। বেজাকে কাঁধে করে, আর সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাছেই একটা ঘরে যাওয়া হল। প্রথমে দেখা হল সবাই লম্বায় ঠিক হচ্ছে কি না। তার পরে দেখতে হবে ছাতির মাপ। ডাক্তার সাহেব টেপ বেজার বুকে লাগালেন—ওঃ হরি, এ যে মাত্র ২৯ ইঞ্চি! মুখ বেঁকিয়ে ডাক্তার বাবু আর একবার টেপ লাগালেন—কিন্তু বুক ত' কথায় কথায় বেড়ে উঠে না, কাজেই ২৯ ইঞ্চি ২৯ ইঞ্চিই রয়ে যায়। সতীশ ডাক্তারের তখন চোখ ছল্‌ছল্‌ করছে—জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন "তা'হলে কি হবে ডাক্তার সাহেব ?" ডাক্তার সাহেব গম্ভীর ভাবে বল্লেন, "কি আর হবে ? গভর্ণমেণ্টের দুর্ভাগ্য যে এমন একটি উৎসাহী ছেলেকে পাওয়া গেল না।" এমন সময় শোনা গেল ঘরের বাইরে কে যেন কাঁদ-কাঁদ স্বরে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বোঝাচ্ছে, "সাহেব ও আমার একমাত্র ছেলে, কাল বেশী বকেছিলাম বলে সৈন্য হয়ে চলে যেতে চাইছে।



তোমরা ওকে নিওনা, তাহলে আমরা—ওর বাপ-মা—কেঁদে মর্‌ব।" গলা বেজার বাবার। এখন তাঁর অবশ্য এ ব্যাকুলতার কোন কারণ ছিল না, কেন না বেজাকে সৈন্য করে নেওয়ার পক্ষে কোন সম্ভাবনাই আর নেই। তিন ইঞ্চি ত সোজা নয়!

এই গোলমালের ভিতর বেজা বেশ গম্ভীর ভাবেই ছিল—এ রকম গাম্ভীর্য্য তার আগে কখন কেউ দেখেনি। কিন্তু শেষ কালটায় বাবার কথাগুলো কাণে যেতে তার চোখটা ছল্‌ ছল্‌ করে উঠ্‌ল, হয়ত একটু জলও এল। সে আর দেরী না করে ঘর থেকে বেরিয়েই সটান বাড়ীর দিকে চল্ল—তার সেখানে থাক্‌তে একটু লজ্জাও হচ্ছিল।

বাড়ীতে মা বাবার সঙ্গে কি ঘট্‌ল তা ত বুঝতেই পাচ্ছ। তবে রাত্তিরে পিসিমা গোপনে ডেকে বল্লেন, "হ্যাঁরে তুই কি সর্ব্বনেশে ছেলে—সত্যিই যদি ওরা তোকে নিয়ে যেত—!" বেজা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্ল, "পাগল! কাল রাত্তিরে বুক মেপে আমি ঠিক জান্‌তাম যে আমায় নেবে না। এ শুধু গেছলাম একটু মজা কর্ত্তে আর কিছু লাভের আশায়।"

"লাভ" নেহাৎ মন্দ হল না। বাবা আর কখনো ওরকম বকেননি এবং সহরে সেই থেকে ত বেজা একটা মস্ত লোক, কেননা তারই উদাহরণে সেখান থেকে সব চেয়ে বাঙ্গালী সৈন্য হয়েছে। বেজার কাছে রাম হাজরা এখন কিছুই না।

অবশ্য এ সব সুবিধা বেশী দিন হয়ত থাক্‌ত না। কিন্তু বেজা তার পর থেকে লেখা পড়ায়ও আশ্চর্য্য রকম ভাল হয়ে উঠল, কাজেই লোকের কাছে তার সম্মান বাড়া বই কমেনি। তোমরা হয়ত জিজ্ঞাসা করবে এখন সে কি করে? তার উত্তর এই যে আজ চার পাঁচ দিন হল সে বিলেত থেকে এরোপ্লেন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিখে এসেছে। এখন কিন্তু সে বড় নামটি বদ্‌লে ছোট্ট একটা নাম রেখেছে। সেটা যে কি তা অবশ্য সবাইকে জানান বারণ। তবে নাম না কর্ল্লেও তাকে চেনা মুস্কিল নয়, কেননা আজকাল সে প্রায় একটা কাবুলির মত লম্বা চওড়া জোয়ান, এবং তার ছাতি আজকাল চল্লিশ, ফোলালে প্রায় চুয়াল্লিশ ইঞ্চি।

# মানুষের-কাছাকাছি জীব

( শ্রীবিরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল্ )

মানুষের সাথে চেহারার মিল সব চাইতে বানরের। কথাটা অস্বীকার করিতে পারিলেই তোমরা খুসী হইতে, কিন্তু স্বীকার না করিয়া তো উপায় নাই! এ না হয় সহ্য হইল, কিন্তু বিলাতের একজন অসাধারণ পণ্ডিত যা বলিয়াছেন, তা শুনিলে তোমাদের বাস্তবিকই রাগ হইবে—তিনি বলেন, মানুষের পূর্ব্বপুরুষ নাকি বানর। অর্থাৎ বানরের চেহারাই লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া একটু একটু বদ্‌লাইয়া শেষে মানুষে আসিয়া ঠেকিয়াছে। এই জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতটীর নাম ডার্‌-উইন্। এবারকার "সন্দেশের" ছবিতে দেখ, এই ডার্‌-উইনের দলের একটী পণ্ডিত দেখাইতেছেন, কেমন করিয়া মাছ হইতে ধীরে ধীরে বানর এবং শেষটায় বানর হইতে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে।

রাগ তো তোমরা করিলে, কিন্তু আদিমযুগের মানুষের চেহারা যেমনটি ছিল বলিয়া আমরা মনে করি, (ছবিতে দেখ) তার সাথে আলিপুর চিড়িয়াখানার বুড়ো ওরাংওটাংটার চেহারা মনে মনে মিলাইয়া দেখ দেখি! খুব তফাৎ আছে বলিয়া মনে হয় কি?

আদিম মানুষ শিকার করিয়া ঘরে ফিরিতেছে।

দেখিতে-শুনিতে ও বুদ্ধি-বলে মানুষের সাথে যে জাতীয় বানরের সাদৃশ্য



সব চাইতে বেশী, তাকে কিন্তু তোমাদের জ্যান্ত অবস্থায় দেখার আশা খুবই কম। গরিলার কথা বলিতেছি। অসম-সাহসী জনা কয়েক শিকারী ছাড়া বড় সড়

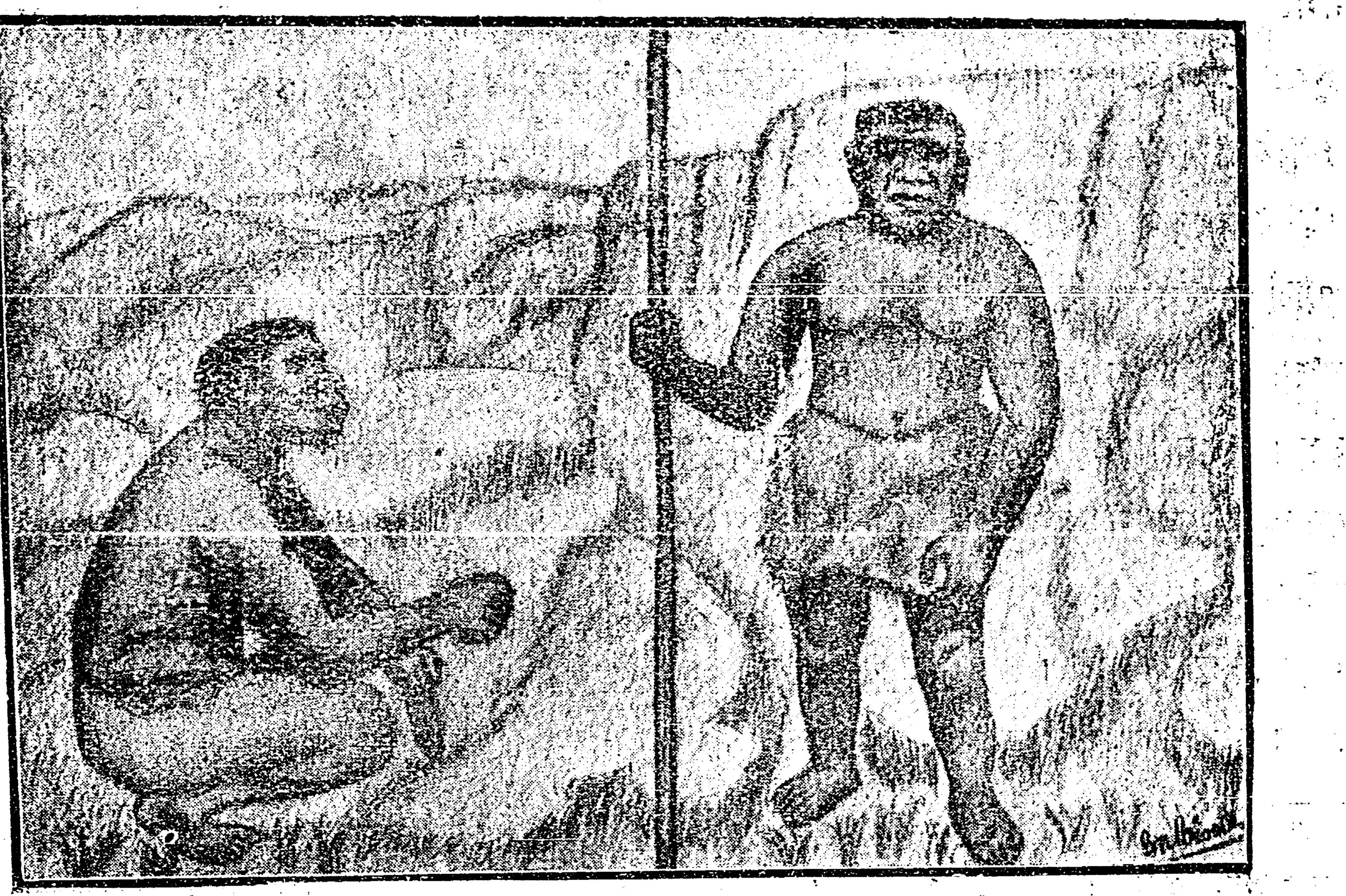

আদিম যুগের মানুষ—( শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক পেন্সিলে আঁকা )

গরিলা দেখার ভাগ্য খুব কম লোকেরই হইয়াছে। গরিলা বলিয়া যে কোন জীব আছে তাইতো আগে কেউ বিশ্বাস করিত না। এক পাদ্রী নাকি প্রথমে গরিলার মাথার খুলি দেখিয়া তাদের অস্তিত্ব জানিতে পারেন। তিনি তাদেরকে এক রকম অসভ্য বেঁটে মানুষ বলিয়া ঠাওরাইয়া ছিলেন, এবং দেশে ফিরিয়া সে সম্বন্ধে লোকের কাছে গল্পও করিয়াছিলেন। (ভাগ্যিস্, তাদের কাছে ধর্ম্মপ্রচারে যান নাই!!) তখন কিন্তু তাঁর কথা সকলে গাঁজা-খুরি গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। একটা কালো নিগ্রো-জাতীয় অসভ্য মানুষের গায়ে যদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোম লাগাইয়া দেওয়া যায়, হাত দুটীকে মানুষের হাতের দু'তিন গুণ মোটা করিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত টানিয়া লম্বা করা যায়, বুক খানাকে ফুলাইয়া তিনগুণ করা যায়, এবং

পায়ের পাতার গড়নটীকে অনেকটা হাতের পাতার মত করা হয়, তবেই মনে মনে একটী গরিলা দেখিয়া লইতে পার। এমনিভাবেই গরিলা দেখার সাধ তোমাদের মিটাইতে হইবে, কেননা জ্যান্ত বড় গরিলা ধরা আজ পর্য্যন্ত কারো সাধ্যেই কুলায় নাই। অবশ্য বাচ্চা অবস্থায় দু'চারটা ধরা পড়িয়াছিল, কিন্তু লোকালয়ে আনিয়া সেগুলিকে বেশীদিন বাঁচাইয়া রাখা যায় নাই।

কেন যে জ্যান্ত গরিলা ধরা যায় না তার কারণ জান? জঙ্গলের জন্য প্রসিদ্ধ যে আফ্রিকা, সেই আফ্রিকারও যেমন তেমন জঙ্গলে গরিলা বাস করে না, করে গভীরতম জঙ্গলে, যেখানে যাইতে হইলে অতিবড় বীরেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যেখানে গরিলার বাস বাঘ-সিংহ পর্য্যন্ত সেখানে যাইতে সাহস পায় না, কেননা কোন কারণে একবার চটিলে তার হাতে কোন প্রভুরই আর নিস্তার নাই। অথচ গায়ে এমন অসুরের জোর থাকা সত্বেও বাঘের মত অমন "ছোট-লোকে" স্বভাব কিন্তু গরিলার আদবেই নয়। অনেকের ধারণা, মানুষ দেখিলেই গরিলা তাকে তাড়া করে। এটী কিন্তু মস্ত ভুল। তাকে যদি তুমি গায়ে পড়িয়া না খোঁচাইতে যাও তবে সে তোমায় কিছুই বলিবে না, কেননা জীব-জন্তুর মাংসে তার কোনই প্রয়োজন নাই—সে সম্পূর্ণ নিরামিষাশী। গাছের ডালপালা, ফল-মূল পাইলেই সে সন্তুষ্ট। কিন্তু যদি তার অনিষ্ট করার দুর্ব্বুদ্ধি তোমার একবার হইল, তবে আর রক্ষা নাই। বজ্রের মত

গরিলার রাগ



হুঙ্কার দিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইবে, গায়ের লোমগুলি তার ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিবে, চোখ দিয়া আগুনের ঝলক্ ছিট্‌কাইবে, আর দুই হাতে ভীষণভাবে বুক চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে তোমার পানে সে যমদূতের মত ছুটিয়া আসিবে। সে কি বুকের চাপড়! দূর হইতে মনে হইবে যেন কেউ দমাদম্ ঢাক্ পিটিতেছে। সে সংহারমূর্ত্তি দেখিয়া ঠিক থাকিতে পারে এমন জীব বোধ করি দুনিয়ায় আর নাই। এমনও হইয়াছে যে শিকারী হয়ত সাহসে বুক বাঁধিয়া গরিলা শিকারে গিয়াছে, কিন্তু সে মূর্ত্তি দেখিয়া কখন যে হাত হইতে বন্দুক খসিয়া পড়িয়াছে বেচারা টেরও পায়নাই। তার পর?... ... ...

গরিলার প্রকৃতিটা যে কতখানি মানুষের মত তা একজন সাহেব শিকারী একখানা ইংরাজী কাগজে লিখিয়াছিল। একদল শিকারী একটা গরিলার স্ত্রীকে মারিয়া ফেলে। গরিলাটা সেই হইতে পাগলের মত হইয়া গেল। সারাদিন সে তার মরা স্ত্রীর পাশে বসিয়া বসিয়া কি কান্নাটাই না কাঁদিত! কে বলিবে সে মানুষ নয়? মানুষেরই মত তার দুই চোখ বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িত আর দারুণ দুঃখে সে খালি নিজের বুক চাপড়াইত। সে দৃশ্য দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। শিকারী সাহেব—জীব-হত্যা করিয়া করিয়া যে ঝানু হইয়া গিয়াছে—সে পর্য্যন্ত তা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। এ তো গেল দিনের কথা। যেই রাত্রি হইত অমনি সে লোকালয়ে গিয়া সেই শিকারীর দলে যাহারা ছিল তাদের খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিত, আর দেখা পাইলে অমনি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিত। কিন্তু আশ্চর্য্য, কখনো সে কোন স্ত্রীলোককে বা সেই শিকারীর দল ছাড়া অপর পুরুষকে আক্রমণ করে নাই, অবশ্য পুরুষেরা গায়ে পড়িয়া খোঁচাইতে না আসিলে।

এদের বংশ আজকাল প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে—গোটা পৃথিবীতে নাকি হাজার দশেকের বেশী গরিলা নাই।

গরিলা ছাড়া আরও কয়েক রকমের বড় জাতীয় বানর আছে যারা আকৃতি-প্রকৃতিতে অনেকটা মানুষেরই কাছাকাছি—যেমন শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাং ও বেবুন। গরিলার মত ওরকম অসম্ভব জোরালো না হইলেও শিম্পাঞ্জীও প্রচণ্ড বলবান্ জীব। গরিলার চাইতে শিম্পাঞ্জীর স্বভাব-চরিত্র আমরা ঢের বেশী জানিতে পারিয়াছি কেননা গরিলা যেমন নির্জ্জন ঘন বন-জঙ্গল ভিন্ন আদবেই থাকিতে পারে না,

লোকালয়ে আসিলেই পটাপট্ মরিয়া যায়, শিম্পাঞ্জী কিন্তু তেমন নয়। অনেক শিম্পাঞ্জীকে লোকালয়ে আনিয়া দিব্যি পোষ মানান হইয়াছে। আফ্রিকার প্রসিদ্ধ পর্য্যটক ডেভিড্ লিভিংষ্টোনের নাম তোমরা সবাই শুনিয়াছ। তাঁর একটা পোষা শিম্পাঞ্জী ছিল, সেটার আচার-ব্যবহার ছিল অবিকল ছোট ছেলেটীর মত। সাহেবের বেড়াইতে যাইবার সময় হইলে সঙ্গে সঙ্গে তারও যাওয়া চাই-ই। যেই দেখিল সাহেব টুপি মাথায় দিয়া হাতে ছড়ি লইয়াছেন, অমনি সে টক্ করিয়া বুঝিয়া লইল এবার তো তবে বেড়াইতে চলিলেন,—ছুটিয়া আসিয়া সাহেবের আঙ্গুল ধরিয়া সেও চলিল, ঠিক যেমনটী তোমরা বেড়াইতে বাহির হইলে তোমাদের ছোট্ট ভায়েরা করে। তোমরা অনেকে হয়তো লক্ষ্য করিয়াছ, ছোট্ট ছোট্ট ছেলেপেলেরা যদি দেখে তাদের মা অপর কোন ছেলেকে কোলে করিয়াছেন তবে তাদের ভারী হিংসা হয়; কাঁদাকাটি করে, আড়ালে পাইলে সে বেচারাকে একটু আধটু চিম্‌টী-খাম্‌চি দিতেও পিছ-পা হয় না! আমি জানি একটী ছোট্ট ছেলে তার কচি ভাই-টীর উপর হিংসা করিয়া তার মাথায় পেরেক ঠুকিতে গিয়াছিল। শিম্পাঞ্জী ভায়াদেরও নাকি এ অভ্যাসটা আছে। একবার এক বিখ্যাত শিকারী তাঁর এক পোষা শিম্পাঞ্জীকে সাথে নিয়া জাহাজে উঠিলেন। দু'দিন যাইতে না যাইতেই জাহাজের সবাইকার সঙ্গে তার খুব খাতির জমিয়া উঠিল, সবাই তাকে ভারী আদর-আপ্যায়িত করে। বেশ

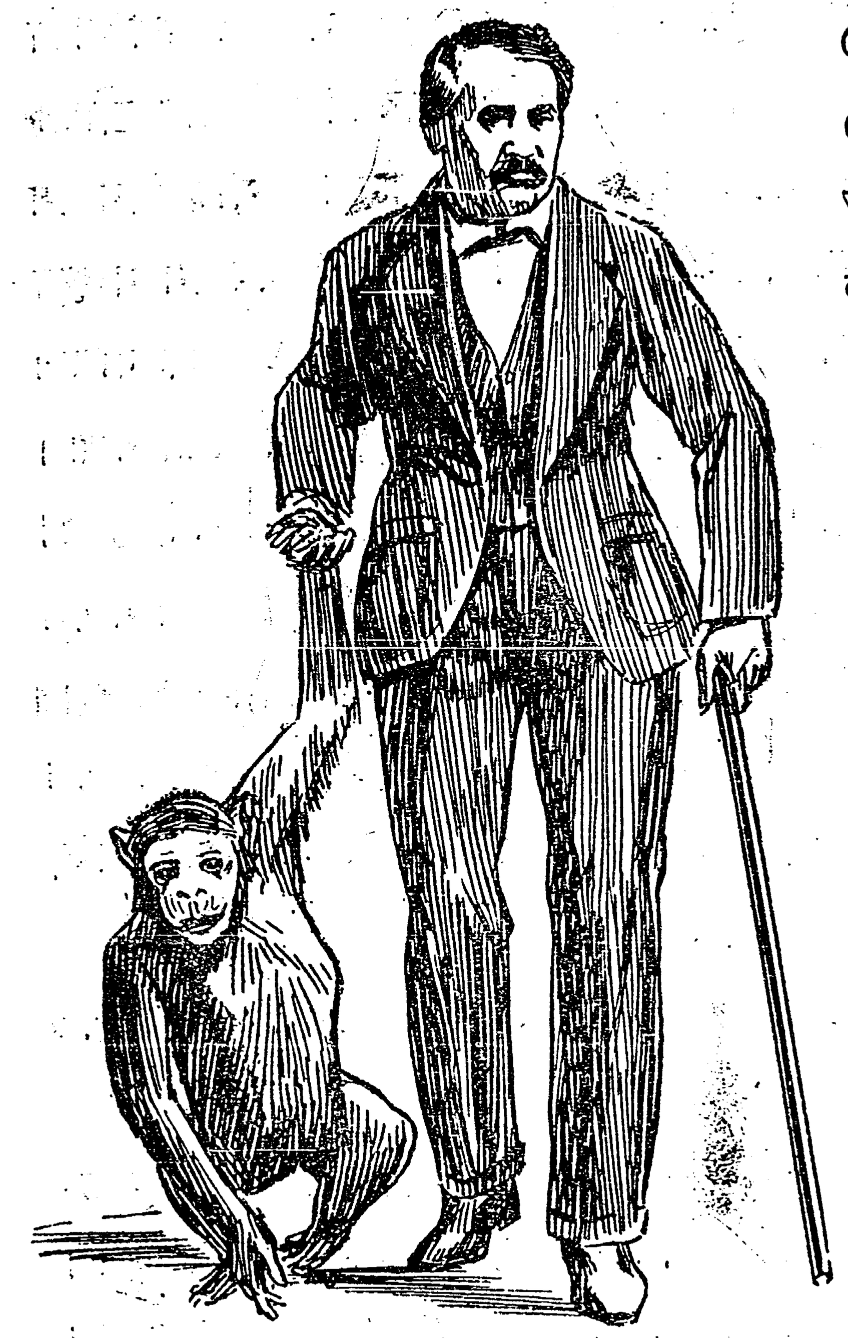
শিম্পাঞ্জী লিভিংষ্টোনের হাত ধরিয়া বেড়াইতে যাইতেছে।



আরামে দিন কাটিতেছে মাঝে হইতে পথে এক সাহেব আর মেম তাঁদের ছোট্ট খোকাটীকে লইয়া জাহাজে উঠিয়াই সব ভেস্তাইয়া দিল। শিম্পাঞ্জী ভায়া দেখিল জাহাজের লোকেরা তাকে আর ততটা আদর করে না—খোকাকে লইয়া আদর করিতেই যেন সকলে বেশী ব্যস্ত। সে দারুণ চটিল, কোথা হইতে এই এক ফোঁটা হতচ্ছাড়াটা আসিয়া তার সমস্ত আদর কাড়িয়া লইল রে! সে মনে মনে ঠিক করিল এ আপদটাকে দূর করিতেই হইবে। এক-দিন খোকা একা চুপ্‌চাপ্ জাহাজের কেবিনে শুইয়া আছে, ধারে-পাশে আর জন-প্রাণী নাই, ধীরে ধীরে ভায়া আসিয়া খোকাকে বিছানা হইতে তুলিয়া নিয়া জাহাজের রেলিংএর কাছে আনিল। তার পর তাকে তুলিয়া ঝপাৎ করিয়া যেই জলে ফেলিতে যাইবে, হঠাৎ নজরে পড়িল তার মনিব, সেই শিকারী সাহেব, ব্যাপার দেখিয়া রুদ্ধশ্বাসে সেই দিকে ছুটিয়া আসিতেছেন। তখন সে খোকাকে পাটাতনের উপর রাখিয়া সেখান হইতে লম্বা দিল। মনিবের আসিতে আর একটু দেরী হইলে কাণ্ডখানা কেমন হইত, বল দেখি!

আর একবার এক শিকারী জঙ্গলের মধ্যে এক শিম্পাঞ্জী বসিয়া আছে, দেখিতে পায়। শিকারীকে দেখিয়া তার কিন্তু কোনই ভাবের পরিবর্ত্তন হইল না, আপন মনে যেমন বসিয়াছিল তেমনটী বসিয়াই রহিল। শিকারী তখন গুলি ছুড়িল। প্রথমটা কি যে হইল বেচারা কিছু বুঝিতেই পারে নাই, কিন্তু একটু পরেই পাঁজরের পাশে হাত পড়িতে দেখিল রক্তে দেহ ভাসিয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে সে এলাইয়া পড়িল,—অতি করুণ, অতি কাতর ভাবে শিকারীর দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে সে প্রাণ-ত্যাগ করিল। সে দৃষ্টি যেন বলিতেছিল, "কেন আমার এ দশা ঘটাইলে, আমি তো তোমার কোন অনিষ্টই করি নাই!" শিকারী সে দৃষ্টির সাম্‌নে দাঁড়াইতে পারিল না। হাত হইতে বন্দুক সে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল, অনুতাপে বুকখানা যেন তাহার ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল—মাথা খুঁড়িয়া মরিতে পারিলে যেন সে বাঁচিয়া যাইত।

আলিপুর চিড়িয়াখানার প্রসিদ্ধ বুড়ো ওরাং-ওটাংটীকে তোমরা নিশ্চয়ই

দেখিয়াছ। অবশ্য ভায়ার বয়স কত হইয়াছে ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু ওরাং-ওটাং মাত্রেই দেখিতে ওরকম বুড়ো মানুষের মত। গরিলা ও শিম্পাজী থাকে আফ্রিকায়, ওরাং-ওটাংএর বাড়ী কিন্তু অন্য জায়গায়—প্রশান্ত মহাসাগরের বোর্ণিও ও সুমাত্রাদ্বীপে। অনেকের বিশ্বাস তেমন করিয়া শিখাইয়া পড়াইয়া লইতে পারিলে এদের দিয়া মানুষেরা কিছু কিছু চাকরের কাজ-কর্ম্মও চালাইয়া লইতে পারে। আমাদের আলিপুরের ভায়াটী মহা রসিক লোক—নানা রকম চাল চালিয়া সে আসর একেবারে মস্‌গুল করিয়া রাখে। তোমরা তার সাথে দেখা করিতে গেলে বেশী করিয়া কিছু কলা লইয়া যাইও, দেখিও ভায়া কেমন দিল্‌-দরিয়া হইয়া যাইবে।

ওরাং ভায়ার পাশের ঘরে যে কুকুর-মুখো বড় বানর বাস করেন তিনিই হইতেছেন বেবুন ভায়া। অতি বদ্‌খৎ চেহারা, কারো কারো আবার চোখের নীচে খাঁজ কাটা নীল রংএর ঢিবি—রূপ একেবারে উথলিয়া উঠিতেছে। এই জন্যই কাউকে কদাকার বলিয়া গালি দিতে হইলে আমরা বলি—ব্যাটা যেন বেবুন! মানুষের একটী বিদ্যা এই বেবুন মশাইরা খুব ভাল করিয়াই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন, সেটী হইতেছে চুরী বিদ্যা। কৃষকের ক্ষেত হইতে নানা রকমে বুদ্ধি খাটাইয়া শস্য চুরি করিতে এঁরা অদ্বিতীয়। মানুষের মত মাথা খাটাইয়া এবং চাল চালিয়া যুদ্ধ করিতে এবং গোলাগুলির পরিবর্ত্তে শত্রুর মাথায় ঢিল ছুড়িতেও এরা বেশ পটু।

আলিপুর চিড়িয়াখানার কর্ত্তারা গুণীর আদর জানেন। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি 'ছোটলোক' জানোয়ারদের খাবার ব্যবস্থাও ছোটলোকের মতই—যা তা কাঁচা মাংস। কিন্তু যাও দেখি একবার ওরাংওটাং প্রভৃতি 'বাবু'দের খাওয়ার কাছে—তাদের জন্য বরাদ্দ দেখিবে চা, পাঁউরুটী-টোষ্ট্‌ প্রভৃতি। দু'চার জন্ম পরে মানুষ হইয়া এ সব তো খাইতেই হইবে, কিছু আগে হইতে তালিম দিয়া না রাখিলে চলিবে কেন?

---

# ব্রাহ্মণ ও কুকুরের মাংস

(মহাভারত হইতে)

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার পর বহুকাল চলিয়া গিয়াছে। ত্রেতাযুগ তখন শেষ হইয়া যাইতেছে, দ্বাপরযুগ কেবল আরম্ভ হইবে।

বৃষ্টির সঙ্গে দেখা নাই; মেঘ তো মেঘ, রাত্রির শেষে একটু শিশির যে লোকে দেখিতে পাইবে তাহাও দুর্ঘট হইয়া পড়িল। নদীর জল প্রায় সবই শুকাইয়া গেল, পুকুর, কুয়া, ঝরণা এ সকলের তো কথাই নাই। লোকে তখন কি দিয়া কি করিবে? ব্রাহ্মণের পড়াশুনা, যাগযজ্ঞ কোথায় চলিয়া গেল—কৃষিকার্য্য, পশুপালন এসব তো উঠিয়াই গেল। দোকান-পাট বন্ধ করিয়া দিতে হইল। আমোদপ্রমোদ তো উড়িয়া গেলই। চারিদিকে কেবল হাড়গোড় আর ভূতের চেঁচামিচি। গ্রাম, নগর সকল ছাড়া পড়িল; ঘরবাড়ী আগুন লাগিয়া পুড়িতে লাগিল। আর মানুষগুলা? কেহ চোর-ডাকাতের ভয়ে, কেহ বা রাজার অত্যাচারে যে যেখানে পারিল ছুট্ দিল। তারপর এ মারে উহাকে, ও মারে ইহাকে—এই দাঁড়াইল ব্যাপার। যাদের বয়স কম, তারা বুড়াদিগকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিল। ঘোড়া, গরু, ভেড়া হিষ বেদম্ মরিতে লাগিল। মানুষ মানুষের মাংস খাইতেও কসুর করিল না—কি আর করে? বড় বড় ঋষিরা পর্য্যন্ত ব্রত নিয়ম ছাড়িয়া এদিক্ ওদিক্ চম্পট দিলেন।

বার বৎসর এই ব্যাপার চলিল। বিশ্বামিত্র যে এত বড় ঋষি, তিনি পর্য্যন্ত বাড়ীঘর, ছেলেপিলে ছাড়িয়া, হোম-জপ সব তুলিয়া দিয়া পেটের জ্বালায় বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি গিয়া পড়িলেন এক বনের মধ্যে চণ্ডালদের পাড়ায়। চণ্ডালেরা জীবজন্তু ধরিয়া তাহার মাংস খাইত। বিশ্বামিত্র সেখানে গিয়া দেখেন—কোথাও ভাঙ্গা কলসী, কোথাও কুকুরের চামড়া, কোথাও শূকরের আর উটের হাড়গোড়, কোথাও মরা মানুষের কাপড়, এই সব দিয়া চারিদিক্ ঘেরা। আর ঘর সাজান রহিয়াছে সাপের খোলস দিয়া। কোথাও মুরগী ডাকিতেছে, কোথাও গাধার শব্দ শুনা যাইতেছে। কোথাও চণ্ডালেরা নিজেরা নিজেরা ঝগড়া বাধাইয়াছে, আবার কোথাও ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে পেঁচা, আরও কত কি পক্ষী, কিল্‌বিল্‌ করিতেছে। কোথাও বা ঘণ্টা বাজিতেছে—অবশ্য লোহার ঘণ্টা, আবার কোথাও কুকুরগুলা দল বান্ধিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিশ্বামিত্র তখন ক্ষুধায় বেজায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। চণ্ডালদের কাছে চাহিয়াও না পাইলেন দুটী ভাত, না পাইলেন মাংস, না পাইলেন কিছু ফলমূল। তখন এক চণ্ডালের বাড়ীর উপর গিয়া পড়িলেন আর মরণটা কিসে এড়ান যায় তাই ভাবিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র দেখিলেন চণ্ডালের বাড়ীতে কুকুর কাটা হইয়াছে, সেই কুকুরের টাট্‌কা মাংসটা আছে। খুব খুশী হইয়া ভাবিলেন,—বেশ তো, ঐ মাংসই আমাকে চুরী করিতে হইবে। প্রাণটা খালি খালি দিব কেন? এমন বিপদে পড়িলে ব্রাহ্মণও চুরী করিতে পারে। ভাবিয়া-চিন্তিয়া মুনি-ঠাকুর সেখানে শুইলেন।

রাত্রি বেশ জমিয়া আসিল, চণ্ডালেরাও ঘুমাইয়া পড়িল। বিশ্বামিত্র চুপে চুপে উঠিয়া সেই কুঁড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার একটু ভুল হইয়াছিল। এক চণ্ডাল সেখানে জাগা ছিল। তাহার চেহারাটা ছিল ভীষণ আর চক্ষু দুটী শ্লেষ্মায় ছিল জড়ান। চণ্ডাল মানুষের শব্দ পাইয়া কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিল, "কে ঢুক্‌লো আমার ঘরে কুকুরের মাংস চুরী কর্‌তে? সব ঘুমে কিন্তু আমি জাগা, যিনি ঢুকেছেন তাঁর এখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি।"

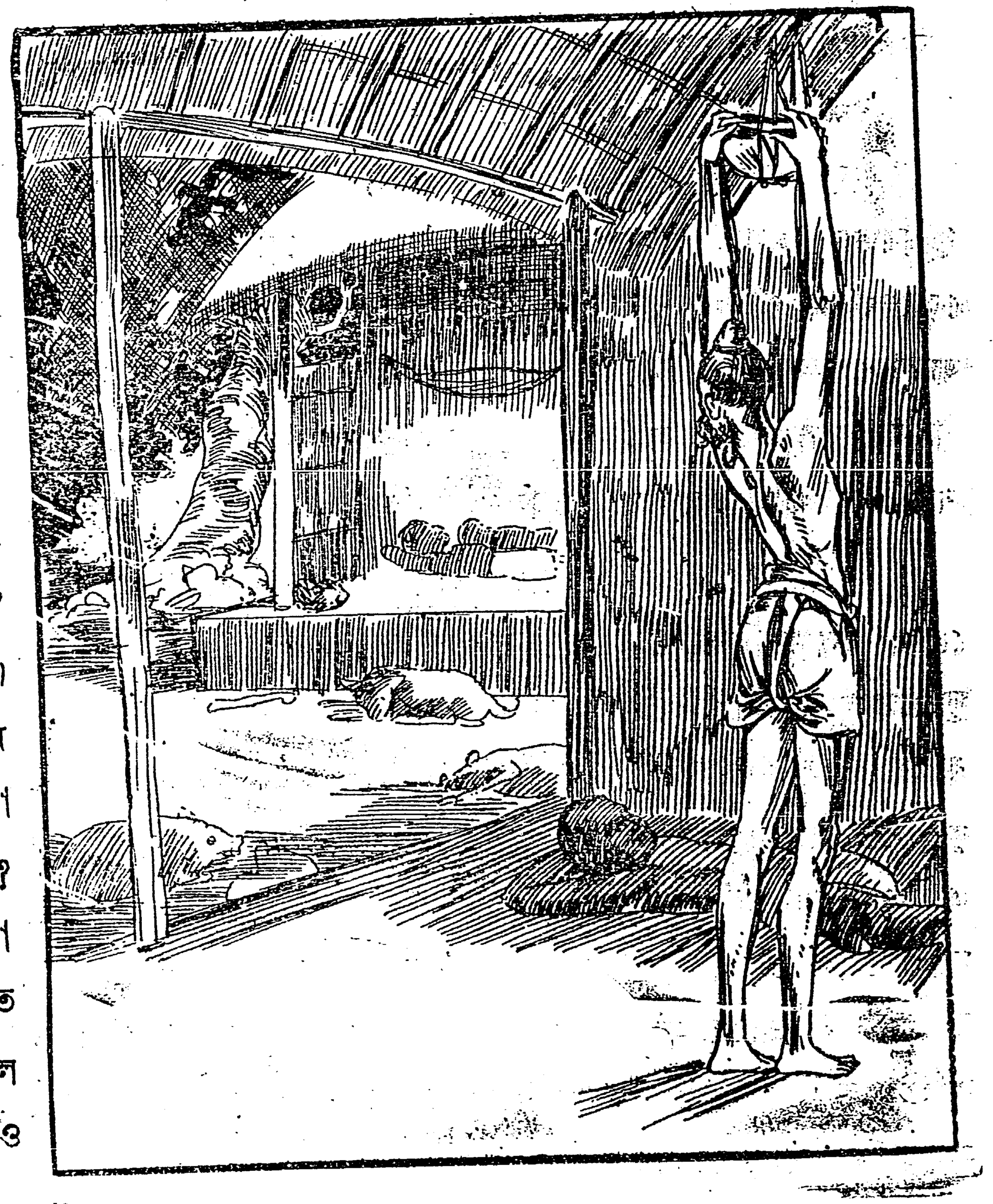

বিশ্বামিত্র কুকুরের মাংস চুরি করিতে উদ্যত।

বিশ্বামিত্র শুনিলেন। তাঁহার যেমন হইল ভয়, তেমন হইল লজ্জা; কিন্তু দুষ্কর্ম্ম করিয়া বসিয়াছেন, এখন করেন কি? বাধ্য হইয়া নিজের পরিচয়টা দিলেন। চণ্ডাল যাহাতে তাঁহাকে না মারিয়া ফেলে সে জন্য একটু কাকুতিও করিলেন।



বিশ্বামিত্রের নাম শুনিয়া চণ্ডাল বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিল, চক্ষু ঘসিয়া একটু পরিষ্কার করিয়া লইল। তার পর হাত জোড় করিয়া বলিল, "ঠাকুর, আপনি এখানে এত রাত্রে কি কাজে এলেন?" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "ওহে আমি খিদেয় অস্থির হয়ে পড়েছি, মরে গেলাম, তাই তোমার কুকুরের পিঠের মাংস চুরী কর্‌তে এসেছি। আমার কি আর জ্ঞান আছে? খিদের চোট্ লাগলে কি আর লজ্জা সরম থাকে? আমার যে প্রাণ যায়, কোন্‌টা খাদ্য আর কোন্‌টা অখাদ্য সে সব আর বিচার করার সময় নেই। তোমাদের পাড়ায় কত ভিক্ষে কর্‌লেম, কিছুই জুট্‌লো না, চুরী করা অধর্ম্মের কাজ সেটা জানি, জেনেও আমার এই কুকুরের মাংস চুরী করার ইচ্ছে হয়েছে; দেখ, অগ্নি তো খুব পবিত্র কিন্তু তিনি যা পান তাই পেটে পোরেন। আমারও এখন সেই দশা।"

চণ্ডাল বলিল, "ঠাকুর, আপনার এখন উচিত যাতে আপনার ধর্ম্ম নষ্ট না হয় আমার কাছে সে কথা শোনা আর সেই রকম কাজ করা। জ্ঞানীরা বলেন, কুকুর শেয়ালের চেয়েও খারাপ। আবার কুকুরের অন্য জায়গার মাংসের চেয়ে পিঠের মাংস খারাপ। তার উপর আবার জিনিষটা চণ্ডালের। এটা চুরী করা নিতান্তই অধর্ম্মের কাজ। আপনি এত বড় ধার্ম্মিক এমন কাজ করবেন না। প্রাণ রাখ্‌তে হবে ত আর কোন ভাল পথ দেখুন। মাংসের লোভে তপস্যা নষ্ট কর্‌বেন না"।

মুনিঠাকুর বলিলেন, "ওহে, আমি না খেয়ে না দেয়ে অনেক ঘুরেছি, প্রাণ রাখার কোন উপায়ই দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আগে প্রাণ, তারপর তো ধর্ম্ম! বেদের বল আমার আছে, সেই বলেই তোমার এই কুকুরের মাংস খেয়ে খিদে মেটাব। প্রাণ থাক্‌লে ধর্ম্ম আবার হবে, এই অভক্ষ্য জিনিষ খেয়ে যা কিছু পাপ হয় বিদ্যা আর তপস্যার জোরেই সে সব নষ্ট করে ফেল্‌বো।

চণ্ডাল বলিল, "ঠাকুর, এই কুকুরের পিঠের মাংস খেলে আপনার না হবে দীর্ঘ আয়ু, না হবে অমৃত খাওয়ার মত সুখ। আপনি অন্য জিনিষের জন্য আবার ভিক্ষায় ঘুরুন। কুকুরের পিঠের মাংস! এ যে ব্রাহ্মণের একেবারে অখাদ্য। আপনি কখনও এটা খাওয়ার চেষ্টা কর্‌বেন না"।

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "আরে, কোথায় পাব এই দুর্ভিক্ষের সময় অন্য মাংস? এদিকে খিদেয় অস্থির, ওদিকে টাকাকড়ি কিচ্ছু নেই। কোথায় কি পাব কিচ্ছু বুঝি না; এই কুকুরের পিঠের মাংসই খুব ভাল খাবার বলে মনে কর্‌ছি।"

চণ্ডালও স্বীকার করে না, বিশ্বামিত্রও ছাড়েন না। এই রকম তর্কাতর্কি চলিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র বলিলেন, "অগস্ত্যমুনিও এক সময় খিদে সাম্‌লাতে না পেরে বাতাপি অসুরকে খেয়ে ফেলেছিলেন।" চণ্ডাল বুঝাইয়া দিল—সেটা হইয়াছিল ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার জন্য তাঁহাদের কথামত। কিন্তু বিশ্বামিত্রের তখন অতটা ভাবিবার সময় কই? তিনি বলিলেন, "আমার এই শরীরটাই সেরা, একে ঠিক রাখার জন্যই কুকুরের মাংস চুরী—তাই ভয়ানক ভয়ানক চণ্ডালদের দেখেও আমার ভয় হয় নি।

চণ্ডাল বলিল, "ঠাকুর, অভক্ষ্য খাওয়ার চেয়ে প্রাণ যাওয়াও সাধু লোকের পক্ষে ভাল। কত লোক তো খিদেটাকে জয় করে ফেলেছে। আপনিও তাই করুন।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "না খেয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া ভাল বটে কিন্তু যার প্রাণ রাখার ইচ্ছে আছে তার পক্ষে সেটা খাটে না, কুকুরের মাংস খেলে যে অল্প পাপ হবে আমি ব্রত-নিয়ম করে সেটা কাটিয়ে দিতে পারবো; খুব ভাল করে বিচার করে দেখ্‌লে কুকুরের মাংস খাওয়ায় যে কোন দোষ হবে না এটা প্রমাণ করা যায়। কুকুরের মাংস খেলেও আমি তোমার মত চণ্ডাল হয়ে যাব না। তুমি চণ্ডাল, এসব বুঝবে কি?"

চণ্ডাল বলিল, "আপনার ওপর দয়া হয়েছে বলেই তো বন্ধুর মত এত সব বল্‌ছি। লোভে পড়ে কুকুরের মাংস খাবেন না, পাপে ডুববেন না।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তুমি যদি আমার বন্ধু হও তবে এখনি আমাকে এই বিপদ্ থেকে উদ্ধার কর; ধর্ম্ম আমি বেশ জানি, তুমি কুকুরের মাংস দাও।

চণ্ডাল আরও অনেকক্ষণ তর্ক করিল। বিশ্বামিত্রকে অনেক বুঝাইল। কিন্তু বিশ্বামিত্র ক্ষুধায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন—তিনি ঠিক করিলেন, ঐ কুকুরের মাংস খাইবেনই। চণ্ডাল ভয় দেখাইল, শেষে চুপ করিয়া গেল। বিশ্বামিত্র তখন সেই কুকুরের মাংস লইয়া সেখান হইতে চলিলেন। ঠিক করিলেন নিজের ধর্ম্মপত্নীকেও জিনিষটার ভাগ দিবেন।

হাজার হইলেও বড় ঋষি তো, সে অবস্থায়ও মাংসটা পাইয়া একেবারেই পেটে পুরিলেন না। শাস্ত্রমত চরু প্রস্তুত করিলেন, তারপর দেবতাদের নামে মন্ত্র পড়িলেন, পিতৃপুরুষদের ডাকিয়া নিয়ম মত তাহাদিগকেও ভাগ দিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তখন আর থাকিতে পারিলেন না—বিশ্বামিত্রের কার্য্য দেখিয়া বেশ জোরেই বৃষ্টি ছাড়িয়া দিলেন। বিশ্বামিত্র দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য শেষ করিয়া কুকুরের মাংস খাইলেন, কিন্তু ঐ বৃষ্টিতে দেশে যথেষ্ট শস্য দেখা দিল। বিশ্বামিত্রও তপস্যা করিয়া কুকুরের মাংস খাওয়ার পাপ কাটাইয়া উঠিলেন।

---

# রামধনু

( শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র। )

শরতের আগমনে
একি মায়া মিষ্টি,—
একদিকে রোদ হাসে
আরদিকে বিষ্টি !
দেখ শিশু, দু'য়ে মিলে
শোভা ওকি ফুট্‌ল !
যার ফলে আকাশেতে
রামধনু উঠ্‌ল !

কিবা রঙ্ কিবা ঢঙ্
মনোরম ধনুটী,
ফুলেরি তোরণ ওটী
প্রফুল্ল তনুটী।
পর পর সাত রঙে
বাহার কি খুল্‌ল !
গাঁথা হলো মালা যেন
শোভায় অতুল্য !

অপরূপ কিবা রূপ
সব-সেরা সুন্দর,
আঁকা হলো গগনেতে
চিত্র কী মন্থর !
আমাদেরি পৃথিবীর
ছুঁয়ে দু'টী প্রান্ত,
এমন যে ছবি হয় !—
আগে কেউ জান্‌ত ?

বলো দেখি এ শোভার
আছে কোনো হেতু কি ?
কিসে কিসে মিশে হেন
গড়্‌লে এ সেতুটী ?
এই পথে নেমে আসে
দেবশিশু-বর্গ ?—
অথবা এ সেতু বেয়ে
যাওয়া যাবে স্বর্গ !

এই রোদ, এই জল,—
সুখ আর দুঃখ,
আছে এই জীবনেতে
বুঝেছ কি সুক্ষ্ম ?
রোদে জলে মিলে বাজে
চিরদিন ডঙ্কা,
ইন্দ্র-সভায় যেতে
নেই শিশু শঙ্কা !

জড়োয়ার হারে গাঁথা
কত হীরা, পান্না,
পাশাপাশি সুখ-দুখ
হাসি আর কান্না ;
চিক্‌চিকে রোদ সাথে
ঝিম্ ঝিম্ বিষ্টি—
দু'য়ে মিলে করে শিশু
রামধনু সৃষ্টি !

চণ্ডালও স্বীকার করে না, বিশ্বামিত্রও ছাড়েন না। এই রকম তর্কাতর্কি চলিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র বলিলেন, "অগস্ত্যমুনিও এক সময় খিদে সাম্‌লাতে না পেরে বাতাপি অসুরকে খেয়ে ফেলেছিলেন।" চণ্ডাল বুঝাইয়া দিল—সেটা হইয়াছিল ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার জন্য তাঁহাদের কথামত। কিন্তু বিশ্বামিত্রের তখন অতটা ভাবিবার সময় কই ? তিনি বলিলেন, "আমার এই শরীরটাই সেরা, একে ঠিক রাখার জন্যই কুকুরের মাংস চুরী—তাই ভয়ানক ভয়ানক চণ্ডালদের দেখেও আমার ভয় হয় নি।

চণ্ডাল বলিল, "ঠাকুর, অভক্ষ্য খাওয়ার চেয়ে প্রাণ যাওয়াও সাধু লোকের পক্ষে ভাল। কত লোক তো খিদেটাকে জয় করে ফেলেছে। আপনিও তাই করুন।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "না খেয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া ভাল বটে কিন্তু যার প্রাণ রাখার ইচ্ছে আছে তার পক্ষে সেটা খাটে না, কুকুরের মাংস খেলে যে অল্প পাপ হবে আমি ব্রত-নিয়ম করে সেটা কাটিয়ে দিতে পারবো ; খুব ভাল করে বিচার করে দেখ্‌লে কুকুরের মাংস খাওয়ায় যে কোন দোষ হবে না এটা প্রমাণ করা যায়। কুকুরের মাংস খেলেও আমি তোমার মত চণ্ডাল হয়ে যাব না। তুমি চণ্ডাল, এসব বুঝবে কি ?"

চণ্ডাল বলিল, "আপনার ওপর দয়া হয়েছে বলেই তো বন্ধুর মত এত সব বল্‌ছি। লোভে পড়ে কুকুরের মাংস খাবেন না, পাপে ডুববেন না।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তুমি যদি আমার বন্ধু হও তবে এখনি আমাকে এই বিপদ্ থেকে উদ্ধার কর ; ধর্ম্ম আমি বেশ জানি, তুমি কুকুরের মাংস দাও।

চণ্ডাল আরও অনেকক্ষণ তর্ক করিল। বিশ্বামিত্রকে অনেক বুঝাইল। কিন্তু বিশ্বামিত্র ক্ষুধায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন—তিনি ঠিক করিলেন, ঐ কুকুরের মাংস খাইবেনই। চণ্ডাল ভয় দেখাইল, শেষে চুপ করিয়া গেল। বিশ্বামিত্র তখন সেই কুকুরের মাংস লইয়া সেখান হইতে চলিলেন। ঠিক করিলেন নিজের ধর্ম্মপত্নীকেও জিনিষটার ভাগ দিবেন।

হাজার হইলেও বড় ঋষি তো, সে অবস্থায়ও মাংসটা পাইয়া একেবারেই পেটে পুরিলেন না। শাস্ত্রমত চরু প্রস্তুত করিলেন, তারপর দেবতাদের নামে মন্ত্র পড়িলেন, পিতৃপুরুষদের ডাকিয়া নিয়ম মত তাহাদিগকেও ভাগ দিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তখন আর থাকিতে পারিলেন না—বিশ্বামিত্রের কার্য্য দেখিয়া বেশ জোরেই বৃষ্টি ছাড়িয়া দিলেন। বিশ্বামিত্র দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য শেষ করিয়া কুকুরের মাংস খাইলেন, কিন্তু ঐ বৃষ্টিতে দেশে যথেষ্ট শস্য দেখা দিল। বিশ্বামিত্রও তপস্যা করিয়া কুকুরের মাংস খাওয়ার পাপ কাটাইয়া উঠিলেন।

---

# রামধনু

( শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র। )

শরতের আগমনে
একি মায়া মিষ্টি,—
একদিকে রোদ হাসে
আরদিকে বিষ্টি !
দেখ শিশু, দু'য়ে মিলে
শোভা ওকি ফুট্‌ল !
যার ফলে আকাশেতে
রামধনু উঠ্‌ল !

কিবা রঙ্ কিবা ঢঙ্
মনোরম ধনুটী,
ফুলেরি তোরণ ওটী
প্রফুল্ল তনুটী।
পর পর সাত রঙে
বাহার কি খুল্‌ল !
গাঁথা হলো মালা যেন
শোভায় অতুল্য !

অপরূপ কিবা রূপ
সব-সেরা সুন্দর,
আঁকা হলো গগনেতে
চিত্র কী মন্থর !
আমাদেরি পৃথিবীর
ছুঁয়ে দু'টী প্রান্ত,
এমন যে ছবি হয় !—
আগে কেউ জান্‌ত ?

বলো দেখি এ শোভার
আছে কোনো হেতু কি ?
কিসে কিসে মিশে হেন
গড়্‌লে এ সেতুটী ?
এই পথে নেমে আসে
দেবশিশু-বর্গ ?—
অথবা এ সেতু বেয়ে
যাওয়া যাবে স্বর্গ !

এই রোদ, এই জল,—
সুখ আর দুঃখ,
আছে এই জীবনেতে
বুঝেছ কি সুক্ষ্ম ?
রোদে জলে মিলে বাজে
চিরদিন ডঙ্কা,
ইন্দ্র-সভায় যেতে
নেই শিশু শঙ্কা !

জড়োয়ার হারে গাঁথা
কত হীরা, পান্না,
পাশাপাশি সুখ-দুখ
হাসি আর কান্না ;
চিক্‌চিকে রোদ সাথে
ঝিম্ ঝিম্ বিষ্টি—
দু'য়ে মিলে করে শিশু
রামধনু সৃষ্টি !

# পদ্মরাগ

( অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ )

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

১৭

## চেনা মানুষ

দু'তিন ঘণ্টার নাম করিয়া হুকা-কাশি বাহির হইলেন বটে, ফিরিতে কিন্তু তাঁর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। বিছানায় শুইয়া একমনে রণজিৎ কি একটা কথা ভাবিতেছিল, জুতার শব্দে চমকিয়া হুকা-কাশির উপর দৃষ্টি পড়িতেই মুহূর্ত্ত মধ্যে সে খাঁড়া হইয়া রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "খবর কি? জান্‌তে পার্‌লেন কিছু?"

"পেরেছি, যদিও তাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। ব্যাপারটা যতদূর বুঝ্‌লাম, ওদের এখানে এসে পৌছোবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কে একজন ছোরা মেরে পদ্মরাগ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।"

নৈরাশ্যের ভারে রণজিৎ একেবারে মুষরিয়া পড়িল, কহিল, "আবার তবে এক যুগের ধাক্কা বলুন? শেষটায় হয় তো কালোমুখে রাজাবাহাদুরকে বল্‌তে হবে যে কোন কিনারাই করা গেল না!"

"অত ঘাব্‌ড়াচ্ছেন কেন রণজিৎবাবু, ঘাব্‌ড়াবার কি আছে এতে? ছোরা মেরে মণিথানাকে কে ছিনিয়ে নিয়েছে সেটা বের করে ফেল্লেই তো সব গোলমাল চুকে গেল!"

"হ্যাঁ, কে নিয়েছে সেটা জান্‌তে পারলে যে এর ভেতর আর কোন গোলমাল থাক্‌বে না সেটা আমি ও বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, মিষ্টার হুকা-কাশি, শুধু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না এইটে যে এই 'বের করা'টাকে আপনি এমন ডাল-ভাতের মত সোজা জিনিষ মনে কচ্ছেন কি করে?"

"তবে আমিও বলি রণজিৎ বাবু, এটাও আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না যে ব্যাপারটাকে আপনি এমন পোলোয়া-কালিয়ার মত শক্ত জিনিষই বা কেন মনে কচ্ছেন! এ পক্ষের সবাই যে কেমন চৌকস তার একটু-আধটু পরিচয় আপনি এর মধ্যেই পেয়েছেন। অনেক দিন থেকে এসব জিনিষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কচ্ছি, বয়সও নেহাৎ কম হোলো না—এ দলের মত হুঁসিয়ার লোক আজ পর্য্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। কাজেই একজন নেহাৎ অজানা-অচেনা—নিতান্ত বাইরের লোক বা পাড়ার লোক—হঠাৎ এদের অসতর্কতার সুবিধা পেয়ে, এরা এসে পৌছুতে-না-



পৌছুতে এমন একটা কাজ করে সেরে যাবে, এটা আমি তেমন বিশ্বাস কর্‌তে পাচ্ছি না। আমার এ অনুমান যদি সত্যি হয়, তবে এ কাজ ঘটেছে এমন একজন লোকের দ্বারা যে আপনাদের মোটর রেস্, জঙ্গলের ভেতর মোটর ওলটানো—সমস্ত ব্যাপারই জানে। খুব বেশী লোক যে এ সব তথ্য জানে, এ আমি বিশ্বাস করি না। কাজেই নিতান্ত অল্প কয়েক জন লোকের ভেতর থেকে আমাদের যাকে চেনা দরকার তাকে চিনে নেওয়াটা কি আপনি খুব কঠিন কাজ মনে করেন? আমি কিন্তু করি না।"

হঠাৎ রণজিৎ কেমন চকিত হইয়া উঠিল, কহিল, "আপনার কি ধারণা, লোকটা আমাদের জানা?"

"হ্যাঁ।"

"তবে যে সে কে, আমি টের পেয়েছি। সেই থেকে ভেবে ভেবে আমি সারা হ'য়ে যাচ্ছি—আপনি ফেরার আগে পর্য্যন্ত শুয়ে শুয়ে কেবল সেই কথাই ভাব্‌ছিলাম। সোলোমন সাহেবের রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে তো আমরা দু'জনে দু'দিক্‌কার পথ ধরলাম—আমি এলাম হোটেল-বরাবর, আর আপনি গেলেন সেই ড্রাইভারটার পেছু পেছু—বটে তো? অনেকটা পথ এগিয়ে আসার পর দেখি, সাম্‌নে বড় রাস্তার মোড়ে একটা লোক দোকান থেকে ফুলুরি আর বেগুনি কিন্‌ছে। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে আস্‌তে না আস্‌তে ফুলুরি-বেগুনি নিয়ে পাশের গলিপথে কোথায় যে সে মিলিয়ে গেল, তার আর কোন পাত্তাই পেলাম না। আমায় বোধ করি সে দেখ্‌তে পায়নি, কিন্তু আমি তাকে স্পষ্ট চিনেছি। বলুন তো সে কে?"

"কে?"

"গণেশ ঠাকুর! রাজাবাহাদুরের রসুয়ে বামুন!"

বিস্মিতকণ্ঠে হুকা-কাশি কহিলেন, "এই এলাহাবাদ সহরে দেখ্‌লেন তাকে?"

"হ্যাঁ, এই এলাহাবাদ সহরেই। আর একটা কথা। পেজ-কাটারের ভাঙ্গা হ্যাণ্ডেলটা পাইনি শুনে সেদিন আর আপনি ও বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসা-বাদ করেন নি, আমিও কিছু বলিনি। কিন্তু আজ আর আপনাকে এটা না জানিয়ে থাক্‌তে পাচ্ছি না যে এই গণেশ-ঠাকুরটীকেই একদিন চোরের মত সবার আড়ালে রাজাবাহাদুরের ঘরে ঢুকে সে জিনিষটার খোঁজ কর্‌তে দেখেছি।"

এক মুহূর্ত্তে হুকাকাশির মুখখানা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন, "এই ঠাকুরটীকে আমাদের খুঁজে বের কর্‌তে হবে।"

রণজিৎ জিজ্ঞাসা করিল, "গণেশ-ঠাকুরকে আপনি চিনবেন তো?

"চিন্‌ব, সমসেরপুরে দেখেছি, চেহারা মনে আছে।"

গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া সাতটা বাজিয়া গেল দেখিয়া রণজিৎ সচকিত হইয়া কহিল, "খাওয়া দাওয়াও তো এখন পর্য্যন্ত বোধ হয় আপনার হয়নি?"

"হোয়েছে, ফেরবার পথে সোলোমন সাহেবের রেষ্টুরেণ্টে সে কাজ সেরে এসেছি চমৎকার খাওয়ালে। সাহেবের সাথে আলাপ-পরিচয়ও খুব হোলো। ভারী আলাপী মানুষ। ভাল কথা, বাড়ীর চিঠি পেয়েছেন আজ?"

আজ তো আসবার কথা নয়, কাল পর্য্যন্ত হয়তো আসতে পারে।"

## ১৮

## নিরুদ্দেশ

পরদিন প্রাতে হুকা-কাশি বেড়াইতে বাহির হইলেন। রাস্তা-ঘাট তখনও জন-শূন্য—ভোরের বাতাস সমস্ত গায়ে তাঁর স্নেহস্পর্শ বুলাইয়া দিতেছিল। সে স্পর্শ যে কতখানি মধুর অপরকে মুখে বলিয়া তা' বুঝান যায় না, যায় শুধু তার সাথে সাক্ষাৎ-পরিচয় করাইয়া দিয়া।

বেড়াইতে বেড়াইতে কখন যে তিনি সহরের গণ্ডী ছাড়াইয়া বিস্তীর্ণ মাঠের ভিতর দিয়া হাঁটিতে ছিলেন, তা তাঁর খেয়ালেই আসে নাই। সাহেবী পোষাক পরা আর একটী লোক বিপরীত দিক্ হইতে আসিতেছিল, কাছে আসিলে হুকা-কাশি চিনিলেন, সে সোলোমন সাহেব। বলিলেন, 'আমার রোগটী যে আপনারও আছে দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

হুকা-কাশি চিনিলেন, সে সোলোমন সাহেব।

কথাটার অর্থ সাহেব ঠিক বুঝিতে পারিল না, কহিল, "কি বল্‌ছেন?"



"ভোরের বেলা বেড়াবার অভ্যেসটা আমার মত আপনারও আছে, তাই বল্‌ছি। বাস্তবিক এ সময়টা কেন যে লোকে বিছানায় পড়ে কাটায়, তা আমি বুঝতে পারিনা। এই বাতাস খাওয়ার চাইতে আরাম কি তাতে বেশী?"

সাহেব হাসিল, "যার যাতে আরাম! আপনি বুঝি রোজই এদিকে আসেন?"

"কোথায় আসি? শুধু আজই এলাম; বেড়াবার আমার কোন নির্দ্দিষ্ট জায়গা নেই, যেদিন যেদিকে মন যায়। আচ্ছা চলি, সুপ্রভাত! যাবো'খুনি ঘণ্টা দুই বাদে আপনার রেষ্টুরেণ্টে। যে ফাঁদ পেতে রেখেছেন, চব্বিশ ঘণ্টাই না কেন সেখানে গিয়ে পড়ে থাকি!" বলিয়া হুকা-কাশি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

সাহেবও হাসিয়া জবাব দিল, "সে তো আমার পরম সৌভাগ্য!"

প্রাতর্ভ্রমণ সাঙ্গ করিয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিতেই হুকা-কাশি লক্ষ্য করিলেন, ফটকের সাম্‌নে রণজিৎ দাঁড়াইয়া—বাহিরে যাইবার জন্য কাপড়-চোপড় পরিয়া একেবারে ফিট্‌ফাট্ হইয়াই সে নামিয়াছে। হুকা-কাশির উপর নজর পড়িতেই আগাইয়া আসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গেছ্‌লেন ভোর না-হতে হতে বেরিয়ে? বেড়াতে বুঝি? দাদার চিঠি পেলাম এই ভোরের ডাকে—দীপেন নাকি শীগ্‌গিরই আমাদের খোঁজে এখানে আস্‌ছে। ওদিকে কাণ্ড হ'য়েছে মন্দ নয়! খবরের কাগজের সাথে তো আমাদের আজকাল আর কারবার নেই, দুনিয়ায় কোন খবরই রাখি না। দিবেন দা' নাকি এবার ডার্ব্বির লটারি জিতে সাত লাখ টাকা পেয়েছেন! অত টাকা হাতে পেলে দিবেন দা'র মত খেয়ালী মানুষ যে ঘরে বসে থাক্‌বেন না, সে তো জানা কথা। বিলেত যাবার বন্দোবস্ত সব ঠিকঠাক করে ফেলেছেন। কিন্তু রায় বংশের ছেলে কিনা, মনটাও উঁচু, দিল্‌টাও সাচ্চা, তাই দীপেনের হাতে নাকি এক লাখ টাকা রেখে যাচ্ছেন, সে টাকাটা খরচ কর্‌তে হবে শুধু এই পদ্মরাগ খুঁজে বের করবার কাজে।"

হুকা-কাশি মন দিয়া কথাগুলি শুনিলেন, তারপর কহিলেন, "দীপেন বাবু কবে আস্‌ছেন?"

"ওদিক্‌কার ঝঞ্ঝাট্‌গুলো একটু মিট্‌লেই।"

"কত টাকা বল্‌লেন, এক লাখ না?" বলিয়া হুকা-কাশি মনে মনে কি যেন একটু হিসাব করিয়া লইলেন, শেষে কহিলেন, "তা ভালই হবে। আপনার তো দেখ্‌ছি এদিকে কাপড়-চোপড় পরা তৈরী, চলুন, হোটেলের এ কদর্য্য চা-রুটী গুলো ফেলে সোলোমন সাহেবের রেষ্টুরেণ্টে যাওয়া যাক্। সাহেবের ওখানকার খাবারগুলি বাস্তবিকই খুব বেশী রকমের

ভাল। ও দামে ওরকম জিনিষ যে কি করে দেয় তাই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি। সচরাচর সাহেবী দোকান মাত্রেই দাম দুনো বেশী, এখানে দেখ্‌ছি ঠিক তার উল্টো।''

''বুঝ্‌ছেন না, পাকা ব্যবসাদারের জাত, কি করে খদ্দের জুটোতে হয় সে কি আর ও জান্‌বে না জান্‌বো আমি?''

রেষ্টুরেণ্টে দু'জনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে বেশ একটু উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। সোলোমন সাহেব এক খানা খবরের কাগজের বিশেষ সংখ্যা সবাইকে জোরে জোরে পড়িয়া শুনাইতেছে আর ব্যাগ্র ঔৎসুক্যের সঙ্গে হাঁ করিয়া সকলে তাই শুনিতেছে!

ব্যাপারটা রণজিতদেরও শীঘ্রই বোধগম্য হইল। এলাহাবাদ সহরের সুপ্রসিদ্ধ পার্শী মণিকার ও রত্ন-ব্যবসায়ী ফসলভাই আসল ভাই হঠাৎ কাল রাত্রে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন। রাত্রি দশটার সময় চাকর তাঁকে তাঁর নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইতে দেখিয়াছিল, কিন্তু রাত্ত বারোটায় বারান্দা দিয়া যাইবার সময় লক্ষ্য করে ঘর তাঁর খোলা, তিনি বিছানায় নাই। তখনই হৈ-চৈ করিয়া খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হয়, পুলিশেও খবর যায়, কিন্তু তাঁকে আর সেই হইতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। (ক্রমশঃ)

---

## আয়, চাঁদ আয়

(শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার)

স্নেহভরে ডাকে ধরা আয়, চাঁদ আয়।
ছিলে তুমি লেপ্টে বুকে গা মিলিয়ে গায়;
এখন যে গো বহু দূরে, আমায় বেড়ে বেড়াও ঘুরে;
তোমার করুণ কিরণ মেখে, উজল করি কায়।
তোমায় খানিক দেখ্‌তে পেলে, আমার ঘরের শিশু ছেলে
হাত বাড়িয়ে মুঠার মাঝে পূরে নিতে চায়।
গূঢ় আকর্ষণের ফলে, জোয়ার জাগে সাগর-জলে;
দিশে-হারা উছল্ ধারা অধীর বেগে ধায়।
জ্ঞানীর বাণী,—তুলি কোলে, ফিরে এলে পড়্‌ব গোলে;
চূর্ণ হবে অঙ্গ নাকি, তবু ডাকি, আয়।

---

## খুকীর আবদার

(স্বর্গীয়া সুনন্দা ভৌমিক, রংপুর)

''মাগো, আমায় ছেড়ে দে' মা
আম তলাতে যাই;
দোল্‌নায় চ'ড়ে মজা ক'রে
দুল্‌তে দুল্‌তে গাই।
সেথায় আছে বেণু-রেণু
গাইছে তারা গান,
তাদের সাথে মিল্‌তে বড়
ছুট্‌ছে আমার প্রাণ।
পড়াশুনা মোটেই এখন
লাগ্‌ছে নাকো ভালো,
আখরগুলো ভাস্‌ছে চোখে
শুধুই কালো কালো।
অঙ্কগুলো লাগ্‌ছে ধাঁধা
ভুল্‌ছি যে বানান,
কাণে শুধু আস্‌ছে ভেসে
ওদের হাসি-গান।
আজকে আমায় ছুটী দে'মা
আম-বাগানে যাই,
সেথায় গিয়ে মনের সুখে
দুল্‌তে দুল্‌তে গাই।

## পূর্ণিমা

### দৃশ্য-কাব্য

( শ্রীমদনকুমার চট্টোপাধ্যায়, বোয়ালমারি, ফরিদপুর। )

স্থান—বর্ষার শেষে শরতের প্রারম্ভে পূর্ণিমার আকাশ

[ দুইটী ভাইবোন, ভাইয়ের নাম—নীরদ আর বোনের নাম—ইন্দু। দুইজনেই আকাশ-বুড়ির কোল-আলো-করা ধন। ভাইটী প্রায়ই বিদেশে থাকে, মাঝে মাঝে তার মা ও বোনের সহিত দেখা করিতে আসে। সে বড় দুরন্ত। গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মের প্রখর তাপে তাপিত হইয়া তার বন্ধু অনিল ও ক্ষণপ্রভার সহিত কেবল এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, তাহাতে পৃথিবীর লোকের পৃথিবীতে টেঁকা দায় হইয়া উঠে। আর বর্ষার পূর্ব্বে সে বড় বড় সাগর, নদী প্রভৃতি হইতে জল আমদানী করিয়া রাখে—বর্ষার সময় ঐ সব জল পৃথিবীতে রপ্তানি করে। পৃথিবীর লোকের ইহাতে বিশেষ উপকার হয়।

ইন্দু খুব শান্ত, সে দিনের বেলায় বিশ্রাম করে, আর রাত্রি বেলায় তার সখি তারকা-গণকে সঙ্গে করিয়া মার কাছে বসিয়া হাসিতামাসা করে। তাদের হাসি তামাসা দেখিবার জন্য পৃথিবীর লোক উৎসুক-নেত্রে তাদের পানে তাকাইয়া থাকে।

মাঝে মাঝে তাদের দুই ভাইবোনের খুব আড়ি বাধে। এই আড়াআড়ি দেখিতে খুবই মধুর হয়। ]

ইন্দু—হ্যাঁ নীরুদা! একটু সর। আমাদের এমন সুন্দর গল্পগুলি তুমি নষ্ট করে দিচ্ছ। আঃ! আমার সখিদের তাড়িয়ে দিলে? কর্‌লে কি? আমি এখন কার সাথে গল্প করে রাত্রি কাটাব? কী—ঈ মুশ্‌কিল! সর না। দেখ্‌ছ না আমার সখিরা মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে রয়েছে?

নীরদ—বাঃ! আমার বিদেশে যাওয়ার সময় হ'য়ে এল, তা' দু'দিন যে আমার ইচ্ছামত একটু ঘুরে বেড়াব তার যো—ও টী যেন নেই! যা না, তোরা এখন ঘুমগে, আমি আমার ইচ্ছেমত একটু বেড়িয়ে বেড়াই। আমি বাড়ী থেকে বিদেশে গেলে তোরা মনের সুখে গল্প করিস, কেউ বাধা দেবে না।

ইন্দু—না। আমাদের আজ উৎসবের দিন, আমরা চুপ করে ঘুমিয়ে থাক্‌তে পারব না। তুমি সর, সর বল্‌ছি! নাঃ, ভা—রী ঈ জ্বালাতন কত্তে পার ত? চেয়ে দেখ পৃথিবীর সকলে আমাদের এই উৎসব দেখবার জন্য এক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।



নীরদ—উঁহু! সেটী হচ্ছে না। আজ আমি কিছুতেই সর্‌ব না এ—ক মিনিটের জন্যও সর্‌ব না। তুই যা, বেশী কথা বল্‌বি ত, জল ছিটিয়ে তোর সমস্ত গা ভিজিয়ে দোব। কি, এখন পালালি যে? আর আস্‌বি?

ইন্দু—দোহাই নীরুদা, তোমার পায়ে ধরি, তুমি এখন সরে যাও, দিনের বেলায় অরুণ-রথে চড়ে মনের সুখে বেড়িও। আমরা তখন তোমায় সর্‌তে খোসামোদ করতে যাব না।

নীরদ—ইস্! আমি যেন ওর হুকুম মেনে চলব? কেন রে? তোরাই না হয় আর একদিন এসে গল্প করিস!

ইন্দু—দেখ নীরুদা, আমি শুধু রেতের বেলায় মার কাছে আসতে পারি, আর তুমি যখন তখন পার। তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের সখের গল্পগুলি নষ্ট করে দিও না।

নীরদ—ন্যাকামো রেখে এখন সর, না হলে দিলেম ভিজিয়ে।

[ ভাইয়ের কথায় ভীতা হইয়া ইন্দু, মুখ মলিন করিয়া তার সখিদের সঙ্গে অন্য দিকে চলিয়া গেল। এই সুযোগে নীরু তাহার বিদেশ থেকে আনা-জল পৃথিবীতে ঢালিতে সুরু করিয়া দিল। ইহাতে পৃথিবীর লোক তার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাকে দোষারোপ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে নীরুর সমস্ত জল ফুরাইয়া গেলে ইন্দু তাহার সখিদের ডাকিয়া আনিয়া হল্লা করিয়া হাসাহাসি আরম্ভ করিয়া দিল। নীরদ আর কোন উপায় না দেখিয়া তাদের কাছে বসিয়া বসিয়া মজার মজার গল্প শুনিয়া রাত্রি কাটাইল। বুড়ো মা তার দুষ্ট ছেলের কাণ্ড দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাদের কাছে গিয়া তাহাদের সঙ্গে গল্পে মাতিয়া গেলেন।

তখন সেখানে এক অপরূপ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল।

---

## প্রাচীন-ভারত

( শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী, অমরদহ-কাব্যকুঞ্জ। )

প্রাচীন ভারত, প্রাচীন ভারত, তোমারে করিহে নমস্কার,
অমরার চির-শান্তি তোমাতে, দাও মোরে আজ আশিস্‌ভার!
উঠেছিলে যবে জগতের মাঝে উচ্চে তুলিয়া আপন শির,
জ্ঞানে-গৌরবে কি যে ছিলে তাহা, বুঝিয়া করিতে পারি না স্থির।

উঠেছিল তব বক্ষেরই'পরে বেদের মধুর মন্ত্র-গান,
সে গান শুনিয়া বিস্ময়ে সবে করেছিল তোমা অর্ঘ্যদান।
তোমারি মাঝারে উঠেছিল সেই জীমূতমন্দ্রে সামের নাদ,
সে নাদ শুনিতে এসেছিল সবে, অমরারও কেউ যায়নি বাদ।
বীর্য্যে শৌর্য্যে সবার শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানেতে তোমার তুলনা নাই,
ক্ষমতা কি মোর গাথায় গাঁথিয়া তব গৌরব স্থরেতে গাই!
একদিন তব আর্য্যঋষির কথায় কাঁপিত দেবতাগণ,
ছুটিয়া আসিত পদরজঃ তরে বিনিময়ে দিতে সকল ধন।
সেদিন তোমার প্রতি তপোবন হোম-সৌরভে স্থরভিময়,
জ্বলিছে বিরাট যাগ-হুতাশন ইন্দ্রের প্রাণে জাগায়ে ভয়।
বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্র, কত ছিল তারা প্রতিভাবান্,
বাল্মীকি ঋষি রচিল রামের মধু রামায়ণ অমর গান।
আশা ছিল তব পরাণ মাঝারে করিতে এ সারা বিশ্বজয়,
তাইত করিলে সখ্য-স্থাপন স্বর্গের সনে, মিথ্যা নয়।
হে ভারত, মোর প্রাচীন ভারত! তব পদে করি নমস্কার,
অধম এ তব সন্তানে তুমি বরিষ অমর আশিস্‌ভার!

—:*:—

**চিত্র-পরিচয়** ঃ—মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লইয়া বাহির হইলেন। কলেজের বড় বড় অধ্যাপকেরা নানা বিষয়ে তাঁহাকে প্রশংসা-পত্র দিলেন। এ রকম সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ ছাত্র পাওয়া তাঁহাদের ভাগ্যে বড় বিশেষ ঘটে নাই। 'উপাধি-দান' উৎসবের একখানা রঙ্গীন ছবি এ মাসে দেওয়া হইল।

---

## মাছ হইতে মানুষ।

এবারকার 'মানুষের কাছাকাছি জীব' নামক প্রবন্ধে তোমরা পড়িয়াছ যে বিশ্ব-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডার্-উইন সাহেবের মতে বানর হইতেই আস্তে আস্তে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে। ডার্-উইন্ শুধু এইটুকুই বলেন নাই, বলিয়াছেন—খুব নীচু-স্তরের জীবেরা আস্তে আস্তে উঁচুস্তরের জীব, শেষে বানর, এবং সর্ব্বশেষে মানুষে আসিয়া পৌঁছিতেছে। ছবিতে দেখ ডার-উইনের দলের এক বৈজ্ঞানিক মূর্ত্তি গড়িয়া দেখাইতেছেন, মাছের চেহারা কেমন করিয়া একটু একটু বদ্‌লাইয়া শেষে সভ্য মানুষ হইয়া যাইতেছে।

## পৃথিবীর সব চেয়ে বড় লোক।

সম্প্রতি বিলাতের "নিউ লিডার" নামে একখানা বিখ্যাত খবরের কাগজ পৃথিবীর মধ্যে আজকাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কে এই বিষয়ে ভোট লইয়াছেন। ভোটের ফল কেমন দাঁড়াইয়াছে শুনিবে? সব চেয়ে বেশী ভোট পাইয়াছেন আয়ারল্যাণ্ডের বিখ্যাত সাহিত্যিক বার্ণার্ড্ শ

দ্বিতীয়—আমাদের মহাত্মা গান্ধী। তৃতীয়—প্রসিদ্ধ জার্ম্মান-বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন। চতুর্থ—প্রফেসার সিগ্ ম্যাণ্ড। পঞ্চম— বিখ্যাত বায়স্কোপের অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন।

কোন কোন তালিকায় রবীন্দ্রনাথের নামও ছিল।

## গ্র্যাফ্ জেপেলিন

আজকালকার এই এরোপ্লেনের যুগে জার্ম্মানরা তাদের আবিষ্কৃত জেপেলিনকে নীচে পড়িয়া থাকিতে দিবে না। তাই, অল্প কয়েক দিন আগে একখানা প্রকাণ্ড জার্ম্মান জেপেলিন (একখানা এরোপ্লেনের চাইতে ঢের ঢের বড়) উনিশ জন যাত্রী লইয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে চক্র দিয়া দেশে ফিরিয়াছে। পৃথিবীতে এই নিয়া খুব হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। ছবিতে এই বিরাট্ জেপেলিনের চেহারাটা দেখ।

জার্ম্মানির বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কাউন্ট্ জেপেলিন প্রথম জেপেলিন আবিষ্কার করেন—তাঁরই নাম লইয়া সে জিনিষটা আজকাল আকাশে উড়িতেছে। জার্ম্মাণ জাতির ইচ্ছা পৃথিবীতে এ জিনিষটার খুব চলন হয়। এয়ারোপ্লেনের সাথে এর তফাৎ অনেক—এ অনেকটা বেলুন জাতীয় জিনিষ—অবশ্য নিরাপদ বেলুন।

## বৃটীশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী

লণ্ডনের বৃটীশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীর নাম বোধ হয় তোমরা অনেকেই শুনিয়াছ। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লাইব্রেরীগুলির মধ্যে এটি একটি। এই লাইব্রেরীতে প্রায় চল্লিশ লক্ষ বই আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আজ পর্য্যন্ত সেখানে এক খানি বইও পোকায় কাটিয়া নষ্ট করে নাই। সেখানে লাইব্রেরী-ঘরে রাতদিন এক রকম উত্তাপ রাখিবার ব্যবস্থা আছে, তারই ফলে পোকার উপদ্রব নাই।



## সাঁতারুর বাহাদুরী।

মিঃ সফী আহমেদ নামে হায়দ্রাবাদের একটি যুবক সেদিন কলিকাতায় অদ্ভুত সাঁতারের কসরৎ দেখাইয়াছেন। ওয়েলেস্লি স্কোয়ারের দীঘিতে তিনি একাদিক্রমে সাতাশ ঘণ্টা ধরিয়া সাঁতার কাটিয়াছেন, একটুও বিশ্রাম করেন নাই। এতক্ষণ ধরিয়া সাঁতার কাটিতে তোমরা আর কাউকে শুনিয়াছ কি?

## রাস্তা ঝাঁট দিয়া লাখ টাকা উপার্জ্জন।

ঠাট্টা নয়, কথাটা সত্যি। ফ্রান্সের প্যারিস্ নগর ইহা বুঝিয়াছে; তাই সেখানে রোজ রাস্তা ঝাঁট দিয়া যে আবর্জ্জনা পাওয়া যায় সেগুলিকে নষ্ট না করিয়া কলে পোড়ান হয়। উহা হইতে তৈরী হয় বাষ্প, এবং তাহার সাহায্যে বিদ্যুৎ—সহরের অনেক খানি আলোই এই বিদ্যুৎ হইতে পাওয়া যায়। আর যা বাকী থাকে তাহা হইতে হয় ইট। এমনি করিয়া ধূলা ঝাঁটাইয়া সত্যি সত্যিই সেখানে আজকাল লাখে লাখে টাকা উঠিয়া যায়।

## অধ্যাপক রমণের সম্মান

আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্সের অধ্যাপক স্যার সি, ভি, রমণের নাম তোমরা অনেকেই শুনিয়া থাকিবে। স্যার রমণের বাড়ী মান্দ্রাজে। কয়েক বছর হইল তিনি বিলাতের পণ্ডিত মহলে বড় বৈজ্ঞানিক বলিয়া খুব নাম করিতেছেন। সেদিন ইটালি হইতে তাঁহাকে "ম্যাটিউচি" নামে এক পদক দেওয়া হইয়াছে। এই পদক বড় সম্মানের। স্যার রমণ ছাড়া এসিয়ার আর কোন বৈজ্ঞানিক এটা পান নাই। যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁরা সকলেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের দলভুক্ত। তাঁদের কয়েক জনের নাম শুনিবে?—এডিসন, লর্ড কেলভিন্, রণ্ট্জেন, র্যামজে, কুরি, আইন্ষ্টাইন্ প্রভৃতি।

---

# কষ্টি-পাথর *

## কালি কে ঢালিল ?

গ্রীষ্মের বিকাল, হেলষ্টন্‌লি সহরের গীর্জ্জা হইতে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টার মধুর আওয়াজ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে।

মামলা-মোকদ্দমার বিচারের জন্য কয়েকজন জজ সহরে আসিয়াছেন, ছোট্ট সহরটী তাই মুখর হইয়া উঠিয়াছে। আজ বিকালে গীর্জ্জায় আবার তাঁদের প্রার্থনা করিতে আসিবার কথা, সেই উপলক্ষে সেখানেও বেশ যেন একটু উৎসবের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং ঘণ্টাধ্বনিও সেই জন্যই।

উপাসনায় আজ যিনি আচার্য্যের আসনে বসিবেন, তাঁর নাম রেভারেণ্ড্ জন্ পাই। তিনি শুধু পাদ্রীই নন, গীর্জ্জার তত্ত্বাবধানে যে একটা কলেজিয়েট স্কুল আছে তার হেড্‌মাষ্টারও তিনিই। তাঁর সামনের আসনটীতে আর একটী যুবা-বয়সী পাদ্রী বসিয়া ছিলেন—নাম রেভারেণ্ড্ উইলিয়ম্ ইয়র্ক। ইনি সবে একাজে ঢুকিয়াছেন।

উপাসনা আরম্ভ হইয়া সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে সমাধা হইয়া গেল, শেষে আসিল সঙ্গীতের পালা। স্কুলের দশটী বাছা বাছা সুকণ্ঠ ছেলে গান গাহিবে। গানের প্রথম পদটী গাওয়া হইতে-না-হইতেই কিন্তু মিষ্টার পাই চম্‌কিয়া মাথা উঠাইয়া চাহিলেন—এ কার গলার স্বর আসিতেছে? চাহিয়া দেখেন, গানের দলের ছেলেদের মধ্যে বাইওয়াটার নামে যে ছাত্রটীর থাকিবার কথা সে নাই, তার জায়গায় গাহিতেছে হার্ষ্ট্ বলিয়া আর একটী ছেলে। সে কি! বাইওয়াটার গেল কোথায়?

কিন্তু ঠিক সেই সময় সাম্‌নের দিকে চোখ পড়ায় হেড্‌মাষ্টার মশায় যা দেখিলেন তা যেন তিনি বিশ্বাসই করিয়া উঠিতে পারিলেন না—সামনেই শ্রোতাদের বেঞ্চিতে বসিয়া তাঁর ছাত্র ষ্টিফেন বাইওয়াটার। শুধু তাই নয়, গীর্জ্জার

* বিখ্যাত ইংরেজ মহিলা-ঔপন্যাসিক মিসেস হেন্‌রি উডের 'দি চ্যানিংস্' নামক বইখানার সারাংশের মর্ম্মানুবাদ।



ভিতর উপাসনা-সম্বন্ধীয় কোন কাজ কর্ম্ম করিতে হইলে সারপ্লিস্ নামে যে ঢল্ ঢলে রকমের পোষাকটা পরিয়া লইতে হয়, বাইওয়াটারের গায়ে সেটা পর্য্যন্ত নাই। হেড্‌মাষ্টারের আদেশ অমান্য করিয়াএ যে তার দারুণ অপরাধ—এতখানি সাহস তার হইল কিসে? মিষ্টার পাই বিস্মিত হইয়া গেলেন।

উপাসনা শেষ হইলে যে যার ঘরে ফিরিয়া গেল, মিষ্টার পাই তখন চলিলেন পোষাক-কামরার দিকে। যে কয়টী ছেলে গান গাহিতেছিল তারা, ও গীর্জ্জার কয়েক জন কর্ম্মচারীও সেদিকে উঠিয়া আসিল। হেড্‌মাষ্টারের মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিয়া লইতে কারোই কষ্ট হইল না যে ব্যাপারটা বোধ হয় একটু গুরুতরই হইয়া দাঁড়াইবে। ক্রুদ্ধস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাইওয়াটার, তুমি আজ যা করেছ সে সম্বন্ধে তোমার কিছু বল্‌বার আছে?"

"আজ্ঞে, আমার সারপ্লিস্ ছিল না, তাই গানের দলে গিয়ে জুট্‌তে পারিনি। ইস্কুলে নোটিস্ দেওয়া হয়েছিল, আমাদের সবাইকে আজ পরিষ্কার সারপ্লিস্ পরে আস্‌তে হবে। তাই ভোরে এসে আমি আমার ধোপাবাড়ীর সাফ্ সারপ্লিস্‌টা এখানে রেখে গেছ্‌লাম—বিকেলে এসে দেখি সেটা নেই।"

"নেই? তবে বোধ হয় হাওয়া হয়েই সেটা উড়ে গেল!"

"আজ্ঞে আপনি জিজ্ঞেসা করুন এদের সবাইকে! সকলে যখন গান গাইতে গেল, তখনও আমি শুধু সেটাই খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

হেড্ মাষ্টার ফিরিয়া হার্ষ্টের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "আর তোমাকেও বলি, হার্ষ্ট, তুমি জান আগেকার মত গলা আর তোমার নেই, তুমি বাপু কেন জজেদের সাম্‌নে গাইতে গেলে?"

"আজ্ঞে, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমি ভাব্‌ছিলাম, এই বুঝি বাইওয়াটার ফিরে এল। তার পর সে যখন আর এলই না, তখন আর কোন উপায় দেখলাম না। ছেলে-ছোকরা কাউকে বসিয়ে দিলে সে সব ভণ্ডুল করে ফেল্‌তো। তাই ভাব্‌লাম, ভণ্ডুল করে ফেলার চাইতে জজেদের ভাঙ্গা গলার গান, শোনান বরং ভাল।"

কথাটা ঠিক, তাই মিষ্টার পাই চুপ করিয়া রহিলেন। হার্ষ্ট একটু থামিয়া আবার কহিল, "স্তার!"

"কেন?"

"আর একটা কথা। এই মাত্র বাইওয়াটার আমাদের জানিয়েছে যে তার সারপ্লিস্ খুঁজে পাওয়া গেছে। কিন্তু সত্যি বল্‌ছি স্তার, এ বিষয়ের ঘুণাক্ষরেও আমরা কেউ কিছু জান্‌তাম না।"

কথাটা শুনিয়া হেড্‌মাষ্টার চকিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "ওঃ, বটে নাকি? এতক্ষণ বুঝি সেটা লুকিয়েছিল আর যেই গানের পালা শেষ হয়েছে, অম্‌নি সে এসে ধরা দিয়েছে, না?"

জবাব দিল, বাইওয়াটার, কহিল, "খুঁজে বের করেছি স্তার, পর্দ্দার ওপাশে—যেখানে কেউ কখনো যায় না—সেখানে ওটা পড়েছিল, নিয়ে এসেছি, ঐ দেখুন!" বলিয়া আঙুল দিয়া সে পোষাক-ঘরের একটা কোণ্ দেখাইয়া দিল। মিষ্টার পাই, মিষ্টার ইয়র্ক প্রভৃতি যাঁরা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, অবাক্ হইয়া দেখিলেন একটা আন্‌কোরা ধোপাবাড়ীর সারপ্লিস্ তালগোল-পাকান অবস্থায় সেখানে পড়িয়া—কে যেন তার উপর এক বোতল কালি ঢালিয়া রাখিয়াছে।

রাগত, অথচ গম্ভীর মুখে হেড্‌মাষ্টার প্রত্যেকটী ছেলের মুখের দিকে তাকাইলেন, কিন্তু দেখিলেন সবারই মুখে সরলতা মাখান। তখন এটী তিনি বুঝিলেন যে অন্ততঃ একয়টী ছেলে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বেশ বুঝিলেন যে তাঁর স্কুলের ছাত্র ছাড়া অপর কোন লোক এ কাজ করিতে আসে নাই। এদিকে ছাত্রেরা বড় একটা আসে না, কিন্তু আজ কাল গোটা গীর্জ্জাটাই মেরামৎ হইতেছে, মিস্ত্রিদের যাওয়া-আসার সুবিধার জন্য দরজা সর্ব্বদাই খোলা থাকে, ইচ্ছা করিলেই যে কোন ছাত্র যখন খুসি আসিতে পারে। মিষ্টার পাই তাই আর কোন কথা-বার্ত্তা না বলিয়া সোজা স্কুলের দিকে চলিলেন, পেছন পেছন ছেলেরাও চলিল।

গীর্জ্জা ছাড়াইয়া একটু গেলেই স্কুল—একই কম্‌পাউণ্ডের ভিতর। স্কুলটী



ইংলণ্ডেশ্বরের পরোয়ানায় স্থাপিত। মাত্র চল্লিশটী ছাত্র সেখানে পড়িতে পায়, তার বেশী ছাত্র ভর্ত্তি করা বারণ।

ছেলেরা তখন স্কুলে দল বাঁধিয়া মহা হৈ চৈ করিতেছিল, হঠাৎ এই অসময়ে হেড্‌মাষ্টারকে দেখিয়া সকলে একেবারে চুপ হইয়া গেল। মিষ্টার পাই ইসারায় সকলকে কাছে আসিতে বলিলেন, তার পর গণ্ট্ নামে একটী ছেলেকে ডাকিয়া কহিলেন, "গণ্ট্, আজ ভোরে বাইওয়াটার গীর্জ্জার পোষাকঘরে তার সারপ্লিস্‌টা রেখে গিয়েছিল, কে যেন তার ওপর এক বোতল কালি ঢেলে রেখেছে। কে রেখেছে বল্‌তে পার?"

এতগুলি ছেলের মধ্যে গণ্ট্‌কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করার কারণ এই যে সে ছিল স্কুলের সর্দ্দার পোড়ো—'সিনিয়ার'। অন্যান্য ছাত্রের উপর তার অনেক খানি ক্ষমতা। স্কুলে গণ্ট্ ছাড়া আরও তিন তিন জন 'সিনিয়র' ছিল—তাদের নাম টম্ চ্যানিং, হ্যারি হাণ্ট্‌লি, এবং জেরাল্ড্ ইয়র্ক্। তবে তারা গণ্টের নীচে, ক্ষমতাও গণ্টের চাইতে তাদের অনেক খানি কম।

হেড্‌মাষ্টারের প্রশ্নের জবাবে গণ্ট্ জানাইল যে এ বিষয়ে সে কিছুই জানে না। মিষ্টার পাই তখন আর সবার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "তোমরা কেউ এ বিষয়ে কিছু জান?"

অনেকগুলি কণ্ঠ এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "না স্তার!"

তিনি আবার বলিলেন, "তোমরা যে কেউ ইচ্ছে করে সারপ্লিসের মত একটা পবিত্র জিনিষ কালি ঢেলে নষ্ট কর্‌বে না, তা আমি জানি। আমার বিশ্বাস দৈবাৎ কেউ কাজটা করে ফেলেছ, তারপর ভয়ে এখন আর স্বীকার কর্‌ছ না। কে করেছ বল, ভয় নেই আমি তাকে কিচ্ছু বল্‌বো না—শুধু সে বাইওয়াটারকে একটা নতুন সারপ্লিস্ কিনে দেবে—এই মাত্র।"

এ কথায়ও কিন্তু কোন ফল হইল না।

হেড্‌মাষ্টার এবার চটিলেন, বলিলেন, "আমার এ কথার পরেও যখন কেউ নিজের দোষ স্বীকার কর্‌ছ না, তখন আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, একাজ যে করেছে

সে ইচ্ছে করেই করেছে—হঠাৎ নয়। যদি একবারটী আমি তার নাগাল পাই তবে সে মজাটী টের পাবে।” তার পর তিনি ‘সিনিয়র’দের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, “আশা করি, অপরাধীকে খুঁজে বের কর্‌তে তোমরা আমায় সাহায্য কর্‌বে।”

হেড্ মাষ্টার চলিয়া যাইতেই সেখানে তুমুল হৈ চৈ আরম্ভ হইল। কে এ কাজ করিল! বাইওয়াটারের নিজের হাব-ভাবে গণ্ট্ একটু আশ্চর্য্য হইয়া তাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হে, কে করেছে কিছু জান্‌তে পেরেছ নাকি?”

“প্রায় বারো আনাই জান্‌তে পেরেছি—বাকী সবে চার আনা। ইস্কুলে দু’টী মাত্র ছেলে আছে যারা আমার ক্ষতি কর্‌তে পারলেই নিজেদের মস্ত লাভ হোলো মনে কর্‌বে। আগে আমায় পূরোপূরি নিশ্চিন্ত হতে দাও, তার পর তার নাম কর্‌বো—ছেড়ে দেবার পাত্তর আমি মোটেই নই, সে তো জানই। এখান থেকে গীর্জ্জা পর্য্যন্ত একটা লোক যাবে, কাজটা সেরে আবার ফিরে আস্‌বে, অথচ কেউ তা লক্ষ্য কর্‌বে না, সে কি কখনো হতে পারে?”

বছর বারো বয়সের একটী সুন্দর ছেলে দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল; চেহারাটা তার বড়ই কচি কচি, স্কুলের ছেলেরা তাই তাকে ‘মিস্ চার্লি’ বলিয়া ডাকিত। সে কহিল, “আমি কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখেছি—” বলিয়াই কি ভাবিয়া হঠাৎ সে একদম্ থামিয়া গেল।

গণ্ট্ তাকে জিজ্ঞাসা করিল, “চার্লি চ্যানিং, তুমি জান কে এ কাজ করেছে?”

বালকটী নির্ভয়ে উত্তর দিল, “যদি জান্‌তাম ও, তা হলেও বল্‌তাম না।”

তার দাদা টম্ চ্যানিং স্কুলের একজন ‘সিনিয়র’, সে ধমক্ দিয়া বলিল, “তুমি জান কি না তাই বল!” কিন্তু বাধা দিল জেরাল্ড্ ইয়র্ক্, কহিল, “তোমরাও যেমন, ও হোলো ‘মিস্’ ও আবার যাবে জান্‌তে! আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে গীর্জ্জার কোন লোক এ কাজ করেছে, ইস্কুলের কেউ নয়।”

বাইওয়াটার জবাব দিল, “না গো না, গীর্জ্জার লোক নয়! সে যাক্, মিস্ চার্লিকে তোমাদের আর কিছু জিজ্ঞাসা-বাদ কর্‌তে হবে না—বেচারা হয়তো শেষটায় তার হাতে মার খেয়েই মরবে। কারুর কোন সাহায্যই আমি চাইনে, নিজেই বের করে ফেল্‌বো, এ কার কাজ!”

ছেলের দল তখন একে একে স্কুল হইতে বাহির হইয়া পড়িল, বাকী রহিল শুধু চার্লি চ্যানিং। সকলে চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া তার দাদা টম্ তার কাছে



আসিয়া চুপে চুপে কহিল, “চার্লি, তুমি এ স্কুলের ছাত্রদের নিয়ম জানো তো, কারো কথা মাষ্টারদের কাছে গিয়ে লাগানি বারণ। তা যদি কর, তবে কিন্তু তোমায় গুঁড়ো করে ফেল্‌বে। আমাদের ‘সিনিয়র’ কয়জনের কথা অবশ্য আলাদা, আমাদের কাণে কোন কথা এলে তা কর্ত্তব্যের অনুরোধে হেড্ মাষ্টারকে জানাতেই হবে। খবর্দ্দার, আমার কাছে যেন ভুলে নামটা বলে ফেল না—তখন কিন্তু ভাই বলে আর খাতির করা চল্‌বে না।”

“তুমিও যেমন টম্, আমি যেন কচি খোকাটী, আজই নতুন ইস্কুলে ভর্ত্তি হ’লাম—ছেলেদের ভেতরকার নিয়ম-টিয়ম কিছুই জানি না! আর তা ছাড়া অপরাধী যে কে, বাস্তবিকই তা আমার জানা নেই। শুধু একজনের ওপর আমার সন্দেহ হচ্ছে। তা, ‘সন্দেহ করা’ আর ‘জানা’ তো এক কথা নয়!”

“ব্যস্, আমি আর কিচ্ছু শুন্‌তে চাইনে,” বলিয়া টম্ এক দৌড়ে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

চার্লি তখন সেখানে বসিয়া পড়িয়া নিজের মনেই অনেক কথা ভাবিতে লাগিল। যে ব্যাপারটা সে আজ দেখিয়াছে সেটা না দেখিলেই মনে মনে সে ঢের বেশী খুসী হইত—স্কুলের একজন ‘সিনিয়রকে’ সবার আড়ালে চুপি চুপি গীর্জ্জার কাছে গিয়া একটা কালির বোতল সে ছুড়িতে দেখিয়াছে! নিজকে সে এই বলিয়া বুঝাইল যে হয় তো এর সাথে বাইওয়াটারের সার-প্লিসের কোনই সম্পর্ক নাই। বোতলটাকে আর একবার ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সে গীর্জ্জার কাছে গিয়া একটা দেয়ালের উপর দাঁড়াইল। হঠাৎ পেছন হইতে কে বলিয়া উঠিল, “চার্লি, কি দেখা হচ্ছে ওখানে শুনি?” চার্লি ফিরিয়া দেখিল, জেরাল্ড্ ইয়র্ক্, কহিল, “যা দেখ্‌তে এসেছি তা আর দেখ্‌তে পাচ্ছি কই?”

“ওঃ, তবে তুমিই বুঝি সারপ্লিসে কালি ঢেলেছ?”

“কেন জেরাল্ড্ ইয়র্ক্, তুমি নিজেই বেশ ভালমতে জান যে সে কাজ যদি কেউ করে থাকে তো সে তুমি, আমি নই!

“কী, মিথ্যেবাদী, এত স্পর্দ্ধা তোমার,” বলিয়া জেরাল্ড্ ইয়র্ক্ চার্লিকে ধরিয়া এমনই এক ঝাঁকুনি দিল, যে চার্লির শরীর ভাঙ্গিয়া যাইবার জো হইল। সে কহিল, “মিথ্যে কথা যে এ নয়, তা তুমি বেশ জান। তবে তোমার এমন মারমুখী হবার কোনই দরকার নেই, আমি সত্যি বল্‌ছি একথা কারুকে বল্‌বোনা। কখনো কখনো মুখ দিয়ে আমার হঠাৎ কথা বেরিয়ে যায় বটে—কিন্তু যাতে না বেরোয় তাই কর্‌বো।”

"দাঁড়াও, পরের নামে দোষ দেওয়া তোমার ঘুচোচ্ছি—আজ তোমার হাড় এক দিকে, মাংস এক দিকে করে ছাড়বো—" কিন্তু বলিতে বলিতে জেরাল্ড হঠাৎ থামিয়া গেল, দেখিল, অপর দিকের দরজা দিয়া পাদ্রী, ডাক্তার গার্ড নামে আসিতেছেন। সুযোগ বুঝিয়া চার্লিও পাদ্রী সাহেবকে একটা নমস্কার জানাইয়া বাড়ীর দিকে সোজা দৌড় দিল। *

( ক্রমশঃ )

## গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) নিস্তব্ধতা। (২)

(ক)

| | | |
|---|---|---|
| বা | ব | র |
| আ | ল | য় |
| প | রা | গ |
| অ | ঙ্গা | র |
| ধ | র | ণী |
| চ | র | ণ |
| নৃ | প | তি |
| পা | ল | ক |
| ক | ট | ক |

বালগঙ্গাধর তিলক

(খ)

| | | |
|---|---|---|
| র | জ | ত |
| আ | বী | র |
| শৈ | লে | ন্দ্র |
| সু | না | ম |
| থ | লি | য়া |
| কাঁ | ঠা | ল |
| বা | র্ত্তা | কু |
| গ | র | ল |

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## উত্তরদাতাদের নাম

### যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন :—

দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (চন্দন নগর), কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় (লাহোর), বয়েজ ওন্ লাইব্রেরীর সভ্যবৃন্দ (সাটীরপাড়া), নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ধুলগ্রাম), দ্বিজেন, সুরেন, গণেশ, হাসি, জ্ঞানেন্দ্র, অধীর, সুধা (আড়াই হাজার)।

### যাঁহারা দু'টী ধাঁধার ঠিক উত্তর দিয়াছেন :—

শিশিরকুমার রায় (বসির হাট), অজিতকুমার, মনোরমা, অনুপমা ঘোষ (চাঁপাই, নবাবগঞ্জ), কমলা বসু (আমতা), মাখনলাল অধিকারী (কিশোরগঞ্জ), বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় (বালী), বীরেন্দ্রলাল সেন (হুনহরা), অমূল্য, অজিত, নন্দ, নিতাই, ভূপেন, হীরেন (মধ্যবাংলা সারস্বত আশ্রম, জয়দেবপুর, ঢাকা), দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী (টাঙ্গাইল), অজয়, অনিল, অজিত, অমর, পারুল, প্রবাস (ভাগলপুর), বরেন্দ্রকুমার পাল (কটক), বিনয়েন্দ্র, অরুণ, সমর, নৃপেন্দ্র, বসন্ত, তারাপ্রসন্ন (রাঁচি), মদনকুমার চট্টোপাধ্যায় (বোয়ালমারী), সুধীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ (দিনাজপুর), হিমাংশুকুমার নিয়োগী (জলপাইগুড়ী), ভ্রাতৃসঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ (চাঁপাই-নবাবগঞ্জ)), লক্ষ্মীময়ী দেবী (সাঁওতা), বাণীকান্ত ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা), এণা, ঊষা, জ্যোৎস্না, বীণা, তরু, প্রতিভা, তটিনী (কুমিল্লা), বিদ্যুৎরাণী, অন্নপূর্ণা, উমারাণী (ছাপরা), গুণদাপ্রসাদ মুখার্জ্জী (দিল্লী), অরুণা দেবী ও তাহার বন্ধুরা (পাটনা), অমিয়া ঘোষ ও তাহার বন্ধুরা (বারাকপুর), নারায়ণদাস নন্দী (নবদ্বীপ), পরমেশ, অরুণা ও প্রীতীশ সরকার (কালিম্পং), সুধামাধব, কালী, অরুণ, কল্যাণ (জামালপুর), পীযূষকুমার সেন (হেনজাদা, বর্ম্মা), নরেন্দ্রকুমার দে (শ্রীহট্ট), নগেন্দ্রচন্দ্র বণিক ও তাহার বন্ধুগণ (কামালপুর), চতুর্থ শ্রেণীর বালকবৃন্দ (সরিষা স্কুল), উমাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), ভুবন, সদানন্দ সাহা (মেদিনীপুর), কল্যাণী দত্ত (সিমলা), রতনমণি ভট্টাচার্য্য, জ্যোৎস্না দেবী (লক্ষ্মীপুর) অপর্ণা ও তাহার বন্ধুগণ (ভোলা), তিলৈ পাঠ মন্দিরের সভ্যবৃন্দ, হরিদাস, সৌদামিনী, শ্রীবাস, অখিল, ক্ষিতীশ (কামালপুর), সুনীতি দেবী ও বনলতা দেবী (ভাগলপুর), বনলতা সেন (নোয়াখালী), যশোমাধব সাহিত্য সঙ্ঘের সভ্যগণ (ধামরাই)।

* গল্পটীর অনুবাদক অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য।



### যাঁহারা ১টি ধাঁধার ঠিক উত্তর দিয়াছেন :—

গুণেন্দ্রমোহন সিংহ (ভবানীপুর), মনোরমা দেবী (জলপাইগুড়ী), গিরীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী (রংপুর), মিস্ মাহ মুদা হোসেন (টাঙ্গাইল), আশালতা দেবী (দার্জ্জিলিং), স্নেহলতা দেবী (রংপুর), তোফাজ্জল হোসেন, বজলুলহক্, সতীশ, কিরণ, গুরুদাস, হবিবর (কামারজানী), বিনয়ভূষণ ও বিজয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য (রংপুর), অশোক, বিমল, প্রীতি, অমল, মা, সুব্রত, অরুণ, (কলিকাতা), পারিজাত-রেণু দেবী (মহিমাগঞ্জ)।

[উত্তর দাতাদের তালিকায় **কেবল মাত্র গ্রাহকদের নামই** প্রকাশিত করা হয়, কিন্তু অনেক গ্রাহক নিজের নামের সাথে বন্ধু-বান্ধবদের নামও জুড়িয়া দেন। সামান্য ২।১টির জন্য আমরা বিশেষ আপত্তি করি নাই, কিন্তু কেহ কেহ অনেকগুলি, এমন কি ১৫।২০টি নামও পাঠাইয়া দেন। বলা বাহুল্য প্রত্যেক গ্রাহকের সাথে অতগুলি করিয়া অতিরিক্ত নাম ছাপাইবার মত স্থান সঙ্কুলান করা আমাদের ছোট্ট কাগজের পক্ষে সম্ভব নয়। এবার হইতে গ্রাহকদের এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করিতেছি।]

## নূতন ধাঁধা

নীচে ব্রাকেটের মধ্যে যে কথাগুলি আছে তাহাদের জায়গায় ঠিকমত এক একটা অর্থ বসাইয়া লইতে পারিলেই লেখাটি পড়া যাইবে। তোমরা চেষ্টা করিয়া দেখ ত' :—

সেদিন হু(ছোট রাস্তা)তে যা বি( পায়ে ) ( পাঠ ) গিয়াছিল ভা( জলাশয়ে )ও ( একটি পছুবী ) ( একটি সম্বোধন )র ( লাল তরল পদার্থ ) ( মাটী )য়া যায়। ( সুমিষ্ট ফল ) রা ( রাশিতে ) ( কোন অস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ )ম ( পোষাক ) ( পাঞ্জাবের বীর রাজা ), তাই কো ( পাপীদের জায়গা )মে বাঁ( পানীয় দ্রব্য বিশেষ ) গেল। ( বাতাস ) ( আধ-চাঁদ ), ( রাত্রি স্বামী ), এ ( রাধা ) ত' স ( একটি সংখ্যা ) ( চাহিয়া ) সাহসী, ( নক্ষত্র ) ( এবং ) ( নিয়ম তুল্য ) শি ( নারায়ণ ) য়া উঠিয়াছিল।

## কবিতার সুপুরুষ

পুরুষের চেহারা কি রকমটী হইলে ভাল হয়, কবিরা তার বর্ণনা দিয়াছেন। ভুরু দুইটী হইবে জোড়া, চোখ দুইটী আকর্ণ বিস্তৃত, অর্থাৎ কাণ পর্য্যন্ত টানা, নাকটী খগরাজের মত, ঠোঁট দুইটী বন্ধুজীব ফুলের মত রাঙ্গা, ঘাড়টী ষাঁড়ের মত; বুকটী প্রকাণ্ড চওড়া, মাজাটী সিংহের মাজার মত ও হাত দুইটী আজানু-লম্বিত! এ সমস্ত মিলাইয়া আমরা একটা ছবি আঁকিলাম। দেখ তো আমাদের "সুপুরুষ"টী দেখিতে কেমন হইল!

—*—

**পূজার সংখ্যা রামধনু**—কার্ত্তিক মাসের রামধনু ১৫ই আশ্বিন তারিখে আমাদের অফিস হইতে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের কাছে পাঠান হইবে। গত বারের মত এবারও পূজার সংখ্যায় গল্পের ভাগই থাকিবে বেশী। আশ্বিন মাসের ধাঁধার উত্তর ১০ই আশ্বিনের মধ্যে অফিসে আসা চাই।

**শোক-সংবাদ**—রামধনু ছাপা শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় আমরা একটা নিদারুণ খবর পাইয়া মর্ম্মাহত হইলাম। বাংলা দেশের একটী ছাত্র, যতীন্দ্রনাথ দাস, লাহোর-জেলে গবর্ণমেণ্টের কাজের প্রতিবাদ করিয়া ৬৩ দিন ধরিয়া অনাহারে ছিলেন, তিনি আর ইহলোকে নাই। কি অসম্ভব মনের জোর! ভগবান্ তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন।

———•———

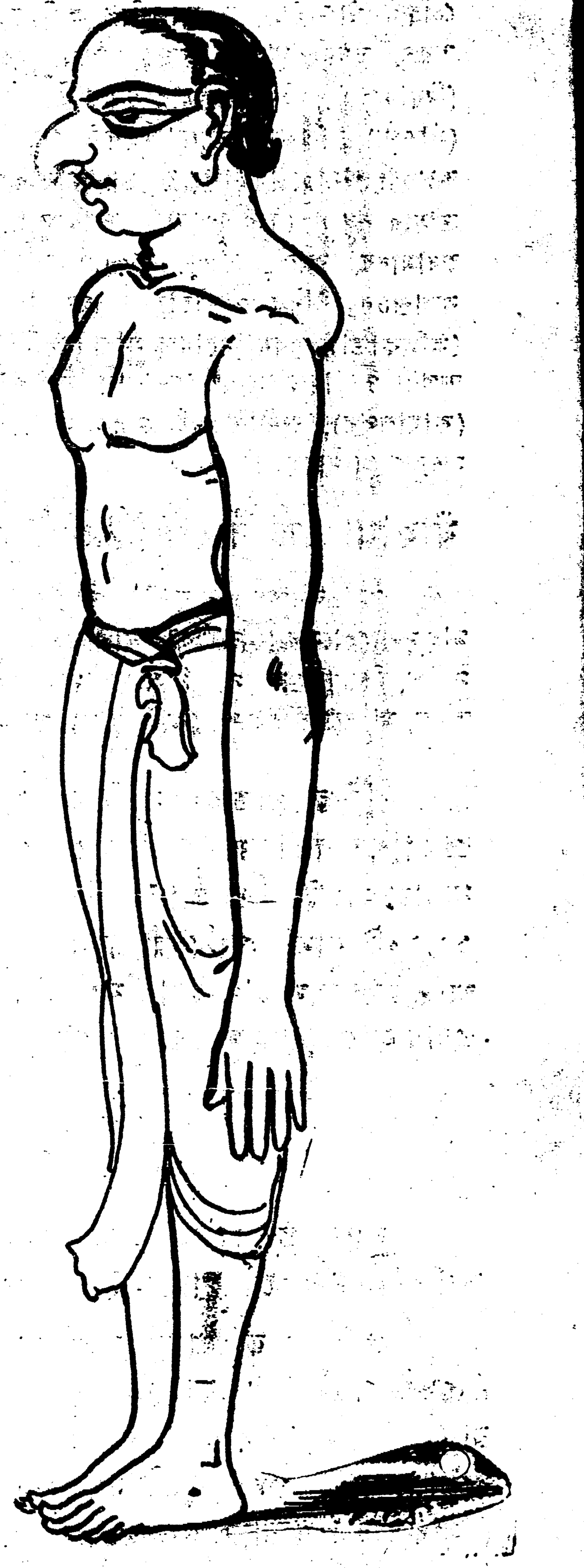

কবিতার 'সুপুরুষ'



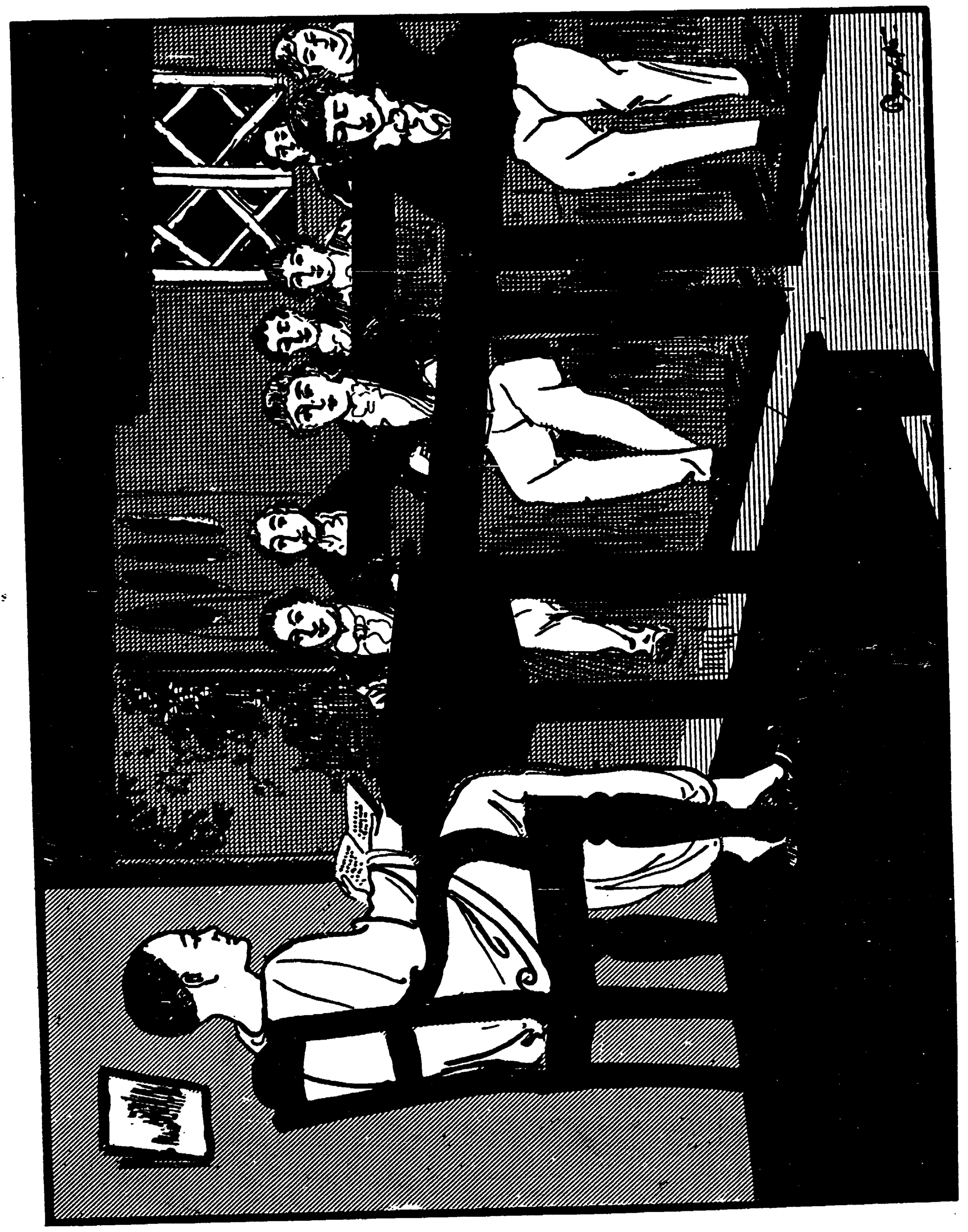

চিত্রে বিদ্যাসাগর জীবনী—৮

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে

শিল্পী—শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত ] [ চিত্র-পরিচয় দেখ

## কবিতার সুপুরুষ

পুরুষের চেহারা কি রকমটী হইলে ভাল হয়, কবিরা তার বর্ণনা দিয়াছেন। ভুরু দুইটী হইবে জোড়া, চোখ দুইটী আকর্ণ বিস্তৃত, অর্থাৎ কাণ পর্য্যন্ত টানা, নাকটী খগরাজের মত, ঠোঁট দুইটী বন্ধুজীব ফুলের মত রাঙ্গা, ঘাড়টী ষাঁড়ের মত; বুকটী প্রকাণ্ড চওড়া, মাজাটী সিংহের মাজার মত ও হাত দুইটী আজানু-লম্বিত! এ সমস্ত মিলাইয়া আমরা একটা ছবি আঁকিলাম। দেখ তো আমাদের "সুপুরুষ"টী দেখিতে কেমন হইল!

—*—

**পুজার সংখ্যা রামধনু**—কার্ত্তিক মাসের রামধনু ১৫ই আশ্বিন তারিখে আমাদের অফিস হইতে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের কাছে পাঠান হইবে। গত বারের মত এবারও পুজার সংখ্যায় গল্পের ভাগই থাকিবে বেশী। আশ্বিন মাসের ধাঁধার উত্তর ১০ই আশ্বিনের মধ্যে অফিসে আসা চাই।

**শোক-সংবাদ**—রামধনু ছাপা শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় আমরা একটা নিদারুণ খবর পাইয়া মর্ম্মাহত হইলাম। বাংলা দেশের একটী ছাত্র, যতীন্দ্রনাথ দাস, লাহোর-জেলে গবর্ণমেণ্টের কাজের প্রতিবাদ করিয়া ৬৩ দিন ধরিয়া অনাহারে ছিলেন, তিনি আর ইহলোকে নাই। কি অসম্ভব মনের জোর! ভগবান্ তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন।

——•——

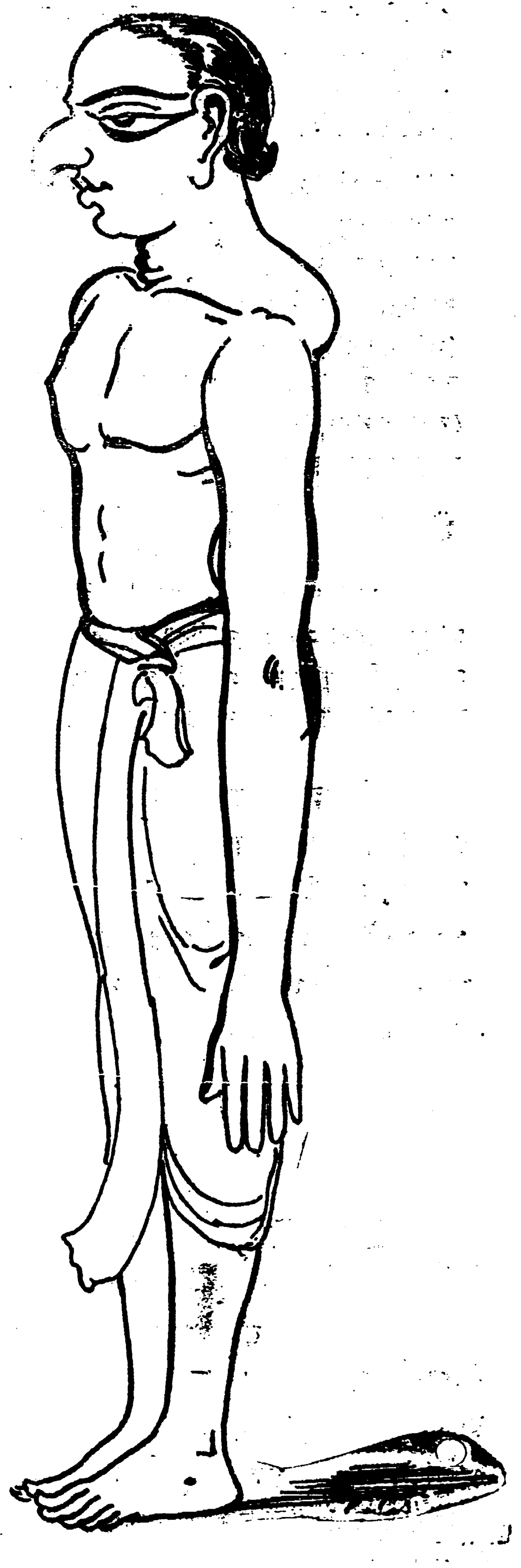

কবিতার 'সুপুরুষ'

চিত্রে বিদ্যাসাগর জীবনী—৮

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

[ চিত্র-পরিচয় দেখ

শিল্পী—শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত ]

২য় বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৩৬ { ১০ম সংখ্যা

## নমস্কার

( শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ )

হে ভগবান্, তোমার চেয়ে দয়াল কেবা আর,
মধুসূদন, সুহৃদ্-শরণ, তোমায় নমস্কার।
তোমার চেয়ে, হে ভগবান্, ভয়াল কেবা আর,
দর্পহারী, চক্রধারী, তোমায় নমস্কার।
হে বিশ্বরূপ, রাজার রাজা, সর্ব্বগুণাধার,
যুগের যুগের সাক্ষী তুমি, তোমায় নমস্কার।

( ২ )

যে দিয়েছে দুঃখ ব্যথা সেও তোমার চর,
যে দিয়েছে আনন্দ সে তোমারি কিঙ্কর।

যে দিয়েছে চক্ষে মোদের প্রীতির অঞ্জন,
উৎসাহ হায় যে দিয়েছে, হে ভয়-ভঞ্জন,
তাদের মাঝে তোমার পরশ পেলাম বারম্বার,
দিল্ দরদী, দয়ার নিধি, তোমায় নমস্কার।

( ৩ )

তুমিই মাতা দশভুজা—বিলাও অমৃত,
লক্ষ্মী তুমিই ধরায় কর নিত্য সমৃদ্ধ।
তোমায় যেন না ভুলি হে, না ভাবি হে পর,
থাকে যেন তোমার উপর অনন্ত নির্ভর।
তোমার নামের আনন্দেতে বহুক আঁখি-ধার,
হে নারায়ণ, পরম পুরুষ, তোমায় নমস্কার।

——:*:——

# দুখীরাম

দুখীরামকে গ্রামের সকলেই ভাল বাসিত—শুধু দেখিতে পারিত না তার প্রতিবেশী বংশীলাল। দুখীরামের উপর তার ভারী রাগ। তার রাগের একটা কারণও ছিল। জন্মের সময় হইতেই দুখীরামের কপালে খানিকটা মাংস জমিয়া বেশ বড় একটা ঢিবি হইয়াছিল; হাকিম, বদ্যি কেহই সেটা সারাইতে পারে নাই,—বরঞ্চ দিনে দিনে সেটা বাড়িয়াই চলিয়াছিল। ছেলে বেলায় বংশীলাল সুবিধা পাইলেই সেটা লইয়া নানা রকম ঠাট্টা-তামাসা করিত। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল বংশীলালেরও কপালটা কেমন ফুলিয়া উঠিতেছে, আর কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই সে বেচারার মাথায়ও ঠিক দুখীরামের মত একটা মাংস-পিণ্ড দেখা দিল। সেই যে দেখা দিল আর সেটাকে সারান গেল না। সেই হইতে দুখীরামের উপর বংশীলালের রাগ।



গ্রামের মধ্যে দুখীরামের ছোট্ট একখানি দোকান, তাহা হইতে যা দু'চার পয়সা হয় তাহা দিয়াই দুখীর দিন চলে। মাঝে মাঝে দোকানের জন্য জিনিষ আনিতে সে সহরে যায়।

সেদিনও সে সহরে গিয়াছিল। কেনাকাটি সারিয়া ফিরিতে একটু দেরী হইয়া গেল। বনের ভিতর দিয়া পথ। দুখীরাম চলিয়াছে। বন শেষ না হইতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বেচারা আর করে কি? অন্ধকারে বাঘ-ভালুকের হাতে ত' আর বেঘোরে প্রাণটা হারাইতে পারে না! কাছাকাছি বড় একটা অশথ গাছ দেখিয়া দুখীরাম ঠিক করিল তার উপরে উঠিয়াই কোন রকমে রাতটা কাটাইয়া দিবে। সে গাছে উঠিয়া বসিয়া রহিল,—একটু পরেই চোখ দুটা তার ঘুমে বুজিয়া আসিল।

রাত তখন প্রায় দুপুর। হঠাৎ একটা গোলমালের শব্দে দুখীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এই রাত্রে গভীর বনের মধ্যে আবার কারা হল্লা করিতে আসিল? গাছের নীচে তাকাইয়া দুখী দেখে—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! সার বাঁধিয়া একপাল ক্ষুদে মানুষ সেখানে দিব্যি আসর জম্কাইয়া বসিয়াছে। তাহাদের এক একজন লম্বায় এক বিঘতের একটুও বড় হইবে না। বামনেরা কেউ হাসিতেছে, কেউ লাফাইতেছে, আবার কেউ কেউ ঢাক-ঢোল, বাঁশী, ভেঁপু প্রভৃতি নানা রকম বাজনা লইয়া গান জুড়িয়া দিয়াছে। সে কি ফূর্ত্তি তাহাদের! আর একদিকে চাহিয়া দুখী দেখে সেখানে প্রচুর খাবারের আয়োজন—দই, সন্দেশ, মিঠাই, মণ্ডা, কত কি! মানুষগুলি ত অতটুকু, কিন্তু সে খাবার বোধ হয় দৈত্যেরা আসিলেও শেষ করিতে পারে না—এত বেশী। দুখীর বেশ ক্ষুধা পাইয়াছিল, খাবারের দিকে চোখ পড়িতে তাহার আর গাছের উপর বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হইল না। প্রথমে, খানিকক্ষণ সে মজা দেখিতেছিল; তারপর গুটিগুটি গাছ হইতে নামিয়া আসিল।

দুখীরামকে দেখিয়া বামনেরা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, কিন্তু খানিক পরে যখন দুখীও হাসি মুখে তাহাদের সাথে নাচ গান জুড়িয়া দিল তখন আর

তাহাদের কোন আপত্তি রহিল না। তাহারা দুখীর কাঁধে পিঠে চড়িয়া আবার হল্লা আরম্ভ করিল। তারপর, নাচ গান শেষ হইলে খাওয়া।

খাওয়া-দাওয়া সারিতে রাত প্রায় ভোর হইয়া আসিল। এইবার বামনদের যাইবার পালা, দুখীরামকে কিন্তু তাহারা ছাড়িতে চাহিল না; বলিল, "বন্ধু, তুমি ত' বেশ ফূর্ত্তিবাজ লোক দেখ্‌ছি, তুমিও আমাদের সাথে চল না!" দুখীরাম নিজের গ্রাম ছাড়িয়া কিছুতেই যাইতে রাজী হইল না, বামনেরাও ছাড়িবে না। শেষে একজন বলিল—বেশ, তাহ'লে কালও তোমাকে এখানে আস্‌তে হবে। কাল দুপুর রাত্রে আবার আমরা এই গাছের তলায় জুট্‌ব।" দুখীরাম দেখিল রাজী না হইলে ছাড়া পাওয়া মুশ্‌কিল। সে বলিল, "আচ্ছা, আমি আস্‌ব, এখন।" বামনদের একজন বলিল, "উঁহু, যদি না আস, তাহ'লে? আচ্ছা তবে তোমার একটা জিনিষ আমাদের কাছে বন্ধক রেখে যাও। কালকে না আস্‌লে আর সেটা পাচ্ছ না।" এই বলিয়া সে টুক্ করিয়া গাছে উঠিয়া দুখীরামের কপাল হইতে মাংসের ঢিবিটা তুলিয়া লইল। তারপর তাহারা চলিয়া গেল।

মাংসের ঢিবিটা তুলিয়া লইল।

ভোরবেলা দুখীরাম গাঁয়ে ফিরিল। তখন আর তার ফূর্ত্তি দেখে কে? সারা রাত্রি অমন চমৎকার খাওয়া-দাওয়া, আমোদ আহ্লাদে কাটিয়াছে, তার উপর



কপালের যে বিশ্রী মাংস পিণ্ডটা সে এতদিন বহু চেষ্টায়ও সারাইতে পারে নাই, বামনেরা সেটাও তুলিয়া লইয়া কপালটিকে নিখুঁৎ করিয়া দিয়া গিয়াছে। কাজেই আহ্লাদ ত' হইবেই।

দুখীরাম সারাদিন গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সকলের কাছে রাত্রের ঘটনা গল্প করিয়া বেড়াইল।—আরও বলিল, "আজ রাত্রেও তারা আস্‌বে।" সে নিজে কিন্তু মনে মনে ঠিক করিল—আজ আর যাওয়াটা ঠিক হইবে না। প্রথমতঃ, অতি লোভ জিনিষটা মোটেই ভাল নয়, তার উপর আজও যদি বামনেরা তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করে তাহা হইলেই ত' বিপদ্, রোজই যে ছাড়া পাওয়া যাইবে তারই বা ঠিক কি?

আর সকলের সাথে বংশীলালও সব কথা শুনিল। নিজের কপালে বার বার হাত বুলাইতে বুলাইতে হিংসায় তার বুক ফাটিবার যোগাড় হইল। সে ঠিক করিল—আজ রাত্রে সেও যাইবে। সন্ধ্যা হইতেই বংশীলাল গুটি গুটি বনের দিকে রওনা হইল। তারপর সেই অশথ গাছ খুঁজিয়া লইয়া তাহার উপর উঠিয়া চাপিয়া বসিল।

খানিক পরে বামনের দল আসিল। কিন্তু তাহারা বড় ব্যস্ত, গান বাজনার দিকে মোটেই ঝোঁক নাই। বংশীলাল তাহাদের দেখিয়া তাড়াতাড়ি গাছ হইতে নামিয়া আসিল। বামনেরা অন্ধকারে বংশীলালকে ঠিক চিনিতে পারিল না, দুখীরাম বলিয়াই ধরিয়া লইল। তারপর তাহাদের একজন কাছে আসিয়া বলিল—"দেখ, আজ আর আমরা নাচগান, আমোদ-আহ্লাদ কর্‌তে পারব না, আমাদের রাজা হুকুম দিয়েছেন—আজ রাত্রেই আমাদের দক্ষিণ দেশে যেতে হবে। কাজেই আমাদের বড় তাড়াতাড়ি। আমরা আসতুমই না, কেবল তোমার এই জিনিষটা বন্ধক রেখেছিলুম, ফিরিয়ে না দিলে তুমি রাগ করতে পার, এই ভেবে শুধু এটা ফেরৎ দেবার জন্যই আমাদের আসা।" এই বলিয়া সে টুক্ করিয়া গাছে উঠিয়া বংশীলালের কপালে তার নিজের মাংসের ঢিবিটার পাশে দুখীরামের কপালের

সেই মাংস-পিণ্ডটা বসাইয়া দিল। তারপর তাহারা সকলে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

ভোরবেলা বংশীলাল কপালের একটির জায়গায় দুইটি ঢিবি লইয়া গাঁয়ে ফিরিল।

---

## পাতালে সোণার পুরী

( রামায়ণ হইতে )

রাবণ সীতাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। রাম সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাঁহাকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করিয়া দিয়াছেন। সীতাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ভার পড়িয়াছে সুগ্রীবের উপর। সুগ্রীব সকল বানরের কর্ত্তা হইয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া চারিদিকে সীতার খোঁজে পাঠাইয়াছেন। ভারী কড়া হুকুম—এক মাসের মধ্যে সীতার খোঁজ করিতেই হইবে।

রাজার হুকুম পাইয়া বানরেরা চারিদিকে লাফাইতে লাফাইতে সীতার খোঁজে চলিল। সকলেরই প্রাণে ভয়, একমাস পার হইয়া গেলে সুগ্রীব কাহাকেও আস্ত রাখিবেন না। দক্ষিণ দিকে গেল সুগ্রীবের ভাইপো অঙ্গদ, মহাবীর হনুমান্ আরও কত কত বীর। বন জঙ্গল, নদ নদী, পাহাড় খুঁজিয়া তাহারা আর কিছু বাকী রাখিল না। কিন্তু কোথাও সীতার খোঁজ মিলিল না।

একদিন অনেক খোঁজাখুঁজির পর হনুমান্ প্রভৃতি বানরদের চোখে পড়িল এক মস্ত গর্ত্ত। বানরেরা ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা দেখিতে পাইল কত হাঁস, সারস, আরও কত কি পাখী সেই গর্ত্তের ভিতর হইতে উঠিতেছে। আরও দেখিল বকের গায়ে জল, চক্রবাকের গায়ে পদ্মের রেণু। দেখিয়াই বানরেরা আশ্চর্য্য হইয়া গেল, গর্ত্তের ভিতরে ঢুকিলে জল পাওয়া যাইবে মনে করিয়া খুসীও হইল।

হনুমানের কথায় বানরেরা সেই গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। সেখানে কী



অন্ধকার! না আছে সূর্য্য, না আছে চন্দ্র। আবার সিংহ প্রভৃতি হুমড়ো-চুমড়ো পশু—আর বিস্তর পাখীও সেখানে। বানরদের কিন্তু সেই অন্ধকার পথে যাইতে বিশেষ কোনও কষ্ট হইল না। যাইতে যাইতে যখন এমন এক জায়গায় গিয়া পড়িল যেখানে অন্ধকারে আর কিছু দেখা যায় না, তখন সকলের ভয় হইল—এইবার বুঝি প্রাণটা যায়। কিন্তু তখনই আবার খানিক দূরে একটা আলো দেখা গেল। আর কি কথা আছে? তাহারা একেবারে হুড়্ মুড়্ করিয়া সেখানে গিয়া পৌঁছিল। গিয়া দেখে—একি?—জ্বলন্ত আগুনের মত লতায় জড়ান সোণার গাছ, তাহাতে রাশি রাশি সোণার ফুল, কচি কচি লাল পাতা, আবার নীচে মণির বেদী। সেখানে সুন্দর সুন্দর সব পুকুর, টল্‌টলে জল,

হনুমান হাতযোড় করিয়া তপস্বিনীকে প্রণাম করিলেন।

ভ্রমরে ঘেরা নীল পদ্ম, সোণার পদ্ম, কত বড় বড় সোণার মাছ। মণি মাণিক্যের কাজ করা সোণা রূপার সুন্দর সুন্দর বাড়ীই বা কত! সোণার বিছানা, সোণার আসন, কত ভাল ভাল ফল-মূল, পাল্কী, কাপড়, কম্বল ইত্যাদি কত কি বানরেরা দেখিল। আবার এদিক্ ওদিক্ খুঁজিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, সেখানে এক বৃদ্ধা তপস্বিনী রহিয়াছেন। কাল হরিণের চামড়া আর গাছের বাকল তাঁর পরণে। আহারটা তাঁর কমই ছিল কিন্তু গায়ের তেজে তিনি যেন দপ্ দপ্ করিতেছিলেন। হনুমান্ হাত-

জোড় করিয়া তপস্বিনীকে প্রণাম করিলেন। তার পর বলিলেন—"আপনি কে? এই সব ধনদৌলত আর বাড়ীঘর কার? দয়া করে আপনি সব বলুন।" হনুমান্ যে তাঁহার দলদল লইয়া সেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া আসিয়া পড়িয়াছিলেন, আর সেখানকার সব কাণ্ডকারখানা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন তাহাও তপস্বিনীকে জানাইতে বাকী রহিল না।

তপস্বিনী বলিলেন—"ময় নামে এক দানব ছিল দেবতাদের কারিকর। সে হাজার বছর এই বনে তপস্যা ক'রে ব্রহ্মার কাছে বর পেয়েছিল। সেই বরে তার শিল্পশাস্ত্রের জ্ঞান হয়, সৃষ্টি করার ক্ষমতাও হয়। সেই ময় দানবই মায়ার জোরে এই সোণার বন তৈয়ারি ক'রে গেছে। ময় দানবের যখন হেমা নামে এক অপ্সরার উপর ঝোঁক পড়্লো, তখন ইন্দ্র তাকে বজ্র দিয়া মেরে ফেল্লেন! তার পর ব্রহ্মা এই সোণার বন, ঘর বাড়ী, জিনিষপত্র সব দিয়া গেলেন সেই হেমাকে। হেমা নাচ্তে গাইতে খুব ওস্তাদ। সে আমার সই,—আমার উপর এই সব ঘর বাড়ী রক্ষা করার ভার দিয়েছে—তাই আমি এ সব আগ্‌লে আছি। আমার নাম স্বয়ম্প্রভা, আমার বাবার নাম মেরুসাবর্ণি। তোমরা এই সব ভাল ভাল ফলমূল আর পরিষ্কার জল খেয়ে ঠাণ্ডা হও। তার পর বল তো তোমাদের দরকারটা কি। আর কেন তোমরা এই ভয়ানক বনে এলে?"

বানরেরা ফলমূল খাইল; স্বয়ম্প্রভা আবার তাহাদিগকে ঐ বনে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হনুমান্ তখন তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। রামলক্ষ্মণের বনে আসা, সীতা-হরণ, সুগ্রীবের পাঠান-মতে সকলকার দক্ষিণ দিকে আসা, খোঁজাখুঁজির পর হয়রাণ হইয়া জলের আশায় গর্ত্তের মধ্যে ঢোকা, সব কথাই বলিলেন। শেষে বলিলেন—"বানরেরা ক্ষিদেয় প্রায় মারা পড়েছিল, আপনি তাদেরকে বাঁচিয়েছেন। আপনার কি উপকার কর্ত্তে হবে বলুন।"

স্বয়ম্প্রভা বলিলেন, "তোমাদের উপর আমি খুব খুসী হয়েছি। আমি ধর্ম্মকর্ম্ম করি, আমার জন্য আর কি কর্‌তে হবে? কিছুই না।"

হনুমান্ তখন বলিলেন "দেখুন, এই গর্ত্তের মধ্যে বেশী সময় থাকায়, সুগ্রীব আমাদেরকে যে সময় ঠিক করে দিয়েছিল তা প্রায় শেষ হয়ে এল। সময়টা চলে গেলে সুগ্রীব আমাদের মেরে ফেল্‌বে। আমরা এখন আপনার আশ্রিত, আপনি দয়া করে আমাদের এই গর্ত্ত হ'তে বের করে দিন। এখানে থাক্‌লে যে কাজের জন্যে আমাদের আসা, তা হবেই না।"



স্বয়ম্প্রভা বলিলেন, "এখানে একবার এলে বের হওয়া মুস্কিল; আচ্ছা, আমি যে এতকাল তপস্যা করেছি তারই জোরে তোমাদের উদ্ধার করে দিচ্ছি। তোমরা সব চোক্ বোজ; চোক্ না বুজ্‌লে এখান থেকে কিছুতেই বেরুতে পার্‌বে না।"

বানরেরা কি করে, চক্ষু বুজিল। তপস্বিনী স্বয়ম্প্রভা তখন তাহাদিগকে চট্ করিয়া উপরে আনিয়া বলিলেন, "বের হয়েছ তোমরা সেই ভয়ানক গর্ত্ত থেকে, ঐ দেখ বিন্ধ্য পর্ব্বত আর এই দেখ মহাসমুদ্র, তোমাদের ভাল হোক্ আমি চল্লাম।"

স্বয়ম্প্রভা চলিয়া গেলেন। বানরেরা চক্ষু খুলিয়া দেখে, সেই পর্ব্বত আর সেই সমুদ্র।

---

# বুনো জানোয়ার ধরার কৌশল

( শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বি-এস্‌সি )

আজকালকার দিনে আর সিংহ, বাঘ, ভালুক প্রভৃতি বুনো জানোয়ারের সাথে দেখা করিতে হইলে কষ্ট করিয়া বনে জঙ্গলে ঘুরিতে হয় না, ঘরের কাছে চিড়িয়াখানা—একটা আনি ফেলিয়া দাও, যতক্ষণ খুসী জানোয়ারদের ভিতর ঘুরিবে; অথচ বিপদের ভয় নাই একটুও।

চিড়িয়াখানায় জ্যান্ত জানোয়ার থাকে, এই পর্য্যন্তই তোমরা জান, কিন্তু সেখানে তারা আসিল কি করিয়া? তাদের আসল বাড়ী ঘর ত' আর সেটা নয়,—কেউ হয়ত' আসিয়াছে আফ্রিকার গভীর জঙ্গল হইতে, কেউ বা অষ্ট্রেলিয়া

হইতে, কারও বা বাড়ী আমেরিকায়, আবার কারও কারও বাড়ী এই ভারতবর্ষেই —অবশ্য কলিকাতা-বোম্বাইএর মত বড় বড় সহরে নয়, হিমালয়ের মত দুর্ভেদ্য

এ অবস্থায় সিংহের সাথে দেখা করিতে কোন ভয় নাই

জঙ্গলে। এই সব মহাপ্রভুরা যে স্বেচ্ছায় চিড়িয়াখানায় বেড়াইতে আসেন নাই এটা তোমরা নিশ্চয় আন্দাজ করিতে পার; ইহাদের এখানে আনিতে দস্তুর মত বেগ পাইতে হইয়াছে। সাধারণ শিকারের চাইতে এ কাজটা ঢের ঢের বেশী কঠিন, আর তেমনি বিপদের। তুমি শিকার করিতে গেলে,—দূর হইতে জানোয়ার দেখা গেল—এক গুলি, ব্যাস্ সব খতম! কিন্তু যদি বলা হয় জানোয়ারটাকে জ্যান্ত অবস্থায় বাঁধিয়া আন তবেই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য রকম হইয়া পড়িবে। গুলি করিবার উপায় সেখানে নাই, জানোয়ারের গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগাইলে



হইবে না; তার পর দূরে বসিয়া থাকিলেও চলিবে না, কাছে আসিয়া তাকে খাঁচায় পূরিতে হইবে; শেষে তাকে জ্যান্ত অবস্থায় লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা—সেটাতেও বিপদের ভয়টা কম নয়।

কিন্তু মানুষ কিছুতেই পিছ-পা নয়; এক্ষেত্রেও নয়। গভীর জঙ্গলে গিয়া তাহারা ভয়ানক ভয়ানক হিংস্র জানোয়ারদের অক্ষত শরীরেই ধরে, কখনও কখনও আবার তাহাদের পোষ মানাইতেও কসুর করে না। ছবিতে দেখ, এক মেমসাহেব কেমন এক প্রকাণ্ড হিপোপটেমাসের পিঠে চাপিয়া বসিয়াছেন, অথচ এই হিপো-পটেমাসের মত সিংস্র, অসভ্য, একগুঁয়ে স্বভাবের জানোয়ার খুব কমই আছে।

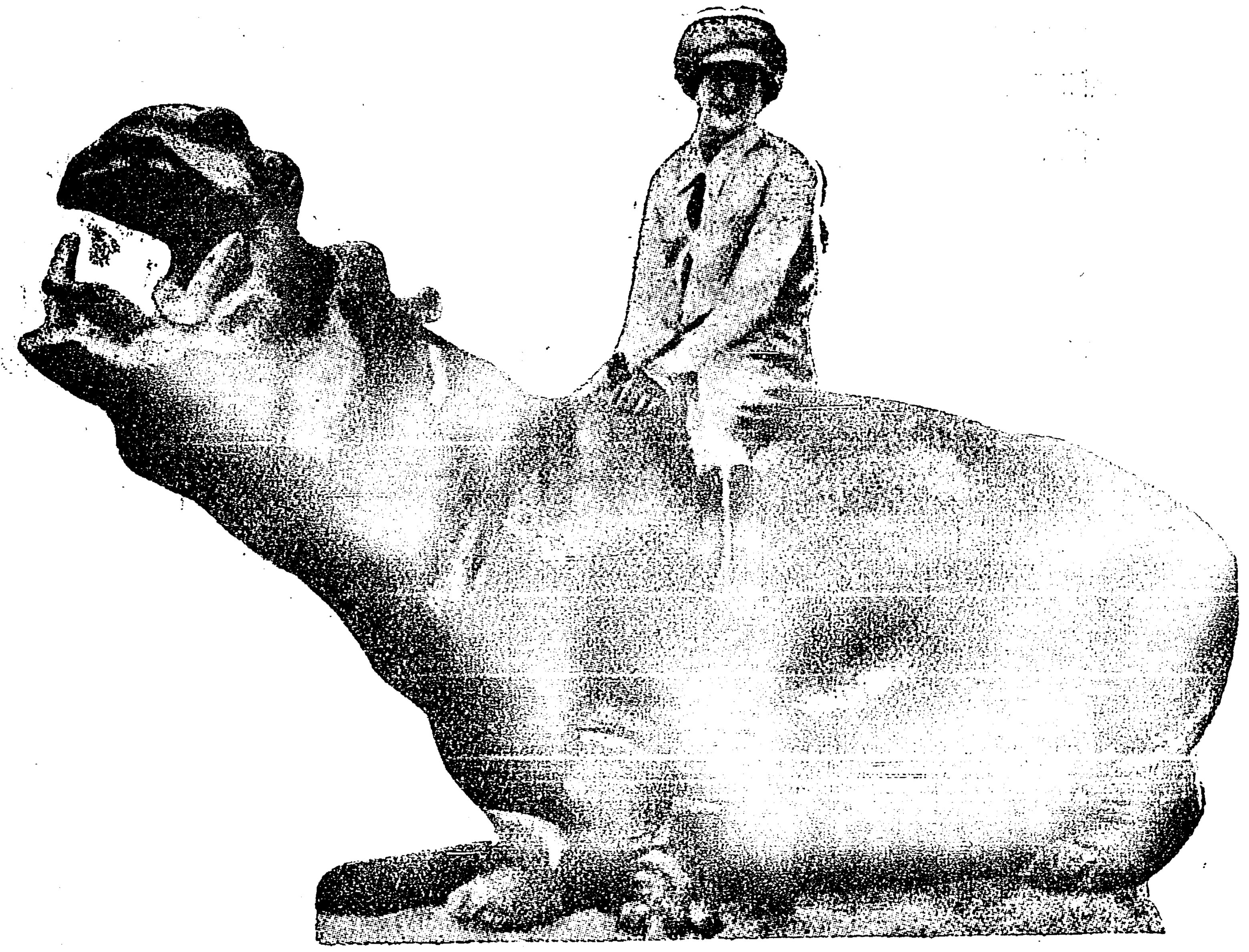

হিংস্র, একগুঁয়ে স্বভাবের হিপোপটেমাস্ কেমন শান্ত "ঘোড়া" সাজিয়াছে

এই সব জানোয়ার কেমন করিয়া ধরা হয় শুনিবে? বাচ্চা গোছের

জানোয়ার পাইলে আর শিকারীরা বুড়াদের কাছে ঘেঁসে না, কেননা বাচ্চাদের গায়েও যেমন জোর অনেকটা কম, তাদের পোষ মানান ব্যাপারটাও তেমনি অনেকটা সহজ। তার উপর জঙ্গল হইতে বুড়া গোছের জানোয়ার ধরিয়া আনিয়া তাদের বাঁচাইয়া রাখাও বেশ কষ্টকর। সারা জীবনটা স্বাধীনভাবে কাটাইয়া বুড়া বয়সে আর তাহারা কয়েদী অবস্থায় থাকিতে পারে না;—মনের দুঃখেই অনেক সময় মারা যায়।

জানোয়ারদের সাথে মোলাকাৎ করিতে হইলে সাধারণতঃ কোন একটা জলাশয়ের ধারে লুকাইয়া থাকাই সুবিধাজনক। জঙ্গলের মধ্যে ত' আর সব জায়গায় জল থাকে না! অনেক সময় জল পাওয়া দস্তুর মত দুর্ঘট হইয়া পড়ে। কাজেই বেশীর ভাগ জানোয়ারই একবার জলের খোঁজ পাইলে তার কাছাকাছি থাকাটাই সুবিধাজনক বলিয়া মনে করে—বিশেষতঃ হিপোপটেমাসেরা ত' জলের মধ্যে থাকিতেই বেশী ভালবাসে। শিকারী দিন কয়েক আগেই গিয়া এই ধরণের একটা জলাশয় খুঁজিয়া লইয়া সেখানে নজর রাখিতে সুরু করে—সেখানে কোন হিপোপটেমাস্ আসে কিনা, কখন্ আসে, কোন্ পথ দিয়া আসে, এই সব। তার পর একদিন সুবিধা মত গিয়া সেই পথের মাঝখানে বেশ প্রকাণ্ড, গভীর একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া, সেটাকে ডালপালা দিয়া বেমালুম ঢাকিয়া রাখিয়া আসে। তার পর হিপোপটেমাস্ আসে। মায়েরা বাচ্চাগুলিকে আগে আগে রাখিয়া, নিজেরা পিছু পিছু চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে চলে। বাচ্চারা গর্ত্তের কাছে আসিয়া যেই সেই ডালপালাগুলির উপর পা দেয় অমনি সেই গভীর গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া যায়, আর তাদের দেখা যায় না। এদিকে মা-হিপোপটেমাস্ ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া প্রথমটা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে। তার পর বন তোলপাড় করিয়া বাচ্চাদের খোঁজে, শেষটায় হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায়। শিকারী তখন গুটি গুটি আসিয়া উপর হইতে ফাঁস গলাইয়া বাচ্চাগুলিকে বাঁধিয়া ফেলে, তার পর ধরিয়া লইয়া যায়। অবশ্য তাদের স্বভাবটা অত সহজে শোধরান যায় না।

গণ্ডারও ধরা হয় ঠিক এম্‌নি ভাবে, তবে গণ্ডারজীর স্বভাবটা নাকি হিপো-



পটেমাসের চাইতে একটু ভদ্র, অবশ্য মোলায়েম তাকে কোন মতেই বলা চলে না।

বাঘ, সিংহের বেলায়ও অনেক সময় ঠিক এই উপায় কাজে খাটান হয়, তবে সব সময় নয়,—নিতান্ত যে গুলি শিশু শুধু তাদেরই এই ভাবে ধরা চলে। শিশু বলিতে খুবই ছোটদের কথা বলিতেছি, কেননা দেড় মাস দু'মাস বয়সের সিংহের বাচ্চাও নেহাৎ সহজ চীজ্ নন্। এত ছোট বাচ্চাদের ধরিয়া আনিয়া মানুষ (?) করাটাও রীতিমত হাঙ্গামার ব্যাপার। সাধারণতঃ কোন কুকুর কিংবা ছাগলের উপর ইহাদের ভার দেওয়া হয়, তারাই নিজেদের দুধ দিয়া এদের পালে। ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য্য নয় কি?—এক জাতের জানোয়ার অন্য জাতের জানোয়ারের বাচ্চাকে পালিতেছে। কিন্তু জানোয়ারের রাজ্যে এরকমটা অনেক সময়ই দেখা যায়। মাতৃ-স্নেহ জিনিষটা এমনই।

বড় বড় বাঘ-সিংহের বেলা কিন্তু আগেকার ঐ উপায় খাটে না, সেখানে শিকারীকে ফাঁদ পাতিতে হয়। ইঁদুর ধরা কল তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ, ফাঁদটা অনেকটা সেই রকমই করা হয়। প্রকাণ্ড একটা লোহার খাঁচা, তার ভিতরে ঢুকিবার একটি মাত্র দরজা, তার সাথে একটা স্প্রিং লাগান থাকে। খাঁচার ভিতর বেশ লোভনীয় কোন একটা খাবার রাখিয়া দেওয়া হয়। খাবারের লোভে বাঘ কি সিংহ আসিয়া যেই দরজার ভিতর ঢোকে, অমনি স্প্রিং ছুটিয়া গিয়া টুক্ করিয়া দরজা বন্ধ হইয়া যায়, আর তা খুলিবার উপায় থাকে না। এমনি ভাবে বিস্তর সিংহ বাঘ ধরা হয়। তবে চালাক তাদের মধ্যেও অনেক আছে—এই খানেই শিকারীর বিপদ্। এমনও দেখা গিয়াছে দুই একটা ধড়ীবাজ সিংহ ফাঁদ দেখিয়া ব্যাপারটা আগেই আন্দাজ করিয়া ফেলে, তার পর করে কি—ভিতরে না ঢুকিয়া ফাঁদের পাশে ঝোপের আড়ালে ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে। তার পর শিকারী যখন দেখিতে আসে, ফাঁদে কোনও জানোয়ার আটকা পড়িয়াছে কিনা—অমনি তার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়ে, তার পর তাকে শেষ করিতে আর ক' মিনিট! আর একটা ভয়ানক ব্যাপারের ছবি দেখ। ফাঁদে সিংহ

ঢুকিয়াছিল, কিন্তু দরজা বন্ধ হইবার সময় দৈবাৎ তার শরীরের খানিকটা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল—ফলে অবলীলাক্রমে সে খাঁচা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া শিকারীর

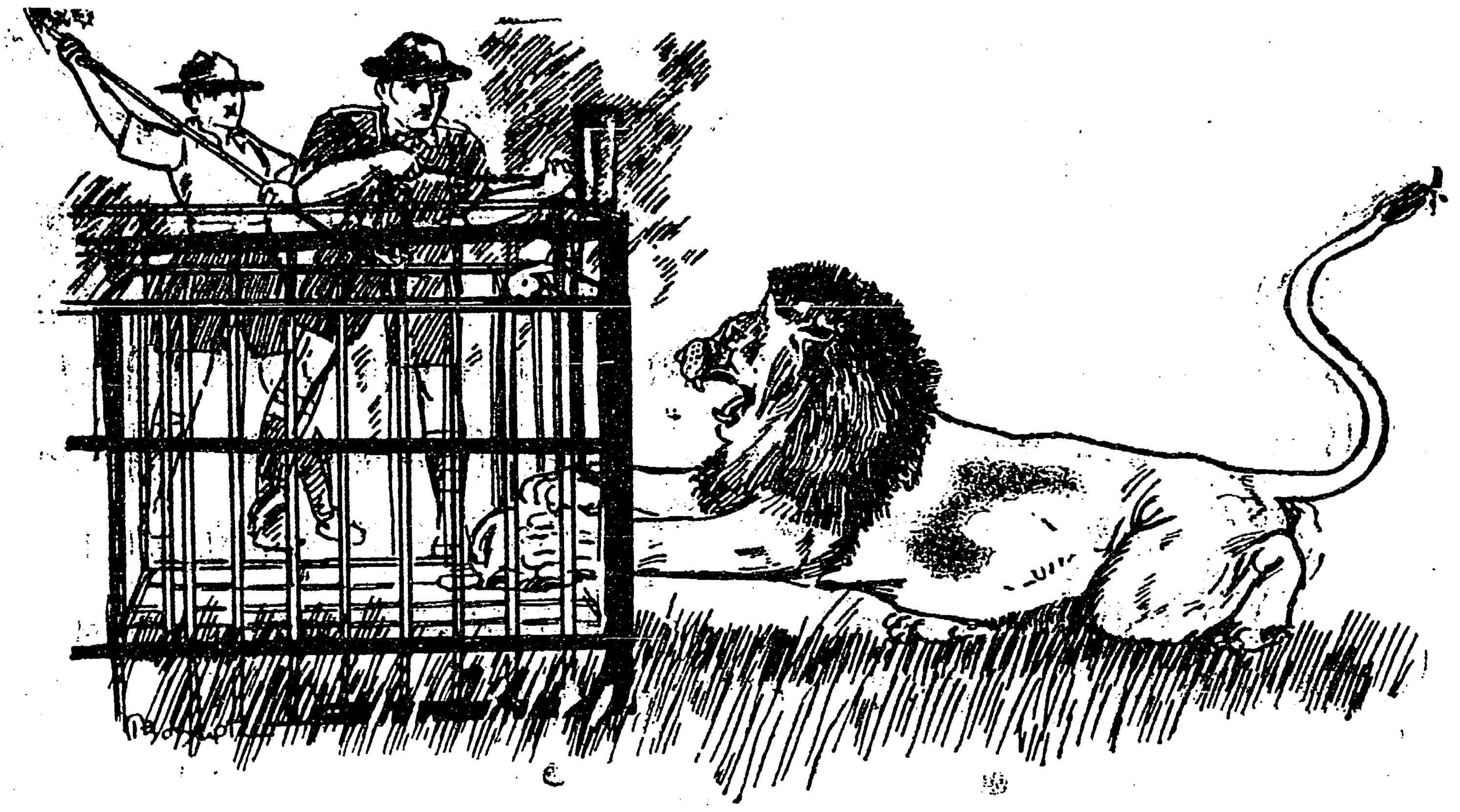

খাঁচা খুলিয়া বাহিরে আসিয়াছে

সম্মুখে দাঁড়াইল। এর পরের ব্যাপারটা কি হইবে আন্দাজ করিয়া লও।

চিতা বাঘ আমাদের দেশে খুব বেশী দেখা যায়। এ জানোয়ারটিকেও নেহাৎ ছোট খাট কিছু মনে করিও না। হিংস্র ত' এরা বটেই, তার উপর দৌড়াইয়া ইহার সাথে পাল্লা দিবে এত বড় সাহস খুব কম জানোয়ারেরই আছে। হরিণকে আমরা মস্ত দৌড়বাজ বলিয়া জানি, চিতা কিন্তু তারও প্রায় দ্বিগুণ বেগে দৌড়াইতে পারে। তবে সে দৌড়টা বেশীক্ষণের জন্য নয়, এই যা রক্ষা। চিতা ধরা কিন্তু খুব কঠিন নয়। তার একটা কারণ আছে। খাবারের খোঁজে যখন ইহারা বাহির হয় তখন অনেকগুলি মিলিয়া দল বাঁধিতে থাকে। সাধারণতঃ এই দল কোন একটা গাছের তলায় একত্র হয়। শিকারীরা সুবিধা বুঝিয়া আগে হইতেই এই রকম এক একটা গাছের চারিদিকে দড়ির ফাঁস রাখিয়া যায়। যেই চিতা আসিল অমনি ফাঁস তার গলায় আটকাইয়া গেল। তখন আর তাকে রাখে কে?



এইবার ভালুক ধরার গল্প বলি। ভারতবর্ষে ভালুকেরও অভাব নাই। তেমন তেমন পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরিলে হামেশাই ভালুকের সাথে সাক্ষাৎ মিলিয়া যায়। এখানে ভালুক ধরার কৌশলটা কিন্তু ভারী মজার। একটা উঁচু গাছের ডালে, গাছের কাণ্ডটা হইতে একটু দূরে একটা হাঁড়িতে করিয়া মধু কিংবা ঐ ধরণের কোন একটা খাবার ঝুলাইয়া রাখা হয়। আর ঠিক তার নীচে, কিন্তু কাণ্ডটার খুব কাছাকাছি একটা ভারী পাথর দড়ি দিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। পাথরটা এমনভাবে থাকে যে সেটা না সরাইয়া হাঁড়িটা নেওয়া সম্ভব হয় না। ভালুক বাবাজী দূর হইতেই গন্ধ পান, তার পর খাবারের লোভে গুটি গুটি গাছে উঠিতে সুরু করেন। তার পর হাত বাড়াইতে গিয়া দেখেন—কি জ্বালা, এখানে আবার কি একটা আপদ ঝুলিতেছে। তিনি তখন হাত দিয়া ঠেলিয়া সেটা সরাইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু ঠেলিলে কি হইবে, সেটা যে দড়ি দিয়া ঝুলান আছে, ঠেলিয়া দিলে ত' আবার তেমনি জোরে ফিরিয়া আসিবে; বার কয়েক অমনি হইবার পর বাবাজী যান চটিয়া, তখন তিনি প্রাণপণে এক ঘুষি লাগাইয়া দেন। সে কি যেমন তেমন ঘুষি! তার এক ঘা খাইলে বড় বড় পালোয়ানের ভুঁড়ি ফাঁসিয়া যায়। পাথর কিন্তু তাহাতেও সরে না, বরঞ্চ ফিরিয়া ঠিক তেমনি জোরে ভালুকের উপরেই আসিয়া পড়ে। ফলে তাঁর আর গাছের উপর বসিয়া থাকিবার সৌভাগ্য হয় না, একেবারে নীচে গড়াগড়ি দিতে হয়। শিকারীরা সেই ফাঁকে আসিরা বাবাজীকে বাঁধিয়া ফেলে।

সব চেয়ে সহজ হইতেছে বানর ধরা। চুরি বিদ্যাটায় তাদের খুব দখল কিনা, তাই তারই সাহায্যে খুব চটপট তাহাদের হাত করা চলে। বানরেরা সাধারণতঃ দল বাঁধিয়া থাকে, প্রত্যেক দলে আবার একটি করিয়া সর্দ্দার থাকে। আমাদের দেশে কেমন করিয়া বানর ধরা হয় বলিতেছি। একটা গাছের তলায় বেশ বড় একটা গর্ত্ত করা হয়। তার মধ্যে একটা দড়ির ফাঁস বসান থাকে। ফাঁসের একটা দিক থাকে গাছের সাথে বাঁধা, আর একটা দিক্ থাকে শিকারীর হাতে। ফাঁসটা বালি কি ঐ রকম আর কিছুর নীচে লুকাইয়া রাখা হয়;

আর গর্ত্তের উপরে থাকে বেশ মোটা এক কাঁদি কলা। কলা দেখিলে বানরদের (শুধু বানর কেন অনেকেরই) আর জ্ঞান থাকে না। তাদের সর্দ্দারটি তখন গুটি গুটি আসিয়া কলায় হাত দেয়। শিকারীও সময় বুঝিয়া দড়ি ধরিয়া টান মারে। বানর বেচারার ভাগ্যে আর কলা খাওয়া হইয়া উঠে না, সে রাম-ফাঁস এড়াইয়া আসা তার সাধ্য নয়। তখন তাকে দড়ি জড়াইয়া আচ্ছা করিয়া গাছের সাথে বাঁধিয়া ফেলিলেই হইল।

অবশ্য ওরাং ওটান, বেবুন, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি বড় দরের বানরকে সব সময়ে এত সহজে পোষ মানানো যায় না, সে সব জায়গায় দরকার মত নানা রকমের ফাঁদ পাতিতে হয়।

এইবার হাতী ধরার কথা বলি। এটাই হইল সব চেয়ে বড় দরের ব্যাপার। বাচ্চা অবস্থায় ধরা হাতী দিয়া বড় একটা কাজ হয় না, কাজেই ধরিতে হয় জোয়ান্ হাতীদের। একে ত' ঐ বিরাট্ চেহারা আর অসম্ভব জোর—একবার ক্ষেপিলে আর রক্ষা নাই—তার উপর বুনো হাতী বড় একটা একা থাকে না, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দল বাঁধিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তাই ধরিতে হয় এক সাথে দলকে দল।

যেখানটায় হাতী ধরা হইবে ৩।৪ মাস আগে হইতেই সেখানটায় শিকারীরা গিয়া জড় হয়। এক আধ জনের কাজ নয়—শিকারীরাও সংখ্যায় থাকে প্রায় দু' তিন শ' জন। প্রথমটা তাদের কাজ হইতেছে বুনো হাতীর দলকে তাড়া দিয়া একত্র জড় করা। বুনো হাতী যদিও ক্ষেপিলে খুব সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায় কিন্তু গোড়াতে তাহারা পলাইতে পারিলে আর আক্রমণ করিতে চায় না। শিকারীর দল দিনের বেলায় নানা রকম আওয়াজ করিয়া, আর রাত্রে মশাল জ্বালাইয়া তাড়া দিয়া হাতীগুলিকে একত্র করে। ইতিমধ্যে আর এক দল লোক গিয়া প্রকাণ্ড একটা জায়গা বেশ করিয়া বেড়া দিয়া ঘিরিয়া ফেলে। সে বেড়া সাধারণ বেড়ার মত নয়, বড় বড় গাছের গুঁড়ি দিয়া এমনি মজবুত ভাবে তা' তৈরী করা হয় যে বুনো হাতীর মত পালোয়ান জন্তুও সেটা ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিতে



পারে না। এই ঘেরা জায়গাটিকে বলা হয় খেদা। খেদার মধ্যে ঢুকিবার একটি মাত্র দরজা থাকে। শিকারীরা বুনো হাতীর দলকে তাড়াইয়া এই খেদার মধ্যে ঢুকাইয়া দেয়; তার পর দেয় দরজা বন্ধ করিয়া।

এইবার যে কাজটা করিতে হইবে সেটাতে মানুষের চাইতে পোষা হাতী-দেরই কৃতিত্ব বেশী। ধরিতে গেলে এই পোষা হাতীরাই বুনো হাতীদের ধরিয়া দেয়।

কয়েকজন মাহুত কয়েকটা পোষা হাতী লইয়া খেদার মধ্যে ঢোকে। তাদের অবস্থাটা একবার ভাবিয়া দেখ। আশে পাশে চারিধারে শুধু বুনো হাতী—সত্তর, আশী, একশ'। কোন মহাপ্রভু যদি দয়া করিয়া একটা ঢুঁ মারেন তাহা হইলেই কর্ম্ম সারা। পোষা হাতীগুলি দিব্যি গম্ভীর চালে,—যেন কিছুই হয় নাই এমনি ভাবে—আস্তে আস্তে বুনো হাতীর দলের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। তারা অবাক্ হইয়া এদের কাণ্ড দেখে—কিছু বলে না। তার পর সুবিধা বুঝিয়া পোষা হাতীগুলি একটা বুনো হাতীকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, আর আস্তে আস্তে তাকে ঠেলিয়া একটা গাছের গুঁড়ির কাছে লইয়া যায়। মাহুতও তখন গুটি গুটি আসিয়া দড়ির ফাঁস দিয়া বুনো হাতীর পিছনের পা গাছের সাথে বাঁধিয়া ফেলে। দড়ির আর একটা কোণা থাকে পোষা হাতীর কাছে। তারা তখন সেই দড়ি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বুনো হাতীকে আরও মজবুত ভাবে গাছের সাথে বাঁধিয়া ফেলে। এমনি ভাবে দলকে দলই আটক পড়ে।

হরিণ, জিরাফ, জেব্রা প্রভৃতি নিরীহ জানোয়ারদের ধরিতে বিশেষ কোন কষ্ট নাই। তারা শুধু জানে দৌড়াইতে। সেগুলি যখন দল বাঁধিয়া মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন হঠাৎ একদল শিকারী পিছন হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া তাদের তাড়া করে, আর ভিড়ের মধ্যে ২।৪টি যারা পিছাইয়া পড়ে তাদেরই দড়ির ফাঁস পরাইয়া ধরিয়া ফেলে। এই জানোয়ারগুলি নাকি এতই ভীরু যে ভয়ের চোটেই তাদের কোন কোন টার দফা শেষ হইয়া যায়।

কিন্তু মানুষের সমস্ত বুদ্ধিকে হার মানাইয়াছে গ্লাটন নামে এক ছোট্ট

জানোয়ার। কোন রকম ফাঁদের সাহায্যেই এই অদ্ভুত জানোয়ারটিকে কাবু করা যায় নাই। শিকারী ফাঁদ পাতিয়া গেল,—ফাঁদের ভিতর খাবার, খাবারের লোভে কোনও জানোয়ার একবার ভিতরে ঢুকিলেই হইল। কিন্তু পর দিন দেখা গেল ফাঁদের মধ্যে কোনও জানোয়ার নাই, অথচ খাবারটুকু উধাও হইয়া গিয়াছে। শুধু কি তাই, গ্লাটন বাবাজী আবার কল-কব্জা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নষ্ট করিয়া দিতেও কম ওস্তাদ নহেন—নিজেরা ত' ধরা দেনই না, আবার অন্য জানোয়ারদের জন্য পাতা যে ফাঁদ তাও নষ্ট করিতে কসুর করেন না। একবার এক গ্লাটন পর পর চল্লিশটি ফাঁদ হইতে ফাঁকি দিয়া বেমালুম খাবার চুরি করিয়া পালাইয়া ছিল,—অথচ ধরা পড়ে নাই।

---

## ভাগ্য পরীক্ষা*

( শ্রীমণীশ ঘটক )

—এক—

সেবার এক্‌জিবিসনে একটা ভারী মজা হয়েছিল। তোমরা শুন্‌লে ভাব্‌বে বানানো, কিন্তু গল্পটা সত্যি।

আমাদের প্রাণধনকে চেনো ত ? চেনো না,—আচ্ছা। ইস্কুলে গোঁয়ার-গোবিন্দ বলে ওর নাম ছিল। যেমন বোকা, তেমনি গোঁয়ার। কালো, মোটা, বেঁটে, নাকটা হকি ষ্টিকের মতো। মানুষ এম্‌নি মন্দ নয়, কিন্তু গোঁ চেপে গেলেই মুশ্‌কিল। বাড়ী ঢাকার দিকে। হঠাৎ হয়ত চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "হঃ, করুম্ না ? ডরাই কারে ?—" তখন ওর কাছাকাছি না থাকাই ভালো, অবশ্যি কাম্‌ড়াবেও না, খিম্‌চেও দেবে না, কিন্তু বলা ত' যায় না—

এহেন প্রাণধনের প্রাণের বন্ধু ছিল হরিশ। সে কোল্‌কাতার ছেলে, দোরস্ত চেহারা। প্রাণধনকে বাঙাল বলে ডাক্‌ত। আর কেউ এ দুঃসাহস

* রুশ লেখক Arkady Avertchenko অবলম্বনে।



করলে তার কি অবস্থা হত বলা যায় না, কিন্তু হরিশের বেলা প্রাণধন বল্‌ত,—"অ, অরিশ— ! অর কথা স্বতন্ত্র !"

ইস্কুলের বাইরের সময়টা দু'জনেই এক সাথে কাটাত। হরিশের বাড়ী ছিল,—কিন্তু প্রাণধন থাক্‌ত বোর্ডিংএ।

এখানে আর একটা কথা বলা দরকার—পড়াশুনায় দু'জনেই ছিল ভালো। হরিশ ফার্ষ্ট আর প্রাণধন সেকেণ্ড বয়। তাদের ভাব হবার এও একটা কারণ।

মফঃস্বল সহর। সব সময় কিছু হৈ চৈ লেগে থাকে না। কাজেই সেবার শীতের সময় যখন জেলখানার মাঠে এক্‌জিবিসন বস্‌ল, তখন সহর শুদ্ধ খুব একটা সাড়া পড়ে গেল।

নানা রকম দোকান, পসার, খেলা, ধূলো, পৃথিবীর-সব চেয়ে-রোগা-লোক, আধখানা-মাছ-আধখানা-মানুষ, একটা-শরীরের-ওপর-দুটো-মাথা, ইত্যাদি নানা রকম সমারোহের আয়োজন। জুয়োখেলাও কম নয়। বল দিয়ে লাট্টু মারা, এয়ার গানের নিশানা, নম্বর আঁটা ঘুরতি চাকা,—অনেক রকম।

সেদিন রাতে যখন প্রাণধন আর হরিশ গিয়ে পৌঁছল, তখন এক্‌জিবিসন খুব জমে উঠেচে। সেদিন একটা লটারী হবার কথা ছিল। কি কি সব, ভালো ভালো জিনিষ প্রাইজ দেবে। সেই জায়গায়টায় খুব ভীড়। প্রাণধন আর হরিশ যখন সেখানে গিয়ে হাজির হল, তখন টিকিট প্রায় শেষ হয়ে এসেচে। চার আনা করে টিকিটের দাম, হরিশ বল্‌ল, "এই বাঙ্গাল, আয় না একবার দেখা যাক্ কপাল ঠুকে, যদি কিছু বেধে যায়—"

প্রাণধন বল্‌ল, "আরে থো ফালাইয়া ! ও হালা গো জুয়াচ্চুরি—"

হরিশ ছাড়বার পাত্র নয় ; চেনাশুনো আর জন কত ছেলে টিকিট কিনেচে। কাজেই বাঙালকে গিয়ে দু'খানা টিকিট কিনে আন্‌তে হল।

টিকিট এনে সে হরিশের সাম্‌নে ধরে বল্‌ল, "ল', একখান্ ত'র—বাইছা ল' !"

একখানা টিকিট নিয়ে হরিশ দেখ্‌ল, তেরো নম্বর, প্রাণধনের খানা চোদ্দ।

খানিক পরে সার্কাসের ক্লাউনের মতো মুখে রঙ্‌ মাখা একটা লোক এসে বল্‌ল, "টিকিট টানা হয়েচে। আমি নম্বর ধরে ডাক্‌চি, যাঁরা প্রাইজ পেয়েচেন তাঁরা টিকিট দিয়ে তাঁদের প্রাইজ নিয়ে যান—"

সবাই উৎকণ্ঠ হয়ে উঠ্‌ল, আর নিজের নিজের টিকিট খুলে এক একবার নম্বরটা দেখে নিতে লাগ্‌ল।

ক্লাউনের মতো লোকটা হাঁক্‌ল, "ফার্স্ট প্রাইজ চৌদ্দ নম্বর। কই মশায়—এদিকে, এদিকে—"

নম্বর শুনে হরিশ আর প্রাণধন চোখ চাওয়া-চাউই করতে লাগ্‌ল। হরিশ কিছু বল্‌বার আগেই প্রাণধন বল্‌ল—"চুপ্‌ চুপ্‌—ত'র নম্বর কয় কিনা দেখি!"

লোকটা সবকটা প্রাইজের নাম ডেকে গেল। হরিশের নম্বর ওঠেনি।

হরিশের মনে একটু কষ্ট হলেও মুখে সে ভাব প্রকাশ পায় নি। প্রাণধন নিজে থেকেই বল্‌ল,—অরিশ, তুই মন খারাপ করিস্‌ না। যা দিবো, দুইজনে বাইট্টা ল'মু। চল, কি ছ্যায় দেহি।"

লটারীওয়ালাকে জিজ্ঞেস্‌ করতে সে বল্‌ল, ক' নম্বর? চোদ্দ—ও! ফার্স্ট প্রাইজ—ভাগলপুরী গাই।"

প্রাণধন লাফিয়ে উঠ্‌ল,—"অঃ, গ্র্যাণ্ড অইছে। হালার দুধই খা'মু রোজ চৌদ্দ স্যার কইরা! তুই মন খারাপ করিস্‌ না অরিশ, তরে অদ্ধেক দিমু।"

গরুটা খুলে দেবার সময় লটারীওয়ালা বল্‌ল, "মশাই, ইচ্ছে করলে গরুটা বেচে দিতে পারেন। আমরাই কিনে নিচ্চি, পঁচিশ টাকা।"

"কি! ইদিকে বিজ্ঞাপনে লট্‌কাইছেন দুই শ' টাকা দামের গরু, অখন ছ্যাওনের ব্যালায় কন্‌ পচিস্‌! না মশায়, আমি গরুই ল'মু।"

গরুর দড়ি ধরে হিড়্‌ হিড়্‌ করে টান্‌তে টান্‌তে প্রাণধন বল্‌ল,'চল্‌ অরিশ, অখন পিট্টান দেই।"



হরিশ বল্‌ল, 'কিন্তু বাজারের মধ্যে দিয়ে এই ভাবে গরুর দড়ি ধরে—"

প্রাণধন বল্‌ল, "করুম্‌ কি ক'? গরুডারে ত' আর ট্যাকে গুজ্‌তে পারি না।"

হরিশ বল্‌ল, "তবে আমি যাই। ওভাবে বাজারের মধ্যে দিয়ে আমি যেতে পারব না।"

প্রাণধনের মাথায় তখন খালি গরু ঘুরছে' সে বল্‌ল,—"আইচ্ছা, তুই যা গিয়া। আমি হালা এম্‌তেই যা'মু।"

—দুই—

বাছা বাছুর

রাস্তা যতক্ষণ নির্জ্জন ছিল, ততক্ষণ কোন বিপদ্‌ হয় নি। কিন্তু বাজারের পথ ধরতেই গোল বাধল।

চারদিকে আলো, রাস্তায় লোকজন। একটা পথের ছোঁড়া বল্‌ল,—ওরে অ হেবো, দেখে যা, বাছা বাছুর তার মাকে নিয়ে শুতে যাচ্ছে—"

প্রাণধন ফুসি পাকিয়ে বল্‌ল,—"তবে রে ছ্যাম্‌রা—"

ছোঁড়া হাততালি দিয়ে সরে গিয়ে চ্যাঁচাতে লাগ্‌ল,—"অ হেবো, হারু পট্‌লা—সাবধান, বাছুর শিং পাকাচ্চে"

প্রাণধন নিজের অসহায় অবস্থা বুঝতে পারল। দড়ি হাতে করে ওভাবে গেলে ছোঁড়ারা চ্যাঁচাবেই। তাদের শিক্ষা দিতে গেলে দড়ি ছেড়ে দিয়ে যেতে হয়। তা ছাড়া বাজারের প্রত্যেক লোকই বিস্মিত ভাবে তার দিকে তাকাচ্চে। সে বিব্রত বোধ করতে লাগ্‌ল।

হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি এল। সে গরুটার দড়ি ছেড়ে দিয়ে নিজে একটু পেছনে পেছনে চল্‌তে লাগ্‌ল। যেন সে বেড়িয়ে ফিরচে। গরুটা থাম্‌লেই সবার অগোচরে তার পিঠে এক খোঁচা অথবা চড় দিতেই সেটা আবার চল্‌তে লাগ্‌ল। এইভাবে দুজনে এগোতে লাগ্‌ল।

শেষ পর্য্যন্ত তারা বোর্ডিংয়ের কাছে এসে হাজির হল। তখন প্রাণধনের ভাব্‌না হল, ওকে রাখা যায় কোথায়। গোয়াল ত নেই,—হ্যাঁ, ঘরেই রাখা যাবে। একটা রাতই ত, আর ওর ঘরও নীচে।

আস্তে দরজা খুলে সে গরুটাকে ঘরের মধ্যে ঠেলে দিল।

দরজা ভেজিয়ে, বাতি জ্বেলে সে এসে দেখ্‌ল গরুটা দাঁড়িয়ে তার বালিশের একটা কোণ চিবোচ্চে।

"আরে ছাখ্‌ ছাখ্‌, হালায় করে কি? ক্ষুধা পাইছে না কি? র', র',—খারা।"

ঘরের কোণা থেকে বাল্‌তী এনে জল ভরে সে গরুটার মুখের কাছে রাখ্‌ল। তার পর বেরিয়ে গোটাকত ডালপালা ভেঙ্গে এনে গরুটার সাম্‌নে ধরে দিল।

একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানার উপর বসে প্রাণধন বল্‌ল,—"খা, খা।"

গরুটা বাল্‌তীর মধ্যে নাক ডুবিয়ে, ডালপালা ক'খানা মুখে নিয়ে, পরম পরিতুষ্ট হয়ে হাম্বা হাম্বা রব করে উঠ্‌ল।

"আরে, করস্‌ কি? হালার মাথা মোটা গরু—চুপ্‌ কর্‌—"



পাশের ঘরের ছাত্রটি দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠ্‌ল।

প্রাণধন বল্‌ল,—"কে ও—চন্দ্রমোহন! ডরাইস্‌ না—ওটা গরু।"

"মাথা খারাপ হয়েচে নাকি প্রাণধন? দুপুর রাতে, ঘরের মধ্যে——"

"জিত্‌ছি। প্রদর্শনীতে। খা, খা!"

"কিন্তু ঘরের ভেতর ত রাখা চল্‌বে না। যদি সার্‌ জানতে পারেন——"

"আরে থো! কাউলকা বেয়ান পর্য্যন্ত ত! একটা বন্দোবস্ত তাইবই অইব!"

হাম্বা——হাম্বা——হাম্বা!

চন্দ্রমোহন বল্‌ল,—"সার জাগবেই। তখন তোকে না বার করে দিয়েচে ত কি বলেচি।"

প্রাণধন বিপন্ন বোধ করছিল। বল্‌ল, "করম কি ক'?"

চন্দ্রমোহন বল্‌ল, 'মেরে ফ্যাল্‌, কাল কসাইদের কাছে বেচে দিস্‌।'

ওর চেয়ে ভালো পরামর্শ ও-বয়সের ছেলের কাছ থেকে আশা করা যায় না। গরুটা ডালপালা শেষ করে প্রাণধনের ব্যাকরণ কৌমুদীখানা খাচ্চিল। প্রাণধনের চোখ পড়েনি। সে বল্‌ল, "আরে রাম রাম! হিন্দুর পোলা, গো-অত্যা করুম্‌—তুই কস্‌ কি রে চন্দর?"

কিন্তু বইয়ের দিকে চোখ পড়তেই প্রাণধন গরুর মুখে একটা চড় দিয়ে বই কেড়ে নিল। নিয়ে বল্‌ল——"ছুরি আছে?"

শব্দরূপ শেষ করে গরুটা সবে ণিজন্ত প্রকরণে এসে পৌঁছেছিল—বই কেড়ে নেওয়া তার মনঃপূত হল না। সে আবার তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—হাম্বা, হাম্বা!

প্রাণধন কিছু বলবার আগেই দরজা খুলে গেল। দুজনে সভয়ে দেখ্‌ল, দরজার গোড়ায় সুপারিণ্টেডেণ্ট দাঁড়িয়ে।

তিনি বল্‌লেন,—বেরোও এখ্‌খুনি। গরু বিদেয় কর, না হলে দুজনেই বেরিয়ে যাও।

প্রাণধন বল্‌ল,—"সার্—শুনেন—"

"কিচ্ছু শোনবার দরকার নেই। কালকেই তোমার বাবার কাছে চিঠি যাবে।"

চন্দ্রমোহন বল্‌ল—'আমি তখুনি বলেছিলাম—"

—তিন—

অন্ধকার রাত। আবার গরুর দড়ি ধরে প্রাণধন রাস্তায়।

চল্‌তে চল্‌তে সহরের সীমা ছেড়ে জেলখানার মাঠের দিকে পৌঁছে প্রাণধনের অত্যন্ত ঘুম পেতে লাগ্‌ল। একজিবিসনের জায়গা ছাড়িয়ে আর কিছু দূর এগিয়ে, প্রাণধন ঠিক করল, আর পারা যায় না। ঘুমোতেই হবে।

সে গরুর দড়ি নিজের কোমরে বেঁধে রাস্তার ধারে কাৎ হল। সঙ্গে সঙ্গেই গাঢ় ঘুমে তার চোখ আচ্ছন্ন হয়ে এল।

কখন সকাল হয়েচে তার খেয়াল নেই।

ঘুম ভাঙ্‌ল মানুষের গলার আওয়াজে।

"ও মশাই, শুন্‌চেন?"

তাকিয়ে দেখ্‌ল একজন ভদ্রগোছের লোক। লোকটি বল্‌ল,—"বেশ মানুষ ত মশাই! নিজের কোমরে দড়ি দিয়ে গাছের সাথে বেঁধে ঘুমোচ্চেন! রাত্তিরে পরীর দৃষ্টি হয় টয় নাকি—উড়ে যাবার ভয় আছে?"

গাছ? প্রাণধন এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে দেখ্‌ল, দড়ির ওদিকের খুঁটটা একটা গাছের গুঁড়ির সাথে বাঁধাই ত' বটে!

সে ফুঁপিয়ে উঠ্‌ল—"আমার গরু! রাহাজানী কর্‌ছে!—আমার ভাগলপুরী গরু!"

* * * * *

দারোগা চটে বল্‌লেন, "মশাই, শুধু 'গরু' আর রাহাজানী' করে মাথা কুট্‌ছেন, বলি গরুর গায়ের কোন চিহ্ন টিহ্ন বল্‌তে পারেন? কি রং?"



"রং,—তা বাদামীও কইতে পারেন, কালাও কইতে পারেন। ধলা দাগও ছিল।"

"দাগ? কোথায়?"

"চক্ষুডার মধ্যে বোধ করি! না—না, ঠিক শিঙ্গার নীচে।"

দারোগা বল্‌লেন—'মশাই, এ চুরীর তদন্ত আমি করতে পারব না। এ সহরে অমন হাজার হাজার গরু আছে। আপনার নিজেরই একটু মাথার গোলমাল হয়েচে—আপনি চিকিৎসা করান।"

প্রাণধন অত্যন্ত বিষণ্ণ-বদনে, উস্কখুস্ক ভাবে বোর্ডিংয়ে ফির্‌ল।

তার কি শাস্তি হল, স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিল কিনা, সে সব এ গল্পের বিষয় নয়। তবে এটুকু বলা ভালো যে, দিনের মধ্যেই হরিশের সাথে আবার মেলামেশা হয়ে গেল। গোঁয়ার-গোবিন্দ বাঙাল প্রাণধন দিনটা অত্যন্ত মন-মরা হয়ে কাটাল।

সন্ধ্যের সময় চন্দ্রমোহন একটা হ্যাণ্ডবিল হাতে করে ঘরে ঢুক্‌ল। তাতে একজিবিসনের অন্যান্য বর্ণনার সাথে ছিল,—

——বিরাট্ ভাগ্য পরীক্ষা——

——অদ্য আবার——লটারী! লটারী!——

প্রথম পুরস্কার—ভাগলপুরী গরু ইত্যাদি।

---

# আশীর্ব্বাদ

(শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ কবিভূষণ)

মানে হও আশুতোষ, চিত্ত সম যশে,
ঔদার্য্যে আচার্য্য রায়, রবি সম রসে।
দুখীর কুটীর ঘেরি রচ স্বর্গ লোক,
নবীন জীবন তব মধুময় হোক্।

দেশ-ব্রত পথে হও সদা আগুয়ান,
রেখে যাও এ' ধরায় সুযশ মহান্।
উজ্জ্বল ভবিষ্য পানে রাখ দীপ্ত চোখ্,
তরুণ জীবন তব জয়যুক্ত হোক্।

---

# ভয়ঙ্কর

( শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র )

সত্যেন বাবুর শেষ জীবনে আমিই তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিলাম। এই বিশালকায় বৃদ্ধের জীবন সাধারণ বাঙ্গালীর জীবনের চেয়ে যে অনেক বেশী বৈচিত্র্যময়, তাও জানবার সুযোগ আমার হয়েছিল।

মধুপুরের তাঁর ছোট্ট নির্জ্জন বাংলো বাড়ীর বারান্দায় বসে সন্ধ্যার পর তিনি ধীরে ধীরে তাঁর পূর্ব্ব জীবনের অনেক কাহিনীই আমায় বলেছিলেন। সে সমস্ত কাহিনী নিয়ে চমৎকার একটা বই লেখা হ'তে পারে। তাঁকে কত বার সেকথা বলেছি। তিনি একটু ম্লান হেসে খানিক চুপ করে থেকে বলতেন, "কিন্তু লোকে বল্‌বে গল্প।"

তাঁর নিজের জীবনের সত্য অভিজ্ঞতাগুলিকে কেউ গল্প বলবে এ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। সেই ভয়েই বোধ হয় তাঁর জীবনের সব চেয়ে বিস্ময়কর কাহিনীটি তিনি আমার কাছেও গোপন করেছিলেন। সাধারণ মানুষের সবজান্তা ভাবকে তিনি সব চেয়ে ভয় ও ঘৃণা করতেন। কতবার তিনি আমার কাছে বলেছেন—সব চেয়ে মজার কথা এই যে এত বড় বিস্ময়ের জগতে বাস করেও মানুষ অন্ধ হবার বড়াই করে। তার ছোট্ট জগতের যেটুকু সে জানে তার বাইরেও যে কিছু থাকতে পারে, এ তাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেও সে বিশ্বাস করবে না। তার পর প্রায়ই দেখতাম কি যেন একটা কথা বলতে গিয়েও তিনি অনেক কষ্টে নিজেকে দমন করতেন। আমার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও স্নেহ থাকা সত্ত্বেও আমিও হয়ত তাঁকে অবিশ্বাস করতে পারি, এই সন্দেহ তাঁর যায় নি। তাই তাঁর জীবনের সব চেয়ে বিস্ময়কর ঘটনার কথা আমি জানতে পারলাম তাঁর মৃত্যুর পরে।

নীচের কাহিনীটি তাঁর নিজের হাতে লেখা। যৌবনে তিনি যখন সায়ামের জঙ্গল জমা নিয়ে কাঠের কারবার করতেন, ঘটনাটি তখনই ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কাগজ পত্রের ভেতর যেভাবে, ও যে ভাষায় কাহিনীটি পাই, সেই ভাব ও ভাষা বরাবর বজায় রেখে কাহিনীটি প্রকাশ করলাম। বিশ্বাস অবিশ্বাসের ভার এখন পাঠকের ওপর। তবে পৃথিবীর আর কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক, শেষ পর্য্যন্ত সেই বিশালকায় ও বিশালহৃদয় বৃদ্ধের সরলতায় আমার বিশ্বাস অটুট থাক্‌বে।



## সত্যেন বাবুর কাহিনী

রাত অনেক হয়েছে। পাম্প-করা কেরোসিনের উজ্জ্বল আলোটা মাঝখানে রেখে কেবিনের ভেতর দুধারে দুই ইজি-চেয়ারে আমি আর ডাক্তার বাবু বসে আছি।

কেবিনের ভেতর বসে এই গভীর রাত্রেও বাইরের অরণ্যকে ভোলবার উপায় নেই। দূরে কোথা থেকে হায়নার লোমহর্ষণ হাসি শোনা যাচ্ছে। বিকট সে শব্দ! হায়না জানোয়ারটি যে খুব ভীষণ তা নয়, কিন্তু শয়তানের অট্টহাসির মত তার এই ডাকে বুকের ভেতরটা পর্য্যন্ত শিউরে ওঠে।

কেবিনের ভেতর সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত যথা সম্ভব আছে। আমাদের সবচেয়ে নিকটের লোকালয় যে একশ মাইল দূরে, এবং এই একশ মাইলের ভেতর নিরবচ্ছিন্ন শ্বাপদ-সঙ্কুল দুর্গম জঙ্গল ছাড়া আর কিছু যে নেই, এই কেবিনের ভেতর বসে সে কথা মনে না হবারই কথা। কিন্তু ওই হায়নার ডাক সে কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

ডাক্তার বাবু গড়গড়ায় আর একবার টান দিয়ে একটু নড়ে চড়ে বসলেন। কাঠুরেদের তাঁবুতে হঠাৎ এক রকম জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখেই তাঁকে সুদূর ব্যাঙ্কক্ থেকে আনান হয়েছে। অনেক ফি দেবার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও কোন ডাক্তারকে প্রথমতঃ এই বিপদসঙ্কুল বনের ভেতর আসতে রাজী করান যায়নি। শীকারপ্রিয় বলে ইনি নিজে থেকেই আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। আজ সকালে চারজন অনুচর ও তিনজন মাঝি নিয়ে তিনি নদীপথে এসে পৌঁছেছেন।

হায়নার ডাক থামতে না থামতেই আমাদের কাঠুরেদের তাঁবুতে হট্টগোল উঠল। এমন রোজই প্রায় ওঠে। বোধ হয় ছাগলের খোঁয়াড়ে চিতা পড়েছে। কাঠুরেদের সোরগোলেই বোধ হয় চিতা বেচারীকে ছাগমাংসের আশা ত্যাগ করে পলায়ন করতে হ'ল। কিছুক্ষণ বাদেই আবার সব নিস্তব্ধ। অরণ্যের এ নিস্তব্ধতাও ভয়ঙ্কর।

কেরোসিন গ্যাসের উজ্জ্বল আলোয় আকৃষ্ট হয়ে নানা জাতের পোকা-মাকড় ঘরে এসে জুটেছে। কেবিনের দেওয়ালে একটি টিকটিকি তাদের সদ্ব্যবহার করতে ব্যস্ত। সেই দিকে চেয়ে ডাক্তার বাবু বল্লেন,—"আচ্ছা আপনি ত এই জঙ্গলে অনেক দিন বাস করছেন! কেমন না?"

"হ্যাঁ, তা প্রায় বছর তিনেক হবে।"

"এর ভেতর কোন আশ্চর্য্য ঘটনা আপনার চোখে পড়ে নি?"

"আশ্চর্য্য ত অনেক ঘটনাকেই বলা যেতে পারে। আপনি কি রকম ঘটনার কথা জানতে চাইছেন ?"

"এই ধরুন, নতুন কোন রকম জানোয়ার! এ জঙ্গলে ত সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত আপনি ছাড়া কোন মানুষ প্রবেশ করেছে কিনা সন্দেহ। কত রকম রহস্যই ত এ জঙ্গলে গোপন থাকতে পারে।"

হেসে বল্লাম, "তা পারে, কিন্তু আমার চোখেত পড়ে নি। আর বছর একটা শাদা বাঘ মেরেছিলাম। কিন্তু সাদা বাঘ ত নানা জায়গাতেই দেখা যায়। তা ছাড়া বিশেষ নতুন কিছু দেখি নি। সেই পুরোন বাঘ, হাতী, অজগর, চিতা আর বুনো মোষ!…"

ডাক্তার বাবুও আমার কথার ধরণে হেসে ফেলে "বল্লেন, কিন্তু এই অরণ্যে অনেক মানুষের অজ্ঞাত রহস্য গোপন থাকতে পারে এ কথাও কি আপনি মানেন না ?"

"তা মানি বই কি!"

ডাক্তার বাবু আবার বল্লেন, "ওই টিকটিকিটার দিকেই চেয়ে দেখুন না! সাধারণ যেসব টিকটিকি দেখেছি তা থেকে একটু তফাৎ নয় কি ?"

সত্যই টিকটিকিটা একটু ভিন্ন রকমের, পিঠের কাছে যেন তার একটা কুঁজ আছে বলে মনে হ'ল।

বল্লাম—"এটা হয়ত একটা বিশেষ জাতের টিকটিকি! তাই বলে একে রহস্যময় জানোয়ার ত আর বলা যায় না!"

ডাক্তার বাবু বল্লেন, "না!"

তারপর টেবিল থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে টিকটিকিটার দিকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন, "আচ্ছা ঘা খেলে সব জাতের টিকটিকিরই ত লেজ খসে যায়। দেখা যাক্ এটারও যায় কিনা।"

কথা শেষ করবার পূর্ব্বেই তিনি ছুরিটা ছুঁড়ে মারলেন। দুঃখের বিষয় লেজে না লেগে ছুরির ফলাটা টিকটিকিটার গলার কাছ দিয়ে তার সামনের ডান পায়ের থাবার ওপর গিয়ে পড়ল। টিকটিকিটা দেয়াল থেকে মেজেয় চিৎ হয়ে পড়ল। ভাবলাম বেচারী বুঝি মারাই গেল।

ডাক্তার বাবু তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে একটা কাগজের ওপর তুলে নিলেন। দেখা গেল চোট্‌টা থাবাতেই বেশী লেগেছে। তিনটে আঙ্গুল কাটা গেছে। গলার কাটাটা সামান্য।



বল্লাম "মরে গেছে নাকি!"

"না, বড় কড়া জান্ এ জাতের! সহজে মরবার নয়। একটু অজ্ঞান হয়েছে মাত্র!"

ডাক্তার বাবুর কথা শেষ হতে না হতেই টিকটিকিটা ধড় মড় করে যেন জেগে উঠে, এক লাফে কাগজের ওপর থেকে নীচে পড়ে, কেবিনের তলার একটা ফাটল দিয়ে বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বল্লাম, "আপনার রহস্যময় জানোয়ার যে পালাল!"

ডাক্তার বাবু হাসলেন।

কত বড় ভয়ঙ্কর রহস্য আমাদের জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছে তখন যদি জানতাম।

তার পর তিন চার দিন কেটে গেছে।

ডাক্তার বাবুর ওষুধে অধিকাংশ রুগ্ন কাঠুরে ভালো হয়ে উঠেছে। ডাক্তার বাবুর থাকবার আর বিশেষ প্রয়োজন নেই, শুধু শীকারের আশা ছেড়ে তিনি যেতে পারছেন না। একজন কাঠুরে খবর দিয়েছে যে নদীর ধারে একটা উঁচু গাছের ওপর থেকে সে ওপারে এক পাল বুনো হাতী দেখেছে। তারা এই দিকেই নাকি আসছে। বুনো হাতী মারবার লোভে ডাক্তার বাবু আর কয়েক দিন যাওয়া স্থগিত করেছেন।

এক দিনের ভেতর উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নি। আমাদের চীনে রাঁধুনি একদিন অন্ধকারে কি একটা জানোয়ার দেখে চীৎকার করে উঠেছিল। কিন্তু সে সাধারণতঃই ভয়-কাতুরে। জানোয়ারের যে ভয়ঙ্কর বর্ণনা সে দিয়েছে তাতে কেউ বিশ্বাস করে নি। করা শক্ত। কারণ, একাধারে বাঘ, অজগর, কুমীর ও হাতীর সমাবেশ একটি প্রাণীতে হওয়া সম্ভব নয়।

সকাল বেলা কেবিনের সামনে পায়চারি করছিলাম। এক ভেলা-বোঝাই কাঠ আগের সন্ধ্যায় নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। নদীর প্রবল স্রোতে সে ভেলা এতক্ষণ নিশ্চয়ই বহুদূর চলে গেছে। মনটা হাল্কা বোধ হচ্ছিল। ডাক্তার বাবু তাঁর রাইফ্‌ল্‌টা পরিষ্কার করছিলেন।

হঠাৎ উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে ছুট্‌তে আমাদের চীনে রাঁধুনি এসে হাজির।

প্রথমে সেত' কথা কইতেই পারে না। খালি হাঁফায়। অনেকক্ষণ বাদে দম নিয়ে অসংলগ্ন ভাবে যা বল্লে তার অর্থ এই যে, আমাদের ছাগলের খোঁয়াড় ভেঙ্গে সবকটি ছাগল কিসে খেয়ে গেছে। আজ সকালে ডাক্তার বাবুর জন্যে ভাল করে একটু মাংস রাঁধবে বলে

সে একটা ছাগল কাটতে গিয়ে দেখে ছাগলের খোঁয়াড়ের দরজা ভাঙ্গা। ভেতরে খালি কটি হাড় আর মাংসের টুকরা ছাড়া অতগুলো জানোয়ারের কিছু অবশিষ্ট নেই।

সত্যিই ভয়ঙ্কর সংবাদ। ছাগলের খোঁয়াড়ে চিতাবাঘ আগে পড়েছে বটে কিন্তু দরজা ভেঙ্গে এর আগে কোন বাঘ ঢুক্‌তে পারে নি। খোঁয়াড়ের দরজা বেশ মজবুত—চিতাবাঘ দূরের কথা কেঁদো বাঘেরও সাধ্য নেই যে সে দরজা ভেঙ্গে ঢোকে! এর আগে ছুট্‌কো ছুটো একটা ছাগল বাঘে নিয়ে গেছে। কিন্তু এমন সর্ব্বনাশ কখনো হয় নি।

তাড়াতাড়ি তার সঙ্গে খোঁয়াড়ে গিয়ে দেখি তার কথা মিথ্যে নয়।

ডাক্তার বাবু দরজাটা পরীক্ষা করে বল্‌লেন, যে বাইরে থেকে যে জানোয়ার ঠেলে দরজা ভেঙ্গেছে তার গায়ে অসীম ক্ষমতা! কারণ লোহার মজবুত কব্জা ভেঙ্গে দুম্‌ড়ে গেছে।

সত্যি অবাক্ হয়ে গেছ্‌লাম। এত জোর কোন জানোয়ারের হতে পারে? বাঘ ত নয়ই, কারণ যদি বা অসম্ভব বলশালী কোন বাঘের দ্বারা দরজা ভাঙ্গা সম্ভবও হত, তা হলেও একটার বেশী দুটো সে খেয়ে উঠ্‌তে পারত না। অন্যগুলো মেরে হয়ত যেত। কিন্তু এ যে সব সাবাড়! আর এ রকম দরজা ভাঙ্গতে পারে বটে হাতী, কিন্তু হাতী ত আর ছাগল খায় না!

আমাদের হতভম্ব ভাব দেখে চীনে রাঁধুনি অনেকক্ষণ বাদে সাহস করে বল্লে, "আপনারা সেদিন ঠাট্টা করলেন বাবু। আমি কি আর অমনি ভয় পেয়েছিলাম! এ সেই সয়তান জানোয়ারের কাজ!"

আজ আর তাকে যেন ঠাট্টা করতে পারলাম না। ডাক্তার বাবুর দিকে ফিরে বল্লাম, "মেঘ না চাইতেই জল এল নাকি! রহস্যময় জানোয়ারের কথা বলতে না বলতেই যে এসে হাজির!"

ডাক্তার বাবু মাটির ওপর ঝুঁকে পড়ে কি পরীক্ষা করছিলেন। কথা কইলেন না।

তার পর থেকে আমাদের বিপদের দিন সুরু হ'ল। কাঠুরেদের ভেতর কি যে ভয় ঢুকে গেল; সন্ধ্যে হবার দু ঘণ্টা আগে থাকতে তারা কাজ টাজ ছেড়ে ঘরে গিয়ে ঢোকে। কার সাধ্য তাদের তখন কাজ করায়! আমরা নিজেরাও যে ভয় পাই নি এমন নয়। তবে মুখে সাহস না দেখালে চলে না। সারা রাত পালা করে আমি আর ডাক্তার বাবু বন্দুক ধরে পাহারা দিই। খোঁয়াড়ের দরজা যে জানোয়ার অনায়াসে ভেঙ্গে ফেলতে পারে, আমাদের কাঠের কেবিনের দেয়াল সে যে ভেঙ্গে ঢুক্‌বে এ আর কি এমন আশ্চর্য্যের কথা!



দুদিন বেশ ধীরে সুস্থে কেটে গেল। একজন কাঠুরে এসে খবর দিলে যে বুনো হাতীর দল নদী পার হয়ে আমাদের বনে এসেছে। ডাক্তার বাবু ও আমি সারাদিন হাতী মারবার সাজ-সরঞ্জাম করে প্রস্তুত হলাম। তার পর দিন সকালেই বেরোন হবে ঠিক হল।

সর্ব্বনাশ ঘট্‌ল ঠিক সেই রাত্রে।

রাত তখন প্রায় একটা হবে। হঠাৎ কাঠুরেদের তাঁবুগুলো থেকে ভীষণ সোরগোল উঠ্‌ল। অভ্যাস মত প্রথমেই মনে হল ছাগলের খোঁয়াড়ে বুঝি বাঘ পড়েছে। তার পরেই মনে পড়ল ছাগলের খোঁয়াড় ত আর নেই। তা ছাড়া এ ত বাঘ তাড়াবার শব্দ নয়, এ যে মানুষের ভীত আর্ত্তনাদ! কাঠুরেদের তাঁবুগুলোর চারি ধারে বড় বড় গাছের গুড়ির উঁচু বেড়া; সে বেড়া ডিঙ্গিয়ে বাঘও ত ঢুকতে পারে না। বাঘের অত সাহসও সাধারণতঃ হয় না। তবে ব্যাপারটা কি!

তাড়াতাড়ি আমাদের চাকর বাকর গুলোকে গোটা কতক মশাল জ্বালবার হুকুম দিয়ে টর্চ্চলাইট ও বন্দুক নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। কাঠুরেদের আর্ত্তনাদ ক্রমেই বাড়ছে।

কিন্তু বেশী দূর এগুতে না এগুতেই জন পঁচিশ কাঠুরে প্রাণভয়ে পাগলের মত হয়ে আমাদের পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ল। ভয়ে তাদের গলা পর্য্যন্ত বুজে গেছে। চোখ কপালে উঠেছে। মুখে জল টল দিতে দু এক জনের জ্ঞান একটু ফিরে এল। কিন্তু তারা যা বল্লে তার স্পষ্ট কোন মানে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ঘুট ঘুটে অন্ধকারের রাত। এক হাত দূরের জিনিষ দেখা যায় না। হঠাৎ মাঝরাতে নাকি তারা চমকে জেগে উঠে শোনে, বাইরের কাঠের বেড়া মড় মড় করে কিসের ধাক্কায় ভেঙ্গে যাচ্ছে। তার পর কি যে হল, কে যে কোথায় গেল, কিছুই তারা বলতে পারে না। হঠাৎ যেন তাদের মনে হ'ল প্রলয় সুরু হয়েছে। তাঁবু, কাঠের ঘর, সব ভেঙ্গে পড়তে লাগল কিসের চাপে! তারি ভেতর কিসে যেন ধরেছে এমনি ভাবে অনেক কাঠুরে নানা জায়গা থেকে চীৎকার করতে লাগল। তারা ক'জন কি ভাবে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে তারা নিজেরাই জানে না। তাদের এক জনের শুধু হাত ভেঙ্গে গেছে। সে বল্লে ঠাণ্ডা একটা একশ-মণি পাথর যেন তাঁবুর ওপরকার ছাদ ফুঁড়ে তার হাতের ওপর পড়ল। শোলার মত হাতটা তৎক্ষণাৎ মুড় মুড়িয়ে ভেঙ্গে গেল। সে ভাঙ্গা হাতটা নিয়েই সে কোন রকমে পালিয়ে এসেছে। তাদের কথা থেকে কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক্ হয়ে বল্লাম, "কি ব্যাপার ডাক্তার বাবু! বুনো হাতীর দলই চড়াও হয়ে এল নাকি!"

"তাই হবে" বলে ডাক্তার বাবু সেই দিকে বন্দুক তুলে ছোড়বার উদ্যোগ করতেই বল্লাম—"ওকি করছেন! কাঠুরেদের গায়েও যে লাগতে পারে!"

"তাইত" বলে বন্দুকের মুখ আকাশের দিকে তুলে কয়েক বার আওয়াজ করলেন। তার পর আমায় বল্লেন,—"আসুন দেখি।"

মশালের আলোয় পথ দেখে দেখে যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছোলাম তখন সব প্রায় আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। কাঠের বেড়া, তাঁবু ইত্যাদি সব ছারখার হয়ে সে জায়গার যে অবস্থা হয়েছে তাতে ভেতরে ঢোকে কার সাধ্য!

প্রায় একশ জন কাঠুরের ভেতর মাত্র জন পঁচিশ পালিয়ে এসেছে। বাকী সকলের পরিণাম কি হয়েছে ভাব্‌তে ভাব্‌তে ভেতরে গিয়ে যা দেখলাম সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য জীবনে ভোলবার নয়। মশালের আলোয় দেখা গেল, চারিদিকে রক্ত আর রক্ত! কোথাও একটা কাটা কাটা হাত কোথাও পা। পঁচাত্তর জন কাঠুরেকে এমনি করে কোন ভয়ঙ্কর মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে।

সভয়ে বল্লাম—"একি বুনো হাতীর পালের কাজ ডাক্তার বাবু?"

"দেখা যাক্" বলে ডাক্তার বাবু কি যেন ভাব্‌তে লাগলেন।

পরের দিন সকাল হতে না হতেই ডাক্তার বাবু বল্লেন—"বুনো হাতীর পেছনে ধাওয়া করতে হবে।"

যে জন পঁচিশ কাঠুরে বেঁচেছিল তারা কি আর সঙ্গে যেতে চায়? অনেক রকম অনুনয় বিনয় করে, ও শেষে ভয় পর্য্যন্ত দেখিয়ে, তাদের রাজী করা হ'ল। আমাদের কেবিনের উত্তর দিকের জঙ্গলে বুনো হাতীর দল চর্‌ছে বলে সংবাদ পাওয়া গেল। সে জঙ্গলটা বিশেষ ঘন নয়। শুধু মাঝে মাঝে পাহাড়ের মত উঁচু গাছের সার। দুপুর নাগাদ আমরা হাতীর পালের সন্ধান পেলাম। বিরাট্ জঙ্গলের ভেতর ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে হাতীর পাল চরে বেড়াচ্ছে। কি ভীষণ তাদের চেহারা। দেখলেই ভয় করে।

হাতীর পালের সন্ধান পেয়েই কিন্তু ডাক্তার বাবু কেমন যেন অদ্ভুত ব্যবহার দেখাতে লাগলেন। বুনো হাতী মারবার নিয়ম হচ্ছে হাতীর পালের পেছু পেছু থেকে একটা ছট্‌কানো হাতী বাছাই করে তার কাণে বা বুকে অব্যর্থ লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া। কিন্তু ডাক্তার বাবু আমাদের সকলকে একটা করে খুব উঁচু ও মজবুত গাছ দেখে একেবারে ডগায় চড়ে বসতে বললেন। শুধু তাই নয়, বল্লেন গাছের ডালের সঙ্গে বেশ করে নিজেদের বেঁধে রাখ্‌তে ও



তিনি আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত একদম গুলি না ছুড়তে! এরকম অদ্ভুত প্রস্তাবের কোন মানে খুঁজে না পেলেও তাঁর কথা আমরা অগ্রাহ্য করলাম না।

গাছে চড়ে, বসে আছি ত বসেই আছি। কিছুই আর হয় না। পায়ের তলায় আমাদেরই গাছের নীচে হাতীর পাল চরছে। নীচের ডাল পালা ভেঙ্গে খাচ্ছে। ডাক্তার বাবু একবার তাঁর গাছ থেকে চেঁচিয়ে বল্লেন—"সব ভাল করে নিজেদের গাছের সঙ্গে বেঁধেছ ত!" তারপর আবার সব চুপচাপ। বসে বসে শেষে ডাক্তার বাবুর পাগলামিতে বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছি এমন সময় ডাক্তার বাবু সোল্লাসে উত্তরের দিকে হাত দেখিয়ে চীৎকার করে উঠলেন—টির‍্যানোসোরাস্। টির‍্যানোসোরাস!

গাছের ওপর থেকে জঙ্গলের বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। ডাক্তার বাবুর চীৎকারে অবাক্ হয়ে তাঁর নির্দ্দেশ মত উত্তর দিকে চেয়ে দেখ্‌বামাত্র ভয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। হাত পা সব তখন শিথিল। বাঁধা না থাকলে সত্যিই গাছ থেকে পড়ে যেতুম। উত্তরের জঙ্গল থেকে যে জানোয়ারটি বেরিয়ে আস্‌ছে, চোখে না দেখ্‌লে তার আকার ও ভীষণতা কল্পনা করা অসম্ভব। প্রথম মনে হল হয়ত স্বপ্ন দেখছি। পাহাড় কি চলতে পারে? কিন্তু স্বপ্ন নয়! পাহাড়ের মতই বিশাল তার চেহারা! সেই পাহাড়ের মত বিরাট্ দেহ থেকে যে দীর্ঘ গলাটি বেরিয়ে এসেছে, পৃথিবীর কোন জিনিষের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। সবচেয়ে বীভৎস বিকট তার দাঁতালো মুখ। সে মুখ থেকে ক্ষণে ক্ষণে আগুনের মত লাল একটা বিরাট্ জিভ্ লক্ লক্ করে বেরিয়ে আসছে।

ডাক্তার বাবুর চীৎকার স্মরণ হ'ল।—টির‍্যানোসোরাস! এই কি তবে পৃথিবীর আদিম যুগের সেই বিশালকায় সরীসৃপ? বুনো হাতীর পাল তখন ভয়ে ক্ষেপে উঠেছে। কোন্ দিকে যে কে পালাবে তার ঠিক নেই! এই বিশালকায় টির‍্যানোসোরাসের কাছে হাতী-গুলোকেও যেন ইঁদুরের মত দেখাচ্ছিল। ইঁদুরের মতই এক একটা হাতীকে সে থাবার এক চাপে বা লেজের এক ঝটকায় মেরে ফেলছিল। এ অসম্ভব দৃশ্য কল্পনাও বুঝি করা যায় না! ভীত হাতীর পাল প্রাণপণে পালাবার চেষ্টা করলে কি হবে? হাতীর পাল পঞ্চাশ পা দৌড়োলে টির‍্যানোসোরাস এক পা বাড়িয়ে তাদের ধরে ফেলে। দেখতে দেখতে সেই ভয়ঙ্কর জানোয়ার আমাদের কাছে এসে পড়ল। ভয়ে আমি চোখ না বুজে পারলাম না। শুনলাম, ডাক্তার বাবু চীৎকার করে বল্‌ছেন—"খবরদার, আমার আগে কেউ গুলি ছুড়োনা!"

তার পরই ডাক্তার বাবুর গাছ থেকে দড়াম দড়াম করে দুবার শব্দ!

চোখ খুলে যা দেখলাম, তা মনে করলে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়। ডাক্তার বাবুর গুলি খেয়ে উত্যক্ত হয়ে জানোয়ারটা পেছনের দু'পায়ে ভর করে ডাক্তার বাবুর গাছ ধরে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার মাথা গাছের ডগার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেছে। ডাক্তার বাবুকে ধরে আর কি! উন্মাদের মত হয়ে তার ওপর গুলি ছুড়লাম। লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হবার কথা নয়। অন্যান্য গাছ থেকেও তার গায়ে গুলি এসে পড়তে লাগল। কিন্তু তার যেন ভ্রূক্ষেপও নেই। শুধু ডাক্তার বাবুকে ধরাই তার লক্ষ্য। আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম, এত বড় বিপদেও অবিচলিত হয়ে ডাক্তার বাবু জানোয়ারটার মাথার দিকে বন্দুক লক্ষ্য করে ধরেছেন। টির‍্যানোসোরাসের লকলকে জিভটা একবার বেরিয়ে ডাক্তার বাবুকে স্পর্শ করল, তার পরেই গুড়ুম গুড়ুম দুবার আওয়াজ! আর কিছু প্রয়োজন হল না। কাটা গাছের মত জানোয়ারটার বিশাল গলা যেন ভেঙ্গে লুটিয়ে পড়ল। সে বিশাল দেহ একটু বুঝি নড়ে উঠল, তার পরে কাৎ হয়ে স্থির হয়ে গেল।

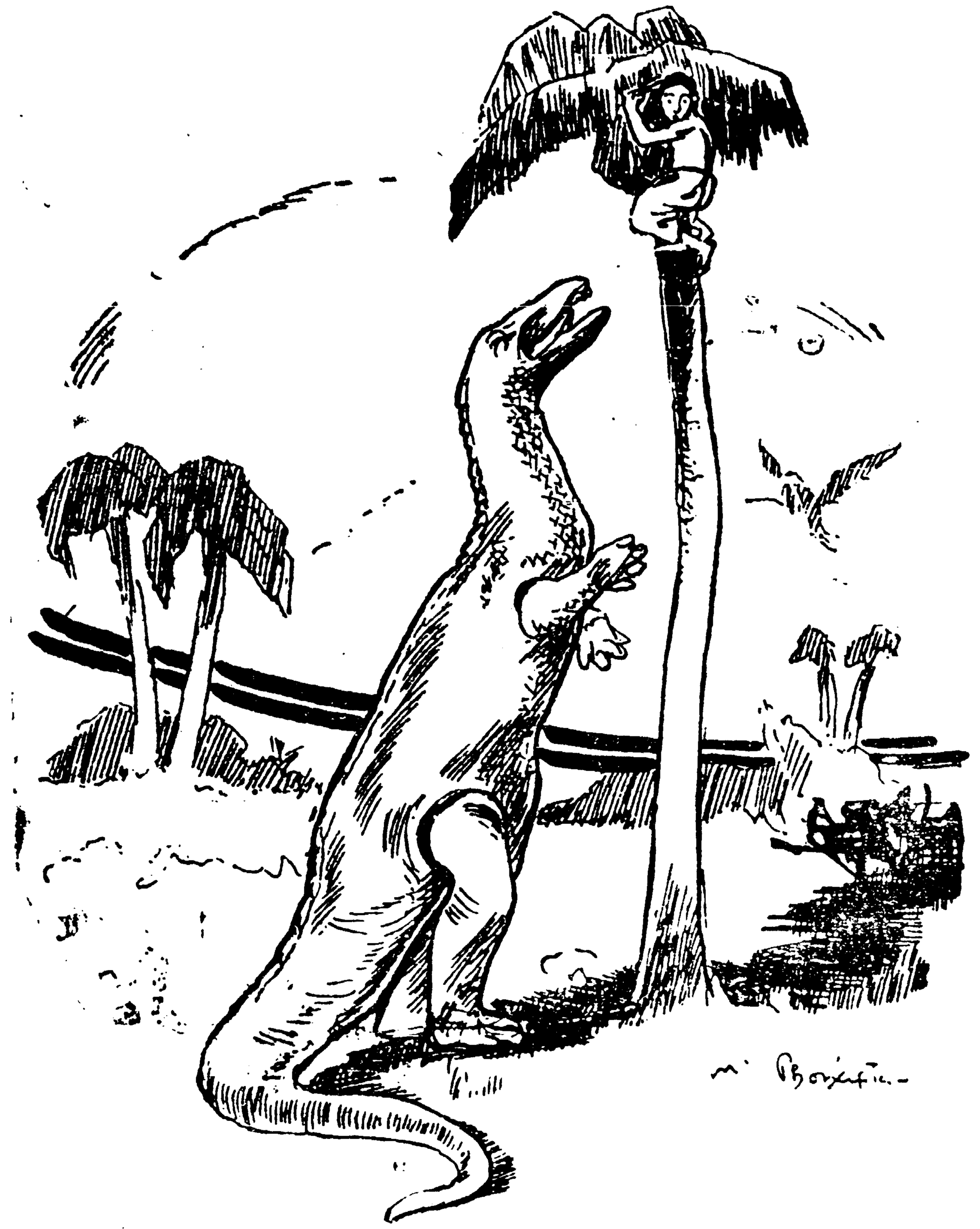
বিশালকায় জীব দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে

ডাক্তার বাবু গাছ থেকে নেমে এলেন। আমরা তখনও সভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছি। হেসে বল্লেন—"একেবারে দুচোখের ভেতর দিয়ে গুলি মগজে বিঁধেছে! আর ভয় নেই!"

সেই বিরাট্ লাশটার পাশে দাঁড়িয়েও যেন ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ডাক্তার বাবু বল্লেন—"কাঠুরেদের তাঁবু আক্রমণের দিন থেকেই আমার এ রকম সন্দেহ হয়েছিল! তাই তোমাদের কিছু না জানিয়ে গাছে উঠিয়ে ছিলাম। ওই শক্ত কাঠের বেড়া



ভেঙ্গে যে জানোয়ার অনায়াসে খাদ্যের লোভে ঢুক্‌তে পারে, হাতীর পালও সে যে আক্রমণ করবে এ আমি জানতাম। তবে সে জানোয়ার যে টির‍্যানোসোরাস হবে তা ভাবি নি। পৃথিবীতে বিস্ময়ের বস্তু এখনও আছে!"

কিন্তু বিস্ময়ের তখনও বাকী ছিল!—টির‍্যানোসোরাসের লাশটার দিকে চাইতে চাইতে হঠাৎ অস্ফুট চীৎকার করে ডাক্তার বাবু বল্লেন—"এ কি! ডান থাবায় মাত্র দুটি নখ!"

সত্যিই ত! আর সব পায়ে পাঁচটা করে নখ থাকলেও সামনের ডান পা টা যেন কাটা গেছে মনে হল। সে পায়ে দুটি মাত্র নখ!

ডাক্তার বাবু নিজের মনেই যেন বলে যাচ্ছিলেন, "প্রথমে চীনে রাঁধুনির ভয় পাওয়া, তার পর ছাগলের খোঁয়াড় সাবাড়, তার পর কাঠুরেদের তাঁবু আক্রমণ!—"

ডাক্তার বাবু হঠাৎ পাগলের মত লাফিয়ে উঠলেন—"হয়েছে হয়েছে! সমস্ত বিজ্ঞান-জগৎকে স্তম্ভিত করে দেব! এত বড় 'থিসিস্' কেউ কখন ভাবতে পারে নি! এমন ঘটনা দেখ্‌বার ভাগ্য কারুর হয় নি!"

লোকটা পাগল হল নাকি! বল্লাম —"কি বক্‌ছেন ডাক্তার বাবু!"

"কি আবার বকছি! দেখতে পাচ্ছেন সামনে ওটা কি!"

"পাচ্ছি বই কি! আপনিই ত বল্‌লেন টির‍্যানোসোরাস!"

ডাক্তার বাবু হেসে উঠলেন—টির‍্যানোসোরাস না ছাই! টিকটিকি! টিকটিকি! ওটা আমাদের সেই দেয়ালের টিকটিকিটা!"

আমাদের বিমূঢ় ভাব দেখে ডাক্তার বাবু আর একটু স্পষ্ট করে বল্লেন—"বুঝতে পারছেন না! সেই টিকটিকিটাই বেড়ে বেড়ে এত বড় হয়েছে! মনে নেই ছুরিতে তার তিনটে নখ কাটা গেছ্‌ল—ওই দেখুন দিকি!"

"তাত দেখ্‌ছি কিন্তু—"

"'কিন্তু' কিছু নেই এর ভেতর। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আর কারো এমন ঘটনা দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে কিনা জানি না। জানোয়ারটির ঘাড়ের কাছে খালের মত একটা কাটা লক্ষ্য করছেন কি! মনে আছে, টিকটিকিটার গলাটায় একটু ছুরির আঁচড় লেগেছিল। সেই দাগই অত বড় হয়েছে! আমার ছুরি অজান্তে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে!"

"আর একটু বুঝিয়ে বলুন, ডাক্তার বাবু।"

"বুঝিয়ে আর বলব কি, আমিই কি সব বুঝি? শুধু বুঝেছি, ছুরিটা লেগে কোন

রকমে টিকটিকিটার ঘাড়ের কোন 'গ্ল্যাণ্ড' কি ভাবে নিশ্চয় কেটে যায়। তার পর কেমন করে কি হয়েছে, জানি না। 'গ্ল্যাণ্ড'টি কাটা যাওয়ার ফলেই তার শরীরে এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সুরু হয়েছে হয়ত। কোন কোন 'গ্ল্যাণ্ডে'র শরীরের ওপর এই প্রভাব আছে বলে শুনেছি—যেমন ধরুন থাইরয়েড্ গ্ল্যাণ্ড। এ ক্ষেত্রে কোন্ গ্ল্যাণ্ড কি ভাবে কাটা গেছে জানি না, শুধু বলতে পারি যে তারি ফলে ওই জানোয়ারটি বড় হয়ে আমাদের রাঁধুনিটিকে ভয় দেখিয়েছেন, আরো বড় হয়ে ছাগলের বংশনাশ করেছেন, তার পর আমাদের কাঠুরেদের সর্ব্বনাশ করে এখন আমার হাতে প্রাণ দিয়েছেন। আরো কিছু দিন বাঁচলে আরো বড় হতেন কিনা জানি না।"

"কিন্তু এ কি সম্ভব! শুধু একটা গ্ল্যাণ্ড কাটা গিয়ে এমন হতে পারে?"

এই প্রথম ডাক্তার বাবুকে একটু বিরক্ত দেখলাম। "সম্ভব কি না জানি না, কিন্তু হয়েছে ত দেখ্ছি।" বলে তিনি জানোয়ারটার ঘাড়ের কাটা দাগটার ওপর ঝুঁকে পড়ে কি পরীক্ষা করতে লাগলেন।

তার পর ডাক্তার বাবু কয়েকদিন বাদেই চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয় নি। তিনি সে থিসিস্ বোধ হয় লেখেন নি। লিখ্লে বিজ্ঞান-জগৎ সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে যেত!

---

# ইউরোপ-যাত্রার দুঃখ

( শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় )

"রামধনু"র পাঠক পাঠিকাদের মত আমারও নানা দেশ দেখিতে ইচ্ছা করে। ইউরোপের কোন্ জায়গায় কোন্ জিনিষ দেখিয়া যে আমার কিছুই সুখ হয় নাই, এমনও নহে। তবে আমি ইউরোপ-যাত্রার দুঃখ লিখিতে বসিলাম কেন? বলিতেছি, শুন।

তিন বৎসর আগে যখন বাড়ী হইতে হাবড়া ষ্টেশনে রেলগাড়ী চড়িয়া বোম্বাই যাই, তখন ট্যাক্সীতে অর্থাৎ ভাড়াটিয়া মোটর গাড়ীতে উঠিলাম। উঠিয়াই মনে হইল, এই গাড়ীর কল-কব্জা কোন অংশেই আমার দেশের লোকে



তৈরী করে নাই; সবই বিদেশের লোকেরা করিয়াছে। বিদেশের লোকদের উপর বিদেশী বলিয়া আমার কোন রাগ বা ঘৃণা নাই। কিন্তু বিদেশীর তৈরী গাড়ীতে হাবড়া যাইতে আমার দুঃখ হইল যে জন্য, তাহা এই যে, মোটর গাড়ীতে ব্যবহৃত লোহা, ইস্পাত, কাঠ, রবার, কেম্বিস, চামড়া ইত্যাদি সব জিনিষই আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়; ভগবান্ অন্যদেশের লোকদের মত আমাদিগকেও বুদ্ধি দিয়াছেন; অথচ মোটর গাড়ী এবং আরও কত কি জিনিষ আমাদিগকে বিদেশ হইতে আনিতে হয়; তাহার জন্য লজ্জা হয় ও মনে কষ্ট পাই।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

যাক্, হাবড়ায় ট্রেনে ত' উঠিলাম। রেলগাড়ীর এঞ্জিন গুলাও কিন্তু বিদেশে তৈরী, এবং আরও কত কি বিদেশে তৈরী। রেলের বড় কর্ত্তারাও সব বিদেশী। সুতরাং সেই ট্যাক্সী চড়ার যে দুঃখ, রেলে চড়ারও সেই দুঃখ।

বোম্বাই পৌঁছিয়া একদিন পরে একটা জাহাজে উঠিলাম। সেটা ইতালীর লোকদের। তা ছাড়া বোম্বাই হইতে ইংরেজদের জাহাজও চলে। সিংহলদ্বীপের বন্দর কোলোম্বো হইতে জার্ম্মান এবং ফরাসীদের জাহাজ চলে। কোন কোন বন্দর হইতে জাপানী এবং আমেরিকানদের জাহাজও চলে। কিন্তু ভারতবর্ষের কোন বন্দর হইতে কোন ভারতীয় যাত্রী-জাহাজ ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা,

জাপান, চীন যায় না। একবার লয়্যাল্টী নামে একটী ভারতীয় লোকদের জাহাজ যাত্রী লইয়া লণ্ডন গিয়াছিল। তাহাও কিন্তু বাঙালীদের নহে। সে জাহাজ বোম্বাইয়ের সিন্ধিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর। ঐ কোম্পানীর ঐ জাহাজ বা অন্য কোন জাহাজ এখন আর যাত্রী লইয়া বিলাত যায় না; তাহাদের অনেক-গুলি জাহাজ মাল লইয়া বিলাত যাতায়াত করে। বাঙালীরা তাহার মালিক বা অংশীদার নহে। কিন্তু অন্য ভারতীয়েরা যে তাহার মালিক, ইহা সুখের বিষয়।

যাহা হউক, ইতালীয় জাহাজে ত উঠিলাম। জলপথে যেমন বিদেশীর উপর নির্ভর, জলপথেও তেমনি। সুতরাং জলে স্থলে একই রকমের দুঃখ।

জাহাজের একটা বন্দোবস্তে আমার কোন দুঃখ হয় নাই; কিন্তু সেরকম বন্দোবস্তের কারণটা আমাদের জাতির পক্ষে অপমান লজ্জা ও দুঃখের বিষয়। আমাদিগকে, অর্থাৎ ভারতীয় লোকদিগকে, আলাদা টেবিলে খাইতে দিল। শাদা চামড়ার লোক যাহারা, তাহাদিগকে অন্য অনেকগুলা টেবিলে খাইতে দিল। ইহাতে আমার কোন অসুবিধা হয় নাই, বরং সুবিধাই হইয়াছিল। কারণ, আমি মাছ-মাংস খাই না, মদ খাই না; যাহারা মদ খায়, তাহাদের সঙ্গে এক টেবিলে খাইতে না হইলেই আমার পক্ষে ভাল। কিন্তু অপমান লজ্জা ও দুঃখের কারণ এই, যে আমাদিগকে নিকৃষ্ট দেশের নিকৃষ্ট জাতির লোক মনে করিয়া আমা-দের সহিত এ রকম ব্যবহার করে।

সব জাহাজে কিন্তু এরকম ব্যবহার করে না। আমি ইউরোপ হইতে দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় ফরাসীদের একটা জাহাজে কোলোম্বো পর্য্যন্ত আসিয়া-ছিলাম। তাহাতে সব দেশের, সব জাতির, সব রঙের লোককে একসঙ্গে খাইতে বসাইয়া দিত।

ইতালীয় জাহাজের ভৃত্যেরা কিন্তু আমাদের বা অন্য কাহারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে নাই। এই সব চাকরই শাদা চামড়ার মানুষ। যে চাকরাণী আমাদের বিছানা করিয়া দিত, সেও শাদা চামড়ার মানুষ। অর্থাৎ আমাদের দেশের জজ, মাজিষ্ট্রেট, লাট সাহেবের স্ত্রীরা দেখিতে যেমন, এই ইতালীয় চাকরাণীও



সেই রকম। কাল চামড়ার চাকর একজন ছিল; তাহার বাড়ী গোয়া। সে স্নানের ঘর ও স্নানের টব প্রভৃতি পরিষ্কার করিত। শাদা চামড়ার চাকরেরা জুতা বুরুস্ করা, পোষাক ঝাড়া, মুখ ধোবার জায়গা পরিষ্কার করা, বমির ও প্রস্রাবের পাত্র খালি করা ও পরিষ্কার করা, এই সব কাজ করিত। রান্না, পরিবেষণ প্রভৃতির চাকরও শাদা চামড়ার মানুষ।

ইউরোপের সর্ব্বত্রই হোটেলে, রেল, জাহাজে, ভদ্রলোকদের বাড়ীতে, মেথর-মেথরাণী, ঝাড়ুদার, জুতা বুরুস্ ও সেলাইওয়ালা প্রভৃতি সব শাদা চামড়ার মানুষ। অর্থাৎ যে রকম মানুষ আমাদের দেশে পুলিশ সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ, লাট, বড়লাট হয়, ঠিক এই রকম চেহারার মানুষ; এবং আমাদের দেশের "সাহেব"দের জাতভাইরা নিজের দেশে কেউ বা মেথরের কাজ করে, আবার কেউ বা প্রধান মন্ত্রীর কাজ করে। এই সব দেখিয়া, এবং শাদা চামড়ার লোকদিগকে মোট বহান, জুতা সাফ করান প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত করিয়া কিম্বা "মেম সাহেব"দিগকে মূত্রাধার পরিষ্কার করিতে দেখিয়া কোন দুঃখ হয় নাই; কিছু শিক্ষা হইয়াছিল বটে।

ইংলণ্ডের লোকেরা ভারতবর্ষ শাসন করে। কয়েক বৎসর আগে এই ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন লয়েড্ জর্জ্জ। তাঁহার মত ক্ষমতা তখন কাহারও ছিল না। এই লয়েড্ জর্জ্জ ছেলেবেলায় মামার বাড়ীতে মানুষ হন। তাঁর মামা বড়লোক ছিলেন না, কোন বড় কাজ করিতেন না। করিতেন পুরাতন ছেঁড়া জুতা মেরামতের কাজ। তাঁহার ভাগিনেয় হইয়াছিলেন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী।

আমাদের দেশে ও ইউরোপের প্রায় সব দেশের মধ্যে এই একটা তফাৎ, যে, ইউরোপে খুব সামান্য লোকদের ছেলেরাও খুব বিদ্বান হইতে ও বড় পদ পাইতে পারে; আমাদের দেশে তাহা হওয়া দুর্ঘট।

এই রকম আরও কোন কোন প্রভেদ দেখিয়া আমার নিজের দেশের জন্য দুঃখ হইয়াছিল।

কিন্তু আমি ভারতীয় বাঙালী বলিয়াই, লজ্জিত নহি। আমাদের দেশ

এক সময়ে মহৎ ছিল। তাহাকে আবার বড় করিবার সুযোগ আমাদের আছে। তাহা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা যদি আমরা করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের লজ্জা নাই; না পারিলে লজ্জার কারণ আছে।

---

## দাতা কর্ণ

( শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ, কবিশেখর )

কি যেন কহিল অস্ফুট স্বরে
 ভিখারী, হাতেম শাহের দ্বারে,
ওমরাহগণ শুনিতে পেল না,
 উত্তর দিল হাতেমই তারে।
হাতেম বধির, জানিত সবাই
 অবাক্ হইয়া শুধা'ল সবে,
"শ্রবণ-শক্তি ক্ষীণ জনাবের,
 শুনিতে কেমনে পেলেন তবে?"
কহিল হাতেম, "দীন আবেদনে
 শ্রুতিবল মোর প্রখরই আছে,
তোষামোদ ছাড়া কয়না যে কথা,
 বধির সেজেছি তাদেরি কাছে।"

---

**চিত্র পরিচয়ঃ**—কলেজ হইতে "বিদ্যার সাগর" নাম লইয়া ঈশ্বরচন্দ্র তো বাহির হইলেন। বাড়ীর অবস্থা তো ভাল নয়, কাজেই চাক্‌রী করিতেই হইবে। এদেশে যাঁরা জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিতে আসিতেন কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁদের এদেশী ভাষা শিখিতে হইত—সেখানেই বিদ্যাসাগর মাত্র পঞ্চাশ টাকা মাহিনায় প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন। ছবিতে দেখ, তিনি ক্লাশে পড়াইতেছেন।

## চাঁদের দেশের মেয়ে

[ জাপানী রূপকথা ]

( শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল, এম-এ, বি-এল্ )

অনেক দিনের কথা। জাপানে একটা বনের মধ্যে বাস করতো একটা বুড়ো কাঠুরে—নাম তার বড়ো বিশ্রী—সানুপি-নো-মিয়াকো। একদিন সে কাঠ কাট্‌ছে খট্ খট্ খট্—এমন সময় হঠাৎ একটা আলো তার চোখ ঝল্‌সে দিল। চোখ মুছে সে দেখ্‌লে একটা বাঁশের ফোকরে বসে' আছে একটা ছোট্টো মেয়ে—রূপ তার ঠিক্‌রে পড়্‌ছে। সে তো আহ্লাদে আটখানা হোয়ে মেয়েটিকে কোলে তুলে নিলে—তার পর ছুট্‌তে ছুট্‌তে বনের ধারে তার ছোট্টো কুঁড়েটিতে ফিরে গেলো। তার ছেলেপিলে ছিল না। বুড়োবুড়ি দুজনে কুলোয় শুইয়ে সেই ছোট্টো মেয়েটিকে মানুষ করতে লাগলো।

তার পর হোলো কি—কাঠুরে বনে কাঠ কাট্‌তে যায়—আর রোজই এক তাল করে সোণা নিয়ে আসে। সে ছিলো বড়ো গরীব। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক'দিনের ভেতর সে মস্ত বড়ো লোক হোয়ে উঠ্‌লো।

মেয়েটির বয়স যখন তিন মাস—তখনি সে দেখ্‌তে দেখ্‌তে হঠাৎ পূর্ণ যুবতী হোয়ে উঠলো। কাঠুরে তার নাম রাখলে কাগুয়া।

কাগুয়ার রূপের কথা মুখে মুখে 'অনেক দূর চলে' গেলো। তাকে বিয়ে করবার জন্যে অনেকেই অস্থির হোয়ে উঠলো। তাদের ভেতর গরীব যারা তারা মাস কতক সবুর করবার পর বুঝলে যে, তাদের আশা সফল হোতে পারেই না। কাজেই তারা হাল ছেড়ে দিলে। তখন রইলো শুধু পাঁচজন রাজপুত্র—ইসিজুকুরি, কুরমোচি, দৈনাগণ, অবি-নো-মিউসি, আর ওতোমো-নো-মিউকি মোরোতাদা। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, তারা সমানভাবে কাঠুরের কুঁড়ের ধারে বোসে' অপেক্ষা কোরতে লাগলো,—কখন্ তাদের একজনের গলায় কাগুয়া মালা দেবে, এই আশায়। একদিন তারা বিরক্ত হোয়ে কাঠুরেকে জিজ্ঞাসা করলে,—"তোমার মেয়ের বিয়ে দেবে কবে?" কাঠুরে বল্লে,—"আমার তো মেয়ে নয়। কাজেই আমি ইচ্ছে কর্‌লেই তো তার বিয়ে দিতে পার্বো না।"

রাজপুত্রেরা কি করে—মনের দুঃখে দেশে ফিরে গেলো। কিন্তু সেখান থেকেও তারা

দূত পাঠাতে লাগলো কাঠুরের কাছে সাধ্য-সাধনা কোরে। একদিন কাঠুরে বিরক্ত হোয়ে কাগুয়াকে বল্লে,—"একি ভালো দেখাচ্ছে? যাহোক একটা ঠিক করো। বিয়ে তো করতেই হবে।" কাগুয়া বল্লে,—"আমি যাকে বিয়ে করবো, তাকে পরখ কোরে' নেবো। সে আমার যোগ্য কি না।"

দূতের মুখে এই কথা শুনে রাজপুত্রেরা প্রাণে একটু আশা পেলে। তারা সবাই বীর—সবাই সাহসী। আবার তারা এসে সেই রাত্রে কাঠুরের কুড়ের ধারে আস্তানা নিলে, আর কাগুয়াকে খুসী করবার জন্যে গান বাজনা জুড়ে দিলে। কাঠুরে খানিক পরে বেরিয়ে এসে কাগুয়ার ইচ্ছা তাদের জানালে।

ভারতবর্ষে তেঞ্জিকু বলে' একটা জায়গা আছে। সেখানে বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্র আছে—ইসিজুকুরিকে তারি সন্ধানে বেরুতে হবে। পূব্ সাগরের পারে আছে হোয়াই পর্ব্বত—সেখানে একটা গাছ আছে—তার শিকড় রূপোর, গুঁড়ি সোণার, আর তাতে পোকরাজ ফলে আছে,—কুরোমোচিকে সেই গাছের একটা ডাল ভেঙে আন্‌তে হবে। মোরোকোসি দেশের লোকেরা ইঁদুরের লোমে এমন পোষাক তৈরী করে যা আগুনে পোড়ে না, সেই পোষাক একটা আন্‌বে দৈনাগন। আগুন-মুখো সাপের মাথায় রামধনু রঙা যে মণি আছে ওতোমো-নো-মিউকিকে আন্‌তে হবে তাই। আর সাগর থেকে বক-পাখী যে কড়ি নিয়ে আসে সেইটে ছিনিয়ে আন্‌বে মোরোতাদা।

এখন ১নং রাজপুত্র ইসিজুকুরি ছিল বেজায় চালাক। সে ভাবলে,—কে প্রাণ হাতে কো'রে ভারতবর্ষে যায়? ওর চেয়ে একটা পুরোণো গোছের ভিক্ষাপাত্র জোগাড় কোরে' দিলেই হবে। কাজেই সে তিন বছর যমাতোতে লুকিয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ কাছাকাছি পাহাড়ের ওপর একটা মঠ আবিষ্কার কোরে' সেখান থেকে একটা খুব পুরাণো ভিক্ষাপাত্র জোগাড় কোরে' সেইটে নিয়ে কাঠুরের কুঁড়েতে হাজির হোলো।

কাগুয়া দেখলে তাতে লেখা আছে,—

পাহাড় সাগর ঘুরে ঘুরে সারা, কত না ঝরেছে নয়ন-জল;
মরণের ছায়া এসেছে ঘনায়ে, দেহে-মনে আর নেইকো বল!

তাতো হোলো! কিন্তু ভিক্ষাপাত্রের সে জ্যোতি কই? কাজেই এটা বুদ্ধদেবের পাত্র হোতেই পারে না। কাগুয়া সেটা ফিরিয়ে দিলে আর সেই সঙ্গে লিখে দিলে,—

ঘাসের পরে মুক্তা ঝরে, ঝলক তারি কইগো হায়!
অন্ধকারে আশার আলো সবাই খোঁজে, ক'জন পায়?



রাজপুত্র বেগে ভিক্ষাপাত্রটা ছুড়ে ফেলে দিলে। কিন্তু কাগুয়াকে লিখে পাঠালে,—

হীরার কিরণ ম্লান করেছে সব আলোরে!
ফুট্‌বে আলো, তোমার থেকে যাচ্ছি সোরে!

কাগুয়া খুসী হোলো না। কাজেই রাজপুত্রকে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে দেশে ফিরতে হলো।

রাজপুত্র কুরোমোচিও বেশ চালাক! সে প্রচার কোরে দিলে যে সে মণি ফলের গাছের সন্ধানে যাচ্ছে। কিন্তু সে কোর্‌লে কি দু'জন কারিগর জোগাড় কোরে' তাদের দিয়ে তেপান্তরের মাঠে একটা ঘর বানিয়ে, সেইখানে বাস কোরতে লাগলো—আর তারা সেখানে রাজপুত্রের আদেশ মতো মণিফল ঝুল্‌ছে এমন একটা ডাল তৈরী কোর্‌লে।

কাগুয়া রাজপুত্রের উপহার পেয়ে খুসী হোলো। রাজপুত্র বোল্‌তে লাগ্‌লো,—কতো সাগর পেরিয়ে, কতো রাক্ষসখোক্ষসের হাত থেকে কোনো মতে প্রাণ রক্ষা করে, অনাহারে অনিদ্রায় দেশ-দেশান্তর থেকে সে এই ডালটি সংগ্রহ কোরে এনেছে। ঘুরতে ঘুরতে সে একটা উঁচু পাহাড়ের তলায় গিয়ে পৌছ্‌ল; পাহাড়টা ঠিক সমুদ্রের ধার থেকে খাড়া হোয়ে উঠেছে। পাহাড়ের ওপরে উঠে একটা বুড়ীর সঙ্গে তার দেখা হোলো; তার হাতে রূপোর পাত্র। সেইটেতে বুড়ী জল ভরলে। পাহাড়ের ওপর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ফুল, আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গাছ—রামধনু রঙা একটা ঝর্ণা বইছে—তার ওপর একটা পোল আছে, ঝক্‌ঝকে মাণিকের তৈরী,—তার ধারে কতো গাছ, সব গাছে মণি ঝুলে আছে,—সেই গাছগুলোয় একটা ডাল ভেঙে সে এনেছে।

কাগুয়া এই বানানো গল্পটা বিশ্বাস কোরতে যাচ্ছিলো, এমন সময় সেই ছ'টা কারিগর সেখানে এসে দামের জন্যে হাঁকাহাকি কোরে দিলে। তখন কাগুয়া সব বুঝতে পারলে। সে-ই তাদের বিদায় কোরে' একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেল্লে।

৩নং রাজপুত্র ভাবলে তার কাজটা ভারী সোজা। সে একজন সদাগরকে হুকুম করলে—আগুনে পোড়ে না। ইঁদুরের লোমে তৈরী এমন একটা পোষাক তাকে এনে দিতে হবে। সদাগর অনেককে ফাঁকি দিয়েছে। কাজেই সে দাঁও পেয়ে বল্লে,—আচ্ছা। বছর তিনেক বাদ সওদাগরের জাহাজ ফিরে এলো সেই দেশ থেকে যেখানে লোকে ইঁদুরের লোমে পোষাক তৈরী করে। সদাগর রাজপুত্রের কাছে অনেক দাম আদায় কোরে' একটা লোমের পোষাক তাকে দিলে—বাক্সতে বন্ধ। রাজপুত্র সেইটে কাগুয়ার কাছে পাঠিয়ে দিলে, আর সওদাগরের কথামতো তার বর্ণনা দিলে,—সাগরের জলের মতো নীল, তাতে সোণালী রঙ,

দূত পাঠাতে লাগলো কাঠুরের কাছে সাধ্য-সাধনা কোরে। একদিন কাঠুরে বিরক্ত হোয়ে কাগুয়াকে বল্লে,—"একি ভালো দেখাচ্ছে? যাহোক একটা ঠিক করো। বিয়ে তো করতেই হবে।" কাগুয়া বল্লে,—"আমি যাকে বিয়ে করবো, তাকে পরখ কোরে' নেবো। সে আমার যোগ্য কি না।"

দূতের মুখে এই কথা শুনে রাজপুত্রেরা প্রাণে একটু আশা পেলে। তারা সবাই বীর—সবাই সাহসী। আবার তারা এসে সেই রাত্রে কাঠুরের কুড়ের ধারে আস্তানা নিলে, আর কাগুয়াকে খুসী করবার জন্যে গান বাজনা জুড়ে দিলে। কাঠুরে খানিক পরে বেরিয়ে এসে কাগুয়ার ইচ্ছা তাদের জানালে।

ভারতবর্ষে তেঞ্জিকু বলে' একটা জায়গা আছে। সেখানে বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্র আছে—ইসিজুকুরিকে তারি সন্ধানে বেরুতে হবে। পূর্ব্ সাগরের পারে আছে হোয়াই পর্ব্বত—সেখানে একটা গাছ আছে—তার শিকড় রূপোর, গুঁড়ি সোণার, আর তাতে পোকরাজ ফলে আছে,—কুরোমোচিকে সেই গাছের একটা ডাল ভেঙে আনতে হবে। মোরোকোসি দেশের লোকেরা ইঁদুরের লোমে এমন পোষাক তৈরী করে যা আগুনে পোড়ে না, সেই পোষাক একটা আনবে দৈনাগন। আগুন-মুখো সাপের মাথায় রামধনু রঙা যে মণি আছে ওতোমো-নো-মিউকিকে আনতে হবে তাই। আর সাগর থেকে বক-পাখী যে কড়ি নিয়ে আসে সেইটে ছিনিয়ে আনবে মোরোতাদা।

এখন ১নং রাজপুত্র ইসিজুকুরি ছিল বেজায় চালাক। সে ভাবলে,—কে প্রাণ হাতে কো'রে ভারতবর্ষে যায়? ওর চেয়ে একটা পুরোণো গোছের ভিক্ষাপাত্র জোগাড় কোরে' দিলেই হবে। কাজেই সে তিন বছর যমাতোতে লুকিয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ কাছাকাছি পাহাড়ের ওপর একটা মঠ আবিষ্কার কোরে' সেখান থেকে একটা খুব পুরাণো ভিক্ষাপাত্র জোগাড় কোরে' সেইটে নিয়ে কাঠুরের কুঁড়েতে হাজির হোলো।

কাগুয়া দেখলে তাতে লেখা আছে,—

পাহাড় সাগর ঘুরে ঘুরে সারা, কত না ঝরেছে নয়ন-জল;
মরণের ছায়া এসেছে ঘনায়ে, দেহে-মনে আর নেইকো বল!

তাতো হোলো! কিন্তু ভিক্ষাপাত্রের সে জ্যোতি কই? কাজেই এটা বুদ্ধদেবের পাত্র হোতেই পারে না। কাগুয়া সেটা ফিরিয়ে দিলে আর সেই সঙ্গে লিখে দিলে,—

ঘাসের পরে মুক্তা ঝরে, ঝলক তারি কইগো হায়!
অন্ধকারে আশার আলো সবাই খোঁজে, ক'জন পায়?



রাজপুত্র বেগে ভিক্ষাপাত্রটা ছুড়ে ফেলে দিলে। কিন্তু কাগুয়াকে লিখে পাঠালে,—

হীরার কিরণ ম্লান করেছে সব আলোরে!
ফুটবে আলো, তোমার থেকে যাচ্ছি সোরে!

কাগুয়া খুসী হোলো না। কাজেই রাজপুত্রকে কাঁদতে কাঁদতে দেশে ফিরতে হলো।

রাজপুত্র কুরোমোচিও বেশ চালাক! সে প্রচার কোরে দিলে যে সে মণি ফলের গাছের সন্ধানে যাচ্ছে। কিন্তু সে কোরলে কি ছ'জন কারিগর জোগাড় কোরে' তাদের দিয়ে তেপান্তরের মাঠে একটা ঘর বানিয়ে, সেইখানে বাস কোরতে লাগলো—আর তারা সেখানে রাজপুত্রের আদেশ মতো মণিফল ঝুলছে এমন একটা ডাল তৈরী কোরলে।

কাগুয়া রাজপুত্রের উপহার পেয়ে খুসী হোলো। রাজপুত্র বোলতে লাগলো,—কতো সাগর পেরিয়ে, কতো রাক্ষসখোক্ষসের হাত থেকে কোনো মতে প্রাণ রক্ষা করে, অনাহারে অনিদ্রায় দেশ-দেশান্তর থেকে সে এই ডালটি সংগ্রহ কোরে এনেছে। ঘুরতে ঘুরতে সে একটা উঁচু পাহাড়ের তলায় গিয়ে পৌছল; পাহাড়টা ঠিক সমুদ্রের ধার থেকে খাড়া হোয়ে উঠেছে। পাহাড়ের ওপরে উঠে একটা বুড়ীর সঙ্গে তার দেখা হোলো; তার হাতে রূপোর পাত্র। সেইটেতে বুড়ী জল ভরলে। পাহাড়ের ওপর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ফুল, আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গাছ—রামধনু রঙা একটা ঝর্ণা বইছে—তার ওপর একটা পোল আছে, ঝকঝকে মাণিকের তৈরী,—তার ধারে কতো গাছ, সব গাছে মণি ঝুলে আছে,—সেই গাছগুলোর একটা ডাল ভেঙে সে এনেছে।

কাগুয়া এই বানানো গল্পটা বিশ্বাস কোরতে যাচ্ছিলো, এমন সময় সেই ছ'টা কারিগর সেখানে এসে দামের জন্যে হাঁকাহাকি কোরে দিলে। তখন কাগুয়া সব বুঝতে পারলে। সে-ই তাদের বিদায় কোরে' একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেল্লে।

৩নং রাজপুত্র ভাবলে তার কাজটা ভারী সোজা। সে একজন সদাগরকে হুকুম করলে—আগুনে পোড়ে না। ইঁদুরের লোমে তৈরী এমন একটা পোষাক তাকে এনে দিতে হবে। সদাগর অনেককে ফাঁকি দিয়েছে। কাজেই সে দাঁও পেয়ে বল্লে,—আচ্ছা। বছর তিনেক বাদ সওদাগরের জাহাজ ফিরে এলো সেই দেশ থেকে যেখানে লোকে ইঁদুরের লোমে পোষাক তৈরী করে। সদাগর রাজপুত্রের কাছে অনেক দাম আদায় কোরে' একটা লোমের পোষাক তাকে দিলে—বাক্সতে বন্ধ। রাজপুত্র সেইটে কাগুয়ার কাছে পাঠিয়ে দিলে, আর সওদাগরের কথামতো তার বর্ণনা দিলে,—সাগরের জলের মতো নীল, তাতে সোণালী রঙ,

খুব সুন্দর দেখতে, আর তার চেয়ে বেশী, পোষাকটা আগুনে পোড়ে না। সেই বর্ণনাটুকু লিখে তার সঙ্গে রাজপুত্র একটা শ্লোক যোগ কোরে দিলে।

পোষাকটা পেয়ে কাগুয়া কাঠুরেকে বল্লে,—"পোষাকটা আগুনে ফেলে দিলে যদি না পোড়ে তা হ'লে আমি এই রাজপুত্রকেই বিয়ে করবো।" আগুন জ্বালা হলো; পোষাকটা তার ভেতর ফেলে দিতেই ফর্ ফর্ কোরে' পুড়ে গেলো। রাজপুত্রের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হোয়ে গেলো—সে সেখানে হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে রইলো। তারও কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে দেশে ফিরতে হোলো।

৪নং রাজপুত্র তার চাকরদের দিয়ে কাজ সারবার চেষ্টা কোর্লে। সে হুকুম দিলে—আগুনমুখো সাপের মাথা থেকে মণি আনতে হবে। দেশে দেশে লোক ছুট্‌লো। কিন্তু কেউ ফিরে এলো না।

তখন সে নিজেই মণির সন্ধানে বেরুলো। একটা নৌকো আর একজন মাঝি নিয়ে সে অকুল সমুদ্রে পাড়ি দিলে।

বরুণ দেবতা রেগে গিয়েছিলেন। কাজেই কয়েক দিন সমুদ্র ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ কর্লে। তখন মাঝিটা ভয় পেয়ে বল্লে'—"হুজুর, সাগরপুরীর যে নাগের সন্ধানে যাচ্ছেন সে-ই রেগে এই ঝড় বৃষ্টি সৃষ্টি কোরেছে—তাকে না খুসী কোর্লে কিছুই হবে না।" রাজপুত্রের তখন ভীষণ অবস্থা। কাজেই সে হাজারবার মন্ত্র জপ্‌লো, আর প্রতিজ্ঞা করলো যে, নাগরাজার মণি হরণের চেষ্টা করবে না।

অনেক কষ্টে রাজপুত্র দেশে ফিরে এল। সে আর কাগুয়ার কাছে গেলো না। প্রাণ নিয়ে যে ফিরে আস্‌তে পেরেছে, এতেই সে খুসী হোলো।

৫নং রাজপুত্রও কড়ির খোঁজ করতে গিয়ে বেজায় নাকাল হোলো। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনো খোঁজই মিল্‌লো না।

বছর কতক না ঘুরতে ঘুরতে কাগুয়ার রূপের খবর রাজধানীতে পৌছলো। মিকাদো অস্থির হোয়ে উঠলেন। তিনি তখুনি ফুসাগো নামে একটি মহিলাকে কাঠুরের কুঁড়েতে পাঠালেন। কিন্তু কাগুয়া তার সঙ্গে দেখা করতেই চাইলে না। মিকাদোকে এসে ফুসাগো সে কথা বল্‌তেই তিনি বেজায় রেগে উঠলেন। তখুনি তিনি আদেশ দিলেন কাঠুরে আর তার মেয়েকে রাজসভায় আন্‌তে। মিকাদোর দুত এসে কাঠুরেকে খবর দিলে, আরো বল্লে,—রাজসভায় গেলে কাঠুরের বরাত ফির্‌বে। কাঠুরের লোভ হোল; কিন্তু কাগুয়ার মত না হোলে তো তা'কে নিয়ে যেতে পারে না। কাগুয়া বল্লে,—তা'কে যদি রাজসভায় যেতে হয়, তা হ'লে সে মারা যাবে। কাজেই কাঠুরে একলাই রাজধানী গেলো। গিয়ে মিকাদোকে মেয়ের কথা সব বল্লে।



মিকাদো সম্রাট। একটা ছোটলোকের মেয়ে তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেবে? হোক্ না, সে স্বর্গের অপ্সরা! কাজেই তিনি মতলব কল্লেন, মৃগয়ায় যাবেন, আর হঠাৎ কাঠুরের কুঁড়েতে হাজির হোয়ে কাগুয়াকে দেখবেন।

তাই হোলো। মিকাদো কাঠুরের কুঁড়েতে প্রবেশ করে' একটা ঘরে দাঁড়ালেন। তাঁর মনে হোলো, ঘরের ভেতর একটা খুব উজ্জল আলো জ্বল্‌ছে, আর সেই আলোতে তিনি দেখ্‌তে পেলেন কাঠুরের কুড়ানো মেয়েটিকে।

দেখেই তাঁর মাথা ঘুরে গেলো। তিনি তার হাত ছুঁতে গেলেন। এমন সময়ে কাগুয়া মুখ ঢাক্‌লে। মিকাদো তখুনি ডুলি আন্‌তে হুকুম করলেন—কাগুয়াকে তিনি রাজধানীতে নিয়ে যাবেন। কিন্তু ডুলি যেই এলো অমনি কাগুয়াকে আর দেখা গেলো না। মিকাদো তখন বুঝলেন যে, সে এ জগতের নয়। তিনি কাতরভাবে বল্লেন,—"দেখি, তুমি যা চাও, তাই হবে। তোমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবো না। কিন্তু দয়া কোরে' আর একবার তুমি দেহ ধারণ করো,' আমি আর একবার তোমায় দেখি।"

মিকাদো কাগুয়াকে আবার দেখ্‌তে পেলেন। যাবার সময় তিনি বলে গেলেন,—

মৃগয়া আমার হোল গো বিফল, হৃদয় গুমরি' মরে;
ফিরে যেতে হোল, পড়ে থাকে পিছে, এসেছি যাহার তরে।

কাগুয়া উত্তর দিল—

সবুজ পাতার চাঁদোয়ার তালে বছরের পর বছর কাটে;
সেই ভালো, রাজা, কাজ নেই মোর মাণিকের ঘর, সোণার খাটে।

মৃগয়ার পর তিন বছর কেটে গেছে। বসন্ত এসেছে। কাগুয়া প্রতি রাত্রে কেবলি চাঁদের দিকে চেয়ে থাকে। কে জানে, কিসের দুঃখ তার? পূর্ণিমার রাতে সে কেঁদে কেঁদে সারা হোলো। তার দাসীরা কাঠুরেকে খবর দিলে,—"কাগুয়া সারা রাত চাঁদের পানে চায় আর কাঁদে। ব্যাপার কি বুঝতে পার্চ্ছি না। তুমি গিয়ে খোঁজ নাও।"

কাঠুরে কাগুয়ার কাছে শুধু এইটুকু শুনলে যে, চাঁদকে দেখ্‌লেই পৃথিবীর দুঃখ তার মনে বড়ো বাজে, তাই সে কাঁদে।

কিছুদিন পরে কাগুয়া সহচরীদের বল্লে যে, সে মানবী নয়, সে চাঁদের দেশের মেয়ে; এইবার তাকে দেশে ফিরে যেতে হ'বে।

কাঠুরে শুন্‌লে—তার বুক ভেঙ্গে গেলো। মিকাদো শুন্‌লেন—তিনি বড়ো দুঃখ পেলেন। খবর নিয়ে তিনি জানলেন যে, পরের পূর্ণিমায় চাঁদের দেশ থেকে একদল লোক এসে কাগুয়াকে নিয়ে যাবে। সে কি হয়? তিনি সান্ত্রী-পাহারা সব পাঠিয়ে দিলেন কাঠুরের কুঁড়েতে,—তারা চাঁদের দেশের লোকেদের আস্‌তেই দেবে না।

বুড়ো কাঠুরে ভাব্‌লে,—ঠিক হোয়েছে। সম্রাটের এতো সৈন্য-সামন্তদের মাঝ থেকে চাঁদের দেশের লোকদের সাধ্য কি কাগুয়াকে নিয়ে যায়? কাগুয়া তার ভুল ভাঙিয়ে দিলে। বল্লে,—"পৃথিবীর লোকের সাধ্য নাই যে তাদের বাধা দেয়। তারা এলেই সব দরজা খুলে যাবে; আর তোমরা হাজারই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করো না কেন, কোনো মতেই তাদের আঁটতে পারবে না।" বুড়ো রেগে উঠলো,—বল্লে,—"আসুক দেখি কারা আসে, আমি তাদের পুলি পোলাও বানিয়ে তবে ছাড়বো!"

কাঠুরের কুঁড়ের চারদিকে পাহারা বোসে' গেলো। তারা সব চাঁদের দিকে তরোয়াল উঁচিয়ে রইলো,—কেউ নেমে এলেই দেবে কোপ। পূর্ণিমার রাত প্রায় পোহায়; আর প্রহর খানেক বাকী আছে। এমন সময় একটা আলো আকাশে দেখা দিলে; আর সেই আলোর মাঝখান দিয়ে একটা রঙীন্ মেঘ নেমে এলো—তার ওপর চাঁদের দেশের একদল লোক। মেঘটা প্রায় মাটিতে ঠেকলো রাজার লোকজন সবাই ভয় পেয়ে গেলো। তাদের ভেতর কেউ কেউ তরোয়াল খেলতে আরম্ভ করলে, ধনুকে বাণ লাগালে,—কিন্তু তরোয়ালগুলো নড়লো না, বাণগুলো বাতাসে উড়ে গেলো।

মেঘের ওপর একটা রথ ছিল—তার চারপাশ ঢাকা। তার ভেতর থেকে জোর-গলায় আওয়াজ বেরুলো,—"মিয়াকো কাঠুরে বেরিয়ে এসো"

ভয়ে কাঠুরের পা দুটো ঠক্ ঠক্ কর্ছিলো। সে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বেরিয়ে এলো। চাঁদের দেবতা তখন তাকে খুব ধমকানি দিয়ে বল্লেন,—"এখুনি চাঁদের দেশের মেয়েকে দিতে হ'বে।"

মেঘটা ওপরে উঠে ঠিক কাঠুরের কুঁড়ের চালের ওপর গিয়ে থাম্‌লো। রথের ভেতর থেকে আবার সেই জোর-গলায় আওয়াজ হোলো,—"কাগুয়া, এ বিশ্রী জায়গায় কতক্ষণ থাকবি?"



তখুনি ভাঁড়ার ঘরের দরজা খুলে গেলো। সবাই দেখলে, কাগুয়া দাঁড়িয়ে আছে, চারপাশে তার দাসীরা।

এইবার কাগুয়াকে পৃথিবী ছেড়ে চাঁদের দেশে ফিরে যেতে হবে। যাবার আগে সে কাঠুরেকে নমস্কার কোরে তার হাতে একটা গুটানো কাগজ দিলে। তাতে লেখা আছে,—"বাবা, আমি যদি এখানে জন্মাতুম, তাহ'লে আমি কখনোই তোমায় ছেড়ে যেতুম না। কিন্তু ইচ্ছা না থাকলেও আমায় যেতেই হ'বে। উপায় নেই। আমার রেশমী কাপড়খানা স্মৃতি-চিহ্ন রইলো। আকাশ থেকে আবার যদি খসা তারার মতো মাটিতে পড়তে পারি তো বেশ হয়।"

চাঁদের দেশের লোকেরা সঙ্গে এনেছিল, সাদা পালকের পোষাক আর একটি পাত্রে একটুখানি সুধা। একজন কাগুয়াকে বল্লে,—"নোংরা পৃথিবীতে এসে অপবিত্র হোয়েছ,—এই সুধা পান কর।" কাগুয়া সুধা পান কোরে' পাত্রশুদ্ধ বাকীটা তার রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে রেখে যাচ্ছিলো,—কাঠুরের উপকার হ'বে বোলে',—কিন্তু চাঁদের দেশের একজন তখুনি তার ওপর পালকের পোষাকটা ফেলে দিতে সে তা' পারলে না। তখন সে বল্লে,—"তোমরা একটু থামো। এ পোষাক পরলে, আমার মনের ভাব একেবারে বদলে যাবে। পৃথিবী ছাড়বার আগে আমার যা' বলবার আছে সেরে নিই।"

তখুনি সে মিকাদোকে চিঠি লিখ্‌লো যে,—তিনি যেন মনে না করেন সে ইচ্ছা কোরে তাঁর আদেশ অমান্য করেছে। তাকে চাঁদের দেশে ফিরতেই হবে; উপায় নেই।

কাগুয়া চিঠি লিখে সেটা, আর বাঁশের চোঙে কোরে' খানিকটা সুধা সম্রাটের লোকের হাতে দিলে। তারপর পালকের পোষাক পরে' রথে গিয়ে উঠ্‌লো—আর মেঘটা তাকে নিয়ে চোখের নিমিষে উধাও হোয়ে গেলো।

কাঠুরে বুড়ো হয়েছিলো। কয়েক দিন পরে সে মনের দুঃখে মারা গেলো।

মিকাদোরও খুব কষ্ট হোলো। তিনি সভা আহ্বান কোরে,' জিজ্ঞাসা করলেন,—"সব চেয়ে উঁচু পাহাড় কোন্‌টা?" একজন সভাসদ্ উত্তর দিলেন—"রাজধানীর কাছেই একটা পাহাড় আছে, সেইটেই সব চেয়ে উঁচু।"

মিকাদো তখন বল্লেন,—

দেখাই যদি না পাই তারি', সুধায় কিবা কাজ?<br>
হৃদয় টুটে অশ্রু ঝুরে, মরণ ভালো আজ!

তারপর তিনি সেনাপতিকে আদেশ করলেন, কাগুয়ার চিঠি আর সুধাপত্র নিয়ে সেই সব চেয়ে উঁচু পাহাড়টার চূড়ায় আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দিতে।

সেনাপতি সম্রাটের আদেশমতো কাজ করলেন।

সেই দিন থেকে পাহাড়টার নাম হলো ফুজি বা অমর-পর্ব্বত। লোকে বলে, এখনো তার চূড়া থেকে আগুনের ধোঁয়া আকাশের মেঘের সঙ্গে মেশে।

—o—

# হেন্‌রি আর্ভিং ও এলেন টেরি

( শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, বি-এ )

দুনিয়ায় এক একজন লোক এক এক দিক্ দিয়ে বড় হয়ে থাকেন—কেউ বড় হন ভাল কবিতা লিখে, যেমন হয়েছেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ, কেউ নাম করেন বড় বৈজ্ঞানিক হিসাবে, যেমন করেছেন আমাদের আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, আবার কেউ নাম কেনেন নানা রকম মানুষের চেহারা আমাদের চোখের সামনে অভিনয়ের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলে। এই শেষের কাজটিকে যেন তোমরা খুব সোজা বলে উড়িয়ে দিও না, রীতিমত ক্ষমতার দরকার হয় এতেও অনেকখানি। বিলেতের বড় বড় অভিনেতা যাঁরা, যেমন ধর, গ্যারিক্, স্যার হেন্‌রি আর্ভিং, স্যার হারবার্ট্ টি, এঁদের খাতির দেশের ছোট বড় সবাই করে গেছেন, এবং আজও বিলেতে এমন একটি শিক্ষিত লোক খুঁজে পাবে না, যে এদের নাম শোনেনি এমন কথা বল্‌তে লজ্জা না পাবে।

আজ আমি তোমাদের বিশেষ করে এই শ্রেণীর দু'জনার কথা—বল্‌ব অভিনেতা স্যর হেন্‌রি আর্ভিং, এবং অভিনেত্রী এলেন টেরি। এ থেকে তোমরা দেখে নেবে, জগতে যাঁরা বড় হয়েছেন, কত দুঃখু কষ্ট সয়ে, কত বাধা বিপত্তি ঠেলে, ধীরে ধীরে তাঁদের এগুতে হয়েছে। ঝপ্ করে এক লাফে গাছের ডগায় গিয়ে ওঠা, খুব কম লোকের বরাতেই জুটেছে।

স্যর হেন্‌রি আর্ভিং—যাঁর নামে একদিন গোটা ইংল্যাণ্ড নেচে উঠ্‌তো—যখন প্রথম থিয়েটারে ঢুক্‌লেন, তখন কর্ম্মকর্ত্তারা তাঁর আবৃত্তি একটু শুনে নিয়েই বলে দিলে, "বাপু হে, তুমি সরে পড়, তোমার কোন কালেও কিছ্ছু হবে না।" অনেক খোসামোদ করে শেষটায় তিনি সে দলকে এটুকু রাজী করালেন, যাতে করে তারা তাঁকে শিক্ষানুবিশী হয়ে



থাক্‌তে দেয়। একদিন নয়, দু'দিন নয়, ক্রমান্বয়ে আট্‌টা বচ্ছর তিনি তাঁদের তাঁবেদারি করে কাটালেন। শেষে তাঁর দিন এল, লণ্ডনে একটা থিয়েটারে তাঁকে এক পার্ট দেওয়া হলো। সে কি ভয়ানক পার্ট, শুনবে? —প্রায় আমাদের "মৃত সৈনিকের" কাছাকাছি—শুধু দু'টী লাইন তাঁকে বল্‌তে হবে। কিন্তু তাইতেই হেনরির চেষ্টা দেখে কে? দিন রাত শুধু তিনি সেই দু'লাইনই তালিম দিতে লেগেছেন। তার পর যখন থিয়েটারের সময় ঘনিয়ে এল, তখন আর তিনি সাহস করে এগুতেই পার্‌লেন না,—বুঝলেন লণ্ডন সহরে থিয়েটার দেখানর মত ক্ষমতা তাঁর তখনও হয় নি। বন্ধুরা তো অবাক্—আরে মূর্খ, আর কিছু না হোক্, কিছু টাকা তো নির্ঘাৎ পেতিস্! তাদের তখনও জানতে বাকী ছিল যে এ লোকটা টাকা পয়সাকে থোড়াই কেয়ার করে, কার্য্যে সাফল্যই হচ্ছে এর কাজ। আর তা পেতে হলে ফাঁকি চলবে না —দরকার হবে অদম্য অধ্যবসায়ের! তোমরা শুনে কতখানি আশ্চর্য্য হবে জানি না যে, ৪২৮টা ভিন্ন ভিন্ন পার্ট করে পাকা হয়ে তবে তিনি লণ্ডনে থিয়েটার দেখাতে এসেছিলেন।

স্যার হেন্‌রি আর্ভিং।

এদিকে, ঝোঁক্ হবার তাঁর একটা ভারী মজার কারণও হয়েছিল ছেলেবেলাতেই। তাঁদের গ্রামে একটি স্ত্রীলোক ছিল—যত রাজ্যের ভূতের গল্প ছেলেদের শোনাতে তার আর জুড়ি ছিল না। ভূতের গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে ছেলেদের প্রায়ই ভূত সেজে অভিনয় করার ইচ্ছাটা জেগে উঠ্‌তো—হেন্‌রিরও। তের বছর বয়সেই বেচারাকে লণ্ডনে এক চাপরাশীর কাজে গিয়ে ভর্ত্তি হতে হল। সুযোগ পেলেই মাইনের পয়সা জমিয়ে তাই দিয়ে তিনি থিয়েটার দেখে

* দ্রষ্টব্য ঃ—৫১৩ হইতে ৫২০ পৃষ্ঠার অঙ্ক ভুলক্রমে দুইবার বসিয়াছে। দ্বিতীয়বারের ঐ কয়েকটী পত্রাঙ্ক স্থলে ৫২১—৫২৮ পড়িতে হইবে।

বেড়াতেন। তাঁর বাপ মা অবশ্য এত ছোট বয়সে এই থিয়েটারের নেশা আদবেই পছন্দ করতেন না। একদিন তো বেশ এক মজাই হয়ে গেল—হেনরি এক থিয়েটারে গিয়ে রীতিমত এক্টিংএর মহল্লা দিচ্ছেন এ দিকে তাঁর মা তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছেন। শেষটায় আর কোথাও না পেয়ে তিনি সেই থিয়েটারে এসে উপস্থিত—তার পর আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে হেন্‌রির কাণটা ধরে হিড়্ হিড়্ করে টেনে নিয়ে গেলেন।

এলেন টেরি।

এই থিয়েটারটার নাম হচ্ছে স্যাডলারস্ ওয়েল্‌স্ থিয়েটার—এখানকারই একজন কিন্তু প্রথমে হেন্‌রির গুপ্ত প্রতিভার পরিচয় পেয়ে গেলেন। তিনি তাঁকে নিয়ে গেলেন স্যামুয়েল ফেল্‌পস্ নামে খুব নামজাদা এক অভিনেতার কাছে। অভিনেতা হেন্‌রির আবৃত্তি শুনে খুব খুসী হলেন বটে কিন্তু থিয়েটারে যোগ দিতে বারণ করলেন। হেন্‌রির কথাটা ভাল লাগ্‌ল না—তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে ফেলেছেন—সেদিকে তাঁকে যেতেই হবে।

তিনি প্রাণ মন একত্র করে অভিনয় করে যেতে লাগলেন। কিন্তু প্রায়ই লোকের কাছ থেকে পুরস্কার আস্‌তে লাগল হাসি ঠাট্টা, চীৎকার বিদ্রূপ। বেচারা প্রায় হতাশ হয়ে পড়লো—কেউ বলে, তিনি যখন ষ্টেজে দাঁড়ান্ তাঁর হাত-পা গুলো তখন বিশ্রী দেখা যায়, কেউ বলে তাঁর গলার স্বর যাচ্ছে তাই ইত্যাদি। কিন্তু সব চেয়ে মারাত্মক দোষ হোল তাঁর ভয়—ষ্টেজে এসে দাঁড়ালেই যেন ১০৫° ডিগ্রী ম্যালেরিয়া জ্বর। ঘাবড়ে গিয়ে অনেক সময় পার্ট টার্ট বিল্‌কুল্ ভুলে যেতেন—অনেক সময় আবার যা তা বলে বস্‌তেন।

এই অভিনেতাই একদিন তাঁর দেশকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর যে অসাধারণ ক্ষমতা আছে সেটা তিনি জান্‌তেন এবং আরও জান্‌তেন যে কতকগুলি বাইরের গলদে সে ক্ষমতা চাপা পড়ে রয়েছে—সেটা কাটাতে পারলেই হলো।

বেট্‌ম্যান্ নামে এক ধনী একটা থিয়েটারের নতুন দল গড়ছিলেন, হেন্‌রি তাঁর সাথে গিয়ে জুটে পড়লেন। কিন্তু সে দল টিকল না। তখন হেন্‌রি একটা ফরাসী নাটকের তর্জ্জমার খস্‌ড়া হাতে নিয়ে বেটম্যান্‌কে বল্লেন, সেটার অভিনয় করলে জম্‌বে ভাল।



বেটম্যান্ বল্লেন "ও রদ্দি মাল, চল্‌বে না।" হেন্‌রি জবাব দিলেন "আমি নায়কের পার্ট্ নেব।" সবাই তো হেসেই আকুল! একে রদ্দি বই, তাতে আবার নায়ক সাজ্‌বেন হেন্‌রি আর্ভিং, মিলেছে ভাল! শেষটায় অনেক বলাকওয়া করতে বেটম্যান্ রাজি হলেন—সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল ব্যাপারটা দেখবার জন্যে—কি হয়।

হেন্‌রির সেদিন অগ্নিপরীক্ষা! পনর বছর ধরে যে কাজ করছেন আজ তার বিচার হবে। নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে তিনি কেবল মহল্লাই দিতে লাগলেন। রাত্রে থিয়েটারে যারা ঠাট্টা করবে ভেবে এসেছিল অবাক্ হয়ে তারা বল্লে এ রকম নিখুঁৎ অভিনয় জীবনে কখনো কেউ দেখে নি। এক রাত্রে লণ্ডন জয় হয়ে গেল।

এইবার তাঁর জীবনের সব চাইতে যা বড় আকাঙ্ক্ষা তাই পূর্ণ করার সুযোগ এল—অমর কবি শেক্‌স্‌পিয়ারের নাটকগুলো ষ্টেজে ফুটিয়ে তোলা। শেক্‌স্‌পিয়ারের চাইতে প্রিয় আর তাঁর কিছুই ছিল না। এতবার তাঁর বই তিনি পড়েছিলেন যে কোন কোন বই—যেমন হ্যাম্‌লেট্—তিনি আগাগোড়া মুখস্থ ব'লে যেতে পারতেন। হেনরি-আর্ভিংয়ের শেক্‌স্‌পিয়ার অভিনয় একটা প্রবাদবাক্যের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শেক্‌স্‌পিয়রের নাটক ভাল করে অভিনয় করবার জন্য তিনি এমন একজন অভিনেত্রীকে তাঁর থিয়েটারে আহ্বান করে আনলেন যাঁর নাম ইংল্যাণ্ড থেকে মুছে যাবার নয়। ইংল্যাণ্ডের সৌভাগ্য যে এক সঙ্গে এই দুই অপূর্ব্ব প্রতিভা সে দেখ্‌তে পেলে। ২০০।২৫০ বছর আগে শেক্‌স্‌পিয়র যে সব জীবন্ত ছবি এঁকে গিয়েছিলেন, বিলেতের লোকেরা তাদের চোখের সাম্‌নে আবার তা হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, দেখ্‌তে পেল।

এই অভিনেত্রীই হচ্ছেন এলেন টেরি। টেরির ছোটবেলাটা কিন্তু ঠিক্ আর্ভিংএর মত নয়, কেননা তাঁর মা-বাপ দুজনাই ছিলেন থিয়েটারের চাঁই। টেরিকেও কিন্তু আস্তে আস্তে, ধাপে ধাপে উঠ্‌তে হয়েছিল। মাঝখানে দু'এক বার তিনি থিয়েটারের সম্পর্ক ছেড়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষটায় তাঁকে থিয়েটারে বরাবরকার মত ঢুকে পড়বার উপদেশ দিলেন একজন বড় ইংরাজ ঔপন্যাসিক—নাম চার্ল্‌স্ রীড্।

এলেন ও আর্ভিং দুজনে মিলে যে রসের স্রোত ইলংণ্ডে বইয়ে দিলেন তা অপূর্ব্ব! প্রতিদিন তাঁদের দু'জনার অভিনয়কলা দেখে ইংলণ্ডবাসী জয়জয়কার করে উঠ্‌ল। তাঁরাও আবার দুজনে দু'জনার প্রতিভা দেখে অবাক্ হ'য়ে যেতেন।

জগৎ-জোড়া নাম এঁরা করলেন বটে, কিন্তু পয়সা কেউই তেমন রোজগার করতে পারেন নি—এমন্ কি অনেক সময় টাকার অভাবে তাঁদের কষ্টও পেতে হ'য়েছে। কিন্তু যশ তাঁদের অবিনশ্বর।

আর্ভিংয়ের পর স্যার হারবর্ট ট্রি নামে আর একজন মহা শক্তিশালী অভিনেতাকে

স্যার হারবার্ট ট্রি।

ইংলণ্ড পেয়েছিল। কিন্তু তাঁর কথা শোনাবার আজকে আর আমার সময় নেই।

———:*:———

**দ্রষ্টব্যঃ**—(২) পূজার 'রামধনু' খানা পড়িয়া যাহাতে সর্ব্বসাধারণেই আনন্দ পায় সেই জন্য ধারাবাহিক গল্পগুলি এ সংখ্যায় বাদ দেওয়া হইল। "ভাবীসাহিত্যিকের বৈঠকও" সেই জন্যই বাহির করা হইল না। অগ্রহায়ণ হইতে আবার পূর্ব্বের ধারা বজায় রাখা হইবে।

## বাংলার যুবক-বীর

আজকাল বাংলাদেশে শরীরচর্চ্চাটা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। এটা একটা মস্ত সুলক্ষণ বলিতে হইবে। 'রামধনু'র পাঠক পাঠিকারা গোপালচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, ভূপেশচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বিষ্ণুচরণ প্রভৃতি যুবক বীরদের পরিচয় পাইয়াছ। আজ আর একজনের চেহারা দেখিয়া রাখ—ইঁহার নাম ষোড়শী গাঙ্গুলী, ইনি ভবানীপুর আশুতোষ কলেজে পড়েন। আশুতোষ কলেজের দিগিন্দ্রনাথ নামে আর একটি ছাত্র আজকাল বাংলা-জোড়া নাম করিতেছেন, তিনি নাকি তিনখানি মোটর থামাইতে পারেন। এঁরাই তো দেশের গর্ব্ব!

আশুতোষ কলেজের ছাত্র ষোড়শী গাঙ্গুলী

## চুম্বকের শক্তি

চুম্বক কাহাকে বলে তাহা তোমরা বোধ হয় জান। চুম্বকের এক আশ্চর্য্য গুণ আছে—কোন লোহার জিনিষ তাহার কাছে লইলে চুম্বক তাহা টানিয়া ধরে। ছবিতে দেখ একটা

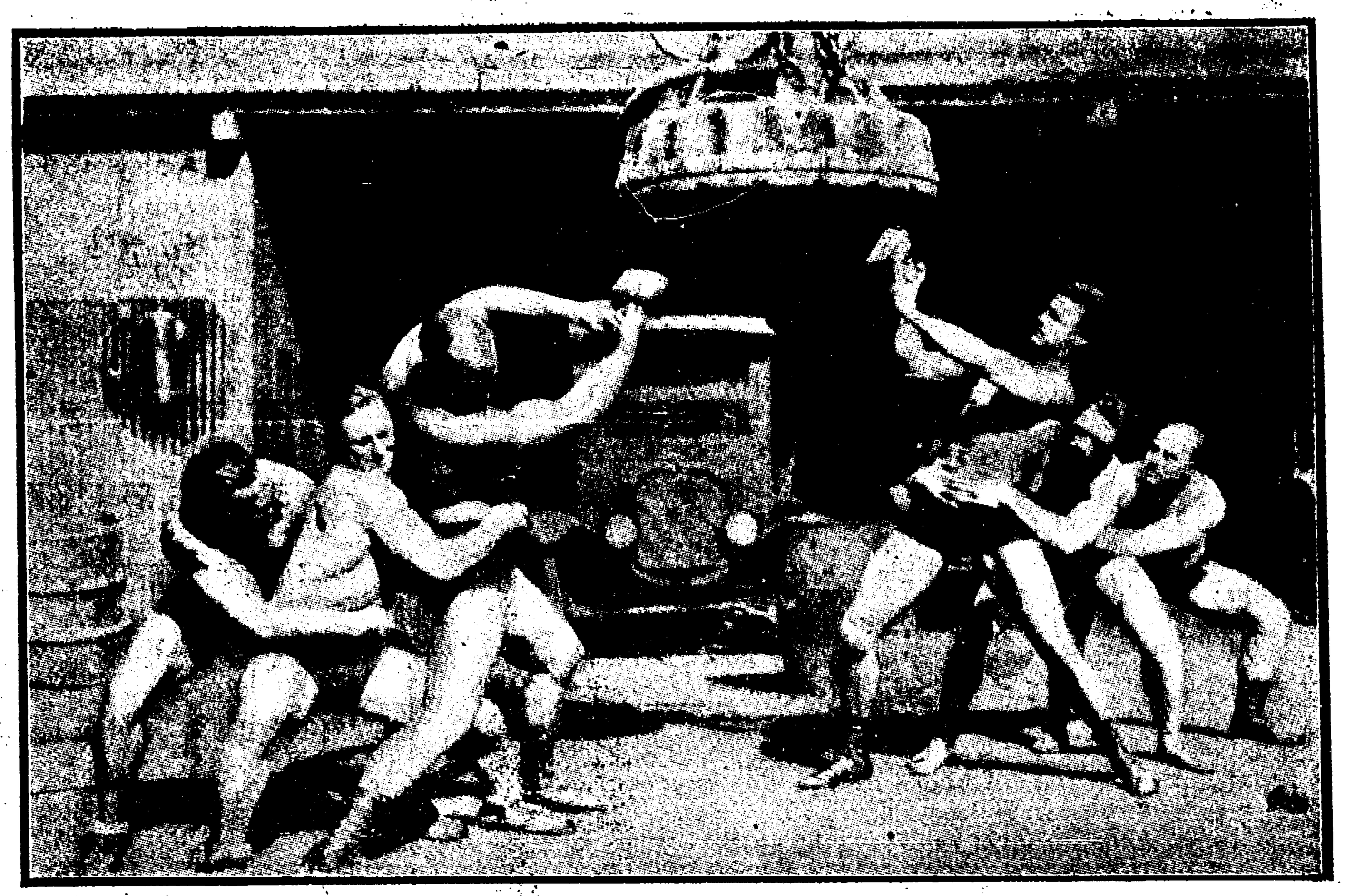

চুম্বকের শক্তি

চুম্বক ২টা লোহার হাতুড়ীকে কেমন ভয়ানক জোরে টানিয়া ধরিয়াছে। দুধার হইতে অত গুলি ভীমের মত পালোয়ান লোক চুম্বকের টান হইতে হাতুড়ী ছাড়াইতে পারিতেছে না।

## গত মাসের ধাঁধার উত্তর

### লাইন কয়টি এইরূপ হইবে ঃ—

সেদিন হু(গলি)তে যা বি(পদে) (পড়া) গিয়াছিল ভা(বিলে)ও (দে)(হে)র (রক্ত) (জমি)য়া যায়। (আম)রা (সংখ্যায়) (ছিলা)ম (বেশ) (পুরু), তাই কো (নরক)মে বাঁ(চা) গেল। (অনিল), (অর্দ্ধেন্দু), (নিশিকান্ত), এ(রাই) ত' স(বার) (চেয়ে) সাহসী, (তারা) ও (রীতিমত) শি(হরি)য়া উঠিয়াছিল।

## উত্তরদাতাদের নাম

### যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন ঃ—

সুধীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ ( দিনাজপুর ), অমিয়কুমার সেন ( কুমিল্লা ), কমলা বসু (আমতা), শিশিরকুমার রায় (বসিরহাট), রমাপ্রসাদ চৌধুরী ( এণ্টালি, কলিকাতা), বরেন্দ্রকুমার পাল (কটক), বাণীকান্ত ভট্টাচার্য্য ( গড়পার, কলিকাতা), সন্তোষ কুমার বেরা ও যদুপতি মাইতি (কলাগাছিয়া), গুণদাপ্রসাদ মুখার্জ্জী (দিল্লী), নগেন্দ্রচন্দ্র বণিক, নরেশ, যোগেশ ও লালমোহন (কামালপুর), গোকুলানন্দ দাস (রংপুর), হরিদাস বণিক, সৌদামিনী ও শ্রীবাস (কামালপুর), সনৎ, নিতাই, শিবাণী, পিণ্টু ও প্রভাত (কালিম্পং), বিজয় ভূষণ ও বিনয় ভূষণ ভট্টাচার্য্য ( রংপুর), তোফাতল হোসেন ও তাঁহার বন্ধুরা (কামারজানি), নরেন্দ্র নাথ কামলে, সরোজমোহন চট্টোপাধ্যায় (এলাহাবাদ)

### যাঁহাদের একটি মাত্র ভুল হইয়াছে ঃ—

রমাপতি অর্ণব (সরিষা), শিবপদ সেনগুপ্ত (বাইশরশি), নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অনাদি (ধূলগ্রাম), পরমেশ, অরুণা, প্রীতীশ সরকার (কালিম্পং), কালিদাস পাঠমন্দির ও অনুশীলন সঙ্ঘের ভ্রাতৃবৃন্দ, (কণেশ্বর), মনোজিত বসু (কুড়িগ্রাম), অমরেশচন্দ্র বসু (হাওড়া), নারায়ণদাস নন্দী (নবদ্বীপ), কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় (লাহোর)। পারিজাত রেণু দেবী (মহিমাগঞ্জ)।

### যাঁহারা আংশিক উত্তর দিয়াছেন ঃ—

সুনীতি দেবী (ভাগলপুর), মীরা ও স্বদেশ (ফরিদপুর), পঞ্চানন মুখার্জ্জী (কলিকাতা), লক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী ও তাহার ভগিনীগণ (শ্রীরামপুর), অরুণকুমার বসু ও মিস্ গীতা ঘোষ (বগু সরাই), লক্ষ্মীময়ী দেবী (সাওগাঁ), রতনমণি ভট্টাচার্য্য ও সরোজ (ভবানীপুর), কামাখ্যারঞ্জন ও চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত (কালিঘাট), সদানন্দ সাহা ও পুষ্পরাণী সাহা (মেদিনীপুর), মিস্ মাহ্‌মুদা হোসেন (টাঙ্গাইল), বীরেন্দ্রলাল সেন (ছনহরা), তরুণ সুহৃদ্ সঙ্ঘের সভ্যগণ (পেগু, বর্ম্মা)।

## নূতন ধাঁধা

এক বৃদ্ধ গৃহস্থের ১৬টি গরু ছিল। পাছে গোলমাল হইয়া যায় এই জন্য তিনি গরুগুলির উপর ১নং, ২নং, ৩নং, এমনিভাবে নম্বর দিয়া রাখিয়া ছিলেন। আরও মজা ছিল এই—যে, গরুগুলি যেটা যত নম্বরের সেটা ঠিক তত সের দুধ দিত। ১নং গরুটি দিত ১সের দুধ, ২নং গরু দিত ২ সের, ৩নং ৩ সের……এমনিভাবে; ১৬ নং গরু রোজ ১৬ সের দুধ দিত।

বৃদ্ধ মরিবার সময় তাঁর চার ছেলেদের মধ্যে গরুগুলি সমান ভাগে ভাগ করিয়া দিলেন। তার পর দিন হইতে দেখা গেল প্রত্যেক ছেলেই রোজ সমান পরিমাণ দুধ পাইতেছে।

বল দেখি কোন্ ছেলের ভাগে কোন্ কোন্ নম্বরের গরু পড়িয়াছিল?

শ্রীরণেন্দ্রমোহন রায়
ও
শ্রীমাখনলাল অধিকারী।

## পূর্ব্ব বাংলার শিশুদের শ্রেষ্ঠ মাসিক

তৃতীয় বর্ষ ] **রাজভোগ** [ বার্ষিক ২৲ টাকা

সম্পাদক শ্রীসুধাংশুশেখর গুপ্ত

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাণের ভিতরে আনন্দের ঢেউ তুলিয়া দিয়া 'রাজভোগ' তাহাদের নিত্য সঙ্গী হইয়াছে। নীরস বৈজ্ঞানিক তথ্য গল্পচ্ছলে বলিয়া দিয়া তাহাদের বিজ্ঞানের স্পৃহা জাগাইয়া দিয়াছে। সম্পাদকীয় বিভাগের 'থবরাথবর' 'পাঁচ মশলা' ইত্যাদি রচনায় শিশুদের কচি বুকে এক স্বাধীন চিন্তার ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আশ্বিন মাস হইতে 'কুট্‌কুটের দপ্তর'-প্রণেতা সুলেখক যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মিষ্টি শিশু-উপন্যাস বাহির হইবে :—এথনি থবর দিন—

শ্রীবীরেন্দ্র তপাদার

রাজভোগ কার্য্যালয়, পোঃ উয়ারী, ঢাকা।

---

আনন্দ সংবাদ ! আনন্দ সংবাদ !!

শিশু-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক—

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্তের

**আক্কেল গুড়ুম—।০**

হাস্যরসের অফুরন্ত ফোয়ারা।

সুলেখিকা অপর্ণা দেবীর—

**বীর রাণী—।০**

গ্রন্থখানি সুকুমারমতি বালকবালিকাদের বিশেষ উপকারে আসিবে। ইহাতে ধর্ম্মের জয়, বীরত্বের পুরস্কার ইত্যাদি বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত লেখিকার—

**বাহাদুর**

**ও**

**সাগর-পারের গল্পকথা**

পূজার পর বাহির হইবে।

স্ত্রী—ভূমিকা হীন ছেলেদের নাটক

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্তের—

**কর্ণ—॥০,**

**চিতোর গৌরব—॥০,**

**ন'দের পাগল—॥০,**

**সিদ্ধার্থ—॥০,**

**গুরু রামদাস—॥০,**

**টাকার পূজা—(যন্ত্রস্থ)।**

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সেন, বি-এল্ প্রণীত

**অস্ত্রলাভ—।৴০**

ছোটদের পৌরাণিক নাটক।

প্রকাশক—

যোগেন্দ্র পাবলিশিং হাউস্।

১১৮, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, সালিখা, হাওড়া।




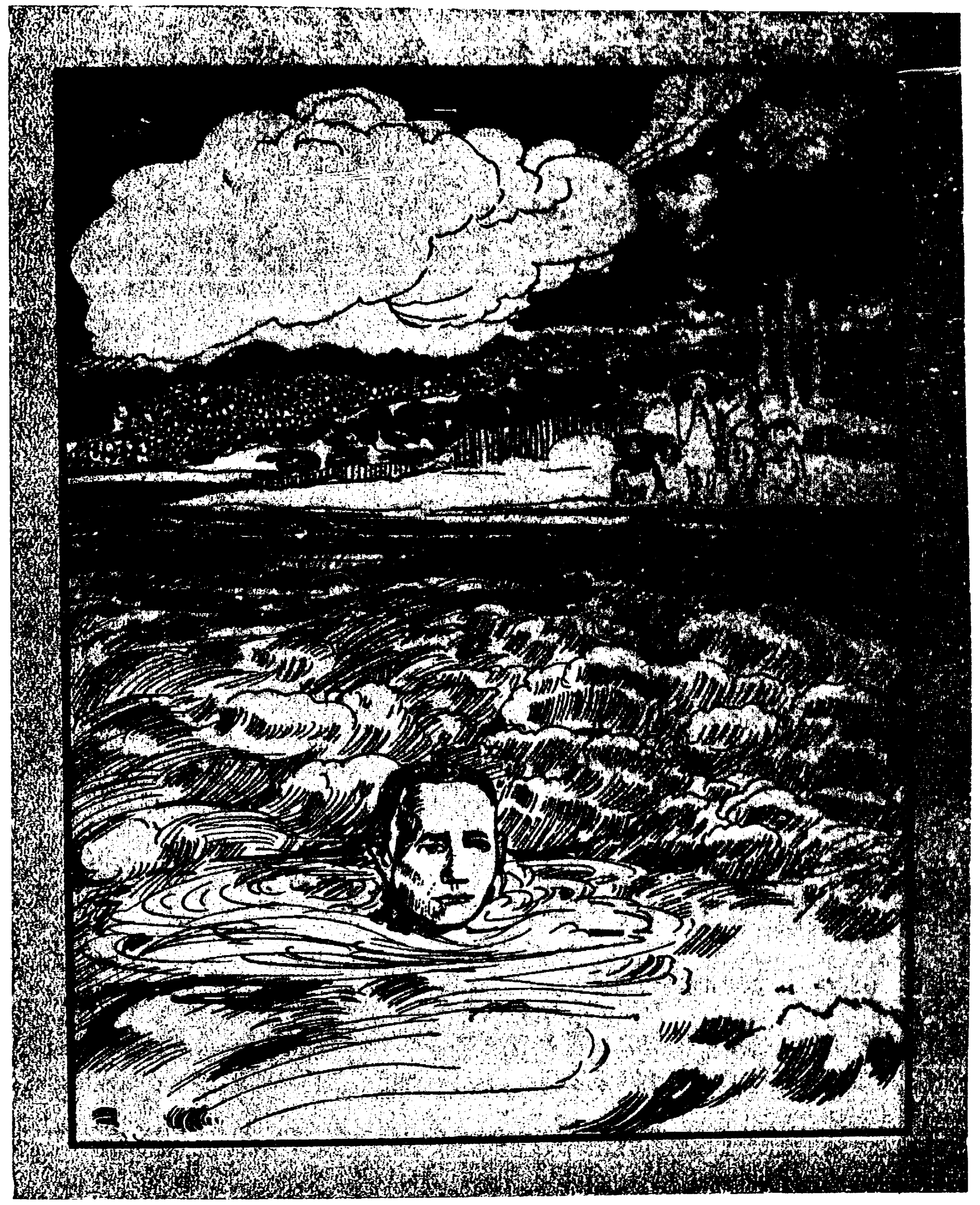

**চিত্রে বিদ্যাসাগর-জীবনী-৭**

মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর

শিল্পী—শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত ]

[ চিত্র-পরিচয় দেখ

পূর্ব্ব বাংলায় শিশুদের শ্রেষ্ঠ মাসিক

তৃতীয় বর্ষ ] রাজভোগ [ বার্ষিক ২৲ টাকা

সম্পাদক শ্রীসুধাংশুশেখর গুপ্ত

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাণের ভিতরে আনন্দের ঢেউ তুলিয়া দিয়া 'রাজভোগ' তাহাদের নিত্য সঙ্গী হইয়াছে। নীরস বৈজ্ঞানিক তথ্য গল্পচ্ছলে বলিয়া দিয়া তাহাদের বিজ্ঞানের স্পৃহা জাগাইয়া দিয়াছে। সম্পাদকীয় বিভাগের 'খবরাখবর' 'পাঁচ মশলা' ইত্যাদি রচনায় শিশুদের কচি বুকে এক স্বাধীন চিন্তার ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আশ্বিন মাস হইতে 'কুট্‌কুটের দপ্তর'-প্রণেতা সুলেখক যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মিষ্টি শিশু-উপন্যাস বাহির হইবে :—এখনি খবর দিন—

শ্রীবীরেন্দ্র তপাদার
রাজভোগ কার্য্যালয়, পোঃ উয়ারী, ঢাকা।

আনন্দ সংবাদ ! আনন্দ সংবাদ !!

শিশু-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক—
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্তের

আক্কেল গুড়ুম—।০

হাস্যরসের অফুরন্ত ফোয়ারা।

সুলেখিকা অপর্ণা দেবীর—

বীর রাণী—।০

গ্রন্থখানি সুকুমারমতি বালকবালিকাদের বিশেষ উপকারে আসিবে। ইহাতে ধর্ম্মের জয়, বীরত্বের পুরস্কার ইত্যাদি বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত লেখিকার—

বাহাদুর
ও
সাগর-পারের গল্পকথা

পূজার পর বাহির হইবে।

স্ত্রী—ভূমিকা হীন ছেলেদের নাটক

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্তের—

কর্ণ—॥০,
চিতোর গৌরব—॥০,
ন'দের পাগল—॥০,
সিদ্ধার্থ—॥০,
গুরু রামদাস—॥০,
টাকার পূজা—(যন্ত্রস্থ)।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সেন, বি-এল্ প্রণীত

অস্ত্রলাভ—।৵০

ছোটদের পৌরাণিক নাটক।

প্রকাশক—
যোগেন্দ্র পাবলিশিং হাউস্।
১১৮, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, সালিখা, হাওড়া।

## চিত্রে বিদ্যাসাগর-জীবনী—৯

মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর

শিল্পী—শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত ] [ চিত্র-পরিচয় দেখ

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE

২য় বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ { ১১শ সংখ্যা

# আশ্বাস

( শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম-এ )

দাদার মত আমি যখন বড় হব, মাগো,
কষ্ট কিছু তোমায় এত কর্‌তে হবে না গো।
কাপড় তোলা, ঘর ঝাঁটান', সন্ধ্যা জ্বালা ঘরে,
নিত্যি দেখো ঠিক্ মত সব রাখ্‌বো আমি করে'।

অফিস্ থেকে ফির্‌লে বাবা, খড়ম পেড়ে' তার
রাখ্‌বো আমি দুয়োর-গোড়ে ; গাম্‌ছা গাড়ু আর,
জলখাবারের রেকাব বাটি, গেলাস ভরা জল,
যখন যেটি লাগ্‌বে সেটি রাখ্‌বো অবিকল।

'চান্' করা'য়ে খোকারে মা, টবের গরম জলে,
কোঁক্ড়া চুলে ঝুঁট'টি বেঁধে টিপ্ পড়াব ভালে।
গরম জামা গা'য়ে দিয়ে তার মারবো গালে টোকা,
চুমু খেয়ে রাঙা গালে, বলব 'ছোণাল খোকা'।

বাট্না বাটা, কুট্নো কোটা তোমার সাথে সাথে,
সকাল সাঁঝে সকল কাজে শিখবো হাতে হাতে।
দুপুর বেলা মাদুর পেতে' শিউলী ঝাড়ের পাছে
'রামায়ণ' আর 'মহাভারত' পড়বো তোমার কাছে।

* * * *

এখন তুমি কষ্ট যত করছো মোদের তরে,
একটুও তার থাক্‌বে না মা, কয়টি বছর পরে।
বড় হলেও, দিদির মত, তোমাদের সব ছাড়ি'—
সত্যি জেনো, যেতে আমি চাইনে শ্বশুর বাড়ী।

---

# থেসেলির রাণী

(শ্রীমতী মণিকা দেবী)

সমস্ত থেসেলি রাজ্যটাতে কান্নার রোল পড়ে গেছে, প্রজাদের কারুর মুখে হাসির লেশ্টুকুও নেই। গোটা রাজ প্রাসাদটী শোকে নিঝুম হয়ে পড়েছে—সকলেরই মুখে কেমন যেন একটা শোক এবং নৈরাশ্যের ছায়া এসে পড়েছে।

সর্ব্বজনপ্রিয় থেসেলিরাজ এড্‌মিটাস্ আজ মৃত্যুশয্যায় পড়ে। তাঁর সবে এই তরুণ বয়স, এই বয়সেই প্রিয়তমা পত্নী এবং সন্তানতুল্য প্রজাদের ছেড়ে তাঁকে কোন্ অজানা দেশে চলে যেতে হবে—একি কম আফ্‌শোসের কথা! সবাই কাতর ভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কচ্ছে, "হে পরমেশ্বর, অন্ততঃ এই বারটী



আমাদের রাজাকে নিষ্কৃতি দাও।" রাজা এড্‌মিটাস্ নিজে বীরপুরুষ, মৃত্যুকে তিনি এতটুকু ভয় করেন না, কিন্তু রাণী এল্‌সেস্‌টিসের দশা দেখে তিনি নিজেও আর স্থির থাক্‌তে পার্‌ছেন না।

এড্‌মিটাসের খুব বড় একজন মুরুব্বি ছিলেন তপনদেব এপোলো। দেবরাজ জিউস্ চটে গিয়ে অভিশাপ দেওয়ায় এই এপোলোকে একবার পৃথিবীতে এসে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। সে সময় রাজা এড্‌মিটাসের কাছে তিনি যে মিষ্টি ব্যবহার পেয়েছিলেন তা তিনি ভুল্‌তে পারেন নি, সেই থেকে এড্‌মিটাস ছিলেন এপোলো দেবের পরম স্নেহের পাত্র। তিনি যে সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা এল্‌সেস্‌টিস্‌কে নিজের রাণীরূপে পেতে পেরেছিলেন, সেও এই দেবতারই কৃপায়।

রাজা ও রাণীকে দেখ্‌বার জন্য এপোলো প্রায়ই মাঝে মাঝে থেসেলিতে বেড়াতে আস্‌তেন, রাজার অসুখের সংবাদ শুনে আজও ছুটে এলেন। রাণী এল্‌সেস্‌টিস্ কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পায়ে আছড়ে পড়ে বল্লেন, "প্রভু, আপনার কৃপায়ই আমি মহারাজ এড্‌মিটাস্‌কে স্বামিরূপে পেয়েছিলাম, আজ এই দারুণ বিপদে আপনি ছাড়া কে আর তাঁকে রক্ষা করবে? দেবতারা বোধ হয় সবাই আমার ওপর বিরূপ হয়েছেন—নইলে এ দারুণ বিপদ্ আমার হবে কেন? কিন্তু প্রভু, আপনি আমাদের পায়ে ঠেল্‌বেন না।"

এপোলোর চোখ জলে ভরে এল, তিনি কাতরভাবে বল্‌লেন, "এল্‌সেস্‌টিস্, তুমি কি মনে কর তোমাদের এ বিপদেও আমি চুপচাপ বসে থাক্‌তে পেরেছি? ভাগ্যদেবীরা—যাঁরা মানুষের নিয়তি নিয়ে খেলা কর্‌ছেন—তাঁদেরকে পর্য্যন্ত আমি ধরেছিলাম। তাঁরা বলেছেন, একটী মাত্র কাজ করতে পারলে মহারাজকে এ যাত্রা তাঁরা নিষ্কৃতি দেবেন। কিন্তু রাণী সে বড় কঠিন কাজ, কেউ বোধ হয় সে কাজ কর্‌তে এগুবে না।"

রাণী অধীর হয়ে বল্লেন, "আমাকে আর অনিশ্চিতের মধ্যে রাখ্‌বেন না দেব, বলুন, সে কি কাজ, দয়া করে বলুন।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দেবতা বল্লেন, "যদি মহারাজের বদলে আর কেউ

তার নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে রাজী হয়, তবেই তিনি জীবন ফিরে পাবেন। কিন্তু তাতে কি কেউ রাজী হবে ?”

“ও, এই কথা ?” বল্‌তে বল্‌তে রাণীর সুন্দর মুখখানা অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে তাঁকে আরও সুন্দর করে তুল্‌লে। তিনি বল্‌লেন, “আমার এ তুচ্ছ জীবনের বদলে যদি মহারাজের অত বড় প্রাণটা পাওয়া যায় তো এক্ষুনি হাসি মুখে সে প্রাণ বিসর্জ্জন দেব।”

তাই হ’ল। রাণী মানা শুন্‌লেন না। প্রাসাদটীকে মহারাজ এড্‌মিটাসের মনের মত করে সাজিয়ে রেখে, সমস্ত ব্যবস্থা করে, নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের প্রাণ তিনি বিসর্জ্জন দিলেন।

মহারাজ এড্‌মিটাস্ সুস্থ-সবল হয়ে উঠ্‌লেন বটে, কিন্তু মনের সুখ-শান্তি আর ফিরে পেলেন না। রাণীর যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে জিনিষটী চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হল। রাজ-প্রাসাদ নিরবিচ্ছিন্ন শোকে আচ্ছন্ন হয়ে রইল—কোনও আমোদ প্রমোদ নেই। মায়ের মত রাণীকে হারিয়ে প্রজাদের মুখের হাসিও যেন চিরদিনের মত নিভে গেল।

এই রকম তো ব্যাপার চল্‌ছে, এর মধ্যে হঠাৎ একদিন কোত্থেকে এড্‌মিটাসের বন্ধু জগদ্বিখ্যাত বীর হারকিউলিস্ এসে উপস্থিত। হারকিউলিসের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। আমরা যেমন বলি এ যুগের ‘ভীম,’ ওরা তেমনি বলে, একালের ‘হারকিউলিস্’। ভদ্রলোক জানেনও না এড্‌মিটাসের কত বড় বিপদ্ হয়ে গেছে, তাই এসেই বল্লেন “ভায়া হে, তোফা এক ভোজ লাগাও তো !” বন্ধুবর হারকিউলিসের সম্মানের জন্য এড্‌মিটাস্ নিজের মনের দুঃখ মনে চেপে রেখে ভোজের আয়োজন কর্‌লেন। সেই নিরানন্দ প্রাসাদ হারকিউলিসের আগমনে আবার যেন হেসে উঠ্‌ল। বন্ধুর প্রীতিসাধনের জন্য এড্‌মিটাস্‌ও ভোজে নিজে পর্য্যন্ত গিয়ে যোগ দিলেন।

অনেক রাত্রে শুতে যাবার সময় রাজবাড়ীর এক পুরান চাকর হারকিউলিস্‌কে নিরিবিলি একটা জায়গায় ডেকে নিয়ে তাঁর বন্ধু রাজা এড্‌-



মিটাসের যে কী বিপদ্ হয়ে গেছে সব ভেঙ্গে বল্লে। শুনে তো হারকিউলিস্ স্তম্ভিত ! য়্যাঁ বলে কি, নিজের মনের এই দারুণ শোক ঢাকা দিয়ে শুধু বন্ধুকে খুসী কররার জন্য বাইরে হাসিমুখ বজায় রেখে এত বড় একটা ভোজের আয়োজন করে ফেল্লে ! শুধু তাই নয়, নিজে এসে যোগ দিলে পর্য্যন্ত। এত বড় একটা উদার মহান্ প্রাণ তো সচরাচর দেখা যায় না !

হারকিউলিস্ নিজেই যে এ সবের কারণ, তা ভেবে তিনি একটু লজ্জিত হলেন, কিন্তু কর্ত্তব্য ঠিক করে ফেল্লেন তৎক্ষণাৎ ! এত বড় দুটো বলিষ্ঠ বাহু তিনি কি জন্য রেখেছেন যদি এমন উদার বন্ধুর একটু উপকারই না কর্‌তে পার্‌লেন—সেই রাত্রেই যমরাজ প্লুটোর কাছ থেকে তিনি রাণী এল্‌সেস্‌টিস্‌কে ছিনিয়ে উদ্ধার করে আন্‌বেন।

যমরাজ প্লুটোর সাথে হারকিউলিসের যুদ্ধ

সেদিন গভীর রাত্রে নরক-রাজ্যের সীমানায় যে কি ভীষণ ব্যাপারখানা হল, ভেবে দেখ। একদিকে জগদ্বিখ্যাত বীর হারকিউলিস্, অন্যদিকে যমরাজ প্লুটো ! কী দারুণ যুদ্ধ যে বাধ্‌ল তা আর কি বল্‌ব ? দুজনেই প্রায় সমান যোদ্ধা। অবশেষে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর বীরশ্রেষ্ঠ হারকিউলিস্ প্লুটোকে যুদ্ধে হারিয়ে, রাণী এল্‌সেস্‌টিস্‌কে প্লুটোর কবল থেকে উদ্ধার করে সেই রাত্রেই থেসেলি রাজ্যের দিকে ছুট্‌লেন।

এদিকে তার পর দিন সকালে এড্‌মিটাস তো তত্ত্ব-তালাস নিতে হারকিউলিসের ঘরে এসে উপস্থিত। এসে দেখেন ঘর শূন্য। ব্যাপারটা কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে তিনি সবার কাছে খোঁজ নিতে সুরু কর্‌লেন। শেষটায় সেই পুরানো চাকরটা এসে বল্লে, কাল শুতে যাবার আগে হারকিউলিস্‌কে সে রাণী-মার মৃত্যু-সংবাদ দিয়েছে, আর সেই সংবাদ শুনেই হারকিউলিস্ রাত্রেই প্রাসাদ ছেড়ে কোথায় চলে গেছেন। রাজা বুঝ্‌লেন হারকিউলিস্ লজ্জিত হয়ে চলে গেছেন, তাই ভৃত্যকে বল্লেন, "কেন তুমি তাঁকে ওসব কথা বল্‌তে গেলে? মনে লজ্জা পেয়ে চলে গেছেন, আর হয়তো জীবনে কখনো এমুখো হবেনই না। হায়, হায়, স্ত্রীকে হারিয়েছি, আজ বুঝি আবার বন্ধুকেও হারাতে বস্‌লাম।"

ঠিক্ এম্‌নি সময়ে কে এসে পেছন থেকে রাজার কাঁধে হাত দিলে। রাজা চম্‌কে ফিরে চেয়ে দেখেন, হারকিউলিস্ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ছেন, "ভায়া হে, হারকিউলিস্‌কে হারান বড় সহজ কথা নয়, দেখ্‌তো আমার সঙ্গে কে?"

রাজা অবাক্ হয়ে দেখ্‌লেন, তাঁর হারানো মাণিক—রাণী এল্‌সেস্‌টিস্!

হারকিউলিস্ আর এক গাল হেসে বল্লেন, "প্লুটোর হাত থেকে এঁকে উদ্ধার করবার জন্যই আমি হঠাৎ রাজ-প্রাসাদ ছেড়ে গিয়েছিলাম।"

তারপর বিস্মিত ও আনন্দিত এড্‌মিটাসের হাতে তিনি রাণী এল্‌সেস্‌টিস্‌কে সঁপে দিলেন। যে শোকের কাল মেঘ সমস্ত থেসেলি রাজ্য ছেয়ে ফেলেছিল, হারকিউলিস্ উত্তরে বাতাসের মত এসে সে সব মেঘ কোথায় উড়িয়ে দিলেন। থেসেলি রাজ্যে আবার আনন্দের বান এল।

---

# অলঙ্কারের কথা

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্-সি)

আমাদের বাড়ীতে একটি হিন্দুস্থানী রাঁধুনে বামুন আছে, মাথায় তার চুল গজাইবার উপায় নাই। আধ ইঞ্চি লম্বা হইতে না হইতেই দেখি বাবাজী ক্ষুর দিয়া তাহা বেমালুম সাফ করিয়া দেন; শুধু সেই চক্‌চকে বেলের মধ্যে বোঁটার মত একগাছা টিকি বাহির হইয়া থাকে। যদি জিজ্ঞাসা করি—"ঠাকুর, বলি মাথা নেড়া কর্‌লে কেন? বেশ ত চুল ছিল, সুন্দর দেখাত।" ঠাকুর জবাব দেয়, "হামার দেশে ওহি রকমটী আছে।" অর্থাৎ, তুমি কি বুঝিবে বেরসিক, আমাদের হিন্দুস্থান দেশীয় লোকেদের মতে মানুষের রূপটা নেড়া মাথাতেই বেশী খোলে।

কিসে নিজেকে সুন্দর দেখাইবে মানুষের ঝোকটা বরাবরই সেইদিকে। সেই আদ্যিকালের গুহা-মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া এখনকার অতি সভ্যদের মধ্যেও নিজেকে সাজাইবার সখটা যায় নাই। তবে এই সাজাইবার রুচিটা এক এক জনের এক এক রকম। উড়িষ্যায় যাও, সেখানে গিয়া শুনিবে—মাথার সম্মুখ দিকটা কামাইয়া পিছন দিকটায় মস্ত ঝুঁটি রাখিলেই তোমার চেহারার বাহার খুলিবে। আবার একটু সরিয়া সাঁওতালদের দেশে যাও, সেখানে শুনিবে—মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল রাখিয়া সেগুলিকে ফাঁপাইয়া বাবরী করিয়া রাখাটাই সৌন্দর্য্যের লক্ষণ।

মাস কয়েক আগেকার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে—আর একটু হইলে কি মুস্কিলেই না পড়িতাম! ট্রামে চড়িয়া যাইতেছি, হঠাৎ মোটাসোটা, ভুঁড়িওয়ালা, দাড়ী গোঁফ-কামান একটী সাহেব উঠিয়া বেঞ্চির অপর পাশে গিয়া বসিল। দেখিলাম সাহেবের নাকের নীচে প্রায় সিকি ইঞ্চি জায়গা জুড়িয়া খানিকটা নস্যি লাগিয়া রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি করিয়া নস্যি গুঁজিতে গিয়া এই কাণ্ডটি ঘটিয়াছে, সাহেব টের পায় নাই। ভাবিলাম, একবার বলি—"সাহেব, তোমার নাকের নীচে এক টিপ নস্যি লাগিয়া রহিয়াছে যে, তুমি বোধ হয় টের পাও নাই।

রুমাল দিয়া ওটুকু পুছিয়া ফেল, বড় বিশ্রী দেখাইতেছে।" ভাগ্যিস্ বলি নাই। একটু পরেই সাহেব ট্রাম হইতে নামিয়া গেল। নামিবার সময় তার মুখের দিকে ভাল করিয়া চোখ পড়িতেই দেখিলাম—আসলে ওটা নস্যি নয়—গোঁফ। দু' পাশ কামাইয়া কামাইয়া সাহেব ওটাকে নাকের নীচে সিকি ইঞ্চি খানেক করিয়া ফেলিয়াছে। সাহেবদের দাড়ীগোঁফ ত' আর বাঙ্গালীদের মত কালো নয়,—লালচে, তাই দূর হইতে নস্যি বলিয়া ভুল হইয়াছিল।

সাহেবের এই সিকি ইঞ্চি গোঁফ ও আর কিছুই নয়, সৌন্দর্য্য বাড়াইবারই একটা অঙ্গ। বাঙ্গালীদের মধ্যেও আজকাল এ রকমটা মাঝে মাঝে দেখা যায়। এগুলি ত' গেল চুল দাড়ী সম্পর্কীয় সৌন্দর্য্যের কথা। কিন্তু নিজেকে ভাল করিয়া সাজাইতে হইলে শুধু ভগবানের দেওয়া শরীরটার একটু আধটু বদল করিলেই চলে না, বাহিরের জিনিষ আনিয়া শরীরে যুড়িতে হয়। এগুলিকেই আমরা বলি গয়না।

সেই আদ্যিকালের মানুষ, যারা বনে জঙ্গলে বাঘ-ভালুকের সাথে এক সঙ্গে জীবন কাটাইত তারাও এ জিনিষটা বুঝিত—তাই তখন হইতেই তাহারা গয়না পরিতে শিখিয়াছিল। তবে গয়না পরার সখটা পুরুষের চাইতে মেয়েদেরই ছিল বেশী—এখনও তাই। তখনকার দিনে ত' আর সোণা রূপার আমদানী হয় নাই, কাজেই সে সব গয়নাও ছিল খুবই সাধাসিধা। কয়েকটা মরা কুকুর-বিড়ালের মাথার খুলি, শূয়োরের দাঁত, আর পাখীর পালক একত্র করিয়া গাঁথিয়া গলায় পর, বাস্, হইয়া গেল গয়না। রূপ এইবার শতগুণ উছলাইয়া পড়িবে।

তারপর মানুষ যত সভ্য হইতে লাগিল তাদের গনারও তত উন্নতি হইতে লাগিল। মরার হাড়ের বদলে ধীরে ধীরে রং বেরং এর পাথরের ব্যবহার আরম্ভ হইল। তারপর যখন ধাতুর আবিষ্কার হইল তখন তাহাই হইল গয়নার আসল সরঞ্জাম। ধাতুকে গলাইয়া, বাঁকাইয়া নানা রকম আকারে ঢালিয়া নিত্যি নতুন ফ্যাসানের গয়নার সৃষ্টি হইল।



পৃথিবীর যে সব জায়গা এখনও ততটা সভ্য হয় নাই, সে সব জায়গার লোকেরা এখনও নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত অলঙ্কার ব্যবহার করে। শুধু অলঙ্কার পরাই নয়, নিজেকে সুন্দর করিবার জন্য শারীরিক যন্ত্রণাও কম সহ্য করে না। এইবার তোমাদের তারই কথা কিছু বলিব।

ডায়াক মেয়ের বেতের গয়না

আফ্রিকা অঞ্চলে এই ধরণের অনেক জাত আছে। সেখানে বংগো বলিয়া এক রকম জাত আছে তাদের মধ্যে নীচেকার ঠোঁটটা যার যত লম্বা হইবে সে তত বেশী সুন্দর—বিশেষতঃ মেয়েদের মধ্যে। ঠোঁট লম্বা করিবার জন্য ইহারা ছেলে বেলা হইতেই মেয়েদের মুখের ভিতর লম্বা কাঠের গুঁজি বসাইয়া রাখে। ফলে তাহাদের এক এক জনের নীচেকার ঠোঁট ৬।৭ ইঞ্চি পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে;—তাতে নাকি তাহাদের ভারী সুন্দর দেখায়। আমাদের দেশে নাক কান ফুটা করিয়া গয়না পরার রেওয়াজ আছে (যদিও অনেক সভ্য লোকের কাছে সেটাও খুব হাস্যকর), কিন্তু কাহাকেও উপরের ঠোঁট কিংবা গাল ফুটা করিয়া আংটি পরিতে শুনিয়াছ কি? আফ্রিকা অঞ্চলে এ জিনিষটারও খুব চলন আছে।

অষ্ট্রেলিয়ার কাছে পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে ছেলেমেয়েদের মধ্যে মোটা হওয়াটা একটা খুব বড় সৌন্দর্য্যের লক্ষণ—বিশেষ করিয়া মেয়েদের। সেখানে মেয়ে হইলেই বাপ মা তাহাকে অতিরিক্ত রকম খাওয়াইতে আরম্ভ করে, কোন কাজ করিতে দেয় না, ইচ্ছাটা এমনি করিয়াই মেয়েকে একটি "মোটা থাসী"

করিয়া তুলিবে। আবার ঠিক ইহার উল্টা রকম বাপ মা ও পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় আছে,—যেমন ধর আফ্রিকায় মুরেদের রাজ্যে, আমেরিকার কোন কোন জায়গায়। সেখানে রোগা মেয়েরই কদর বেশী। রোগা করিবার জন্য বাপ মা মেয়েদের না খাওয়াইয়া শুঁটকাইয়া রাখে, ঘরে কয়েদ করিয়া রাখে; সময় সময় দু' চার ঘা মার লাগাইতেও ইতঃস্তত করে না।

অষ্ট্রেলেশিয়ায় পপুয়া দ্বীপের লোকেরা নাকের ভিতর মস্ত ছেঁদা করিয়া তাহার মধ্য দিয়া লম্বা লম্বা কাঠি, হাড় প্রভৃতি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করিয়া চালাইয়া দেয়। এক একটা কাঠি অনেক সময় এক হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। আমাদের চোখে বিকট দেখাইলেও তাদের কাছে তা' নাকি বড়ই চমৎকার। ইহাদের অনেকে আবার নাকটাকে থ্যাবড়া করিয়া প্রকাণ্ড চওড়া করিয়া ফেলে—তারপর তার মধ্যে নানা রকম রং মাখিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। গুগ্‌লি, শামুকের মালা এ সব পরিতেও ইহারা খুব ভাল বাসে।

আর এক রকম জাত আছে ডায়াক্ বলিয়া। তাহারা থাকে বোর্ণিও দ্বীপে। এদের মেয়েরা বেত দিয়া তৈরী খুব আঁটা এক রকম পোষাক ব্যবহার করে। পোষাকও বলিতে পার, গয়নাও বলিতে পার। তার মধ্যে আবার পিতল কিংবা অন্য কোন ধাতুর কারিকুরীও যথেষ্ট থাকে। এই বেতের পোষাক ইহারা একবার পরিলে আর জীবনে কখনও খোলে না। মাথার চুলের গয়নাটাও ইহাদের ভারী অদ্ভুত। ও পাতায় একটি ডায়াক মেয়ের ছবি দিলাম, দেখ।

কিন্তু সব চেয়ে সেরা গয়না যদি তোমরা দেখিতে চাও তবে আন্দামান দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের কাছে যাইও। তাদের গয়নার মত আরামের গয়না বোধ হয় আর নাই। তাহারা কি করে শুনিবে? কাচ, পাথর কিংবা ঐ রকম কোন ধারাল অস্ত্র দিয়া সমস্ত শরীর আঁচড়াইয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলে। তারপর সেই কাটা ঘা অনেক রকম ফন্দী ফিকির করিয়া যতদিন সম্ভব জিয়াইয়া রাখে। সেই কাটা ঘায়েই নাকি তাদের রূপ শতগুণ বাড়িয়া যায়।



শরীর সাজাইবার আর একটা অঙ্গ হইতেছে রং মাখা। অসভ্যদের মধ্যে ত' কথাই নাই আজকালকার মেম সাহেবেরাও গালে, ঠোঁটে রং মাখিতে কসুর করেন না। কিন্তু রংএর একটা অসুবিধা—বড় সহজেই সেটা উঠিয়া যায়। তাই রং পাকা করিবার জন্য উল্কীর চলন হইয়াছিল। উল্কী জিনিষ-টাকে নেহাৎ সহজ মনে করিও না। শরীরের মধ্যে ক্রমাগত সূচ বিঁধাইয়া বিঁধাইয়া সেই কাটা-ঘায়ের মধ্যে রং মিশাইয়া মিশাইয়া এই উল্কী পরিতে হয়। সৌন্দর্য্যের খাতিরে মানুষ মুখ বুজিয়া সে যন্ত্রণা সহ্য করে। মনে পড়ে অনেকদিন আগে মাকাসোয়েস কিংবা ঐ রকম কোন একটা দ্বীপের এক সর্দ্দারের ছবি দেখিয়া-ছিলাম। তার মুখ চোখ হইতে আরম্ভ করিয়া সারা দেহের কোথাও উল্কী বাদ ছিল না। চল্লিশ বছর ধরিয়া প্রত্যহ দারুণ যন্ত্রণা সহিয়া সে নাকি এই উল্কী পরিয়াছিল। শুধু অসভ্য নয়, সাহেবদের মধ্যে এবং আমাদের দেশেও উল্কীর চলন আছে; আগে নাকি আরও বেশী ছিল। উপরে একটী সাহেবের ছবি দিলাম দেখ—ইনিও সমস্ত শরীরে উল্কী পড়িয়াছেন—কোথাও একটু ফাঁক নাই।

উল্কীর চূড়ান্ত। সমস্ত শরীরে কোথাও একটুখানি ফাঁক নাই

সভ্যদেশেও নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত গয়নার নমুনা পাওয়া যায়। খোঁপার বাহারে জাপানীদের কাছে কেউ লাগে না—কিন্তু বুলগেরিয়ার পাড়াগেঁয়ে মেয়ে-দের খোঁপাটাও একটা দেখিবার জিনিষ। ঠিক খোঁপা তাহারা বাঁধে না—

সূতার মত অসংখ্য ছোট ছোট বেণী বুনিয়া তার মধ্যে কতকগুলি টাকা পয়সা বাঁধিয়া দেয়। সেখানকার মেয়েদের বিবাহের সাজটাও বড় অপরূপ। ফুল আর মোহরই সে সাজের প্রধান অঙ্গ। তাহার বিবরণ আমরা দিতে চাই না, নীচে একটা ছবি দিলাম।

বুলগেরিয়ার পাড়াগেঁয়ে মেয়ের বিবাহের সাজ

চীন দেশের মেয়েদের মধ্যে ছোট পা রাখা একটা মস্ত সৌন্দর্য্যের লক্ষণ। সেখানকার বাপ-মায়েরা ছেলে বেলা হইতেই মেয়েদের পায়ে শক্ত লোহার জুতা আঁটিয়া দেন, আর তা খুলিতে দেন না। সারা জীবন তার জন্য খোড়াইয়া চলুক, ক্ষতি নাই, রূপ তাতে বাড়িবে বই কমিবে না।

এবার আমাদের দেশের গয়নার কথা কিছু বলি। সেকালকার গয়নার সাথে এখনকার বাঙ্গালী মেয়েদের গয়নার বিশেষ কোন মিল নাই। এমন কি ত্রিশ চল্লিশ বছর আগেও যে সব গয়না প্রত্যেক ঘরে ঘরে দেখা যাইত এখন সে সব একেবারে উঠিয়া যাইতেছে। যেমন ধর—নথ, মল, নাকছবি, রতনচূড়। এ সব আধুনিক মেয়েরা একেবারেই পছন্দ করে না, কিন্তু কিছুদিন আগেও এগুলির খুব বেশী রকম আদর ছিল।

সেকালে, অর্থাৎ কয়েক শ' বছর আগেও আমাদের দেশে যে সব গয়নার চলন ছিল, সেগুলি কিন্তু দেখিতে কোন অংশেই খারাপ ছিল না। অজন্তা, সাঁচি, ভারুট প্রভৃতি জায়গায় সেকালকার শিল্পীদের হাতের অনেক ছবি, মূর্ত্তি প্রভৃতি



দেখা যায়—বিশেষ করিয়া অজন্তা গুহার চিত্রগুলি। দেড় হাজার দু'হাজার বছর আগে আমাদের দেশের মেয়েরা কি রকম পোষাক পরিত, কি রকম গয়নায় গা সাজাইত এই সব গুহা-চিত্রের মধ্যে সে সবের নমুনা পাওয়া যায়। আমরা এখানে "রাণীর প্রসাধন" নামে একটা ছবি দিলাম, এটাও অজন্তার ছবি। রাণী তাঁর দু'টি সখীকে লইয়া সাজগোজ করিতেছেন। রাণীর মাথার মুকুট, গলার মালা, হাতের বালা, বাজুবন্দ, কোমরের মেখলা—সবই কেমন সুন্দর দেখ ত'।

রাণীর প্রসাধন ( অজন্তা গুহার ছবি )

এই সব সেকেলে গয়নার বেশীর ভাগের নামই বোধ হয় তোমরা কেউ শোন নাই; কয়েকটা বলিব? যেমন ধর মাথার—গর্ভক, ললামক, আপীড়, বালপশ্যা, পরিতথ্যা, হংসতিলক, চূড়িকা, লম্বন। কাণের—কর্ণপুর, কর্ণিকা, বজ্রগর্ভ, ভূরিমণ্ডল। গলার—প্রালম্বিকা, উরঃসূত্রিকা, দেবচ্ছন্দ, মাণবক প্রভৃতি। অবশ্য এ গুলিরই কোন কোনটা আবার অন্য নাম দিয়া ব্যবহার করা হয়। যেমন ধর গর্ভককে অনেকে খোঁপার কাঁটা জাতীয় জিনিষ বলিয়া মনে করেন, ললাটিকা হিন্দুস্থানী মেয়েদের কপালে পরিবার চাঁদ; দেবচ্ছন্দ, গুচ্ছার্দ্ধ, মাণবক এগুলি সবই নানা রকমের মুক্তাহার।

———

# খোকাখুকু

( শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র )

খোকার — মোমের দেহ লাগে হাল্‌কা,
খুকুর — মধুর গলা, মিঠা !—ভুল কি ?
খোকার — হাসিটী দেব-শিরে কল্কা,
খুকুর — কাঁদনে বুকে দাগে উল্কী ।

খোকার — কোমল কর ডাকে চাঁদকে,
খুকুর — নূপুর পায়ে বাজে গুঞ্জি' ;
খোকার — ভুখিয়া দাঁতে পাতে ফাঁদ কে ?
খুকুর — অলকে অলকার কুঞ্জী !

খুকুর — কাহিনী সে ত মনঃসঙ্গী,
খোকার — আধেক কথা ভারি মিষ্টি ;
খুকুর — চাহনী মাঝে নয়া ভঙ্গী,
খোকার — ডাগর চোখে একি দৃষ্টি !

খোকার — মমতা রচে স্নেহ-কেল্লা,
খুকুর — পরশে দোলে দেহ-বল্লী ;
খোকার — জনম দেছে গৃহে জেল্লা,
খুকুর — চপল নাচে হাসে পল্লী !

---

# পদ্মরাগ

( অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বি-এল্‌ )

[ পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর ]

১৯

## ভবিষ্যদ্বাণী

ব্যাপারটায় এলাহাবাদ সহরে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল—পথে-ঘাটে সকলে কথাচ্ছলে শুধু এই বিষয়েরই আলোচনা করিতে লাগিল, এবং সে রাত্রে সকলে ঘুমাইতে না যাওয়া পর্য্যন্ত রণজিৎদের হোটেলেও এইটাই হইল সব চেয়ে বড় গল্পের জিনিষ।

ঘুম হইতে উঠিতে রণজিতের বরাবরই একটু দেরী হইত। পরদিন সকালে তখনও সে বিছানা ছাড়িয়া উঠে নাই, দেখিল, প্রাতর্ভ্রমণ সাঙ্গ করিয়া হুকা-কাশি ঘরে ঢুকিতেছেন। ঘরে ঢুকিয়াই তিনি বলিলেন, "আজ আমাদের 'প্রোগ্রাম' কি হবে, জানেন রণজিৎ বাবু, সমস্ত সহরটায় যেখানে যা কিছু দেখ্‌বার জিনিষ আছে, খুঁটে খুঁটে তাই দেখ্‌তে হবে। তারপর দুপুর বেলা গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে গিয়ে একটা ডুবও দিয়ে আস্‌ব। এক কথায় পদ্মরাগের বিষয় বিল্‌কুল্‌ ভুলে গিয়ে আজ আর কাল আমাদের শুধু বেড়িয়েই বেড়াতে হবে।" তার পর এদিক্‌ ওদিক্‌ একটু তাকাইয়া, গলাটাকে আরও খাটো করিয়া আবার বলিলেন, "আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, দু'তিনটে লোক গাদা পিস্তল পকেটে পূরে আজ ছায়ার মত সারাদিন আমাদের পেছনে ঘুরে বেড়াবে। তারা যেন দিনের শেষে এই মনে করে বাড়ী ফেরে যে, আমরা এলাহাবাদে এসেছি নিছক্‌ বেড়াতে—বেড়ান ছাড়া আমাদের আর কোন উদ্দেশ্যই নেই। শুধু রাত্তির হলে আমি একা সুযোগ বুঝে দু'তিনটে দেশী খবরের কাগজের আপিসে এই বিজ্ঞাপনটা দিয়ে আস্‌বো" বলিয়া তিনি জামার ভিতরকার পকেট হইতে একখানা বিজ্ঞাপনের খস্‌ড়া রণজিতের চোখের সম্মুখে ধরিলেন।

বিজ্ঞাপনটী হিন্দিতে লেখা। খুব ভাল হিন্দি না জানিলেও রণজিতের তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হইল না লেখাটাকে বাংলা অনুবাদ করিলে এই রকম দাঁড়ায় :—

### "ভূত আছে কি নাই !

এই লইয়া আমার সহিত আমার কোন বন্ধুর বিষম তর্ক হইয়া গিয়াছে। যে ভাবেই

তর্কটার একটা মীমাংসা হইয়া যাওয়া দরকার। কাজেই এতদ্দারা আমি সকলকে জানাইতেছি, যিনি আমাদিগকে 'ভূত আছে' এই প্রমাণ দিতে পারিবেন তাঁহাকে আমরা পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিব। বক্স নং...

প্রায় মিনিট্ খানেক রণজিৎ হাঁ করিয়া হুকা-কাশির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর কহিল, "এ সবের মানে কি মিষ্টার হুকা-কাশি? ভূত নিয়ে আবার কার সাথে আপনার তর্ক-বিতর্ক হল? আর তা ছাড়া দু'তিন জন লোক যে পিস্তল নিয়ে গোপনে সারা সহর আমাদের অনুসরণ করে বেড়াবে এ খবরই বা আপনাকে কে দিলে?"

হুকা-কাশি হাসিলেন, কহিলেন, "এসব খবর কি আর কেউ বাড়ী বয়ে দিয়ে যায় রণজিৎ বাবু? অনুমান করে নিতে হয়। আমাদের চারপাশে রোজ যে ঘটনা ঘট্‌ছে তারই ভেতর এর ছায়া এসে পড়ে, কেউ তা দেখ্‌তে পায়, কেউ সে চেষ্টাই মোটে করে না। যাক্, ভূতের কথা শুনে অমন ঘাব্‌ড়ে যাবেন না যেন, এসব ভূত মানুষের ঘাড় বড় একটা মট্‌কায় না, মণিমুক্তা, পদ্মরাগ—এই সব ব'য়ে নিয়ে বেড়ায়।" বলিয়া তিনি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। একটু চুপ করিয়া শেষে গম্ভীর গলায় বলিলেন, "গোড়া থেকে আরম্ভ করে আমার অনেক ব্যবহারই বোধ হয় আপনার কাছে হেঁয়ালি বলে মনে হয়েছে—কিন্তু এ সমস্তেরই অর্থ একটী একটী করে শীগ্‌গিরই আপনাকে আমি বুঝিয়ে দেব। বল্‌তে কি আর এখনও পারি না, খুবই পারি, কিন্তু যদি অন্যমনস্ক ভাবে কোন কথা বেফাঁস আপনার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় তবেই মুস্কিল কিনা! এতদিন আপনি আমায় মাপ করে আস্‌ছেন, আর এক সপ্তাহ করুন। আমার খুবই আশা হচ্ছে, এই এক সপ্তাহের মধ্যেই রাজা-বাহাদুরের পদ্মরাগ আপনার হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব। এখন চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক্—মর্ণিং ওয়াকে গিয়ে সোলোমন সাহেবের সাথে আজও দেখা হয়েছিল, তাঁরই ওখানে চা খাব বলে কথা দিয়ে এসেছি। দেরী হ'য়ে পড়্‌ছে।"

"তার আগে শুধু একটী মাত্র কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব, গণেশ ঠাকুরের কোন সন্ধান পেয়েছেন কি?"

"এখনও পাইনি, তবে ভরসা হচ্ছে দু'তিন দিনের মধ্যেই পেয়ে যাব। লোকটা যেন কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে চল্‌ছে।"

ফসল ভাই আসল ভাইয়ের হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ার ধাক্কা এলাহাবাদ যে তখনও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই, সোলোমন সাহেবের হোটেলে ঢুকিতেই সেটা বেশ বোঝা গেল,



ছোট বড় সবারই মুখে তখনও কেবল সেই একই কথা—কি করিয়া লোকটী ওরূপ আশ্চর্য্য ভাবে উধাও হইয়া গেল, অথচ বাড়ীর কেহ তাহার এতটুকু জানিতে পারিল না। বুড়ো নাকি প্রতি দিন অনেক টাকার মদ খাইত, তাই অমন একজন খরিদ্দার হাত্-ছাড়া হওয়ায় সোলোমন সাহেবও খুব মন-মরা হইয়া গিয়াছেন।

## ২০

## ভূত কাৎ

সেদিন খানিকটা বেলা হইতে-না-হইতেই দেখা গেল হুকা-কাশির অনুমান কত-খানি সত্য।

চা খাওয়ার পর তিনি ও রণজিৎ টঙ্গা ভাড়া করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন, উদ্দেশ্য—লোককে দেখান, বেড়াইবার জন্যই তাঁহারা এখানে আসিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের হাইকোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয়, মতিলাল নেহেরুর বাড়ী, চিন্তামণি ঘোষের ইণ্ডিয়ান্ প্রেস, ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম—কিছুই তাঁরা বাকী রাখিবেন না, সমানে টঙ্গা চড়িয়া বেড়াইবেন, এই ছিল তাঁদের ইচ্ছা। খানিকটা পথ আসিতেই স্পষ্ট টের পাইলেন, কিছু দূরে দূরে গা ঢাকা দিয়া জনা তিনেক লোক একখানা একায় আগাগোড়া তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া আসিতেছে।

হুকা-কাশি রণজিতের পিঠে আস্তে একটা ঠেলা দিয়া বলিলেন, "দেখ্‌ছেন, ভোরবেলার সেই ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক্ ঠিক্ ফল্‌ছে কিনা।—যাক্ ঘাব্‌ড়াবেন না, ওরা এখন আমাদেয় কিছুই বল্‌বেনা।"

রণজিৎ সদর্পে জবাব দিল, "ঘাবড়াব ওই তিন মর্কটকে দেখে? এক ঘুঁষিতে তিনটেকেই জাহান্নামে পাঠাতে পারি জানেন!"

"দোহাই আপনার সেই কাজটীই শুধু কর্‌বেন না। এখানে তিনজন দেখ্‌ছেন বটে, কিন্তু সাঙ্গ-পাঙ্গ ওদের অন্ততঃ ত্রিশজন আছে এই এলাহাবাদ সহরেই। আমরা যে ওদের লক্ষ্য করেছি, সেটাও যেন ওরা টের না পায়। আজকে সারাটা দিন ওরা পেছু পেছু ঘুর্‌চে বটে, কিন্তু কালও যদি দেখে আমরা এম্‌নি ভাবে শুধু সহরই দেখে বেড়াচ্ছি, তবে আপনা হতেই থেমে যাবে।

"পদ্মরাগ কি ওদের কাছে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু সেজন্য একটু বিচলিত হয়েছেন, কি সমস্ত নষ্ট করে ফেলেছেন! কৌশল

ধরে না চল্‌লে হাজার চেষ্টাতেও প্রমাণ করতে পারবেন না যে পদ্মরাগ ওদের হাতে—বেজায় চালাক লোক ওরা। আর জোর করে? সে অসম্ভব!"

ইহার পর হইতে রণজিতের সময় যে কি করিয়া কাটিতে লাগিল সে এক ভগবান্‌ই জানেন। হাতের সাম্‌নে শত্রু, সেই শত্রুকে মাটীতে পাড়িয়া ফেলিতে হাত প্রতিমুহূর্ত্তে মুষ্টিবদ্ধ হইতেছে, অথচ তার উপায় নাই!

তাদের কথা-বার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় একটা প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ ঘোড়া রাস্তা কাঁপাইয়া তাদের পাশ কাটাইয়া বিপরীত দিকে চলিয়া গেল, এবং তার পিছন পিছন কয়েকটা হিন্দুস্থানী

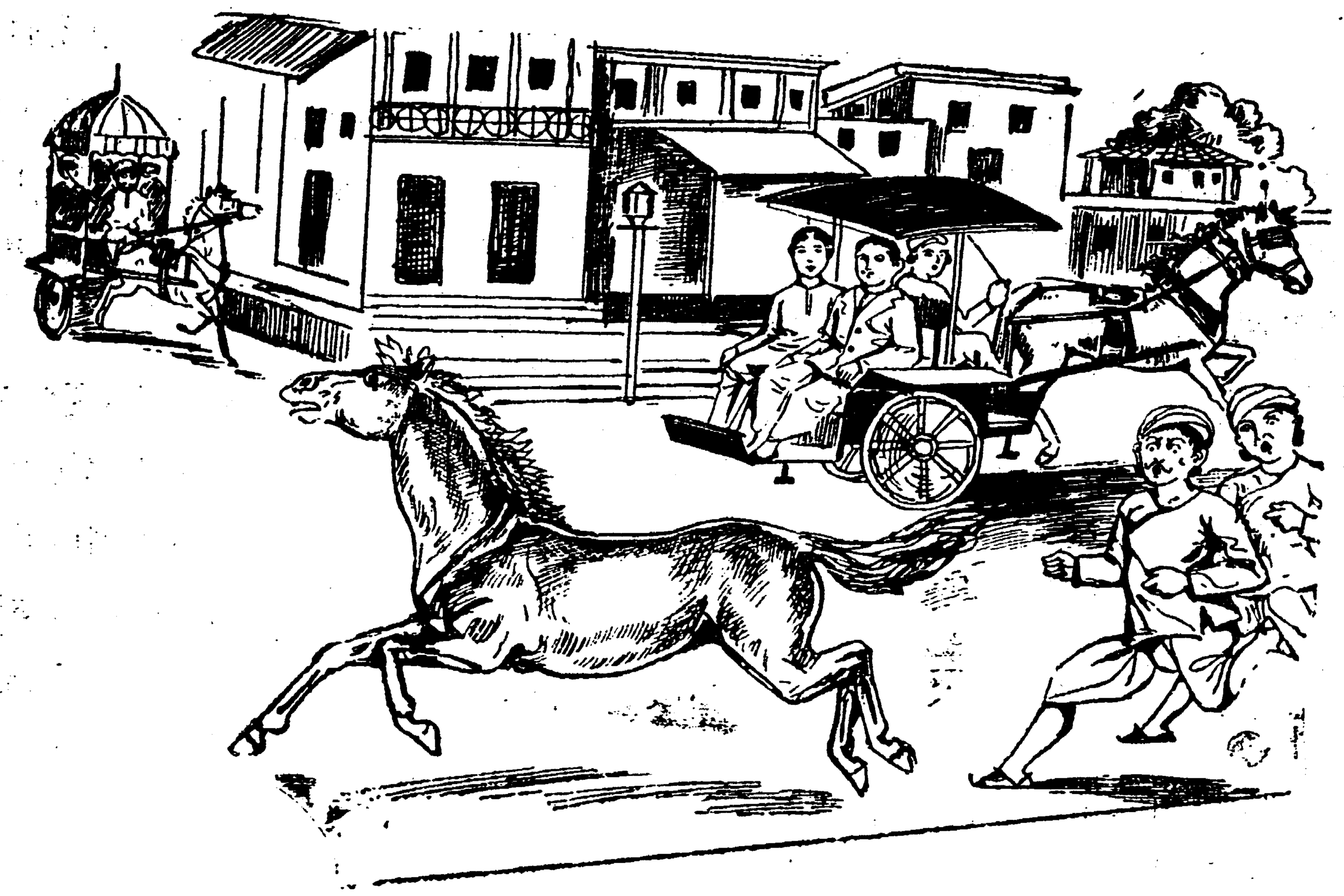

প্রকাণ্ড ঘোড়া রাস্তা কাঁপাইয়া চলিয়া গেল

চেঁচামেচি করিতে করিতে অগ্রসর হইল। ঘোড়া তাদের, আস্তাবল হইতে পালাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু কেহই তাকে ধরিতে পারিতেছে না। দেখিয়া হুকা-কাশি কহিলেন, "একটা বড় মত দড়ি পেলে এক মিনিটে ঘোড়াটাকে ধরে ফেলা যেত।"

"কি করে?"

"ব্রেজিলে যেভাবে বুনো ঘোড়া ধরে—ল্যাসো করে। একটা দড়ির ডগায় ফাঁস-গেরো দেওয়া থাকে, কায়দা করে দড়িটাকে ছুঁড়ে সেই ফাঁসটা ঘোড়ার গলায় গলিয়ে দিতে হয়। তার পর হেঁচকা টান মার্‌লেই ঘোড়া আট্‌কে পড়ে।"



'ল্যাসো' করিয়া কিভাবে ঘোড়া ধরিতে হয় রণজিতের তাহা জানা ছিল, কহিল, "কিন্তু সে তো যে সে ছুড়্‌তে পারে না, রীতিমত অভ্যাস থাকা চাই। ধরুন, আপনাকেই যদি ল্যাসো ছুড়্‌তে বলা হয়, পারেন তা' আপনি?"

"পারি, সে অভ্যাস আমার আছে" বলিয়া হুকা-কাশি চুপ করিলেন। কিন্তু তার একটু পরেই নিতান্ত বিনা কারণে তাঁর ঠোঁট দুটীর ভিতর দিয়া একটু হাসি খেলিয়া গেল, যাহা রণজিতের চোখ এড়াইল না। এই আর একটী হেঁয়ালি, অনেক চিন্তা করিয়াও রণজিৎ যাহার কোন অর্থ বাহির করিতে পারিল না।

সেদিন সেই লোক তিনটা কিন্তু বাস্তবিকই ছায়ার মত রণজিৎদের পিছনে লাগিয়া রহিল, এবং পরদিনও বেলা দুপুর পর্য্যন্ত তাদের হাত হইতে ছাড়া পাওয়া গেল না। গেল বিকাল বেলায়। তখন বোধ হয় তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে এ লোক দুটী নিতান্তই গোবেচারা—পদ্মরাগের নাম গন্ধও কোনদিন শোনে নাই, এদের পিছনে আর সময় নষ্ট করা বৃথা।

হোটেলে রণজিৎ ও হুকা-কাশির শোবার ঘর ছিল একই। গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় রণজিৎ সাশ্চর্য্যে দেখিল ঘরে আলো জ্বলিতেছে আর টেবিলের সাম্‌নে বসিয়া হুকা-কাশি এক মনে একখানা কাগজে কি একটা নক্সা আঁকিতেছেন। সাম্‌নেই পড়িয়া আছে এক খানা ম্যাপ্‌ ও খান কয়েক খোলা চিঠি। এমনই গভীর মনোযোগের সহিত হুকা-কাশি কাজ করিতেছিলেন যে রণজিতের এই হঠাৎ জাগিয়া উঠা তিনি টেরই পান নাই। খানিক-ক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রণজিৎ যখন কিছুই বুঝিতে পারিল না, তখন সে প্রশ্ন করিল, "এত রাত্তিরে এ কি কর্‌ছেন, মিষ্টার হুকা-কাশি?"

চমকিয়া উঠিয়া হুকা-কাশি ফিরিয়া দেখিলেন রণজিৎ। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "ওঃ, আপনি? এম্‌নি চম্‌কে উঠেছিলাম! আর নাই বা উঠ্‌বো কেন, ভূতের সাথে কারবার তো! এই দেখুন, সেই বিজ্ঞাপনের উত্তরে এই চিঠি গুলো এসেছে। সব গুলো চিঠিতেই এই একই কথা লিখ্‌ছে যে এদের গ্রামের মাঠ দিয়ে এরা প্রায়ই একটা ভূতকে গভীর রাত্রে ছুটোছুটি করে বেড়াতে দেখ্‌তে পায়। যে যে গ্রাম থেকে এ রকম চিঠি পেয়েছি, এই ম্যাপ খানা দেখে দেখে তার একটা নক্সা তৈরী করে নিচ্ছি, কেননা, ভূতের বেড়াবার রাস্তাটা তবে টের পাওয়া যাবে। ভূতটাকে দেখার জন্য এরা আমাদের ডেকে পাঠিয়েছে—কাল রাত্রেই দুজনে বেরিয়ে পড়ব, কি বলেন? সেদিন রাজা বাহাদুরের মোটর খানা

ফেরৎ না পাঠিয়ে বাস্তবিকই ভাল করেছি। গ্রিফিৎ কোম্পানীর ম্যানেজারের কাছ থেকে আজ সন্ধ্যে বেলা জেনে এসেছি যে সেটা মেরামৎ প্রায় হয়ে এসেছে। তাঁকে বলে রেখেছি, গাড়ী খানা কাল সন্ধ্যেয় আমাদের চাই-ই। ভুতুড়ে ব্যাপার, বেশী সোর-গোল করা সঙ্গত নয়, নিরিবিলি গোপনে যাওয়াই ভাল।”

কথাগুলি শেষ করিয়া, বিস্মিত রণজিৎকে মুখ খুলিবার আর অবকাশ পর্য্যন্ত না দিয়া এক রকম জোর করিয়াই হুকা-কাশি তাকে শুইতে পাঠাইয়া দিলেন।

সেদিন রাত্রির অন্ধকারে সেই দুইজন—একজন অসম-সাহসী বাঙ্গালী যুবক, আর একজন কুশাগ্রবুদ্ধি জাপানী ভদ্রলোক—মোটরে বাহির হইয়া পড়িলেন। আগে হইতেই ম্যাপে পথ ঘাট দেখিয়া রাখা হইয়াছিল, কাজেই রাস্তায় সামান্য একটু জিজ্ঞাসা করিয়াই তাঁরা তাঁদের অভীষ্ট গ্রামটীতে আসিয়া পৌছিতে পারিলেন। চারিদিকে প্রকাণ্ড মাঠ, মাঝে মাত্র খান কয়েক গরীব গৃহস্থের বাড়ী—এই লইয়াই সেই গ্রাম খানা। এই গ্রামেরই মোড়ল আনন্দরাম ভূত দেখিবার জন্য হুকা-কাশিকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে।

বিরাট্ মূর্ত্তি তীর-বেগে ছুটিয়া যাইতেছে

গ্রামে যখন গিয়া তাঁরা পৌছিলেন, তখন সেখানকার সকলেই প্রায় ঘুমাইতে গিয়াছে। ডাকা-ডাকি হাঁকা-হাঁকি করিয়া কোনমতে তাঁরা আনন্দরামের বাড়ী খুঁজিয়া লইলেন। আনন্দরাম চোখ কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে উঠিয়া আসিল, এবং পরিচয় পাইয়া আগন্তুকদের খুব সমাদর করিয়া ঘরে নিয়া বসাইল।

অল্প কতক্ষণ তিনজনে বসিয়া গল্প চলিতেছিল, হঠাৎ আনন্দরাম বাহিরের



দিকে তাকাইয়া ভয়-মাখান স্বরে বলিয়া উঠিল, “দেখিয়ে, দেখিয়ে বাবুজি, দেখিয়ে।”

সেদিন পূর্ণিমা নয়, কিন্তু তবুও যে টুকু আলো ছিল তাহাতেই সকলে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, গ্রামের সাম্‌নের মাঠ দিয়া প্রকাণ্ড একটা মূর্ত্তি তীর-বেগে ছুটিয়া যাইতেছে। মূর্ত্তিটা একজন সাধারণ মানুষের তিনগুণ লম্বা—গায়ে তার ধব্‌ধবে সাদা কাপড় জড়ান। এক একটী পা ফেলিয়া সে প্রায় দশ-বার হাত করিয়া মাটী অতিক্রম করিতেছে। ঘণ্টায় বোধ করি সে প্রায় ৪০ মাইল বেগে ছুটিতেছিল। মুখ খানা স্পষ্ট দেখা গেল না, কিন্তু আনন্দরাম বলিল, কেউ কেউ নাকি তার মুখও দেখিয়াছে—সে'মুখে নাকি চামড়া বা মাংস নাই, মড়ার মত শুধু হাড়!

এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া রণজিতের পর্য্যন্ত মুখ দিয়া কোন কথা ফুটিল না, আর আনন্দরাম তো আড়ষ্টই হইয়া গেল। ঘাব্‌ড়াইলেন না শুধু হুকা-কাশি। আনন্দরামকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ফের কতক্ষণ পরে এ আবার ফির্‌বে?”

আনন্দরাম একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, “ফির্‌বে যে তা আপনি জান্‌লেন কি করে?”

“হ্যাঁ বাপু, তা আমি জানি, কতটা বাদে ফির্‌বে তাই বলনা?”

“শেষ রাত্রের কিছু আগে, এই ধরুন রাত আড়াইটে তিনটের সময়।

তখন রণজিতের দিকে ফিরিয়া হুকা-কাশি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি ঘণ্টায় কত মাইল্ জোয়ে মোটর চালাতে পারেন?”

“চেষ্টা কর্‌লে শ'খানেক মাইল জোরে পারি।”

“ব্যস্, তবে আর ভাবনা নেই। আড়াইটের একটু আগে আমরা গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌বো। তারপর ও ফিরলেই ওর পেছনে আপনি গাড়ী- করে তাড়া কর্‌বেন। রাজা-বাহাদুরের গাড়ীতে শব্দ হয় না, কাজেই খুব কাছে যাওয়া না পর্য্যন্ত ও কিছু টের পাবে না। তারপর আপনি এই টর্চ্চ লাইট্‌টা জ্বেলে ধর্‌বেন। মোটরের ভেতরে দড়ি দিয়ে একটা ল্যাসো তৈরি করে রেখেছি—দেখ্‌বেন সেই ল্যাসো দিয়ে ঘোড়ার বদলে কেমন সুন্দর ভূত ধরি!” বলিয়া হুকা-কাশি একটু হাসিলেন। কল্যকার সেই হাসির আসল অর্থ আজ এতক্ষণে রণজিৎ বুঝিতে পারিল।

আনন্দরাম বাংলা বুঝিতে পারিলে এই মারাত্মক মৎলবে সে আঁৎকাইয়া উঠিত, কি সে তো আর বাংলা জানে না!

তারপর ঘণ্টা কয়েক বাদে বাস্তবিকই যে ঘটনাটী ঘটিল, তা ভাবিতে গেলেও ভয়ে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। নক্ষত্রবেগে সেই বিভীষণ মূর্ত্তিটী আবার এদিকে ছুটিয়া আসিতেছিল, আনন্দরামের বাড়ী সে অতিক্রম করিয়া গেল। দেখিবামাত্র সেই দুই বে-পরোয়া বীর—হুকা-কাশি ও রণজিৎ মোটরে তার পিছু লইলেন।

মোটর জীবটীর কাছে যাওয়া মাত্র, হুকা-কাশি ল্যাসো ছুড়িলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে বিরাট্ মূর্ত্তি মাটীতে আছাড় খাইয়া পড়িল। চক্ষের নিমেষে গাড়ী হইতে নামিয়া হুকা-কাশি যুযুৎসুর এক প্যাঁচে সেই বিরাট্ জীবকে একেবারে নিশ্চল করিয়া দিলেন। তারপর রণজিৎকে ডাকিয়া বলিলেন, "একবার টর্চ্চ-লাইট্‌টা জ্বেলে এদিকে আসুন তো, দেখুন তো ভূতটাকে আর কোথাও দেখেছেন কিনা? এসব ভূতের কিন্তু মাথা থাকে পেটের ঠিক ওপরে—কাজেই সেই জায়গাটাতেই মুখের খোঁজ করবেন।"

হুকা-কাশির কথামত টর্চ্চ আলো জ্বালাইয়া সেই বিরাট্ মূর্ত্তির পেটের উপর-কার কাপড়-চোপড় সরাইয়াই রণজিৎ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "আরে, এযে সোলোমন সাহেব।"

হুকা-কাশি বলিলেন "ঠিকই দেখেছেন তবে।" (ক্রমশঃ)

---

# ডাকটিকেটের গল্প

( শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় )

তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত ডাকটিকেট সংগ্রহ কর, কিন্তু ডাকটিকেট সম্বন্ধে অনেক কথাই হয়ত তোমরা সবাই জান না।

ডাকটিকেট জিনিষটা যে খুব পুরোনো নয়, তা বোধ হয় তোমরা সবাই জান। এখনও একশ' বছর পোরেনি,—মাত্র সেদিন ( ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ) স্যর রোল্যাণ্ড্ হিলের চেষ্টায় ইংল্যাণ্ডে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম ডাকটিকেটের চল্‌তি হয়। কাজেই দেখ্‌ছ, কোন ডাকটিকেট্‌কেই একেবারে "সেকেলে" বলা চলে না। তবে ১৯৪০ সনে যখন কোন কোন টিকেটের বয়স লিখ্‌তে তিনটী সংখ্যার দরকার হবে, তখন বোধ হয় সে গুলোকে "সেকেলে" বলা চল্‌বে।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ডাকটিকেটের প্রথম চল্‌তি হয় বলে তার আগে যে



লোকে চিঠি পত্র পাঠাতে পারত না তা মনে করো না কিন্তু। ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থা অনেক দেশেই ছিল। আমাদের এদেশে 'কাসিদ' নামে এক শ্রেণীর লোক ছিল যাদের সামান্য কিছু বখ্‌শিশ্ দিলেই কোন চিঠি বা জিনিষপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তারা গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আস্‌ত। আর তা ছাড়া ঘোড়ার ডাক

ঘোড়ার-ডাক—১ নং ছবি

তো ছিলই। আমাদের দেশে সব চাইতে প্রথম ডাক টিকেটের ব্যবহার হয় ১৮৫২ সনে—সিন্ধু দেশে। তারপর দেখ্‌তে দেখ্‌তে দু'বছরের ভেতর তা গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৪০ সনে সব চাইতে প্রথম ইংল্যাণ্ডে যে ডাক টিকেট্ বের হয় তার রং ছিল কালো—ভেতরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি। এ টিকেট্ গুলোকে আজ কাল বলে Penney black. তার পর থেকে এই বছর নব্বুইয়ের ভেতর কত রকমের, কত আকারের, ও কত রংয়ের টিকেট যে বেরিয়েছে, কে তার সংখ্যা কর্‌বে? হিসাব করে দেখা গেছে, ১৯২৮ সনের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ৪৮,৭০৭ রকমের ভিন্ন ভিন্ন ডাক টিকেট বেরিয়েছে।

এই সব টিকেট সম্বন্ধে যে কত মজার মজার কথা আছে তা এক মুখে বলে শেষ করা যায় না।

জার্ম্মাণীর প্রাসিয়া রাজ্যে ১৮৬৬ সনে যে দু'রকমের ডাক টিকেট বের হয়, তার সাথে সাধারণ টিকেটের বেশ একটু তফাৎ ছিল। সে তফাৎটী কি শুন্‌বে? —কাগজের বদলে সেগুলো ছাপা হত ষাঁড়ের চামড়ার উপর।

উগাণ্ডা যখন তার প্রথম টিকেট বের কর্‌লে তখন সে ছাপাখানাকে দস্তুরমত 'বয়কট্' করে, টাইপ্‌রাইটার দিয়ে সেগুলো ছাপ্‌তে সুরু করেছিল। ভূমধ্যসাগরে লং নামে (Long Island) ইংরাজদের দখলে একটা দ্বীপ আছে। সেখানেও ডাক

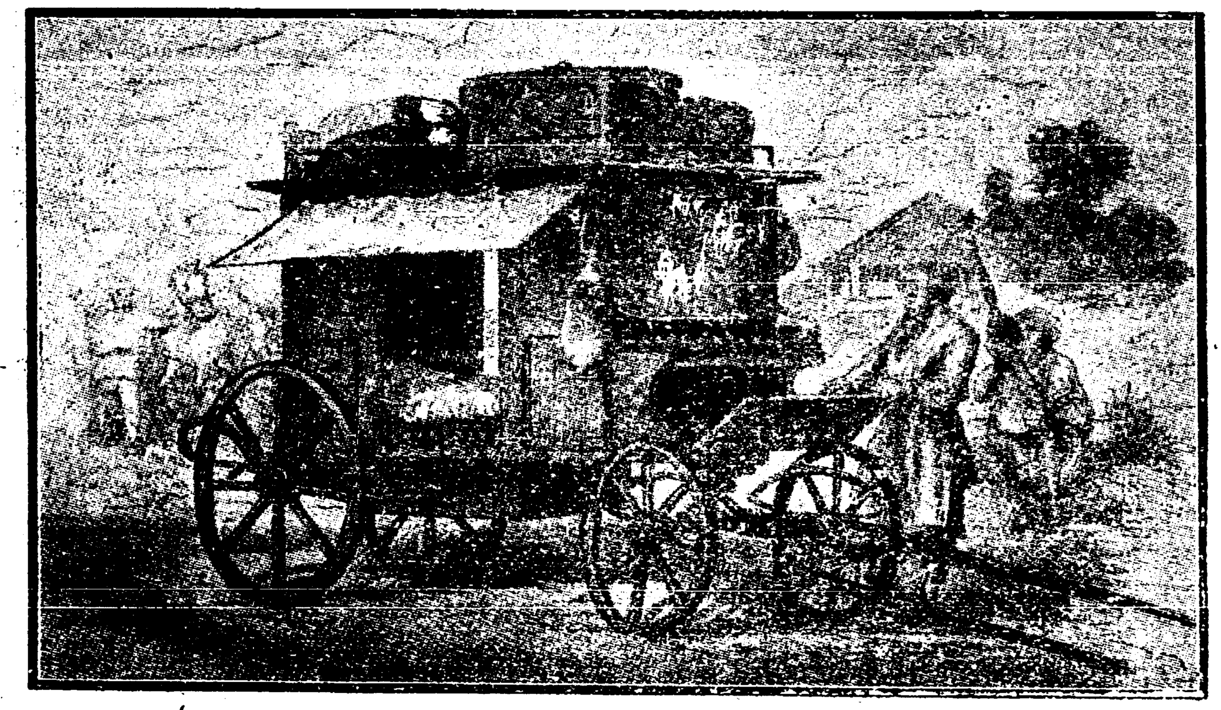

ঘোড়ার-ডাক—২ নং ছবি

টিকেট প্রথম প্রথম টাইপ্‌রাইটারে ছাপা হ'ত। কিন্তু পাছে সে সব টিকেট জাল হয়, এই ভয়ে এক উচ্চ রাজকর্ম্মচারী টিকেট গুলোতে নিজের নাম সই করে দিতেন—যেমন তোমরা নোটের ভেতর নাম সই দেখ্‌তে পাও।

অভাবের সময় টিকেট্ অনেক রকম কাগজের উপরই ছাপা হয়। কোন কোন রাজ্যের টিকেট্ রেলের টিকেটের উপর ছাপা হয়েছে। লিথুয়ানিয়ার অনেক টিকেট্, যুদ্ধের সময় জার্ম্মেণি যে সব ম্যাপ্ ব্যবহার করেছিল, তারই উল্টো পিঠে



ছাপান। এই সব কারণে কোন কোন টিকেটের পিঠের দিক্‌টাও বেশ একটা দেখ্‌বার জিনিষ। টিকেটের উল্টো পিঠে বিজ্ঞাপন দেওয়ার চেষ্টাও কোন কোন দেশে হয়েছিল। ভিক্টোরিয়া-আমলের ইংল্যাণ্ডের কোন কোন টিকেটের পিঠে পিয়ার্স্ সাবানের বিজ্ঞাপন আছে। ১৮৮২ সন থেকে ১৮৯৭ সন পর্য্যন্ত নিউজিল্যাণ্ডে যে সব টিকেট্ বের হয়, সেগুলোর পিঠে অনেক রকমের বিজ্ঞাপন দেখা যায়।

বড় বড় ডাকঘরের সীলের মধ্যেও, কখনো কখনো বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। আজকাল কলিকাতার জেনারেল পোষ্ট-অফিসে যে ছাপ দেওয়া হয় তাতে লেখা থাকে, "ভারতীয় শিল্পকে সাহায্য কর।" (Support Indian Industries.) এটা বোধ হয় তোমরা অনেকেই লক্ষ্য করেছ।

সব দেশেই যে প্রথম থেকে ডাক-টিকেটকে সকলে খুব সুনজরে দেখে এসেছে, তা কিন্তু নয়। কোরিয়ায় যখন প্রথম ডাক টিকেট বের হয় তখন সেখানকার লোকজন খুব ক্ষেপে উঠেছিল। তারা দেশের সমস্ত ডাকঘর ভেঙ্গে-চুরে, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে একাকার করে দিয়েছিল।

ইস্‌লামের মতে ভগবানের সৃষ্ট কোন জীবের প্রতিমূর্ত্তি আঁকা নিষেধ। কাজেই আগে আগে মুসলমানদের কোন রাজ্যে ডাক-টিকেটে কোন রকমের ছবি বের হোত না। কিন্তু বর্ত্তমান তুর্কী জাত হঠাৎ একদিন একখানা টিকেট বের করে ফেল্ল, যাতে বের হোল, ভগবানের সৃষ্ট জীব তো জীব, একেবারে শ্রেষ্ঠ জীব—স্বয়ং সুলতানের ছবি। দেশে একটু গণ্ডগোল হল, কিন্তু নবীন তুর্কী জাতির বিরুদ্ধে কেউ কথা বল্‌তে সাহস পেল না। আর আজকাল তো অনেক মুসলমান রাজ্যের ডাক-টিকেটেই মানুষের ছবি বার হচ্ছে।

ডাক-টিকেটে নানা রকম জিনিষের ছবি বার হয়। আমাদের দেশেই সারমুর নামে ছোট্ট একটী করদ-মিত্র রাজ্য আছে, তার ডাক-টিকেট ভারতবর্ষের টিকেট থেকে ভিন্ন। সেখানকার রাজার ছিল একটা খুব প্রিয় হাতী, ব্যস্, আর কি, দিলেন রাজা সেই হাতীটার ছবিই তাঁর দেশের টিকেটে তুলে। সে হাতীটী

মারা গেলে পর সে রাজ্যে যতখানি ধূম-ধারাক্কা করা হয়েছিল, বোধ করি কোন রাজা-মহারাজের মৃত্যুতেও ততখানি হয় কিনা সন্দেহ।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ডমিনিকা ও হাইতি বলে দুটো দ্বীপ আছে। ডমিনিকার খানিকটা ইংরাজদের অধিকারে, বাকীটা স্বাধীন। এই স্বাধীন অংশটুকুর নাম ডমিনিকা রিপাব্লিক। তোমাদের কারো কাছে যদি এদেশের ১৯০০ সনের এক কেণ্টাভো দামের টিকেট থাকে, তবে দেখ্‌বে, সেই টিকেট খানায় একটা দ্বীপের ম্যাপ আছে। দ্বীপটী দু'ভাগ করা, একভাগ হাইতির অধিকারে, অন্য ভাগ ডমিনিকার। হাইতির ভাগে দেখান হয়েছে এককোণে সামান্য একটুখানি জমি; আর ডমিনিকার ভাগে বাকী সবখানি। আসলে কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এই যে দ্বীপটার ঠিক অর্দ্ধেকটা ডমিনিকার আর বাকী অর্দ্ধেকটা হাইতির। কাজেই সে টিকেট খানায় হাইতিকে অপমান করা হয়েছে। আর যায় কোথা, হাইতি চোখ পাকিয়ে হেঁকে বল্‌ল "যুদ্ধং দেহি।" শেষে একটা মিট্‌মাট্ হয়ে গেল, ডমিনিকা রিপাব্লিকের গভর্ণমেণ্ট্ সে টিকেটটা চালান বন্ধ করে দিলেন।

সিসিলির রাজা দ্বিতীয় ফার্ডিনাণ্ডের (তাঁর ডাক নাম ছিল রাজা বোম্বা) রাজত্বকালে যখন প্রথম ডাকটিকেট্ বার হোলো, তখন সেই টিকেটে সবাই খুব ঘটা করে রাজার ছবি ছাপ্‌ল। কিন্তু রাজা মশাই নিজে বস্‌লেন বেঁকে, বল্লেন, "সে কিহে, আমার ছবির ওপর সীল মেরে তার নাক মুখ সব তোমরা থেব্‌ড়ে ফেল্‌বে, আর আমি তাই সইব? সেটী হচ্ছে না বাপু!" তখন সবাই নতুন এক রকম ছাপ বার কর্‌ল, যাতে রাজার গায়ে কোন রকম কালীর দাগ না পড়তে পারে। তবে রাজা মশা'য়ের অনুমতি মিল্‌ল।

ঠিক এই রকমেরই আর একটা কাণ্ড ঘটেছিল রুষিয়ায়। সেখানকার শেষ 'জার' দ্বিতীয় নিকোলাসের ছবি যখন টিকেটে ছাপা হল, তখন প্রজারা সবাই তুমুল আপত্তি জানাল, তারা তাদের দ্বিতীয় পিতার (Little Father) ছবি কখনো সীল মেরে নষ্ট করতে পারবে না। অথচ এই 'জার'কেই কিনা শেষে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে গুলি করে মেরে ফেলে। একেই বলে অদৃষ্ট!



আজ এই পর্য্যন্তই। তোমাদের যদি ভাল লাগে তো সম্পাদক মহাশয়কে জানিও, ডাকটিকেট সম্বন্ধে আরও অনেক মজার মজার কথা তোমাদের শোনাব।

---

## স্বর্গের মন্দির

এক দেশে এক চিত্রকর আর এক ভাস্কর বাস করিত। চিত্রকরের নাম নিরঞ্জন, ভাস্করের নাম চিরঞ্জীব। ভাল কাজ জানে বলিয়া তাদের দু'জনেরই বেশ নাম ডাক ছিল। লোকে জানিত তাদের মধ্যে বেশ বন্ধুত্বও আছে; কিন্তু আসলে ছিল ঠিক তার উল্টা—কেহ কাহারও নামও শুনিতে পারিত না;—বিশেষ করিয়া চিত্রকরটি। সে রাতদিন ভাবিত, কেমন করিয়া ভাস্কর বেচারীর অনিষ্ট করিবে।

সে দেশের যে রাজা, তিনি ছিলেন পরম গুণবান্। রাজ্যের সকলেই তাঁকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিত। রাজার বয়স হইয়াছিল, তিনি প্রায়ই ভাবিতেন—এইবার তাঁর ছেলের হাতে রাজ্যের ভার বুঝাইয়া দিবেন, কিন্তু রাজপুত্রের বুদ্ধি জিনিষটার একটু অভাব থাকাতে শেষ পর্য্যন্ত সেটা আর কাজে হইয়া উঠিল না।

ইহার মধ্যে হঠাৎ একদিন বুড়া রাজা মারা গেলেন। রাজপুত্র রাজা হইলেন।

এদিকে সেই যে চিত্রকর—ভাস্করের উপর তার হিংসাটা দিনে দিনে বাড়িয়াই চলিয়াছিল। এইবার সে ভাবিল, 'বোকা রাজাটাকে হাত করিয়া চিরঞ্জীব হতভাগাটাকে সরাইয়া ফেলি না কেন—ও থাকা পর্য্যন্ত ত' আর দেশ-যোড়া খ্যাতিটা আমার একার ভাগ্যে নাই; অর্দ্ধেক লোকের সুখ্যাতি ত' ঐ কুড়াইতেছে।'

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া হঠাৎ একদিন তার মাথায় এক বুদ্ধি আসিল। সে সটান্ গিয়া নতুন রাজার কাছে হাজির।

রাজা চিত্রকরকে চিনিতেন। বলিলেন "কি হে, খবর কি?" চিত্রকর জবাব দিল, "খবর খুবই ভাল, আর তেমনি আশ্চর্য্য। সেই জন্যই ত' মহারাজের কাছে আসা। কি জানেন? আপনার বাবা, বুড়ো রাজা—তিনি এখন স্বর্গে গিয়ে আবার নতুন জন্ম নিয়েছেন। এখন তিনি সেখানে বেশ সুখেই আছেন। কাল রাত্রে তিনি আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন। তিনি নাকি স্বর্গে একটা মন্দির তৈরী করছেন। এখানে থাক্‌তে আমাকে খুব ভাল বাসতেন কিনা, তাই আমায় সব কথা খুলে বল্লেন; আর আপনাকে এই চিঠিখানা দিতে বল্লেন,—এটাও আমি কাল স্বপ্নে পেয়েছি।" এই বলিয়া চিত্রকর কাপড়ের ভিতর হইতে জমকালো কাগজে লেখা এক খানা জাল চিঠি বাহির করিয়া নতুন রাজার হাতে দিল। রাজা দেখিলেন, চিঠিতে বুড়া রাজা স্বর্গের অনেক কথাই লিখিয়াছেন। শেষে লেখা আছে—"আমাদের বংশের কল্যাণের জন্য আমি এখানে একটা মন্দির তৈরী করাইতেছি। মন্দিরটি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এখন এটাকে ভাল করিয়া সাজাইবার জন্য একটি ভাস্করের দরকার। এখানকার ভাস্করদের কাজ আমার বেশী পছন্দ হয় না—বিশেষতঃ আমার ইচ্ছা, মন্দিরের কারুকার্য্যটা আমাদের দেশের মত হয়;—কাজেই আমাদের দেশেরই একটি ভাস্কর চাই। তোমাদের ওখানকার চিরঞ্জীব ভাস্করকে বোধ হয় তুমি চেন। আমার মনে হয় সেই এই কাজের যোগ্য লোক। আমি নিরঞ্জনকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সেও তাহারই নাম করিল। কাজেই তুমি অবিলম্বে চিরঞ্জীবকে এখানে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিবে। কি ভাবে সে এখানে আসিতে পারিবে, তাহা নিরঞ্জনকে বুঝাইয়া বলিয়াছি; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও।"

রাজা ত' চিঠি পাইয়া প্রথমটা চিত্রকরকে একেবারে জড়াইয়া ধরিলেন। তারপর বলিলেন, "এক্ষুণি চিরঞ্জীব ভাস্করকে ডাক।"

ভাস্কর আসিল। রাজা তাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া ভাস্করের ত' চক্ষুস্থির। জ্যান্ত মানুষ আবার স্বর্গে যাইবে কেমন করিয়া? রাজা চিত্রকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, 'নাঃ, সে ব্যাপারটায় বিশেষ



গোল নেই। কি করে যাবে বল্‌ছি। আগে চিরঞ্জীব তার সমস্ত যন্ত্রপাতি ঠিক ঠাক করে নিক্। তারপর সে গুলো নিয়ে সে তার বাগানে দাঁড়াবে, আর তার চার দিকে কাঠের পাঁজা দিয়ে উঁচু করে ঘিরে দেওয়া হবে। তার পর সেই কাঠের পাঁজায় ঘি ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের যত বাদ্যকর আছে তারা তাদের বাজনা বাজাতে আরম্ভ করবে। একটু পরেই দেখা যাবে সেই আগুন থেকে কালো কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছে। সেই ধোঁয়ায় চড়ে আমাদের বন্ধু চিরঞ্জীবও খুব সহজেই স্বর্গে চলে যেতে পারবে।"

রাজা ইহার মধ্যে কোনও গোল দেখিতে পাইলেন না—বেশ সহজ উপায়। ভাস্করকে যন্ত্রপাতি, সাজ সরঞ্জাম ঠিক করিবার জন্য একদিন সময় দেওয়া হইল।

ভাস্করের বুঝিতে বাকী রহিল না, যে সমস্তই ঐ চিত্রকরটার কারসাজী। কিন্তু রাজার হুকুম, এখন ত' আর 'না' বলিবার উপায় নাই!

বাড়ী ফিরিয়া ভাস্কর তার স্ত্রীকে সব কথা খুলিয়া বলিল। ভাস্করের স্ত্রী ছিল খুব বুদ্ধিমতী। সমস্ত শুনিয়া সে বলিল,—"তুমি ভেব না, আমি এর একটা উপায় বের করবই।" তারপর ভাস্করের স্ত্রী করিল কি—রাতারাতি ভাস্করকে লইয়া বাগানে যেখানটায় তাকে পোড়াইবার কথা সেখান হইতে আরম্ভ করিয়া মাটীর তলা দিয়া একটা লম্বা সুড়ঙ্গ কাটিয়া ফেলিল। সুড়ঙ্গের অপর মুখ হইল তাদের বাড়ীতে ঘরের ভিতর। তারপর আবার বাগানে গিয়া সুড়ঙ্গের অন্য মুখটা একটা বেশ চওড়া অথচ হাল্কা পাথর দিয়া ঢাকিয়া রাখিল। ব্যাপারটার বিন্দু-বিসর্গও কেউ জানিতে পারিল না।

পরের দিন সকাল বেলা ভাস্করের স্ত্রী সেই পাথরটার চারি দিকে নানা রকম আল্পনা দিল, ফুল দিয়া সাজাইল,—ভাবখানা যেন স্বামী স্বর্গে মন্দির সাজাইতে যাইবে, তার আর আনন্দের সীমা নাই। চিত্রকর ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে হাসিল; ভাবিল, বাছাধনেরা ব্যাপারটা সত্যি বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছে, ওরা কি বোকা!

যথা সময়ে ভাস্করকে স্বর্গে পাঠাইবার আয়োজন হইল। তাকে সেই পাথরটার উপর দাঁড় করাইয়া চারিদিকে কাঠ সাজাইয়া তাতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইল; সঙ্গে সঙ্গে ঢাক ঢোল বাজিতে লাগিল। প্রজারা বুড়া রাজাকে ভাল বাসিত, তাঁর কাজের জন্য ভাস্কর চলিয়াছে তারা ত' খুবই খুসী। একটু পরেই কুণ্ডলী পাকাইয়া কালো কালো ধোঁয়া চারিদিক্ অন্ধকার করিয়া ফেলিল, ভাস্কর-ও সুযোগ বুঝিয়া সেই অন্ধকারে পাথর সরাইয়া সুড়ঙ্গে ঢুকিয়া পড়িল—তারপর তার ভিতর দিয়া অক্ষত দেহে নিজের বাড়ী গিয়া হাজির। ওদিকে বাহিরে বাগানে তখন চিত্রকর ধোঁয়া দেখাইয়া লোকদের বুঝাইতেছে, "ঐ দেখ চিরঞ্জীব আমাদের কেমন ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে স্বর্গে উঠে যাচ্ছে।"

সেই রাত্রে ভাস্কর ও তাহার স্ত্রী চুপি চুপি উঠিয়া সুড়ঙ্গ বুজাইয়া ফেলিল। তারপর কিছুদিন ভাস্কর আর বাড়ী হইতে বাহির হয় না—এমন কি সূর্য্যের আলোতেও নয়; রোজ সে দুধ দিয়া স্নান করে। লোকে জানে সে স্বর্গে গিয়াছে।

মাসখানেক পরেই ভাস্করের গায়ের রংটা একটু বদ্‌লাইয়া গেল। তখন এক দিন সে খুব সাজিয়া গুজিয়া জমকালো একটা পোষাক পরিয়া একেবারে রাজ-দরবারে গিয়া হাজির। রাজা ত' তাহাকে দেখিয়া একেবারে অবাক্। কিন্তু ভাস্কর যখন তার জামার ভিতর হইতে বুড়া রাজার এক খানা জাল চিঠি বাহির করিয়া রাজার হাতে দিল, তখন আর তাঁর আহ্লাদ দেখে কে? চিঠিতে অন্যান্য কথার পরে লেখা ছিল, "তুমি যে ভাস্করকে পাঠাইয়াছিলে তার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, মন্দিরটিকে সে আশ্চর্য্য রকম কারুকার্য্যে সাজাইয়াছে। এত সুন্দর যে এখানকার দেবতারাও আগে তার ধারণা করিতে পারেন নাই। তার কাজে আমি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি তাকে রাজ-ভাণ্ডার উজাড় করিয়া সে যত চায় তত ধন-রত্ন দিবে। ইহা আমার আদেশ জানিও। আর একটা কথা, আমি ভাবিতেছি এখানকার মন্দিরটিকে একেবারে নিখুঁত করিয়া তবে ছাড়িব; তার জন্য একটি ভাল চিত্রকরের দরকার। আমার মনে হয় নিরঞ্জন চিত্রকরই এ কাজের সব



চেয়ে উপযুক্ত লোক। চিরঞ্জীবেরও তাই মত। সুতরাং তুমি অবিলম্বে নিরঞ্জন চিত্রকরকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিবে। চিরঞ্জীব যে ভাবে স্বর্গে আসিয়াছিল নিরঞ্জনও তেমনি ভাবেই আসিতে পারিবে।"

তৎক্ষণাৎ নিরঞ্জনের তলব পড়িল।

চিত্রকর আসিয়া ভাস্করকে দেখিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িল। তারপর রাজা যখন তাকে বুড়া রাজার চিঠি দেখাইলেন তখন সে বলির পাঁঠার মত কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু 'না' বলিবার ত' আর উপায় নাই।

ভাস্কর হাসিয়া তার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "কোন ভয় নেই ভাই, আমারও প্রথমটা খুব ভয় হয়েছিল, কিন্তু শেষটায় বেশ আরামেই স্বর্গে গিয়েছিলাম।" ভাস্করের অক্ষত চেহারা দেখিয়া চিত্রকর মনে ভাবিল—হবেও বা, ওর যখন কিছু হয় নাই, তখন আমারও হয় ত' কিছুই হবে না। এদিকে রাজা ভাস্করকে অগাধ ধন-রত্ন দিয়া বিদায় দিলেন; প্রজারা আনন্দে এই স্বর্গ-ফেরৎ লোকটিকে প্রায় কাঁধে করিয়াই লইয়া গেল।

তার পর যথা সময় সেই বাগানে পাথরের উপর চিত্রকরকে তার সাজ-সরঞ্জাম শুদ্ধ দাঁড় করান হইল। তার পর তাহার চারিদিকে কাঠের পাঁজা সাজাইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিতেও দেরী হইল না। চিত্রকরের গায়ে একটু একটু করিয়া আগুনের তাত আসিতে লাগিল। সে ভাবিল, এখনই সব ঠিক হইয়া যাইবে, ধোঁয়াটা ভাল করিয়া উঠিলেই হয়। একটু পরেই ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, যেন হাজার হাজার সাপ এক জোটে ফণা তুলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। সে আগুনে চিত্রকরের সর্ব্বাঙ্গ ঝলসিয়া গেল, সে আর থাকিতে না পারিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাঁচাও, বাঁচাও, পুড়ে মরলাম, পুড়ে মরলাম।" কিন্তু সেই সময় এক সঙ্গে হাজারটা ঢাক, ঢোল, শানাই, বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছে, তার আওয়াজের তলায় চিত্রকরের গলার আওয়াজ কোথায় যে চাপা পড়িয়া গেল তাহার ঠিক নাই। দেখিতে দেখিতে চিত্রকর পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।*

* একটা সেকেলে গল্প অবলম্বনে

# লণ্ডনের কথা

( শ্রীতপতী সরকার )*

লণ্ডনে পৌঁছেই দেখি যে দাদা আমাদের "রামধনু" পাঠিয়ে দিয়েছেন। পড়্‌তে পড়্‌তে মনে হল যে লণ্ডনের কথা লিখে পাঠালে হয়ত আমাদের মতন ছেলে-মেয়েদের ভাল লাগবে।

লোকের মুখে শুনেছিলাম যে লণ্ডন বড় বিশ্রী জায়গা। চারিদিকে মোটর গাড়ী ছুটছে,—ধোঁয়া, ধূলো,—বাড়ীগুলো ঘেঁসাঘেঁসি। তাই জন্যে আমাদের মনে লণ্ডনের একটা অদ্ভুত ধারণা ছিল, আর এখানে আসতে আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এখানে এসে আমাদের ধারণা বদলে গেছে।—সুন্দর সুন্দর পার্ক রয়েছে এখানে—এক একটা কি প্রকাণ্ড! প্রায় সব পার্কেই তিনটে করে পুকুর। একটা মানুষদের চানের, একটা কুকুরদের চানের, আর একটা ছেলেদের নৌকা ভাসাবার। ছেলেরা ছোট ছোট নৌকা পাল তুলে ভাসিয়ে দেয়, পাল্লা দিয়ে ছোটায়,—তখন চারিদিকে বড়দের কি ভিড় হয় জান না। ফুলের বাগানগুলিও ভারী সুন্দর।

Ken Wood Park বলে একটা জায়গা আছে। তার মধ্যে প্রকাণ্ড এক বাড়ী। এটা ভারী সুন্দর জায়গা। বড় বড় গাছের ভিতর দিয়ে রাস্তা, পুকুর, এবং অসংখ্য ফুলের গাছ। তা ছাড়া বাড়ীর ভিতরটা আশ্চর্য্য সব ছবিতে ভরা। শুন্‌লে অবাক্ হবে, এই আড়াই শ' বিঘের বাগানশুদ্ধ বাড়ী, ছবি, সব Lord Iveagh (লর্ড আইভা) বলে একজন ভদ্রলোক দেশের লোকের বেড়াবার জায়গা করবার জন্য দান করে গিয়েছেন। এটা তাঁর নিজের বাগানবাড়ী ছিল।

Hamstead Heath বলে প্রকাণ্ড মাঠ (৩০০০ বিঘের উপর) এই Ken

* কুমারী তপতী সরকারের বয়স মোটে এগার বছর। সে তার মা-বাবার সাথে বিলাতে গিয়াছে। কুমারী তপতীর ঠাকুরমা ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা সরকার, আর দাদা মহাশয় শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার।



Wood এর সঙ্গে জোড়া। Heath এর একটা উঁচু জায়গাকে Parliament Hill (পার্লিয়ামেণ্ট হিল্) বলে। সেখান থেকে লণ্ডন সহর যেন ছবির মত দেখায়।

হ্যাম্প্‌টন কোর্ট্ বলে আর একটা সুন্দর বাগান আছে। সেটা ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেন্‌রীর বাড়ী ও বাগান ছিল—এখন লোকে বেড়াতে যায়। এখানে আরও কত পার্ক আর বাগান আছে বলে শেষ করতে পারি না। হাইড্ পার্ক্ এর নাম ত সকলেই জানে। গরীব লোকের ছেলেরা ঘরে বন্ধ না থেকে তাদের মেয়েদের সঙ্গে এই সব ভাল ভাল বাগানে বেড়াতে পারে। আর একটা মজা, হয়ত তুমি বেড়াতে বেড়াতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছ, খানিক হেঁটে গেলেই একটা চা কিংবা কিছু খাবার জায়গা দেখতে পাবে।

এখানকার চাকরেরা রাস্তায় নোংরা ফেলে না। সব নিজেদের বাড়ীর একটা প্রকাণ্ড টিনে ফেলে রাখে, আর ময়লার গাড়ী প্রত্যেক বাড়ী থেকে সেগুলো পরিষ্কার করে নিয়ে যায়। তা ছাড়া রাস্তার মোড়ে আর পার্কের ভিতর গাছের গায়ে গায়ে ঝুড়ি ঝোলান আছে, তোমার টিকিট ফিকিট, ছেঁড়া কাগজ রাস্তায় না ছড়িয়ে সেখানে ফেল। পার্কে নোংরা কিছু ফেল্‌লেই জরিমানা! থুতু ফেল্‌লেও তাই!

এবার একটা মজার জিনিষের কথা বলি। তোমার হয় ত সকলে 'রামধনু'তে পড়েছিলে এক অদ্ভুত ঘড়ির কথা, যেটাতে লেখা থাকে What is the time? তাতে একটা ম্যাপ লাগান আছে, আর তা দেখে ঠিক্ তখন পৃথিবীর সব বড় বড় সহরে ক'টা বেজেছে বলা যায়। আমরা প্রায়ই গিয়ে দেখি কল্‌কাতায় এখন ক'টা বেজেছে। পিকাডিলি সার্কাসে (একটা পাড়ার নাম) ও অন্য দুই এক জায়গায় একটা ভারী অদ্ভুত জিনিষ আছে। সেটা হচ্ছে চলন্ত সিঁড়ি। ধাপে ধাপে সিঁড়ি ক্রমাগত উপরে যাচ্ছে, নয় ত নীচে নামছে। তার একটা ধাপে দাঁড়ালে আপনি তোমায় নিয়ে যাবে। বেশ মজার নয়? ছোট ছোট ছেলেরা এই সিঁড়িতে উঠ্‌তে খুব ভালবাসে।

এখানকার চিড়িয়াখানা এমন সুন্দর করে সাজান কি বল্‌ব। তার মধ্যে

একোয়েরিয়াম্ বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে যত রকম মাছ ইত্যাদি রাখা হয়েছে। সে এত নানা রকমের যে আমি বল্‌তেই পারব না। দু একটা মজার কথা বলি। ইলেক্‌ট্রিক্ ঈল্ বলে একটা লম্বা মাছ আছে, সেটা যে কোন জীবের গায়ে ছুঁলে জীবটা মরে যাবে। সব চেয়ে মজার Sea-horse (সমুদ্রের ঘোড়া) গুলো। ছোট্ট ছোট্ট জানোয়ার—লেজের উপর ভর করে দাঁড়ায়। কুমীরের মত তাদের মুখ, অথচ টিকটিকির চেয়েও ছোট। প্রবাল দেখ্‌লাম—সব বাঁচা অবস্থায়। কাচের খাঁচায় এরা আছে, পাম্প করে হাওয়া দেওয়া হয়। কয়েকটী মাছের জন্য আল্‌ট্রা ভায়োলেট্ রে দেয়।

ব্রিটীশ মিউজিয়াম্ এর নাম বোধ হয় তোমরা শুনেছ। সেখানে সেকালের রাজাদের, কবিদের হাতের লেখা, সেকালের অসভ্যদের অস্ত্রশস্ত্র, ইজিপ্টের 'মামি' সব রয়েছে। একটা মামি একেবারে খোলা। সেই লোকটার চুল পর্য্যন্ত একটু একটু রয়েছে। এখানে আরও অনেক মিউজিয়াম্ আছে। সেখানেও কত আশ্চর্য্য জিনিষ আছে। এখানকার অনেক স্কুলের ছেলে-মেয়েদের দেখ্‌লাম ছুটি হলেই মিউজিয়াম্‌এ গিয়ে সব দেখে, খাতায় এঁকে নিয়ে আসে।

Houses of Parliament (পার্লিয়ামেণ্টের বাড়ী) ঠিক টেম্‌স্ নদীর ওপর। এখানে দেশের উন্নতির জন্য মন্ত্রীরা পরামর্শ করেন। এই সভাতে এ দেশের কয়েকজন মেয়েও সভ্য আছেন। যাই হোক, এর বিষয় আমার অল্পই জানা আছে, কাজেই এর ঠিক বিবরণ দিতে পারলাম না। তোমরা হয় ত আমার চেয়ে বেশী জান।

এবার ওয়েষ্ট্‌মিনিষ্টার য়্যাবির কথা বলি। এতে ইংলণ্ডের বড় বড় রাজা, মন্ত্রী ও বড়লোকদের সমাধি আছে। এখানে সমাধি পাওয়া ইংরাজদের পক্ষে সব চেয়ে বড় সম্মান। মস্ত বড় গির্জ্জা, প্রকাণ্ড জানালা, দরজা আর ভিতরে কত লোকের গোর। চারিদিক নিস্তব্ধ। নেল্‌সন্ এত বড় যোদ্ধা, তিনিও এখানে সমাধি পাবার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু তা সফল হয় নি।



তাঁর নামে ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ার আছে। সেখানে তাঁর খুব উঁচু মূর্ত্তি আছে। স্কোয়ারটার চারপাশে চারটে বড় বড় মূর্ত্তি।

অনেক দিন আগে ম্যাডাম্ টাসাণ্ড্ বলে একটি মহিলা মেয়েদের মূর্ত্তির একটা Exhibition করেছিলেন। সেটা মাঝে পুড়ে গিয়েছিল, এখন আবার নূতন করে তৈরী করা হয়েছে। তাতে অনেক রাজা রাজড়ার ও অন্যান্য সব মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিগুলি একেবারে সত্যিকার মানুষের মত—ধাঁধা লেগে যায়। এর ভিতরেই

টেম্‌স্ নদীর উপর পার্লিয়ামেণ্টের বাড়ী

'চেম্বার অব্ হররস্' বলে আর একটা ঘর আছে। তাতে সব খুনে, ডাকাত, ও দুষ্টলোকেদের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আছে।

লণ্ডনএর আসল জিনিষ বল্‌তে ভুলে গিয়েছি। এখানে সব দোতালা বাস্—আমাদের কলকাতায় যেমন কয়েকটা আছে। ট্রামগুলোও দোতালা। দোতালা বাসএর মাথায় চড়ে যেতে আমাদের খুব মজা লাগে। আরও মজার হচ্ছে গিয়ে টিউব! এবার টিউবএর বর্ণনা দি। যাদের খুব কাজের তাড়া,

তারা বাসএ গেলে দেরি হয়ে যেতে পারে, কেননা ভিড়ের সময় বারে বারে থাম্‌তে হয়। তাই লোকে বুদ্ধি করে মাটির নীচে সুড়ঙ্গ কেটে তার ভিতর ট্রেণ যাবার পথ করেছে। এগুলো ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রেন, নয়ত ধোঁয়ায় মরতে হত। মাটির তলায় ত হাওয়া নেই, সেই ওপর থকে পাম্প্ করে হাওয়া পাঠান হয়। টিউবএ শীতের দিনে গরম আর গরমের দিনে ঠাণ্ডা লাগে। ভারি মজা, না? অন্ধকারও নয়, ইলেক্‌ট্রিক আলোতে ঝল্‌মল্ করছে। এর উপর তলা দিয়ে ডিষ্ট্রিক্ট্ রেলওয়ে গিয়েছে। সেটাও ইলেক্‌ট্রিকে চলে। তার উপর দিয়ে ট্রাম, বাস্, মোটর চলেছে। এখানে সত্যিকারের আলো। সিঁড়ির মতন যেন নানারকম পথ ধাপে ধাপে উঠে গেছে। ধন্যি বল্‌তে হবে লণ্ডনকে! এত বড় যে সহর, এত কাণ্ডকারখানা কিন্তু গোলমাল মোটে নেই। সবাই নিজের কাজে চলেছে, আস্তে আস্তে কথা বল্‌ছে। বেশ মজা, না?

তোমাদের আগে থাকতে একটা সুখবর দিয়ে রাখি। কথা হচ্ছে যে কল্‌কাতায় টিউব হবে। কতদূর ঠিক্ তা জানি না। অনেকেই ত বল্‌ছে যে আর দশ বছরের মধ্যে কল্‌কাতা প্রায় লণ্ডন! তোমাদের কি মনে হয়? দেশের খবর পেতে খুব ইচ্ছা করে। তোমাদেরও বোধ হয় এখানকার খবর ভাল লাগে?

---

**চিত্র-পরিচয়** ঃ—একবার বিদ্যাসাগরের ছোট ভাইএর বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার মা তাঁহাকে বাড়ী যাইতে আদেশ করেন। বিদ্যাসাগর তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরী করিতেন। তিনি ছুটীর দরখাস্ত করিলেন। ছুটী প্রথমটা মঞ্জুর হইল না, কিন্তু বিদ্যাসাগর মাতৃ-আজ্ঞা মনে করিয়া সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মত্যাগের ভয় দেখাইতে ছুটী পাওয়া গেল।

বাড়ী যাইতে পথে দামোদর নদ পার হইতে হয়। বিদ্যাসাগর পাড়ে গিয়া দেখিলেন—নদীতে তখন প্রবল বর্ষার ঢল নামিয়াছে, ওদিকে খেয়ার নৌকা ওপারে। সেদিন বাড়ী না পৌছাইলেই নয়। মায়ের আদেশ মনে করিয়া বিদ্যাসাগর সকলের নিষেধ সত্ত্বেও সেই ভীষণ দামোদরের স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, তারপর সাঁৎরাইয়া ওপারে উঠিলেন। এমনিভাবে আর একটা নদী পার হইয়া ভিজা কাপড়ে 'মা মা' করিতে করিতে তিনি বাড়ী গিয়া উঠিলেন। ছবিতে বিদ্যাসাগর দামোদর পার হইতেছেন।

---

# যমরাজের সমস্যা

( শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ )

বিনোদ বাবু রংপুরে মস্ত উকিল। সকাল, সন্ধ্যায় বাড়ীতে মক্কেল আর ধরে না। টাকা যে কত তাহার তো হিসাবই নাই। কেউ বলে পঁচিশ হাজার; কেউ বলে লাখ পাঁচেক তো বটেই। রোহিণীকান্তের অবস্থা ঠিক উল্টা। তাহার ঘরে মক্কেলের বদলে পাওনা-দারের ভিড়। ছেঁড়া কোট, ময়লা প্যাণ্ট্। কোন রকমে দিন চলাই ভার। কিন্তু রোহিণীর চেহারাখানা ঠিক বিনোদ বাবুর মতই লম্বা চওড়া। তবে বিনোদ বাবুর মুখে মস্ত দাড়ি, রোহিণীর দাড়ি নাই, গোঁফ আছে। দুইজনে অল্পসল্প ভাবও আছে।

সেদিন কথায় কথায় বিনোদ বাবু বলিলেন, "ওহে রোহিণী, আর এখানে ভালো লাগছে না; এবার হাইকোর্টে যাওয়া যাক্, কি বল?" তাহাই স্থির হইল। আগের দিন সন্ধ্যা বেলায় রোহিণী আসিয়া কহিল, "দয়া করে যদি আমার সঙ্গে একটু আসেন বড়ই উপকার হয়।"

বিনোদ বাবু বলিলেন, "কোথায়?"

"আজ্ঞে এই কাছেই।"

বিনোদ বাবু চলিলেন। সহরের প্রায় শেষ কোণে নিমাই পরামাণিকের চুল দাড়ির দোকান। এ অঞ্চলে সমস্ত যাত্রায় এবং থিয়েটারে চুল দাড়ি যোগাইবার ভার তাহারি উপর। বিনোদ বাবুকে সেই খানে লইয়া যাওয়া হইল। কিছুক্ষণ পরে নিমাই আসিতেই রোহিণী তাহার কানে কানে কি বলিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে দুই দিক থেকে দুইটা লোক আসিল, একজন বিনোদ বাবুকে ধরিয়া ফেলিল, এবং অন্য জন তাহার গালে সপাসপ ক্ষুর চালাইয়া দিল। তিনি চমকাইয়া উঠিলেন, "আরে করো কি? করো কি?" ততক্ষণে তাঁহার দাড়ির দফা শেষ। বিনোদ বাবু মুখে হাত দিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "পাজি, জোচ্চোর, তোদের সবগুলোকে আমি জেলে পূরবো।" রোহিণী জোর হাত করিয়া কহিল, "আজ্ঞে চটবেন না, আপনার দাড়ি আবার হ'বে। এতে আপনার কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার মস্ত লাভ আছে।"

বিনোদ বাবু কহিলেন, "লাভটা কি শুনি?"

"—এই দেখুন।" বলিতে বলিতে নিমাই সেই দাড়িগুলোর একটা চাপ তৈরী করিয়া রোহিণীর মুখে পরাইয়া দিল। বিনোদ বাবু রাগ ভুলিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। মনে হইল

তিনিই রোহিণী, আর এই দাড়িচোর লোকটাই সত্যিকার বিনোদ বাবু। রোহিণী আবার তেমনি ভাবে হাত জোর করিয়া কহিল,"আর একটা নিবেদন আছে। আপনার বাড়ীটা আমাকে ভাড়া দিতে হ'বে।"

বিনোদ বাবু আপত্তি করিলেন না।

সেই ঘর, সেই আসবাব, চাকর বাকর সব তেমনি রহিল। কেবল বিনোদ বাবু নাই ; তাহার দাড়ি লইয়া রহিল রোহিণী। মক্কেলের দল ব্যাপারটা বুঝিল না।

তেমনি ভাবেই আবার ভিড় জমিতে লাগিল। কেউ সন্দেহ করিল না যে এ লোকটা বিনোদ বাবু নয়। বছরের মধ্যে রোহিণীর অবস্থা ফিরিয়া গেল। পাড়ার লোকে বলাবলি করিল, "একেই বলে আঙুল ফুলে কলাগাছ। এই রোহিণীটা খেতে পেত না। দাড়ি চুরি করে বড়লোক হ'য়ে গেল।" শিরোমণি মশাই কহিলেন, "কপাল! কপাল!"

এমনি ভাবে বছর কয়েক যায়। হঠাৎ একদিন এক অদ্ভুত দুর্ঘটনা ঘটিল। রোহিণী জজের সুমুখে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছিল,"হুজুর, আমার মক্কেল———" ব্যস্। সঙ্গে সঙ্গে ধূপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। লোকজন ছুটিয়া আসিয়া দেখিল জ্ঞান নাই। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "হঠাৎ হার্ট ফেল করে মৃত্যু হ'য়েছে!"

( ২ )

অপঘাত মৃত্যু। সুতরাং যমালয়ে রোহিণীর তলব হইল।

চারিদিকে যত দূর দৃষ্টি যায় মেঘ আর মেঘ। তার উপর হাজার হাজার রঙের খেলা— যেন মায়ালোক। সেই অন্তহীন মেঘমণ্ডলের ভিতর দিয়া তীর বেগে বিদ্যুতের রথ ছুটিয়াছে। দুই দিকে দুইটা কালরূপী যমদূত ; মাঝ খানে রোহিণী। পায়ের তলায় কুয়াসার আবছায়ায় ঢাকা অস্পষ্ট পৃথিবী। পর্ব্বতে সাগরে মিশিয়া গিয়াছে, যেন একখানা একটানা ছবি। রোহিণীর সেদিকে লক্ষ্য নাই। সে যমরাজের কাছে চলিয়াছে। পাপপুণ্যের বিচার হইবে। সেদিকেও ভ্রূক্ষেপ নাই। কেবলই মনে হইতেছে, এমন বাঁধা পশার—এত শীঘ্র শেষ হইয়া গেল!

রথ আসিয়া যমালয়ে থামিল। সদর দরজার পরেই চিত্রগুপ্তের আফিস। একরাশ মোটা মোটা খাতার জঙ্গলের মধ্যে মাথা জাগাইয়া বৃদ্ধ নাকের ডগায় চশমা লাগাইয়া বসিয়া আছে। রোহিণীকে তাহার সুমুখে দাঁড় করানো হইল। প্রশ্ন হইল "তোমার নাম বিনোদ রায়—?" আজ্ঞে না আমি রোহিণী সরকার।

"য়্যাঁ?"



চিত্রগুপ্ত খাতা ঘাঁটিয়া দেখিলেন, তাই ত, এ যে মস্ত ভুল হ'য়েছে।

যমদূতদের তলব হইল। তাহারা মিনতি করিয়া কহিল, "আমাদের দোষ নাই আমরা বাড়ী আর দাড়ি দেখে একে নিয়ে এসেছি।"

হুকুম হইল, "শীগ্গির রেখে এস।"

কিন্তু রোহিণী অত সহজে ছাড়িবার পাত্র নয় ; সুবিধা পাইয়া কহিল, "আমি স্বয়ং যমরাজের কাছে এর বিচার চাই, আমি উকিল, আমার মূল্যবান সময় নষ্ট হ'য়েছে। তার ক্ষতি পূরণ করতে হ'বে।" যমরাজ রোহিণীর অভিযোগ শুনিয়া কহিলেন, "বৎস, তোমার উপর আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছি। তুমি বর প্রার্থনা কর।"

রোহিণী কহিল, "ধর্ম্মরাজ, যদি প্রসন্ন হ'য়ে থাকেন, আমি আর কতদিন বাঁচবো, অনুগ্রহ করে বলে দিন।"

যমরাজের হুকুমে চিত্রগুপ্ত খাতা দেখিয়া কহিল, "তিন বছর পরে, মাঘী-পূর্ণিমার রাতে তোমার মৃত্যু হ'বে।"

সেই মেঘ-লোকের মধ্য দিয়া যমদূতের সঙ্গে রোহিণী ফিরিয়া আসিল।

এদিকে আদালতে রোহিণীর মৃতদেহ তুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। চারিদিকে কান্না-কাটি, হট্টগোল। হঠাৎ রোহিণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "হুজুর, হ্যাঁ কি বলছিলাম, আমার মক্কেল নিতান্ত নির্দ্দোষ।"

( ৩ )

রোহিণীর সবই আছে, কেবল মনে শান্তি নাই। তিন বছর! মাত্র তিনটি বছর! তারপর সবশেষ। রোহিণী দিন দিন শুকাইতে লাগিল। আত্মীয় স্বজনেরা চিন্তায় পড়িলেন। কিন্তু আসল কারণটা কেহই জানিল না। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, রোহিণীর মাথায় এক মতলব আসিল। রংপুর সহরের এক ধারে এক খৃষ্টান পাদ্রি ছিল। রোহিণী গিয়া তাহাকে ধরিল, "সাহেব আমি খৃষ্টান হ'বো। আমায় দীক্ষা দাও।" সাহেব তো বেজায় খুসী। রোহিণীর চোখের সুমুখে একটা আঙ্গুল ধরিয়া সাহেব কহিল, "কেটা আঙ্গুল আছে?"

"—একটা।"

"সেইমটো ঈশ্বর এক।"

রোহিণী মুগ্ধ হইয়া গেল। সাহেব আবার কহিতে লাগিল, "টোমাডের অবটার কৃষ্ট; আমার অবটার যিশুকৃষ্ট। কে বড় আছে? ডেখো! টুমি অঙ্ক জান?"

রোহিণী কহিল, "জানি।"

কাছেই একটা বোর্ড ছিল। সাহেব লিখিল $\frac{\text{যিশু | ক্লষ্ট}}{\text{| ক্লষ্ট}}$, তারপর কহিল, "ডেকো, ক্লষ্ট ক্লষ্টে কাটা গেলো, যিশু ঠাকিলো। অটএব যিশু বড় আছে।"

রোহিণী সেই দিনই খৃষ্টান হইল।

তারপর দেখিতে দেখিতে তিন বছর কাটিয়া গেল। সেই মাঘী-পূর্ণিমার আর তিন দিন বাকী। হঠাৎ রোহিণীর জ্বর দেখা দিল। রোহিণী ডাক্তার ডাকিতে দিল না। আত্মীয় স্বজনদের ডাকিয়া কহিল, "আমি জানি আমার সময় হ'য়েছে, ওষুধ খেয়ে লাভ নেই। কিন্তু তোমরা একটা কথা মনে রেখো। আমাকে গোর দেবার আগে এক দিন এক রাত্রি অপেক্ষা করো। সাবধান যেন ভুল না হয়।"

গভীর রাত্রে নিতান্ত সজ্ঞানে রোহিণীর মৃত্যু হইল।

আবার সেই যমদুত। এক নম্বর কহিল, "কিহে বাপু, সেবার বড্ড ঠকিয়েছিলে, এবার ?"

দুই নম্বর বলিল, "ঠিক বলেছিস ভাই। এ বেটার জন্যে পুরো দু'মাসের মাইনে কাটা গেল, এবার ওর ঘাড় ভেঙ্গে সেটা আদায় করবো।"

রোহিণী জবাব দিলনা; আগাগোড়া গম্ভীর হইয়া রহিল।

যমরাজ কহিলেন, "চিত্রগুপ্ত, এ ব্যক্তির পাপ-তালিকা বাহির কর।"

রোহিণী গলায় কাপড় দিয়া কহিল, "ধর্ম্মাবতার, তার পূর্ব্বে আমার একটা নিবেদন আছে।"

যমরাজ বলিলেন, "ব্যক্ত কর।"

রোহিণী ধীরে ধীরে কহিল, "ধর্ম্মরাজ, আপনি অন্তর্য্যামী। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমি হিন্দু নই, আমি খৃষ্টান। আপনি হিন্দুর দেবতা। সুতরাং এ অধীনের উপর আপনার কোন জুরিস্‌ডিক্‌সন বা এলাকা নাই। আমি এ আদালতের অধীন নই। অতএব আমাকে মুক্তি দিতে আজ্ঞা হয়।"

যমরাজ চিন্তিত হইলেন। চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন, "দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে দূত পাঠাও। বিশেষ পরামর্শ আবশ্যক।"

রোহিণীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "আপাততঃ তুমি মুক্ত।"

রোহিণী আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছে। যমরাজের বিচার এখনো শেষ হয় নাই। দেব-



গুরুর পরামর্শে পিতামহ ব্রহ্মার কাছে ব্যাপারটা উপস্থিত করা হইয়াছিল। তাঁহার আদেশে ম্লেচ্ছ নরকরাজ প্লুটোর সঙ্গে লেখালেখি চলিতেছিল। এদিকে দেবসেনাপতি কার্ত্তিককে সৈন্য সংগ্রহের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কেননা, যুদ্ধও বাধিতে পারে। ধন্য রোহিণী! তোমার জন্য স্বর্গেও শান্তি নাই।*

---

# কষ্ঠিপাথর

## ( ২ )

### দুঃসংবাদ

"খারাপ খবর আছে"

স্কুলের খুব কাছেই চার্লি-চ্যানিংদের বাড়ী। বাড়ীতে ফিরিয়াই চার্লি গলা ফাটাইয়া গান করিতে করিতে পড়ার ঘরে গিয়া ঢুকিতেছিল, বাড়ীর বুড়ী দাসী জুডিথ তাড়াতাড়ি আসিয়া তাকে থামাইয়া দিয়া কহিল, "আস্তে বাছা, বাড়ীতে খুব খারাপ একটা খবর আছে।"

"কি খবর জুডি? বাবার অসুখ আবার বেড়েছে নাকি?"

জুডিথ উত্তর দিল, "না বাছা, সে সব কিছু নয়, একটা দুঃসংবাদ এসেছে।

* অংশ বিশেষ কোন জার্ম্মান গল্পের ছায়াবলম্বনে।

খবরটা ঠিক্ যে কি তা' আমি নিজেও জানি না, কর্ত্রী ঠাক্‌রুণ যা দু'একটা কথা বল্‌ছিলেন, তাই থেকে আমি আন্দাজ করে নিচ্ছি। খবরটা এসেছে আজকেরই ডাকে।"

চাল্‌র্স্‌ নিজের মনেই একটু ভাবিয়া লইয়া কহিল, "সেই মোকদ্দমার কোন খবর ? মোকদ্দমা কি শেষ হয়ে গেছে নাকি ?"

"শেষ হয়ে গেছে বলেই মনে হচ্ছে বাছা। কর্ত্তার এত দিনকার আশা-ভরসা—সব গেছে। লক্ষ্মীছাড়া ডাকপিয়নটাকে জেলে দিলে তবে আমার রাগ যায়।"

চার্লস্‌ একেবারে পাথরে-গড়া মূর্ত্তির মত সেই খানে দাঁড়াইয়া পড়িল। অনেকদিন হইতে তার বাবা মিষ্টার চ্যানিংয়ের কাঁধে খুব বড় একটা মোকদ্দমা ঝুলিতেছিল—জিতিলে অনেক টাকা প্রাপ্য, হারিলে বিস্তর ক্ষতি। আসলে টাকাটা সত্যিই মিষ্টার চ্যানিংয়ের পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু অপর পক্ষের লোকদের ছিল অর্থবল। কাজেই একবার হারিয়া গিয়াও আবার তারা আপীল করিয়াছিল। চার্লির ভয় হইল হয়তো বা এই আপীলে তার বাবা হারিয়া গিয়াছেন। এ আপীলের পর যে আর কিছুই করার নাই, চার্লি তা জানিত।

দু'জনায় কথা-বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় বছর তেইশ বয়সের একটী সুন্দর ঢ্যাঙ্গা-মত যুবক সেই ঘরে আসিয়া ঢুকিল। সে এ বাড়ীর বড় ছেলে—নাম জেমস্‌, কিন্তু সকলেই তাকে তার ডাক নাম 'হামিশ' ধরিয়া ডাকিত। লম্বায় সে মাত্র ছয় ফুট দু' ইঞ্চি !

ঘরে ঢুকিয়াই হামিশ দুষ্টামীর সুরে বলিল, "দুটীতে মিলে এখানে গুজ্‌ গুজ্‌ করে কি ষড়্‌যন্ত্র হচ্ছে শুনি ? এ মশাইটী বুঝি টফি তৈরি করার ছলে আর একটী সস্‌প্যানের তলা পোড়াবার মৎলবে আছেন, নয় জুডি ?"

চাল্‌র্স্‌ সে কথায় কোন কাণ না দিয়া বলিল, "শুন্‌ছ হামিশ, * জুডি বল্‌ছে লণ্ডন থেকে আজ একটা খারাপ খবর এসেছে। কে জানে হয়তো মোকদ্দমায় আমাদের হারই বা হয়েছে !"

* সাহেবেরা বড় ভাই-বোনদের নাম ধরিয়াই ডাকে।



হামিশের হাসি-ঠাট্টা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল, সে বলিল, "সত্যি নাকি জুডিথ্‌ !"

"হাঁ বাছা, ঐ রকমই একটা কোন খারাপ খবর। কর্ত্রীঠাক্‌রুণ বল্‌ছিলেন, সব আশা-ভরসা নাকি এবার গেল। তোমরা দুজন বাদে আর সবাই ওই বস্‌বার ঘরেই রয়েছে, তোমরাও যাও সেখানে। দেখ বাবা হামিশ, তুমি হচ্ছ সকলের বড়, তোমাকেই আমি প্রথম কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। কর্ত্তাকে তুমিই বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা কর্‌বে।"

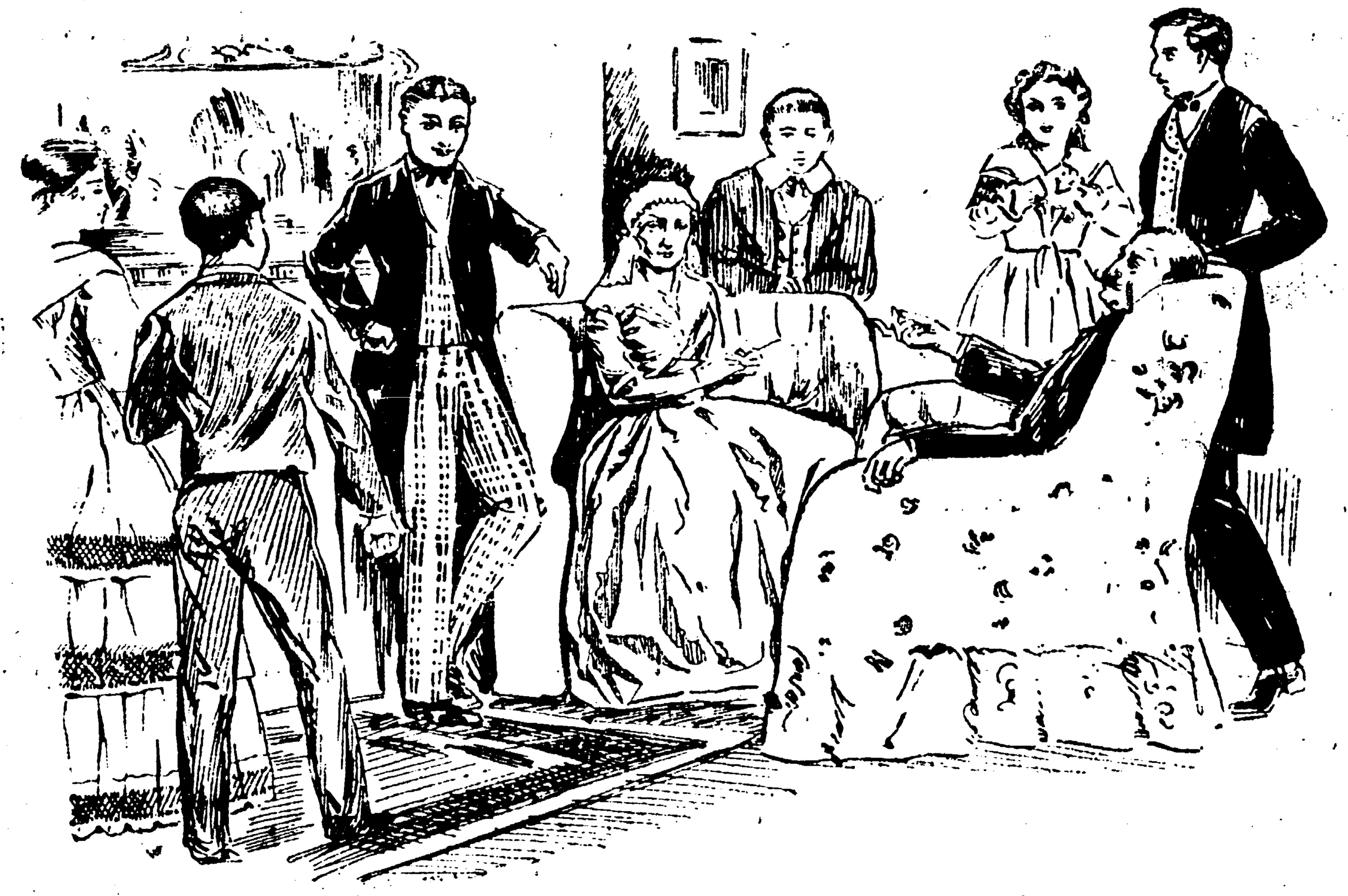

চ্যানিং পরিবার

উত্তরে হামিশ বলিল, "সে তো বটেই, কিন্তু জুডি, এই হার হওয়ায় যে আমাদের কতখানি অনর্থ হবে, তা তুমি ভাব্‌তেও পার্‌ছ না। চল চার্লি, আমরা ও ঘরেই যাই।"

ও ঘরে মিষ্টার চ্যানিং একটা সোফার উপর কাৎ হইয়া শুইয়া ছিলেন, অনেক দিন যাবৎ অসুখে ভুগিয়া ভুগিয়া আজ তাঁর এই অবস্থা। চেহারাটী তাঁর সৌম্য এবং চিন্তাশীলের মত, এককালে তিনি খুবই সুপুরুষ ছিলেন। তাঁর চার

ছেলে, দু' মেয়ে। দ্বিতীয় পুত্রের নাম আর্থার, সে বাপের মতই সুন্দর, বয়স উনিশ বছর। আর্থারের ছোটটীই হইতেছে আমাদের টম্—তার কিন্তু মেজাজখানা তত সুবিধার নয়। মেয়ে দুইটী ও তাদের মা মিসেস্ চ্যানিংও সেই ঘরেই উপস্থিত ছিলেন। বড় মেয়েটীর নাম কন্‌স্‌ট্যান্স্, বয়স বছর একুশ, মুখ খানা তার বড়ই লাবণ্যময়। ছোট মেয়েটী সবে এই চোদ্দ বছরের, দুষ্টামীতে সে খুব পাকা। তার নাম এনাবেল।

ঘরে ঢুকিয়াই হামিশ তার সেই দুষ্টামী-মাখা হাসি হাসিয়া বলিল, "আজ ব্যাপার খানা কি হয়েছে শুনি! জুডিথ্ বল্‌ছিল, কি একটা ভয়ানক নাকি ভীষণ ঘটে গেছে?"

তার মা বলিলেন, "হাস্‌ছ হামিশ, কিন্তু যা ঘটেছে তা বল্‌তে আমার মুখে কথা সর্‌ছে না।"

হামিশ বলিল, "না, পৃথিবীতে কোন জিনিষই আমাদের ভয়ানক কি কাবু করে ফেল্‌তে পারে না, যতক্ষণ আমাদের স্বাস্থ্য অটুট্ আছে, আর এম্‌নি ভাবে সকলে মিলে সেটাকে নিয়ে আলোচনা করতে পার্‌ছি। কি এমন ব্যাপারটা, মোকদ্দমায় আমাদের হার হয়েছে—এই তো?"

"শুধু হার হলেও তো কথা ছিল বাবা, কিন্তু এতে আর কোন আপীলই চল্‌বে না।"

মিষ্টার চ্যানিং এতক্ষণে কথা কহিলেন, বলিলেন, "হামিশ ঠিকই বলেছে। চিঠিখানা প্রথম যখন এল, তখন দুশ্চিন্তায় আমি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলাম, কিন্তু এখন আস্তে আস্তে দেখছি, এতে ভয়ানক কিছু হবে না। একটা লাভ হল এই যে, মস্ত বড় একটা ভাবনার বোঝা থেকে আজ মুক্তি পেলাম। অসুখে পঙ্গু হ'য়ে পড়ে আছি, কাজ-কর্ম্মে ভুলে থাকার উপায় নেই, দিন-রাত শুধু এই মামলার দুশ্চিন্তা আমায় পাগল করে ফেলার গতিক করেছিল। অন্ততঃ সেটার তো শান্তি হল!" (ক্রমশঃ)

---

## তিন বীর

(শ্রীজ্যোৎস্না দেবী, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী)

তিনটি ছেলে ইস্কুলে যায় এক ছাতিতে তিন্ জনা,
ঝম্ ঝমাঝম্ বৃষ্টি পড়ে, মন্দ না এ মন্দ না!
তীরের মত বৃষ্টি পড়ে 'রেইনি ডে'ত' হবেই আজ
মেঘের আড়াল হতেই শুধু তীর ছোঁড়ে কোন্ তীরন্দাজ?
জলের উপর পা ফেলে যায় ছপ্ ছপাছপ্ তিন শিশু
পিনু মনু দুই ধারে আর ডাঁটটি ধরে যায় বিশু।
খিল্ খিলিয়ে হাস্‌ছে তারা ছাতার আগে চোখ ঢাকা,
পায়ের আগে একটুকু পথ আড়াল থেকে যায় দেখা।
দেখ্‌লে হঠাৎ ষণ্ড মশায় শিং বাঁকিয়ে, বাপ্‌রে বাপ!
ছাতা ফেলে তিন বীরেতে তিন দিকে দেয় লম্বা লাফ।
পিনু পড়্‌ল পগার জলে, মনু বাড়ায় লম্বা ঠ্যাং
ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌ল বিশু পথের মাঝেই চিৎপটাং।

---

## রঙ্গ-কণা

(শ্রীরামেন্দু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় টিকাটুলি, ঢাকা)

বন্ধু। তোমার সাহস ত কম নয়, ভেবে দেখ দেখি তোমার বাপ ঠাকুর্দ্দারা কি সমুদ্রে মারা যান নি? তুমি আবার সেই সমুদ্রেই নাবিক হয়েছ!

নাবিক। আচ্ছা, তোমার পূর্ব্ব পুরুষেরা কোথায় মারা গেছেন?

বন্ধু। আরে, তারা কি তোমাদের মত হে? তাঁরা সব ঘরে বিছানায় মারা গেছেন।
নাবিক। আরে সর্ব্বনাশ, তবে তুমি আর বিছানায় শুয়ো না; তোমার কি একটুও ভয় নেই?

---

## রেণুকা

( শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ধূলগ্রাম, যশোহর )

সে ছিল গোলাপ ফুলের মত ফুট্‌ফুটে একটী মেয়ে। ছেলেবেলায় স্বভাবটী ছিল তার বড় সুন্দর। ক্রমে যখন সে বড় হ'ল তখন কিছু অহঙ্কারী হ'য়ে পড়ল। অন্যান্য মেয়েদের মত সেও হেসে খেলে ফুল পেড়ে, মালা গেঁথে বেড়িয়ে বেড়াত। তার বাবারও অনেক টাকা-কড়ি ছিল। তার বাড়ীর একটু দূরেই বাস করত একটী ছেলে, নাম অমল। ছেলেটীও অন্যান্য ছেলেদের মত লেখা পড়া করত, খেলা ক'রত। বেশীর ভাগে সে একটু কাব্য চর্চ্চা করত। রেণুকা এই ছেলেটীকে তত ভাল ভাবে দেখত না। কারণ বোধ হয় অন্যান্য ছেলের মত এই ছেলেটী তার কাছে বেশী যেত না; তাকে ফুল পেড়ে দিত না—তার সঙ্গে গল্পও করত না। অন্যান্য মেয়েরা যদি তার কাছে অমলের প্রশংসা করত তবে সে গম্ভীর হ'য়ে বসে থাক্‌ত।

সেবার যখন "ভোরের আলো" পত্রিকায় অমলের কয়েকটা সুন্দর সুন্দর কবিতা ও তার উচ্চ প্রশংসা বেরুল তখন গাঁয়ের সবাই তাকে বাহবা দিল। হেড্‌ মাষ্টার মশাই তাকে একটা মেডেল্‌ পুরস্কার দিলেন।

সেদিন ছিল রেণুকার জন্মদিন। রেণুকা বড় লোকের মেয়ে, কাজেই তার জন্মদিনের উৎসব হ'ত। উৎসবে অনেক লোক নিমন্ত্রিত হ'ত, এবং তারা অনেকেই রেণুকাকে কিছু উপহার দিত। অন্যান্য ছেলের মত অমলেরও সেদিন নিমন্ত্রণ হ'য়েছিল। উৎসবের সময় সকলেই রেণুকাকে এক একটা জিনিষ উপহার দিল। কেউ গয়না, কেউ বই, কেউ রুমাল, যার যা খুসি সে তাই দিতে লাগ্‌ল। কিন্তু অমলের দেখা নেই। এতক্ষণ অমলকে অনুপস্থিত দেখে রেণুকা ভেবেছিল নিশ্চয়ই সে একটা চমৎকার জিনিষ উপহার নিয়ে আসবে। সে এ ঘর ওঘর করতে লাগল। অবশ্য অমলের দেওয়া উপহারের উপর তার বেশী লোভ ছিল না, কারণ উপহারে তার সারা গা বোঝাই হয়ে গিয়েছে। সে তার পড়ার ঘরে গিয়ে একখানা মাসিক পত্রিকা খুলে বস্‌ল। পত্রিকা খানা "ভোরের আলো।" প্রথমেই অমলের তৈরী একটা কবিতা, সে কয়েক লাইন পড়বার চেষ্টা করল :—



"আমি যখন বড় হব, হব মস্ত বীর
হিমালয়ের পাষাণ-মত শান্ত ও গম্ভীর;
শত্রুরা মোর বুকের মাঝ কঠিন হয়ে হানবে বাজ
তবুও আমি টল্‌ব নাগো এমনি সুস্থির।
আমি যখন বড় হব, হব মস্ত বীর।"

ইঃ আশা ত কম নয়! সে বার বার দরজার দিকে তাকাতে লাগল। ভাবলে অমল বুঝি ইচ্ছা করেই এত দেরী কর্চ্ছে। তার মনটা তিক্ত হ'য়ে উঠল। ভাব্‌লে অমল এলেই এর প্রতিশোধ দেবে। এমন সময় অমল এসে সে ঘরে ঢুকল। রেণুকা একবার তার দিকে চেয়েই গম্ভীর হ'য়ে বসল। অমল তার পকেট থেকে একটা ফুলের তোড়া বের করে বল্ল, "রেণু, তোমার জন্ম দিনের উৎসবে এই সামান্য উপহারটী গ্রহণ করে তোমার অমল দাকে সুখী কর।" বলে সে তোড়াটী রেণুকার হাতে দিল। রেণুকা ফুলগুলি মাটিতে ফেলে পা দিয়ে সেগুলো ছিন্ন ভিন্ন করে ফেল্‌ল। তার দেওয়া উপহারের এই অপমান দেখে অমল ক্ষুব্ধ স্বরে বল্ল, "এই নির্জ্জীব ফুলগুলো তোমার কাছে কি অপরাধ করেছে রেণু?" রেণুকা তেম্‌নি ভাবে বল্‌ল, "সে কৈফিয়ৎ আমি তোমার কাছে দিতে রাজী নই। এখন তুমি এখান থেকে চলে গেলেই আমি সুখী হব।" "আচ্ছা, তবে যাই" বলে অমল ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে গেল।

রেণুকা চুপ করে বসে রইল। তার কানে কেবলই ধ্বনিত হতে লাগল "তবে যাই।" একবার ইচ্ছা হল ছুটে গিয়ে অমলকে ফিরিয়ে আনে কিন্তু সে তখন বহুদূর চলে গিয়েছে।

দু' দিন পরে রাগের মাত্রাটা একটু কম পড়লে রেণুকা খোঁজ নিয়ে জানল অমল এ দু' দিন বাড়ীতে আসে নি। ক্রমে কয়েক বছর চলে গেল, অমল আর এল না। তার বাড়ীর লোকেরা কেঁদে কেঁদে হতাশ হল। ক্রমে রেণুকার বিয়ে হয়ে গেল এক জমিদার-পুত্রের সঙ্গে। কিছু দিন পরে তার গোলাপ ফুলের মত একটী ছেলে হল—নাম হল—পিন্টু। রেণুকা সুখী হতে চেষ্টা করল। কিন্তু মাঝে মাঝে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস এসে তাকে বিচলিত করত। সে নিজের মনকে বোঝাত অমলের জন্য সে দায়ী নয়। তার কোন দোষও নেই।

* * * *

২২শে আগষ্ট সোমবার "গোল্ডেন ষ্টার" নামে জাহাজ খানি কাউকে গ্রাহ্য না করে

নিজের বেগেই রেঙ্গুন অভিমুখে ছুটে যাচ্ছিল। তার ডেকের উপর দাঁড়িয়ে রেণুকা অনন্ত সাগরের পানে চেয়ে কি ভাবছিল। তার স্বামী সুবোধ বাবু পত্নী ও পুত্রকে নিয়ে রেঙ্গুনে বেড়াতে যাচ্ছেন। পিণ্টু বড় দুরন্ত। হঠাৎ ঝপ করে একটা শব্দ হ'ল। রেণুকা চম্‌কে দেখল পিণ্টু সাগরের অসীম জলে পড়ে একবার ভাস্‌ছে একবার ডুবছে। সে ভয়ে চীৎকার করে উঠল। তার চীৎকারে সবাই চম্‌কে উঠ্‌ল। রেণুকা আঙ্গুল দিয়ে পিণ্টুকে দেখিয়ে দিল, সবাই নির্ব্বাক হ'য়ে রইল। শুধু একটী যুবক তথনই জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। রেণুকা নির্ব্বাক হ'য়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল যুবকের বলিষ্ঠ বাহু তার পিণ্টুকে উঁচু করে শুধু পা আর একখানা হাত দিয়ে সাঁতার কেটে জাহাজের দিকে আস্‌ছে। জাহাজ তথনই থেমে গিয়েছিল। রেণুকা দেখ্‌ল একি! যুবকের মুখ খানা ঠিক অমলের মত নয়? তাইত! রেণুকা হঠাৎ শুন্‌তে পেলে একটা লোক চীৎকার করে উঠ্‌ল "হাঙ্গর! হাঙ্গর!" রেণুকা দেখ্‌ল একটা ভয়ঙ্কর হাঙ্গর অমলের পিছু পিছু ছুটে আসছে। একটু পরেই সে দেখ্‌ল হাঙ্গরটা ডুব দিয়েছে। সর্ব্বনাশ! যদি ধরে! জাহাজ থেকে একখানা বোট নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, অমল তাড়াতাড়ি সাঁতার কেটে পিণ্টুকে বোটের উপর রাথল। তারপর নিজেও উঠ্‌তে গিয়ে হঠাৎ চীৎকার করে অবশ হ'য়ে সেখানেই ঢলে পড়্‌ল। ৪।৫ জন লোক ধরাধরি করে মূর্চ্ছিত অমলকে জাহাজে উঠাল। রেণুকা দেখ্‌ল উরু থেকে অমলের একটা পা নেই, রক্তের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। সে আর দেখ্‌তে পারল না নিজের কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

খানিক পরে সে বেরিয়ে এসে দেখল দুটো লোক কি বলাবলি কচ্ছে। একজন বল্লে, "তা লোকটাকে কিন্তু মহৎ বলতে হবে—নিজের প্রাণ দিয়ে পরের ছেলেকে বাঁচালে!"

আর একজন বল্লে, "মরবার আগে ও কি বল্‌ছিল জান? 'রেণুকা, রেণুকা, বোন আমার, কোথায় তুমি?"

রেণুকা ততক্ষণে ডেকের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে।

---

## পৃথিবীর আকার

( শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী, কানুনগোর পাড়া, চট্টগ্রাম )

মধুদের স্কুলে কেশব বাবু পরীক্ষা করতে গিয়েছেন। তিনি ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন,—"পৃথিবীর আকার কিরকম?" ছাত্রেরা তা' জান্‌ত না। মাষ্টার মহাশয় তাদের দু'হাত গোল করে দেখিয়ে দিলেন। ছাত্রেরা সমস্বরে বলল,—"লুচি, লুচি, লুচি।"

---

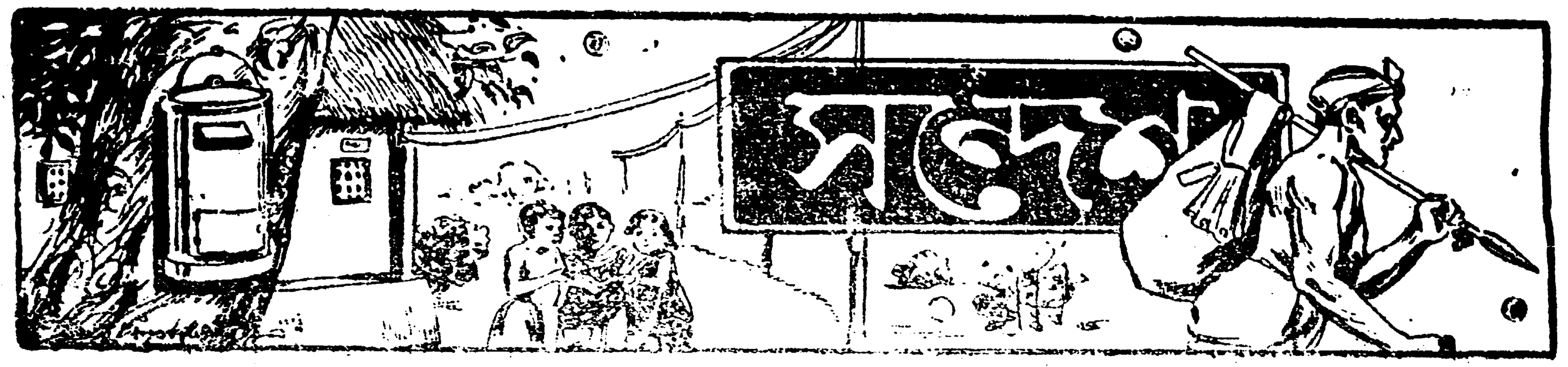


## ছেলেদের গির্জ্জা

ওয়েল্‌ড্রষ্টোন্ নামে একটা জায়গায় শুধু ছেলেমেয়েদের জন্য একটা আলাদা গির্জ্জা আছে। সেখানকার সমস্ত ভার ছেলেদের হাতে, পাদ্রী হইতে আরম্ভ করিয়া অর্গান-বাদকটি পর্য্যন্ত সেখানে শিশু। তাদের এক এক জনের বয়স দশ, বারো, চৌদ্দ এই রকম।

## মেয়েদের বিলাসিতা

এবারকার রামধনুতে তোমরা "অলঙ্কারের কথা" প্রবন্ধটিতে সাজ পোষাক সম্বন্ধে অনেক কথা পড়িয়াছ। বিলাতের মেয়েরা সাজ পোষাকের জন্য কি সাংঘাতিক খরচ করে শুনিবে? গেল বছর শুধু গ্রেটব্রিটেনের মেয়েরা মিলিয়া মুখের রং পাউডার, ক্রিম, চুলের লোসান এই সব বাবদ ষাট কোটী টাকার উপর খরচ করিয়াছে।

## পিঁপড়ার আয়ু

বৈজ্ঞানিকেরা অনেক ছোট খাট জিনিষ লইয়া দস্তুর মত মাথা ঘামান। তাই একটি পিঁপড়া কতদিন বাঁচিতে পারে এ খবরও আজ আর তাঁদের কাছে অজানা নয়। লর্ড আভারি একবার একটি পিঁপড়াকে বিশেষ যত্নের সাথে পুষিয়া ৬ বছর বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। আজকালকার প্রাণীতত্ত্ববিৎরা বলেন পিঁপড়া সাত বছর পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে।

## আকাশে হাঁসপাতাল

হাসিও না, আজ কালকার দিনে সবই সম্ভব। বিলাতের বড় বড় ডাক্তারেরা বলিতেছেন—মাটী হইতে অনেক উঁচুতে উঠিতে পারিলে বাতাসটাও যেমন বিশুদ্ধ পাওয়া যাইবে, সূর্য্যের আলোও তেমনি প্রচুর জুটিবে। স্বাস্থ্যের জন্য এ দু'টিই আসল জিনিষ। তাই তাঁরা উড়ো জাহাজে হাঁসপাতাল বসাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কয়েকটি রোগী নাকি আকাশ-হাঁসপাতালে গিয়া বেশ উপকারও পাইতেছে।

## ভাসমান থিয়েটার

ডাক্তারেরা যেমন আকাশে হাঁসপাতাল গড়িতেছেন, একদল ব্যাবসাদার তেমনি জলের উপরেও 'নতুন কিছু' আরম্ভ করিয়াছেন! সম্প্রতি জার্ম্মেণীতে একটা গোটা জাহাজ জুড়িয়া প্রকাণ্ড এক থিয়েটার হল খোলা হইয়াছে। তার মধ্যে শ' পাঁচেক লোকের বসিবার জায়গা আছে। শীঘ্রই এই থিয়েটারওয়ালারা তাদের জল-থিয়েটার লইয়া পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইবে।

## মিস্ ইণ্ডিয়ান্ রবার

বার্ম্মিংহাম সহরে একটি ১৫ বছরের মেয়ে আছে তার নাম দেওয়া হইয়াছে ইণ্ডিয়ান্ রবার। সে নাকি তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ইচ্ছা করিলে রবারের মত বাড়াইতে পারে। সে সাধারণতঃ ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু উপরের কোন জিনিষ ধরিয়া ঝুলিলে সে লম্বায় হইয়া যায় ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি। সে তার হাত দু'খানা ইচ্ছা করিলে ৩ ইঞ্চি বাড়াইতে পারে—পা পারে আরও বেশী, প্রায় ৪ ইঞ্চি।

## বিরাট দূরবীণ

সম্প্রতি আমেরিকায় একটা বিরাট দূরবীণ তৈরী করিবার মতলব চলিতেছে। দূরবীণটি কত বড় হইবে জান? তার লেন্স খানার ব্যাসই হইবে ৩৩ ফিটের উপর। এতদিন ধরিয়া দূরবীণে যতগুলি তারা দেখা যাইত এই দূরবীণ তৈরী হইলে তার চেয়ে কয়েক লক্ষ বেশী তারা দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। এখন পৃথিবীর সব চেয়ে বড় দূরবীণ আছে ক্যালিফোর্ণিয়ার মাউণ্ট্ উইল্‌সন্ মানমন্দিরে। নতুন দূরবীণটা তারও চার গুণ বড় হইবে।

## নিউ ইয়র্কের টেলিফোন

আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহরে ১৭ লক্ষ, ৫০ হাজার, টেলিফোন আছে। প্রত্যেক সেকেণ্ডে সেখানে গড়ে এক শ'টি করিয়া কল্ আসে।

---

# গত মাসের ধাঁধার উত্তর

প্রথম ছেলের ভাগে ১নং, ৮নং, ৯নং ও ১৬নং,
দ্বিতীয় ছেলের ভাগে ২নং, ৫নং, ১২নং ও ১৫নং,
তৃতীয় ছেলের ভাগে ৩নং, ৭নং, ১০নং ও ১৪নং এবং
চতুর্থ ছেলের ভাগে ৪নং, ৬নং, ১১নং ও ১৬নং গরু পড়িয়াছিল। ইহা ছাড়া আরও কয়েক রকম ভাবে গরুগুলিকে ভাগ করা যায়।

---

# উত্তর দাতাদের নাম

গুণেন্দ্রমোহন সিংহ (ভবানীপুর), মিলনমালা ঘোষ (ভবানীপুর), রমাপ্রসাদ চৌধুরী (কলিকাতা), কালু, ঝুণ্টু, সুরমা (পাবনা), নির্ম্মলেন্দু সর্ব্বাধিকারী (ভবানীপুর), মীরা ও স্বদেশ (ফরিদপুর), দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (চন্দন নগর), কৃষ্ণ, কুঞ্জ, কমল, লাবণ্য (এণ্টালি, কলিকাতা), বিদ্যুৎরাণী, অন্নপূর্ণা, উমারাণী (ছাপরা), আমেনা খাতুন, প্রিয়বালা, অনঙ্গ, কুরজা (যোশর), গোকুলানন্দ দাস (রংপুর), নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অনাদি (ধুলগ্রাম), রতনমণি ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর), চিনু, লালু ও রেটু (ইটালি, কলিকাতা), শোভা, নিভা, অমিয়া, গিরীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী (রংপুর), অমিয়কুমার সেন (কুমিল্লা), অরুণকুমার বসু (বেগুসরাই), অরুণকুমার ঘোষ (আসানসোল), প্রভাত, ডম, নানু, মণা, নিশি চক্রবর্ত্তী (বেনারস সিটি), রবীন্দ্র, ছেনু, রেণু (হাতোয়া) শম্ভুদাস মুখোপাধ্যায় (মধুপুর), সন্তোষ ও যদুপতি (কলাগাছিয়া), উষাময়ী ঘোষাল ও সন্তোষকুমার ঘোষাল (গাজিপুর), সুরমারাণী রায় (ওয়ালটেয়ার), মনীষা সেন (গৌহাটি), পুরুষোত্তমপুর যুবসঙ্ঘ ও সাধারণ পাঠাগারের কর্ম্মিবৃন্দ, আমিনদ্দিন আকন (বেজগাঁও), রেণুকাময়ী সিংহ (বিহার শরীফ), নারায়ণদাস নন্দী (নবদ্বীপ), অজিতকুমার রায় (ফৈজাবাদ), রামেন্দুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাকা), সনৎ, কৃষ্ণ, নিতাই, প্রভাত (কালিম্পং), অপর্ণা, স্বদেশ, টুকু, ফুল (ভোলা), তোফাতল হোসেন, বজলুল হক, কিরণ, গুরুদাস, সতীশ (কামারজানী), বাণীকান্ত ভট্টাচার্য্য (গড়পার, কলিকাতা), গিদারী ফরওয়ার্ড লাইব্রেরীর সভ্যগণ, অমরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী (সানগোর), যোগেন্দ্র, বরি, সুধীর (রঘুনাথপুর), তরুণ সুহৃৎ সঙ্ঘের সভ্যগণ (পেগু), সীতানাথ রায় (আলোক জোয়ারী), অমরেশচন্দ্র বসু (সালকিয়া,হাওড়া), কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় (লাহোর), নীলিমা, প্রতিমা ও জ্যোতির্ম্ময় লাহিড়ী (গৌহাটী), বিনোদ বিহারী চক্রবর্ত্তী (কানুনগোরপাড়া), শিবপদ সেনগুপ্ত (বাইশরশি), দ্বিজেন, সুরেন, গণেশ (আড়াই হাজার), ডলি রায় ও ডুলু রায় (কাঞ্চনতলা, মুর্শিদাবাদ), হরিদাস, সৌদামিনী ও শ্রীবাস (কামালপুর), বেঙ্গলী স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণ (মাণ্ডালে, বর্ম্মা), এন্ সি বণিক, এন্ এন্ বসু,

এইচ্ এন্ সাহা, আর সি সাহা ( কামালপুর ), ব্যোমকেশ সিংহ, যাদব, রাঘব, হৃষীকেশ ( মহেশপুর ), মোহম্মদ হোসেন ( মুন্সীগঞ্জ ), পরমেশ, প্রীতীশ ও অরুণা সরকার ( কালিম্পং ), সদানন্দ সাহা ( মেদিনীপুর ), সতীশচন্দ্র সাহা, ফিজির রহমন মিঞা ( কুতুবপুর ), লক্ষ্মীময়ী দেবী ( সাওগাঁ ), দ্বিজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ( বহরমপুর ), অমিয়া, ইন্দিরা, অশোক ও অজিত মিত্র ( পাবনা ), কালিদাস পাঠমন্দির ও অনুশীলন সঙ্ঘের ভ্রাতৃবৃন্দ ( কণেশ্বর ), ভবতারণ ভট্টাচার্য্য (সিলাম, সিলেট ), গোপালচন্দ্র মুখার্জ্জী ( কলিকাতা ), ভ্রাতৃসঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ ( চাপাই নবাবগঞ্জ ), বিনয়কৃষ্ণ দাশগুপ্ত ( মাগুরা ), অমূল্য, অজিত, নন্দ, নিতাই, ভূপেন, হীরেন ( মধ্য বাংলা সারস্বত আশ্রম, জয়দেবপুর ), গ্রাহিকা নং ৪২৫, সরিষা স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর বালকবৃন্দ ( সরিষা ), ব্রজনাথ বক্সী ( পূর্ব্বধলা ), উমাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ( কলিকাতা ), বীণাপাণি লাইব্রেরীর সভ্যবৃন্দ ( আচমিতা, ময়মনসিংহ ), শৈলেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ( জলপাইগুড়ী ), বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ( বেনারস সিটি ), দি ইয়ং ভৌমিকস্ য়্যাণ্ড্ কাকীমা (ভবানীপুর), বাণীপদ এন্দ ( রাঢ়িশাল, শ্রীহট্ট ), শিবপুর পাব্লিক লাইব্রেরীর সভ্যগণ ( শিবপুর )।

---

# নূতন ধাঁধা

সুরেশদের ক্লাসে এবার য়্যানুয়াল পরীক্ষায় ভূগোলের প্রশ্নটা ভারী অদ্ভুত রকম হয়েছিল। প্রশ্ন পেয়ে ত' ছেলেদের চক্ষু চড়কগাছ। সুরেশও প্রথমটা ভয়ানক ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে চালাক ছেলে একটু বাদেই ব্যাপারটা বুঝে নিল, আর সবগুলো উত্তরই ঠিক ঠিক লিখে ফেলল। আমরা প্রশ্নের খানিকটা অংশ 'রামধনু'তে তুলে দিলাম। তোমরা একবার চেষ্টা করে' দেখ' ত।

( ১ ) কোন্ সহরকে আমরা পুড়িয়ে খাই ?

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত।

( ২ ) কোন দেশটা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের থাকবার জায়গা ?

( ৩ ) কোন্ জায়গায় গরু বাঁধা ?

( ৪ ) কোন্ সহর আমাদের একজন নিকট আত্মীয় ?

( ৫ ) কোন্ দেশটায় ভয়ানক ঝাল ?

( ৬ ) কোন্ সহরে সুধার সরোবর ?

( ৭ ) কোন্ সহরকে আমরা ভাতের সাথে মেখে খাই ?

( ৮ ) কোন্ সহরের মাথা কাটা ?

---

চিত্রে বিদ্যাসাগর-জীবনী—১০

আচ্ছা জব্দ !

শিল্পী—শ্রী[illegible] গুপ্ত । চিত্র-পরিচয় দেখ ।

২য় বর্ষ } পৌষ, ১৩৩৬ { ১২শ সংখ্যা

## চামেলি

( শ্রীবিমলচন্দ্র দত্ত )

এই পাড়াতে একটি মেয়ে ডাগর ডাগর চোখ্ দুটি,
ফুলের মত কচি মুখে উঠ্‌ছে আলোক ফুটি।
কুন্দ কুচি দন্তরুচি, রেশ্‌মী-কালো চিকুরদাম,
চঞ্চলিত চাঁদের সুধা—চামেলি যে তাহার নাম।
লজ্জাতে সে মুগ্ধ হেসে দুলিয়ে কেশে দেয় গো ছুট,
তড়িল্লতা হার-মানানো রূপের শিখা,—কইনি ঝুট্ !
গানের সুরের ঢেউ উঠে তার প্রতি কথার সঙ্গেতে,
উর্ম্মিউতল কল্লোলিনী ধায় যেন নট-রঙ্গেতে।

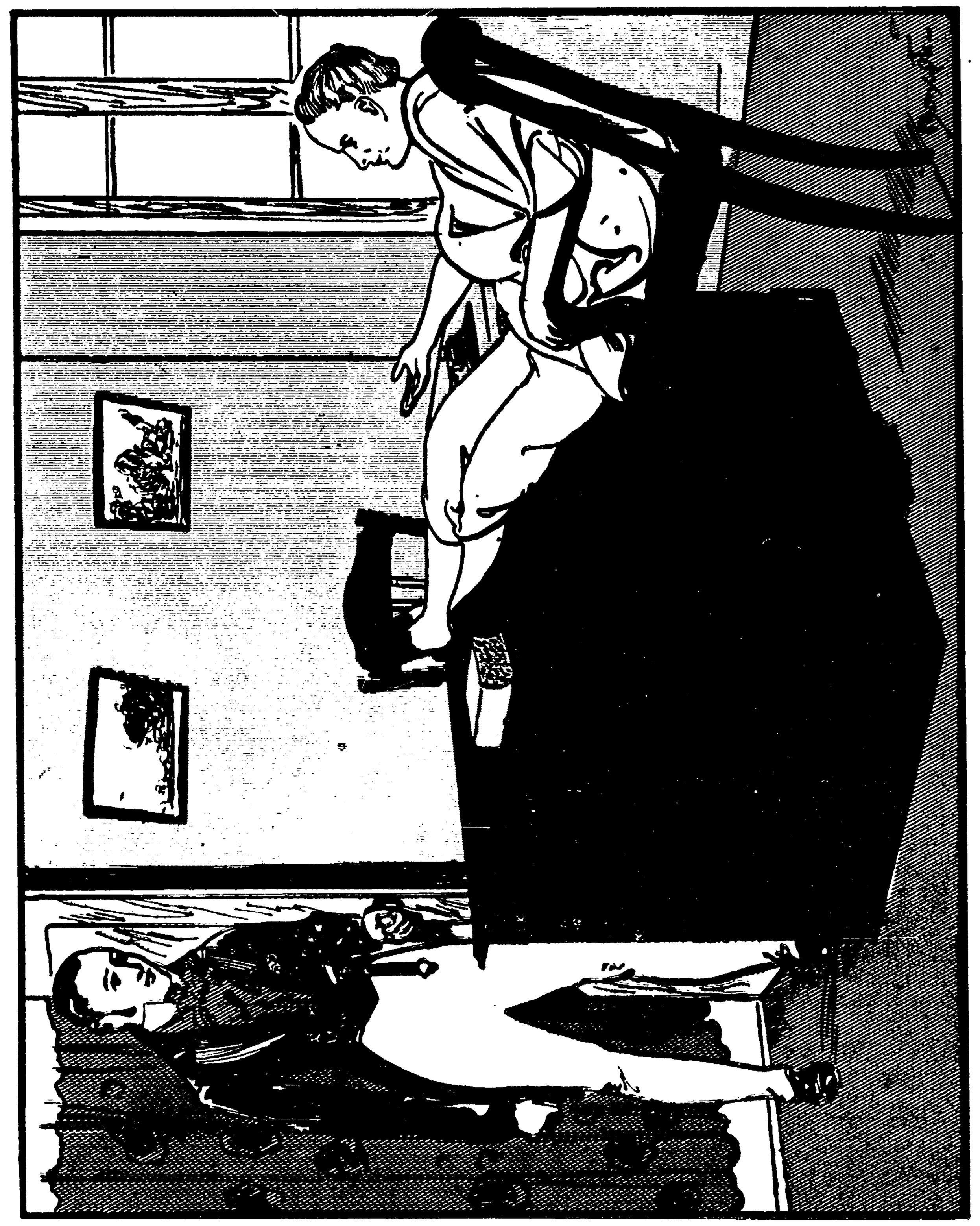

চিত্রে বিদ্যাসাগর-জীবনী—১০

আচ্ছা ডক।

| চিত্র-পরিচয় দেখ |

২য় বর্ষ } পৌষ, ১৩৩৬ { ১২শ সংখ্যা

## চামেলি

( শ্রীবিমলচন্দ্র দত্ত )

এই পাড়াতে একটি মেয়ে ডাগর ডাগর চোখ্ দুটি,
ফুলের মত কচি মুখে উঠ্‌তেছে আলোক ফুটি।
কুন্দ কুচি দন্তরুচি, রেশ্‌মী-কালো চিকুরদাম,
চঞ্চলিত চাঁদের সুধা—চামেলি যে তাহার নাম।
লজ্জাতে সে মুগ্ধ হেসে দুলিয়ে কেশে দেয় গো ছুট্,
তড়িল্লতা হার-মানানো রূপের শিখা,—কইনি ঝুট্!
গানের সুরের ঢেউ উঠে তার প্রতি কথার সঙ্গেতে,
উর্ম্মিউতল কল্লোলিনী ধায় যেন নট-রঙ্গেতে।

কালো কোকিল লজ্জাতে কি ভুরুতে তা'র ঘুমিয়ে ঝুম্ ?
আবেশ ভরা ওষ্ঠাধরে ছড়ালো রে কে কুঙ্কুম ?
পদ্ম বুঝি পাপড়ি মেলে' ছড়িয়ে দিলে রূপ-বিভা,
দু'টি পায়ের কোমল শোভা মন-ভোলানো চাই কিবা ?
শুধুই নহে অঙ্গ-বিভা, মনের রূপে প্রাণ বিভোর,
সাদা প্রাণের সরল কথায় সকল দিকে সে সুন্দর।
ঝগড়া-ঝাঁটি, কান্নাকাটি, মারামারি নাই গো নাই,
তাইত' তা'রে ভালই লাগে—জড়িয়ে বুকে রাখ্‌তে চাই।

---

# দানবীর নোবেল

( শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্-সি )

কবি রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ্ পাইবার পর নোবেল প্রাইজের নাম শুনে নাই এমন ছেলে বোধ হয় বাংলা দেশে খুব কমই আছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি কয়েকটা বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে যাঁরা সেরা লোক তাঁরাই কেবল এই পুরস্কারটি পাইয়া থাকেন। এই পুরস্কার পাওয়ার মত সম্মান পৃথিবীতে খুব কমই আছে। টাকার দিক্ দিয়াও এগুলি নেহাৎ কম নয়। এক একটি পুরস্কারের মুল্য প্রায় সোয়া লক্ষ টাকা।

যে লোকটি এই পুরস্কার দিয়া গিয়াছেন তাঁহার নাম আলফ্রেড নোবেল। পৃথিবীতে এত বড় দানের তুলনা খুব কমই আছে; কিন্তু তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে যে এই লোকটিই ইহার চেয়েও ঢের ঢের বড় জিনিষ পৃথিবীকে দিয়া গিয়াছেন—যা দিয়া সভ্য মানুষ পৃথিবীর চেহারাটা অনেক খানি বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছে। আজ তারই কথা কিছু বলিব।

নোবেল ছিলেন সুইডেন দেশের এক বৈজ্ঞানিক। সারা জীবনটা তাঁর কাটিয়াছিল বোমা আর বারুদের মধ্যে। নোবেলের বাবা ছিলেন এক যুদ্ধ-



কারখানার কারিগর। ছেলেবেলা হইতেই নোবেল দিনের অনেকখানি সময় বাপের সাথে কারখানায় কাটাইতেন। বারুদের কারখানা—কি রকম সাংঘাতিক সাংঘাতিক জিনিষ লইয়া তাহার কারবার—বালক নোবেলের কিন্তু সে সব লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে বড় আমোদ লাগিত। বড় হইয়া তিনি গোলা বারুদের কারবার করাই ঠিক করিলেন। নোবেলের চেহারাটা ছিল ভয়ানক রোগা আর দুর্ব্বল, তার উপর যে ব্যবসায়ে তিনি নামিলেন সেটা আবার তেমনি বিপদ্-সঙ্কুল। এই কাজ করিতে গিয়া কত লোক যে মারা গিয়াছে তার ঠিক নাই; নোবেলও জানিতেন যে এ কাজে নামিলে যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁর প্রাণটি খোয়া যাইতে পারে—কিন্তু সে সব ভাবিয়া ভড়কাইবার ছেলে তিনি মোটেই ছিলেন না। এই বারুদের ব্যবসা করিতে গিয়াই তাঁহার আবিষ্কার সম্ভব হইল।

সেকালে আল্প্‌স্ পাহাড় কি ভাবে পার হইত

সে কালে বড় বড় পথঘাট, খাল, পুকুর, সুড়ঙ্গ প্রভৃতি কাটিতে হইলে নরম মাটী ছাড়া আর কোথাও তা করা সম্ভব ছিল না। পাহাড়ের উপর শক্ত পাথর কাটিয়া বড় বড় চওড়া পথ, কিংবা মাইলের পর মাইল লম্বা সুড়ঙ্গ তৈরী করিবার ক্ষমতা মানুষের ছিল না। সেকালে হানিবল যখন তাঁহার সৈন্য লইয়া রোম-বিজয়ে

রওনা হইলেন, তখন তাঁর পথের উপর বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল আল্প্‌স্‌ পর্ব্বত,—"নেহি যানে দেঙ্গে"। হানিবল সে বাধা মানিলেন না, তিনি আল্প্‌স্‌ পাহাড় ডিঙ্গাইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু এ ব্যাপারটি নেহাৎ সহজে সম্পন্ন হইল না। কি প্রাণান্তকর কষ্টটাই না তাঁহাকে সহিতে হইল। শীতে, বরফে জমিয়া, পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া, কত হাজার হাজার সৈন্য পথেই মারা পড়িল; যারা পার হইল তারাও প্রায় জীবন্মৃত অবস্থাতেই সেকাজ করিল। হানিবলের প্রায় দু' হাজার বছর পরে নেপোলিয়ন যখন আল্প্‌স্‌ পার হইলেন তখন তাঁহাকেও কতকটা ঠিক এমনি কষ্টই স্বীকার করিতে হইল। অন্য কোন সহজ উপায় তিনিও বাহির করিতে পারিলেন না।

কিন্তু আজকাল আর সেদিন নাই। পাহাড় আর এখন মানুষের পথ আট্‌কাইয়া দাঁড়াইতে পারে না। গায়ের জোরে নয়, কিন্তু বুদ্ধির জোরে মানুষ পাহাড়-পর্ব্বত গুঁড়া করিয়া দিয়া নিজের পথ তৈরী করিয়া নিতে জানে। নেপোলিয়ন্‌ আল্প্‌স্‌ পার হইবার পর এক 'শ' বছর যাইতে না যাইতে মানুষ সেই আল্প্‌স্‌ পাহাড়কেই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহার ভিতর দিয়া সুড়ঙ্গ কাটিয়া রেল পথ বসাইয়া ফেলিল। যে আল্প্‌স্‌ পাহাড় পার হইতে গিয়া অত বড় বড় বীরকে অমন সাংঘাতিক নাকানি-চুবুনি খাইতে হইয়াছিল, কত অজস্র লোকক্ষয় হইয়াছিল, লোকে আজ সেই পাহাড়টাই নিত্যি পার হইতেছে; কেমন করিয়া জান?—ট্রেণের কামরার ভিতর পাখার নীচে শুইয়া ঘুমাইয়া, কিংবা খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে। টেরও পাইতেছে না, কি সাংঘাতিক কাজটা সে হাঁসিল করিয়া যাইতেছে। এই এত বড় অসম্ভব ব্যাপারটা যে সম্ভব হইয়াছে তাহা শুধু নোবেলেরই আবিষ্কারের ফলে। এইবার সেই কথাই বলি।

পাহাড়-অঞ্চলে রাস্তাঘাট সমান করিবার জন্য অনেক সময় বাধ্য হইয়া পাহাড় ভাঙ্গা দরকার হইয়া পড়ে; কিন্তু শুধু গাঁতি আর কোদাল দিয়া সে কাজ করিতে যাওয়া পাগ্‌লামি ছাড়া আর কিছুই নয়। লোকে তাই কাজ সারিত বারুদ দিয়া। ছোটখাট ব্যাপার তাহাতেই কোন রকমে চলিয়া যাইত, কিন্তু বড় কাজের



বেলা,—বড় বড় গাড়ী চালাইবার মত রাস্তা, কিংবা পাহাড় এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া সুড়ঙ্গ তৈরী করিবার সাধ্য শুধু বারুদের ছিল না। বারুদের চাইতে শক্তিশালী বিস্ফোরকের কথা যা দু' একটা লোকে জানিত, সেগুলি আবার এতই বিপজ্জনক যে তাহা দিয়া কাজ করিবার সাহস কোন মহাপ্রভুরই ছিল না। নোবেল ঠিক করিলেন এদিকেই যখন তিনি নামিয়াছেন তখন এই অভাবটা দূর করিয়া যাইবেন। তারপর আরম্ভ হইল তাঁহার পরীক্ষা—যত রকম সাংঘাতিক সাংঘাতিক বিস্ফোরক আছে, কোনটাই তিনি ঘাঁটিতে বাদ রাখিলেন না। শেষটায় তিনি নাইট্রো-গ্লিসিরিন্‌ বলিয়া এক রকম বিস্ফোরক বাহির করিয়া ফেলিলেন।

একালে আল্প্‌স্‌ পাহাড় কেমন ভাবে পার হয়

এই নিরীহ জিনিষটি কি রকম শুনিবে? তোমরা কেহ কেহ বোধ হয় জান যে বাতাসে অক্সিজেন বলিয়া এক রকম গ্যাস আছে। বাতাস ছাড়া আরও অনেক জিনিষের মধ্যে এই অক্সিজেন আছে, এবং কোন কোনটায় খুব বেশী পরিমাণেই আছে। নাইট্রোগ্লিসিরিনকে যদি এই রকম কোন জিনিষের সাথে হঠাৎ মিশাইয়া জ্বালাইয়া দেওয়া যায় তবে উহা ফাটিয়া যাইবে, আর ফাটিবার সঙ্গে সঙ্গে একটা

সহরকে সহর কিংবা গোটা পাহাড়কে পাহাড়ই উড়াইয়া দিয়া যাইবে। আর ফাটিতে সময়টা কি দারুণ রকম লাগে তাহাও শোন। এক সেকেণ্ডের চব্বিশ হাজার ভাগেরও ঢের ঢের কম।

নাইট্রোগ্লিসিরিন আবিষ্কারের পর যে সব কাজ আগেকার লোকে নেহাৎ অসম্ভব বলিয়া মনে করিত তাহাই সম্ভব হইয়া দাঁড়াইল; কিন্তু একটুকু গোল তখনও রহিয়া গেল। নাইট্রোগ্লিসিরিন জিনিষটা জলের মত তরল, কাজেই এদিক্ ওদিক্ নাড়াচাড়া করিবার সময় তাহাকে বোতলে পূরিয়া পাঠাইতে হয়।—আর কোন গতিকে যদি একটু আধটু পড়িয়া যায় তবেই মুস্কিল; যে জিনিষ, কখন কি বিপদ্ ঘটাইয়া বসিবে কে জানে? নোবেল তখন উপায় ঠাওরাইতে লাগিলেন, কি করিয়া জিনিষটাকে একটু কঠিন করা যায়!

পুরুষকার বলিয়া জিনিষটা যার আছে, অদৃষ্টও তাহাকে সাহায্য করে। নোবেলের বেলায়ও তাহাই হইল। এক দিন নোবেলের কারখানার এক কর্ম্মচারী নাইট্রোগ্লিসিরিনের বোতল প্যাক করিতেছিল, কাছে খানিকটা বালি ছিল; হঠাৎ অসাবধান হওয়ায় বোতল ভাঙ্গিয়া খানিকটা নাইট্রোগ্লিসিরিন বালিতে ছড়াইয়া পড়িল। বেচারা ত' ভয়েই অস্থির, এখনই না জানি কি কাণ্ডটা ঘটিবে! নোবেল ছুটিয়া আসিলেন; ভয় পাইবার লোক তিনি মোটেই নন, সেই ভিজা বালি নাড়াচাড়া করিয়া তিনি দেখিতে লাগিলেন। তারপর সেগুলি লইয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ব্যাপারটা দাঁড়াইল শাপে বর। নোবেল দেখিলেন, কি আশ্চর্য্য, ভিজা বালিটাও দেখি প্রায় নাইট্রোগ্লিসিরিনের মতই আর একটা বিস্ফোরক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি তখন ভাবিলেন, আচ্ছা, এই জিনিষটাকে পাহাড় ভাঙ্গিবার কাজে ব্যবহার করিলে ত' মন্দ হয় না! আর জিনিষটাও কঠিন, নাড়াচাড়ার পক্ষেও খুব সুবিধা হয়। তাহাই হইল। কিছুদিন পরে তিনি বালির বদলে কাইসেলগাড় নামে এক রকম সছিদ্র পাথর ব্যবহার করিয়া দেখিলেন, ফল একই দাঁড়ায়, কিন্তু সুবিধা হয় আরও বেশী। তিনি ইহার নাম দিলেন ডিনামাইট। এই প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফোরকের নাম বোধ হয় তোমরা অনেকেই জান।



নোবেল শুধু ডিনামাইট আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। রাতদিন খাটিয়া খাটিয়া নিত্যি নূতন বারুদের মশলা বাহির করিতে লাগিলেন। তারপর একদিন তিনি ব্লাষ্টিং জিলেটিন নামে আর একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফোরক আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। দুনিয়ায় ইহার চাইতে শক্তিশালী জিনিষ বোধ হয় আর নাই।

এই সব আবিষ্কারের পর মানুষ যেন আর কোন বাধাকেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনিল না, ভূগোল বেচারাকে শুদ্ধ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া নাস্তানাবুদ করিয়া তুলিল। লক্ষ লক্ষ বছর ধরিয়া যেখানে আজ পাহাড় দাঁড়াইয়া আছে, কাল সেটাকে গুঁড়াইয়া সমতল ভূমি করিয়া দিল; নদীর পার ফাটাইয়া তাহার স্রোতের গতি উল্টাইয়া দিল; যোজক ভাঙ্গিয়া প্রণালী করিল। যে কাজ শেষ হইতে আগে বছরের পর বছর কাটিয়া যাইত, এখন সেটা কয়েক মিনিটেই হইয়া গেল। মানব-সভ্যতার যে সব প্রধান অঙ্গ (ধাতু প্রভৃতি) খনির তলায় পাওয়া যায়, কোদাল ঠুকিয়া সে সব বাহির করিতে মানুষকে কি দুর্ভোগটাই না পোহাইতে হইত! এখন আর তার জন্য কোন ভাবনাই নাই—সময়, পরিশ্রম, টাকা-পয়সা—যে দিক্ দিয়াই দেখনা কেন!

গোটা পৃথিবী যুড়িয়া নোবেলের গোলা-বারুদের কারবার চলিল। দেখিতে দেখিতে বড় বড় কারখানায় তিনি দেশ ছাইয়া ফেলিলেন। কারখানা বলিলাম বটে, কিন্তু সাধারণ কারখানা হইতে এসব কারখানায় অনেকটা তফাৎ। বোমা আর বারুদ লইয়া তার কাণ্ড, কি অসম্ভব রকম সতর্কতার সাথে নোবেলকে সে সব চালাইতে হইত তাহা ভাবিলেও অবাক্ হইতে হয়। কারখানার চারিদিকে পাহাড়ের মত বড় বড় মাটীর বেড়া দেওয়া থাকিত। তাহার ত্রিসীমানায়ও কেউ আগুন ত' দূরের কথা পেরেকটি পর্য্যন্ত আনিতে পারিত না; কারখানার ভিতর নোবেল কাহাকেও জুতার শব্দটুকু পর্য্যন্ত করিতে দিতেন না। এত করার পরেও কিন্তু একবার এক আনাড়ি কর্ম্মচারীর দোষে একটা আস্ত কারখানা উড়িয়া গিয়াছিল। নোবেল কিন্তু তাহাতে একটুও দমেন নাই।

নোবেলের আবিষ্কার কিন্তু খানিকটা মুস্কিল বাধাইতেও ছাড়িল না। একদিক্ দিয়া ইহা যেমন পৃথিবীর চেহারা বদ্‌লাইয়া দিল, সুখ, ঐশ্বর্য্য বাড়াইল, তেমনি আর

কবি রবীন্দ্রনাথ
( এশিয়ার মধ্যে একমাত্র ইনিই নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন )*

এক দিক্ দিয়া তৈরী হইল কতকগুলি মানুষ-মারা কল। কয়েক বছর আগে

* ছবিখানি 'লিবার্টির' সৌজন্যে প্রাপ্ত।



এই যে সেদিন সমস্ত পৃথিবী যুড়িয়া দারুণ লড়াইটা হইয়া গেল, লক্ষ লক্ষ লোক মারা পড়িল—সেটা যে সেকালকার মত তীর ধনুক কিংবা ঢাল তরোয়াল দিয়া হয় নাই তাহা বোধ হয় তোমরা সকলেই জান। এ যুদ্ধ হইয়াছিল বিজ্ঞানের যুদ্ধ। কত রকম ভয়ানক ভয়ানক গ্যাস, বারুদের মশলা, বিস্ফোরক যে এই যুদ্ধে ব্যবহার করা হইয়াছিল তার আর ঠিক নাই—আর তার অনেকগুলিই ছিল নোবেলের আবিষ্কার।

গোলা-বারুদের ব্যবসা করিয়া নোবেল লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করিয়াছিলেন। তাহা দিয়া মরিবার সময় তিনি আর একটা মস্ত কাজ করিয়া গেলেন। ঐ টাকার আয় হইতে প্রতি বছর তিনি পৃথিবীর সেরা লোকদের জন্য কয়েকটি পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। ঐ পুরস্কারের একটি পাইবেন যিনি সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ। এশিয়ার মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই এটা পাইয়াছেন। তিনটি পুরস্কার চিকিৎসা, রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের জন্য। আর একটি পাইবেন যিনি পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিবেন তিনি। নিজে মানুষ মারা কল বাহির করিয়া পৃথিবীতে অশান্তি আনিবার গতিক করিয়াছেন, তাই ভাবিয়াই বোধ হয় এটির ব্যবস্থা।

---

## কান-ঢাকা টুপী

( শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্‌-এ )

মণ্টু একটা কান-ঢাকা টুপী কিনিয়াছে। এ রকমটা নাকি এদেশে নতুন, নিকারাগুয়া থেকে সদ্য আমদানী। সেইটি পরিয়া সে এমন ভাবে বুক ফুলাইয়া বেড়ায় যে নেপোলিয়ন আল্পস্ ডিঙ্গাইবার পরেও সেভাবে বেড়ান নাই। কিন্তু এই কান-ঢাকা টুপীর জন্মকথা যদি একবার বলিয়া ফেলি, মণ্টু বাবুর এই ফুলানো বুক একেবারে বসিয়া যাইবে। তাই মনে করিয়াছিলাম, থাক্। কিন্তু বলিতেই হইল।

অনেক দিনের কথা। পারস্য দেশে এক বাদশা ছিলেন। নামটা ভুলিয়া গিয়াছি। শাহানশা খাজা আবদুল্ এলাহি নিজামল্ উল্মুল্‌ক সম্‌সের জঙ্গ্ বাহাদুর কিংবা ঐ রকম একটা কিছু। মস্ত বড় বাদশা। তাঁহার দাপটে কাহারো টুঁ শব্দটি করিবার উপায় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন যে রাজা, তাঁহাকে কেউ কখনো চোখেও দেখে নাই। লোকের কাছে তিনি দেখা দেন না—চাকর, দাসী, পাত্র-মিত্র কারুর কাছেই না। বাদশার একটা মস্ত সখ ছিল তাঁর চুল। এই জন্য তাঁকে রোজ একবার করিয়া মুখ দেখাইতে হইত। নিয়ম ছিল, তাঁহার রাজ্যের প্রত্যেক বাড়ী থেকে রোজ একটি করিয়া ছেলে গিয়া তাঁহার চুল সাজাইয়া দেবে, এবং তার পরেই তাহার গর্দ্দান! এমনি করিয়া দিন চলে। যে চুল বাঁধিতে যায়, সে আর ফিরিয়া আসে না। ক্রমে একদিন পালা পড়িল এক বিধবার ছেলের। একমাত্র ছেলে, কিন্তু উপায় নাই; রাজার হুকুম।

পরদিন ভোর হইতেই বাদশার সিপাই আসিয়া উপস্থিত। বিধবা খুব ভাল পিঠা করিতে জানিতেন। আজ ছেলেকে জন্মের মত বিদায় দেবার আগে নিজের বুকের দুধ দিয়া পিঠা করিয়া দিলেন। ছেলে যতটা পেটে ধরিল খাইল, এবং বাকী কতকগুলো চাদরে বাঁধিয়া লইয়া চলিল।

সমস্ত দিন শেষে বাদশার অন্দরে যখন পৌঁছিল, ছেলেটির রীতিমত পেট জ্বলিতে সুরু করিয়াছে। সুতরাং আর থাকিতে না পারিয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতেই সে সেই পিঠা খুলিয়া খাইতে লাগিয়া গেল। বাদশার নাকে গন্ধ গেল। অমন মিষ্টি গন্ধ, সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বায় জল আসিয়া পড়িল। বাদশা কহিলেন, ওহে ছোকরা, বলি অতো ক'রে খাচ্ছ কি?

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে কহিল, আজ্ঞে পিঠে।

—পিঠে! ভারী সুন্দর তো? কই, দাও দিকিন দুখানা, চেখে দেখি।

মোবারক—ছেলেটির নাম মোবারক—বাদশার হাতে একখানা একখানা করিয়া প্রায় সব গুলো পিঠাই তুলিয়া দিল। বাদশা কহিলেন, কই হে, আর আনোনি। এ যে একেবারে মধু। কোথায় পেলে?



—আজ্ঞে জাঁহাপনা, আমার মা করে দিয়েছেন।

—কি দিয়ে করেছেন?

—আজ্ঞে চা'লের গুঁড়ো আর তাঁর বুকের দুধ।

—তাই নাকি? তা বেশ, বেশ!

তারপর চুল সাজানো শেষ হইলে, মোবারকের গর্দ্দান হুকুম হইল। মোবারক, হাঁটু পাতিয়া বসিয়া জোড় হাতে কহিল, জাঁহাপনা, একটা নিবেদন আছে, অভয় দেন তো বলি।

বাদশা বলিলেন, আচ্ছা অভয় দিলাম।

মোবারক কহিল, শাস্ত্রে আছে, ভাইএর প্রাণ বধ কর্‌লে তাকে জন্ম জন্ম নরকে থাক্‌তে হয়, এ কথা কি সত্যি?

বাদশা উত্তর করিলেন, নিশ্চয়ই সত্যি, আলবৎ সত্যি।

—তা হ'লে আপনাকেও নরকে যেতে হ'বে।

— কেন?

যেহেতু, আমরা এক মায়ের দুধ খেয়েছি; আমরা ভাই।

বাদশা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাই ত! অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "ঠিক বলেছ মোবারক, তোমাকে খুন ক'রবার ক্ষমতা আমার নাই। তুমি বাড়ী ফিরে যাও। কিন্তু যাবার আগে একটা কথা দিয়ে যেতে হ'বে।

মোবারক কহিল, আজ্ঞা করুন।

—আজ যা দেখে গেলে, কোন দিন কারো কাছে প্রকাশ কর্‌তে পার্‌বে না। যদি কর, সেদিন তোমার মৃত্যু। সাবধান!

মোবারক বাদশাকে সেলাম করিয়া কহিল, "জাঁহাপনা আমার প্রাণ দিয়েছেন। আপনার হুকুম কোন দিন অমান্য কর্‌বো না।"

সাক্ষাৎ যমের মুখ থেকে ছেলেকে ফিরিতে দেখিয়া মায়ের আনন্দ আর ধরে না। ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া করিলেন, কি হ'য়েছে, সব

খুলে বল।' মোবারক গম্ভীর ভাবে কহিল, বলবার উপায় নেই মা, সে অত্যন্ত গোপনীয় কথা। এদিকে বাদশার নিয়ম পরদিন থেকে সেই ভাবেই চলিল। যে যায়, সে আর ফেরেনা। দেশের সমস্ত লোক মোবারককে ঘিরিয়া ধরিল, ব্যাপার কি? কিন্তু মোবারকের মুখে রা নাই। অথচ বলিবার জন্য তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। ব্যাপারটাও এমনি মজার যে না বলিয়া থাকা যায় না। মোবারক স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে যে, বাদশাটির চেহারা যদিও মানুষের, কান দুইটা অবিকল গাধার মত। সেই জন্যই অত বড় বাদশা হইয়াও বেচারীর সুখ নাই, লোকের সুমুখে মুখ দেখাইবার উপায় নাই। পাছে প্রজারা এ কথা জানিতে পারে, সেই জন্যে একবার তাহাকে যে দেখিয়াছে, তাহাকে আর প্রাণ নিয়া আসিতে হয় না। এমন একটা ঘটনা কেহ না বলিয়া থাকিতে পারে?

দিন-রাত চিন্তা করিয়া অবশেষে মোবারক অসুখে পড়িল। অদ্ভুত অসুখ। হাত-পা গুলি কাঠির মত হইয়া গেল, চোখ বসিয়া গেল, মুখ শুকাইয়া গেল। কেবল পেটটি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহার মা বড়ই বিপদে পড়িলেন। ওঝা আসিয়া কইল, পেটে পিলে হয়েছে। চিকিৎসা চলিল। হাতের কব্জিতে নীল সূতা। কনুইএর উপরে মাদুলি গলায় ঢাকের মত বাবা-দুলি, পেটে প্রলেপ। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তারপর আসিলেন এক বদ্যি। জিব্ দেখিয়া, পেট টিপিয়া, চোখ টানিয়া, হাত দেখিয়া, অনেক পুঁথি-পত্তর ঘাঁটিয়া মত দিলেন, উদরি। আবার চিকিৎসা চলিল। তেতো, টক, ঝাল, মিষ্টি ইত্যাদি নানা রকমের ওষুধ জোর করিয়া গেলানো হইল। কিন্তু পেটের চেহারা কমিল না। শেষটায় আরবের মরুভূমির ওপার থেকে আসিলেন এক হাকিম। মস্ত হাত-যশ, মস্ত নাম। তাহার চেহারা দেখিলে রোগের চৌদ্দপুরুষ পলাইয়া যায়, এমনি ধন্বন্তরী। তিনি বলিলেন, এই ছেলের মনে একটা গোপন-কথা আছে। সেইটিকেই বের করতে না পেরে ওর পেট ফুলে উঠেছে। হয় তাকে বলে ফেল্‌তে হবে, নয়তো অস্ত্র করা ছাড়া আর উপায় নাই।



বিধবা চম্‌কাইয়া উঠিল, ওমা, সেকি কথা! পেটে অস্ত্র করলে কি লোক বাঁচে?

সুতরাং গোপন-কথা বলিয়া ফেলিবার জন্য সকলে মিলিয়া রোগীকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অনেক কথার পর স্থির হইল, লোকালয়ের বাহিরে, নির্জ্জন খোলা মাঠে দাঁড়াইয়া মোবারক কথাটা বলিয়া আসিবে। পরদিন তাহাই করা হইল। সঙ্গে সঙ্গে পেটের ফুলা একদম কমিয়া গেল। হাত পা' আবার আগের মতই সবল হইয়া উঠিল।

এদিকে আর এক মুস্কিল। খোলা মাঠে লোক ছিল না বটে, কিন্তু বাতাস তো ছিল! সেই বাতাসে বহিয়া কথাটা বাদশার কানে গেল। মোবারকের তলব হইল। বাদশা গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, তোমার কিছু বল্‌বার আছে? মোবারক অবাক্! কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, জাঁহাপনা, আমি তো কারো কাছেই কিছু বলিনি। নিতান্ত প্রাণের দায়ে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম।

বাদশার দয়া হইল। বিশেষতঃ যখন শুনিলেন, পৃথিবীতে আর কোন মানুষ একথা এখনো জানে না, তখন আর তাঁহার রাগ রহিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, মোবারক, রাজ্যের লোক তো ফুরিয়ে এল। এবার উপায় কি? একটা কিছু বাৎলে দিতে পার?

মোবারক কহিল, জাঁহাপনা, আমার মত ক্ষুদ্র লোকের পরামর্শ যদি দয়া করে শোনেন, তো একটা কথা বলতে পারি।

বাদশা বলিলেন, "কি বল।"

—একটা কান-ঢাকা টুপী তৈরী করিয়ে পর্‌তে সুরু করে দিন। তখন আর বাইরে বেরোতে আপত্তি থাকবে না। আর রাজ্যের লোকও জাঁহাপনার দেখাদেখি ঐ টুপী পর্‌বে।

মোবারকের পরামর্শে বাদশা কান-ঢাকা টুপী পরিয়া বাইরে আসিলেন্। সমস্ত রাজ্যময় উৎসব লাগিয়া গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই কান-ঢাকা টুপীতে দেশ ছাইয়া গেল। তার আগে পৃথিবীতে ও জিনিষ কেউ দেখে নাই।

আমার কথা শেষ হইতেই, ন্যাড়া, কাঙ্গে, বুড়ী, সুধা সবাই এক সঙ্গে মণ্টুর ঘাড়ের উপর পড়িয়া কহিল, ওঃ সব চালাকি বুঝ্‌তে পেরেছি। টুপী খোল ত বাপু, দেখি কানের চেহারা খানা!

মণ্টু তো রাগিয়াই আগুন। সেই থেকে আমার সঙ্গে আর কথা বলে না। তবে সে টুপী আর নাই। কান দুইটা যাহাতে ভাল করিয়া দেখা যায়, এই জন্য চুলগুলোও ছোট করিয়া ছাঁটিয়া ফেলিয়াছে।

---

# টেনিসের গল্প

( শ্রীরামকৃষ্ণগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্-এ )

তোমাদের মধ্যে যারা একটু খেলা-ধূলো সম্বন্ধে খোঁজ-খবর রাখ, তারা নিশ্চয়ই জানো যে গত সপ্তাহে টেনিস্ খেলা নিয়ে কল্‌কাতায় কী রকম হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর যাঁরা সব চেয়ে সেরা খেলোয়াড় তাঁদের জন কয়েক এখানে এসেছিলেন ভারতবর্ষটা ঘুরে দেখবার জন্যে—তাঁদের বাড়ী ইউরোপের ফ্রান্স্ দেশে কিনা, তাই। সেই সুযোগে তাঁদের সঙ্গে বন্দোবস্ত হ'ল যে, এখানে তাঁরা ভারতবর্ষের যাঁরা সব চেয়ে বড় খেলোয়াড় তাঁদের সঙ্গে কয়েকটা ম্যাচ্ খেল্‌বেন। সাউথ্ ক্লাবের চেষ্টায় এখানকার লোকেরা গত সপ্তাহে সেই সব বিখ্যাত খেলোয়াড়দের খেলা দেখে চক্ষু সার্থক করতে পেরেছে।

ফ্রান্স্ থেকে মাত্র চারজন খেলোয়াড় এসেছিলেন। তাঁদের নাম হচ্চে—কোশে, ব্রুয়োঁ, ল্যাণ্ড্রি এবং রোদেল। কোশে হচ্চেন এখন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টেনিস্ খেলোয়াড়। তাঁর সমকক্ষ আরো তিন জন খেলোয়াড় আছেন, তাঁদের নাম হচ্চে—টিল্‌ডেন, লাকস্ত্ এবং বোরোত্রা। এঁদের ভেতর এক টিল্‌ডেনের বাড়ী আমেরিকায়, আর বাকী দু'জন ফ্রান্সের লোক। আজ এঁদের কথাই তোমাদের বল্‌ব।

তোমরা বোধ হয় ভাব্‌ছ পৃথিবীর মধ্যে কে যে সব চেয়ে বড় খেলোয়াড়



তা পৃথিবীর সব খেলোয়াড় এক জায়গায় জড়ো না হলে কী করে জানা যাবে—না? আজকাল এটা বোঝ্‌বার দু'রকম উপায় আছে। প্রথমতঃ, লোক হিসেবে কে শ্রেষ্ঠ তা জানা যায় উইম্ব্‌ল্‌ডনে; আর দ্বিতীয়তঃ জানা যায় দেশ হিসেবে—ডেভিস্ কাপ্ প্রতিযোগিতায়। লণ্ডনের নাম তোমরা নিশ্চয়ই জান। তারই কাছে উইম্ব্‌ল্‌ডন্ বলে একটা সহরতলী আছে। সেখানে প্রতি বছর একটা প্রকাণ্ড টেনিস্ প্রতিযোগিতা হয়। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ থেকে, যারা ভাল ভাল খেলোয়াড় তারাই শুধু সেখানে খেল্‌তে যায়। সেই প্রতিযোগিতায় ঠিক করা হয় পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় কে। যিনি সেই প্রতিযোগিতায় জয়ী হন তাঁকে World Champion ( পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ) বলা হয়। এই ত গেল লোকের সঙ্গে লোকের খেলা; আর দেশের সঙ্গে দেশের খেলা হয়, ডেভিস্ কাপে। পৃথিবীর প্রায় ২৫।৩০টী দেশ এই খেলায় যোগ দিয়ে থাকে, ভারতবর্ষও প্রতি বৎসর খেল্‌তে যায়। এই খেলা ভিন্ন ভিন্ন দেশে হয়ে থাকে। যেমন ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের খেলা হয় ত ইংলণ্ডেই হ'ল; কিন্তু ইংলণ্ডের সঙ্গে জার্ম্মেনীর খেলা হয় ত হ'ল জার্ম্মেনীতে। যে দেশের খেলোয়াড়েরা অন্য সব দেশের খেলোয়াড়দের হারিয়ে ফাইনালে এ জেতে, সেই দেশই ডেভিস্ কাপ্ পায়। যে কোন দেশের পক্ষে এটাই হ'ল সব চেয়ে বড় সম্মান। গত দু'বছর ধরে ফ্রান্স্ পৃথিবীর আর সব দেশকে হারিয়ে এই কাপ্ জিতে রেখেছে। তার আগে সাত বছর ধরে আমেরিকা অন্যান্য সব দেশকে হারিয়ে এই কাপটী নিজের কাছে রেখেছিল।

আমেরিকার এই প্রাধান্যের মূলে ছিল প্রধানতঃ টিল্‌ডেন, আর অংশতঃ জন্‌ষ্টন্। এই দু'জনে মিলে এতকাল পৃথিবীর সবাইকে হারিয়ে এসেছে, কিন্তু এখন বুড়ো হয়েছে বলে আর ফ্রান্সের সঙ্গে খেলায় পেরে উঠ্‌ছে না। এই সাত বছর টেনিস্ খেলার 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' একচ্ছত্র অধীশ্বর ছিলেন—টিল্‌ডেন। তিনি মাত্র দু'বছর উইম্ব্‌ল্‌ডনে খেল্‌তে গিয়ে World champion হয়েছিলেন; আমেরিকা ছেড়ে ফি বছর ইংলণ্ডে খেল্‌তে আসা তাঁর পক্ষে আর সম্ভবপর হয়নি।

কিন্তু পরের বছর থেকে যাঁরা World champion হতে লাগ্‌লেন ডেভিস্ কাপের খেলায় টিল্‌ডেন্ তাঁদের ধরে ধরে যা-তা করে হারিয়ে দিচ্ছিলেন। কেউই তাঁকে এ সাত বছরের ভেতর হারাতে পারা ত দূরের কথা, কেউ যে তাঁকে হারাতে পারে এ ধারণাও কেউ মনে আন্‌তে সাহস পেত না।—এম্নিই ছিল তাঁর খেলার বাহাদুরী! তোমরা হয়তো ভেবেই পাচ্ছ না এর মধ্যে বাহাদুরী আবার কোথায়। একটা ব্যাট্ দিয়ে একটা বল্‌কে পিটে জালের ওদিকে একটা মস্ত চৌকোণা দাগের ভেতর ফেল্‌তে নাকি আবার বাহাদুরীর দরকার হয়! এই ত সেদিন ও বাড়ীর মনুদা 'র‍্যাকেট্' দিয়ে বল্‌টাকে পেট্‌বা মাত্রই বল্‌টা লাফিয়ে উঠেই অক্লেশে গিয়ে ও দিক্‌কার দাগের পাশেই পড়্‌ল। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ যদি টেনিস্ খেলে থাকো তো নিশ্চয়ই জানো যে বল্‌টা গিয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভেতর পড়্‌বে, আর

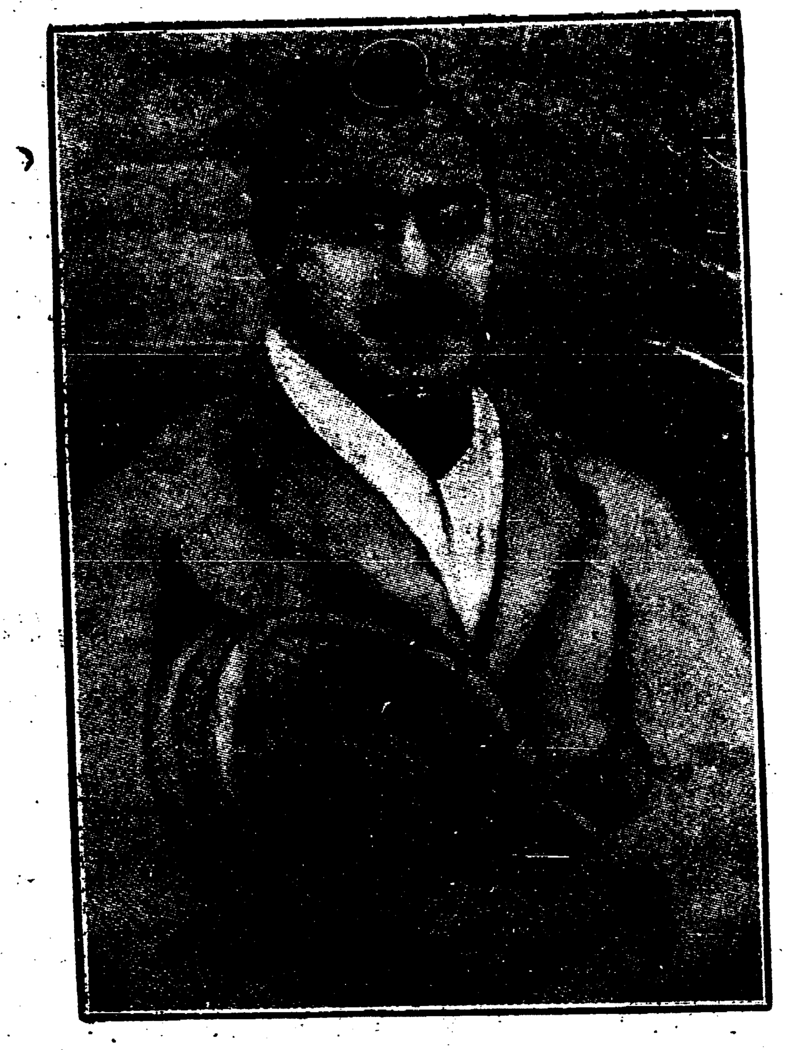

টিল্‌ডেন্

তোমার বিপক্ষের লোক্ সেটাকে কিছুতেই ঠিক মতো ফিরিয়ে দিতে পার্‌বে না—এম্‌নি করে খেলা কী রকম শক্ত ব্যাপার। বিপক্ষের খেলোয়াড় যাতে না বল্‌টাকে ফিরিয়ে দিতে পারে তার জন্যে ভাল ভাল খেলোয়াড়েরা যে কত রকম ফন্দী-ফিকির খাটিয়ে, আর প্রাণপণ পরিশ্রম ক'রে খেলে, তা দেখ্‌লে তোমরা অবাক্ হয়ে যাবে। এই টিল্‌ডেন সাহেব এত রকম কসরৎ করে, বুদ্ধি খাটিয়ে আর নানান রকম কায়দা করে খেল্‌তেন যে তাঁর



বিপক্ষেরা কেউই তার সঙ্গে খেলায় এঁটে উঠ্‌তে পারতেন না। তাঁরা সব 'যুদ্ধং দেহি' বলে আমেরিকায় গিয়ে হাজির হতেন আর বছরের পর বছর সাত বছর ধরে টিল্‌ডেন্ সাহেবের কাছে হেরে গিয়ে মুখটী চুণ করে বাড়ী ফিরতেন। টিল্‌ডেন্ যখন বল্‌টাকে মারেন বল্‌টা তখন কামানের গোলার মতন বেগে বিপক্ষের দিকে ছুটে যায়—মাঝে মাঝে এত জোরে যায় যে, বিপক্ষের খেলোয়াড় সে বল্‌টাকে ফিরিয়ে দেওয়া ত দূরের কথা অনেক সময় চোখেই দেখ্‌তে পায় না ঠিকমতো। এ-হেন টিল্‌ডেনও দু-একবার হার্‌তে হার্‌তে খুব বেঁচে গিয়েছেন।

একবার ডেভিস্ কাপের সেমি-ফাইনাল এর খেলা হচ্চে জাপানের সঙ্গে আমেরিকার। জাপানের হয়ে খেল্‌ছেন শিমিৎজু আর টিল্‌ডেন্ খেল্‌চেন আমেরিকার হয়ে। যিনি পাঁচ সেটের মধ্যে তিন সেট্ জিত্‌বে তাঁরই জিৎ। শিমিৎজু নেমেই এম্নিতর খেল্‌তে সুরু কর্‌লেন যে টিল্‌ডেন বেচারা একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে উঠ্‌লেন। শিমিৎজু ত দুটো সেট্ জিতে নিলে, আর একটা নিলেই তাঁর জয়-জয়কার। সে সেটেরও ছটার মধ্যে পাঁচটা গেম্‌ই তিনি জিতেছেন—আর একটা মাত্র বাকী। সমস্ত দর্শকেরা দম্ বন্ধ করে চেয়ে আছে—টিল্‌ডেন্ যায় যায়! দু'এক জন হয়তো—আর কিই বা দেখ্‌ব, শেষকালে একটা জাপানীর কাছে জগতের সেরা টিল্‌ডেন্ হেরে গেল—এই সব ভেবে উঠে মাঠ ছেড়ে চলেই গেলেন। এমন সময় একবার টিল্‌ডেন্‌কে একেবারে কোণঠেসা করে শিমিৎজু জালের কাছে দৌড়ে এলেন, যেন অমন কোণঠেসা হয়ে টিল্‌ডেন্ যেই রসগোল্লার মত বল্‌টী শিমিৎজুর হাতে তুলে দেবেন, জাপানী বীর অম্নি সেটীকে এত জোরে মার্‌বেন যে বল্ মাটীতে পড়ে এক লাফে মাঠের বাইরে চলে যাবে—টিল্‌ডেন্ আর সেটা ছুঁতেও পারবেন না; আর তা হলেই তো তাঁর জিৎ নিশ্চয়। টিল্‌ডেন্ সাধারণ খেলোয়াড় হলে হয়তো সেদিন ঠিক ঐভাবেই খেল্‌তেন। তিনি জাপানী-পুঙ্গবের মৎলবখানা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লেন কিন্তু মোটেই ঘাব্‌ড়ালেন না। "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ"—এই কথাটী মনে রেখে তিনি শিমিৎজুকে ঠকাবার জন্যে তাঁর মাথার খুব উঁচু দিয়ে বল্‌টাকে ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু মেরেই তাঁর মনে

ভয় হল যে বল্‌টা বোধ হয় গণ্ডীর মধ্যে পড়্‌বে না। শিমিৎজুও হয়তো তাই ভেবেছিলেন। এদিকে দর্শকেরা সব নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখ্‌ছে বল্‌টা কোথায় পড়ে। এরি মধ্যে বল্‌টা ধীরে ধীরে নাম্‌তে নাম্‌তে মাটীতে এসে পড়্‌ল—রেফারি বল্‌লেন গণ্ডীর মধ্যেই পড়েছে। ব্যস্‌, সে পয়েণ্ট্‌টী টিল্‌ডেন্‌ জিত্‌লেন। এই যে স্রোত ফিরে গেল আর শিমিৎজু জিত্‌তে পার্‌লেন না। টিল্‌ডেন্‌ সাহেব সেই সেট্‌টী এবং তার পরের তুটী নিয়ে, জয়ী হয়ে, বেরিয়ে এলেন। তখন সবার আনন্দ ধরে না! সবাই মিলে টিল্‌ডেন্‌কে কাঁধে চড়িয়ে নিয়ে গেল। আর বেচারা শিমিৎজু সেদিন বোধ হয় ধরিত্রীকে দ্বিধা হবার অনুরোধ জানিয়ে তবে বাড়ী ফির্‌লেন।

এই রকম আরো অনেক নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে তিনি বেঁচে গিয়েছেন। এ-গুলো লোকের চোখে এতই অদ্ভুত ঠেক্‌ত যে সকলের একটা ধারণা হয়ে গেল যে তিনি একেবারে অজেয়।

এম্‌নি করে কিছুকাল যায়। হঠাৎ একদিন টিল্‌ডেন্‌ সাহেবের ডান হাতের ঠিক মাঝের আঙ্গুলটায় একটু ঘায়ের মতন কি হল। ডাক্তার এল, অষুধ দিয়ে গেল, কিন্তু কিছুই হল না। শেষে সব বড় বড় ডাক্তারেরা মিলে পরামর্শ করে ঠিক কর্‌লে যে, টিল্‌ডেন্‌কে বাঁচাতে হলে এযাত্রা 'সর্ব্বনাশে, সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ—অর্থাৎ কিনা আঙ্গুলের অর্দ্ধেকটাই ছেঁটে বাদ দিয়ে ফেল্‌তে হবে। বেচারা কী আর কর্‌বেন—বাধ্য হয়েই আধখানা আঙ্গুল কেটে ফেল্লেন—প্রাণটাতো আগে বাঁচান চাই! কিন্তু প্রাণের চেয়েও বড় মান বুঝি এবার যায়! এতবড়ো পৃথিবী-বিখ্যাত খেলোয়াড়কে আঙ্গুল কেটে বুঝি খেলা-ধূলো সব ছেড়েই দিতে হয়। টিল্‌ডেন্‌ সাহেবও বড়ই কাতর হয়ে পড়লেন—খেলা ছাড়তে হবে ভেবে। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে যে, ইচ্ছে থাক্‌লেই উপায় হয় ( Where there is a will, there is a way ) তিনিও ঐ আধখানা আঙ্গুল নিয়ে খেলা অভ্যাস করতে লাগ্‌লেন। শেষে ঐ আধখানা আঙ্গুল দিয়েই টিল্‌ডেন্‌ সাহেব এত প্রচণ্ড জোরে খেলা সুরু কর্‌লেন যে, সবাই বল্‌তে লাগ্‌ল টিল্‌ডেনের আঙ্গুল কেটে খেলা খুলে গেছে। কী অদ্ভুত লোক, আর কী অসম্ভব তাঁর ক্ষমতা!



এম্‌নি করেই চল্‌লো সাত বছর। শেষে একদিন এহেন তুর্দ্ধর্ষ অজেয় লোকটীও মহাকালের কবলে পড়ে হার্‌তে সুরু কর্‌লেন। বয়েস বেশী হলে লোকে আর আগের মতো ছুটোছুটী করতে পারে না—লাফালাফি কর্‌বার ক্ষমতা কমে আস্‌তে থাকে। টিল্‌ডেন্‌ও তাই আর আগের মত হুড়োহুড়ি, লাফালাফি কর্‌তে পার্‌ছেন না। তাই তিনি তাঁর চেয়ে বয়সে প্রায় ১২।১৩ বছরের ছোট কোশে ও লাকস্ত, এঁদের সঙ্গে পেরে উঠ্‌ছেন না। তবুও সমস্ত পৃথিবীর লোকে—এমন কি কোশে এবং লাকস্ত পর্য্যন্ত—একবাক্যে স্বীকার করে, যে টিল্‌ডেনের মত খেলোয়াড় আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কেউ জন্মায় নি।

এ হেন লোককে প্রথম হারাবার সৌভাগ্য হয়েছিল বোরোত্রার। যেদিন সকালে উঠেই লোকে খবরের কাগজে দেখ্‌লে যে অজেয় টিল্‌ডেন্‌ হেরে গিয়েছেন বোরোত্রার কাছে—সেদিন সমগ্র পৃথিবী বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। লোকে অবাক্‌ হয়ে ভাব্‌ল—তা'হলে টিল্‌ডেন্‌ও হারে!

টিল্‌ডেন্‌ ত হার্‌লেন—অবশ্য এ পরাজয়ের শোধ তিনি তুলেছেন—কিন্তু যাঁর কাছে হার্‌লেন সেই লোকটী—বোরোত্রা—একটী অতি অদ্ভুত লোক। তাঁর প্রত্যেকটী কাজ, চলাফেরা, খেলাধুলো—এমন কি লোকের সঙ্গে মেলামেশা পর্য্যন্ত অন্যান্য লোকের মত নয়। তুমি আমি ঐ রকম কর্‌লে লোকে হয়ত হাস্‌বে, কেউ বা ভাব্‌বে পাগল, কেউ বা আবার চটেই যাবে, কিন্তু ঠিক ঐ কারণেই বোরোত্রা সমস্ত পৃথিবীর প্রিয়—মেয়েরা তো তাঁকে একদম্‌ ভালোই বেসে ফেলেছে। হয়তো একদিন দেখা গেল বোরোত্রা জামাটা উল্টো করে গায়ে দিয়েই খেল্‌তে নেমেছেন। সবাই তো দেখে খুব হাসাহাসি কচ্ছে—বোরোত্রার ভ্রূক্ষেপও নেই। কেউ হয়তো ভুলটা তাঁকে দেখিয়ে দিল, আর অম্‌নি বোরোত্রার মুখখানা সলজ্জ হাসিতে ভরে উঠ্‌ল—তিনি ছুট্‌লেন জামা বদ্‌লাতে।

এক দিন হয়তো বোরোত্রার খেলা হবে অন্য কারুর সঙ্গে। দর্শকেরা হাঁ করে বসে আছে, এদিকে সময়ও হয়ে এল, কিন্তু বোরোত্রার দেখা নেই।

বোরোত্রা তখন হয়ত মাইলখানেক দূরে—ভীষণবেগে ট্যাক্সি চালিয়ে মাঠের দিকে আস্‌চেন। মাঠে পৌঁছেই দেখ্‌লেন গেটে অত্যন্ত ভিড়, ভেতরে ঢুক্‌তে দেরী হয়ে যাবে। তক্ষুণি তড়াক্‌ করে এক লাফে গেট ডিঙিয়ে, ঝুপ্‌ করে পড়লেন গিয়ে মাঠের ভেতর। মজা দেখে দর্শকেরা খুব হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল।

একে তো অতি সুগঠিত সুন্দর শরীর,—তার ওপর আবার দৌড়ঝাঁপ লাফালাফি প্রভৃতি সকল রকম বিদ্যাতেই ওস্তাদ। সুরসিক লোক, মুখে হাসিটী সব সময়েই লেগে আছে। টেনিস্‌ খেলায়ও কিছু কম নন, টিল্‌ডেন্‌কে হারিয়েছেন শুনেই বোধ হয় তা বুঝ্‌তে পেরেছ। উইম্বল্‌ডনের যে খেলায় World Champion ঠিক হয় বলেছি সেই খেলায় তিনি দু' দু' বছর আর সব্যাইকে হারিয়ে দিয়েছেন। তা ছাড়া অন্যান্য আরো অনেক রকম সম্মানই তিনি পেয়েছেন টেনিস্‌ খেলে। তাঁর মতো এত চট্‌পটে খেলোয়াড় পৃথিবীতে আর কেউ নেই। ভয়, ভাবনা, আশঙ্কা—এসব যেন লোকটার কাছে ঘেঁষ্‌তেই পায় না। তিনি যখন খেলেন তখন যেন মাঠের ওপর ঝড় বয়ে যায়—মনে হয় যেন এক বিরাট্‌ দৈত্য সাম্‌নে যা পাচ্ছে তাই যেন ভেঙ্গে চুরে গুঁড়ো করে দিয়ে যাচ্ছে তার চলার দাপটে। এই দেখ্‌চ মাঠের পেছনে দাঁড়িয়ে বোরোত্রা একটির পর একটী করে বল্‌গুলি ঠিক মতো ফিরিয়ে দিচ্ছেন; হঠাৎ হয়তো এক বিরাট্‌ লাফ দিয়ে একেবারে জালের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন—এক একটী মারের চোটে বল্‌গুলোর নাড়ীভুঁড়ি বেরুবার মতন অবস্থা! সমস্ত মাঠটা ভরে এম্‌নি করে বিদ্যুতের মত ছুটোছুটি করে তবে তার খেলা হয়। হাই জাম্প্‌, লং জাম্প্‌, হান্‌ড্রেড্‌ ইয়ার্ডস্‌ রেস্‌—মায় আছাড় খাওয়া শুদ্ধ—সব গুলোই পাবে তাঁর এক টেনিস্‌ খেলার মধ্যে। লোকটাও আবার ভারি মজার কিনা। বিপক্ষের খেলোয়াড় হয়তো একেবারে কোণ ঘেঁসে একটা বল্‌ মেরেচে—প্রচণ্ড বেগে দৌড়ে সেটাকে ফেরাতে গিয়ে বোরোত্রা হয়ত টাল্‌ সাম্‌লাতে না পেরে পড়ে গেলেন এক দর্শক মহিলার কোলের ওপর। তক্ষুণি বল্‌টল্‌ ফেলে হাজার হাজার দর্শকের সাম্‌নে বোরোত্রা হাঁটুগেড়ে বসে মহিলাটীকে খুব নম্র ভাবে অভিবাদন করে



উঠে গেলেন খেল্‌তে। মহিলাটী তো একেবারে অপ্রস্তুত; কিন্তু দর্শকেরা সবাই খুব খুসী!

একবার তাঁর একজন বিপক্ষের খেলোয়াড় এত চমৎকার খেলেছিল যে বোরোত্রা এক লাফে জাল ডিঙিয়ে পার হয়ে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিলেন। এম্‌নি সরল আর গুণগ্রাহী স্বভাব এই লোকটীর।

অসম্ভব যা তার আকর্ষণ এই লোকটীর কাছে একেবারে অদ্বিতীয়। তির্ব্বতে বেড়াতে যাবার তাঁর খুব ইচ্ছে; তাই তাঁর বন্ধু রোদেলকে সমস্ত খোঁজ খবর নিতে বলে দিয়েছেন। রোদেল আমাদের জিজ্ঞেস কচ্ছিল পথের কথা; আমরা বল্‌লুম—ও আশা ছেড়েই দাও, ও পথে যে যায় সে আর ফেরে না। শুনে একটু মুচ্‌কি হেসে রোদেল বল্লে—"খবর্দ্দার, এ কথা যেন কখনও বোরোত্রার কানে না যায়। যা আস্ত পাগল সে, যদি একবার শোনে যে এ পথে যাত্রা মানেই মৃত্যুকে বরণ করা, তাহলে আর তাকে কিছুতেই ফেরান যাবে না কিন্তু!" এম্‌নিতর অদ্ভুত লোক ইনি।

লোকটী কিন্তু ওদিকে আবার ভয়ানক খামখেয়ালী। যেদিন মন টন ভাল নেই সেদিন হয়ত যার তার কাছে হেরে যাবেন। আবার শুদ্ধু মজা দেখ্‌বার জন্যেও বটে, আর তার চেয়ে খারাপ কোন খেলোয়াড়কে উৎসাহ দেবার জন্যেও বটে—হঠাৎ হয়ত বোরোত্রা সেই খেলোয়াড়টীর কাছেই হেরে বস্‌লেন। আচ্ছা, তোমরাই বলতো—এরকম একজন লোককে নাকি আবার ভাল না বেসে থাকা যায়?

কিন্তু তাও বলি, যেদিন বোরোত্রার খেলার ঝোঁক চাপে সেদিন তাকে হারান এক রকম অসম্ভব। সেদিনকার তাঁর খেলাকে শুধু ভাল বল্‌লে কিছুই বলা হয় না—সে খেলা যেমন সুন্দর, তেমনি ভয়ঙ্কর, আর তার চাইতেও বোধ হয় অদ্ভুত।

তাঁর খেয়ালের পরিচয় তোমাদের আর একটু দেব। সেবার উইম্ব্‌ল্‌ডনে সে কি কাণ্ডটা করেছিল তা জান না বুঝি? বছর বছরই তো

উইম্ব্‌লডনের খেলায় একজন করে World Champion হন—এম্‌নি করে গত পঞ্চাশ বছরে যাঁরা Champion হয়েছেন তাঁদের সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করে রাজারাণী তাঁদের একটী করে বিশেষ সম্মানজনক পদক দেবেন, তাই ঠিক হয়েছিল সেবার। বোরোত্রাকেও অবশ্যি নেমন্তন্ন করা হয়েছিল Champion হিসেবে। সভার কাজ আরম্ভ হ'ল। রাজারাণী একে একে ভূতপূর্ব্ব বীরদের সম্মানিত কর্‌তে লাগ্‌লেন; ক্রমে বোরোত্রার পালা এল। কিন্তু বোরোত্রাকে কোথাও খুঁজেই পাওয়া গেল না। রাজা প্রায় হতাশ ভাবে বোরোত্রার আশা ছেড়ে দিয়ে তার পরের লোকটীকে পদক দিতে যাবেন, এমন সময় হুস্‌ করে আকাশ থেকে একখানা এরোপ্লেন নেমে এল আর তার মধ্য থেকে লাফিয়ে পড়লেন—বোরোত্রা। তাই দেখে সবাই এত খুসী হয়ে উঠ্‌ল যে পূরো পাঁচ মিনিট ধরে নাকি তারা হাততালিই দিয়েছিল। বোরোত্রা কিন্তু ততক্ষণে ছুটে গিয়ে রাজারাণীর সাম্‌নে হাঁটুগেড়ে বসে, অতি বিনীতভাবে দেরী হওয়ার জন্যে ক্ষমা চাইতে সুরু করেছেন। ক্ষমা তো তাঁরা কর্‌লেনই বরং আরও আনন্দিত হলেন। এতটা আমোদ বোধ হয় দর্শকেরাও শিগ্‌গির পান নাই।

লাকস্ত্

এরকম লোকের ওপর তোমরা রাগ করে থাক্‌তে পার? কেউই পারে না; তাই সবাই ওকে খুব ভালবাসে।

কিন্তু এর ঠিক উল্টো ধরণের লোক হচ্চেন—লাকস্ত্‌। এই গম্ভীর



মানুষটীর পরিচয় তোমাদের দেবার ইচ্ছে আছে; তবে আজ আর নয়—আর একদিন এসো, তখন বল্‌ব। আমারও খেল্‌তে যাবার সময় হয়ে এলো কিনা, তাই যাচ্ছি—কেমন?

---

# পদ্মরাগ

( অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বি-এল্‌ )

[ পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর ]

## ২১

রণজিৎ ঠিক বুঝিতে পারিল না যে, বায়স্কোপের মত পর পর যে সব ঘটনা তার চোখের সাম্‌নে ঘটিয়া যাইতেছে সেগুলি কি বাস্তবিকই সত্যি, না কি সে জাগিয়া জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিতেছে! তার মনের ভাব হুকা-কাশি টের পাইলেন, বলিলেন, "খুব অবাক্‌ হয়ে গেছেন বুঝি? কিন্তু অবাক্‌ হওয়া তো সবে এই আরম্ভ—এমন সব ঘটনা এবার আস্তে আস্তে টের পাবেন যে তা শুনে আপনার মূর্চ্ছা না হয় তবেই বাঁচি। কিন্তু তার আগে একটী কাজ,—এই ট্যাঁসের পোর পকেটে যা কিছু পাওয়া যায় বের করে ফেলে, ড্রাইভারের সীটের নীচে যে কলের হাতকড়াটা লুকিয়ে রেখেছি, সেটা এনে একে গয়না পরিয়ে দিতে হবে।"

হাতকড়ি পরাইয়া সোলোমনের পকেটে হাত দিতেই দুইটা বোঝাই পিস্তল পাওয়া গেল, আর কোটের ভিতরকার পকেটে মিলিল ছোট একটা টিনের কৌটা। হুকা-কাশির কথামত রণজিৎ তখনই সে কৌটা খুলিয়া ফেলিল।

নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন সেই প্রকাণ্ড মাঠ তৎক্ষণাৎ এক তীব্র দ্যুতিতে হাসিয়া উঠিল, আর রণজিৎকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ছোট কৌটাটী হইতে বাহির হইয়া আসিল সমসেরপুর-রাজের পদ্মরাগমণি!

কোন বিষয়েই হঠাৎ উচ্ছ্বসিত বা বিচলিত হইয়া উঠা হুকা-কাশির মোটেই স্বভাব নয়, কিন্তু তবুও তিনি যেন একটু আবেগ-মাখা স্বরেই বলিয়া উঠিলেন, "রাজাবাহাদুরের পদ্মরাগ আজ এই আপনার হাতে তুলে দিলাম, রণজিৎবাবু!" তারপর একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "কোথায় এটা এতদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এবং কি ভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে এর সন্ধান

বের করতে হয়েছে সেইটে আপনাকে বল্‌বার এইবার সময় এসেছে। কিন্তু এখানে নয়, চলুন আনন্দরামের বাড়ীতেই ফের গিয়ে ওঠা যাক্।" সোলোমনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "চল সাহেব, গরীবের কুঁড়ে-খানা একটু পবিত্র কর্‌বে।"

বন্দীকে গাড়ীতে তুলিয়া আনন্দরামের বাড়ীতে দুই জনে ফিরিয়া আসিবার পর স্তম্ভিত, বিমূঢ় আনন্দরাম বেচারাকে আকাশ পাতাল ভাবিবার অবসর দিয়া হুকা-কাশি তাঁহার গল্প আরম্ভ করিলেন,—

সোলোমনের কাছে পদ্মরাগ পাওয়া গেছে বলেই যেন মনে কর্‌বেন না যে সে একাই আগাগোড়া এর রহস্যের সাথে জড়িত। দু' দু'বার মণিটী হাত বদল হয়েছে। আমি আমার গল্প আরম্ভ করব শেষ দিক্ থেকে। প্রথমবারে কারা কি চাতুরী খেলে রাজা-বাহাদুরের কাছ থেকে পদ্মরাগ সরিয়ে ফেলেছিল সেটা শেষে বল্‌বার জন্য রেখে, গোড়াতে বল্‌ব কে দ্বিতীয় বারের আসামী, অর্থাৎ কে এই প্রথম দলের হাত থেকে পদ্মরাগ ছিনিয়ে নিয়েছিল। এই দ্বিতীয় বারের ঘটনাটী বল্‌তে হলে আমায় আরম্ভ কর্‌তে হবে আপনার সেই মোটর-ওলটানোর ব্যাপার থেকে। প্রথম দলের কয়েকজন আমাকে বন্দী করে পদ্মরাগ নিয়ে সরে পড়্‌ছিল, আপনি টের পেয়ে মোটরে তাড়া কর্‌লেন। তারা আগে থেকেই বন্দোবস্ত করে রেখেছিল, মোটরশুদ্ধ আপনাকে ঘাল করে, নিরাপদে পদ্মরাগ নিয়ে ভেগে পড়্‌ল, কিন্তু যেতে হল আমায় মুক্তি দিয়ে। এ সমস্ত ব্যাপারই আপনি জানেন। তারপর কি করে আপনি ডাকাত-দলের হাতে পড়্‌লেন, কি করে আমি পাগল সেজে শেষ পর্য্যন্ত আপনাকে উদ্ধার করে আন্‌লাম, সে সবও আপনার জানা কথা, তা বলে বেশী সময় নষ্ট করার দরকার নেই।

কিন্তু ঠিক্ তার একটু পরেই যে ছোট্ট একটী ঘটনা ঘটে গেল তা হয় তো আজ আর আপনার স্মরণ নেই, কিন্তু আমার মনে সেটা চিরদিনের মত স্থায়ী দাগ এঁকে দিয়েছে। এই ছোট্ট ঘটনাগুলোকে দুনিয়ার লোকে চিরকালই তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করে আস্‌ছে, তারা মোটেই ভাবে না যে এ গুলোর ওপর কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জিনিষের ছাপ লুকোনো থাকে। সামান্য ব্যাপার,—সঙ্গে টাকা-পয়সা আছে কি না দেখ্‌বার জন্যে আপনি পকেটে হাত ঢুকোলেন, বেরিয়ে এল যা, তা কিন্তু টাকা-পয়সা নয়, এক খানা টেলিগ্রাম। দেখ্‌লাম সেখানা মোটর ওল্‌টানোর সাঙ্কেতিক চিহ্ন, দামী রত্ন খানা যে যাচ্ছে তাও ইঙ্গিতে লেখা আছে।

টেলিগ্রাম খানা তাদের কাছ থেকে আপনার পকেটে কি করে এল, তা বুঝ্‌তে অবশ্য



কোন কষ্ট হোল না! আপনি তখন যে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটীর কথা বলেছিলেন সেইটেই ঠিক, অর্থাৎ, ও-দলের কাপ্তেনের পকেটেই নোটগুলোর সাথে টেলিগ্রামখানা জড়িয়ে গিয়েছিল; তারপর ডাকাতের হল্লায় তাড়াতাড়িতে দিশেহারা হয়ে সে যখন আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার আশা ছেড়ে, আপনার পকেটে নোটগুলো গুঁজে দিয়ে দৌড়ে পালাল, তখন সেই নোটের সাথে আর কিছু গেল কি না গেল— সে দেখ্‌বার সময় আর তার হয় নি। এতো বেশ পরিস্কার। কিন্তু টেলিগ্রাম খানার মাথা কাটা কেন তা কিছুতেই ভেবে ভেবে ঠিক্ কর্‌তে পার্‌লাম না। এই পর্য্যন্তই তখন ব্যাপারটা ধামা চাপা রইল।

টেলিগ্রামখানা............সাঙ্কেতিক চিহ্ন

তারপর এলাহাবাদে এসে সোলোমনের রেষ্টুরেণ্টে যখন প্রথম দলের এক জনের—ড্রাইভারটীর—সাক্ষাৎ পেলাম, তখন মন আহ্লাদে একেবারে নেচে উঠ্‌ল, ভাবলাম এইবার বুঝি তবে পদ্মরাগের উদ্ধার হয়েই গেল। আপনি তো তৎক্ষণাৎই লোকটার টুঁটি চেপে ধর্‌তে যাচ্ছিলেন, আমি বুঝিয়ে সুজিয়ে আপনাকে থামালাম, বল্লাম, দাঁড়ান, আগে একটু খোঁজ-খবর নিয়ে নি, নইলে শেষে কি শুধু ড্রাইভারের টুঁটি টেপাই সার হবে?

ছদ্মবেশে লোকটার চাল-চলন, হাবভাব, কথাবার্ত্তা সমস্ত লক্ষ্য কর্‌তে সুরু কর্‌লাম। দলের আরও কয়েক জনের সাথে দেখা হল। বহুকষ্টে, অনেকক্ষণের চেষ্টায় মাত্র এইটুকু জানা গেল যে, তারা এলাহাবাদে আস্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই কে, বা কারা, তাদের কাপ্তেনকে

তেতালার ঘরে একা পেয়ে, ছুরি মেরে, পদ্মরাগ নিয়ে পালিয়ে গেছে। উঃ, এই খবরটুকু জান্‌তে আমায় যা বেগ পেতে হয়েছিল, আমার এতটা অভিজ্ঞতায় এতখানি কষ্ট আর হয় নি। নিশ্চয় জানি, পদ্মরাগ হারিয়ে আগের মত অতটা সতর্ক আর ওরা ছিল না বলেই এ খবরটুকু আমি পেতে পেরেছিলাম, তাদের হাতে পদ্মরাগ থাক্‌লে ঘুণাক্ষরেও সে সংবাদ পাওয়া আমার সাধ্যে কুলাতো না—অসম্ভব হুঁসিয়ার! অসম্ভব হুঁসিয়ার!!

এখন প্রশ্ন হোল, কে এ লোক যে প্রথম দলের কাপ্তেনকে ছোরার ঘায়ে ঘাল করে পদ্মরাগ নিয়ে পালিয়েছে? কোন অজানা নতুন লোক সে হতেই পারেনা, কেননা সাধ্য কি তার এই অসম্ভব হুঁসিয়ার দলের ওপর চাল চালে? দলের কেউ যে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে তাও আমার মনে হল না, কেননা, কিছু দিন তো আমি তাদের কাছেই ছিলাম, দলে কে কে আছে এবং কি দরের লোক তারা সে খবরও আমি কিছু কিছু রাখি। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, এ এমন এক জন লোকের কাজ যে মোটর-ওলটানর কথা জানে, এবং আরও জানে যে একদল লোক এক খানা দামী রত্ন নিয়ে এলাহাবাদের অমুক ঠিকানায় যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার চিন্তা সেই টেলিগ্রাম খানার ওপর ফিরে এল—সেখানা আপনার পকেটে গিয়ে ঢোকা, এবং ডাকাতদের আড্ডা থেকে আমাদের পালান—এই দুই ঘটনা ঘট্‌বার ভেতরকার সময়টুকুর মধ্যে নিশ্চয়ই সেখানা অন্য কোন লোকের চোখে পড়েছে! যে ডাকাতগুলো আমাদের জঙ্গল থেকে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাগল সাজা অবস্থাতেই পেয়েছিলাম, তারা যে টেলিগ্রাম খানার ঠিক মানে কিছুতেই বুঝ্‌তে পারে নাই তা বেশ জান্‌তাম।

মাটীর তলাকার গারদে চালান না যাওয়া পর্য্যন্ত আমরা এক সঙ্গেই ছিলাম, কাজেই আমি জানতাম্ তখন পর্য্যন্ত টেলিগ্রামের কথা কেউ টের পায়নি। আমাদের আলাদা আলাদা গারদে রাখা হল বটে, কিন্তু আপনাকে পূর্‌লো আগে—আমার সাম্‌নেই তালা বন্ধ করে ফেল্লে। তালা বন্ধ হওয়ার পরে সেখানে যাবার ক্ষমতা ছিল মাত্র দুজনার—এক সর্দ্দারের নিজের, আর খাবার-দাবার দেবার জন্যে দ্বারোয়ানের। দ্বারোয়ান নিরক্ষর লোক, তার পক্ষে টেলিগ্রাম পড়া অসম্ভব। তবে কি ডাকাত-দলের সর্দ্দারেরই এ কাজ? সর্দ্দার কি তবে লেখাপড়া-জানা বুদ্ধিমান্ লোক? নিশ্চয়ই।

আমার এ অনুমান গিয়ে দৃঢ় বিশ্বাসে দাঁড়াল দুটো কারণে। প্রথমতঃ, টেলিগ্রাম খানার মাথা কাটা দেখে। প্রথম দলের কাপ্তানের পক্ষে এ কাজ করার কোন প্রয়োজন দেখ্‌লাম না। সে তো টেলিগ্রামখানা খুব ভাল করেই পড়েছে; যদি গোপন কর্‌তেই হয় তবে মাথা থেকে শুধু নাম-ঠিকানা গুলো কাটার কি দরকার তার, গোটা টেলিগ্রাম খানাই তো সে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেল্‌তে পার্‌তো। এমনও নয় যে সে টেলিগ্রামখানার অনেক কিছু লেখা আছে, যা সে ভুলে যেতে পারে বলে যত্ন করে পকেটে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু এদিকে সর্দ্দারের পক্ষে এ কাজ করা খুবই স্বাভাবিক। শুধু নাম আর ঠিকানাটা কাছে রাখ্‌লেই তার কাজ হাঁসিল হতে পারে, অমন একটা 'ডাকাতে' টেলিগ্রাম তার নিজের পকেটে না থাকাই নিরাপদ।



দ্বিতীয়তঃ, আপনার বোধ হয় মনে আছে, আমি বলেছিলাম যে আমাদের মাটীর তলায় স্থানান্তরিত হবার খানিকটা বাদেই সর্দ্দার আপনার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল। আপনি তখনও অজ্ঞান—আপনার আর আমার ঘরের ব্যবধান খুব একটা পাৎলা কাঠের দেয়াল ছিল বলে ব্যাপারটা আমি টের পেলাম। আপনাকে শেষ করে আমার ঘরে আসাই ছিল তার পক্ষে সব চাইতে স্বাভাবিক, কেননা আমি একটা আধ-পাগ্‌লা মানুষ, তাদের কুকীর্ত্তি জঙ্গলের ভেতর কতটা দেখেছি, না দেখেছি সেইটে পরখ্ করা তার খুবই প্রয়োজন। কিন্তু আপনাকে আগেই বলেছি, প্রথম দিন সে আমার ঘরে মোটেই এল না। এই না আসার কারণটা বোঝা খুবই সহজ, নিশ্চয়ই হঠাৎ তার এমন একটা দরকার পড়্‌ল, যাতে করে আর সব কাজ তাকে ছেড়ে ছুড়ে চ'লে যেতে হল। এ দরকারটী আর কিছুই নয়,—প্রথম দল এলাহাবাদে গিয়ে পৌছুবার আগেই কোনমতে তাড়া-হুড়ো করে টেলিগ্রামে লেখা ঠিকানার বাড়ীটার আশে পাশে ঘাপ্‌টী মেরে ওঁৎ পেতে লুকিয়ে থাকা। লোকটী নিশ্চয়ই খুব বুদ্ধিমান্ এবং বিশেষ রকমের চালাক! দলের লোকের কাছে মোটর ওল্‌টান শুনেই সব বুঝে নিয়েছে।

তখন এই পর্য্যন্ত বুঝ্‌লাম যে পদ্মরাগ এবার সেই ডাকাতদলের সর্দ্দারের হাতে পড়েছে কিন্তু কোথায় যে তাদের আড্ডা তার কোনই ধারণা কর্‌তে পার্‌লাম না। সেই দুর্য্যোগের রাত্রে হু হু করে মোটরে পালিয়ে এসেছিলাম, দিগ্বিদিক্ সম্বন্ধে কোন খেয়ালই ছিলনা। শুধু জানা ছিল, জায়গাটা এলাহাবাদ থেকে বেশী দূরে নয়।

ঠিক্ এম্‌নি সময় আসল ভাই ফসল ভাই নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। সমস্ত এলাহাবাদ স্তম্ভিত, আমি কিন্তু এর মধ্যে আলোর রেখা দেখ্‌তে পেলাম—ব্যাপারটা আমার চোখে যেন আরও সুস্পষ্ট হয়ে এল। এই ধনী পার্শী মণিকারটী নিশ্চয়ই আমাদের সর্দ্দার ভায়ার দোস্ত্। ডাকাতিতে সব সময়েই আর কিছু টাকা-নোট মেলে না, গয়না, মণিমুক্তা-জহরৎ—এসবও

পাওয়া যায়। একটা লোক যদি প্রত্যহই এগুলো বিক্রী করতে আনে, তবে স্বভাবতঃই তার ওপর লোকের সন্দেহ হয়। কিন্তু মণিকারের দোকানে—সেগুলো থাক্‌লে সন্দেহ হবার কোন কারণই নেই। কাজেই সর্দ্দার ভায়া দিব্যিসে আশে পাশের লোকের ঘাড় ভেঙ্গে সোণাদানা জোগাড় কর্‌তেন, আর আসল ভাই সেগুলোর চেহারা একটু বদ্‌লে ফেলে দূর দূরান্তে বিক্রী করত। এতদিন বখ্‌রা নিয়ে কোন গোলমাল হয়নি, কিন্তু গোল বাধ্‌ল এই পদ্মরাগের বেলায়। আসল ভাই এত বড় একটা সুযোগ ফস্‌কাতে চাইলে না, সর্দ্দারের ওপর দাঁও মারবার মৎলব কর্‌ল। অমন একটা জিনিষ নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার খুবই নিরিবিলিতে, কাক-পক্ষীতেও যাতে টের না পায়। তাই বোধ হয় আসল ভাই ঠিক্ করেছিল, ঘরে গিয়ে ঘুমোবার ভাণ করে থাক্‌বে, চাকর-বাকর সবাই ঘুমিয়ে পড়্‌লে, চুপি চুপি বাড়ীর বার হয়ে সর্দ্দারের কাছে যাবে। পরে ল্যাচ্‌ কী দিয়ে দরজা খুলে আবার বাড়ীতে ঢুক্‌লেই গোল মিটে যাবে। কিন্তু সর্দ্দারও তো আর কচি খোকাটী নয়, সে কেন আসল ভাইয়ের কাছে ঠক্‌তে যাবে, দুই দোস্তে কথা কাটাকাটি এবং শেষে ঝগড়া আরম্ভ হল। আসল ভাই ডাকাতের দলকে ধরিয়ে দেওয়ার ভয় দেখাতেই সর্দ্দার সেইখানেই নিজের লোক জন দিয়ে তাকে বন্দী করে ফেল্‌ল। তারপর হয় তো সুবিধে মত আমাদের সেই খাঁচা দুটোর একটায় তাকে চালান দিয়ে থাক্‌বে। এদিকে আসল ভাইয়ের চাকর সেই রাত্রেই দেখ্‌তে পেল, তার প্রভুর ঘর খোলা, প্রভু সেখানে নেই। সহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেল 'আসলভাই নিরুদ্দেশ!"

এখন সর্দ্দারটিকে কি করে বের করা যায়? এটা বরাবরই আমার মনে হয়েছিল যে সর্দ্দারের যে ধরণের কাজ, তাতে তাকে সদাসর্ব্বদাই এলাহাবাদের সাথে যাতায়াতের বন্দোবস্ত রাখ্‌তে হবে, অথচ লোকে যে তা টের পায়, তা সে চাইবে না। রেল গাড়ী বা মোটরে এলে, টের পাবার খুবই সম্ভাবনা। তাকে আস্‌তে হবে রাত্রির অন্ধকারে—এবং দারুণ বেগে। সে এক মাত্র সম্ভব হতে পারে রণ-পায়ে। রণ-পা জিনিষটা কি নিশ্চয়ই জানেন। বড় দুটো বাঁশের লগীর খানিকটা উঁচুতে পা রাখ্‌বার বন্দোবস্ত থাকে। তারপর সেই বাঁশ দুটোতে দু'পায়ের ভর রেখে বিদ্যুতের বেগে মানুষ ছুটে যায়। গোড়াতে একটু অভ্যেস করে নিলেই হোলো। আপনাদের এই ভারতবর্ষে শুনেছি আগে আগে অনেক ডাকাতই এই জিনিষটা ব্যবহার কর্‌তো—আজকাল অবশ্য এর চলন কমে গেছে।

তারপর কথা হচ্ছে এই, যদি অনবরত প্রায় রাত্রেই একটা লোক রণ-পায়ে গ্রামের পর গ্রাম দিয়ে যাতায়াত করে, তবে কেউ না কেউ তাকে দেখ্‌বেই। তাদের চোখে ধুলো দিতে



হলে সর্দ্দারের পক্ষে ভূতের পোষাক পরাটা খুবই দরকার। কাজটা কিছুই কঠিন নয়, বাঁশ দুটোর ডগায় যদি একটা মড়ার মাথা বা ঐ রকমই কিছু বসিয়ে নেওয়া যায়, আর পা-জামার মত ঢিলে পোষাকে বাঁশ দুটো ঢেকে ফেলা যায়, তবে এ অঞ্চলের লোকেদের যেমন ভূতের বিশ্বাস, তাতে করে সবাই তাকে ভূতই ঠাওরাবে।

এখন, বাস্তবিকই সর্দ্দার যদি রাত্রির আড়ালে খুব ঘন ঘন রণ-পায়ে তার আড্ডা থেকে এলাহাবাদ যাতায়াত করে, তবে নিশ্চয়ই এলাহাবাদের কাছাকাছি কোন নির্জ্জন মাঠে তার সাজ-সরঞ্জাম ঢেকে রাখ্‌বার একটা আখ্‌ড়া থাক্‌বে, এবং এসব আখ্‌ড়া প্রায়ই থাকে মাটীর তলাতে, ওপর থেকে তা মালুম হয় না। বড় বড় ধড়িবাজ দস্যুর কথা বইয়ে পড়েছি—এ রকম চোরা কুঠুরী নাকি তাদের থাকে। এই জিনিষটা লক্ষ্য করার জন্যেই প্রাতঃভ্রমণের নাম করে রোজ শেষ রাত্রে হোটেল থেকে সহরের বাইরে মাঠের দিকে বেরিয়ে পড়্‌তাম—আপনি ভাব্‌তেন আমি বুঝি শুধু বেড়াতেই যাচ্ছি! কিন্তু এত করেও লাভ বেশী কিছু হোল না, কিছুই টের পাওয়া গেল না।

গেলনা সত্য, কিন্তু একটা ব্যাপার রোজই লক্ষ্য কর্‌তে লাগ্‌লাম—সহরের অনেকটা দূরে, খুব ভোরে, এমন কি অনেক সময় অন্ধকার থাক্‌তেও, সোলোমন সাহেবকে সহরের দিকে ফির্‌তে দেখা যেত। গোড়াতে আমার মনে তেমন কিছু সন্দেহ হয়নি, কিন্তু ওর নিজেরই পাপ মন, আমায় ও দস্তুর মত সন্দেহের চোখে দেখ্‌তে সুরু কর্‌ল। সন্দেহ তার যে দিন্‌কে দিন বেড়েই চলেছে, তার হাব-ভাবে তা স্পষ্ট বোঝা যেতে লাগ্‌ল, এবং শেষ দিন সে সন্দেহ একেবারে উৎকট ভাবেই দেখা দিল। সেইদিনই বুঝ্‌লাম সাহেব আর আমাকে সহজে ছাড়্‌ছেনা, পেছনে দস্তুর মত গুণ্ডা-গোয়েন্দা লাগাবে। হোটেলে ফিরে এসে সে কথা আপনাকে জানাতেই আপনি একেবারে অবাক্ হয়ে গেলেন। কিন্তু এখন দেখ্‌ছেন, অবাক্ হবার মত এতে কিছুই ছিল না।

কিন্তু সোলোমন ঠকে গেল, আমিই তার ওপর চাল চেলে দিলাম! সমস্ত দিন আমরা শুধু তীর্থ-যাত্রীর মত সহর দেখে বেড়াচ্ছি শুনে সাহেবের সন্দেহ নিভে গেল, আর কাজেই সে একটু অসতর্কও হয়ে পড়্‌ল।

এবারে নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে ডাকাত-দলের সর্দ্দার এবং এলাহাবাদের হোটেলের কর্ত্তা একই লোক এবং সে লোকটী হচ্ছেন শ্রীমান্ সোলোমন। অতি সস্তায় ভাল-ভাল খাবার বিক্রী করে হোটেলটীকে সে খদ্দেরের ভীড়ে সরগরম করে রেখেছে। লোকে

ভাবৃছে ব্যবসা করে সে কী টাকাটাই না লুট্‌ছে—দেখ্‌তে দেখ্‌তে এতগুলো বাড়ী হাঁকিয়ে ফেল্লে, অথচ টাকা রোজগার আসলে সে করৃছে লোকের মাথায় লাঠি মেরে। শুনেছি, সোলোমনের বাপ ইহুদী, মা সিংহলী,আজ পাঁচ সাত বছর সে এই কীর্ত্তি করৃছে। তার আড্ডায় আমাদের সবারই পরস্পরের দেখা হয়েছিল রাত্রের অন্ধকারে অল্প সময়ের জন্য। কাজেই কেউ কাউকে চিনৃতে পারিনি।

লোকটাকে এবারে হাতে নাতে ধরে ফেলা খুবই সোজা হয়ে পড়্‌ল। যে সব গ্রামের ওপর দিয়ে এর চলা ফেরা অভ্যাস, সে সে গ্রামের লোকেরা একে নিশ্চয়ই ভূত বলে ঠাওরে বসে আছে। কাজেই পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে বিজ্ঞাপন দিলে তারা নিশ্চয়ই খবরটা আমাদের দেবে। অথচ সে বিজ্ঞাপন সোলোমনের চোখে পড়ার কোনই সম্ভাবনা নেই, কেননা হিন্দি কাগজ সে পড়ে না।

বিজ্ঞাপন খানার জবাব দিল অনেকে, আনন্দরাম তাদের মধ্যে একজন। তারপর সে জবাব পেয়ে আমরা যে কি করৃলাম তা তো আপনি আগাগোড়া সবই জানেন!

রণজিতের মুখ দিয়া কোন কথা ফুটিল না, সে ভাবিল এই জাপানীটীর বুদ্ধির নিকট সে শিশুও নয়, শিশু বলিলেও যেন তাহাকে বাড়াইয়া বলা হয়। হুকা-কাশি একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "কিন্তু চরম আশ্চর্য্য বোধ করৃবেন আপনি তখন, যখন প্রথম দলটীর বিবরণ শুনৃবেন! কাকে আপনার সন্দেহ হয় বলুন তো?"

রণজিৎ বলিল, "কাকে আবার? গণেশ ঠাকুরকে!"

"এইটীই আপনার প্রকাণ্ড ভুল, গণেশ ঠাকুর একেবারে খাঁটী; পদ্মরাগের কিছুই জানে না, আপনার আমার মত নির্দ্দোষ। প্রকৃত অপরাধীর নাম শুনৃলে আপ্‌নি আঁৎকে উঠ্‌বেন —তিনি রাজা বাহাদুরের বড় ভাইপো,—আপনার দিবেন দা!" (ক্রমশঃ)

---

**চিত্র-পরিচয়ঃ**—ক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বা প্রিন্সিপাল হইলেন। সেই সময় একবার তিনি কার্য্যোপলক্ষে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের সাথে দেখা করিতে যান্। কার সাহেব টেবিলের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া বসিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরকে দেখিয়া পা নামান আবশ্যক বোধ করিলেন না; সেই ভাবে বসিয়াই কথা বলিতে লাগিলেন। ইহাতে বিদ্যাসাগরের আত্মসম্মানে বড় আঘাত লাগিল। মুখে তিনি কিছু বলিলেন না, কিন্তু মনে মনে ঠিক করিলেন ইহার শোধ লইতে হইবে।

ইহার কিছুদিন পরে কার সাহেবকে একবার কর্ম্মোপলক্ষে সংস্কৃত কলেজে আসিতে হইল। বিদ্যাসাগর নিজের ঘরে বসিয়াছিলেন, যেই খবর পাইলেন কার সাহেব আসিতেছেন, অমনি চটী-জুতা শুদ্ধ পা দু'খানি টেবিলের উপর তুলিয়া দিয়া কার সাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সাহেব আসিয়া বিদ্যাসাগরকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া অপমানে ফুলিতে লাগিলেন; বিদ্যাসাগর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া টেবিলে পা রাখিয়াই কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

---

# শীতের সাঁঝে

(শ্রীবিকাশ দত্ত)

শীতের সাঁঝে আগুন যখন গন্‌গনিয়ে জ্বলৃছে ঘরের মাঝ,
বাইরে তখন বন্ বন্ বন্ চ'লৃছে বেজায় ঝোড়ো হাওয়ার নাচ;
কম্‌লা দিদি জাঁকিয়ে ব'সে শোনায় ক'সে ঠাকুর মায়ের চালে,
ভূত প্রেতেরি গল্প এমন শুনিনি যা হায়রে কোনও কালে;
দাপাদাপির নাইরে কামাই মরি কিম্বা বাঁচি—
কম্‌লা দিদির গল্প শুনে হুর্‌রো হো-হো, ধেই ধেই ধেই নাচি।

কেমন ক'রে নাপ্‌তে ভায়া ভূতের পোকে লাগিয়ে দিল ধোকা—
ভাবলো দেখে আয়নাতে মুখ, 'ভূত ধরেছে'—এমনি ধেড়ে বোকা;
ভয়েতে মুখ কুঁচ্‌কে, ঘেমে, কেঁপে কেঁপেই হ'য়ে গেল সারা—
নাপ্‌তে ভায়ার গোলাম হ'ল, মজার বটে নেইক' তো আর চারা।
দাপাদাপির নাইরে কামাই মরি কিম্বা বাঁচি
কম্‌লা দিদির গল্প শুনে হুররো হো হো, ধেই ধেই ধেই নাচি।

অরুণকুমার ছুটিয়ে ঘোড়া চল্‌ল সে কোন্ আজব পুরীর পানে
কোন্ অজানা রূপকুমারীর রূপের মোহে কেউ কি তাহা জানে!
হাজার বিপদ সাম্‌নে এল, বীরের মত সকল করে জয়!
রাজকুমারীর সঙ্গে দেশে ফির্‌লো সবাই ধন্য তারে কয়।
দাপাদাপির নাইরে কামাই, মরি কিম্বা বাঁচি
কম্‌লা দিদির গল্প শুনে হুর্‌রো হো হো, ধেই ধেই ধেই নাচি।

বড়ই ভালো আলোয় আলো অবাক্-করা ফাগুন মাসের বেলা,
জ্যৈষ্ঠি মাসে আমবাগানে বেজায় রকম আনন্দেরি মেলা;

( শোন্‌রে বলি, ) শীতের দিনে ঘরের কোণে গল্প করার মতন কিছুই নয়
এম্‌নি মজার আমোদ-ভরা শীতের পালা রোজ কিরে ভাই হয় ?
দাপাদাপির নাইরে কামাই, মরি কিম্বা বাঁচি
কম্‌লা দিদির গল্প শুনে হুর্‌রো হো হো, ধেই ধেই ধেই নাচি।

# কে বেশী সুন্দর?

কে বেশী সুন্দর—এই নিয়া দু'জনে দারুণ তর্ক লাগিয়াছে। আমাদের কাছে বিচারের জন্য আসিয়াছিল, কিন্তু আমরা দু'জনার রূপেই সমান মোহিত হইয়া গিয়াছি—কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই।

ঝগ্‌ড়ার পূর্ব্বলক্ষণ দেখিতেছি !!! দেখ তোমরা যদি কেউ মীমাংসাটা করিয়া দিতে পার! বেচারারাও তবে ঝগ্‌ড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়, আমরাও আর বদ্‌নামের ভাগী হই না।

# জন্ম-দিনের উপহার

( শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায় )

নিশ্চিন্তপুরের রাজার জন্ম-দিন। অজয়গড়ের মহারাজের কাছ থেকে উপহার এল, সোনার খাঁচায় পোরা একটা জীব। লম্বায় ইঞ্চি পাঁচেক, চোখ ফোটেনি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন তখনও সম্পূর্ণ হয়নি; দেখ্‌তে যে কি রকম তা ঠিক মত বলা যায় না, তবে গিরগিটীর মত যে একটা ল্যাজ আছে তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। মহারাজ লিখেছেন—

শ্রীল শ্রীযুক্ত নিশ্চিন্তপুরের রাজা বাহাদুর সমীপেষু—

আপনার আজ জন্ম-দিন। আমার প্রিয় 'লিম্‌সিতুসুং'কে পাঠালাম। সম্প্রতি মাঞ্চুরিয়া থেকে একে আনা হয়েছে, বয়স মাত্র তিন মাস। আশাকরি এর যত্নের কোন ত্রুটি হবে না।

আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি। ইতি—

শ্রীহাতিয়ার সিং ঠন্‌ঠনিয়া।

রাজা ত' বেজায় খুসী, তাঁর চিড়িয়াখানায় নতুন ধরণের একটি জীব বাড়্‌লো বলে'। কিন্তু ভয়ও হ'ল এই ভেবে যে যদি প্রাণীটির মহাপ্রাণের কোন রকমে বিনাশ ঘটে তা' হলে ঠন্‌ঠনিয়া বাহাদুর হয়ত 'যুদ্ধং দেহি' বলে' বস্‌বেন। কারণ মহারাজ যেমন প্রতাপশালী তেমনি খেয়ালীও।

যাই হোক্, মহারাজকে শত সহস্র ধন্যবাদ জানিয়ে একখানি পত্র পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর ডাক পড়লো চিড়িয়াখানার তাদারককারী উস্কিবক্স-মিঞার। সে এসে এই অদ্ভুত জীবটিকে দেখে ত' হেসেই অস্থির। তারপর বল্লে,—"কিন্তু এ চ্যাং-চ্যুর দেশের ফ্যাং-চু মশাই কি আহার কর্ব্বেন, আমার চৌদ্দ পুরুষে ত' বাবা এ জন্তুর নামও শোনে নি!"

রাজা বল্লেন,—"তা বল্লে কি হয়! তোমার উপর যখন চিড়িয়াখানার ভার, তখন এ কি খায় না খায় সে তুমি বুঝ্‌বে।"

"যে আজ্ঞে"—বলে' উস্কি মিঞা পিছন ফিরতেই রাজা আবার বল্লেন,—'আর এই শোন, এর যত্নের যদি কোন রকম ক্রুটী হয়, আর সেজন্যে যদি এ মারা যায়, তা'হলে তোমার শাস্তিটা যে কি রকম হবে তা না বল্লেও নিশ্চয়ই বুঝতে পাচ্ছ! কারণ অযত্নে এ মরে গেলে অজয়গড়ের মহারাজের হাত থেকে নিস্তার নেই। যুদ্ধ অনিবার্য্য, আর সে যুদ্ধের জন্যে এক রকম দায়ী হবে তুমিই। অতএব বুঝে সুঝে কাজ করো।"

কথাগুলো শেষ করে' রাজা একটু মুচ্‌কে হাস্‌লেন। উস্কি তখন কাঁপছে; একবার ভাবলে, বলে—যে রইল আপনার চাকরী, এর জন্যে কি আমি শেষটায় প্রাণ দেবো! কিন্তু গলা শুকিয়ে কাঠ, একটি কথাও বেরুলো না। সে সেলাম করে' খাঁচাটা নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

* * * *

রাজার প্রকাণ্ড চিড়িয়াখানার একটা ঘরে 'লিম্‌সিতুস্থং'কে এনে রাখা হয়েছে। উস্কিমিঞার ভাবনার আর অন্ত নেই মুখের হাসি কোথায় চলে গিয়েছে। সে ভাবে, এই ছোট প্রাণীটির জন্যে হয় ত তার চাক্‌রী যাবে, প্রাণও হয়ত যেতে পারে! দুধ কলা থেকে আরম্ভ করে' ঘাস ছোলা পর্য্যন্ত সবই তাকে দিয়ে দেখা হয়েছে, লিম্‌সি সে সব ছোঁয়ওনা। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কিছু না খেয়েও লিম্‌সি শুক্লপক্ষের শশীকলার মত বেশ বেড়ে উঠতে লাগ্‌লো। একমাস পরে তার চোখ ফুট্‌লো; চোখ নয় ত যেন দুটো ফাঁপা কাঁচের মার্বেবলের মধ্যে দুটো জোনাকি পোকা! দেহটা দেখতে হয়েছে কতকটা মোরগের মত, তবে তফাৎ এই যে ল্যাজটা গিরগিটীর মত। ডাকে ফ্যা ফ্যা করে'।

কিছুদিন পরে তাকে সেই ছোট সোণার খাঁচা বদ্‌লে একটা বড় পেতলের খাঁচায় রাখা হল, কারণ ওটাতে আর তাকে ধরছিল না।

উস্কির মনে আশার সঞ্চার হয়, হয়ত লিম্‌সি শুধু হাওয়া খেয়েই বেঁচে



থাক্‌বে। কিন্তু একদিন তার চোখে পড়্‌লো, একি! লিম্‌সি যেন কেমন রোগা হ'য়ে যাচ্ছে, ল্যাজটা সরু হয়ে গেছে, গলার স্বর যেন বেরুতেই চায় না।

উস্কি ভয়ে ভাবনায় কেঁদে ফেল্‌লে। আস্‌ছে মাসে রাজা যে নিজে লিম্‌সি-তুস্থংকে দেখ্‌তে আস্‌বেন। উস্কির মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। কত রোজা, হাকিম, বদ্যি এল, মায় সুদূর সহর থেকে এক চীনা জুতোওলাকে পর্য্যন্ত আনা হ'ল, কেউ কিছুই কর্ত্তে পাল্লে না। উস্কি অস্থির হয়ে উঠ্‌লো। রাজার আসার আর সতের দিন মাত্র বাকী।

আরো পাঁচদিন গেল, লিম্‌সি একেবারে যেন কেমন হয়ে গেছে, চোখ মেলে না, ডাকে না, চুপ করে' পড়ে থাকে।

যেদিন থেকে হিসেব কর্‌লে রাজার আসার আর দশ দিন বাকী থাকে সেই দিন সন্ধ্যে বেলায় উস্কির এক চাকর দেখ্‌লে যে, লিম্‌সি তার চোখ দুটো অল্প একটু ফাঁক করে' সাপের মত সরু জিভটা দিয়ে কি একটা কালো টুক্‌রো খুব আগ্রহের সঙ্গে চেটে চেটে খাচ্ছে। চাকরটার খুব কৌতুহল হ'ল। সে কল্লে কি, একটা বড় চিম্‌টে দিয়ে সেই টুক্‌রোটা বার করে' নিলে। আলোতে ধরে' দেখ্‌লে—এক টুক্‌রো কয়লা। চিড়িয়াখানা দেখ্‌তে কত লোকই ত আসে, তাদের মধ্যে হয় ত কেউ ওকে জাগাবার জন্যে ওটা ছুঁড়ে মেরেছিল। সে খাঁচার মধ্যে কয়লার টুক্‌রোটা আবার ঢুকিয়ে দিলে;—লিম্‌সিও আবার সেটা চাট্‌তে সুরু করে' দিলে। চাকরটা ভাব্‌লো, এত মন্দ নয়! সে অবাক্‌ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে, লিম্‌সি চেটে চেটে কয়লাটার অনেক খানি খেয়ে ফেলেছে। সে তখন আরো গোটাকতক কয়লার টুক্‌রো এনে খাঁচার মধ্যে পুরে দিয়ে চলে গেল।

পরদিন খুব ভোরে উঠে চাকরটা লিম্‌সির খাঁচার কাছে গিয়ে দেখ্‌লে, সেটা বেশ নড়ে' চড়ে' বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে ডাক্‌ছেও। যেন তার ভারী স্ফূর্ত্তি হয়েছে। সে দৌড়ে গিয়ে উস্কি মিঞার ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাকে সব কথা বল্লে।

মিঞা সাহেব ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে দেখ্‌লে,—সত্যিই ত, লিম্‌সির সব অসুখ সেরে গেছে। খুব খুশী হয়ে উস্কি মিঞা চাকরকে দশটাকা বখশিস্‌ দিয়ে দিলে।

এদিকে কয়লা খেয়ে খেয়ে লিম্‌সি বেশ সবল হয়ে উঠ্‌লো। দেখতে দেখতে সে দারুণ বেড়ে উঠ্‌লো—সেকালে যেমন মন্ত্রবলে হত না তেমনি। রাজা এসে দেখ্‌লেন লিম্‌সি বেশ ভালই আছে। সন্তুষ্ট হ'য়ে উস্কি মিঞার কুড়ি টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলেন।

* * * *

ছ'মাস পরে দেখা গেল, লিম্‌সিকে আর ও খাঁচায় কুলোচ্ছে না। ল্যাজটা গরাদের ফাঁক দিয়ে বাইরে বেড়িয়ে পড়ে, ডানা দুটো সর্ব্বদা কুঁচকিয়ে রাখে, স্থানাভাবে মেল্‌তে পায় না। গলার স্বর ভারী কর্কশ, আর পাঁচসের কয়লার কমে ওর পেট ভরে না। করাতের মত দাঁত দিয়ে গরাদ কেটে ফেল্‌বার চেষ্টা করতেও কসুর করে না; কেউ কাছে গেলে তেড়ে তেড়ে কাম্‌ড়াতে আসে।

মোটা মোটা গরাদ দেওয়া একটা প্রকাণ্ড লোহার খাঁচায় তাকে রাখা হ'ল। বড় খাঁচায় এসে লিম্‌সির ভারী স্ফূর্ত্তি! সর্ব্বদা ডানা মেলে আনন্দে ভীষণ চীৎকার করে,—সে ডাক শুনে বুড়োদেরও বুক কেঁপে উঠে। তার খাবার অর্থাৎ কয়লা দেবার সময় তেড়ে আসে, সাপের মত চেরা জিভ্‌ লক্‌ লক্‌ করে' ওঠে। ল্যাজের ডগাটা যেন রাস্তা খোঁড়ার গাঁতি, গরাদগুলো তার ঘা খেয়ে খেয়ে বেঁকে তুবড়ে যায়। তার নিঃশ্বাস যেন আগুনের হল্কা! লিম্‌সির কি ভীষণ পরিবর্ত্তন হয়েছে।

এবারে আর খাঁচা নয়। পাথরে গাঁথা একখানা ঘর তৈরী হ'ল তার জন্যে। ছাদের ওপর দিয়ে ঘরের মধ্যে কয়লা ঢেলে দেবার বন্দবস্ত করা হ'ল। বস্তা বস্তা কয়লা উড়ে যায়; দেখ্‌তে দেখ্‌তে লিম্‌সী যেন একটা হাতী হয়ে দাঁড়াল।

তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল, লিম্‌সি ভয়ানক চীৎকার কর্চ্ছে, আর তার মুখ দিয়ে লক্‌ লক্‌ করে' বেরুচ্ছে আগুনের শিখা। পাথরের দেওয়াল, মেঝে



সব কালো হ'য়ে উঠেছে। ওপর দিয়ে কয়লা ঢেলে দিতেই, কয়লাগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেল। লিম্‌সির চীৎকারেরও বিরাম নেই, আগুনও আর নেভে না। মহা মুস্কিল! উস্কি মিঞা পাগলের মত ছুটাছুটি কর্ত্তে লাগ্‌ল, কি করে' লিম্‌সিকে সে শান্ত কর্ব্বে, কি করে' আগুন থামাবে! শেষে রাজার কাছে খবর গেল। রাজা ঘোষণা কর্ল্লেন—যে লিম্‌সিকে ঠাণ্ডা কর্ত্তে পার্ব্বে—তাকে তিনি হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন।

কত লোক এসে চেষ্টা কর্ল্লে, কেউ তাকে শান্ত কর্ত্তে পারল না। শেষে একটি বারো বছরের ছেলে বল্লে, "আমি ওকে ঠাণ্ডা করব, শুধু আমার একটা জিনিষ চাই, সেটা হচ্ছে একখানা আর্শি।" সকলে ত' হেসেই অস্থির। এক রত্তি ছেলে কর্ব্বে কিনা সেই কাজ, যা পার্ল্লে না এত বড় বড় লোকগুলো! রাজা বল্লেন, "বেশ, তোমাকে আর্শি আনিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তুমি চেষ্টা করে' দেখো।" আর্শি আনা হ'ল। ছেলেটি কর্ল্লে কি, সেই আর্শিটা একটা দড়ী দিয়ে বেঁধে ছাদের ওপরের গর্ত্তটা দিয়ে ঘরের মধ্যে নামিয়ে দিলে। আর যায় কোথা!

আর্শিটার দিকে তেড়ে আসতেই লিম্‌সি দেখলে, তার ভিতর এক বিরাটাকার মূর্ত্তি—যেন তাকে গিলতে আস্‌ছে। সে গেল ভড়কে। ভয়ে দু' একবার চীৎকার করে উঠতেই আর্শির গায়ে আগুনের হল্কা চক্‌ চক্‌ করে উঠল। লিম্‌সি চোখ দুটো বুজে ঘরের একটা কোণে গিয়ে লুকোল।

---

# মণীন্দ্রচন্দ্র ও ললিতকুমার

রামধনুর পাঠক-পাঠিকারা, অল্প কিছুদিন হইল পর পর তোমরা বাংলা দেশের খুব বড় বড় দুই জন লোককে হারাইয়াছ। এক জন মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, অপর জন অধ্যাপক ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

মণীন্দ্রচন্দ্র ছিলেন **কাশিম-বাজারের** মহারাজ, কিন্তু মহারাজ বলিয়া আজ বাংলা দেশ তাঁর জন্য কাঁদিতেছে না। মহারাজ বাংলা দেশে অনেক আছেন, হইবেনও অনেক, কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্র বাংলার মাত্র একটীই। তিনি ছিলেন কলিযুগের দাতাকর্ণ। তাঁর দানের বহর শুনিলে তোমরা স্তম্ভিত হইয়া যাইবে—হাজার নয়, লক্ষ নয়, কোটী টাকা তিনি এক জীবনে দান করিয়া গিয়াছেন। এই টাকা দিতে অনেক সময় তাঁর কষ্ট হইয়াছে, ধার করিতে হইয়াছে, কিন্তু মুখের সেই মধুর হাসিটী বজায় রাখিয়া টাকা তিনি ঢালিয়াই গিয়াছেন, নিজের সুখের দিকে তাকান নাই মানুষ না দেবতা? লেখা-পড়া শিখাইবার জন্য দেশে স্কুল-কলেজ তৈরি করিতে হইবে, কিম্বা কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িতে হইবে, না খাইতে পাইয়া লোকে কষ্ট পাইতেছে, কোন ভাবনা নাই—সটান কাশিম বাজারে চলিয়া যাও, দেখিবে সেখানে একটী টাকার গাছ রহিয়াছে, নীচু হইতে চাহিলেই টাকা পড়ে। দেশের দুর্ভাগ্য সে গাছটী আজ ঝড়ে চিরদিনের জন্য পড়িয়া গেল।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র



অধ্যাপক ললিতকুমারও বাংলা দেশকে অনেক দিয়াছেন, তবে সে টাকা-

অধ্যাপক ললিতকুমার

কড়ি নয়, অন্য জিনিষ।

ইনি ছিলেন কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেসার। ছাত্র-জীবনেও যেমন ছিলেন বিশ্ববিত্থালয়ের একটী 'বাঘা' ছেলে, প্রোফেসার হইয়াও তেমনি পাণ্ডিত্যের জন্য বাংলা-জোড়া নাম কিনিয়াছিলেন। কিন্তু বড় পণ্ডিত হিসাবেই শুধু ললিতকুমারের পরিচয় নয়, তিনি জীবনে আরও একটা বড় কাজ করিয়াছেন।

আমাদের বাঙ্গালী-জাত বড় গরীবের জাত; জীবনে দুঃখ-কষ্ট তাদের এত বেশী যে বেচারারা কখনো প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারে না। এই অভাগাদের মুখে ললিতকুমার হাসি ফুটাইয়াছিলেন। তাঁর লেখা পড়িয়া লোকে হাসিয়া আকুল হইত। তোমরা বড় হইয়া তাঁর 'ফোয়ারা', 'পাগ্‌লাঝোরা', 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা' প্রভৃতি পড়িয়া দেখিও, কত মজার মজার কথা তাতে লেখা আছে। নিতান্ত শিশুদেরও তিনি হাসাইতে ছাড়েন নাই—তাদের জন্যও 'আহ্লাদে আটখানা,' প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন।

---

# কষ্টি-পাথর

[ পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর ]

হেল্‌ষ্টন্‌লি সহরে লণ্ডনের খুব বড় এক সওদাগরী অফিসের একটা শাখা ছিল, মিষ্টার চ্যানিং ছিলেন তারই ভার-প্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মচারী। এ দানিকে অসুখ খুব বাড়িয়া পড়ায় তিনি আর কাজে যাইতে পারিতেন না, বড় ছেলে হামিশই বাপের হইয়া অফিসের কাজ-কর্ম্ম সব দেখাশুনা করিত। এই ব্যবস্থায় কাজ বেশ ভালই চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া কর্ত্তারা মিষ্টার চ্যানিংকে তাঁর পুরা মাইনাটাই দিতেন, মিষ্টার চ্যানিংকে তাঁর চরিত্রগুণে তাঁরাও খুব শ্রদ্ধা করিতেন কিনা!

কিন্তু শুধু সওদাগরী অফিসের এই মাইনাটার উপরই এত দিন তিনি ভরসা করিয়া থাকেন নাই। আগেই বলিয়াছি যে মকর্দ্দমার সম্পত্তিটা আসলে ছিল যথার্থ তাঁরই, অনেক দিন হইতেই এটা যে তিনি ফিরিয়া পাইবেন এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। এবং এই জন্য আপাততঃ খরচ চালাইবার উদ্দেশ্যে তিনি কিছু দেনাও করিয়া ফেলিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, মকর্দ্দমার শেষে টাকাটা হাতে আসিলে, পরে আস্তে আস্তে সে দেনা মিটাইয়া ফেলিলেই সব



চুকিয়া যাইবে। কিন্তু অদৃষ্ট যখন বাঁকিয়া বসিল, তখন তিনি নিজেও দমিলেন না, নিজের ছেলেপেলেদেরও দমিতে দিলেন না। বলিলেন, "দেখ বাছারা, দুঃখ জিনিষটা দুরকমের—একরকম আসে আমাদের নিজেদেরই পাপের জন্যে, আর একরকম ভগবান্ পাঠিয়ে দেন, আমরা খাঁটী মানুষ কিনা সেইটে দেখ্‌বার জন্যে। এ টাকাটা পেলে অবশ্য তোমাদের খুবই সুবিধে হোতো, কিন্তু পেলে না বলেও হতাশ হয়ে পড়্‌বার কিছুই নেই। ভগবান্ তোমাদের হাত-পা দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন, আবার কি চাই? দোকান-টোকানে অবশ্য আমাদের কিছু ধার হয়ে পড়েছে,—তা' হ'য়েছে, কি আর করা যাবে?"

আর্থার বলিল, "সে আমরা কোন রকমে শুধ্‌রে নেব, বাবা!"

সব ভাইবোনেরা মিলিয়া তখন ব্যাপারটাকে নিয়া পরামর্শ করিবার জন্য তাদের বাপ-মার ঘর ছাড়িয়া ছেলেদের পড়ার ঘরে গিয়া ঢুকিল। কেবল এনাবেলকে তার দুষ্টামী আর ফড়ফড়ানির জন্য সেখানে যাইতে দেওয়া হইল না!

সকলে সেখানে গিয়া বসিলে হামিশ বলিল, "বাবা যে বলেছেন সে কথাটা ঠিক, আর কিছু না হোক্, একটা ভাবনার বোঝা যে কাঁধ থেকে নেমে গেল সেটা সত্যি। এখন থেকে আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে যে, জীবনে যা কিছু উন্নতি সে আমাদের নিজেদেরই চেষ্টা করে, করে নিতে হবে—কোন টাকার ওপর ভরসা করে আর থাকা চল্‌বে না।"

কন্‌স্ট্যান্‌স্ বলিল, "কিছুদিন ধরে আমার মনে কেন জানি না, কেবলই একটা ভয় হচ্ছিল যে হয়তো মকর্দ্দমায় আমরা হেরে যাব। কাজেই এ বিষয়ে আমি খানিকটা ভেবেও রেখেছি। প্রথম কথা হচ্ছে, এতে আমাদের আয় কমে যাবে।"

টম্ এতক্ষণ রাগে ফুলিতেছিল, এইবার বলিয়া উঠিল, "বাঃ, ওরা কি বাবার মাইনের ওপরও হাত দিতে চায় নাকি? সথখানা দেখ না একবার?"

"তা নয় টম্, বুঝ্‌ছ না, দোকানে আমাদের ধার হয়ে পড়েছে, প্রত্যেক মাসে কিছু কিছু করে সেটা শোধ দিতে হবে তো? তা' হলেই আয় কমে গেল না? তা যাক্, সে ভাবনা তোমার, চার্লির কিম্বা এনাবেলের ভাব্‌তে হবে না, তুমি এখন প্রাণপণে চেষ্টা কর কিসে স্কুলের 'সিনিয়র' হতে পার। এই হার হওয়াতে সব চেয়ে যার বেশী ক্ষতি হবে, সে হচ্ছে আর্থার।"

আর্থার চুপ করিয়া বসিয়া সকলের কথা শুনিতেছিল। স্বভাবটী তার বড়ই নরম, বেশী কথা বলা তার অভ্যাস নয়। গ্যাল্‌-ওয়ে নামে এক এটর্ণীর আফিসে সে খুব অল্প মাইনায় কেরাণীর কাজ করিত। (এই এটর্ণীটী আবার ছিলেন গীর্জ্জারই এক কর্ম্মচারী) ঠিক

ছিল মকর্দ্দমার টাকাটা হাতে আসিলেই আর্থার কিছু টাকা দিয়া সেই এটর্ণী আফিসেই শিক্ষানবিশের কাজে ভর্ত্তি হইবে, এবং কিছুদিন বাদে নিজেই এটর্ণী হইয়া বাহির হইবে। কিন্তু সে টাকাতো আর পাওয়া গেল না! হামিশ তাই বলিল, "তাইতো, কন্‌সট্যান্‌স ঠিক কথাই বলেছে—তোমার এখন কি উপায় হবে আর্থার?"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া আর্থার বলিল, "উপায়? উপায়তো কিছুই দেখছি না ভাই, মাছিমারা কেরাণী হয়েই আমার জীবন কাটাতে হবে।"

টম্ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "কি বল্লে? কি বল্লে? ঐ জেঙ্কিন বুড়োর ছেলের সাথে একত্র হয়ে কেরাণীগিরি কর্‌বে আর্থার চ্যানিং? আর তাই দেখে রোল্যাণ্ড্ ইয়র্ক দিনে তিনবার করে নাক সিঁট্‌কাবে—এখনি তার নাক সিঁটকানির চোটে অস্থির!"

আর্থারের সুন্দর মুখখানা লজ্জায় লাল টক্‌টকে হইয়া উঠিল, সে যে চ্যানিং-পরিবারের ছেলে, এ গর্ব্ব তার বরাবরই ছিল। কিন্তু সে ঠিক করিল, নাঃ কিছুতেই সে পিছাইবে না। প্রকাশ্যে বলিল, "টম্ আমরা কেবল স্বার্থপরের মত আমাদের নিজেদের ভাবনাই ভাব্‌ছি, এদিকে বাবার যে অসুখ সারাতে জার্ম্মেণী যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, সেটা কেউ মনেই আন্‌ছি না।

কথাটা একটু বুঝাইয়া বলা দরকার। এক বড় ডাক্তার বলিয়াছিলেন যে জার্ম্মেণীর কোন জায়গায় যদি মিষ্টার চ্যানিং গিয়া কিছুদিন স্নান করিয়া আসিতে পারেন, তবে তাঁর বাত সারিয়া যাইবার খুবই সম্ভাবনা। এই জন্য ঠিক ছিল মকর্দ্দমার সম্পত্তিটা হাতে আসিলেই সেই টাকায় তিনি জার্ম্মেণীতে গিয়া রোগ সারাইয়া আসিবেন। এখন মাম্‌লায় হার হওয়ায় সেটাও বন্ধ হইয়া গেল।

টম্ লজ্জিত হইয়া বলিল, "তুমি জান না আর্থার, যদি পারতাম তো বাবাকে আমি কাঁধে করে জার্ম্মেণীতে গিয়ে হাজির হতাম?"

কন্‌সট্যান্‌স কহিল, "তোমার কাঁধে করে নিয়ে যাওয়াটা যখন সম্ভব নয় টম্, তখন সে কথা ভেবেও কোন ফল নেই। তুমি, চার্লি আর এনাবেল একটু বেশী করে মন দিয়ে পড়াশুনা ক'রো, তা হলেই চল্‌বে। যা করার, তা কর্‌ব—হামিশ, আর্থার আর আমি।"

"তুমি? তুমি আবার কি কর্‌বে কন্‌সট্যান্‌স্?"

কন্‌সট্যান্‌সের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে সে বলিল, "ভাব্‌ছি, কোন বাড়ীতে গভর্ণেসের * কাজ নেব।"

* অবস্থাপন্ন সাহেবেরা ছেলেমেয়েদের জন্য 'গভর্ণেস' রাখে—ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখান, আদব-কায়দা দুরস্ত করা, তত্ত্বাবধান করা—এই সব হইল গভর্ণেস্‌দের কাজ।



এইবার টম্ রাগে একেবারে পাগল হইয়া উঠিল, আর্থারেরও গর্ব্বে ঘা পড়িল। টম্ বলিল, "গভর্ণেস? সেতো দাসীচাকরাণীর সামিল। মিস্ চ্যানিংয়ের উপযুক্ত কাজই বটে! আর তা ছাড়া মা-ই বা একথা শুনে কি বল্‌লেন?"

"মা জানেন। একটু আগেই বলেছি না যে মকর্দ্দমায় হার হওয়ার ভয়টা কিছুদিন থেকে আমি করে আসছিলাম—তখন মার সাথে এ সব কথাও হয়েছে; এবং মায়ের বুদ্ধি-বিবেচনাটা তাঁর টম্ ছেলেটীর চেয়ে একটু বেশী কিনা, তাই তিনি কোন আপত্তিই করেন নাই।" বলিয়া কন্‌স্‌ট্যান্‌স্ টমের দিকে চাহিয়া সস্নেহে একটু হাসিল।

হামিশ বলিল, "কন্‌স্‌ট্যান্‌সের গভর্ণেসের কাজ নেওয়ায় আমিও কোন আপত্তি দেখি না। সে ভদ্রলোকের মেয়ে, লোকের বাড়ীতে গিয়ে যদি সে বাসন মাজ্‌তেও আরম্ভ করে, তবুও ভদ্রলোকের মেয়েই সে থাক্‌বে। সে জন্য লোকে কিছু মনে কর্‌বে না। একমাত্র ভাবনা হচ্ছে—উইলিয়ম্ ইয়র্ক আবার এতে কোন আপত্তি না ক'রে বসে!"

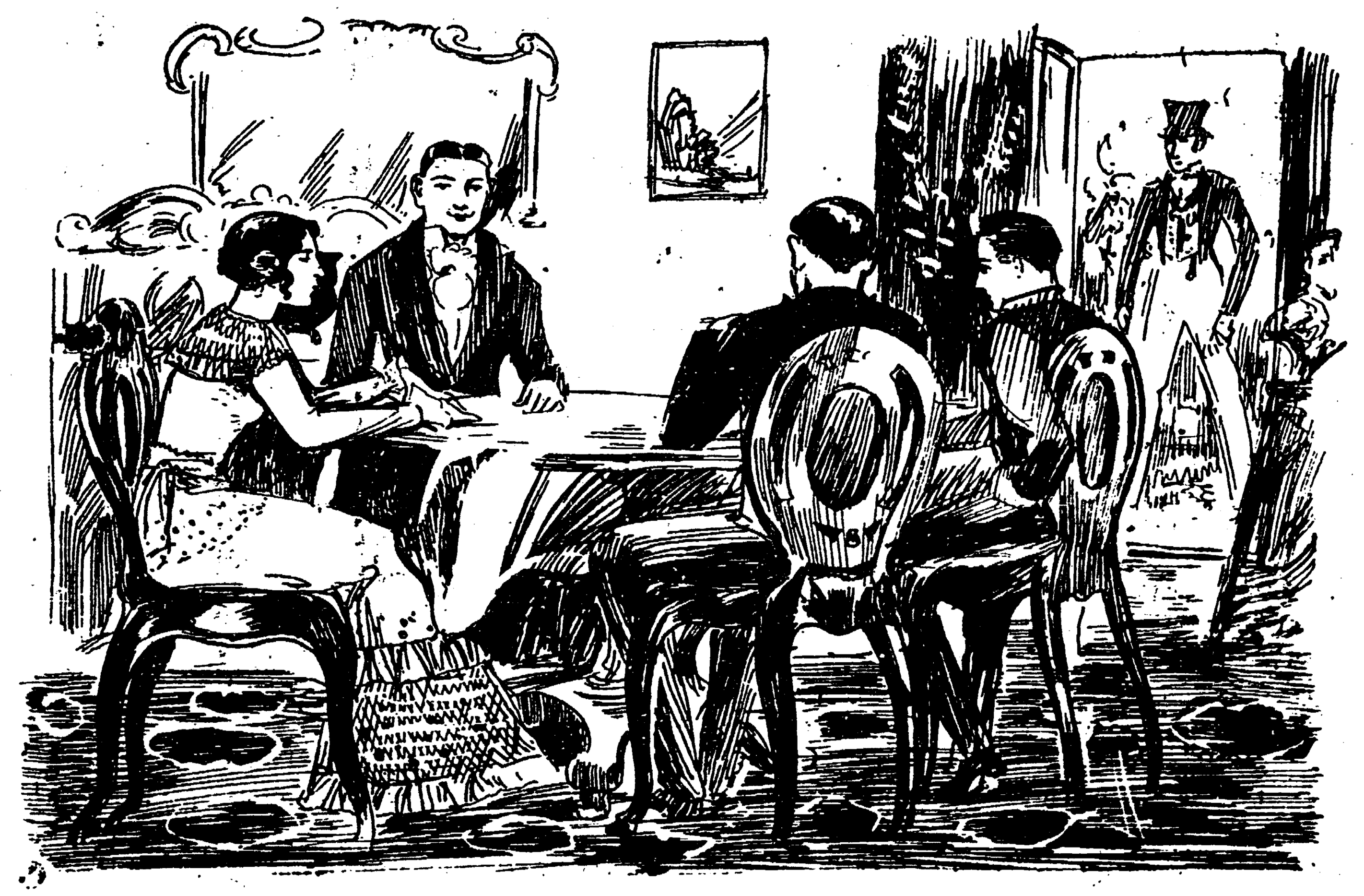

ভাইবোনেরা পরামর্শে ব্যস্ত।

এই শেষের কথাটীতে কন্‌স্‌ট্যান্‌স্ বড়ই লজ্জা পাইল, তার চোখ-মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিবার জন্য সে বলিল, "আহা, থাম না হামিশ! টম্ কাল খবর নিও তো, হেলষ্টন্‌লি সহরে কারো গভর্ণেসের দরকার আছে নাকি?"

এমন সময়ে জানালার ওধার হইতে কে একজন হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, "আমি সব শুনেছি মশাইরা, আমি সব শুনেছি! রাখ্‌বে আর আমায় বাইরে আট্‌কে? —আর্থার মাছিমারা কেরাণী কেরাণীই থাক্‌বে, কন্‌স্‌ট্যান্স্‌ গভর্ণেস্‌ হবে, আর টম্‌ যদি নিজের চেষ্টায় 'সিনিয়র' না হ'তে পারে, তবে সে ইস্কুলের ঘণ্টা বাজাবে, নইলে বাবা আর তাকে টাকা পয়সা খরচ করে কলেজে পাঠাতে পার্‌বেন না। সকলে চমকিয়া ফিরিয়া দেখে—লক্ষীর অবতার, কুমারী শ্রীমতী এনাবেল।

তার দাদারা ছুটিয়া তাহাকে ধরিতে যাইবে, ঠিক এম্‌নি সময় সে ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন মিষ্টার উইলিয়ম ইয়র্ক। ভদ্রলোকটীর সাথে প্রথম পরিচ্ছেদেই তোমাদের পরিচয় করাইয়া দিয়াছি—সেই যুবা-বয়সী পাদ্রীটী। পাদ্রীর কাজে এখনও মাইনাটা তাঁর তেমন সুবিধার হয় নাই, সেটা একটু বাড়িলেই তিনি খরচ-পত্র চালাইয়া উঠিতে পারিবেন, এবং তখন তাঁর সাথে কন্‌স্‌ট্যান্সের বিবাহ হইবে, এই রকম ঠিক হইয়া আছে।

ঘরে ঢুকিয়াই উইলিয়ম্‌ ইয়র্ক্‌ বলিলেন, "জুডি বল্লে, সবাই নাকি এ ঘরে, তাই বরাবর এখানেই চলে এলাম। কি বলে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে?"

জবাব দিল হামিশ, বলিল, "হুঁ, মকর্দ্দমা শেষ হয়ে গেছে—আমরা হেরে গেছি।" তার সে কথাটা আরো একটু সম্পূর্ণ করিয়া দিল এনাবেল, বলিল, "এবং কন্‌স্‌ট্যান্স্‌ কোন বাড়ীতে গভর্ণেসের কাজ নেবে, আর্থার জেঙ্কিন বুড়োর ছেলের সাথে একত্র মাছি মার্‌বে, আর টম্‌ কোন জায়গায় ঘণ্টা বাজাবার লোক দরকার হলে তারই জন্যে দরখাস্ত কর্‌বার মৎলবে আছে।"

এনাবেলের কথা তো! তাই মিষ্টার ইয়র্ক ঠাট্টার ভাবেই কথাটা নিলেন, কিন্তু কন্‌স্‌ট্যান্স্‌ বেশ লক্ষ্য করিল মিষ্টার ইয়র্কের মুখটা যেন একটু লাল হইয়া উঠিয়াছে। আলোচনা ঘুরাইয়া ফেলিবার জন্য তিনি বলিলেন "তারপর চার্লি, সারপ্লিসে কে কালী ঢেলেছে ধরা পড়্‌ল? শুন্‌লাম তুমি নাকি ভেতরের খবর কিছু কিছু জান?"

চার্লি যেন একটু ভড়কাইয়া গেল দেখিয়া টম্‌ বলিল, "না মিষ্টার ইয়র্ক, ও কথা আর ওকে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না। আমার সাম্‌নে কোন কথা বলে ফেল্লেই মুস্কিল—আমাকে তা হেড্‌মাষ্টারের কাছে বল্‌তেই হবে—আর তা হলেই ইস্কুলের ছেলেরা চাঁটিসে ওর মাথাটা উড়িয়ে দিবে।

(ক্রমশঃ)

## বৃক্ষ ও কুঠার

(এ, করিম।)

কাঁদিয়া বলিছে বৃক্ষ কুঠারের তরে।
'কি দোষেতে কাট ভাই আজি তুমি মোরে?
পাষাণ তোমার হিয়া, নাহি দয়া লেশ,
তাই সে কাটিয়া মোরে করিতেছ শেষ।
ভাবনা নাহিকো ছিল আমার অন্তরে।
যতনে দিতাম কোল আশ্রিত জনেরে।
হঠাৎ হইলে শত্রু আজি তুমি মোর,
বড়ই হিংসুক তুমি হৃদয় কঠোর।'
কুঠার বলিল 'তরু, কেন কর রোষ?
জ্ঞাতি-ভাই অরি তব মোর কিবা দোষ?
না থাকিলে মোর সাথে তোমার গিয়াতি,
কাটিবারে নাহি ছিল আমার শকতি।'

## হাসির টুক্‌রা

(মনীষা সেন, গৌহাটী)

কর্ত্তা ভুতোকে বল্লেন—গ্যাখ, জুতোযোড়া মুচির কাছে নিয়ে যা সারাতে। মুচি যত তার চেয়ে চার আনা কম বলিস্‌।

আধ ঘণ্টা পর ভুতো জুতোযোড়া যেমন তেমনি ফিরিয়ে নিয়ে এল। বাবু বল্লেন—মুচি পেলিনে ?

ভুতো বল্লে—সে দু আনা চেয়েছে। কি কর্‌ব তাই শুন্‌তে এসেছি।

---

## ছোট্ট সাথী

( কুমারী উষারাণী দেবী, পিরোজপুর )

সকাল-সাঁঝে হাসতো মিনু নোলক-পরা মুখে ;
ছোট্ট প্রাণের ছোট্ট সাথী ছিল আমার বুকে।
কপাল ছেয়ে পড়্‌তো বেয়ে কোঁক্‌ড়ানো তার চুল ;
দুল্ দুল্ দুল্ সমীর ভরে দুল্‌ত কানে দুল্।
কচি কচি হাত দুখানা বাড়া'য়ে মোর পানে ;
ডাক্‌তো মোরে আকুল করা মৃদু মধুর গানে।
স্থির নয়নে থাক্‌তো চেয়ে মুখের পরে মোর
ছল্ ছল্ তার আঁখির কোণে ফুট্‌তো স্বপন-ঘোর
ঢল্ ঢল্ সেই ছবিখানি লাগ্‌তো আমার ভালো,
সে যে আমার ছোট্ট সাথী আঁধার বুকে আলো!
হাস্‌তো যখন বিজ্‌লী যেন যেত চমক দিয়ে ;
থাক্‌তো মিনু আমার সনে পুতুল খেলা নিয়ে।
আঁচল ভরে ফুল তুলেগো গাঁথ্‌তো বসে মালা,
পরিয়ে দিত আমার গলে মুচ্‌কি হেসে বালা।
কাজল-চোখে কেমন শোভা ফুট্‌তো মুখে তার ;
আজ সে গেছে কোথায় চলে ? কোন্ সুদূরের পার ?
প্রাণ-বোঁটাতে ফুটেছিল স্বপন দেশের রাণী ;
কে নিলোগো ছিঁড়ে এমন কাঁদা'য়ে প্রাণখানি ?
কোন্ অজানা দেশের পানে আজ গেল সে ছুটে ?
কে আজ ওগো এমন করে নিলে গো তায় লুটে ?



নিরাশ প্রাণে কাটিয়ে দিছি কত দিবস রাতি ;
কোথায় আমার বুকভরা ধন ছোট্ট প্রিয় সাথী ?

---

## রঙ্গকণা

( শ্রীরামেন্দুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, টিকাটুলি, ঢাকা )

পথিক—ওহে ছোক্‌রা, এই পুকুরটায় কত জল আছে বল্‌তে পার ?

বালক—বেশী নয় মশাই। দেখ্‌ছেন না ঐ হাঁসগুলোর পা পর্য্যন্ত ডুবেছে!

* * *

রমেশ—( মুমূর্ষু রোগীর প্রতি ) একবার কালী বলুন।

রোগী—অ—ত—ক—থা—ব—ল্—তে—পা—র্—বো—না—বা—বা।

---

## মজার অঙ্ক

( শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ গুহ রায়, গোয়ালপাড়া )

পরীক্ষার পর আবার আমাদের বৈঠক বসিয়াছে, উপস্থিত বন্ধুগণ সকলেই ভানু ও ভবতোষের তারিফ্ করিতেছে—কেহ বলিতেছে এবার ভবতোষ পরীক্ষায় খাসা নম্বর পাবে, আবার কেহ তাহাকে ধমকাইয়া বলিয়া উঠিতেছে—"যা যা ভানুকে defeat করা বড় সোজা নয়, বিশেষতঃ অঙ্কে! সেদিন যে একটি মজার অঙ্ক বলে দিয়েছিল মনে আছে ?"

ভানুকে এত প্রশংসাবাদ প্রদান করিতে দেখিয়া আমি কিঞ্চিৎ ঈর্ষাবশতঃ বলিয়া ফেলিলাম,—"আমিও অমন ঢের ঢের মজার অঙ্ক বল্‌তে পারি!"

আমার কথা শুনিয়া বিধু কিঞ্চিৎ রাগান্বিত হইয়া বলিল—"একটা মজার অঙ্ক কই বল্‌ত দেখি! বড় যে লম্বা চওড়া কথা বলিস্!" বিধুর কথা শেষ হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই মণ্ট, যেন কি বলিতে যাইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

আমি বিধুর কথার উত্তরে একটু নম্র সুরে বলিলাম—"রাগ করিস কেন! আমি যা বলি তা একবার করেই দেখ্ না!"

"আচ্ছা বল্!" : বিধুর নরম সুরে কথা কয়টি বলিল।

আমি বলিলাম—"প্রথমে তুই দু'টি সংখ্যা মনে কর্বি ; সংখ্যা দুটি যেমন তেমন হলেই কিন্তু চল্‌বে না, আগেই বলে রাখ্‌ছি! প্রথম সংখ্যাটি যদি হয় ৭, তবে দ্বিতীয় সংখ্যাটি হবে ৯ অর্থাৎ প্রথম সংখ্যাটি থেকে দ্বিতীয় সংখ্যাটি হ'বে দুই বেশী।"

আমার কথা শেষ না হইতেই বিধু বলিয়া উঠিল—"বেশ তা যেন হ'ল। এর পর এ-দুটি সংখ্যার কি কর্ত্তে হবে?"

আমি বলিলাম—"বিশেষ কিছু কর্ত্তে হ'বে না, শুধু দু'টি সংখ্যারই প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে Squire কর্ত্তে হ'বে। তারপর, যে দু'টি ফল হ'বে ; তার মধ্যে যেটি ছোট সংখ্যা হ'বে তাকে বড় সংখ্যাটি থেকে বিয়োগ দিতে হবে।"

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বিধু বলিল—'হাঁ হয়েছে।'

আমি বলিলাম—"এখন তবে উত্তরটা বল!"

বিধু বলিল—"২৮ হয়েছে।"

আমি বলিলাম—"তবে তুই ৬ ও ৮ মনে করেছিলি, কেমন?"

বিধু মাথা নাড়িয়া বলিল—"হাঁ ঠিক বলেছিস্।"

"কেমন ক'রে উত্তরটা বের করলি বল্‌ত?" এই প্রশ্ন করিয়া মণ্টু আমার নিকট সরিয়া আসিল।

আমি তাহার দিকে চাহিয়া একটু গর্ব্বভরে বলিলাম—"বিধুর উত্তর হ'য়েছিল কত?—২৮ ত! বেশ! আমি ২৮কে প্রথমে ৪ দিয়ে ভাগ করি, তাতে ফল দাঁড়ায় ৭। তারপর এই সাতের সঙ্গে ১ যোগ দিয়ে এক ফল পাই ৮। আবার ৭এর থেকে ১ বিয়োগ দিয়ে আর এক ফল পাই ৬। এই রকমে প্রত্যেক ফলকেই প্রথমে চার দিয়ে ভাগ ক'রে তারপর ভাগফলের সঙ্গে একবার ১ যোগ, আর একবার ১ বিয়োগ দিয়ে মনে-করা সংখ্যাদুটি বের কর্ত্তে হয়।"

তারপর আমাদের বৈঠকে অনেক কথাবার্ত্তা হয় ; এ সমস্ত কথা রামধনুর পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট বলার কোন প্রয়োজন নাই। শুধু এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে সেদিন সম্পূর্ণ তিন ঘণ্টাকাল বৈঠক বেশ সরগরম ছিল।

---

## অদ্ভুত বন্ধুত্ব

বিড়াল আর পাখীর মধ্যে চিরকালের শত্রুতা। পাখী দেখিলেই বিড়াল তাহাকে মারিয়া খাইয়া ফেলে ইহাই আমরা জানি, কিন্তু ছবিতে দেখ একটি বিড়াল ও একটি টিয়াপাখী কেমন পরম বন্ধুর মত পাশাপাশি বসিয়া আছে। উভয়ে অদ্ভুত ভয়ানক ভাব হইয়া গিয়াছে ; কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া একদণ্ড থাকিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে যে একটা খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ আছে তাহ যেন ইহারা একদম ভুলিয়া গিয়াছে।

অদ্ভুত বন্ধুত্ব

## তিনশ' বছরের ঘড়ী

আইল অব ম্যান নামক দ্বীপের একটা দুর্গে 'কুইন এলিজাবেথ' নামে একটা পুরাণো ঘড়ী আছে। ঘড়ীটা ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের উপহার। তখন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত এই ঘড়িটি সমানে ঠিক ঠিক সময় দিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি কয়েক দিন হইল সেটাকে সারানো আরম্ভ হইয়াছে।

## নূতন আমীর

খবরের কাগজে তোমরা বোধ হয় পড়িয়াছ যে সেনাপতি নাদির খান্ বাচ্চাকে হারাইয়া কাবুলের তক্ত দখল করিয়াছেন। এঁর নাকি নিজের রাজা হওয়ার ইচ্ছা ছিল না, লোকের পীড়াপীড়িতেই সিংহাসনে বসিয়াছেন বাচ্চা তার দুষ্কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে নিজের প্রাণ দিয়া। বাচ্চাকে প্রাণে মারা নাকি নাদির খানের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাঁর সৈন্য-সামন্তেরা উত্তেজিত হইয়া এই কাজটী করিয়াছে।

নূতন আমীর আমানুল্লার বন্ধুলোক। বহুদিন তিনি ইয়োরোপে থাকিয়া সভ্য জাতিদের হাল-চাল লক্ষ্য করিয়াছেন। আশা করা যায় এঁর আমলে আফ্‌গানিস্থানের অনেক উন্নতি হইবে।

নূতন আমীর নাদিরখান্

## মাথায় ক'গাছা চুল

আমাদের দেশে একটা আশীর্ব্বাদের চলন আছে—"আমার মাথায় যত চুল তোর তত পরমায়ু হোক্"। আশীর্ব্বাদটি যদি সত্যি সত্যিই ফলিয়া যাইত, তবে এক একটি লোক কত বছর করিয়া বাঁচিত জান? হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে যে সব লোকের চুল লাল হয় তাদের চুলের সংখ্যা হয় প্রায় ৯০ হাজারের কাছাকাছি। যাদের কাল চুল তাদের হ ১ লক্ষ তিন হাজার, আর যাদের কটা চুল তাদের হয় ১ লক্ষ ৯ হাজার। কাজেই আয়ু লক্ষ বছর হইত।

## মাছ ধরার অদ্ভুত যন্ত্র।

সম্প্রতি এক বৈজ্ঞানিক সমুদ্রের তলার মাছের সন্ধান লইবার এক অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। যন্ত্রটি কিসের সাহায্যে চলিবে জান?—প্রতিধ্বনির সাহায্যে।

# গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) মক্কা (২) বিহার (৩) গাইবাঁধা (৪) পিসা (৫) লঙ্কা (৬) অমৃতসর (৭) মুসুরী (৮) কাটামুণ্ডু।

---

## উত্তরদাতাদের নাম

### যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন ঃ—

শিশিরকুমার রায় (বসিরহাট), বিনোদ বিহারী চক্রবর্ত্তী (কানুনগোর পাড়া) দি ভৌমিক্‌স্ (ভবানীপুর)।

### যাঁহারা সাতটির উত্তর দিয়াছেন ঃ—

জ্যোৎস্না ও অনিল (শান্তিনিকেতন, ঢাকা), রবীন্দ্র, হীরু, তরুণ, ইলা (হাতোয়া)। যদুপতি, সন্তোষ ও ফণিভূষণ (বৃন্দাবন চক), মীরা ও স্বদেশ (ফরিদপুর), মনীষা সেন (গৌহাটী), বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় (বালী), সনৎ, রবীন, নিতাই, শিবানী, পিণ্টু ও প্রভাত (কালিম্পং), কমলা বসু (আমতা), দীনেন, রথীন, বীরেন (এণ্টালি, কলিকাতা), এন্ বণিক, এন্, বসু, কে তারণ, ডি, বাই ও এ, বণিক (কামালপুর), লক্ষ্মীময় ...মার ...দেবী (সাওগা), হরিদাস, সৌদামিনী বণিক, শ্রীবাস (কামালপুর), গিদারীক্ ফরোয়ার্ড লাইব্রেরার সভ্যগণ ...ধ্যায় (লাহোর)।

### ...হারা ...টির উত্তর দিয়াছেন

অমিয়কুমার সেন (... ...াধ্যায় (গৌহাটী), মহবুবুর রব চৌধুরী (শ্রীহট্ট), ...ন ঘোষ (বালুর ঘাট), সন্তোষ, ক্ষিতীশ, পশুপতি (সরিষা), দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (চন্দন নগর), ...মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাকা), তিলৈ সাধারণ পাঠমন্দিরের সভ্যবৃন্দ (তিলৈ, ফরিদপুর), সুনীল, মেরু, যোগমায়া ও ষষ্ঠী মামা (পূর্ব্বস্থলা), সুরমা রাণী রায় (ওয়াল্ টেয়ার), যোগেন্দ্র, রবি, সুধীর (রঘুনাথপুর)।

### যাঁহারা আংশিক উত্তর দিয়াছেন ঃ—

কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় (লাহোর), মীরা, পিণ্টু, অমিয়, গিরীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী (রংপুর) বাণীপদ এন্দ (রাঢ়িশাল, শ্রীহট্ট) অরুণকুমার বসু ও গীতা ঘোষ, রেণুকাময়ী সিংহ (বিহার শরীফ), কালিদাস পাঠমন্দির ও অনুশীলন সঙ্ঘের বন্ধুগণ (কণেশ্বর), তরুণ সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ (কামারজানী), ডলি রায় ও দুলু রায় (কাঞ্চনতলা, মুর্শিদাবাদ), আমিনদ্দিন আকন (বেজগাঁও), যোগেশ, যতীন্দ্র, অশ্বিনী, মিহির, লাল সাহা (নরসিংহদি), ঊষাময়ী ঘোষাল ও সন্তোষকুমার ঘোষাল (গাজিপুর), অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (রংপুর), সদানন্দ সাহা (মেদিনীপুর), বীণাপাণি দেবী (ম্যায়মিও, বর্ম্মা), সুশীলচন্দ্র সাহা ও তাহার বন্ধুগণ (আখাউরা বাজার)।

---

## নূতন ধাঁধা

( ১ )

### শব্দ-রুহিতন

কয়েকটি শব্দকে এমন ভাবে সাজাতে হবে যে পাশাপাশি ( বাঁয়ে থেকে ডাইনে ) যে শব্দগুলি আছে, উপর থেকে নীচেও সেই শব্দগুলি হবে। আর সব শুদ্ধ দেখতে হবে রুহিতনের মত। নীচে একটা নমুনা দিলাম—

ধাঁধার শব্দগুলি :—(১) ব্যঞ্জনবর্ণ, (২) ভুট্টা, (৩) লোক নিন্দা (৪) টানিলে বড় হয় এমন একটা জিনিষ, (৫) ব্যঞ্জনবর্ণ।

উত্তর :—

জ
জ না র
জ না প বা দ
র বা র
দ

এই রকম আরও তিনটি ধাঁধা দেওয়া গেল :—

ক

(১) স্বরবর্ণ (২) বড় ভাই (৩) মাসের নাম, (৪) গাছের নাম, (৫) ব্যঞ্জনবর্ণ

খ

(১) স্বরবর্ণ, (২) কোমল, (৩) যাহা রাখা যায় না, (৪) বুদ্ধি, (৫) ব্যঞ্জন বর্ণ।

গ

(১) একটি সংযুক্ত অক্ষর, (২) নিযুক্ত, (৩) একটি দেশের নাম, (৪) বস্ত্র-যন্ত্র বিশে… (৫) একটি যুক্তাক্ষর।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার

( ২ )

কোন্ জীব প্রথমে দু'পায়ে, তার পর চার পায়ে ও শেষে তিন পায়ে হাঁটে?

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৌলিক।

## নূতন ধাঁধা

( ১ )

### শব্দ-রুহিতন

কয়েকটি শব্দকে এমন ভাবে সাজাতে হবে যে পাশাপাশি ( বাঁয়ে থেকে ডাইনে ) যে শব্দগুলি আছে, উপর থেকে নীচেও সেই শব্দগুলি হবে। আর সব শুদ্ধ দেখতে হবে রুহিতনের মত। নীচে একটা নমুনা দিলাম—

ধাঁধার শব্দগুলি :—(১) ব্যঞ্জনবর্ণ, (২) ভুট্টা, (৩) লোক নিন্দা (৪) টানিলে বড় হয় এমন একটা জিনিষ, (৫) ব্যঞ্জনবর্ণ।

উত্তর :—

জ<br>
জ না র<br>
জ না প বা দ<br>
র বা র<br>
দ

এই রকম আরও তিনটি ধাঁধা দেওয়া গেল :—

ক

(১) স্বরবর্ণ (২) বড় ভাই (৩) মায়ের নাম, (৪) গাছের নাম. (৫) ব্যঞ্জনবর্ণ

... ঞ্জন চক্রবর্তী

খ

(১) স্বরবর্ণ, (২) কোমল, (৩) যাহা রাখা যায় না, (৪) বুদ্ধি, (৫) ব্যঞ্জন বর্ণ।

গ

(১) একটি সংযুক্ত অক্ষর, (২) নিযুক্ত, (৩) একটি দেশের নাম, (৪) বাদ্য-যন্ত্র বিশেষ, (৫) একটি যুক্তাক্ষর।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার

( ২ )

কোন্ জীব প্রথমে দু'পায়ে, তার পর চার পায়ে ও শেষে তিন পায়ে হাঁটে?

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৌলিক।